বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক:

ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক:

আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
রেজি নং−৩০/২০১১-১২ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অক্টোবর-২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক, আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **“নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা”** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমাদের জানা মতে, ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ উপস্থাপিত হয়নি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষকের এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক	যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক
(ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা‘বুদ)	(ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী)
অধ্যাপক	অধ্যাপক
আরবী বিভাগ	দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **"নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা"** শীর্ষক পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- এর নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ বিশ্ববিদ্যালয়/ সংস্থায় কোন ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে এর সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ জমা দেইনি।

আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
পি-এইচ. ডি. গবেষক
রেজি নং-৩০/২০১১-১২ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুরুতে সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর নিকট, এরপর দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.), তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ (রা.) ও যুগে যুগে যারা ইসলামের মহান খিদমত করেছেন তাদের প্রতি। অতঃপর **"নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা"** গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ড. শাহ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ গবেষণা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে তাঁরা সার্বিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভাগীয় শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলী মধ্যে থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মরহুম অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মরহুম অধ্যাপক আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দিন, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল কাদির, জনাব ড. যুবাইর মো. এহসানুল হক এবং বন্ধুবর ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ও ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রবীন অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আবু সায়েম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল হুসাইন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিকহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু বকর জাকারিয়া, আল-কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হিজবুল্লাহ, আল-হাদীস ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মরহুম ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব (ধর্ম মন্ত্রণালয়) এ জেড এম সামসুল আলম, বর্তমান যুগ্মসচিব (অর্থ মন্ত্রণালয়) মশিউর রহমান ও বিশিষ্ট লেখক এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলামসহ অনেকেই আমাকে আন্তরিকভাবে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সকলের সহযোগিতা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। মরহুম শ্রদ্ধেয় স্যারদের জন্য পরম করুণাময়ের নিকট বিশেষভাবে মাগফিরাত কামনা করছি।

গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ঢাকা, ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা ও দারুল হিকমাহ পাঠাগার, গাইবান্ধা ব্যবহার করছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও যে সব ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে আমার স্ত্রী, ভাতিজী সাদিয়াসহ স্বজন ও শুভাকাংঙ্খীদের অনেকেই বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা কর্মটি ফলপ্রসূ করার জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন ছোট ভাই কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এবিএম মুনিরুল ইসলাম, উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও প্রকৌশলী বি এ মাহমুদ, আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাংঙ্খীরা। আমি তাদের সকলের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, নানা প্রতিকূলতা পরও পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের একান্ত অনুগ্রহে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পারায় আবারও তাঁর নিকট সবিনয়ে লাখ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

বিনীত,

আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ
পি-এইচ. ডি. গবেষক
রেজি নং–৩০/২০১১-১২ইং
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ-সংকেত : শব্দ সংক্ষেপ সূচী

অনু.	: অনুবাদ
অনূ.	: অনূদিত
‘আ.	: ‘আলাইহি’স-সালাম
আল-কুরআন	০০ সূরা : আয়াত০০ (প্রথম সংখ্যা সূরার, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের)
ই ফা বা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	: ইংরেজী
খ্রী./খৃ.	: খ্রীস্টাব্দ
খৃ. পূ.	: খৃষ্ট পূর্ব
খ.	: খণ্ড
জ.	: জন্ম
ড.	: ডক্টর
ডা.	: ডাক্তার
তা. বি.	: তারিখ বিহীন
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
নং	: নম্বর
প্রাগুক্ত	: পূর্বোলিখিত/পূর্বোক্ত
পৃ.	: পৃষ্ঠা
বং	: বঙ্গাব্দ
বি. দ্র.	: বিশেষ দ্রষ্টব্য
মৃ.	: মৃত্যু
রহ.	: রাহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
রা.	: রাদি আল্লাহু ‘আনহু
সম্পা.	: সম্পাদিত,
সং.	: সংস্করণ/সংকলন
সা.	: সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম
হা. নং / হা.	: হাদীস নং
হি.	: হিজরী
Dr.	: Doctor
Ed.	: Edition
Ibid.	: Ibidem (in the same place)
N D	: No date
Op.cit.	: Opere Citato(in the work cited)
loc. cit.	: Loco Citato (in the same place cited)
P.	: Page
P. P.	: Pages
Vol.	: Volume

অভিসন্দর্ভে অনুসৃত আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়নঃ

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا (আলিফ)	অ/া	أ (হামযাহ)	’(উর্দ্ধ কমা)/অ
ب (বা)	ব	ي (ইয়া’)	য়/ই
ت (তা)	ত	ة (তা)	ত/হ
ث (ছা)	ছ/স	َ (যবর)	া
ج (জীম)	জ	ِ (যের)	ি
ح (হা)	হ	ُ (পেশ)	ু
خ (খা)	খ	ّ (তাশদীদ/দ্বিত বর্ণ)	্য
د (দাল)	দ	أ	আ
ذ (যাল)	য	إ	ই
ر (রা)	র	أ	উ
ز (যা)	য	عَ	‘আ
س (সীন)	স	عِ	‘ই
ش (শীন)	শ	عُ	‘উ
ص (ছাদ)	স	عو	‘ঊ
ض (দ্বাদ)	দ	وَ	ওয়া
ط (তা)	ত	و	উ
ظ (যা)	য	وُو	ঊ
ع (‘আইন)	‘(উল্টোকমা)/ ‘আ	يا	ইয়া
غ (গাইন)	গ	إيِ	য়ি
ف (ফা)	ফ	إيِ	য়ী
ق (ক্বাফ)	ক	أي	ঈ
ك (কাফ)	ক	يي	য়ী
ل (লাম)	ল		
م (মীম)	ম		
ن (নূন)	ন		
و (ওয়াও)	ও/উ/ব		
ه (হা)	হ		

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ পৃ. ০১

১ম অধ্যায়ঃ আল-কুরআন পরিচিতি পৃ. ০৪

১.১ আল-কুরআন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ এবং এর পরিচয়/০৫

১.২ আল-কুরআন নাযিলের ধারা/০৭

১.৩ আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রিকরণ/০৭

১.৪ আল-কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু/০৯

১.৫ আল-কুরআনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য /১৩

১.৬ নাযিলকৃত শেষ আসমানী কিতাব হিসেবে আল-কুরআন/১৬

১.৭ আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ /২২

১.৮ আল-কুরআন ও মানব জাতি /২৪

২য় অধ্যায়ঃ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা পৃ. ২৭

২.১ মূল্যবোধের ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়/২৮

২.২ ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্লেষণ/৩০

২.৩ সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা, ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মূল্যবোধ/৪০

২.৪ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড/৪২

২.৫ মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনের মূল্যমান ও বিশেষত্ব/৪৮

৩য় অধ্যায়ঃআল-কুরআনের আলোকে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী উপাদান পৃ. ৫২

৩.১ অবক্ষয় অর্থ, মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা /৫৩

৩.২ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রতিবন্ধক ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়সমূহ/৫৫

- ৩.২.১ ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে /৫৫
- ৩.২.২ পারিবারিক জীবনে /১০০
- ৩.২.৩ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে /১০৯
- ৩.২.৪ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে /১৬৪
- ৩.২.৫ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে/১৭৮
- ৩.২.৬ আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে /১৮৭

৩.৩ আল-কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়/২১৭

৩.৪ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অকল্যাণ ও অশুভ পরিণতি/২২১

৪র্থ অধ্যায়ঃ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন পৃ. ২২৬

৪.১ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের আলোকে মানব জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ ২২৭

- ৪.১.১ ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে /২২৭
- ৪.১.২ পারিবারিক জীবনে /২৬৮
- ৪.১.৩ সামাজিক পর্যায়ে /২৮৫
- ৪.১.৪ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে /৩২৫
- ৪.১.৫ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে /৩৭০
- ৪.১.৬ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে / ৩৭৯
- ৪.১.৭ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও সৎকর্মের সংশ্লিষ্ট / ৩৯৭

৪.২ মূল্যবোধ বিকাশে ঐতিহাসিক মদীনা রাষ্ট্রে আল-কুরআনের ভূমিকা/৪৬২

৪.৩ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা-দৃষ্টিভঙ্গি/৪৬৫

৪.৫ মূল্যবোধ সম্পর্কিত ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ/৪৬৭

৪.৬ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের কল্যাণ ও শুভ পরিণাম/৪৭০

৫ম অধ্যায়ঃ মূল্যবোধ বিকাশে মানব জীবনে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রায়োগ পদ্ধতি পৃ.৪৭৩

৫.১ মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে করণীয়/৪৭৪

৫.২ আল-কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের উপায়/৪৮১

৫.৩ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে গবেষকের মতামত ও সুপারিশ/৪৮৮

উপসংহার পৃ./৪৯২

গ্রন্থপঞ্জি পৃ./৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও ইলাহ আল্লাহ তা'য়ালার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি মানুষকে তারঁ প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানব জাতির হিদায়েত, শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য নাবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি দরুদ, যার উপর বিশ্ববাসীর হিদায়েত ও মুক্তির জন্য নাযিল করা হয়েছে সর্বশেষ আসমানী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। অতঃপর সাহাবা (রা.) ও তাবেয়ীসহ সেই সব মহান ব্যক্তিদের জন্য সালাম ও মাগফিরাত কামনা করছি যারা যুগে যুগে আল-কুরআন চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং আল-কুরআনের শিক্ষা প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

মহান আল্লাহ প্রথম মানব আদম('আ.) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া('আ.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব জাতির সূচনা করেন। তাদের সন্তানাদি থেকে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটান। পৃথিবীতে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য প্রদান করেন আসমানী জীবন বিধান।[১] প্রথম দিকে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান পালনে এক থাকলেও পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সত্য পথ নির্দেশের জন্য নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেন।[২] এভাবে যুগে যুগে মানব জাতির হিদায়েতের জন্য মহান আল্লাহ অসংখ্য নাবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করেন। নাবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সা. এর উপর নাযিলকৃত হয় সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এই মহাগ্রন্থ নাযিলের মাধ্যমে নবুয়্যতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ রহিত হয়। ফলে এই মহাগ্রন্থে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সারসংক্ষেপসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বকালের উপযোগী করে একটি সর্বজনীন, চিরন্তর, মৌলিক, পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত জীবন বিধান প্রদান করা হয়।

খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতকে আরব ভূখণ্ডসহ পৃথিবীবাসীর চরম নৈতিক অধঃপতন ঘটে। ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে মানব সভ্যতা বিকাশের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ আরব ভূখণ্ডে মুহাম্মাদ সা. কে প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি নাযিল করেন এই আসমানী মহাগ্রন্থ। দুনিয়ায় শান্তি ও উদ্বেগহীন জীবন যাপন এবং আখিরাতে মুক্তি লাভের পথনির্দেশই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য একটি সর্বজনীন ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। এতে মানুষের যাবতীয় সমস্যার মৌল উৎসের সন্ধান এবং তার নির্ভুল সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ তথা ব্যক্তি, পারিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিক-আধ্যাত্মিক ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়সহ সমগ্র জীবনের মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) "আর আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি–তাতে রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদরূপে।"

আল-কুরআন এমন এক সময় নাযিল হয় যখন পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে আরব সমাজের মানুষ ছিল চরম বর্বর, অসভ্য, বিভ্রান্ত,অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মূর্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, বিভিন্ন কুসংস্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহ, হত্যা-লুণ্ঠন, কন্যা সন্তানের জীবিত কবর, দাসপ্রথা, দূর্বলের প্রতি সবলের অবিচার, মদ-জুয়া, অশ্লীলতা-ব্যভিচার, পাপাচার ও নৈতিক অধঃপতন তাদের সমাজকে ভয়ানকভাবে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করেছিল। নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের সীমা অতিক্রম করে আরবরা পৃথিবীর একটি নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আরবরা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির অবস্থাও চরম শোচনীয় ছিল। আল-কুরআনের শিক্ষা এবং নাবী সা. এর তত্ত্বাবধানের বদৌলতে আরবরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ, উন্নত চরিত্র, সৌভ্রাতৃত্ব ও সুসভ্য জাতি হিসেবে নযিরবিহীন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সমাজ সাম্য, সুবিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সততা, নৈতিকতা, উদারতা, উন্নত মানবীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই নযিরবিহীন দৃষ্টান্ত আজও কেউ রচনা করতে পারেনি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا "তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর,তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন।

মুসলিম জাতির ঐতিহাসিক এই মহাবিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল আল-কুরআন। কুরআনের এই শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> কোরআন শরীফের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব জগতের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়। জগতের ইতিহাসে একখানা গ্রন্থ যে এত বিপুল পরিবর্তন আনায়ন করতে পারে তার তুলনা নেই। একটি জাতির জীবনে তেইশ বৎসর অতি সামান্য সময়। এই অল্প পরিসর সময়ে একটি বিচ্ছিন্ন , বিক্ষিপ্ত, কলহপরায়ণ জাতি তৌহিদের স্পর্শে বলীয়ান হয়ে জীবন ও জগতের রহস্য

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২১।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্ল : আয়াত ৮৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৩ ।

> উদঘাটনে ব্রতী হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই জাতি কোরআনের শিক্ষার জাদু স্পর্শে বিশ্বের বুক থেকে অন্ধকার নিরসন করে, সেখানে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। ইসলামী সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছে তা কোরআনের শিক্ষারই পরিণতি।[১]

কিন্তু রাসূল সা. ও খুলাফা রাশিদূনের (চার খলীফার) পর মুসলিম জাতির নৈতিক পদস্খলন শুরু হয়। ক্রমে তারা আল-কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে পার্থিব লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস ও আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সময়ের বিবর্তনে তাদের অধঃপতন ঘটে। বর্তমানে মানব সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত অধঃপতিত এই জাতিটি থাকলেও দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী ও নৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী মুসলিমের সংখ্যা পৃথিবীতে নগণ্য পর্যায়ে। ফলে আল-কুরআনের শিক্ষার বাস্তব নমুনা ও উন্নত চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী মুসলিমের পরিমান পৃথিবীতে অল্প। বর্তমান নামসর্বস্ব মুসলিম জাতির অধিকাংশই কুরআনের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। তাদের অধিকাংশের কর্ম ও আচরণ ইসলাম পরিপন্থী। তারা নানাবিধ বিভ্রান্তি ও অবক্ষয়ে জর্জরিত।

বর্তমান এই অধঃপতিত মুসলিম ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করলেও নৈতিকভাবে অধঃপতিত। অথচ কোন জাতির নৈতিক উন্নতি ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। এ কারণে বর্তমান মানব সমাজ লোভ, হিংসা, দুর্নীতি, ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস, ছিনতাই, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ফিৎনা-ফাসাদ, যুলুম, স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার, দায়িত্বহীনতা, মাদকাসক্তি-নেশা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, বিকৃত যৌনচার, নারী নির্যাতন, অপসংস্কৃতিক আগ্রাসন, পরশ্রীকতরতা, খাদ্যদ্রবে ভেজাল, মজুতদারী-কালোবাজারী, দ্বৈতনীতি, বৈষম্য-বর্ণবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ ইত্যাদিতে ভরে গেছে। অন্যায়, অবিচার, অনাচার, পাপাচার ও অশান্তি আজ সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় যেন সমগ্র মানব জাতিকে চারদিক থেকে ভয়ানকভাবে গ্রাস করেছে। মানবতা আজ ভয়ানকভাবে বিপন্ন ও নিষ্পেষিত। হাজারও সমস্যা-সংকটে জর্জরিত বর্তমান পৃথিবীবাসী তারই একটি জলন্ত সাক্ষী। যদি এই অবস্থা অব্যাহত থাকে তবে এক সময় মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। বহুবিদ সমস্যায় জর্জরিত এই পৃথিবীর অবস্থা সৃষ্টির জন্য মানুষই দায়ী। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]– ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে তিনি তাদের কতিপয় কৃতকর্মের শাস্তি তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"

জীবনের প্রকৃত পথ ভুলে গিয়ে দিশেহারা মানুষ দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে বিভিন্ন মরীচিকাপূর্ণ ভ্রান্ত পথে। আত্মবিস্মৃত মানব উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রবঞ্চনার মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে শন্তির অমিয়ধারা। কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ না করাই মানব জাতির এসব সংকট, দুর্দশা, দুর্গতি, অশান্তি ও অকল্যাণের মূল কারণ। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ''আর যে আমার স্মরণ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জন্য হবে এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাব অন্ধ অবস্থায়।"

বর্তমান সংঙ্কটাপন্ন মানব জাতির এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করে নৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনিস্বীকার্য। কেননা আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান প্রদান করা হয়েছে তাতে রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক কল্যাণ, পারলৌকিক মুক্তি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অতি চমৎকার দিকনির্দেশনা। শুধু তাই নয়, নৈতিকভাবে অধঃপতিত এবং চরমভাবে বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে একটি উৎকৃষ্ট সমাজ গঠনের বাস্তব উদাহরণ আল-কুরআনের আছে। তাই মানুষকে সত্যিকার আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হলে এবং মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হলে আল-কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহাসমুদ্র। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মৌলিক দিক নির্দেশনা সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সারনির্যাসসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানব জাতির মুক্তির পথনির্দেশ রয়েছে। নৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয় সম্পর্ক বিশেষভাবে অবহিত হওয়া সকলের প্রয়োজন। কিন্তু সমগ্র আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশজুড়ে এ বিষয়টির আলোচনা থাকায় সকলের পক্ষে এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা কষ্টসাধ্য। অধিকন্তু, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলা ভাষায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণাকর্ম পাওয়া যায় না। তাই **"নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা"** শিরোনামে গবেষণার এই প্রয়াস।

এই গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে হলো : ক. নৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বর্তমান মানব জাতিকে মহাসংঙ্কট থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করা। খ. বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আল-কুরআনের শিক্ষার সর্বজনীনতা তুলে ধরা। 'আল-কুরআনের শিক্ষা বর্তমান যুগে অনুপযোগী' প্রচলিত এই ভুল ধারণা দূর করা। গ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ব্যাপারে আল-

---

[১]. ড. রশীদুল আলম, *কোরআনের দর্শন* (ঢাকা: আয়েশা কিতাব ঘর, প্রকাশকাল ২০০২), পৃ.৬৮।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৪১।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : আয়াত ১২৪।

কুরআনের শিক্ষার প্রয়োজন ও উপযোগিতা তুলে ধরে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহলকে আল-কুরআনের শিক্ষার বাস্তবতা বুঝতে সহায়তা করা। ঘ.সমাজ সংস্কারে আল-কুরআনের শিক্ষার আবেদন, গ্রহণযোগ্যতা ও উপকারিতা তুলে ধরে তা বাস্তবায়নে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ঙ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে আল-কুরআনের শিক্ষা মানব জীবনে প্রয়োগের পদ্ধতি নির্দেশ করা।

আল-কুরআনের বিশাল শিক্ষাভাণ্ডার থেকে এই অভিসন্দর্ভে শুধু ঐ সব আয়াত তথা আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও ঘটনাবলীর শিক্ষা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেগুলোতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ সম্পর্কিত শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। এতে আল-কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে ততটুকু বিশ্লেষণ আনা হবে যাতে করে এ বিষয়ে কুরআনের শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

এই গবেষণাকর্মটিকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করার জন্য ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে– আল-কুরআন পরিচয়, নাযিলের ধারা, নাযিলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছি। আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রিকরণ, নাযিলকৃত শেষ আসমানী কিতাব হিসেবে আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়ার প্রমাণ, আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিকত্ব, এবং আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের একটি তুলনামূলক আলোচনা এবং মানব জাতির সাথে আল-কুরআনের সম্পর্ক আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে– মূল্যবোধের ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়, ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধ, ইসলামী মূল্যবোধের উৎপত্তি, ভিত্তি, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও স্বরূপ-প্রকৃতি, সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা, ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যকার পার্থক্য এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের গ্রহণযোগ্য উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনের গুরুত্ব কতটুকু– তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে–মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রতিবন্ধক উপাদান ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী(বর্জনীয়) বিষয়সমূহ কুরআনের দৃষ্টিতে বর্ণনা করে তার কার্যকারণ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। এরপর কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির মূল্যবোধের অবক্ষয় পর্যালোচনা এবং অবক্ষয়ের পার্থিব ও পরকালীন অশুভ পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে–নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণ এবং আল-কুরআন আলোকে মানব জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ নির্দেশ করার সাথে সাথে মূল্যবোধ বিকাশে ঐতিহাসিক মদীনা রাষ্ট্রে আল-কুরআনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং আল-কুরআনের শিক্ষা ও কতিপয় বিধি-বিধান উপযোগিতা সম্পর্কে বিশেষ মহলের সংশয় ও অপপ্রচারের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এরপর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা তুলে ধরে ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেষ পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশে ইহকালীন ও পরকালীন শুভ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে– বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মানব জীবনে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উপায়; আল-কুরআনের শিক্ষার বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের উপযোগী কর্মপন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শেষভাগে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে গবেষকের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

উপসংহারে– নৈতিক সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধন এবং অবক্ষয়রোধে আল-কুরআনের শিক্ষা সারবস্তু উল্লেখপূর্বক সামগ্রিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সচেতনভাবে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে।

অত্র অভিসন্দর্ভে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা এবং গুণগত মানের ক্ষেত্রে সর্বজনবিদিত নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। আল-কুরআন কেন্দ্রিক অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবহার ছাড়াও প্রচলিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বাস্তবসম্মত যুগোপযোগী তত্ত্ব ও তথ্যের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা-পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতা ও আমার অযোগ্যতার কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মানসম্মত অভিসন্দর্ভ রচনা হয়ে উঠেনি। তবে এর মধ্যে যতটুকু ভালো হয়েছে তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয়েছে, আর যে সব ভুল-ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা আমার সীমাবদ্ধতার কারণে হয়েছে। আশারাখি নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং সমাজ সংস্কারে কিছুটা হলেও এই অভিসন্দর্ভটি জাতির উপকারে আসবে।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ, তিনি যেন আমার ক্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন।

প্রথম অধ্যায়ঃ আল-কুরআন পরিচিতি

১.১ আল-কুরআন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ এবং এর পরিচয়

১.২ আল-কুরআন নাযিলের ধারা

১.৪ আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণ

১.৩ আল-কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

১.৫ আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়

১.৬ আল-কুরআনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১.৭ নাযিলকৃত শেষ আসমানী কিতাব হিসেবে আল-কুরআন

১.৯ আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

১.১০আল-কুরআন ও মানব জাতি

মানব ইতিহাসের প্রসিদ্ধ আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-কুরআন সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সর্বশেষ। এটা শুধু একটি আসমানী ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং তা একটি কালোত্তীর্ণ ও সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল-কুরআন প্রদত্ত এই জীবন বিধান অবলম্বনের বদৌলতে বিশ্ববাসী দীর্ঘকাল লাভ করেছিল কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও মুক্তি এবং অবসান ঘটেছিল সব অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ও অনৈতিকতার এবং মুসলিম জাতি লাভ করেছিল বিশ্বের নেতৃত্ব। কিন্তু কালের বিবর্তনে বিভিন্ন কারণে তারা আল-কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়। ফলে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে এবং তারা নেতৃত্ব হারিয়ে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হতে থাকে। মুসলিম অধঃপতনের পর পৃথিবীতে বহু মতাদর্শের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সে সব মতাদর্শ জ্ঞানের নির্ভুল উৎস '*ওহী*'[১] বর্জিত সীমাবদ্ধ মানব চিন্তাপ্রসূত হওয়ায় সেগুলো মানুষের স্থায়ী শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং সেগুলো অল্পকালের মধ্যেই তাদের আবেদন হারিয়ে ফেলেছে এবং বিভিন্ন সংকট সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববাসী আজ নৈতিক অধঃপতনসহ নানা সমস্যা-সংকটে জর্জরিত। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে তারা অধীর অপেক্ষায়। কিন্তু এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে নৈতিকতা, শান্তি ও মুক্তির নির্ভুল মূল উৎসের নিকট যেতে হবে। তবেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি মিলবে। বলাবাহুল্য, আল-কুরআনই নৈতিকতা, শান্তি ও মুক্তির নির্ভুল ও পরীক্ষিত উৎস। এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ। এর শাশ্বত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই আজকের মানুষেরও সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নানা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই মহাগ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল।

আল-কুরআন শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণ:

আভিধানিক অর্থ: আল-কুরআন (القرآن) শব্দটি আরবী শব্দ। القرآن শব্দটি قرء - يقرأ থকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ-একত্রিকরণ, সংগ্রহ করা, পরে তা পঠন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা পঠন অর্থ- শব্দসমূহের একত্রিকরণ।[২] ইবনু মানযূর আল-আফরীকী (মৃ.৭১১হি.) বলেন, القرآن(আল-কুরআন) শব্দটি মূলত আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী قُرْآنَه - قَرَأنَا- قرء-يقرأ ক্রিয়ামূল থেকে উৎগত। যার অর্থ পড়া, অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা, অধিক পঠিত ইত্যাদি।[৩] জাহেলী যুগে আরবরা 'قرأ' শব্দ পাঠ করা অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করত। যেমন: আরবদের উক্তি (ما قَرَأَتِ الناقةُ سَلىً قَطُّ وما قَرَأَتْ مَلْقُوحاً قَطّ) 'এ উষ্ট্রীটি কখনও গর্ভবতী হয়নি ও বাচ্চাও দেয়নি।' পরবর্তীতে আরবরা শব্দটিকে তিলাওয়াত বা পাঠ অর্থে গ্রহণ করেছে এবং এ অর্থেই তা প্রচলিত হয়ে গেছে।[৪]

উল্লেখ্য যে, আল-কুরআন (القرآن) শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ বিষয়ে আরবী ভাষাবিদ ও আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের মূল দিক দু'টি। প্রথমটি হচ্ছে: কুরআন শব্দটি নিষ্পন্ন বিশেষ্য (*ইসমি মুশতাক*), না-কি অনিষ্পন্ন বিশেষ্য (*ইসমি গায়র মুশতাক*)। দ্বিতীয়ত: 'কুরআন' শব্দটিতে হামযাহ অক্ষর আছে কি নেই।

এক. আল-কুরআন (القرآن) শব্দটি অনিষ্পন্ন বিশেষ্য অর্থাৎ তা কোন ক্রিয়ামূল বা ধাতু কিংবা অন্য কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন নয় (*ইসমি গায়র মুশতাক*) এবং তা হামযা বিশিষ্ট নয়। ইমাম শাফেয়ী রহ. (মৃ.২০৪হি.), ব্যকরণবিদ আল-ফাররা (মৃ.২০৭হি.), আবুল হাসান আশআরী রহ. (মৃ.৩২৪হি.) ও ইবনু কাছীর রহ. (মৃ.৭৭৪হি.) সহ একদল আলিম এ মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আল-কুরআন (القرآن) শব্দটি ক্রিয়ামূল (*মাসদার*), ধাতু কিংবা অন্য কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন নয়। ফলে তা কোন শব্দ থেকে নির্গত হয়নি, (*ইসমি গাইরি মুশতাক*) এবং তা হামযাবিহীন (*গাইরি মাহমুয*)। এটি আল-কুরআনের সুনির্দিষ্ট নাম, যা শুধু রাসূল সা.এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কালামের জন্য সুনির্দিষ্ট, যেমন-তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল মহান আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী।[৫]

দুই. আল-কুরআন (القرآن) শব্দটি উৎপন্ন বিশেষ্য(*ইসমি মুশতাক*), যা قرء ধাতু থেকে উৎপন্ন এবং তা হামযা বিশিষ্ট। আবূ ইসহাক আয-যাজ্জাজ(মৃ.৩১১হি.), আবুল হাসান আল-লিহয়ানী(মৃ.৩১৫হি.) সহ একদল আলিম এ মতের প্রবক্তা।[৬]

•আয-যাজ্জাজ (মৃ.৩১১হি.) বলেন-قرآن (কুরআন) শব্দটি فعلان এর ওজনে গঠিত এবং قرء ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ জমা বা সন্নিবেশ করা। যেমন আরবরা বলেন-(قرا الماء في الحوض) 'পানি হাওযে জমা হয়েছে।'[৭]

•আল-লিহয়ানী বলেন-"قرآن (কুরআন) শব্দটি হামযাযুক্ত এবং 'قرأ' ক্রিয়ার মাসদার বা ক্রিয়ামূল। قرآن শব্দটি غفران এর সম ওজনে এবং 'قرأ' শব্দ থেকে গঠিত। যার অর্থ-পাঠ করা। আর মাসদারকে *ইসমে মাফউল*(Past Participle)

---

[১]. ***ওহী*** শব্দের আভিধানিক অর্থ-এমন গোপন ও দ্রুত সংবাদ যা শুধু ঐ ব্যক্তিই জানে যার নিকট তা প্রেরণ করা হয়েছে, তা অন্যদের কাছে গোপন থেকে যায়। পরিভাষায়–"ওহী হল আল্লাহ প্রদত্ত বাণী, যা তাঁর নাবীগণের মধ্য থেকে কোন নাবীর উপর নাযিল করেছেন।" [মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, তাবি.) পৃ.২৬,] ওহী দু'প্রকার যথা, ক. *মাতলু*, যা সালাতে বা সালাতের বাইরে ইবাদত হিসেবে তিলাওয়াত করা হয়; যেমন কুরআন খ. *গাইর মাতলু*: যা সালাতে বা সালাতের বাইরে ইবাদত হিসেবে তিলাওয়াত করা হয় না;যেমন হাদীস। ওহী মাতলু এর ভাব ও ভাষা সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত। আর ওহী গাইর মাতলুর ভাব আল্লাহ প্রদত্ত কিন্তু ভাষা রাসূলের সা.। [ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ,'*উলূমু'ল-কুরআন* (রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ২০০২) খ.১, পৃ.৩৫।]

[২]. রাগিব আল-ইসফাহানী (মৃ.৫০২হি.), *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন* (মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, তা. বি.) খ.০২, পৃ.৫২০।

[৩]. ইবনু মানযূর আল-আফরীকী, (মৃ.৭১১হি.) *লিসানুল আরব* (ইরান:নাশরু আদাবিল হাওযাহ, ১৪০৫ হি.), খ.০১, পৃ.১২৬; ড. সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫), পৃ.১৯।

[৪]. ইবনু মানযূর আল-আফরীকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৮-৭৯, ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮-১৯।

[৫]. আস-সুয়ূতী জালালুদ্দিন, (মৃ.৯১১হি.) *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন* (কায়রো : দারল হাদীস, ১৪২৭ হি.), খ. ০১, পৃ.১৬৯।

[৬]. ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯; আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯।

[৭]. জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭০; ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এর অর্থে গ্রহণকরত এখানে কুরআনকে مقروء বা পঠিত গ্রন্থ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[১] আরবী ভাষায় মাসদার কখনও কখনও ইসমে মাফউল এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই কুরআনকে 'কুরআন' (مقروء) বা পঠিত গ্রন্থ বলা হয়।[২] যেমন মহান আল্লাহর বাণী–[৩] (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ-فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَه) "নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।"

আল-কুরআনকে 'আল-কুরআন' নামকরণের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মত হলো-
•ইবনুল আছীর(মৃ.৬০৬হি.) বলেন–القرآن অর্থ জমা বা একত্রিত করা। আল-কুরআনকে এ নামে নামকরণ করার কারণ–তাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনাবলী, আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার-সতর্ককরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আয়াত ও সূরাসমূহের পরস্পরকে পরস্পরের সাথে একত্রিত ও মিলিত করেছে।[৪]

•আবুল হাসান আল-আশ'আরী রহ. (মৃ.৩২৪হি.) মতে– قرن الشئ بالشئ থেকে القرآن উদ্ভুত। যার অর্থ- একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা, আয়াত ও হরফসমূহ পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে আল-কুরআন বলা হয়।[৫] এর কাছাকাছি অভিমত পেশ করে আবূ উবাইদাহ বলেন(মৃ.২০৯হি.), আল-কুরআনকে এরূপ নামকরণের কারণ হল, তাতে সূরা ও হরফসমূহ একত্রিত এবং পরস্পরে মিলিত করা হয়েছে।[৬]

•আল-ফাররা (মৃ.২০৭হি.)বলেন–"আল-কুরাআন (القرآن) নামটি القرائن থেকে উদ্ভুত। এটি قرينة এর বহুবচন, যার অর্থ অনুরূপ। যেহেতু আল-কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতের সত্যতা প্রতিপন্ন করে এবং এর এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে তাকে আল-কুরআন বলা হয়।"[৭]

•কারো কারো মতে, আল-কুরআনকে কুরআন বলার কারণ হল, এতে পূর্ববর্তী সব আসমানী গ্রন্থের শিক্ষা ও সারবস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে।[৮] •কেউ কেউ বলেন, আল-কুরআন দুনিয়ার সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলেই তাঁকে আল-কুরআন বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থঃ আল-কুরআন নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ। এটা কোন মানুষের রচনা নয়। এর ভাব ও ভাষা সরাসরি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। মানব জাতির সার্বিক জীবনের পথনির্দেশ করে এটি সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সা.এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৯]

(وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ- بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ)

"নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সমস্ত সৃষ্টিজগতের রবেরই নিকট থেকে অবতীর্ণ, আজ্ঞা পালনকারী (জিব্রাইল) তা নিয়ে এসেছেন, আপনার (মুহাম্মাদ) হৃদয়ে, যাতে আপনি (আপনার উম্মতের জন্য) সতর্ককারী হতে পারেন। (এটা নাযিল করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।[আর অবশ্যই তার উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে]"।

•ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে আল-কুরআনের পরিচয় তুলে ধরেছে। এ ব্যাপারে মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ মান্না আল-কাত্তান (১৯২৫- ১৯৯৯ খৃ.) বলেন-[১০] (هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم المتعبد بتلاوته)
" আল-কুরআন হল আল্লাহর কালাম যা মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ, যা তিলাওয়াত করা ইবাদত।"

•*'আল-মানার'* গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (মৃ.৭১০হি.) বলেন-[১১]
(واما الكتاب فاالقرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه و سلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة)
"বস্তুত কিতাব হল আল-কুরআন যা রাসূল (সা.) এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর তা রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির সনদে সন্দেহমুক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"

•বিশিষ্ট মুফাস্সির মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী (১৯৩০- ২০১৫ খৃ.) বলেন-[১২]
(هو كلام الله المعجز، المنزل على خاتم الانبياء و المرسلين بواسطة الامين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف، المنقول الينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، و المختتم بسورة الناس)

[১] .ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯; জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯।
[২] .জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ:১৭-১৮।
[৪]. ইবন মানযূর, মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম আল-আফরীকী, *লিসানুল আরব* (কায়রো: দারুল হাদীস,২০০৩) খ.০৯, পৃ.২৮৫; ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯।
[৫] .ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮; জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯।
[৬] .জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭০।
[৭] .জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯; রাগিব আল-ইসফাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৫২০; ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮।
[৮] .রাগিব আল-ইসফাহানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২০; জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৯; ড. সুবহী সালিহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯ ।
[৯] .আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা : ১৯২-১৯৫, এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ১০:৩৭, ৪:৮২, ২:২৩, ৮১:১৯, ৬৯:৪০-৪২।
[১০] .মান্না' খলীল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন* (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, তাবি.) পৃ. ১৬।
[১১] .আহমাদ মোল্লা জিওন, *নূরুল আনোয়ার* (পাকিস্তান, সাদিকাবাদ: জামি'আ ইসলামিয়া, তা. বি.), খ.০১, পৃ.১৯-২১।
[১২] .মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, *আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন* (পাকিস্তান, করাচী : মাকতবাতুল বুশরা, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১২) পৃ.০৮।

"আল-কুরআন আল্লাহর কালাম যার মোকাবেলায় সবাই অক্ষম। জিব্রাইল আমিন ('আ.) এর মাধ্যমে সর্বশেষ নাবী ও রাসূলের উপর এটি অবতীর্ণ। মাসহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ। মুতাওয়াতির পর্যায়ে এটি আমাদের নিকট পর্যন্ত বর্ণিত। এর তিলাওয়াত করা ইবাদত এবং এর আরম্ভ সূরা আল-ফাতিহা দ্বারা এবং সমাপ্তি সূরা আন-নাস এর মাধ্যমে।"

উল্লেখিত সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে শেষোক্ত সংজ্ঞাটি অধিক সুস্পষ্ট। তবে সব সংজ্ঞার মূলকথা হল, আল-কুরআন মানুষ, জিন বা ফিরিশতার কোন বক্তব্য নয়, বরং এটা মহান আল্লাহর বাণী, যার সমকক্ষ রচনা সৃষ্টিকুলের পক্ষে অসম্ভব। তা জিব্রাইল ('আ.) এর মাধ্যমে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ, এটা পূর্ববর্তী কোন আসমানী কিতাবের অংশ নয়। এটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও সন্দেহমুক্তভাবে বর্ণিত, এর তিলাওয়াত করা ইবাদত, আর এটা *'হাদীস আল-কুদসী'*[১] এর মত আল্লাহর কোন বক্তব্য নয়।

আল-কুরআন নাযিলের ধারাঃ

আল-কুরআন সৃষ্টির শুরু থেকে *'লাওহি মাহফুয'*[২]-এ সংরক্ষিত রয়েছে।[৩] *লাওহি মাহফুয* থেকে দু'পর্যায়ে আল-কুরআন পৃথিবীতে নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ আল-কুরআন একসাথে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের মর্যাদাপূর্ণ স্থান *'বাইতুল ইয্যাহ'*য় অবতীর্ণ করা হয়।[৪] দ্বিতীয় পর্যায়ে *'বাইতুল ইয্যাহ'* থেকে জিব্রাইল('আ.) মাধ্যমে প্রয়োজন অনুপাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর তাঁর নবুয়তী জীবনের দীর্ঘ তেইশ বছর কালব্যাপী খণ্ড খণ্ড আকারে নাযিল হয়।[৫]

পৃথিবীতে আল-কুরআন নাযিল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক হেরা গুহায় *রামাদান* মাসের *লাইলাতুল কদর* (২৭ রামাদান) এর এক বিশেষ মুহুর্তে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) এর চল্লিশ বছর বয়সে পৃথিবীতে প্রথম আল-কুরআন নাযিলের সুত্রপাত ঘটে।[৬] সমগ্র আল-কুরআন একবারে নাযিল না হয়ে বিভিন্ন সময় খণ্ড খণ্ডভাবে নাযিল হওয়ায় প্রথম ও শেষ নাযিল হওয়া আয়াত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী–সূরা 'আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দিয়ে আল-কুরআন নাযিল শুরু হয়।[৭] আর সূরা আল-বাক্বারাহর ২৮১ ও ২৮২ আয়াত নাযিলের মধ্য দিয়ে নাযিলের পরিসমাপ্তি ঘটে। রাসূলুল্লাহর সা. ইন্তিকালের নয়দিন পূর্বে আল-কুরআন নাযিল সমাপ্ত হয়।[৮] মক্কায় আল-কুরআন অবতীর্ণের সময়কাল ছিল ১৩ বছর এবং মদীনায় অবতীর্ণের সময়কাল ১০ বছর।[৯] কারো কারো মতে, মক্কায় এই সময়কাল ছিল ১২ বছর ৫ মাস ২১ দিন এবং মদীনায় এই সময়কাল ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন।[১০] অবশ্য এই সময়ের মধ্যে ওহী নাযিলের প্রথম ভাগে মক্কায় আড়াই বা তিন বছর সময়কাল ওহী নাযিল বন্ধ ছিল।

আল-কুরআনের বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর উপর তা অবতীর্ণ হয়নি; বরং প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে অবতরণের ক্রমধারা ভিন্ন ছিল। তবে কোন আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) ওহী লেখকদের এ কথাও বলে দিতেন যে, এ আয়াতকে অমুক সূরার অমুক স্থানে লিখ। এবং সেভাবেই তা তালিকাবদ্ধ হতো। অবতরণের ক্রমধারা সংরক্ষণের চেষ্টা রাসূল (সা.) নিজেও করেননি, সাহাবাগণও করেননি। তাই আল-কুরআন অবতণের ক্রমধারা সম্পর্কে বিশদ সঠিক তথ্য জানা যায় না।[১১]

আল-কুরআন সংরক্ষণ ও একত্রকরণঃ

আল-কুরআন নাযিলের শুরু থেকেই মুখস্থকরণ ও লিখনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়।[১২] আল-কুরআন সংরক্ষণের এই স্তর তিনটি। ক. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়, খ. আবূ বকর (রা.) এর সময়, গ. উসমান (রা.) এর সময়।

ক. রাসূলুল্লাহ(সা.) এর সময়ঃ রাসূল (সা.) এর উপর আল-কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হলে তিনি তা সাহাবী[১৩] দের পাঠ করে শুনাতেন এবং তিনি তাঁদেরকে তা পাঠ করে শুনাতে বলতেন। এভাবে নাযিলকৃত আয়াত মুখস্থ হয়ে যেত। এরপর তা *কাতিবুল ওহী* (সম্মানিত লেখকদের) দ্বারা লিখে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ(সা.) এর সময় যারা তাঁর নির্দেশে ওহী

---

[১] .হাদীসে কুদসী হল, যে হাদীসকে নাবী কারীম (সা.) মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। -মান্না আল কাত্তান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০।

[২]. ***'লাওহি মাহফুয'*** কিরূপ তা আমরা জানতে পারি না। কেননা এটা অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। [সাইয়েদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, http://www.altafsir.com খ.০৮, পৃ.০৫] একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, লাওহি মাহফুয সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মিত। এর দৈর্ঘ আকাশ ও পৃথিবীর সমান এবং প্রস্থ মাশরিক(পূর্ব) থেকে মাগরিব(পশ্চিম) এর মধ্যবর্তী স্থানের সমান। এর পাতা লাল ইয়াকুতের। এর কলম নূরের তৈরী। এর মধ্যে লেখাও নূরের। [আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জাম আল-কাবীর*, (ইরাক: মাতবুআতুল ইলমি ওয়াল হিকম, ২য় সং. ১৪০৪হি.) খ.১২, পৃ.৭২, হা. নং ১২৫১১]

[৩] .আল-কুরআন ৮৫: ২১-২২।

[৪] .আল-কুরআন (৪৪:০২-০৩),(৯৭:১),(২:১৪৫), মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭-১৮, ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৬।

[৫] . আল-কুরআন ১৭:১০৬, ২৫:৩২।

[৬] .আল-কুরআন ২:১৮৫, ৯৭:১, মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১।

[৭]. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃ.২৫৬হি.), *আস-সহীহ* (বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ইয়ামাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭হি.), কিতাবুল ওহী, হাদীস নং ০৩।

[৮] . মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪।

[৯] . মুহাম্মদ আবদুল আযীম আয্-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬খৃ.) খ.০১,পৃ. ৩৮।

[১০] . ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯) পৃ. ১৮।

[১১] . তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন* (ঢাকা : ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ২০০৭) পৃ.৫৭।

[১২]. মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৪।

[১৩] . সাহাবী : সাহাবী শব্দের আভিধানিক অর্থ: সহচর, সঙ্গী-সাথী। পরিভাষায়, সাহাবী ঐ ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপরেই মৃত্যুবরণ করেছেন।-ইবনু হাজার আল-আসকালানী,*আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, (বৈরুত: দারুল যাইল,১৪১২হি.), খ.১, পৃ.৬।

Dhaka University Institutional Repository

লিখে রাখতেন তাঁদের সংখ্যা অনেক ছিল, জানা যায় যে, এরূপ কাতিব ছিল চল্লিশ বা বিয়াল্লিশজন।[১] তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন: যায়িদ ইবন ছাবিত (রা.), আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.), উমার আল-ফারুক (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), উবাই ইবন কা'ব (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.)। অনুরূপভাবে আল-কুরআন নাযিলকালীন সময়ে আল-কুরআনের হাফিয সংখ্যাও ছিল অনেক। বি'র মাউনের ঘটনায় ৭৭ জন হাফিয শহীদ এবং পরবর্তীতে ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ মতান্তরে ৭০০জন হাফিয শহীদ–তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এভাবে রাসূল সা. কাতিবদের লেখনী এবং হাফিযদের মুখস্তকরণের মাধ্যমে আল-কুরআন দুনিয়ায় সংরক্ষিত অবস্থায় রেখে যান। কিন্তু তিনি যেভাবে বিন্যস্ত করে গেছেন তা ক্বারীদের স্মৃতিতে থাকলেও কাতিবরা যা লিপিবদ্ধ করেছিল তা একস্থানে একত্রিত ছিল না।

খ. আবূ বকর (রা.) এর সময়: রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা.) খিলাফত লাভ করেন। তাঁর খিলাফত (৬৩২-৬৩৪খৃ.) লাভের ০৬ (ছয়) মাস পর ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক আল-কুরআনের হাফিয শহীদ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উমার (রা.) এর পরামর্শে খলীফা আবূ বকর (রা.) গ্রন্থকারে আল-কুরআন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে প্রধান *কাতিবুল ওহী* যায়িদ ইবন ছাবিত (রা.) কে দায়িত্ব দিলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা.) এর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করা আল-কুরআনের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করে হাফিযদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত আল-কুরআনের সাথে মিলিয়ে একটি প্রণিধানযোগ্য কপি তৈরী করেন। এভাবে তিনি যে মাসহাফ তৈরী করেন তা সর্বদিক দিয়ে নির্ভুল ও রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক বিন্যস্ত আল-কুরআন।[২] এতে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয়নি। R. A. Nicholson (১৮৬৮-১৯৪৫) এর মত সমালোচকও আল-কুরআনের বিশুদ্ধতা স্বীকার করেন বলেন যে, "and its genuineness is above suspicion." অর্থাৎ 'এর নির্ভেজালতা সন্দেহাতীত।'[৩]

আবূ বকর (রা.)-এর সময়কার পাণ্ডুলিপিটি ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত: ক. এ পাণ্ডুলিপিতে রাসূল (সা.) এর বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতগুলো সূরাসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করা হয়েছিল। তবে সূরাগুলোর ধারাবাহিকতা ছিল না। বরং প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে আলাদা কপিতে লিখা হয়েছিল। তাই তা অনেকগুলো সহীফা বা কপিতে বিভক্ত ছিল। খ. এ কপিগুলোতে শুধু ঐ সমস্ত আয়াত ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল, যেগুলোর তিলাওয়াত মানসুখ (রহিত) হয়নি। গ.এ পাণ্ডুলিপিতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতিই সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। ঘ. এ পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সর্বসম্মত ঐক্যমতের ভিত্তিতে *মুতাওয়াতির সনদের*[৪] ভিত্তিতে তৈরী করা হয়।

গ. উসমান (রা.) এর সময়: খুলাফায় রাশিদূনের যুগে অনারব দেশসমূহে ব্যাপকভাবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের জন্য আল-কুরআন পাঠে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে উসমান (রা.) এর খিলাফতকালে (৬৪৪-৬৫৬খৃ.) হুযায়ফা (রা.) আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের এলাকার এক অভিযান থেকে ফিরে এসে সেখানকার মুসলিমদের মধ্যে আল-কুরআন পাঠের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য যে, রাসূল সা. তাঁর জীবদ্দশায় কুরাইশী ভাষা ছাড়াও আরবের কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় আল-কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগুলোর উচ্চারণে পার্থক্য থাকায় আল-কুরআন তিলাওয়াতে উচ্চারণে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম প্রসারের ফলে কিছু অনারব দেশে আঞ্চলিক ভাষায় আল-কুরআন তিলাওয়াতের চর্চা শুরু হয়। এতে আল-কুরআন তিলাওয়াতে এক ধরনের উচ্চারণ বিকৃতি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। বিষয়টি উসমান (রা.) এর দৃষ্টি গোচর হওয়ার পর তিনি উপস্থিত সাহাবীদের পরামর্শ ভিত্তিতে আঞ্চলিক ভাষায় আল-কুরআন তিলাওয়াতে নিষিদ্ধ করেন এবং আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কুরআনের কপি পুড়ে ফেলেন এবং শুধু কুরাইশী ভাষায়, যে ভাষায় আল-কুরআন নাযিল হয় কেবল তাতে আল-কুরআন তিলওয়াতের সিদ্ধান্ত জারি করেন। এরপর উসমান (রা.) আবূ বকর (রা.) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'মাসহাফ' যা হাফসা (রা.) এর নিকটে রক্ষিত ছিল তা সংগ্রহ করে তার মূল পাঠের (কুরাইশী পাঠের) হুবহু কয়েকটি কপি নকল করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে উসমান (রা.) আল-কুরআনকে স্থায়ীভাবে হিফাযতের ব্যবস্থা করেন।[৫] *মাসহাফে উসমানী* তথা উসমান (রা.) এর কপি পৃথিবীতে ব্যাপক চালু হয়। উসমান (রা.) সেই কপি আজও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত আছে, বর্তমান মুদ্রিত আল-কুরআন তাঁর অনুরূপ।

উসমান (রা.)-এর সময়কার পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য: ক. আবূ বকর (রা.)-এর উদ্যোগে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস ছিল না। বরং সূরাগুলো পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। এ পাণ্ডুলিপিতে সবগুলো সূরাকে ক্রমানুপাতে একই কপিতে সুবিন্যস্ত করে লিপিবদ্ধ করা হয়। খ. আয়াতগুলো এমন এক লিখন পদ্ধতির অনুসরণে লিখা হয়, যাতে সবগুলো শুদ্ধ ক্বিরাআত পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই এতে নুকতা, যের, যবর ও পেশ সংযুক্ত হয়নি। গ.এ পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে প্রধানত আবূ-বকর(রা.)-এর যুগে লিখিত কপি অনুসরণের সাথে অধিকতর সাবধানতা

---

[১] .তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪১; ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২।

[২]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং. ৪৪০২।

[৩]. R.A. Nicholson, *A litarary History of Arabs* (Great Britain : Cambridge University press, 1st edition, Reprinted 1988), p.143।

[৪] মুতাওয়াতির সনদ হলো প্রতিটি আয়াত এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণনা করেন যার ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা করা অসম্ভব।

[৫] .*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু ফাদায়িলিল কুরআন, হাদীস নং ৪৭০২।

Dhaka University Institutional Repository

বশত ঐ সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয় যা আবূ বকর (রা.)-এর যুগে মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় অনুসরণ করা হয়েছিল। রাসূল (সা.) এর যুগে লিখিত কুরআনের সে সব অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলো পুনরায় একত্র করা হয়। আবূ বকর (রা.)-এর সময়ের মূল পাণ্ডুলিপির অনুলিপির সাথে সে সব অনুলিপিও পুনঃপরীক্ষা ও নতুনভাবে যাচাই করে দেখা হয়। ঘ. তখন পর্যন্ত কুরআনের সর্বসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য একটি মাত্র কপি বিদ্যমান ছিল। এ সময়কালে কুরআনের একাধিক কপি তৈরী করা হয়। সাধারণ বর্ণনা মতে- পাঁচটি মতান্তরে সাতটি কপি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ঙ. আল-কুরআনের এ সর্বসম্মত কপি তৈরী হওয়ার পর গোটা উম্মত এ কপির ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর উসমান (রা.) আগের বিক্ষিপ্ত সব কপি আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেন।

উল্লেখ্য যে, *মাসহাফে উসমানী*তে হারকাত (আরবী স্বরচিহ্ন) ছিল না। অনারবদের পক্ষে আরবী এই লিপির পঠন ছিল দুঃসাধ্য। ইসলাম আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে অনারব ভূমিতে পৌঁছলে আল-কুরআন তিলাওয়াত সহজ করার জন্য তাতে হারকাত প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই মুসলিম পণ্ডিতগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে নুকতাহ ও স্বরচিহ্নের ব্যবস্থা করে লিপিকে সহজপাঠ্য করতে সচেষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে আবুল আস্ওয়াদ আল-দুয়ালী (মৃ.৬৯ হি.), হাসান আল-বাসরী (মৃ.১১০হি.) ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার (মৃ.১২৯হি.), নসর ইবন আসম (মৃ.৮৯হি.), উমাইয়াদের প্রাদেশিক গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ (মৃ.৯৬হি./৭১৪), খলীল ইবন আহমদ (মৃ.১৭৪হি.) প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য।[১]

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে হাতেই আল-কুরআন লিখা হতো। এক্ষেত্রে যুগে যুগে মুসলিমদের কীর্তি বিস্ময়কর। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর জার্মানীর হামবুর্গে ১১১৩ হি./১৭০১খ্রী. আল-কুরআন প্রথম মুদ্রিত হয়। এরপর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। এরপর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তেহরান ও কাযান শহরে আল-কুরআন মুদ্রিত হয়। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে ছাপাখানায় আল-কুরআন মুদ্রিত হয়।[২]

আল-কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যঃ

মানব জাতির হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে নাবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করা হয়। সেই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে আল-কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে। আল-কুরআন মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগের এবং অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সত্যের চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক। আল-কুরআনের উদ্দেশ্য হলো, মানব জাতিকে আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন করা, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং আখিরাতে সুখময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। আল-কুরআন অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-[৩] فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى "অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং হতভাগ্যও হবে না।"

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (মৃ.১১৭৬হি.) বলেন-[৪] আল-কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য তিনটি-"মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন বা আত্মার সংশোধন, বাতিল আকীদার মূলোৎপাটন এবং কুসংস্কার ও কুকর্মকাণ্ডের মূলোচ্ছেদ।"

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়/বিষয়বস্তুঃ

আল-কুরআন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্ভুল পথনির্দেশিকা। এতে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে।[৫] এতে বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর মৌলিক পরিচয় ও গুণাবলী, সৃষ্টিজগত, সৃষ্টি রহস্য, সত্য ও সরল সঠিক পথের পরিচয়, পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলী, নাবী-রাসূলদের দাওয়াহ ও কর্মনীতি, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, পার্থিব জীবনের স্বরূপ, পরকালীন জীবনের বাস্তবতা ও জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও ইবাদত সংক্রান্ত বিধি-বিধানসহ মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণ কিসে নিহিত তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (মৃ.১১৭৬হি.) মতে-[৬], আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় প্রধানত পাঁচ ধরনের। যেমনঃ ক. *ইলমুল আহ্কাম* বা বিধি-বিধান সংক্রান্ত জ্ঞান: এ পর্যায়ে ইবাদত-বন্দেগী, আচার-ব্যবহার, দাম্পত্য জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, হালাল-হারাম, মুবাহ ও যাবতীয় আদেশ-নিষেধ এর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান। খ. *ইলমুল মুখাসামা* বা ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান: ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান, মুশরিক ও মুনাফিক এ চারটি পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্ক সম্পর্কিত জ্ঞান। এ পর্যায়ে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের ত্রুটি ও অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। গ. *ইল্মুত তাযকীর বি-আ'লা ইল্লাহ* বা স্রষ্টাতত্ত্ব জ্ঞান: আল্লাহর পরিচয় ও অবদান সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য এবং দৈনিক জীবনে বান্দার অভিজ্ঞান সর্বোপরি স্রষ্টার গুণাবলীর পরিচয়

---

[১] . তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৪; আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা:ই ফা বা, ৩য় সং, ১৯৯৫) পৃ.১৩৬ ও ১৮৪।

[২] . তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৯, [সংক্ষেপিত]; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, খ.০৮,পৃ.৪৮৭।

[৩] . আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১২৩, এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ২:২,১৮৫; ১৪:১, ৫:১৫-১৬, ১০:৫৭।

[৪] .শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *আল-ফাউযুল কবীর ফী উসুলিত তাফসীর* (দামেস্ক: দারুল গাউছানী, ১ম মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ.১৯।

[৫] . আল-কুরআন ১৬ : ৮৯, ০৫: ৩৮।

[৬] .শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী, *আল-ফাউযুল কবীর ফী উসুলিত তাফসীর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭-১৮।

সম্পর্কিত জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে। ঘ. *ইল্‌মুত তাযকীর বি-আইয়্যামিল্লাহ* বা সৃষ্টিতত্ত্ব জ্ঞান: আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে আনুগত্যের পুরস্কার ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঙ. *ইল্‌মুত তাযকীর বিল মাউত* বা পরকাল জ্ঞান: এ পর্যায়ে মৃত্যু ও তার পরবর্তীকাল তথা আখিরাতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত-দোযখ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো এসেছে।

আল-কুরআনের পরিচয়ের মৌলিক কিছু দিক:

নামঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মূল নাম 'আল-কুরআন' হলেও এর বেশকিছু গুণবাচক নাম রয়েছে। এ নিয়ে মতভেদ আছে। আবূল মা'আলী(মৃ.৪৯৪হি.) সূত্রে আয্-যারকাশী(মৃ.৭৯৪হি.) বলেন, আল-কুরআনের ৫৫টি নাম রয়েছে।[১] কেউ কেউ বলেন, আল-কুরআনের ৯০টির বেশী নাম আছে।[২] তবে এসব নামের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ০৫টি। তা হলো, ১.আল-কুরআন, ২.আল-ফুরক্বান, ৩.আয-যিক্‌র, ৪.আল-কিতাব, ৫.আত-তানযীল। আল-কুরআন বিশেষভাবে এ পাঁচটি নামে নিজের পরিচয় দিয়েছে।

সূরাঃ বিশেষ সংখ্যক আয়াত নিয়ে গঠিত পরিচ্ছেদকে সূরা বলে। আল-কুরআনে মোট সূরা সংখ্যা **১১৪টি**। তন্মধ্যে আল-ফাতিহা প্রথম সূরা এবং আন-নাস শেষ সূরা। দ্বিতীয় সূরা আল-বাকারাহ আল-কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ২৮৬টি। ১০৮তম সূরা আল-কাউসার আল-কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা, এর আয়াত সংখ্যা ০৩ টি। আল-কুরআনের সূরাগুলো দু'ভাগে বিভক্ত, যথা–ক. মাক্কী[৩], খ. মাদানী[৪]। মাক্কী ও মাদানীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে অধিক প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী মাক্কী সূরা-৮৬টি, আর মাদানী সূরা-২৮টি।

আয়াতঃ আল-কুরআনের এক একটি বাক্যকে আয়াত বলে। আয়াত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। এই মতভেদের কারণ–রাসূল সা. কোন কোন সময় কিছু কিছু আয়াত তিলাওয়াত শেষে থামতেন, আবার কখনও মিলিয়ে পড়তেন। তাই কেউ কেউ সে সব আয়াতকে পৃথক ধরেছেন, কেউ কেউ মিলায়ে হিসাব করেছেন। ফলে সংখ্যার এই তারতম্য ঘটেছে।প্রচলিত মতানুযায়ী আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি বলা হলেও বর্তমান মুদ্রিত কুরআনের আয়াত সংখ্যা-৬২৩৬টি। সূরা সমূহের শুরুতে উল্লেখিত বিসমিল্লাহকে আয়াত হিসেবে গণনা করলে এ সংখ্যা হবে-৬৩৪৯টি। আল-কুরআনের ২য় সূরা আল-বাক্বারাহ এর ২৮২নং আয়াত সর্ববৃহৎ আয়াত। আল-কুরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হল সূরা আল-বাক্বারাহ এর-২৫৫ নং আয়াত, যা আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত। আল-কুরআনের আয়াতসমূহ দু'ধরনের যথা মুহকামাত[৫] ও মুতাশাবিহাত[৬]।

রুকুঃ কয়েকটি আয়াতের সমষ্টি অনুচ্ছেদকে রুকু বলে। আল-কুরআনের রুকু সংখ্যা ৫৫৮টি। সালাতের এক রাকাআতে সাধারণত আল-কুরআনের যতটুকু অংশ পড়া যায় ততটুকু নিয়ে গঠিত আল-কুরআনের ছোট অনুচ্ছেদকে রুকু বলা হয়। রুকু গঠনে স্বাভাবিক অবস্থায় আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সাধারণত একটি রুকুতে কয়েকটি আয়াত থাকে, তবে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। সকল রুকুর আয়াত সংখ্যা সমান নয়। সূরা আল-মুয্যাম্মিলের শেষ (২০নং) আয়াতটি একটি রুকু, যা এক আয়াত সম্বলিত।

জুয/পারাঃ আল-কুরআনের পারা বা জুয সংখ্যা ৩০টি। পুরো কুরআন তিলাওয়াতের সুবিধার্থে কুরআনকে ৩০ অংশে ভাগ করা হয়েছে। পারা ফার্সী শব্দ, যা শুধু উপমহাদেশে প্রচলিত। আরবীতে পারাকে জুয বলা হয়। পারা বা জুয বিভাজনের ক্ষেত্রে সাধারণত মোট আয়াতের উপর লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রত্যেক জুয পরস্পর প্রায় সমান।

মন্‌যিলঃ আল-কুরআন ০৭ (সাত) টি মন্‌যিলে বিভক্ত। সমগ্র আল-কুরআন সাত দিনে তিলওয়াতের সুবিধার্থে আল-কুরআনকে ০৭ (সাত) মন্‌যিলে বিন্যাস করা হয়েছে।

শব্দ ও বর্ণ: তাবি'ঈন, তাব'উ তাবি'ঈন ও অন্যান্য আলিমের মতে, আল-কুরআনে ৭৭,৩৪৭টি শব্দ এবং ৩,২৩,৬৭১টি বর্ণ রয়েছে।[৭]

---

[১] .বদরুদ্দীন আয্-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯১হি.) খ.০১, পৃ. ২৭৩; আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ. ১৬৭।

[২] . তাকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯।

[৩] .**মাক্কী :** যে সব সূরা মহানাবী সা. এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে সেগুলো মাক্কী সূরা। মাক্কী সূরাগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলী, ঈমান-আকীদ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা; শির্‌ক ও কুফরের বিরোধিতা; নাবী-রাসূল ও পূর্ববতী জাতিসমূহের বৃত্তান্ত, নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ প্রদান; পারলৌকিক বিচার, হিসাব ও জান্নাত-জাহান্নমের বর্ণনা বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে বিবেকবোধ জাগ্রত করে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, নৈতিকতাবোধ, ব্যক্তি গঠন ও আত্মিক পরিশুদ্ধির নির্দেশনা রয়েছে। এ পর্বের সূরাগুলোর ভাষা স্বচ্ছ, অতি উন্নত, ছন্দবদ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, ব্যঞ্জনাময়। এই সূরাগুলোয় শপথের আধিক্য রয়েছে। এই সূরাগুলো আকারে ছোট ও সহজে মুখস্তযোগ্য।

[৪] .**মাদানী :** যে সব সূরা মহানাবী সা. এর মদীনায় হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী সূরা। এতে বিভিন্ন ইবাদত, পারিবারিক(বিবাহ-তালাক, দাম্পত্য জীবন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতার সাথে আচার-আচরণ ইত্যাদি), সামাজিক(ইসলামের ব্যবহারিক জীবন, ইসলামী রীতি-নীতি, মুনাফিক, কাফির, আহলি কিতাব, শত্রু-মিত্রতা ও অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে আচরণবিধি, হালাল-হারাম, শরী'আতের বিধি-বিধান ও ফৌজদারী বিধান ইত্যাদি), অর্থনৈতিক (যাকাত, উশর, ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি), রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান, যুদ্ধ-শান্তি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাগুলো আকারে বড় এবং এতে শপথের প্রাবল্য কম।

[৫]. ***মুহকামাত* :** যে সকল আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট এবং যাতে মানব জীবনের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে আয়াতুল মুহকামাত।

[৬] .***মুতাশাবিহাত* :** যে সকল আয়াতের অর্থ ও মর্ম অস্পষ্ট এবং যেগুলোর প্রকৃত অর্থ কেবল মহান আল্লাহই জানেন সেগুলোকে আয়াতুল মুতাশাবিহাত।

[৭] .*ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, খ.০৮, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯০), পৃ.৪৬৭।

একনজরে আল-কুরআনের সূরা পরিচিতি :

সূরার নাম	সংকলনের ক্রমানুযায়ী সূরা নং	নাযিলের ক্রমানুযায়ী সূরা নং	আয়াত	রুকু	পারা/ জুয	মন্‌যিল	মাক্কী	মাদানী	নাযিলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সূরাসমূহ
আল-ফাতিহাহ	০১	০৫	০৭	০১	১	১ম	মাক্কী	×	০১.আল-‘আলাক্ব
আল-বাক্বারাহ	০২	৮৭	২৮৬	৪০	১-৩	”	×	মাদানী	০২.আল-মুয্‌যাম্মিল
আলে-‘ইমরান	০৩	৮৯	২০০	২০	৩-৪	”	×	মাদানী	০৩. আল-মুদ্দাছ্‌ছির
আন্‌-নিসা’	০৪	৯২	১৭৬	২৪	৪-৬	”	×	মাদানী	০৪.আল-ক্বালাম
আল-মা’য়িদাহ	০৫	১১২	১২০	১৬	৬-৭	২য়	×	মাদানী	০৫.আল-ফাতিহাহ
আল-আন্‘আম	০৬	৫৫	১৬৫	২০	৭-৮	”	মাক্কী	×	০৬ লাহাব/
আল-আ‘রাফ	০৭	৩৯	২০৬	২৪	৮-৯	”	মাক্কী	×	০৭. আত-তাক্‌ভীর
আল-আনফাল	০৮	৮৮	৭৫	১০	৯-১০	”	×	মাদানী	০৮. আল-আ‘লা
আত্‌-তাওবাহ	০৯	১১৩	১২৯	১৬	১০-১১	”	×	মাদানী	০৯. আল-লাইল
ইউনুস	১০	৫১	১০৯	১১	১১	৩য়	মাক্কী	×	১০. আল-ফাজ্‌র
হূদ	১১	৫২	১২৩	১০	১১-১২	”	মাক্কী	×	১১ .আদ-দুহা
ইউসুফ	১২	৫৩	১১১	১২	১২-১৩	”	মাক্কী	×	১২ .আল-ইনশিরাহ
আর্‌-রা‘দ	১৩	৯৬	৪৩	০৬	১৩	”	×	মাদানী	১৩. আল-‘আস্‌র
ইব্‌রাহীম	১৪	৭২	৫২	০৭	১৩	”	মাক্কী	×	১৪. আল-‘আদিয়াত
আল-হিজ্‌র	১৫	৫৪	৯৯	০৬	১৩-১৪	”	মাক্কী	×	১৫.আল-কাওছার
আন্‌-নাহ্‌ল	১৬	৭০	১২৮	১৬	১৪	”	মাক্কী	×	১৬. আত-তাকাছুর
আল-ইসরা’	১৭	৫০	১১১	১২	১৫	৪র্থ	মাক্কী	×	১৭. আল-মা‘ঊন
আল-কাহ্‌ফ	১৮	৬৯	১১০	১২	১৫-১৬	”	মাক্কী	×	১৮. আল-কাফিরূন
মার্‌ইয়াম	১৯	৪৪	৯৮	০৬	১৬	”	মাক্কী	×	১৯. আল-ফীল
ত্বা-হা	২০	৪৫	১৩৫	০৮	১৬	”	মাক্কী	×	২০.আল-ফালাক্ব
আল-আম্‌বিয়া	২১	৭৩	১১২	০৭	১৭	”	মাক্কী	×	২১. আন-নাস
আল-হাজ্জ	২২	১০৩	৭৮	১০	১৭	”	×	মাদানী	২২. আল-ইখ্‌লাস
আল-মু’মিনূন	২৩	৭৪	১১৮	০৬	১৮	”	মাক্কী	×	২৩. আন-নাজ্‌ম
আন-নূর	২৪	১০২	৬৪	০৯	১৮	”	×	মাদানী	২৪.‘আবাসা
আল-ফুর্‌ক্বান	২৫	৪২	৭৭	০৬	১৮-১৯	”	মাক্কী	×	২৫.আল-ক্বাদর
আশ-শু‘আরা’	২৬	৪৭	২২৭	১১	১৯	৫ম	মাক্কী	×	২৬. আশ-শাম্‌স
আন্‌-নাম্‌ল	২৭	৪৮	৯৩	০৭	১৯-২০	”	মাক্কী	×	২৭. আল-বুরূজ
আল-ক্বাসাস	২৮	৪৯	৮৮	০৯	২০	”	মাক্কী	×	২৮. আত-তীন
আল-‘আনকাবূত	২৯	৮৫	৬৯	০৭	২০-২১	”	মাক্কী	×	২৯. কুরাইশ
আর-রূম	৩০	৮৪	৬০	০৬	২১	”	মাক্কী	×	৩০. আল-ক্বারি‘আহ
লুক্‌মান	৩১	৫৭	৩৪	০৪	২১	”	মাক্কী	×	৩১. আল-ক্বিয়ামাহ
আস-সাজ্‌দাহ	৩২	৭৫	৩০	০৩	২১	”	মাক্কী	×	৩২. আল-হুমাযাহ
আল-আহ্‌যাব	৩৩	৯০	৭৩	০৯	২১-২২	”		মাদানী	৩৩.আল-মুরসালাত
সাবা’	৩৪	৫৮	৫৪	০৬	২২	”	মাক্কী	×	৩৪. ক্বাফ
ফাত্বির	৩৫	৪৩	৪৫	০৫	২২	”	মাক্কী	×	৩৫. আল-বালাদ
ইয়াসীন	৩৬	৪১	৮৩	০৫	২২-২৩	”	মাক্কী	×	৩৬. আত-তারিক
আস্‌-সাফ্‌ফাত	৩৭	৫৬	১৮২	০৫	২৩	৬ষ্ঠ	মাক্কী	×	৩৭.আল-ক্বামার
সাদ	৩৮	৩৮	৮৮	০৫	২৩	”	মাক্কী	×	৩৮.সাদ
আয্‌-যুমার	৩৯	৫৯	৭৫	০৮	২৩-২৪	”	মাক্কী	×	৩৯.আল-আ‘রাফ
আল-মু’মিন	৪০	৬০	৮৫	০৯	২৪	”	মাক্কী	×	৪০. আল-জিন
হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ	৪১	৬১	৫৪	০৬	২৪-২৫	”	মাক্কী	×	৪১. ইয়াসীন
আ্‌শ-শূরা	৪২	৬২	৫৩	০৫	২৫	”	মাক্কী	×	৪২. আল-ফুরক্বান
আয্‌-যুখরুফ	৪৩	৬৩	৮৯	০৭	২৫	”	মাক্কী	×	৪৩. ফাত্বির
আদ্‌-দুখান	৪৪	৬৪	৫৯	০৩	২৫	”	মাক্কী	×	৪৪. মার্‌ইয়াম
আল-জাছিয়াহ	৪৫	৬৫	৩৭	০৪	২৫	”	মাক্কী	×	৪৫. ত্বা-হা
আল-আহ্‌ক্বাফ	৪৬	৬৬	৩৫	০৪	২৬	”	মাক্কী	×	৪৬.আল-ওয়াক্বি‘আহ
মুহাম্মাদ	৪৭	৯৫	৩৮	০৪	২৬	”	×	মাদানী	৪৭. আশ-শু‘আরা’
আল-ফাত্‌হ	৪৮	১১১	২৯	০৪	২৬	”	×	মাদানী	৪৮. আন্‌-নাম্‌ল
আল-হুজুরাত	৪৯	১০৬	১৮	০২	২৬	”	×	মাদানী	৪৯. আল-ক্বাসাস
ক্বাফ	৫০	৩৪	৪৫	০৩	২৬	৭ম	মাক্কী	×	৫০. আল-ইসরা

আয-যারিয়াত	৫১	৬৭	৬০	০৩	২৬-২৭	”	মাক্কী	×	৫১. ইউনুস
আত-তূর	৫২	৭৬	৪৯	০২	২৭	”	মাক্কী	×	৫২. হূদ
আন-নাজ্ম	৫৩	২৩	৬২	০৩	২৭	”	মাক্কী	×	৫৩.ইউসুফ
আল-ক্বামার	৫৪	৩৭	৫৫	০৩	২৭	”	মাক্কী	×	৫৪.আল-হিজ্‌র
আর-রাহমান	৫৫	৯৭	৫৮	০৩	২৭	”	×	মাদানী	৫৫.আল-আন্‘আম
আল-ওয়াক্বি‘আহ	৫৬	৪৬	৯৬	০৩	২৭	”	মাক্কী	×	৫৬.আস্-সাফ্‌ফাত
আল-হাদীদ	৫৭	৯৪	২৯	০৪	২৭	”	×	মাদানী	৫৭.লুক্‌মান
আল-মুজাদালাহ	৫৮	১০৫	২২	০৩	২৮	”	×	মাদানী	৫৮. সাবা’
আল-হাশ্‌র	৫৯	১০১	২৪	০৩	২৮	”	×	মাদানী	৫৯.আয্‌-যুমার
আল-মুম্‌তাহিনাহ	৬০	৯১	১৩	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬০.আল-মু’মিন
আস-সাফ্‌ফ	৬১	১০৯	১৪	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬১.হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ
আল-জুমু‘আহ	৬২	১১০	১১	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬২. আ্‌শ-শূরা
আল-মুনাফিক্বূন	৬৩	১০৪	১১	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬৩. আয্‌-যুখরুফ
আত-তাগাবুন	৬৪	১০৮	১৮	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬৪. আদ্‌-দুখান
আত-তালাক	৬৫	৯৯	১২	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬৫. আল-জাছিয়াহ
আত-তাহ্‌রীম	৬৬	১০৭	১২	০২	২৮	”	×	মাদানী	৬৬. আল-আহ্‌ক্বাফ
আল-মুল্‌ক	৬৭	৭৭	৩০	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৬৭.আয-যারিয়াত
আল-ক্বালাম	৬৮	০৪	৫২	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৬৮. আল-গাশিয়াহ
আল-হাক্‌ক্বাহ	৬৯	৭৮	৫২	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৬৯.আল-কাহ্‌ফ
আল-মা‘আরিজ	৭০	৭৯	৪৪	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৭০.আন্‌-নাহ্‌ল
নূহ	৭১	৭১	২৮	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৭১. নূহ
আল-জিন্ন	৭২	৪০	২৮	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৭২.ইব্‌রাহীম
আল-মুয্‌যাম্‌মিল	৭৩	০২	২০	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৭৩. আল-আম্‌বিয়া
আল-মুদ্দাছ্‌ছির	৭৪	০৩	৫৬	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৭৪. আল-মু’মিনূন
আল-ক্বিয়ামাহ	৭৫	৩১	৪০	০২	২৯	”	মাক্কী	×	৭৫. আস-সাজ্‌দাহ
আদ-দাহ্‌র	৭৬	৯৮	৩১	০২	২৯	”	×	মাদানী	৭৬. আত-তূর
আল-মুরসালাত	৭৭	৩৩	৫০	০২	২৯	”	×	×	৭৭.আল-মুল্‌ক
আন-নাবা’	৭৮	৮০	৪০	০২	৩০	”	মাক্কী	×	৭৮. আল-হাক্‌ক্বাহ
আন-নাযি‘আত	৭৯	৮১	৪৬	০২	৩০	”	মাক্কী	×	৭৯. আল-মা‘আরিজ
‘আবাসা	৮০	২৪	৪২	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮০.আন-নাবা’
আত-তাক্‌ভীর	৮১	০৭	২৯	০৯	৩০	”	মাক্কী	×	৮১.আন-নাযি‘আত
আল-ইন্‌ফিতার	৮২	৮২	১৯	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮২.আল-ইন্‌ফিতার
আল-মুতাফ্‌ফিফীন	৮৩	৮৬	৩৬	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৩. আল-ইন্‌শিক্বাক
আল-ইন্‌শিক্বাক	৮৪	৮৩	২৫	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৪. আর-রূম
আল-বুরূজ	৮৫	২৭	২২	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৫. আল-‘আনকাবূত
আত-তারিক	৮৬	৩৬	১৭	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৬.আল-মুতাফ্‌ফিফীন
আল-আ‘লা	৮৭	০৮	১৯	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৭.আল-বাক্বারাহ
আল-গাশিয়াহ	৮৮	৬৮	২৬	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৮. আল-আনফাল
আল-ফাজ্‌র	৮৯	১০	৩০	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৮৯.আলে-‘ইমরান
আল-বালাদ	৯০	৩৫	২০	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯০. আল-আহ্‌যাব
আশ-শাম্‌স	৯১	২৬	১৫	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯১. আল-মুম্‌তাহিনাহ
আল-লাইল	৯২	০৯	২৯	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯২.আন্‌-নিসা’
আদ-দুহা	৯৩	১১	১১	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯৩. আয-যিল্‌যালা
আল-ইনশিরাহ্‌	৯৪	১২	০৮	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯৪. আল-হাদীদ
আত-তীন	৯৫	২৮	০৮	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯৫.মুহাম্মাদ
আল-‘আলাক্ব	৯৬	০১	১৯	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯৬.আর্‌-রা‘দ
আল-ক্বাদর	৯৭	২৫	০৫	০১	৩০	”	মাক্কী	×	৯৭. আর-রাহমান
আল-বায়্যিনাহ	৯৮	১০০	০৮	০১	৩০	”	×	মাদানী	৯৮. আদ-দাহ্‌র
আয-যিল্‌যালা	৯৯	৯৩	০৮	০১	৩০	”	×	মাদানী	৯৯. আত-তালাক
আল-‘আদিয়াত	১০০	১৪	১১	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০০. আল-বায়্যিনাহ
আল-ক্বারি‘আহ	১০১	৩০	১১	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০১. আল-হাশ্‌র
আত-তাকাছুর	১০২	১৬	০৮	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০২.আন-নূর
আল-‘আস্‌র	১০৩	১৩	০৩	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৩. আল-হাজ্জ
আল-হুমাযাহ	১০৪	৩২	০৯	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৪. আল-মুনাফিক্বূন
আল-ফীল	১০৫	১৯	০৫	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৫.আল-মুজাদালাহ

কুরাইশ	১০৬	২৯	০৪	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৬. আল-হুজুরাত
আল-মা‘উন	১০৭	১৭	০৭	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৭. আত-তাহ্‌রীম
আল-কাওছার	১০৮	১৫	০৩	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৮. আত-তাগাবুন
আল-কাফিরূন	১০৯	১৮	০৬	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১০৯. আস-সাফ্‌ফ
আন-নাস্‌র	১১০	১১৪	০৩	০১	৩০	”	×	মাদানী	১১০. আল-জুমু‘আহ
লাহাব	১১১	০৬	০৩	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১১১. আল-ফাত্‌হ
আল-ইখ্‌লাস	১১২	২২	০৪	০১	৩০	”	মাক্কী		১১২.আল-মা’য়িদাহ
আল-ফালাক্ব	১১৩	২০	০৫	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১১৩. আত্‌-তাওবাহ
আন-নাস	১১৪	২১	০৬	০১	৩০	”	মাক্কী	×	১১৪. আন-নাস্‌র
মোট=	সূরা ১১৪	সূরা ১১৪	আয়াত ৬২৩৬	রুকু ৫৫৮	পারা ৩০	মনযিল ০৭	মাক্কী ৮৬	মাদানী ২৮	*০১-৮৬ পর্যন্ত মাক্কী *৮৭-১১৪ পর্যন্ত মাদানী

আল-কুরআনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য:

আল-কুরআন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মহাগ্রন্থ। আকারে এই গ্রন্থটি মধ্যম ধরনের। তাঁকে বৃহৎ আকারে নাযিল করা হয়নি, কেননা তাতে অনেকে তা চর্চার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলত। আবার তাঁকে অতি সংক্ষেপ করা হয়নি, কারণ তাতে অনেকের জন্য তা অনুধাবন করা দুরূহ হয়ে পড়ত। শুধু আকারগত দিক থেকেই নয় বরং বিভিন্ন দিক থেকে কুরআন অন্য সব গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ থেকে আলাদা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল-

১.পৃথিবীতে অনেক ধর্মমত ও ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত রয়েছে। অনেকেই আল-কুরআনকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত একটি ধর্মগ্রন্থ মনে করে। এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়। কেননা মানব রচিত অনেক ধর্মগ্রন্থ ও ধর্ম রয়েছে। প্রচলিত বেদ, ত্রিপিটক, বাইবেল, তালমুদ, গ্রন্থসাহেব, ইত্যাদি সবই ধর্মগ্রন্থ হলেও আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কোন আসমানী গ্রন্থ নয়। এমনকি তৌরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল নামে যে সব পুস্তক আজ প্রচলিত আছে তা নাযিলকৃত আসমানী তৌরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল থেকে অপরিবর্তিত ও অবিকৃত রূপ নয়। এগুলোর অবিকৃত নির্ভরযোগ্য কোন কপি পৃথিবীতে মজুদ নেই। কিন্তু আল-কুরআন এমন এক ধর্মগ্রন্থ, যা মহান আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[১] (وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) “নিশ্চয় এটা (আল-কুরআন) সমস্ত সৃষ্টিজগতের রবেরই নিকট থেকে অবতীর্ণ।” আরও বলা হয়েছে–[২] قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ “বলুন, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদের সতর্ক করি, কিন্তু বধিররা সতর্ক বাণী শুনে না যখন তাদের সতর্ক করা হয়।”

২. আল-কুরআনের সাহিত্যিক রীতি সম্পূর্ণ অভিনব। তা গদ্যও নয় এবং পদ্যও নয়, বরং এতদ উভয়ের মধ্যবর্তী এক অভূতপূর্ব সাহিত্যরূপ। আল-কুরআনের রচনাশৈলী ও বিষয় বিন্যাস স্বতন্ত্র। এর প্রকাশরীতি, এর ব্যঞ্জনা, এর অভিব্যক্তি ও এর আবেদন অনুপম। এর ভাষা অননুকরণীয়। এর মধ্যে রয়েছে সর্বোচ্চ মানের গদ্য সাহিত্যের সাবলীলতা এবং কাব্যিক মূর্ছনা, এ দু’য়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক অপূর্ব সাহিত্য। আয়াতের সমাপ্তি ও মিলবিন্যাস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। অনুপম শব্দচয়ন, চমৎকার ভাষাশৈলী, বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা, নিখুঁত বাক্যবিন্যাস অর্থের ব্যাপকতা ও বক্তব্যে ভাব-গাম্ভীর্যতা, তাকে অপূর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করেছে। মানুষের রচনা রীতিতে বিষয়বস্তুর অবতরণা যেভাবে করা হয় এতে তা অনুপস্থিত। এ গ্রন্থ বিষয়ভিত্তিক ধ্যান-ধারণায় বিরচিত নয়। কোন বিষয় ধারাবাহিকভাবে সাধারণতঃ একস্থানে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিষয় একই আয়াতে আবার একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে। এটি কুরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আস-সুয়ূতী হাযিম–এর ‘মিনহাজুল বূলাগা’ বরাতে লিখেছেন যে[৩]-

> আল-কুরআনের অন্যতম অলৌকিকত্ব এই যে, এতে ভাষার সাবলীলতা ও অলংকার সর্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। সারা কুরআন খুজেঁ কোথাও এমন একটি আয়াতও পাওয়া যাবে না, যার ভাষা সাবলীল বা আলংকারিক নয়। কিন্তু কেন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, তার রচনা বা বক্তব্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র ভাষার সাবলীলতা বা অলংকার সমানভাবে বিদ্যমান।

৩. আল-কুরআন বক্তব্য আকারে নাযিল হওয়ার কারণে এতে একই বিষয় অনেকবার ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু একই ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হলেও প্রতিটি স্থানে তা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বিশেষ আলংকারিক রীতিতে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া একেক স্থানে একেক উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে, ফলে প্রতিটি স্থানের স্বতন্ত্র্য বর্ণনা ও উপস্থাপনা পাঠক হৃদয়ে নতুন নতুন অনুভূতি জাগ্রত করে। এ কারণে একই ঘটনা বারংবার উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও পাঠক ও শ্রোতার মনে বিরক্তির উদ্রেগ হয় না। বরং প্রতিটি বিবরণ নতুন নতুন ভাব ও দিগন্তের উন্মোচন করে।

৪. আল-কুরআন এমন একটি মহাগ্রন্থ, যাতে কিয়ামাত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানব জাতির জন্য সর্বকালের উপযোগী পুর্ণাঙ্গ বিধি-বিধান প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আল-কুরআনের পূর্বে যে সব আসমানী কিতাব নাযিল হয় তাতে মানব জাতির জন্য সর্বকালের উপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান অনুপস্থিত ছিল। কেননা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ বিশেষ জাতির জন্য

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু‘আরা : আয়াত ১৯২।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত ৪৫।
[৩]. আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৪, পৃ. ৩০৮।

এবং একটি নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য ছিল, তাই সেগুলোতে সর্বজনীন, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বকালের উপযোগী বিধি-বিধান প্রদান করা হয়নি। সে কারণে হয়ত আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ স্থায়ী সংরক্ষিত করা হয়নি যেভাবে কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। তাই আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল-কুরআন সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকবে। একে কখনই সংশোধন বা কোন সংযোজন-বিয়োজন করা হয়নি, আর ভবিষ্যতেও তার প্রয়োজন হবে না। তাই কোন ধর্মগ্রন্থের সাথে কুরআনের কোন তুলনা হতে পারে না।

৫. প্রধান চারখানা আসমানীগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ 'তাওরাত' এর শরয়ী বিধি-বিধান ছিল বেশ কঠিন ও কষ্টকর। অন্যদিকে 'ইনজীল' এর শরয়ী বিধি-বিধান ছিল বেশ সহজ। কিন্তু আল-কুরআন প্রদত্ত শরয়ী বিধি-বিধান এ দু'য়ের মধ্যপন্থী। এতে বর্ণিত জীবন বিধান মানব প্রকৃতির সাথে অত্যন্ত সংগতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ ।

৬. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের কিছু বর্ণনায় অশ্লীলতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে গীতা, রামায়ন, মহাভারত, বাইবেল উল্লেখযোগ্য। এ সব গ্রন্থে কিছু ঘটনা এমন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, যা শালীনতার পরিপন্থী। কিন্তু আল-কুরআনের বর্ণনা ধারায় সেরূপ অশ্লীলতা লক্ষ্য করা যায় না। যেমন যৌন আচরণ সম্পর্কে কুরআনের একটি বর্ণনা ভঙ্গি-[১] (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা গমন কর তোমাদের শস্যক্ষেত্রে, যেভাবে চাও।"

৭.উল্লোখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ছাড়াও কুরআন আরও নানা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন আল-কুরআনের পঞ্চাশের অধিক নাম পাওয়া যায়, যার প্রত্যেকটি নামের মধ্যে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নিম্নে সংক্ষেপে এর কিছু তুলে ধরা হলো

ক. আল-কুরআন হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্যকারী তাই তাঁর নাম দেয়া হয়েছে আল-ফুরক্বান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী)[২] ও আল-ক্বাওলুল ফাসল (মীমাংসাকারী বাণী)। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৩] (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) ''পরম কল্যাণময় সেই সত্তা তিনি তাঁর বান্দার প্রতি আল-ফুরক্বান নযিল করেছেন যাতে তিনি জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" অন্যত্র এ মর্মে বলা হয়েছে[৪] (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) "নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী।"

খ. আল-কুরআন সত্য ও সুপথের দিশারী। এজন্য তাঁর নামকরণ করা হয়েছে আল-হুদা/আল-হাদী (পথ প্রর্দশক)। কুরআনে এসেছে-[৫] –(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) "রামাদান মাস, এতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত(দিশারী) এবং হিদায়াতের (সৎপথের) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।"

গ. আল-কুরআন আন-নূর (জ্যোতি) নামে নামকরণের কারণ এর মাধ্যমে হালাল ও হারামের রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[৬] অধিকন্তু, কুরআন নিজে আলো এবং তা আলোর পথ নির্দেশ করে তাই তাঁকে আন-নূর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৭]–(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا) "হে মানবকুল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো নাযিল করেছি।"

ঘ. আল-কুরআন সর্বপ্রকার বক্রতামুক্ত সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথ দেখায় তাই তাঁকে আস-সিরাতুল মুস্তাক্বীম নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[৮]–(اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) "আমাদের প্রদর্শন করুন সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথ।"

ঙ.আল-কুরআন মানব জাতির জন্য মহাউপদেশ। তাই তাঁকে আল-মাওইজা (উপদেশ) ও তাযকিরাহ (স্মরণিকা) উপাধি দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-[৯] (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)"নিশ্চয় এটা(কুরআন) তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে।" আরও বলা হয়[১০] (إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً)"নিশ্চয়ই এটা এক উপদেশ, অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক।"

চ. আল-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাউৎস। এজন্য কুরআনকে আল-হিকমাত (জ্ঞান, প্রজ্ঞা), আল-হাকীম (প্রজ্ঞাময়) ও আত-তাবসিরা (জ্ঞান, আলো) প্রভৃতি নামে ভূষিত করা হয়েছে। বস্তুত এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন ভাণ্ডার যা মানুষের হৃদয়ের চোখ খুলে দেয় এবং মৃত অন্তরকে সজীব করে তোলে। এ মর্মে কুরআনে এসেছে[১১] (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২২৩।
২. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.১৭০।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান: আয়াত ০১।
৪. আল-কুরআন, সূরা আত-তারিক: আয়াত ১৩।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ১৮৫।
৬. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.১৭০।
৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১৭৪।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহাহ : আয়াত ০৬।
৯. আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ : আয়াত ৪৪।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল : আয়াত ১৯।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব : আয়াত ৩৪। আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৬: ০১-০২।

(وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ)"আর আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে।" আরও বলা হয়েছে-[১] (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ) "আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।"

ছ. আল-কুরআনের সব তথ্য শুধু সত্যই নয়, বরং তা মহাসত্যের একমাত্র উৎস, এজন্য তাঁকে আল-হাক্ক (সত্য) নামে ভূষিত করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে-[২] (وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)"বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়েই থাকে।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[৩] (إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ)-"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য।"

জ. আল-কুরআনের জ্ঞান প্রামাণ্য ও সঠিক তাই তাকে আল-বুরহান (প্রমাণ/ দলীল) ও আল-বাসায়ির (স্পষ্ট প্রমাণ) নামে পরিচয় করে দেয়া হয়েছে। এ মর্মে বলা হয়েছে-[৪] (قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا) "অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই উপকৃত হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

ঝ. আল-কুরআন অন্তরের ব্যাধি যেমন-বিশ্বাসগত বৈকল্য, শিরক, কুফর, নিফাক, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, মূর্খতা ইত্যাদি রোগ নিরাময়কারী তাই তাঁকে বলা হয়েছে আশ-শিফা।[৫] মহান আল্লাহ বলেন[৬]–(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) "হে মানবকুল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা (যে ব্যাধি) আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।"

ঞ. আল-কুরআন মানুষকে ভ্রান্তপথ ও জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী এবং সত্যপথ ও জান্নাতের সুসংবাদদাতা, এজন্য তাঁকে আন-নাযীর (সর্তককারী) আল-বাশীর (সুসংবাদদাতা) নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭] -قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ- بَشِيرًا وَنَذِيرًا "আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।"

ট. আল-কুরআনের শিক্ষা, জ্ঞান ও বিধি-বিধান সমগ্র মানব জাতির জন্য কল্যাণকর ও বরকতময় তাই তাঁকে আল-মুবারাক (কল্যাণময়), আল-খায়ির (কল্যাণ) ও আর-রাহমাত (অনুগ্রহ) বলা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে[৮] (وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ) "এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি তা নাযিল করেছি। তবুও কি কি তোমরা তা অস্বীকার করবে?" অন্যত্র এসেছে[৯] (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) "আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।"

ঠ. আল-কুরআন সব আসমানী কিতাবের সারসংক্ষেপ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সব ঘটনার সাক্ষী ও সংরক্ষণকারী তাই তাঁকে আল-মুহাইমিন (সংরক্ষক, অভিভাবক)।[১০] এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সমর্থক এজন্য তাঁকে আল-মুসাদ্দিক (সত্যায়নকারী) নামে ভূষিত করা হয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১১] (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) "আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষণকারীরূপে।"

ড. আল-কুরআন এক মহারজ্জু, যার এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে অন্য প্রান্ত মানুষের জন্য উন্মুক্ত। যে তা মজবুতভাবে ধরবে সে হিদায়েত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এজন্যই তাঁকে হাবলুল্লাহ(আল্লাহর রজ্জু) ও আল-উরওয়াতুল উসকা (মজবুত রশি)। এ মর্মে বলা হয়েছে[১২](وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ)"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় ভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" অন্যত্র এসেছে[১৩](فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا)"যে তাগূতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহে ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবে না।"

ঢ. আল-কুরআন সত্য, মুক্তি ও কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তাই তাঁকে আয-যিক্‌র(স্মারক) নামে নামকরণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[১৪]–(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)"আমিই স্মারক নাযিল করেছি এবং আমি তার সংরক্ষক।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ: আয়াত ৮।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৮১।
৩. আল-কুরআন, আয্-যুমার :৪১।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১০৪।
৫. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।
৬. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ৫৭।
৭. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম-আস-সাজ্‌দাহ : আয়াত ৩-৪।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্‌বিয়া : আয়াত ৫০, আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান: আয়াত ১০৪।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৮২।
১০. জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত ৪৮।
১২. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১০৩।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২৫৬।
১৪. আল-কুরআন, সূরা আল-হিজ্‌র : আয়াত ০৯।

ণ. আল-কুরআনের বাণী ও বক্তব্য সর্বোৎকৃষ্ট; এরচেয়ে উৎকৃষ্ট কোন বাণী নেই কিংবা এরূপ রচনা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্য তাঁকে আহসানুল হাদীস (সর্বোত্তম বাণী) বলা হয়েছে। আল-কুরআনে এসেছে[১]–(اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ) " আল্লাহ নাযিল করেছেন অতি উত্তম বাণী(সম্বলিত), সুসমঞ্জস্যপূর্ণ কিতাব, (তা)পুনঃ পুনঃ পঠিত।"

ত. আল-কুরআন মানব জাতির এক সুস্পষ্ট মহাপয়গাম, এর মাধ্যমে মানুষ স্বীয় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় জানতে পারে। এজন্য তাঁকে আল-বালাগ(মহান বার্তা) বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[২](هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ) "এটা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক করা হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ।"

দ. আল-কুরআন সত্যের স্পষ্ট প্রকাশক ও প্রামাণ্য দলীল এজন্য তা আল-মুবীন (সুস্পষ্ট), আল-বায়ান (স্পষ্ট বর্ণনা) ও আল-বায়্যিনাহ (স্পষ্ট প্রমাণ) নামে ভূষিত। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৩] (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) -"আলিফ-লাম-রা, এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।"আরও বলা হয়েছে[৪] (هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ) "এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং হিদায়াত ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[৫] (فَقَدْ جَاءكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ) "তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত।"

ন. আল-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাবিস্ময়কর মহাগ্রন্থ এবং আরবী ভাষার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। তাই কুরআনকে আল-আ'জব (বিস্ময়, বিস্ময়কর) নামে বিভূষিত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-[৬] (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) তারা বলল, 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।'

সর্বপরি, আল-কুরআন একটি মহিমান্বিত, অনবদ্য, উন্নত, পবিত্র ও অতি মর্যাদাপূর্ণ আসমানী মহাগ্রন্থ, এসব কারণে একে আল-মাজীদ (মহিমান্বিত), আল-কারীম (সম্মানিত), আল-আযীম (মহান), আল-আযীয (মহিমাময়), আল-আ'লী(মহান, সুউচ্চ), আস্–সুহফা (পুস্তিকা), আল-মুকার্‌রামাহ (মর্যাদাসম্পন্ন, অনবদ্য), আল-মারফূ'আ (উন্নত), আল্-মুতাহ্‌হারাহ (পবিত্র) ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–(ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) "কাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের।"[৭](إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ)"নিশ্চয়ই এটাা সম্মানিত কুরআন।"[৮] (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) "আর আমি তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন।"[৯] (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ)"আর এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ।"[১০] (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَالَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) "নিশ্চয় তা আছে আমার কাছে উম্মুলকিতাবে,তা অতি মর্যাদাশালী, জ্ঞানগর্ভ।"[১১] (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ)-"নিশ্চয়ই এতে রয়েছে মহান বার্তা সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা ইবাদত করে।"[১২] (صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ)"- তা আছে সম্মানিত লিপিসমূহে, যা মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র।"[১৩]

নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন সম্পর্কে অমুসলিদের আপত্তির জবাবঃ

নাস্তিক, পৌত্তলিক, ছাড়াও ইহুদী ও খ্রীষ্টানসহ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ অধিবাসী যাদেরকে আসমানী গ্রন্থের উত্তরসূরী বলে গণ্য করা হয় তারা আল-কুরআনকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে চান না। তাদের ধারণা– মুহাম্মাদ সা. বাইবেলের অনুকরণে অথবা ইহুদী, খৃষ্টান, জোরস্ত্রীয়, মিশরীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আল-কুরআন রচনা করেছেন। এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) বলেন–[১৪]

> পাশ্চাত্যে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও নিরশ্বরবাদীগণ কোন রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই একযোগে বলে থাকেন যে, মুহাম্মাদ বাইবেলের অনুকরণে নিজেই কুরআন লিখেছিলেন অথবা কাউকে দিয়ে লিখে নিয়েছিলেন। তারা আরও বলে থাকেন যে, কুরআনে ধর্মীয় ইতিহাসের যে সকল কাহিনী আছে তা বাইবেলের কাহিনীগুলোর পুনরাবৃত্তি মাত্র।

জবাবঃ আল-কুরআন সম্পর্কিত উল্লেখিত অভিযোগ কোন নতুন বিষয় নয়, কুরআন নাযিলের সময়কার কাফিররাও এরূপ কথা বলেছিল। কুরআন উল্লেখিত সব ধরনের কাফিরদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছে–[১৫] (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)-"তারা কি বলে, 'সে তা রচনা করেছে?' বলুন, তবে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং ডাক আল্লাহ ছাড়া যাকে পার, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।"

---

[১] . আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার : আয়াত ২৩।
[২] . আল-কুরআন, সূরা হিজ্র : আয়াত ৫২।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : আয়াত ০১।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৩৮।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১৫৭।
[৬] . আল-কুরআন, সূরা আল-জিন্ন : আয়াত ০১।
[৭] . আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ : আয়াত ০১।
[৮] . আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াক্বি'আ : আয়াত ৭৭।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-হিজ্র: আয়াত ৮৭।
[১০] . আল-কুরআন, সূরা হা-মীম-আস-সাজ্দাহ : আয়াত ৪১।
[১১] . আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ : আয়াত ০৪।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত ১০৬।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা 'আবাসা : আয়াত ১৩-১৪।
[১৪]. ডা. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, ওসমান গনি অনূদিত (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ১ম সং, ১৯৯৪) পৃ. ১৭০।
[১৫] . আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ৩৭-৩৮।

যারা মন্তব্য করেন যে, আল-কুরআনে বাইবেলের কাহিনীগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তারা যাছাই করে দেখেন না যে, বাইবেল ও আল-কুরআনে একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে; সুতরাং তা নকল করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। মরিস বুকাইলি (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) বলেন-[১]

> চৌদ্দশত বছর আগে আবির্ভূত হয়ে কি করে একজন মানুষের পক্ষে বাইবেলের বাণীর ভুল–ত্রুটি এমন যথাযথভাবে সংশোধন করা সম্ভব? কিভাবে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ নিজের জ্ঞান–বুদ্ধি মোতাবেক বাইবেল থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ বাণীসমূহ বাদ দিয়ে এমন সব বাণী ও বক্তব্য রচনা করে কোরআনে সন্নিবেশিত করা সম্ভব–যা এতদিন –এতকাল পরে কেবলমাত্র আজকের বিজ্ঞানের পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হতে পারছে? সুতরাং কোরআন মোহাম্মদের(দঃ)নিজস্ব রচনা কিংবা তিনি বাইবেলের বাণী থেকে নকল করে কোরআনের বাণী তৈরী করেছিলেন বলে যে ধারণা পোষণ করা হয়–সে ধারণা আদৌ সত্য সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কিত কোরআনের বাণী ও বর্ণনা বাইবেলের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

আর যারা অভিযোগ করেন যে, মুহাম্মাদ সা. ইহুদী, খৃষ্টান, জোরস্ত্রীয়, মিশরীয়, আর্মেনীয়, গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আল-কুরআন রচনা করেছেন বলে তারা এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি–কিভাবে মুহাম্মাদ সা. বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এরপর অভিযোগকারীরা যে প্রশ্নের সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তা হল– মুহাম্মাদ সা. ছিলেন একজন উম্মী (নিরক্ষর) নাবী, যিনি নিজে পড়তে ও লিখতে জানতেন না। তাঁর পক্ষে এত বিচিত্র জটিল উৎস থেকে চয়ন করে কুরআনের মতো মানব জীবনের সামগ্রিক বিধান ও জীবন-জগতের সকল সমস্যার মৌলিক ও প্রকৃত জবাব সম্বলিত বিশ্বের সেরা বিস্ময় একটি অনবদ্য, অতুলনীয়, নির্ভুল মহাগ্রন্থ রচনা কি করে সম্ভব হল? কিভাবেই বা এসব উৎসের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটল?

এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মুহাম্মাদ সা. একজন নিরক্ষর লোক ছিলেন, যিনি লেখাপড়া জানতেন না। মহান আল্লাহ বলেন[২] (وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ)"আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর করনি এবং নিজের হাতে কোন কিতাব লেখনি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে।"

কাব্যচর্চা তৎকালীন আরবদের মজ্জাগত ব্যাপার হলেও এর প্রতি তাঁর কোন প্রকার ঝোঁক ছিল না। তিনি কোনদিন কবিতা লিখেননি। আর কোন কবি বা জ্ঞানী সংস্পর্শে গিয়ে জ্ঞানার্জনের কোন ধরনের সুযোগও পাননি। শুধু ব্যবসায়িক কাজে তিনি দু'বার সিরিয়ায় কয়েক দিনের জন্য গিয়েছিলেন। এ অল্প সময়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। মক্কায় জীবনের চল্লিশ বছরে মধ্যে, শৈশবে অনাথ অবস্থায়, কৈশরে চাচার গৃহে মেষ চড়িয়ে, যৌবনে খাদীজার(রা) কর্মচারী হিসেবে যিনি অতিবাহিত করলেন, জীবনে যার পক্ষে কোনদিন জ্ঞানার্জনের সুযোগ হলো না। তাঁর পক্ষে জীবনের চল্লিশতম বৎসরে হটাৎ একদিন এমন নির্ভুল ও অপূর্ব অলংকার সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট বাণী উচ্চারণ হল যা আল-কুরআন নামে পরিচিত, যা আরব কবি-সাহিত্যিকদের বিস্মায়াভিভূত করে ফেলল। যার সমকক্ষ সাহিত্য পূর্বে তো ছিলই না পরেও এর সমতুল্য রচনা কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি, যা আরবী সাহিত্য জগতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যরূপ হিসেবে পরিগণিত হল। এটা অকল্পনীয় ও অভাবনীয় ব্যাপার। এ থেকে কি এটা বুঝা যায় না যে, আল-কুরআন মুহাম্মাদ সা. রচিত নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত। এ মর্মে কুরআন ইরশাদ হয়েছে-[৩] (قُل لَّوْشَاءَ اللَّهُ مَاتَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَأَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) "বলুন, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, আমি তোমাদের নিকট তা পাঠ করতাম না।' আর তিনি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। কেননা, আমি তো এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। তবে কি তোমরা বুঝ না?"

অমুসলিমদের যারা কুরআনকে নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজী নন, কিংবা যারা মনে করেন যে, তা মুহাম্মাদ সা. এর রচনা; তারা কতটা বিভ্রান্ত এবং তাদের পরিণতি কী?–সে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৪]– قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ "বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি তা (কুরআন) আল্লাহর কাছ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত তার চেয়ে অধিক ভ্রষ্ট আর কে?" আরও বলা হয়েছে-[৫] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ) "নিশ্চয় যারা উপদেশ (কুরআন) আসার পরও তা অস্বীকার করে(তারা অবশ্যই এর পরিণাম ভোগ করবে, তাদের বোঝা উচিত) নিশ্চয় এটি এক সম্মানিত গ্রন্থ।"

নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসেবে আল-কুরআন–এর কিছু অকাট্য প্রমাণ:

আল-কুরআন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী মহাগ্রন্থ। এর মধ্য দিয়ে নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এর ভাব, ভাষা ও বিন্যাস সবই আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত। পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মত কুরআন মানব রচিত কিংবা বিকৃত ঐশী কোন গ্রন্থ নয়। মহান আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে

---

[১] . ডা. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, আখতার-উল-আলম অনূদিত (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৭ম সং, ১৯৯৬), পৃ. ২০৩।
[২] . আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত : আয়াত ৪৮।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ১৬।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা হা-মীম-আস-সাজ্‌দাহ : আয়াত ৫২।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা হা-মীম-আস-সাজ্‌দাহ : আয়াত ৪১।

এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ মর্মে বলা হয়েছে[১] (تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى) "এ (কুরআন) তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[২] (تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) "এ কিতাব সমস্ত সৃষ্টিজগতের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।" অন্যত্র আরও বলা হয়েছে-[৩] (وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ) "আর শয়তানরা তা নিয়ে অবতরণ করেনি। তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না।"

আল-কুরআন নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী কিতাব হওয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল:

আল-কুরআনের সমমানের সাহিত্য রচনায় মানব জাতির অক্ষমতা: কুরআন নাযিলকালীন সময়ের মক্কার কাফিররা এই মিথ্যা অপবাদ আরোপ দেয় যে, মুহাম্মাদ সা. নিজেই কুরআন রচনা করেছেন। বিভিন্ন যুগে কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি সেই অপবাদ পুনঃরাবৃত্তি করে। মহান আল্লাহ এ সব কাফিরদের উদ্দেশ্যে কুরআনের সমমানের কিছু রচনার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। ইরশাদ হচ্ছে-[৪] (أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ- فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ) "তারা কি বলে, 'তিনি এটা বানিয়ে বলছে?' বরং তারা ঈমান আনে না। তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ বাণী নিয়ে আসুক।"

কুরআনের সমতুল্য অনেকগুলো সূরা রচনা যখন মক্কার কাফিরদের পক্ষে সম্ভব হল না তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে কুরআনের সূরার মত দশটি সূরা রচনার আহবান জানান। এই মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৫] - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ "নাকি তারা বলে,'তিনি তা নিজে রচনা করেছে'? বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরা(তৈরী) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ দশটি সূরা রচনায় যখন তারা ব্যর্থ হল তখন বলা হল[৬]–(وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) "আর যদি তোমরা কোন সন্দেহ পোষণ করে থাক তাতে, যা আমি নাযিল করেছি আমার বান্দা প্রতি, তাহলে তোমরা তার মত একটি সূরা (রচনা করে) আন এবং ডাক আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সাক্ষ্যদেরকে (সাহায্যকারীদের); যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

আরবের খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, অলংকার বিশরদ ও পণ্ডিতরা যখন কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও রচনা করতে সক্ষম হল না তখন মহান আল্লাহ বললেন[৭]–(قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرً) "বলুন, যদি মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয় এ কুরআনের অনুরূপ (রচনা করে) আনার জন্য, তবুও তারা এর অনুরূপ (রচনা করে) আনতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।"

উল্লেখিত চ্যালেঞ্জ শুধু কুরআন অবতরণের যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা কিয়ামত পর্যন্ত আগত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব জ্ঞানী-গুণীর জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ এই চ্যালেঞ্জে শামিল হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতেও কেউ এর সমমান সম্পন্ন সাহিত্য রচনায় সমর্থ্য হবে না। কুরআন নাযিলকালীন সময়ে আরবে শ্রেষ্ঠ বেশ ক'জন কবি বিদ্যমান ছিল। কুরআন অনেকবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়ার পরও সমকালীন আরব কবিদের কেউই এর মোকাবেলার সাহস করেনি, বরং তারা সম্মুখে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে পড়ে। তৎকালীন আরবের কবি সম্রাট লবীদ এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে বলেছিলেন-এটা মানব রচিত কোন কথা হতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জের চৌদ্দ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে সফল হতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে আরব বংশজাত বহু ইহুদী ও খৃষ্টান পরিবার আছে যাদের মধ্যে আরবী ভাষার বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে, কিন্তু তাদের এর সমকক্ষ একটি সূরা রচনা সম্ভব হয়নি। এটা যেমন প্রমাণ করেছে কুরআন মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ, তেমনি এর মাধ্যমে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আল-কুরআনে দূর্লভ প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের নির্ভুল নানা তথ্য পরিবেশন: আল-কুরআনে এমন অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের, ষষ্ঠ শতাব্দীর লোকেরা যে সম্পর্কে খোঁজও রাখত না, ইহুদীদের ধর্মে এ সম্পর্কে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও তা ছিল ত্রুটিপূর্ণ, বিকৃত ও অতিরঞ্জিত। আবার কুরআনে এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়, যার উল্লেখ না ছিল ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থে, আর না ছিল তার চর্চা আরবদের মধ্যে, প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের এসব ঘটনা কুরআনে এমন নিখুঁত ও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যার সত্যতাকে আজ পর্যন্ত কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। বরং আধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদদের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের নব নব আবিষ্কার এর সত্যতাকে আরও সন্দেহাতীত করে তুলেছে। এ প্রসংগে আদম-হাওয়া ('আ.), নুহ ('আ.), ইবরাহীম('আ.), ইসমাইল ('আ.), ইয়াকুব ('আ.), ইউসুফ ('আ.) এর বৃত্তান্ত; নমরুদ, ফিরাউন প্রসঙ্গ; আদ, সামুদ, তুব্বা ও সাবা ইত্যাদি জাতিসমূহের বৃত্তান্ত, আসহাবুল কাহফ, লুকমান আ., যুল-কারনায়ন, হুদ('আ.), সালিহ ('আ.), দাউদ ('আ.), সুলয়মান ('আ.), মুসা ('আ.),

---

১. আল-কুরআন, সূরা ত্বা- হা : আয়াত ০৪।
২. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদাহ : আয়াত ০২।
৩. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা: আয়াত ২১০-২১১।
৪. আল-কুরআন, সূরা আত-তুর : আয়াত ৩৩-৩৪।
৫. আল-কুরআন, সূরা হূদ : আয়াত ১৩।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২৩।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৮৮।

যাকারিয়া (‘আ.), ইয়াহিয়া (‘আ.), মারিয়াম (‘আ.) ও ‘ইসা (‘আ.) প্রমূখের ঘটনাবলী উল্লেখযোগ্য। মুহাম্মাদ সা. একজন নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন, যিনি না ছিলেন পর্যটক, না ছিলেন ইতিহাসবেত্তা, না গিয়েছিলেন কোন জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্যে। কাজেই তাঁর পক্ষে এতসব ঘটনা এত নিখুঁত ও বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১] (تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا) “এ সব অদৃশ্যলোকের সংবাদ, আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে তা অবহিত করছি, যা এর পূর্বে না আপনি জানতেন এবং না তোমার সম্প্রদায়ও জানত।”

আল-কুরআনে বহুবিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ঘটলেও সেগুলোর মধ্যে কোন ত্রুটি ও বৈপরীত্য নেইঃ আল-কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নির্ভুল ও প্রামাণ্য মহাউৎস। ধর্মীয় বিষয়াবলী ছাড়াও এতে ইতিহাস, সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি আইন, সাহিত্য, ব্যকরণ, অলংকার, প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ের জ্ঞানভাণ্ডার বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না যাতে এত বহুবিদ মৌলিক জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে। কুরআনে বহুবিদ জ্ঞানের সমাবেশ ঘটলেও সব জ্ঞানই নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কুরআনের বিবিধ জ্ঞানের মধ্যে কেউ কোন ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা খুঁজে পাননি। একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্বজ্ঞানে বিশরদ হওয়া এবং জ্ঞানের সব শাখাই নির্ভুল তথ্য প্রদান করা সম্ভব নয়। আর একজন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানের এতসব শাখায় নির্ভুল উচ্চারণ কিভাবে সম্ভব?এরপরও কী বলা যায় কুরআন মুহাম্মাদ সা. এর রচনা? তাই মহান আল্লাহ বলেছেন[২]-(أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا)“তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক অসংগতি পেত।” এ প্রসংগে মরিস বুকাইলি বলেন[৩]

> আর কিভাবেইবা মোহাম্মাদের মত একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতোসব সত্য উচ্চরণ করে যাওয়া সম্ভব হল? বিশেষত সে যুগে বসে–যে যুগে কোন মানুষের পক্ষেই বিজ্ঞানে অত বেশী উৎকর্ষ অর্জন ছিল একেবারেই অসম্ভব। শুধু কি তাই, বিজ্ঞান বিষয়ক অতসব বক্তব্য উচ্চরণে তাঁর মত নিরক্ষর মানুষের একটিবারের জন্যও সামান্যতম কোন ভুলও ঘটল না? এটা সত্যি আশ্চার্যজনক নয় কি?

পি. কে. হিট্টি বলেন-[৪]ঃ Himself an unschooled man, Muhammad was nevertheless responsible for a book still considered by one-eighth of mankind as the embodiment off all science, wisdom and thenology.

আল-কুরআনে বিশ্বজগৎ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অত্যাধুনিক নির্ভুল তথ্যাদি উপস্থাপনঃ মহাকাশ, ভূমণ্ডল, উদ্ভিদ, প্রাণী, জীবন ও জড়জগৎ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আল-কুরআনের অনেক জায়গায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। যে তথ্যগুলো কুরআন নাযিলের হাজার বছর পরে বৈজ্ঞানিকগণ নির্ভুল সত্য হিসেবে আবিষ্কার করেছেন। অজ্ঞতার যুগের বর্বর সমাজের একজন নিরক্ষর লোক যিনি কারও নিকট কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেননি তাঁর পক্ষে এরূপ অত্যাধুনিক নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান কিরূপে সম্ভব হল? মরিস বুকাইলি (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) বলেন[৫]–

> কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশ্বসৃষ্টি, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূমণ্ডল গঠনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, পশু প্রজাতি, উদ্ভিদজগৎ, এবং মানব-প্রজনন প্রভৃতি বিষয়ে এত বেশী আলোচনা রয়েছে যে, অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, এসব বিষয়ে আলোচনায় বাইবেলের ভুলের পরিমাণ পর্বত প্রমাণ, সেখানে কোরআনে একটি মাত্র ভুলও আমি খুঁজে পাই নাই। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পদে পদে আমাকে থেমে যেতে হয়েছে, প্রতিটি পর্যায়ে নিজেকেই আমি জিজ্ঞাসা না করে পারি নাই যে, সত্যি সত্যিই কোন মানুষ যদি এই কোরআন রচনা করে থাকেন, তাহলে সপ্তম শতাব্দীতে বসে কিভাবে তিনি জ্ঞান–বিজ্ঞানের এতসব বক্তব্য এত সঠিকভাবে রচনা করতে পারলেন? আর সে সব বক্তব্য কিভাবে আজকের যুগের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য–জ্ঞানের সাথে এতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারল।

অথচ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে এত বহুবিদ বিজ্ঞানের সমাহার ঘটেনি, বরং সে সব গ্রন্থে স্বল্প পরিমানে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটলেও তা আধুনিক বিজ্ঞানের স্বীকৃত সত্যের বিপরীত অনেক ভুল তথ্য পাওয়া যায়। মরিস বুকাইলির(মৃ.১৯৯৮খৃ.) ভাষায়

> বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের বহু বিষয় কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে এবং কোরআনের বাণীসমূহ বাইবেলের বাণীর তুলনায় পুরোপুরি নির্ভুল। বাইবেলে বিজ্ঞান সংক্রান্ত বক্তব্য কম–মাত্র কিছু সংখ্যক; কিন্তু সেগুলি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী; পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান–সংক্রান্ত বক্তব্য কোরআনে প্রচুর তার সবগুলিই সত্যভিত্তিক। বস্তুত, কোরআনে বিজ্ঞান–সংক্রান্ত একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না –যেটি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী।[৬]

আল-কুরআন প্রদত্ত ভবিষ্যবাণীসমূহের বাস্তবায়নঃ বর্তমানকালে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু কুরআনে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা সংঘটিত হওয়ার অনেক পূর্বে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)কে জানিয়ে দিয়েছেন। কুরআনে এরূপ যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা ঠিক যেভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই যথাসময়ে সংঘটিত হয়েছে বিরুদ্ধবাদীরাও এর যথার্থতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এ প্রসংগে পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয়ের

---

১. আল-কুরআন, সূরা হূদ : আয়াত ৪৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ৮২।
৩. ডা. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, আখতার-উল-আলম অনূদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩।
4. P.Q. Hitti, *Op.cit.*, p.122.
৫. ডা. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, আখতার-উল-আলম অনূদিত, পৃ. ১৬৪-১৬৫।
৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৮।

সংবাদ, বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের সংবাদ, ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ ও রাসূল সা. কে হিফাযতের ওয়াদা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে শুধু পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয়ের সুসংবাদ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। রোমক ও পারস্যের পারস্পরিক যুদ্ধে পারসিকরা ছিল অধিকতর শক্তিশালী; রোমকরা বার বার পরাজিত হচ্ছিল। পারসিকদের উপর রোমকদের বিজয়ের কোনই সম্ভবনা ছিল না। ঠিক সে সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়[১] (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ) "নিকটবর্তী অঞ্চলে, তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই।"-এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুসারে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় লাভ করে।

আল-কুরআনের নির্ভুলতা সর্ম্পকিত চ্যালেঞ্জঃ পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না যা ভুল-ত্রুটি ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্দ্ধে। বরং প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার তার রচনায় ভুল-ত্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে সহযোগিতা চান। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু আল-কুরআন, যার শুরুতেই এর নির্ভুলতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে বলা হয়েছে যে, এর যাবতীয় তথ্য-তত্ত্ব, বিধান ও ভাষা সর্বপ্রকার ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা, সন্দেহ-সংশয়, পরিবর্তন-পরিবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন মানুষের পক্ষে এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করা সম্ভব নয়। এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহর বাণী বলেই এরূপ চ্যালেঞ্জ সম্ভবপর হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[২]-(ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ) "এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।"

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ভাষা-সাহিত্যগত মানের ব্যবধান ও বৈসাদৃশ্যঃ কুরআন ও হাদীসের ভাষা-সাহিত্যগত মান তুলনামূলক বিচার করলে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। কুরআনের সাহিত্যরীতি রাসূল সা. এর বর্ণনাভংগী অথবা সাধারণ মানুষের রচনাশৈলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্যের বিচারে কুরআন ও হাদীসের ভাষা-সাহিত্যিক মানের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য দেখা যায় না। যদি মুহাম্মাদ সা. কুরআন রচনা করতেন তাহলে কুরআন ও হাদীসের ভাষা-সাহিত্যগত মান কাছাকাছি হত। কুরআন কোনভাবেই মুহাম্মাদ সা. এর রচনা নয়, বরং তা মহান আল্লাহর বাণী। এ মর্মে বলা হয়েছে[৩]

> (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ-وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ-وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ-تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ-وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ-لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ-ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ-فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين)
>
> "নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) এক সম্মানিত দূতের(জিবরাঈলের বাহিত) বাণী। আর তা কোন কবির কথা নয়। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। আর নয় তা কোন গণকের কথাও। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।এটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। যদি তিনি আমার নামে কোন কথা বানিয়ে বলতেন, তবে আমি তার ডান হাত ধরে লেতাম। তারপর অবশ্যই আমি কেটে ফেলতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা। আর তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা করার থাকত না।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৪]
>
> (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ)
>
> আর এ কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া তা অন্য কারো দ্বারা রচিত হতে পাবে; বরং এটি তার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তার সত্যায়ন এবং বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সমস্ত সৃষ্টিজগতের রবের পক্ষ থেকে তা আগত।"

আল-কুরআন মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ, এটি মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এ সত্য কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই বুঝা যায়। এ সম্পর্কে ড. আবদুল্লাহ দারায বলেন[৫]–

> কোরআন হাকীমই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য দেয় যে, তা আল্লাহ তা'য়ালার রচিত। রাসূলে কারীম কখনো কোরআনের মাধ্যমে নিজের কথা বলেন নি। মহাগ্রন্থে হয় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে নাম পুরুষে, অথবা তাঁকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে নাবী, হে রাসূল, আমি তোমার কাছে নাযিল করেছি,...এ কাজ কর , এ কথা বল, কোরআনে হাকীমের ভাষা হচ্ছে অনুরূপ।

আল-কুরআন কর্তৃক সর্বকালের মানব সমাজের উপযোগী চিরন্তন আইন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান প্রদানঃ মানব রচিত আইন দেশ, কাল ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে চলতে পারে না। স্থান ও কাল ব্যবধানে তার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। স্থান ও কাল নির্বিশেষে তার দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত নয়। তাই দেখা যায়, প্রতিটি দেশের পার্লামেন্টে আইন-কানুনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ধারা লেগেই আছে। কিন্তু মুসলিম জাতি পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল জয়ের পর শত শত বর্ষব্যাপী কুরআনের আইন অনুসরণ করেছে। কোন সময়েই তাতে কোন আইনের রদবদলের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ডক্টর আসওয়েল জনসন বলেন[৬]–'কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানগুলো এতই কার্যকরী এবং সর্বকালের জন্য উপযোগী যে, সর্বকালের সকল দাবী পূরণ করতে তা সক্ষম।'

আল-কুরআন প্রদত্ত সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা উপহারঃ মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়ের পথনির্দেশনা সম্বলিত আল-কুরআন মানব জাতির জন্য শুধু একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। আল-কুরআন শুধু জীবনের রূপরেখাই প্রদান করেনি বরং সে জীবন বিধানের আলোকে একটি সর্বোৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিয়ে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্ববাসীর জন্য এরূপ কল্যাণকর রাষ্ট্র নজিরবিহীন। কুরআনের মূলনীতির আলোকে মুহাম্মাদ সা. মদীনায় সেই ঐতিহাসিক কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। খুলাফা রাশিদূনের মাধ্যমে তার বিকাশ সাধন হয়।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম : আয়াত ৩-৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ০২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাক্কা : আয়াত ৪১-৪৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস: আয়াত ৩৭।
[৫].কেনেথ ডাব্লিউ মর্গান, *ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা*, অনু. মুয়াযযম হুসাইন খান ও অন্যান্য (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স,১৯৬৩), পৃ.২৭।
[৬]. *কোরআন পরিচিতি*, সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২) পৃ. ০৪-০৫।

আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের আরও বিশেষ কিছু দিকঃ

আল-কুরআন অতি মর্যাদাপূর্ণ ও অসাধারণ বৈশিষ্টমণ্ডিত আসমানী মহাগ্রন্থ। আল-কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে কুরআনের স্থান সবার শীর্ষে। মহান আল্লাহ কুরআনকে কল্যাণময় সম্মানিত ও উজ্জ্বল গ্রন্থ[১] জ্ঞানগর্ভ ও গৌরবময় কুরআন[২] ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনের এই শ্রেষ্ঠত্ব যেমন অসংখ্য তেমনি তা বর্ণনাতীত। এ মর্মে কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে[৩] (لَوْ أَنزَلْنَاهَذَاالْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) "এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে,আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে।" নিম্নে আল-কুরআনের কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হল–

০১. মহান আল্লাহ বিভিন্ন যুগে নাবী-রাসূলের প্রতি শতাধিক সহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করেন। আসমানী কিতাব নাযিলের ধারাবাহিকতায় আল-কুরআনই সর্বশেষ হওয়ায় এতে পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সারসংক্ষেপসহ মানব জাতির বর্তমান ও কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সবসমস্যার মূলনীতি, চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান প্রদান হয়েছে। তাই কুরআন সর্বাধুনিক মহাজ্ঞানভাণ্ডার সম্বলিত এক চিরন্তন ও কালজয়ী জীবনদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ "আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষণকারী রূপে। কাজেই আপনি তাদের মধ্যে নির্দেশ প্রদান করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" এ সম্পর্কে ইবনু কাছীর(রহ.) বলেন–

> আল-কুরআনুল কারীমই সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত এক পরিপূর্ণ কিতাব। ইহার পূর্ববর্তী কিতাগুলোর যত বৈশিষ্ট্য ছিল, একক কুরআনের মধ্যে উহার সমস্তই বিদ্যমান রয়েছে। উপরন্তু এতে এমন কতগুলো বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ছিল না। তাই এই কুরআন একাধারে সাক্ষী, সংরক্ষক ও সমন্বয়কারী বলে খ্যাত।[৫]

০২. আল-কুরআন সর্বকালের সেরা সাহিত্য। এর সাহিত্যিক মান অতি উচ্চাঙ্গের। আল-কুরআন–এর অনুপম বর্ণনারীতি, বাচনভঙ্গি ও অনন্য রচনাশৈলী আরব ভাষাবিদ বর্ণনারীতি হতে সম্পূর্ণ অভিনব। এর ভাষা ছন্দযুক্ত ও আলংকারিক কিন্তু কাব্যিক নয়। কুরআন–এর পূর্বে অন্য কোন রচনায় যেমন এর নজির পাওয়া যায় না, তেমনি কুরআনের পরবর্তী কোন গ্রন্থেও এর নমুনা পরিলক্ষিত হয় না। আরব ভাষাবিদরা কুরআন–এর এই অভিনব ও অপূর্ব বাচনভঙ্গি প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়ে। আল-কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে চৌদ্দশত বছর পর আজও তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকবে। ভাষার অলংকার ও সাবলীলতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত উন্নতিই হোন না কেন কুরআন–এর বাণীর কোন ধরনের দুর্বলতা অনুভূত হবে না। কুরআন–এর এই উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক মান আজও সর্বজন স্বীকৃত। ভাষা-সাহিত্য ও মতাদর্শগত দিক থেকে আল-কুরআন অদ্বিতীয়, যার সমতুল্য সাহিত্য রচনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এর সমকক্ষ রচনা করার চেষ্টা করে অনেকে ব্যর্থ হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ বলেন-[৬] قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرً "বলুন, যদি মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয় এ কুরআনের অনুরূপ (রচনা করে) আনার জন্য, তবুও তারা এর অনুরূপ (রচনা করে) আনতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।"

০৩. আল-কুরআন শুধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম নয়, বরং তা মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান। সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি একত্রিত হয়ে যেমনিভাবে কুরআনের মত উন্নত সাহিত্যকর্ম রচনা করা যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি কুরআনে প্রদত্ত সর্বজনীন, চিরন্তন, ইনসাফভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ, সর্বকালের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের অনুরূপ জীবন বিধান রচনাও কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। মহান আল্লাহ বলেন-[৭] اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ "আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তমবাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসমঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।" অন্যত্র বলেন[৮] (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তার বাক্য পরিবর্তন করার কেহ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

এ প্রসঙ্গে মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ সায়্যিদ রাশীদ রিদা (মৃ. ১৯৩৫ খৃ.) বলেন–

> আল-কুরআন সর্বকালের মানব জাতির জন্য একটি সুসামঞ্জস্য, সার্বজনীন, স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রদান করে বিশ্বের ইতিহাসে একটি মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছে। 'মানুষের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আখলাক-চরিত্র, ব্যক্তি জীবন,

---

[১] . আল-কুরআন, ৬:১৫৫, ৪১:৪১,৫:১৫।
[২] . আল-কুরআন, ৩৬:২, ৫০:১।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ২১।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত ৪৮।
[৫] .ইবনু কাছীর (রহ), *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, তাহকীক, সামী ইবন মুহাম্মদ সালামাহ,(সৌদী আরব : দারুত তাইয়েবাহ, ১৪২০হি.), খ.০৩, পৃ. ১২৮।
[৬] . আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৮৮।
[৭] .আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার : আয়াত ২৩।
[৮] .আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১১৫।

পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবনসহ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বযুগের জন্য তার বিধান বিস্তৃত ও প্রযোজ্য। মানব রচিত কোন বিধানই এর মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।[১]

০৪.আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাতে বাধ্যতামূলক ভাবে এবং সালাতের বাইরেও কুরআন তিলাওয়াত করে থাকে। বিভিন্ন দেশে সূর্যের উদয়-অস্তের পার্থক্য থাকায় দেশে দেশে সালাতের সময় আবর্তিত হয়। ফলে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সালাতে কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে এক মুহুর্তের জন্য কুরআন তিলওয়াত বন্ধ থাকছে না। অধিকন্তু, প্রতি বছর রামাদান মাসে তারাবীহ সালাতে লক্ষ লক্ষ বার পুরা কুরআন তিলাওয়াত হচ্ছে। সালাতের বাইরেও ব্যক্তি পর্যায়ে ও বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করছে, কিয়ামত পর্যন্ত এই তিলাওয়াত অব্যহত থাকবে। পৃথিবীতে অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না, যা এত ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়ত সর্বত্র পঠিত হয়। পি. কে. হিট্রি (১৮৮৬-১৯৭৮খৃ.) বলেন-[২] Though the youngest of the epoch-making books, the koran is the most widely read book ever written, for besides its use in worship, it is the text-book from which practically every moslem learn to read Arabic.

০৫. আল-কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ যা সুসংরক্ষিত। এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা অভাবনীয়। অবতীর্ণের শুরু থেকে কুরআন লিখন ও মুখস্তের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা হয়। রাসূল সা. যুগ থেকে শুরু করে যুগে যুগে অসংখ্য হাফিয মুখস্থ করণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পরও মুদ্রণ পদ্ধতিতে কুরআন ছাপানোর ব্যবস্থা থাকার পরও লাখ লাখ হাফিয মুখস্থকরণের মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করেছে। অথচ পৃথিবীতে অন্য কোন সাধারণ গ্রন্থ তো দূরের কথা কোন ধর্মগ্রন্থও এরূপভাবে সুসংরক্ষিত নয়। এর স্থায়ী হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। ফলে তা কিয়ামাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত ও সুসংরক্ষিত থাকবে। পৃথিবীর কেউ তাঁর সম্পূর্ণ বা আংশিক কখনই ধ্বংস বা বিকৃত করতে পারবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩] (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) " আমিই স্মারক (কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমি তার সংরক্ষক।"

০৬.আল-কুরআনের তিলাওয়াতে এক চমৎকার সুর ঝংঙ্কার, মোহনীয় আকর্ষণ শক্তি ও সুমিষ্ট সুরমাধুরী আরবী ভাষা-ভাষীসহ অন্য ভাষার শ্রোতাদের মন-মগজকে মোহিত করে তুলে। এর তিলাওয়াতের সুরের মূর্ছনা শ্রোতার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আল-কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের পাঠের সুর এরূপ চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর বলে লক্ষ্য করা যায় না। এটা আল-কুরআনের একক অনন্য বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, আল-কুরআন এমন আলৌকিক গ্রন্থ, যার পুনঃপুনঃ তিলাওয়াতে বিরক্তির আসে না। পৃথিবীর কোন রচনা যত বিখ্যাত, যত সাবলীল ও অলংকারপূর্ণই হোক না কেন মানুষ একবার, দু'বার, তিনবার পাঠ অথবা শুনার পর তা আর পাঠ বা শুনার জন্য আগ্রহী হয় না, বরং তার প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আল-কুরআন এর একমাত্র ব্যতিক্রম, যা বার বার পাঠ অথবা শ্রবণে এক ধরনের নতুন আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করা যায়।
কারো কারো মতে[৪], 'চিন্তা–দুর্ভাবনা দূরীকরণের ক্ষেত্রে আল-কুরআন এমন একটি ফলদায়ক গ্রন্থ, যা মনোযোগ ও অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে সকল চিন্তা বা অস্থিরতা হতে মুক্তি লাভ করে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করা যায়।'

আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ :

প্রথম নাবী আদম ('আ.) থেকে শুরু করে শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেক নাবী-রাসূল আগমন করেছেন। এই নাবী-রাসূলদের প্রতি চার খানা প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব ছাড়াও অনেক সহীফা প্রদান করা হয়েছিল। সহীফা সংখ্যা ১০০টি বলা হলেও এর সঠিক সংখ্যা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এ সব সহীফার স্থায়ীরূপ ছিল না। সমসাময়িক ও স্থানীয় প্রয়োজনের নিরিখে মূল কিতাবের শিক্ষার আলোকে এ সব সহীফা প্রদত্ত হয়েছিল। তাই কাল পরিক্রমায় সেগুলোর অস্তিত্ব আজ অবলুপ্ত। পূর্ববতী প্রধান যে তিন খানা আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল তাও এখন দুস্প্রাপ্য। উক্ত তিন খানা কিতাব হিসাবে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে, তা তার নাযিলকৃত মূল ভাষায় নয়। আর মূল ভাষা হতে যখন কোন গ্রন্থকে অনুবাদ করা হয়, তখন তা অনুবাদ গ্রন্থ, আসল গ্রন্থ নয়। বিশেষ করে মহান আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের ভাষা স্বয়ং আল্লাহরই। সুতরাং আল্লাহর কিতাব যখন ভাষান্তরিত হয়, তখন আর তা আল্লাহর কিতাব থাকে না, বরং তা আল্লাহর কিতাবের অনুবাদ। আর অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা অনুবাদকের, আল্লাহর নয়। তাছাড়া ঐ সমস্ত গ্রন্থ যে পরিবর্তন মুক্ত নয় তা তাদের বিজ্ঞ অনুসারীদের অনেকেই স্বীকার করেছেন। কেননা সে যুগে আজকের মত কাগজ না ছিল, আর না ছিল আজকের মত ছাপাখানা। ফলে বৃক্ষপত্র, কাষ্ঠফলক, মসৃণ পাথর অথবা পাতলা চামড়ায় তা লিখে রাখা হত এবং তাঁর অতিরিক্ত কপি করা অসম্ভব বিধায় পুরোহিতদের কাছে তাঁর এক-আধ কপি তাদের কেন্দ্রীয় উপসানালয়ে রক্ষিত হত। আর যখনই প্রতিদ্বন্দ্বী কোন জাতি তাদের রাজধানী বা নগরে আক্রমণ করত, তখন তাদের

---

[১]. রশীদ রিদা, *তাফসীর আল-মানার* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২য় সংস্কার) খ.০১, পৃ. ২০৬।
[2] . P.Q. Hitti, *History of the Arabs,* (New york : Mac Millan, Tenth Edition) p.126.
[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-হিজ্‌র : আয়াত ০৯।
[৪]. *কুরআন পরিচিতি*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা : ই ফা বা, প্রকাশকাল ১৯৯৫), পৃ. ২৬২।

ধর্মগ্রন্থ ও উপসনালয়ই হত বিজয়ী জাতির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থল। ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে এভাবে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি কর্তৃক ইহুদী ও খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে একখানা পূর্ণাঙ্গ তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল তার মূল ভাষায় পাওয়া সাধারণভাবে অসম্ভব।[১]

ওল্ড টেষ্টামেন্ট (তাওরাত বা যাবুর) অনেকবারই ধ্বংসের পর বিভিন্ন ব্যক্তির মৌখিক বর্ণনা এবং বিক্ষিপ্ত লিপির অংশ বিশেষ সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করে নতুন কপি তৈরী করা হয়। ফলে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে তা মৌলিক ও অবিকৃত থাকেনি। বর্তমানে তওরাত বা Old Testament বলতে যা প্রচলিত আছে তা মূসা (‘আ.) এর ওপর অবতীর্ণ তাওরাতের হুবহু অনুবাদ বা মর্ম সে কথা বলার সাধ্য কারো নেই। কারণ তা গ্রীক, হিব্রু ও আরামীয় ভাষায় লিখিত ইয়াহুদী পণ্ডিতদের অনেকগুলো পুস্তকের সংগ্রহের সমন্বয়ে প্রণীত বর্তমান তওরাত তিন হাজার বছরেরও আগের। ভাষা, বিষয়বস্তু, সংরক্ষণ, কালক্রমিক হস্তান্তর, সর্বোপরি বিশুদ্ধতা ইত্যাদি কোনদিক দিয়েই এ তাওরাতকে নাযিলকৃত তাওরাত বলা যায় না। তবে কুর’আনের বর্ণনার সংগে যেখানে তাওরাতের মিল রয়েছে তাছাড়া বর্তমান তাওরাতকে আসমানী কিতাব হিসাবে কোনক্রমেই অবিকৃত মনে করার উপায় নেই। এ মর্মে বলা হয়েছে–[২] أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ “তোমরা কি আশা কর যে, তারা (ইয়াহুদীরা) তোমাদের কথায় ঈমান আনবে। যখন তাদের এক দল আল্লাহর কালাম শ্রবণ করত ও বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।” আরও বলা হয়েছে-[৩] (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) “সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে, তারপর বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’, যাতে তার বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য লাভ করতে পারে।” এ প্রসংগে ডা. মরিস বুকাইলি(১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) বলেন-[৪]

> ওল্ড টেষ্টামেন্ট বিভিন্ন দৈর্ঘ্য, আকার ও প্রকারের রচনার একটি সংকলন। মৌখিক প্রবাদের ভিত্তিতে এগুলি নয় শতাধিক বছর যাবত বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। এরপর বিভিন্ন সময়ে, বহুদিন পরপর কোন ঘটনার ভিত্তিতে অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনবশত অনেক রচনাই সংশোধন ও সম্পূর্ণ হয়েছে।...ওল্ড টেষ্টামেন্টের রচনাবলীর মধ্যে ওহী মিশ্রিত ছিল বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। কিন্তু এখন গ্রন্থখানি আমরা যে অবস্থায় পেয়েছি, তাতে সেই ওহী আর অবশিষ্ট আছে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি বর্ণনা অনেকবার রদবদল হয়েছে এবং অনেক লেখকই হস্তক্ষেপ করেছেন। সুতরাং সহজেই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশে, পরিস্থিতি ও পছন্দ অনুসারে যা ভাল মনে করেছেন, শুধু সেইটুকুই অবশিষ্ট রেখেছেন এখন আমাদের পর্যন্ত শুধু সেইটুকুই এসেছে।...পেন্টাটিউক বা তৌরাতের মূল রচনা পরীক্ষা করে দেখলে অতি সহজেই মানুষের হাতের কাজ বলে ধরা যায়। ইহুদী জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন আমলের মৌখিক কাহিনী, কিংবদন্তি এবং পুরুষানুক্রমে রক্ষিত রচনার ভিত্তিতে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

‘ইসা (‘আ.) এর প্রতি সুরিয়ানী ভাষায় নাযিলকৃত মূল “ইনজীল” কিতাব পাওয়া যায় না। ‘ইসা (‘আ.) এর অন্তর্ধানের বহুকাল পরে তার ভক্তরা নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী জনশ্রুতির ভিত্তিতে বর্তমান বাইবেল সংকলন করেন। বহু নকল, অনুলিখন, অনুবাদ ও ভাবসম্প্রসারণের স্তর পেরিয়ে ইংরেজীতে অনূদিত যে বাইবেল বর্তমান বিদ্যমান তা কোন ক্রমেই প্রকৃত ইনজীল নয়। সেন্ট ম্যাথিউ, সেন্ট মার্ক, সেন্ট লুক ও সেন্ট জন এই সাধু চতুষ্টয়ের সংকলিত চারটি পুস্তকের সমন্বয় বর্তমান বাইবেল। সাধু চতুষ্টয় নিজেদের জ্ঞানানুযায়ী ‘ইসা (‘আ.) এর জন্মকথা, প্রচারের কাহিনী, আলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ, নবজীবন লাভ ইত্যাদি এতে সন্নিবেশিত করেন। তারা এ সব বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন নিজেদের ভাষায়। এর বিন্যাস, বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তা আল্লাহর কালাম নয়, বরং মানুষের রচনা। ‘ইসা (‘আ.) এর অন্তর্ধানের বহুকাল পরে লিখিত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে বর্তমান বাইবেলে সন্নিবেশিত অনেক বক্তব্য খ্রীষ্টান ধর্মযাজক কর্তৃক অনেক সময় পরিবর্তিত ও সম্পাদিত হয়েছে।[৫] তাছাড়া বর্তমান বাইবেল সন্নিবেশিত অনেক বক্তব্যের সঙ্গে খ্রীষ্টিয় জগতের অনেক যাজক ও পণ্ডিতের দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। ডা. মরিস বুকাইলি (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) বলেন-[৬]

> নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না যে, বাইবেলের যে পাঠ এখন আমাদের সামনে আছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই।...আমরা স্বভাবতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বাইবেলের মূল পাঠে বিকৃতি ঘটেছে এবং বিকৃতি মানুষের দ্বারাই ঘটেছে। মুখে মুখে এক পুরুষ থেকে এক পুরুষে আসার সময়, অথবা লিখিত হয়ে যাওয়ার পর তা নকল বা সম্পাদনা করার সময় এ বিকৃতি ঘটেছে।

দাউদ (‘আ.) এর উপর যে যাবূর নাযিল করা হয়েছিল তাও বিদ্যমান নেই। তাওরাত ও ইনজীলের যেমন অনেক অনুসারী রয়েছে, যাবুরের সেরূপ নেই। তাওরাত ও ইনজীলের মত এর কোন অনূদিত ভাষ্যও নেই। উত্তর ইরাকের কুর্দিস্তানের কিরনিদ জিলার পার্বত্য অঞ্চলে যে সব লোক দাউদ (‘আ.) এর অনুসারী বলে দাবী করে তাদের নিকটও

---

[১]. দেখুন, আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, *মহাগ্রন্থ আল-কোরআন কি ও কেন?* (ঢাকা: খেলাফত পাবলিকেশন্স, ২০০৪) পৃ. ৫২-৫৩; ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর’আন পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৭-২৫৪।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৮৫।

[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৭৯, আরও দেখুন আল-কুরআন (০৩:৭৮)

[৪]. ডা. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, ওসমান গনি অনূদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২, ২৫, ২৮।

[৫] . ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর’আন পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫১।

[৬] . ডা. মরিস বুকাইলি, *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, ওসমান গনি অনূদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

যাবুরের কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তাওরাত ও ইনজীলের মত এর কোন অনূদিত বা বিকৃত ভাষ্যও নেই। গীতসংহিতা রূপে যা কিছু পাওয়া যায় তা সবেই সাহিত্যকর্ম, ধর্মগ্রন্থ নয়।[১]

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ বেদ বৈদিক যুগের অনেক পরে মহাভারতীয় যুগে (কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময়) বেদব্যাস মুনি কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে–বেদ যীশু খৃষ্টের জন্মের মাত্র সাত কি আটশত বছর পূর্বের রচনা। অনুরূপভাবে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের তৃতীয় পিটকখানা বুদ্ধের মৃত্যুের প্রায় দুইশত বছর পর মহামতি অশোকের নেতৃত্বে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পিটকদ্বয়ও বুদ্ধের মৃত্যুর পরে সংকলিত হয়।[২]

অন্যদিকে, আল-কুরআন নাযিলের শুরু থেকেই লিখিত ও মুখস্থকরণের মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়। স্বয়ং রাসূল সা. তাঁর জীবদ্দশায় এ কাজ সম্পন্ন করে যান। রাসূল সা. এর ওফাতের ০৬ (ছয়) মাস পর খলীফা আবূ বকর রা. গ্রন্থকারে কুরআন সংরক্ষণ করেন। এছাড়া, কুরআন হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং মহান আল্লাহ গ্রহণ করেন, যা অন্য ধর্মগ্রন্থের বেলায় ঘটেনি। এ সংক্রান্ত ঘোষণা কুরআন নাযিলের প্রাথমিক স্তরে একটি মাক্কী সূরাতে প্রদান করা হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন[৩] (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه) "ওহী তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা তার সাথে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমার দায়িত্বে।"

কাজেই আল-কুরআন ঐতিহাসিককালে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব। নাযিলের শুরু থেকেই তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যে সব ভাষায় নাযিল বা লেখা হয়েছে সেসব ভাষার প্রচলন বর্তমান পৃর্থিবীতে নেই বললেই চলে। তাওরাত নাযিল হয়েছিল ইবরানী বা হিব্রু ভাষায়, ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল সুরিয়ানী ভাষায়, বেদ ও গীতা লেখা হয় সংস্কৃত ভাষায়, ত্রিপিটক লেখা হয় পালি ভাষায়–বর্তমানে এ সব ভাষা মৃতপ্রায়, কারণ এ সব ভাষায় এখন আর কেউ কথা বলে না। পক্ষান্তরে, যে মূল আরবী ভাষায় কুরআন মহানাবী সা. এর প্রতি নাযিল হয়েছে, আজ চৌদ্দশত বছর পরও কুরআনের সে ভাষা না পুরান হয়েছে; না পরিত্যক্ত হয়েছে। বরং বর্তমান পৃথিবীর আরবী একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবন্ত ভাষা।

আল-কুরআন ও মানব জাতি:

মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষ অন্যতম। মহান আল্লাহ মানুষকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেন এবং সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন। কুরআন অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, মহান আল্লাহ মানুষকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের উপর বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-[৪] (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍمِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) "আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদের উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"

মানুষের এই মর্যাদা ব্যাপারে মতৈক্য থাকলেও পৃথিবীতে মানুষের আগমন কখন ও কিভাবে ঘটেছে- এ নিয়ে আসমানী গ্রন্থসমূহ এক ধরনের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জীববিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও নৃ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ সব বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে– মানব সাদৃশ দ্বিপদচারী যেমন: বানর, বন মানব, শিম্পাঞ্জী, গোরিলা ইত্যাদি কোন প্রাণী থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। যেমন একটি ভাষ্য-[৫]

> প্রাগৈতিহাসিক কালের মানব-সাদৃশ দ্বিপদচারী বিলুপ্ত নানা প্রজাতির অসংখ্য ফসিল আবিষ্কারের পর জীববিজ্ঞানীগণ নির্দ্বিধায় ধারণা করলেন যে, দ্বিপদচারী বিলুপ্ত কোন কোন প্রজাতি থেকে মানুষের উদ্ভব ঘটে থাকবে। বিবর্তন বিজ্ঞান বলে- শত সহস্র বছর অতীতকাল থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে একেক প্রজাতির আগমন ও বিলপ্তি হচ্ছে এবং তা থেকে নতুন প্রজাতির অবির্ভাব ঘটে চলছে। এভাবে প্রায় দুই লক্ষ বছর পূর্বে মানব প্রজাতির উন্মেষ হয়ে থাকবে, বলে অধিকাংশ বিবর্তনবিদ মনে করেন।

মানব জাতির উন্মেষ সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের এ ধরনের সব তথ্যই অনুমান নির্ভর; যা বিভ্রান্তির উর্দ্ধে নয়। এক্ষেত্রে প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (মৃ.১৮০৯-১৮৮২ খৃ.) এর বিবর্তনবাদতত্ত্ব[৬] নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক সমালোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে এবং অনেকেই তা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন।[৭] এ সংক্রান্ত ধারণাপ্রসূত সব তথ্যই জ্ঞানের সবচেয়ে

---

[১] . ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫২-২৫৫।

[২]. আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪-৫৫।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ : আয়াত ১৬-১৭।

[৪] .আল-কুরআন সূরা আল-ইসরা' : আয়াত ৭০,আরও দেখুন- আল-কুরআন ৪৪:৩৮-৩৯, ৩৮:২৭, ৯৫:০৪।

[৫] . মো. আজিজুর রহমান লস্কর, *প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ধর্ম*, (ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ২য় সংস্করণ, ২০১২) পৃ. ১২২।

[৬] .**বিবর্তনবাদ:** ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন তার *The Orgin of Species* গ্রন্থে বংশগতি তত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেখানে মানুষের আদি পুরুষ হিসেবে একটি অনুজীবকে চিহ্নিত করা হয়। যে অনুজীবটি মিলিয়ন মিলিয়ন বছর একটি বদ্ধ ডোবাতে ছিল। বিবর্তনের ফলে তা এক পর্যায়ে বানর এবং শেষ পর্যায়ে মানুষে রুপান্তরিত হয়েছে। বিবর্তনবাদ ধর্মীয় বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করে নাস্তিকতার প্রসার ঘটায়। -ড. মানে' আল-জুহানী, *ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও ইসলাম (আল' ইলমানিয়াহ ওয়াল ইসলাম)* অনু. মুহাম্মদ নুরুল্লাহ (ঢাকা:ইসলাম হাউজ ডট কম, ২০১৩), পৃ.০৯।

[৭] . হারুন ইয়াহিয়া, *কুরআনের আদর্শ সকল সমস্যার সমাধান*, অনু. জাবীন হামিদ,(ঢাকা: ইফাবা, ১ম প্রকাশ,২০০৯)পৃ.৯৫-১১১। আরও দেখুন, ডা. মরিস বুকাইলি রচিত (*The Orgin of Man*) *মানুষের আদি উৎস*, বাংলা অনুবাদ, আখতার-উল-আলম (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৯৬), পৃ. ৪৬-৭২।

নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং মানুষের জন্য মর্যাদা হানিকর। তাই অনুমান নির্ভর এ সব তথ্যকে জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎস ওহীর উপর কোন অবস্থাতেই প্রাধান্য দেয়া যায় না।

আল-কুরআন ও পূর্ববর্তী সব আসমানী গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হয়নি, বরং মহান আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্যে তথা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেন।[১] এ মর্মে বলা হয়েছে[২] (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) "(স্বরণ কর)যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।" আদম('আ.) কে সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সৃষ্টির সূত্রপাত করেন।[৩] আদম ('আ.) থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে ('আ.) সৃষ্টি করা হয়। তাদের মাধ্যমে মানব জাতির গোড়াপত্তন হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء "হে মানব! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে করেন এবং তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী।" আল-কুরআন প্রদত্ত এ সব তথ্য মনগড়া নয়। বরং মানুষের জন্মের সূচনা, মাতৃগর্ভে গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আল-কুরআন যে তত্ত্ব প্রদান করেছে আজকের বিজ্ঞান তার সত্যতা স্বীকার করে।[৫]

আল-কুরআন মতে, প্রথমদিকে আদম('আ.) ও তার স্ত্রী হাওয়া('আ.) জান্নাতে অবস্থান করেন। কিন্তু নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের কারণে তারা জান্নাত থেকে পৃথিবীতে বহিষ্কৃত হন।[৬] পৃথিবীতে তাদের সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনা এবং সঠিকভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আদম('আ.) এর প্রতি প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তাদের আসমানী জীবন বিধান দেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন[৭]–(قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) "আমি বললাম, "তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও, পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাযুক্তও হবে না।"

আদম('আ.) ও হাওয়া('আ.) এর সন্তানাদির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে মানব জাতির বিস্তার ঘটে। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। প্রথম দিকে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান পালনে এক থাকলেও পরবর্তীতে মানব জাতির বিস্তৃতির সাথে সাথে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। মানুষ বিশ্বস্রষ্টার পরিবর্তে দেব-দেবী, সূর্য, চন্দ্র, প্রাকৃতিক বস্তুসহ সৃষ্টির পূজা এবং বিভিন্ন নীতিহীন ও গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সত্য পথ নির্দেশের জন্য নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন[৮]– كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ "মানুষ(আদিতে) ছিল এক উম্মত। (পরে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল) অতঃপর আল্লাহ নাবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।"
এভাবে যুগে যুগে মানুষ যখন সত্য পথ পরিহার করে অধঃপতনের চরমে পৌঁছেছে, তখন তাদের সুপথ প্রদর্শন, উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানের জন্য নাবী-রাসূলের অবির্ভাব ঘটেছে। আর এই নাবী-রাসূলদের প্রতি নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব, যা উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ। আসমানী কিতাব নাযিলের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ হল, আল-কুরআন, যা বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি নাযিল হয়। তাই কুরআন মুহাম্মাদ সা. আবিষ্কৃত নতুন কোন মতবাদ নয়, বরং তা ঐতিহাসিক যুগের ধারাবাহিক ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের সমর্থক ও সত্যায়নকারী।[৯] কুরআন কোন নির্দিষ্ট জাতির ধর্মগ্রন্থ নয়, আবার তা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও নাযিল হয়নি; বরং তা সমগ্র মানব জাতির সত্য-সঠিক পথের দিশারী এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত মানবকুলের জন্য সব যুগের উপযোগী একটি সর্বজনীন চিরন্তন, মৌলিক, পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত জীবন বিধান।[১০] এতে মানুষের যাবতীয় সমস্যার নির্ভুল সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[১১] (وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) "আর তারা আপনার কাছে এমন কোন সমস্যা নিয়ে আসেনি, আমি যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আপনাকে প্রদান করিনি।"

মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব হলো, প্রথমে সে যার প্রতিনিধি হয়ে এসেছে তার সঠিক পরিচয় তুলে ধরা। পৃথিবীতে তাঁর সার্বভৌমত্বকে ঘোষণা করা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর নির্দেশের অবাধ্য না হওয়া। প্রতিনিধি

---

[১] . দেখুন, পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক।
[২] . আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩০, আরও দেখুন-আল-কুরআন (০৬:১৬৫)।
[৩] . আল-কুরআন ,সূরা আল-আ'রাফ: আয়াত ১৮৯; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪৯ : ১৩, ৩৯ : ০৬, ০৪ : ০১, ৫১ : ৫২, ৯৬:১-৫, ৮৬:৫-৮, ৮০:১৭-২২, ৭৬:২-৩, ৭৫: ৩৭-৪০, ১৮:৩৭, ১৬:০৪, ৫৫:১-৪, ৯০:৪-৫, ১১-১২।
[৪]. আল-কুরআন , সূরা আন্-নিসা': আয়াত ০১।
[৫]. আল-কুরআন ২২:০৫; ২৩:১২-১৪, ৯৬:০২।
[৬] . আল-কুরআন ০২:৩৫-৩৬।
[৭] . আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২০:১২৩, ৭:৩৫।
[৮] . আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২১৩।
[৯] . আল-কুরআন, ০৩:০৩; ০২:৪১,৯১,৯৭; ০৪:১৪৮ ৫:৪৮।
[১০]. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৫।
[১১] . আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান ২৫: আয়াত ৩৩।

নিয়োগকর্তার (সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর) অর্পিত দায়িত্ব তাঁর প্রদর্শিত পন্থায় সঠিকভাবে সম্পন্ন করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। এক্ষেত্রে বর্তমান মুসলিম জাতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার মূলনীতি আল-কুরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। তারা কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি অনীহ। তাদের অধিকাংশই কতিপয় ইবাদতের বাইরে কুরআন প্রদত্ত সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গ্রহণে নারাজ? অথচ মুসলিমদের জন্য এর বাইরে যাওয়ার কোনই সুযোগ নেই। তারা মনে করে কুরআন নাযিল হয়েছে–শুধু তিলাওয়াত করে ছাওয়াব অর্জন, বিপদ থেকে উদ্ধার, জাগতিক কোন স্বার্থ হাসিল বা সাফল্য লাভের তাবিজ বা ঝাড়-ফুকের জন্য এবং মৃত ব্যক্তিদের মুক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করার মাধ্যম হিসেবে খতম অনুষ্ঠানের জন্য। তাই তারা বর্তমানে মৃত ব্যক্তির ছাওয়াব পাঠানো সহ উল্লেখিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কুরআন খতম করে থাকেন। কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষকে সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারজগত থেকে মুক্ত করে সত্য-সঠিক প্রদর্শন[১], সঠিকভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার দিক নির্দেশনা প্রদান, উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষাদান, মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন, জীবন সমস্যার সমাধান এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য।[২] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৩] وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ "আর এভাবেই আমি কুরআনকে জীবনবিধান স্বরূপ আরবীতে নাযিল করেছি। তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী নেই।" মহান আল্লাহ আরও বলেন[৪]–(الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) "আলিফ-লাম-রা; এ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন তাদের রবের অনুমতিক্রমে, পরাক্রমশালী, প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথের দিকে।"

কাজেই, আল-কুরআন থেকে কাঙ্ক্ষিত শান্তি, মুক্তি, কল্যাণ ও সুফল পেতে হলে আজকের পৃথিবীবাসীকে আবারও আল-কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে। এবং কুরআনের নাযিলের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সকলকে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। কুরআনের শিক্ষা সঠিকভাবে অনুধাবন, আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে। তাহলেই পৃথিবীবাসী প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ লাভে সক্ষম হবে।

---

[১] . আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ০১।
[২]. আল-কুরআন ১৬:৬৪; ২১:১০; ৩৬: ৬৯-৭০, ০৬:৯২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ: আয়াত ৩৭।
[৪] .আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ০১; এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ৫৭ : ০৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়:নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা

মূল্যবোধের ধারণা, নৈতিক মূল্যবোধের পরিচয়

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধ,

সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা, ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মূল্যবোধ

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড

মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনের মূল্যমান ও বিশেষত্ব

মূল্যবোধের ধারণা (Concept of Value):

মূল্য বা মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Value[১] আর আরবী প্রতিশব্দ (القيم, الأخلاق)[২]। মূল্য বা মূল্যবোধ শব্দটি নীতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। সাধারণভাবে মূল্য বা মূল্যবোধ (Value) বলতে বোঝায়–আমাদের আচরণের ভালো-মন্দের দিক মূল্যায়ন করা। অবশ্য মূল্য শব্দটি অর্থনীতিরও একটি বিশেষ পরিভাষা, তবে সেখানে মূল্য অর্থ–বিনিময় মূল্য; কিন্তু এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা নীতিবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে বিষয়টির বিশ্লেষণ করব।

নীতিবিজ্ঞানে মূল্য বা মূল্যবোধ (Value) কথাটির আক্ষরিক অর্থ- যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা। নীতিবিজ্ঞানের পরিভাষায়- "মূল্যবোধ (Value) হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষতা, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে।"[৩] আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায়- "মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি আদর্শের মাপকাঠি যা মানুষের প্রয়োজন, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও আকাঙ্খার নৈতিক, নান্দনিক এবং যৌক্তিক প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে।"[৪]

মূল্যবোধের পরিচয় সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের আরও কিছু মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হলো-

Values Identify a group's ideals its ultimate aim and most general standards for assessing good and bad or desirable and undesirable.[5]

A value is an idea shared by the people in a society about what is good and bad, right and wrong, desirable and undesirable.[6]

Values broad cultural principles embodying ideas about what most people in a society consider to be desirable are not same as norms.[7]

A value is a standard of judgment by which people decide on desirable goals and outcomes.[8]

স্পেফার মতে, ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ও কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ।"[৯]

এন. আর. উইলিয়াম বলেন,"মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"[১০]

অতএব বলা যায় যে, মূল্যবোধ হচ্ছে এমন একটি মাপকাঠি, যার আদর্শে সমাজস্থ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং যার মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ বিচার করা হয় এবং যা মানুষের কাঙ্খিত আচরণ গঠন করে। মূল্যবোধ মানুষের নীতিবোধ, আদর্শ, জীবনাচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির সম্মিলিত বহি:প্রকাশ।

ইসলামী মূল্যবোধের পরিচয়ে আলী খলীল মুস্তফা, *আল-কীমাহ আল-ইসলামিয়্যাহ* গ্রন্থে বলেন, মানুষ, জীবন এবং বিশ্বজগত সম্পর্কে মৌলিক ইসলামী চিন্তা থেকে উৎসারিত এমন কিছু বিধান ও মানদণ্ড যা জাগতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও অবস্থার আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সামনে গঠিত হয়, যা তাকে তার সম্ভাব্যতা অনুযায়ী জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেছে নিতে সক্ষম ও যোগ্য করে তোলে এবং যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবহারিক রীতি-নীতি ও ব্যবস্থাপনার মাঝ থেকে রূপ পরিগ্রহ করে।[১১]

মূল্যবোধ একটি অলিখিত সামাজিক বিধান। কোন সমাজেই তা লিপিবদ্ধ থাকে না। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, অনুমোদিত আচার-ব্যবহার, [ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবীয় অভিজ্ঞতা] ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ফলে সমাজভেদে মূল্যবোধের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই মূল্যবোধ সমাজ ভেদে ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপ ধারণ করে। সমাজ জীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি পর্যায়ে মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ের মূল্যবোধ ব্যক্তির বিশ্বাসবোধ, রুচিবোধ, ধ্যান-ধারণা ও নীতিবোধকে নির্দেশ করে। যেগুলো ব্যক্তির আচার-আচরণ, ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। দলীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতিবোধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা বিচারবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি দলীয় মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ ও অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে গড়ে

---

[১].ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে মূল্য বা মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত Value শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Valeo* শব্দ থেকে, এই *Valeo* শব্দটি একাধারে শক্তি (strength) ও স্বাস্থ্য (health) উভয়কেই বুঝায়। অতঃপর বাঙলা ভাষায় এ শব্দটির অর্থ গিয়ে দাঁড়ালো– ফলপ্রসূ ও উপযুক্ত হওয়া (effective and adequate)| আবার শব্দটির ফরাসি প্রতিশব্দ হচ্ছে *Valeur,* বাঙলা ভাষায় যার অর্থ হলো–উৎকর্ষ(excellence); ইটালি প্রতিশব্দ *Valuta*, যার বাঙলা অর্থ হলো–দাম; জার্মান প্রতিশব্দ *wert,* যার বাঙলা অর্থ মূল্য। এভাবে শব্দটির প্রকৃত নিহিতার্থ নিয়ে দার্শনিকদের মতভেদ থাকলেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শব্দটির প্রকৃত অর্থ–বস্তু বা ব্যক্তির মূল্যাবধারণ বা মূল্যবিচার। -ড.এম মতিউর রহমান ও ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *দর্শনের মূলনীতি*,(ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০০৯) পৃ.২৩১।

[২] .আরবী القيم (আল-ক্বিয়াম) যা القيمة (আল-ক্বিমাহ) শব্দের বহুবচন। যার আভিধানিক অর্থ- (কোন বস্তুর প্রকৃত) মূল্য। এছাড়া তা সরলতা, সঠিকতা ও দৃঢ়তা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর الأخلاق শব্দের বিশ্লেষণ পরবর্তীতে প্রদান করা হয়েছে।

[৩]. ড. এম. আবদুল হামিদ, *সমকালীন নীতি বিদ্যার রূপরেখা* (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, ২০০১), পৃ.১৫।

[৪]. সম্পা দাস, *সমাজ কর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন* (ঢাকা: বুক চয়েস, ২০০৫), পৃ.১৩৭।

[5] . Rodney Stark, *Sociology* (California : Wadsworth Publishing Company) p.34.

[6] . David Popenoe, *Sociology* (Newjersey: Prentice Hall, 6th ed. 1986) p.57.

[7] . Jon.M Shepard, *Sociology* (NewYork :West Publishing Company, 1981) P.65.

[8] . David M. Newnan, *Sociology*, *exploring the Architecture of Everyday Life* (California : SAGE Publication Inc.) P.36.

[৯] . ড. শওকত আরা, *উচ্চতর সমাজ মনোবিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২য় সংস্করণ, ২০০৬), পৃ.২১৯।

[১০] . ড. শওকত আরা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৯; মো: আতিকুর রহমান, *সমাজ কল্যাণ* (ঢাকা: কোরআন মহল, ১৯৯৯), পৃ.৫৮।

[১১] . উদ্ধৃত, *মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম* (জেদ্দা: দারুল ওসীলাহ লি নাশরি ওয়াত তাওযী') খ.০১, পৃ.৭৯।

উঠা মূল্যবোধ সমাজের মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। আর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত মূল্যবোধ হল নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট পেশার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক নীতিমালার সমষ্টি যা প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।[১]

মূল্যবোধ মানব জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জীবনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, আদর্শ, কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও নৈতিক ভাবধারা গঠনে মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটাই নৈতিক জীবনের মৌলিক উপাদান এবং জীবনে এর রূপায়নই মানব জীবনের ব্রত। এর বাস্তবায়নে জীবন ধন্য, সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। মূল্যের ধারণাই মানুষকে জীব জগতে পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে। মানব জীবন থেকে মূল্যবোধের ধারণা বিয়োজন করলে জীবের বৈশিষ্ট্য থাকে বটে কিন্তু মনুষ্য নামের উপযোগী কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব একই সূত্রে গাঁথা, যার মূল্যেবোধের ধারণা নেই তার মনুষ্যত্ব নেই। শুধু দীর্ঘায়ুর মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নেই, সার্থকতা আছে জীবনের মূল্যবোধের রূপায়ণে, তথা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের ধারণা ও উপলব্ধি মাধ্যমে আলোকিত জীবন যাপনের মধ্যে। মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে মূল্যগুলোকে জীবনে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে। মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও রূপায়ণের মাধমেই সাধিত হয় মানবতার অগ্রগতি। এ পথেই মানবিক পূর্ণতা ও আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।[২]

মূল্য বা মূল্যেবোধের প্রকারভেদ: মূল্য বা মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন–নৈতিক মূল্য, সামাজিক মূল্য, ধর্মীয় মূল্য, পার্থিব মূল্য, সৌন্দর্য বিষয়ক মূল্য ইত্যাদি। মূল্যের উল্লেখিত শ্রেণী ছাড়াও আরও বিশেষ কিছু প্রকার বা দিক রয়েছে। যেমন–ক.'স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য'[৩]; খ.'বিষয়গত মূল্য ও বিষয়ীগত মূল্য'[৪]; গ.'পরম মূল্য ও আপেক্ষিক মূল্য'[৫] ইত্যাদি। এ পর্যায়ে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় তথা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

নৈতিকতা / নৈতিক মূল্যবোধ (Morality/ Moral Value):

নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ একটি বহুল প্রচলিত প্রত্যয়। সাধারণতঃ ভালো-মন্দের যে জ্ঞান মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই নৈতিকতা। নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হলো নীতিবোধ। ন্যায়-অন্যায় বা ভালো-মন্দের ধারণার ভিত্তিতে নীতিবোধের সৃষ্টি হয়। নীতিবোধ মানুষের একটি অন্তরশক্তি, সেই শক্তির উৎস হলো সত্য, সুন্দর ও শুভের প্রতি অনুরাগ এবং অসুন্দর, অসত্য ও অশুভের প্রতি বিরাগ। আর এই নীতিবোধ থেকেই উৎসারিত হয় আমাদের নৈতিকতা।

নৈতিকতা শব্দটি বাংলা 'নীতি' শব্দমূল থেকে উদ্ভূত। নীতি অর্থ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য–অকর্তব্য ইত্যাদি বিচার, প্রথা, আচার, রীতি-নীতি ইত্যাদি।[৬] আর সমাজস্থ ব্যক্তির আচরণের উচিত্য ও অনৌচিত্যের বিচার হল নৈতিকতা।[৭]

নৈতিকতা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে Morality ব্যবহৃত হয়, যা Moral শব্দের বিশেষণ। Moral শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন *Mores*[৮] বা *Moralis* শব্দ থেকে; যার অর্থ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি বা অভ্যাস।[৯]

আবার নৈতিকতা শব্দটি ইংরেজিতে Ethics অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা গ্রীক শব্দ *Ethica* থেকে, আর তা এসেছে *Ethos* শব্দ থেকে, যার অর্থ চরিত্র (character)।[১০] উল্লেখ্য যে, চরিত্রকে অভ্যাস ও রীতিনীতির সাথে সম্পর্কিত মনে করা হয়ে থাকে।[১১] তবে Ethics শব্দটি বিশেষভাবে নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন John Mackenzie বলেন[১২]-

> Ethics, may defined as the study what is right or good in conduct.It is general theory of the conduct and considers the actions of human being with reference to their rightness or wrongness, their tendency to good or to

---

১. সম্পা দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৭।

২. দেখুন,এ এফ মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন?* (ঢাকা: ই ফা বা, ১ম প্রকাশ, ২০০৪) পৃ. ২৫-২৮।

৩. **স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য:** মূল্যের নিজস্ব মূল্য আছে বা নাই, এর উপর ভিত্তি করে নৈতিক মূল্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–যে মূল্যের নিজস্ব গুণ বা মূল্য আছে, অর্থাৎ নিজ গুণে গুণান্বিত তাকে স্বতঃমূল্য বলে। আর যে মূল্যের নিজস্ব গুণ বা মূল্য নেই কিন্তু অন্য কোন মূল্যের উপায় বা সহায়ক বলে পরিগণিত হয়ে থাকে তাকে পরতঃ বা সহায়ক মূল্য বলে। স্বতঃমূল্য নিজ গুণে গুণান্বিত, তাই তা স্বাধীন ও নিরেপেক্ষ। পক্ষান্তরে, পরতঃমূল্য অন্যের গুণের সহায়ক বা অন্যের গুণে গুণান্বিত, তাই তা আপেক্ষিক। যেমন–সত্য, সুন্দর ও শুভ স্বতঃমূল্য, কারণ এগুলো নৈতিক জীবনে কাম্য। আর সুখ বা আনন্দ পরতঃমূল্য, কারণ এগুলো নৈতিক জীবনের সহায়ক হিসেবে ভাল হতে পারে।

৪. **বিষয়গত মূল্য ও বিষয়ীগত মূল্য:** নৈতিক মতবাদসমূহকে ব্যাপক অর্থে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা–জ্ঞানজবাদ ও অজ্ঞানজবাদ। জ্ঞানজবাদ অনুসারে আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ বিষয় নির্ভর। এ মতানুযায়ী বিষয়ের মধ্যে মূল্য নির্ণীত থাকে এবং মূল্যায়নের বিষয় দ্বারা মূল্য নিহিত হয়ে থাকে। যখন কোন কিছুকে আমরা সুন্দর বলি তখন ঐ বস্তুর মধ্যে সুন্দরের গুণাবলী আছে বলেই তাকে আমরা সুন্দর বলি। আর অজ্ঞানজবাদ অনুসারে, মূল্যের ধারণা ব্যক্তি নির্ভর। ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার জগতেই মূল্যের স্থান রয়েছে। সত্য, সুন্দর ও শুভ আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত আছে বলেই এদের মূল্য আছে।

৫. **পরম মূল্য ও আপেক্ষিক মূল্য:** যে মূল্যবোধ বা নৈতিক ধ্যান-ধারণা বিষয়কেন্দ্রিক ও সর্বজনীন তাকে পরম মূল্য বলে। এই মতবাদ অনুযায়ী, দেশ, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে নৈতিক মূল্যবোধের আবেদন চিরন্তন। যা সত্য তা সর্বকালে ও সর্বস্থানে সত্য, সবার কাছে একই রকম। অন্যদিকে, আপেক্ষিক মূল্যবোধ এমন একটি নৈতিক চেতনা যা দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে পরিবর্তনশীল। এ মত অনুযায়ী স্থান, কাল ও পাত্র নৈতিকতা বা সামাজিক মূল্যবোধ বিভিন্ন হয়ে থাকে।

৬. ড মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ২০০২), পৃ.৬৯৯।

৭. ড রশীদুল আলম, *দর্শন ও সাহিত্য* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২), পৃ.১৩২।

৮. ড. এম. আবদুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২।

9. Jaeqes P. Thiroux, *EthicsTheory and Practice* (California :Glencoe Publishing co. inc.) p.2.

10. S.John Mackenze, *A Manual of Ethics* (Delhi: Oxford University Press, 1993), P.1.

11. *Ibid.,* P.1

12. *Ibid.,* P.1.

evil. অর্থাৎ নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচার-আচরণের ভালোত্ব বা ঔচিত্য সম্পর্কিত আলোচনা। এটা মানুষের আচরণের ঔচিত্য-অনুচিত্য ও ভালো-মন্দ প্রবণতা বিষয়ে সাধারণ তত্ত্ব।

Morality শব্দের অর্থ সম্পর্কে *Oxford Advanced Learner's Dictionary* তে বলা হয়–Principles concerning right and wrong or good and bad behaviour.[১] অর্থাৎ নৈতিকতা হলো মানব আচরণের ন্যায্য-অন্যায্য বা ভালো-মন্দ সম্পর্কিত মূলতত্ত্ব।

Oxford Reference Dictionary তে বলা হয়েছে–"Morality- Principles concerning the difference between right and wrong, moral behaviour, the extent to which an action is right or wrong. "[২]

The World Book Dictionary তে বলা হয়েছে, "Moral, Ethical mean in agreement with a standard of what is right and wrong in character or conduct. "[৩] অর্থাৎ নৈতিকতা হলো এমন একটি আদর্শের সাথে একমত পোষণ করা যা মানুষের চরিত্র বা আচরণের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

P.W.Taylor বলেন,"Morality is a set of sowel rules and standards that guide the conduct of pople in a culture."[৪]

Ethics Theory and Practice গ্রন্থে বলা হয়েছে,

> Morality deals basically with humans and how they relate to other beings, both human and non-human. It deals with how humans treat other beings to promote mutual welfare, growth, creativity and meaning in a striving for what is good over what is bad and what is right over what is wrong."[৫]

ড. মু. আবদুল হাই ঢালী বলেন, নৈতিক মূল্যবোধ হল এক প্রকার নৈতিক চেতনা যার উৎস প্রকৃত অর্থে নীতিবোধ। আবার নীতিবোধ হল বিবেকপ্রসূত এক অভ্যন্তরস্থ শক্তি যা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের মধ্যে প্রভেদ করতে সক্ষম।[৬]

কারো কারো মতে, নৈতিক মূল্যবোধ হল মানুষের এমন একটি অনন্য অন্তর শক্তি, যা সাধারণত কোন না কোন একটি *নৈতিক আদর্শের*[৭] প্রতি একান্ত নিষ্ঠাকে বোঝায়। যা প্রতিটি ব্যক্তিকেই ভালো বা শুভের দিকে আকর্ষিত করে এবং মন্দ বা অশুভ থেকে বিকর্ষিত করে।

মোটকথা, মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্য ও কর্তব্য বিবেচনা করার একটি অন্তরশক্তি নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ। এটি এমন একটি অন্তরশক্তি যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, কর্তব্য নির্ধারণ, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? কোনটি ভালো ও করণীয় আর কোনটি মন্দ ও বর্জনীয়? তা নির্দেশ করার সাথে সাথে মানুষকে ভালো ও ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ ও অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে। সমাজে বসবাসকারী অপরাপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সংস্থা ইত্যাদির সাথে একজন মানুষের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তা নির্দেশ ও নির্ণয় করে।

উল্লেখ্য যে, নৈতিক ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল, ব্যক্তির ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ড ও আচরণ, যা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে চিন্তা -ভাবনা করে সম্পাদন করে। তাই মানব নিয়ন্ত্রণের বর্হিভূত, সহজাত কিংবা বাধ্যতামূলক বা আকস্মিক ক্রিয়া, অথবা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ক্রিয়া, যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় –তা নৈতিক বিচারের আওতা বহির্ভূত।

ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধঃ

নৈতিকতা বা Morality শব্দের আরবী প্রতিশব্দ الأَخْلاَقِيَة, যা আখলাক (اخلاق) শব্দের বিশেষণ।[৮] আখলাক (اخلاق) শব্দটি খুলুক (خُلُق) শব্দের বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ, মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রকৃতি, চরিত্র।[৯] রাগিব আল-ইসফাহানী (মৃ.৫০২হি.)বলেন–خَلَق(খালক), خُلُق(খুল্ক), خُلُق(খুলুক) মূলত এক ও অভিন্ন। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে خَلَق (খালক) শব্দটি দৃশ্য, অবায়ব ও আকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট। আর خُلُق(খুলুক) শব্দটি স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস-আচরণ সাথে সংশ্লিষ্ট।[১০]

---

1. Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (New york: Oxford University Press, Sixth edition, 2003-04) p.861.
2. Cathine Soanes, *Oxford Reference Dictionary* (New york: Oxford University Press, 2001) p.546.
3. *The World Book Dictionary* (Chicagoi: World Book, inc.2000), v.2, p.1350.
4. Paul.W. Taylor, *Problems of Moral Philosophy* (California : Dickenson Publishing co. inc., 2nd edition) p.6.
5. Jaeqes P. Thiroux, *Op.cit.*, p.8.

৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *নীতিবিদ্যা*, (ঢাকা: পুথিঘর লিমিটেড, ৩য় সং. ১৩৯৭ বং), পৃ.১৪৪।

৭. **নৈতিক আদর্শঃ** নৈতিক আদর্শ হল নৈতিক মূল্যবোধের নির্দিষ্ট একটি কাঠামো, যা নৈতিক জীবনের পথ-নির্দেশক কতগুলো মূল্যের তালিকা দেয় এবং সেই মূল্যকে বাস্তবায়নের পথের দিশারী পদ্ধতি বা উপায় দিয়ে দেয়। একটি নৈতিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই নৈতিকতার বা নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ পায় এবং এই অনুরাগ ও একনিষ্ঠতাই নৈতিক মূল্যবোধের সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

৮. মুনির বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ* (বৈরুত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৭৭), পৃ.৫৯২; HANS WEHR, *A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC* (New York: Poken Language Services, Inc.) p. p.258-59.

৯. আল-কুরআন, আল-ক্বালাম ৬৮: আয়াত ০৪, (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيم) خُلُق (খুলুক) শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ,২১০

ইসলামী নৈতিকতা বা আখলাকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী রহ. (মৃ. ৫০৫হি.) বলেন[১]–

আখলাক হচ্ছে অন্তরে বদ্ধমূল একটি প্রকৃতির নাম, যা দ্বারা ক্রিয়াকর্ম অনায়াসে ও চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায়। এই প্রকৃতির দ্বারা প্রকাশিত ক্রিয়াকর্ম যদি বিবেক ও শরীয়াতের দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট হয় তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় সচ্চরিত্র। পক্ষান্তরে, যদি তা দ্বারা মন্দ ক্রিয়াকর্ম প্রকাশ পায় তবে সেই প্রকৃতিকে বলা হয় অসচ্চরিত্র।

•আরবী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক আল-জাহিয (মৃ.২৫৫হি./ ৮৬৮খৃ.) বলেন-[২],

খুলুক নাফসের এমন এক অবস্থা যা দ্বারা মানুষ কোনরূপ চিন্তা-গবেষণা ও ইচ্ছা-অভিপ্রায় ছাড়াই কাজ করতে পারে। কোন কোন মানুষের মধ্যে খুলুক থাকে স্বভাবজাত, আর কারো কারো মধ্যে তা চেষ্টা-সাধনা ছাড়া সৃষ্টি হয় না।

•মুসলিম দার্শনিক ইবন মাসকুয়াহ (মৃ.৪২১হি.) বলেন-[৩],

আখলাক মানব প্রকৃতির এমন একটি অবস্থা যা কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে কাজের প্রতি আহবান জানায়। আর এ অবস্থা দু'ধরনের। ক). যা স্বভাবগতভাবেই পাওয়া যায়। যেমন সামান্য বিষয় মানুষকে আন্দোলিত করে, যথা-উষ্মা, এটা উত্তেজিত হয় সামান্য কারণে। খ). যা অভ্যাস বা অনুশীলন ছাড়া অর্জিত হয় না।

•আল-জুরজানী (মৃ.৮১৬হি.) বলেন-[৪],

খুলুক বলা হয়, মনের এমন এক প্রবল অবস্থাকে, যদ্বারা অতি সহজে চিন্তা-ভাবনার প্রতি কোন রকম প্রয়োজন ছাড়াই কার্যাদি প্রকাশ পায়, আর সুন্দর চরিত্রের এ অবস্থাকে বলা হয় উত্তম চরিত্র। আর যদি উৎস থেকে অসুন্দর কর্ম উৎসারিত হয়, তবে সে অসুন্দর চরিত্রের উৎসকে বলা হয় মন্দ চরিত্র।

•কারো কারো মতে–[৫] "মানুষের দৈনিক কাজ-কর্মের মাধ্যমে যে সব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায়, সে সবের সমষ্টি হলো আখলাক।"

আখলাক একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সামাজিক জীব হিসেবে মানব চরিত্রের প্রতিটি দিকই আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত আখলাকের ক্ষেত্র বিস্তৃত। মানব চরিত্রের সৎ ও অসৎ গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে আখলাক দু'ধরনের[৬]: ক.*আল-আখলাক আল-হাসানা*(সৎ চরিত্র); খ.*আল-আখলাক আস-সায়্যাআ*(অসৎ চরিত্র)।

কুরআন ও সুন্নাহ[৭]তে উল্লেখিত ভালো গুণাবলী মানব চরিত্রে বিদ্যমান থাকলে তা *আল-আখলাক আল-হাসানা*। যেমন, সততা, সত্যবাদিতা (সিদক), ধৈর্য (সবর), সদাচার (ইহসান), সৃষ্টির সেবা (খিদমাতে খালক), ইত্যাদি *আল-আখলাক আল-হাসানার* অন্তর্ভুক্ত। আর কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক যেসব গুণাবলীকে মন্দ সাব্যস্ত করেছে এবং যেগুলো মানুষকে হীন ও ইতরে পরিণত করে তা *আল-আখলাক আস-সায়্যাআ*। যেমন: মিথ্যা (কিযব), কপটতা (নিফাক), কৃপণতা (বুখল), গীবত, খিয়ানত, ইত্যাদি *আল-আখলাক আস-সায়্যাআর* অন্তর্ভুক্ত। এই উভয় প্রকার আখলাকের কিছু স্বভাবগতভাবেই মানুষের মধ্যে থাকে, আর কিছু অনুশীলন বা চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।

মানব জীবনে আখলাকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আখলাক ব্যক্তির চালিকাশক্তি। আখলাক এমন এক শক্তি যা মানুষের আকাঙ্খা পূরণকে ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ নির্দেশ করে, মানুষকে বৈধ-অবৈধ সীমারেখার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং তা অন্যায় ও অবৈধ পথে অর্জন থেকে বিরত রাখে। এই নৈতিক শক্তি মানব মনের পাশবিক প্রবৃত্তি ওপর লাগাম পরিয়ে দেয়। তা শুধু মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত রাখার নির্দেশ করে না, বরং মানুষকে উন্নত ও মহান উদ্দেশ্যে এবং তাৎক্ষণিক পার্থিব ভোগ-বিলাসের পরিবর্তে উন্নত ও চিরস্থায়ী আখিরাতের মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে। এটা তাৎক্ষণিক পার্থিব সুবিধা কামনা করে না। এটা মানুষের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ পরিবর্তে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে শেখায়। এই নৈতিক শক্তিই কেবল মানব সভ্যতার সম্মুখে সত্যিকার অর্থে উন্নতি ও প্রগতির পথ খুলে দিতে পারে। তাই চরিত্র ভালো হলে ব্যক্তি ভালো হয়। আর চরিত্র মন্দ হলে ব্যক্তি মন্দ হয়। এজন্যই বলা কুরআনে হয়েছে[৮]- وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ

---

১. মূল আরবী ভাষ্য: فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا -আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, (বৈরুত: দার আল-মা'রিফাহ, তা.বি) খ. ৩য়, পৃ.৫৩।

২.মূল'আরবী ভাষ্য: الخُلُق : هو حال النفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار ، والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعا ، وفي بعضهم لايكون إلا بالرياضة والاجتهاد ، -আল-জাহিয, *তাহযীব আল-আখলাক* (সৌদী আরব: দারুস সাহাবাহ, ২য় সং, ১৯৯২) পৃ.১০।

৩.মূল 'আরবী ভাষ্য: [الخلق حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية ولا روية. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه أو يرتاع من خبر يسمعه وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله، ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا. -ইবন মিসকাওয়াহ, *তাহযীব আল-আখলাক*,আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ,(http://www.alwarraq.com) ২য় সং. পৃ.১০।

৪.মূল 'আরবী ভাষ্য: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سيئا -আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫হি.) পৃ.১৩৬।

৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, (ঢাকা: ই ফা বা, ১০ম সং, ২০১২) পৃ.৭১৪-৭১৫।

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১৫।

৭. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, সুন্নাহ হলো, নাবী সা. এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও চারিত্রিক গুণাবলি অথবা তাঁর জীবন চরিতকে বুঝায়।

৮. আল-কুরআন, ০৭: আয়াত ৫৮।

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ "আর উত্তম ভূমি–তার ফসল বের হয় তার রবের অনুমতিতে। আর যা নিকৃষ্ট, তাতে তো কমই উৎপন্ন হয়। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি নানাভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য।"

আখলাকই দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য। যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণকে আখলাক বা চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে যে সব মৌলিক দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তন্মধ্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য তিনি বলেছেন, '*আমি উন্নত নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।*'[১] মূলত ধার্মিক হওয়ার জন্য মৌলিক উপাদান হলো উত্তম চরিত্র। উত্তম চরিত্রবান তথা ভালো মানুষ হওয়া ছাড়া ধার্মিক হওয়া যায় না। চরিত্রের উপরই মানুষের ধার্মিকতা গড়ে উঠে। চরিত্রের দিক থেকে যে অধিক অগ্রসর, ধর্মের দিক দিয়েও সে অধিক অগ্রগামী। নাবী কারীম সা. যথার্থই বলেছেন, '*তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে চরিত্রে সবচেয়ে উত্তম।*'[২] অন্যত্র বলেন, *তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সর্বোত্তম কিয়ামতের দিন সে হবে আমার প্রিয়পাত্র এবং তোমাদের মধ্যে তার আসন হবে আমার অধিক নিকটবর্তী।*[৩] আরও বলা হয়েছে, *উত্তম চরিত্রই পূণ্যশীলতা।*[৪]
এই আখলাকের মূলকথা হলো এক উন্নত ও চিরন্তন অবিনশ্বর সত্তা মহান আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর সন্তোষ অর্জন করার লক্ষ্যে তাঁর রাসূল আনীত জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাঁর (আল্লাহর) গুণে গুণান্বিত হওয়া।

ইসলামী নৈতিকতা বা মূল্যবোধের উৎপত্তি, ভিত্তি, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও স্বরূপ-প্রকৃতি:
আল-কুরআন প্রদত্ত একটি অত্যাধুনিক, পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। আল-কুরআনের উপর ভিত্তি করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। ইসলামী নীতিদর্শন তার একটি। ইসলামী নীতিদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল-আখলাক তথা মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। এটি আল-কুরআনের একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল-কুরআনের প্রায় সর্বত্রই এর সুর ধ্বনিত হয়েছে। আল-কুরআনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে এ সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৫] মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ মাহমুদ শালতূত– এর মতে–'আল-কুরআনের বক্তব্যসমূহ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ক. আকীদা(বিশ্বাস) সংক্রান্ত বিষয়, খ. আখলাক (নৈতিক চরিত্র) সংক্রান্ত বিষয়, গ. আহকাম (বিধি-বিধান) সংক্রান্ত বিষয়।[৬]

প্রথম মানব আদম ('আ.) এর মাধ্যমে ইসলামী নৈতিকতার সূত্রপাত হয়। আদম ('আ.) কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ তাঁকে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন, যার মধ্যে ভালো-মন্দ ও নৈতিকতা বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৭] নৈতিকতার বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে আদম ('আ.) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া ('আ.) কে জান্নাতে (নিষিদ্ধ বৃক্ষ বর্জন সম্পর্কিত) নৈতিক নির্দেশ প্রদান করা হয়।[৮] আদম ('আ.) ও হাওয়া ('আ.) এর নৈতিক বিচ্যুতি ঘটার পর তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাওবা ও সংশোধনের পর নতুনভাবে পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য তাদের প্রতি আবারও নৈতিক বিধি-বিধান প্রদান করা হয়।[৯] আদম আ. এবং তাঁর সন্তানদের মধ্যে নৈতিকতা চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে।[১০] আদম আ. এর পরবর্তীতে যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ আসমানী কিতাবের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধন করেন। আল-কুরআনে উল্লেখিত নাবী-রাসূলগণের মধ্যে নূহ('আ.), হূদ ('আ.), সালিহ ('আ.), ইব্রাহীম ('আ.), লূত ('আ.), ইসমাঈল('আ.), ই'য়াকুব ('আ.), ইউসুফ ('আ.), মূসা ('আ.), দাউদ ('আ.), সুলায়মান ('আ.), শু'আয়িব ('আ.), যাকারিয়া ('আ.), ইয়াহহিয়া ('আ.) ও 'ইসা ('আ.) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে এই ধারার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিকাশ সাধিত হয়। মানব জাতির সার্বিক জীবনের পথনির্দেশ প্রদান করে তাঁর প্রতি নাযিল করা হয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। কালোত্তীর্ণ ও সর্বজনীন এই গ্রন্থে প্রদান করা হয় মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিধি-বিধানসহ সর্বকালের উপযোগী জীবন বিধান। এতে বহুবিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ঘটলেও জীবনাচরণ, আদর্শ, নীতিবোধ ও চারিত্রিক বিধানাবলী বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

---

[১].মূল আরবী [بعثت لأتمم حسن الأخلاق] মালিক ইবনু আনাস, *আল-মুয়াত্তা*, তাহক্বীক, মুহা. ফুয়াদ আবদুল বাকী (মিসর: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), কিতাবু হুসনিল খুলক, হাদীস নং ১৬০৯; বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত : দারুল বাশায়িরিল ইলমিয়্যাহ,৩য় প্রকাশ ১৪০৯হি.) কিতাবু হুসনিল খুলক, হা.১১৯।
[২].মূল আরবী [إن من خياركم أحسنكم أخلاقا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং ৩৩৬৬।
[৩].মূল আরবী [إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا] আবূ' ঈসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, তাহক্বীক, আহমাদ শাকির ও অন্যান্য (বৈরুত : দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.নং ২৯০৬।
[৪].মূল আরবী [البر حسن الخلق] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, তাহক্বীক, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ২৫৫৩। [বি.দ্র.এটি পুনরাবৃত্তি ছাড়া সংকলন, তাই প্রচলিত অন্য সংকলনের সাথে এর হাদীস নং মিলবে না]
[৫].দেখুন, আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী রচিত '*জাওয়াহিরুল কুরআন*'। গ্রন্থকার এ গ্রন্থে আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর সৃষ্টিরাজি বিষয়ে ৭৬৩ টি আয়াত এবং আল-আখলাক সম্পর্কিত ৭৪১ টি আয়াত এনেছেন। এছাড়া আল-কুরআনের বিধি-বিধান সম্বলিত ৫০০ আয়াতের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে *আহকামুল কুরআন*। এভাবে আল-কুরআনের প্রায় একচতুথাংশ জুড়ে মূল্যবোধ বা নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।
[৬]. মাহমুদ শালতূত, *ইলাল কুরআনিল কারীম*, (বৈরুত : দারুশ শুরক, ১৯৮৩), পৃ.০৫।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩১।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩৫।
[৯].আল-কুরআনে বলা হয়েছে (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) 'অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যখন হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগ্যেও নিমজ্জিত হবে না'। আল-কুরআন ২০:১২৩, আরও দেখুন, আল-কুরআন,০২: ৩৮।
[১০]. দেখুন- আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ: আয়াত ২৭-২৮।

উৎস ও ভিত্তি: আল-কুরআন ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের মূল উৎস ও ভিত্তি। এতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ, পারিবারিক জীবনাচরণ, সামাজিক আচার-আচরণ, সমাজের সদস্য হিসেবে অন্য সকলের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, অর্থনৈতিক লেন-দেন, শাসক-শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক, যুদ্ধ-শান্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে।[১] এতে নৈতিক চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইসলামী নীতিশাস্ত্র।এ সম্পর্কে M.M. Sharif (মৃ.১৯৬৫ খৃ.)বলেন[২],

> The Quran gave Muslims a new ethics and a new political theory and a new philosophy- a practical ethics, a democratic politics and a monotheistic philosophy. …The Quran did indeed chain and fetter it.

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে আস-সুন্নাহ বা আল-হাদীস[৩] ইসলামী মূল্যবোধের দ্বিতীয় উৎস। স্বয়ং আল-কুরআন আস-সুন্নাহ বা আল-হাদীসকেও ওহী ও নৈতিক আদর্শ গণ্য করা হয়েছে।[৪] আস-সুন্নাহ তথা রাসূল সা. এর জীবনাদর্শ ইসলামী নৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, এ কারণে যে 'রাসূল সা. ছিলেন আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।'[৫] তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে সুন্নাহর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এজন্যই আল-কুরআন 'মুহাম্মাদ সা. কে মানব জাতির জন্য উত্তম চরিত্রের নমুনা ঘোষণা করেছে।'[৬]

আল-কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তি হলেও ইজতিহাদ[৭] এর ভূমিকা এখানে উপেক্ষণীয় নয়।[৮] সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে আল-কুরআন ইজতিহাদ তথা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৯] তাই নৈতিক মানদণ্ডের ক্ষেত্রে সুস্থ বিবেক ও আল্লাহ্‌র বিধানের অনুকূল বিচার-বুদ্ধি (ইজতিহাদ) কুরআন স্বীকৃত একটি দিক। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে যুগপোযোগী করে ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ তথা সুস্থ বিবেকের প্রয়োগের ভূমিকা অপরিসীম। বরং প্রত্যাদেশ ও প্রজ্ঞার সমন্বয় সাধিত হওয়ায় ইসলামী নৈতিকতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ কারণে ইসলামী নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ, সুদৃঢ়, সঠিক ও ত্রুটিমুক্ত। ইসলামী নৈতিকতার বুনিয়াদ সম্পর্কে ড. খলিফা আবদুল হাকীম বলেন–

> ইসলামী নীতিবিদ্যা একটি সাধারণ লৌকিক বা পার্থিব নীতিবিদ্যা নয়। ইসলামের মতে, নৈতিকতার মূল বা গোড়াপত্তন হলো আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও বিশ্বাসের উপর। তাই যখনই কুরআন আদর্শ মানব সম্বন্ধে বলে, তখন তাঁকে প্রথমেই এক করুণাময় পরম সত্তায় বিশ্বাসী হিসাবে দেখায়, যে সত্তা জীবনের মূল্যমানগুলোকে সৃষ্টি ও ধারণ করে। কুরআন একে মৌলিক ও সামগ্রিক বিশ্বাস বলে ধরে নেয়, যা থেকে সব জ্ঞান ও সব পূণ্য অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে আসে। দার্শনিকভাবে বিবেচনা করলে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক মূল্যমানগুলোর বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাস। নিতান্ত সাধারণ লৌকিক নৈতিকতা পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত নয়।.... লৌকিক বা পার্থিব নৈতিকতা মানব জীবনের একটা ক্ষীণতম ফলমাত্র ও একে নৈতিকতা সম্বন্ধে উদাসীন, এমনকি নৈতিকতা বিরোধী, বিশ্বের সাথে মুকাবিলা করতে হয়। মূল্যমান বিধ্বংসী বিশ্বের মুকাবিলায় পুণ্যবান ও সাহসী হতে হয়, কিন্তু পুণ্যবান হওয়ার মত হৃদয় কত জনের আছে? সব প্রকৃত মূল্যমান–সত্য, মঙ্গল, সৌন্দর্য ও সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মায়া নয়– বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাতীত সত্তা–এ বিশ্বাসের উপরই ইসলামী নীতিবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত।[১০]

আলোচ্য বিষয়/বিষয়বস্তু : আল-কুরআন দর্শনের গ্রন্থ না হলেও এতে দর্শনের অনেক মৌলিক বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে পরম সত্তা বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌, সৃষ্টি জগত, মানুষ, আত্মা, আত্মার অমরত্ব, মৃত্য, মৃত্যু পরবর্তী জীবন, পরকালীন জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এতে মানুষ ও আল্লাহ্‌র সম্পর্ক, মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। এতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য, অর্থনৈতিক লেন-দেন, শাসক-শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক, যুদ্ধ-শান্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে নৈতিক নীতিমালা দেওয়া হয়েছে। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর এখানে নৈতিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে কুরআন মানব আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিক বিষয়াবলীর ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক পর্যালোচনা করে। আল্লাহ্‌র

---

[১] . আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল : আয়াত ৮৯। এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ৬:৩৮ ও ১৬: ৬৪।

[২].M.M. Sharif, *Muslim Thought:Its Origin and Achievements*, edited, Ateeb Gul(USA: Boston University, Open Boston), p.38.

[৩]. হাদীস শব্দের শাব্দিক অর্থ নতুন কথা, বাণী। পরিভাষায় মহানাবী সা. এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে আল-হাদীস বলা হয়।

[৪]. স্বয়ং কুরআনে হাদীসকেও ওহী ও নৈতিক আদর্শ গণ্য করা হয়েছে। [দেখুন, আল-কুরআন ৫৩:৩-৪, ৫৯:০৭, ৩৩:২১]

[৫].মূল আরবী [كان خلقه القرآن]- *ইমাম আহমাদ* ইবন হাম্বল (রহ.), *মুসনাদ* (আল-কাহিরাহ: মুআসসাত কুরতুবাহ, তা.বি.) খ.৬, পৃ.৯১, হা.নং ২৪৬৪৫।

[৬]. আল-কুরআন(সূরা আল-আহ্‌যাব: আয়াত ২১)(সূরা আল-ক্বালাম: আয়াত ০৪) ।

[৭].ইজতিহাদ:যে সকল নতুন উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না তার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুসরণ করে বের করে নেয়ার জন্য একনিষ্ঠ সাধনাকেই ইজতিহাদ বলা হয়।-ড.মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, *ইল্‌মুত তাফসীর ইল্‌মুল হাদীস ও ইল্‌মুল ফিক্‌হ*(গবেষণাপত্র সংকলন-১,) ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃ.১৪৪]

[৮].রাসূলুলাহ সা. যখন মুয়াযকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: যদি তোমার কাছে কোনো বিচারের দায়িত্ব আসে তাহলে কী-ভাবে বিচার করবে? মুয়ায বলেন: আমি আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা বিচার করব। তিনি প্রশ্ন করেন: যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে (তোমার বিধান) না পাও? মুয়ায বলেন : তাহলে রাসূলুলাহ সা. -এর সুন্নাত দ্বারা (বিচার করব)। রাসূলুলাহ সা. বলেন: যদি আল্লাহ্‌র কিতাবে বা সুন্নাতের মধ্যে (তোমার নির্দিষ্ট কোনো বিধান) না পাও? মুয়ায বলেন: তাহলে আমি সর্বাত্মকভাবে আমার বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রয়োগ করে ফয়সালা প্রদানের চেষ্টা করব। তখন রাসূলুলাহ সা. তাঁর বুকে থাবা দিয়ে বলেন: "আল-হামদুলিল্লাহ, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি রাসূলুলাহ সা. -এর প্রতিনিধিকে তৌফিক প্রদান করেছেন এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যা রাসূলুলাহ পছন্দ করেন।"–সুনান তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ১৩২৭।

[৯]. দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌'আম: আয়াত ৫০, আল-কুরআন ১০:১০০। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে প্রায় ৪৬টি আয়াত পাওয়া যায়।

[১০] .ড.খলিফা আবদুল হাকীম, *ইসলামী ভাবধারা*, অনু. সাইয়েদ আবদুল হাই, (ঢাকা: আল হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৪) পৃ. ১৫৩-১৫৪।

প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের জন্য করণীয় দায়-দায়িত্ব নিয়েও আলোচনা করে। কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ মন্দ তার দিক-নির্দেশনা কুরআনে প্রদান করেছে। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে ভালো-মন্দ কাজের বর্ণনা রয়েছে। কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ মন্দ তার দিক-নির্দেশনা আল-কুরআনে প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে ভালো ও মন্দ কাজের বর্ণনা এবং ভালো-মন্দের ধারণা ও মানদণ্ড বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ভালো বিষয়সমূহকে করণীয় স্থির করে তা পালনের নির্দেশ দিয়েছে ও মন্দ বিষয়সমূহকে অবৈধ ঘোষণা করে তা বর্জনের তাকিদ দিয়েছে। এ মর্মে বলা হয়েছে-[১] (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) "নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"
উল্লেখিত আয়াতে সংক্ষেপে ভালো-মন্দ কাজের বর্ণনা তুলে ধরে মানুষকে নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুরআনে এ ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে।[২] কুরআনের ভালো-মন্দের এ সব দিক-নির্দেশনা থেকে মানব জীবনের কর্মকাণ্ড ও আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত –তা প্রণয়ন এবং এসবের যৌক্তিকতা ও বাস্তব উপযোগিতা যাচাই করা ইসলামী নীতিবিদ্যার কাজ।

বস্তুত ইসলামী নৈতিকতার ধারণা আল-কুরআন প্রদত্ত কতিপয় মৌলবিশ্বাস ও নীতিমালাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্যঃ ১. আল্লাহ তা'য়ালাই একমাত্র রব [স্রষ্টা, প্রতিপালক, রক্ষক ও সংহারক] ও সত্যিকার ইলাহ [উপাস্য] এবং সকল সত্য, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের চূড়ান্ত উৎস। ২.মানুষ আল্লাহর এক দায়িত্বশীল ও সম্মানিত প্রতিনিধি। ৩. আল্লাহ আসমান ও জমীনের সবকিছু মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। ৪. আল্লাহ স্বীয় দয়া ও বিচক্ষণতার কারণে মানুষের কাছ থেকে সামথ্যের বাইরে কোন কিছু প্রত্যাশা করেন না, কিংবা তার ক্ষমতা বর্হিভূত ও সামথ্যের বাইরের কোন জিনিসের জন্যও তাকে দায়ী করেন না, অনুরূপভাবে তিনি জীবনের সুন্দর জিনিসগুলোকে উপভোগ করতে বারণ করেন না। ৫. নীতিগতভাবে সব জিনিস অনুমোদিত, তবে ব্যতিক্রম শুধু এই যে, যা স্পষ্টতঃ বাধ্যতামূলক তা অবশ্যই পালনীয়, আর যা স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ তা অবশ্যই বর্জনীয়। ৬.মানুষ চূড়ান্তভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী, [মানুষের দায়িত্ব হল সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা এবং তাঁর নির্দেশিত পন্থায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা] এবং তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করা।[৩]

আল-কুরআন ইসলামী নৈতিকতার মূল উৎস। এটা মানব জাতির জন্য মহাউপদেশ।[৪] এতে মানুষের কল্যাণের জন্য ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, করণীয়-বর্জনীয়, পাপ-পূণ্য, উচিত-অনুচিত, ও সঠিক-ভ্রান্ত পথ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনটা শান্তির পথ, কোনটা অশান্তির পথ, কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ এবং কিসে মুক্তি ও কিসে ধ্বংস তাও এতে বর্ণিত হয়েছে। এ সব বিষয় সরাসরি আদেশ বা উপদেশ আকারে কিংবা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ মানুষের জন্য ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, বৈধ-অবৈধ ও করণীয়-বর্জনীয় বিষয়সমূহ স্থির করেছেন। মানুষ যাতে শান্তি, কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভে সক্ষম হয় এবং মন্দ, অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে মুক্তি পায় সেজন্য তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআনের বিস্তৃত অংশ জুড়ে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে নৈতিকতা বিষয়ে এমন তত্ত্ব, আদর্শ ও মানদণ্ড উপস্থাপন করা হয়েছে যা নির্ভুল, বাস্তবসম্মত, সর্বজনীন ও অতুলনীয়। মহান আল্লাহ্ বলেন-[৫] (هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ) "এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য সৎপথের দিশারী ও উপদেশ।" অন্যত্র বলেন-[৬] (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) "নিশ্চয় এটা (কুরআন) তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদের (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে।" অন্যত্র আরও ইরশাদ করেন-[৭], (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم - فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ - إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) "আর এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয়। সুতরাং তোমরা যাচ্ছ কোথায়? এতো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ নয়।" -উল্লেখিত আয়াতসমূহে কুরআনকে নৈতিকতার উৎস হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আল-কুরআন যে নৈতিকতার মূল উৎস এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন-[৮] [إن هذا القران مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدب] "আল-কুরআন আল্লাহর শিষ্টাচারের পাত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহর শিষ্টাচারের পাত্র থেকে গ্রহণ কর।"

আল-কুরআনে বা ইসলামে নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়সমূহের আলোচনা ভালো-মন্দ(الخير-الشر/الطيب-الخبيث), মা'রূফ[৯]-মুনকার[১](المعروف-المنكر), বির্র-ইছম(البر-الإثم), সালিহাত-সায়্যেয়াত(الصلحات-السيئات), হালাল-হারাম(الحلال-الحرام)

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : আয়াত ৯০; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৭:১৫৭; ৬:১৫১-১৫২, ১৭:২২-৩৮, ২৩:১-৯, ২৫:৬৩-৭৩, ৩১: ১৩-১৯, ৪৯:৬, ১০-১৩, ৭০:১৭-৩৫।

[২] . দেখুন, আল-কুরআন ৬:১৫১-১৫২, ১৭:২২-৩৮, ২৩:১-৯, ২৫:৬৩-৭৩, ৩১: ১৩-১৯, ৪৯:৬, ১০-১৩, ৭০:১৭-৩৫।

[৩] . হামমুদাহ আবদাল 'আতি, *ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান*, অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (ঢাকা:খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৪) পৃ. ৫৬-৫৭।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহঃ আয়াত ০২, ১৮৫, এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ৩:১৩৮, ৬:১৫৭।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৩৮।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ : আয়াত ৪৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাকভীর : আয়াত ২৫-২৭। এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ৬: ৯০, ৪৩: ৪৪, ৬৮: ৫২. ৩৮: ৮৭, ৫০: ৩৭।

[৮]. *মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম* (জেদ্দা: দারুল ওসীলাহ লি নাশরি ওয়াত তাওযী') খ.০২, পৃ.১৪১।

[৯].মা'রূফ হলো এমন কাজ যা ইসলামী শরীয়াতে প্রশংসিত এবং শরীয়াতের অনুসারীদের কাছে পরিচিত। (*তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.৪৯৭)।

ও ইতিবাচক-নেতিবাচক এই দু'ভাবে করা হয়েছে।[২] আল-কুরআনে ভালো, উত্তম ও নৈতিক বিষয়গুলো খায়ির, সালিহাত, হাসানাত, বির্র, মা'রূফ, হালাল ইত্যাদি শব্দে এবং মন্দ, অনৈতিক ও অকল্যাণর বিষয়গুলোকে শার্র, মুনকার, হারাম, সায়্যেয়াত, ইছম ইত্যাদি শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] তন্মধ্যে হালাল ও ইতিবাচক বিষয়সমূহ সত্তাগতভাবে ভালো ও মানুষের জন্য কল্যাণকর। আর হারাম ও নেতিবাচক বিষয়সমূহ সত্তাগতভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও মন্দ।
হাদীসে ভালো-মন্দের একটি সর্বজনীন পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল সা. এর নিকট পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন[৪]–"সৎ চরিত্রই হলো পূণ্যের কাজ, আর পাপ হলো–যে কাজ মনের মধ্যে খটকা সৃষ্টি করে এবং এ কাজ সম্বন্ধে কেউ অবগত হোক তা অপছন্দ করা।" ইসলাম ব্যক্তির ভালো-মন্দের নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দকে মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেছেন-[৫], "তোমাদের মধ্যে ভালো হচ্ছে যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে মন্দ হচ্ছে যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।"

মানুষের সুস্থ মন, শান্তিময় আত্মা ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে এবং মানুষকে অধঃপতন, অশালীনতা, দুর্বলতা ও কুপ্ররোচনা থেকে রক্ষার জন্য এই বিধি-নিষেধ ও ভালো-মন্দের নিরূপণ। ইসলাম অযৌক্তিকভাবে বা কুসংস্কারের বশে কোন কিছু বিধি-নিষেধ দেয়নি। আর হারাম ঘোষণার মাধ্যমে মানুষকে কোন ভালো কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি। বরং মানুষের আত্মিক ও মানসিক কল্যাণ বিধান, মানুষকে সর্ববিধ অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা, তার মধ্যে ভালো-মন্দের একটি সুন্দর পার্থক্যবোধ, উৎকৃষ্ট বস্তুর জন্য একটি মার্জিত রুচিজ্ঞান এবং তার নৈতিক ও বৈষয়িক হিত সাধনের লক্ষ্যেই আল্লাহ এই হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য–ব্যবস্থা নয় অথবা কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা মানবতার কল্যাণ বিধানে মানুষের প্রতি সযত্ন মনোভাবেরই একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।[৬]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ইসলামের নৈতিক বিধানের মূল লক্ষ্য হলো, ইহকাল ও পরকালে ব্যক্তি ও সামষ্টিকভাবে সকলের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ, স্বচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্ম ও জীবনের প্রতি সংগতি বিধান। মানুষকে নিজের ও আল্লাহর প্রতি তার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা। এজন্যই ইসলামে নির্দেশিত সব আচার-অনুষ্ঠানেই এমন আধ্যাত্মিক দিক লক্ষণীয়, যা মানবাত্মার বিকাশ ও পূর্ণতা বিধানে সচেষ্ট। এ সম্পর্কে ড. জামাল আল-বাদাবী বলেন-[৭]

> ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করাবার মাধ্যমে ইসলামী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা। এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা যা আল্লাহ্ প্রেমে পরিপুষ্ট, যার কর্মতৎপরতা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং মন্দ কাজের প্রলোভন থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তিত্ব তার উপর অর্পিত আল্লাহ্‌র খিলাফাতের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেষ্ট। সে দায়িত্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সরল, স্বচ্ছ এবং ভ্রান্তিমুক্ত। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ইসলামের নৈতিক বিধানের লক্ষ্য শুধু ব্যক্তির আত্ম উন্নয়নই নয় বরং ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যষ্টির তথা গোটা সমাজের ন্যায়, সাম্য ও সুবিচার কায়েমের এবং অবিচার ও অসত্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নিবেদিত। কাজেই এর লক্ষ্য অনেক সুদূরপ্রসারী যা আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে গোটা সমাজের সবার সমবেত অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি আনে।

ইসলাম মতে, জন্মগতভাবে মানুষ নৈতিক সত্তা। মানুষের সত্তার মধ্যে এক সুপ্ত নৈতিক চেতনা লুকিয়ে থাকে।[৮] উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ব্যক্তি তার নৈতিক আদর্শ ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করতে পারে। প্রত্যেক মানুষ ভালো, নিষ্পাপ, শান্তিপ্রিয় স্বভাবের উপর জন্ম গ্রহণ করে। হাদীসের ভাষায়-[৯] "প্রত্যেক মানুষ ফিতরাত (ভালো, নিষ্পাপ ও ইসলামের স্বভাব) এর উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খৃষ্টান বানায়।" তাই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ সৃষ্টি করা এবং শক্তির উৎস হিসেবে তাকে তার নিজের সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই ইসলামের নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য।

ইসলামী ধারণায়–মানব প্রকৃতিতে উচ্চতর ও নিম্নতন দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উচ্চতর দিকটি মানুষকে নিয়ে যায় উপরের দিকে, আর নিম্নতন দিকটি তাকে চালিত করে নীচের দিকে। তাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত মনের নিম্নতন আবেগ ও রিপুকে উচ্চতর শক্তি দ্বারা জয় করা। এদিক থেকেই মানুষকে অভিহিত করা হয় নৈতিক দায়িত্ব সম্বলিত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক

---

[১].মুনকার হলো যা ইসলামী শরীয়াতে অপছন্দনীয় এবং শরীয়াতের অনুসারীদের কাছে অপরিচিত। (*তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.৪৯৭)।

[২]. ইসলামে হালাল-হারাম ও ইতিবাচক-নেতিবাচক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ১.মুবাহ/হালাল–যা সাধারণভাবে অনুমোদিত। ২.ফরজ–যা পালন করা মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক, যেমন-সালাত, সাওম ও সুবিচার ইত্যাদি। ৩.মুস্তাহাব/নফল–এমন বাঞ্ছিত বিষয় যা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক নয়, যেমন-সাধারণ দান। ৪.হারাম-যা মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেমন,ঘুষ ও ব্যভিচার ইত্যাদি। ৫.মাকরূহ-যা অপছন্দনীয় এবং যা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন, ধুমপান।

[৩]. আল-কুরআন ২:২৬৭; ৩:১০৪; ৫:২,১০০; ১০:৫৯; ২৭:৮৯-৯০; ৪৫:২১; ৯৯:৭-৮।

[৪].মূল আরবী [سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البر والإثم ؟ فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৫৩।

[৫].মূল আরবী[خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجي خيره ولا يؤمن شره] *মুসনাদ আহমাদ*, খ.০২, পৃ.৩৭৮, হা. নং ৮৯০৭।

[৬]. দেখুন, হামমুদাহ আবদাল 'আতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৮-৫৯।

[৭].ড. জামাল আল-বাদাবী, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, অনু: ডা. আবু খলদুন আলমাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট,২০০৮) পৃ.১৬৮।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শাম্‌স ৯১: আয়াত ০৭-০৮।

[৯].মূল আরবী [كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১৩১৯।

সত্তা। সব রকম ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই তাকে বিকাশিত করতে হয় তার সুপ্ত শক্তিসমূহকে। মানুষ শুভ ও অশুভ এদুটি বিপরীত প্রবণতার যুদ্ধক্ষেত্র স্বরূপ। তার সত্তার একাংশ ফিরিশতাদের চাইতে উচ্চতর এবং অবশিষ্টাংশ ইতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। জীবাত্মাকে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করাই মানব জীবনের লক্ষ্য।[১] আর ইসলামী নৈতিকতা ব্যক্তিকে এই লক্ষ্যেই উপনীত করে।

প্রকৃতি: ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী নৈতিকতাও সহজ-সরল, জটিলতা মুক্ত, বিবেক সম্মত, ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও বৃহত্তর মানব কল্যাণের জন্য প্রদত্ত। ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ায় তা যেমন সর্বকালের উপযোগী জীবন ব্যবস্থা তেমনি ইসলামী নৈতিকতা বিশেষ কোন কালের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জীবনের যে কোন গতিশীল অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। ইসলামী নৈতিকতার প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে–'ইসলামী নৈতিকতায় মানব জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী সেই বিধি-ব্যবস্থায় রয়েছে–ক). কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন। খ). বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে কর্ম সম্পাদন। গ). আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।'[২]

স্বরূপ: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। তাই এর নৈতিক নীতিমালা পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন। অন্যান্য ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিক বিধানের চেয়ে ইসলামের নৈতিক বিধান পৃথক, সম্পূর্ণ নিজস্ব ও পূর্ণাঙ্গ। এতে মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলাম কেবল বিশেষ কোন ব্যক্তি, দেশ বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর কল্যাণ চিন্তা করে না। ইসলাম ব্যক্তিকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে জোর দেয় বটে। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে গোটা মানব সমাজ। আর সমাজ দ্বারা বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে বুঝায় না বরং গোটা বিশ্বমানবের সৌভ্রাতৃত্বকে বোঝায়। এজন্য কেবল ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর আর সমষ্টির জন্য ক্ষতিকর, এমন কোন মূল্যমানকে কুরআন স্বীকার করে না। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৩]–(مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) "অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"
এখানে জীবন রক্ষা একক ব্যক্তির প্রশ্ন নয়। কারণ সৃষ্টি ও স্বভাবগত দিক থেকে প্রত্যেক মানুষই আদম সন্তান। তাই যে একজন মানুষের জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো।

ইসলামী নৈতিকতার মুখ্য বিষয় সমাজের বৃহৎ মানুষের স্থায়ী ও সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করা। তাই সাময়িকভাবে কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হলেও যদি বৃহৎ মানুষের স্থায়ী ও সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয় সে ব্যাপারে ইসলাম অনুমতি দেয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি ও ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকরে কিংবা জিহাদ বা যুদ্ধে সাময়িকভাবে কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যা সত্তাগতভাবে ভালো নয়। কিন্তু এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয় হলো, সমাজের অন্যায়-অসত্যের মূলৎপাটন, সত্য-ন্যায় ও শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। তাই ইসলামী নৈতিক বিধান তথা হালাল-হারাম ও করণীয়-বর্জনীয় নির্দেশনাবলীর উদ্দেশ্য মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।[৪] অনুরূপভাবে পরনিন্দা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়। কিন্তু অত্যাচারিত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য অত্যাচারী ব্যক্তির নিন্দা ও দোষ বর্ণনা কোন অন্যায় বা অনৈতিক নয়। বরং এক্ষেত্রে চুপ থাকাই অনৈতিক। বিশেষ করে এক্ষেত্রে প্রতিবাদের শক্তি থাকার পরও চুপ থাকলেও তা অত্যাচারীকে সহায়তার শামিল–যা সম্পূর্ণ অনৈতিক।

ইসলামী নৈতিকতায় ব্যক্তির ভালো নিয়ত বা সদিচ্ছার উপরই কাজের ফলাফল নির্ভর করে, সদিচ্ছাবিহীন কাজ দৃশ্যত ভালো মনে হলেও তার কর্তা কোন পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। আবার যে কাজ ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, বরং জোরপূর্বক বা নিরূপায় হয়ে করতে হয়েছে তা ইসলামে ইসলামে নৈতিক বিচারের আওতামুক্ত। পক্ষান্তরে, এর বিপরীত কেউ কোন ভালো কাজেও যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয় কিংবা বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোন কর্তব্য সম্পাদন করে তাও ইসলামী নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন মুনাফিকদের বিভিন্ন কার্যক্রম, যা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানোর জন্য করে থাকে। এছাড়া ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ প্রেরণা বা কর্তব্যবোধ থেকে কৃত কাজই ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক। তাই বাহ্যিক চাপের কারণে কোন অন্যায় থেকে বিরত থাকাকে নৈতিক বলে গণ্য হয় না। এজন্যই রাসূল সা. বলেছেন–'সব কাজ নিয়ত(সংকল্প) অনুযায়ী গৃহীত হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়।'[৫]

---

[১]. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১) পৃ.৪৪।
[২] . মুহাম্মদ আবদুল বারী, *নীতিবিদ্যা*, (ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ৪র্থ সং, ২০০৯), পৃ.৩০৮।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত ৩২, এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ০২:২৭৫-২৭৬, ০৩:১৩০।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৫৭।
[৫] .মূল আরবী [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওহী, হাদীস নং ০১।

ইসলামী নৈতিকতায় সদিচ্ছাও শর্তসাপেক্ষে অর্থাৎ এখানে ভালো কাজের সদিচ্ছাই ভালো। তাই ভালো নিয়তে কোন অননুমোদিত কাজ অনুমোদিত নয়। যেমন কেউ মানব সেবার জন্য অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে তা দ্বারা ভালো কাজ করে তবে তা ভালো বলে গণ্য হবে না, বরং ইসলামের দৃষ্টিতে তা অন্যায় ও অনৈতিক।

ইসলাম এমন নৈতিক আদর্শ ও বিধি-বিধান প্রদান করে যা মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল। এজন্য ইসলামকে বলা হয় ফিতরাত বা স্বভাবজাত ধর্ম। মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল নয়, এমন কোন বিধি-নিষেধ ও কর্তব্য-দায়িত্ব ইসলামের নৈতিক বিধানে নেই। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, জরুরী অবস্থা, অনন্যোপায় ও সঙ্কটাবস্থায় ইসলাম ব্যক্তিকে সে সব কাজ করার অনুমতি দেয়। এরূপ পরিস্থিতি যতক্ষণ বিরাজ করবে এবং মুসলিম এর উন্নয়নে অপরাগ থাকবে ততক্ষণ সে আল্লাহর দেয়া নৈতিক বিধান পালনে ব্যর্থ হলে তাকে দোষারোপ কিংবা অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না। যেমন–কোন বিশিষ্ট উন্নত চরিত্রবান ব্যক্তিকে ঘোর নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজে বাধ্য করা হলো। এখন তার সহজাত প্রবণতা জীবন রক্ষা করা, আর নৈতিক মূল্যমানগুলোর দাবী হলো ন্যায়–সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা। এমতাবস্থায় ইসলামের স্বভাবজাত প্রবণতাকেই প্রাধান্য দেয় এবং প্রত্যেককে সহজাত বৃত্তির অনুকূলে আদেশ দেয়। সে যদি দুর্বল চিত্তের হয় আর যেহেতু সহজাত বৃত্তি জীবনকে গুরুত্ব দেয়; সুতরাং অনুমতি রয়েছে যে, সে তার জীবন রক্ষা করতে পারে। আর তার সহজাত বৃত্তি যদি মজবুত হয় তা'হলে জীবনের পরোয়া করা উচিত নয়। ক্ষুধায় জনৈক মুসলিম জীবন যাওয়ার উপক্রম কিংবা ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে। এমতাবস্থায় জীবন রক্ষার জন্য সীমানুযায়ী কর্ম করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই তার সীমালংঘন বৃত্তি থাকবে না। তখনও তাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে, উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য তার জীবন অধিক কল্যাণকর, না মরণই শ্রেয়। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

"তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

এখানে পতিতাবৃত্তির মত ঘৃর্ণিত কাজে কোন নারীকে বাধ্য করা হলে এবং সে তা সর্বান্তকরণে অপছন্দ করলে তাতে তার পাপ হবে না বরং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অনুরূপভাবে হারাম খাদ্য যেমন, মদ, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং তা যা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে তা যদি কেউ জীবন রক্ষায় সীমালজ্ঘনপ্রবণতা ছাড়া অপছন্দ সহকারে বাধ্য হয়ে ভক্ষণ করে তবে তাতে তার কোন পাপ হবে না। [আল-কুরআন ০২:১৭৩] একইভাবে যদি কাউকে বলপ্রয়োগে ঈমানবিরোধী কথা বলতে বাধ্য করা হয় কিন্তু তার অন্তর যদি ঈমানে অবিচল থাকে তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না। [আল-কুরআন ১৬:১০৬]

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহ্‌র দায়িত্বশীল প্রতিনিধি এবং সচেতন আমানতদার। ফলে তাকে সর্বদাই পৃথিবীর অন্য সকলের ব্যাপারে মনোযোগী থাকতে হবে। কেননা আল-কুরআনে আত্মস্বার্থ অপেক্ষা পরস্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। যেমন বিজয় ও ক্ষমতা লাভের পর শক্তির মোহে অতীত অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতাকে কুরআন নিবৃত্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[২], وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, ন্যায়বিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর।"

আল-কুরআন মানুষের ব্যবহারিক ও ধর্মীয় জীবনকে আলাদা করে দেখে না। বরং জীবনের সব ক্ষেত্রেই আল-কুরআনের সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। কারো জন্য এ সুযোগ নেই যে, নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে অবশিষ্ট ক্ষেত্রে ইচ্ছামত চলবে। এ মর্মে কুরআনে বলা হচ্ছে[৩] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) "হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

উদ্ধৃত আয়াতে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে সর্বাত্মকভাবে ইসলামের শিক্ষা ও নীতি-আদর্শ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্যসব পথ ও মতকে বর্জনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে ইসলামী নৈতিকতার পূর্ণতা ও সর্বজনীনতা ফুটে উঠেছে।

আল-কুরআন মূল্যবোধের এমন উৎস যা একাধারে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। আল-কুরআন ঈমান ও আমল তথা বিশ্বাস ও কর্মের এক অপূর্ব সমন্বয়। ইসলামের এমন কোন বিধান নেই যা কর্মের দ্বারা সমর্থিত ও বাস্তবায়িত নয়। আল-কুরআন মু'মিনদের সৎ কাজের আদেশ দান, মানুষকে তাতে উদ্বুদ্ধ করা ও সৎ কাজের প্রসার সাধন এবং অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান করার দায়িত্ব দেয়ার সাথে সাথে ব্যক্তিকে তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে ইসলামী নৈতিকতা বিশেষভাবে নির্দেশ

[১] . আল-কুরআন, সূরা আন-নূর : আয়াত ৩৩।
[২] . আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত ০৮।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : আয়াত ২০৮।

দেয়।[১] ইসলামী নৈতিক বিধান অন্যান্য নৈতিক বিধানের মত তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয়। এটা ব্যক্তিকে শুধু ধার্মিক, সৎ ও নীতিবান হতে আদেশ করে না, বরং সত্যিকার অর্থে কিভাবে ধার্মিক ও পূণ্যবান হওয়া যায় এবং কোন কোন বিষয় মানুষকে সৎ ও নীতিবান করে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ কী করা বা হওয়া উচিত তারও নির্দেশনা প্রদান করে। অর্থাৎ ইসলামী নৈতিকতা একাধারে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। এটা নৈতিক তত্ত্ব ও মানদণ্ড প্রদানের সাথে সাথে নিজ জীবন ও কর্মে তার বাস্তবায়নে জোর তাকিদ প্রদান করেছে। যেমন বলা হয়েছে– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ "হে মুমিনগণ! তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? আল্লাহ্র নিকট বড়ই অসন্তোষজনক হলো যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা কর না।"[২]

উদ্ধৃত আয়াতে কুরআন তার অনুসারীদের নৈতিকতাকে তত্ত্ব সর্বস্ব প্রচারণার অপেক্ষা বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই ইসলামী নৈতিকতা শুধু তত্ত্ব সর্বস্ব নয় বরং প্রায়োগিকও বটে। আর প্রয়োগ ছাড়া নিষ্ক্রিয় মূল্যেবোধের ধারণা অর্থহীন ধারণা মাত্র।

ইসলাম এই জগতে বিরাজমান সবকিছুকে বাস্তব বলে স্বীকার করে। পাপ, বেদনা, দুঃখ,কষ্ট–এ সবই বাস্তব সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব অশুভ জগতের পক্ষে আবশ্যিক নয়। জগতকে অবশ্যই সংস্কার করা যায়, পাপ ও অমঙ্গলের সব উপাদানকে ক্রমশ দূর করা সম্ভব। এদিক থেকে জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণা আশাবাদী নয়, নৈরাশ্যবাদীও নয়, বরং সংস্কারবাদী। কারণ অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিবর্তিত করে জগতের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে সুনিয়ন্ত্রিত কর্মের ফলপ্রসূতায় ইসলাম বিশ্বাস করে।[৩]

পরিধি: ইসলাম মানব জীবনকে দেখে থাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ইসলামে নৈতিক বিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। জীবনের সর্বত্রই এর প্রয়োগ আছে। গোত্র, জাতীয়তা, ভৌগলিক সীমারেখাসহ সকল সংকীর্ণ গণ্ডির উর্দ্ধে উঠে সর্বজনীনভাবে তার নৈতিক বিধি-নিষেধ সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই ইসলামে নৈতিকতার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, ব্যাপকতর ও সুদূরপ্রসারী। এটি যুগপৎ আল্লাহতে বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক আচরণ, নীতি-নির্ধারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক পেশা, ভোগের অভ্যাস, বলার ভঙ্গি এবং মানব জীবনের অন্যান্য সকল দিককে আত্মস্থ করে নেয়। কেননা নৈতিকতা ইসলামের এমন একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সকল অনুচ্ছেদের মর্মমূলেই নৈতিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই মহাগ্রন্থের সর্বত্র নানা প্রসঙ্গে বারবার নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।[৪]

ইসলামের নৈতিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক বোধ কেবল আইনানুবর্তিতার মধ্যে সীমবদ্ধ নয়, তা এমন একটি ব্যাপক বোধ, যা গোটা জীবনময় প্রচলিত পরিব্যাপ্ত এবং সর্বদিক থেকেই জীবন তার আওতাধীন। ইসলামে একজন মানুষের জন্ম পর শিশুর কানে আযান-ইকামাতের ধ্বনি প্রদান থেকে শুরু মৃত্যুর পর কবরে দাফন পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নৈতিক আবরণে আবৃত। জীবনের কোন অংশকে এ থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। কুরআনে বর্ণিত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিস্তৃতি সম্পর্কে ড. হামমুদাহ আবদাল 'আতি(১৯২৮-১৯৭৬) বলেন-[৫]

> সাধারণভাবে বলতে গেলে মুসলমানের ভূমিকা হলো সুকৃতিকে বিজয়ী করে তোলা এবং দুস্কৃতিকে পরাস্ত করা, সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা। সত্য ও সুকৃতি তার জীবনের চরম লক্ষ্য। বিনয় ও সারল্য, সৌজন্য ও সহৃদয়তা তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তার দৃষ্টিতে ঔদ্ধত্য ও অহংকার এবং রূঢ়তা ও উদাসীনতা আল্লাহ্র কাছে অরুচিকর, বিরক্তিকর ও অসন্তোষজনক। অধিকতর সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, আল্লাহ্র সাথে মুসলমানের সম্পর্ক হলো–প্রগাঢ় ভালবাসা, আনুগত্য, আস্থাশীলতা ও সুবিবেচনা, শান্তিপ্রিয়তা ও সত্যোপলব্ধি এবং স্থিরচিত্ততা ও কর্মশীলতার সম্পর্ক এই উচ্চমানের নৈতিকতা নিঃসন্দেহে নৈতিকতাকে মানবিক পর্যায়ে লালন ও সম্প্রসারণ করবে। সহযোগী লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে মুসলমান অবশ্যই নিকট আত্মীয়দের প্রতি সহৃদয়তা ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে উদ্বেগ, বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি মমতা, অসুস্থদের জন্যে পরিচর্যা ও অভাবগ্রস্তদের জন্য সাহায্য, শোকার্তদের জন্য সহানুভূতি ও ভগ্নোৎসাহদের জন্য সান্তনা, নিঃসহায়ের প্রতি উদারতা এবং মন্দ কাজের প্রতি অসন্তোষ ও তুচ্ছ কাজের প্রতি উপেক্ষার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। তার মন-মানস থাকবে গঠনমূলক ধারণা ও বাস্তবমুখী কর্মপ্রেরণায় ভরপুর। তার হৃদয়ে স্পন্দিত হবে সদিচ্ছা, শুভকাংখা ও দয়ার্দ্র অনুভূতি। তার আত্মা দ্যুতিময় হবে শান্তি ও স্বস্তি দ্বারা। তার উপদেশ হবে আন্তরিকতাপূর্ণ ও শুভেচ্ছামূলক।

ধর্মীয় নৈতিকতা বনাম দার্শনিক নৈতিকতা: ধর্মীয় বিধি-নিষেধের সাথে নৈতিক বিধি-নিষেধের অনেকাংশে মিল থাকায় অনেকে ধর্ম ও নৈতিকতাকে এক ও অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু ধর্ম ও নৈতিকতা সাধারণভাবে একে অপরের সাথে অনেকাংশে সম্পর্কযুক্ত হলেও নৈতিকতার সঙ্গে ধর্মের সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় চেতনা অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে স্থাপিত হয়; আর নৈতিকতা আমাদের আচরণের ভালো-মন্দের মূল্যায়ন। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়; আর নৈতিক ক্রিয়ার মূল্যায়ন থেকে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রধানত আমাদের

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা : আয়াত ৭১।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্ফ : আয়াত ০২-০৩।
[৩]. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪-৪৫।
[৪]. হামমুদাহ আবদাল 'আতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬০।
[৫].ড. হামমুদাহ আবদাল 'আতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৭।

বিশ্বাস ও অনুভূতি কাজ করে; আর নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রধানত আমাদের ধারণাগত যৌক্তিকতা কাজ করে। ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধের উৎস স্রষ্টা; কিন্তু নৈতিক চেতনা আসে ব্যক্তির নিজস্ব অন্তস্থ ধারণা থেকে।[১]

কথা হলো একজন বিবেকবান মানুষ ধার্মিক না হয়েও নৈতিক অনুশাসন মেনে চলতে পারেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন এর সঙ্গে পরম কল্যাণের সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। নীতি শাস্ত্রের আলোচনায় এটা পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে যে, নীতি শুধু মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যকে নির্ধারণ করে। আল্লাহর প্রতি যে বান্দার কর্তব্য আছে এ কথা নীতি শাস্ত্র বলে না। এটা বলে ধর্ম। অসীম সত্তা আল্লাহর সঙ্গে সসীম সত্তা মানুষ কিভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারে তার পথ ও পন্থা বলে দেয় ধর্ম। তাই নীতি শাস্ত্রের পরিধির চাইতে ধর্মের পরিধি অনেক বিস্তৃত। ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম যুগপৎভাবে মানুষকে আল্লাহর প্রতি ও মানবতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের তাকিদ দিয়ে থাকে। ইসলাম এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে চায় যে দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে কৃতজ্ঞচিত্ত করে তোলে।...
আরেকটি বিশেষ বিষয় হলো সর্বশ্রেণীর মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে শুধু নীতি দর্শন সক্ষম নয়। নীতি দর্শন সমাজের বিশেষ শ্রেণী ও কতিপয় লোককেই আদর্শবাদী বানাতে সাহায্য করলেও সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে তা সামর্থ্য রাখে না। এতে যদিও কিছু লোক নীতিবাদী হয়ে উঠে তবুও তাতে সামষ্টিক কল্যাণ সাধিত হয় না। উপরন্তু নীতিদর্শনের নানা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, তা দ্বীনের প্রভাবের মত কখনো গভীর ও ব্যাপকও হয় না। ... আর ধর্ম কেবল উত্তম পবিত্র চরিত্র গ্রহণের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ম নৈতিক চরিত্রের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও মৌলিক আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আচার-আচরণের খুঁটিনাটিও বলে দেয় এবং তার উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। চরিত্র হারালে তার কি নির্মম পরিণতি হতে পারে, তার কথা বলে মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়। আর চরিত্রবান কি উচ্চ সওয়াব পেতে পারে এবং চরিত্র হারালে কি আযাব ভোগ করতে হতে পারে, তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে চলা ধর্মের কাজ।[২]

ইসলামী আল-আখলাক তথা ইসলামী নীতিশাস্ত্র চর্চার ধারাঃ

আল-কুরআন নৈতিকতা, জীবন-জগৎ ও সমাজ নতুন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত সাহাবী(রা.) ও তাবেয়ী (রা.) কর্তৃক আল-কুরআনের মূলবোধ চর্চা শুরু হয়। এর সূচনা হয় কুরআনে উল্লেখিত নৈতিকতা সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা এবং উপদেশ, ওসীয়ত ও নসীহত আকারে।
হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইসলামী আইন শাস্ত্রের 'চার ইমাম'[৩] ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে 'উলূমুল ফিকহ' বাস্তব রূপ দান করেন। এর মাধ্যমে তারা মানব জীবনের সমগ্র দিকের উপর নৈতিক নীতিমালা ও নৈতিক মানদণ্ডের কাঠামোর আওতায় ইসলামী জীবন পদ্ধতি বুদ্ধিবৃত্তিক সুশৃঙ্খল রূপদানের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। চার ইমাম ছাড়াও এ সময় আরও অনেকে এক্ষেত্রে অবদান রাখেন। যেমন:আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক(মৃ.১৮১হি.) রচনা করেন *'কিতাবুয যুহদ'*(كتاب الزهد)। ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ(মৃ.১৯৭হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (মৃ.২৪১হি.) *'আয-যুহদ'*(الزهد) নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী নীতিশাস্ত্র প্রভূত অগ্রগতি লাভ করে। এ সময় হাদীসভিত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক পদ্ধতিতে অনেকে কাজ করেন। এক্ষেত্রে ইমাম আল-বুখারী (মৃ.২৫৬হি.) রচিত *'আদাবুল মুফরাদ'*(الأدب المفرد) এবং ইমাম আন-নাসায়ী(মৃ.৩০৩হি.) রচিত *'আমালুল ইয়াম ওয়াল লাইল'*(عمل اليوم والليلة) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইবন কুতাইবা (মৃ.২৭৬হি.) রচিত *'উয়ূনুল আখবার'* (عيون الأخبار) এবং ইবনু আবীদ দুনিয়া (মৃ.২৮১হি.) রচিত *'আল-ইখলাস'*(الإخلاص) , *'মাকারিমুল আখলাক'*, 'আল-আমরু বিল মা'রূফ'(الأمر بالمعروف), *'যিকরুল মাউত'*(ذكر الموت),*'আদাবুল লিসান'*(آداب اللسان) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সব গ্রন্থে কুরআন, হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীসহ জ্ঞানীদের মূল্যবান উক্তি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এ সব গ্রন্থে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ সময় বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় নীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনার অনেকে এগিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন আল-জাহিয(মৃ.২৫৫হি.) তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি হচ্ছে *'তাহযীবুল আখলাক'*(تهذيب الأخلاق)'। এ সময় মুসলিম দার্শনিকগণও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আল-কিন্দী (মৃ.২৬০হি.) রচিত القول في النفس, আবূ বকর আর-রাযী রচিত *"আল-ফুকারা ওয়াল মাসাকীন"*, আল-ফারাবী (মৃ.৩৩৯হি.) রচিত آراء أهل المدينة الفاضلة ও الآداب الملوكية গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

এরপর যুগে যুগে অনেকেই এই শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে যারা বিশেষ অবদান রাখেন তন্মধ্যে ইবন মাসকুয়াহ (মৃ.৪২১হি.) রচিত *'তাহযীব আল-আখলাক'*। ইবন সীনা (মৃ.৪২৮হি.) রচিত رسالة في الحكمة, الانصاف, كتاب الطير, ইবন বাজাহ আল-আন্দালুসী (মৃ.৫৩৩হি.) রচিত كتاب النفس, اتصال العقل ইবন রুশদ (মৃ.৫৯৫হি.) রচিত فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال এবং ইবনুত তুফাইল রচিত رسالة في النفس

---

[১]. ড. এম. আবদুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০-২১।
[২]. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৪) পৃ. ২৪০-২৪৪।
[৩].চার ইমাম হলেন, ইমাম আবূ হানিফা রহ. (মৃ.১৫০হি.), ইমাম মালিক রহ. (মৃ.১৭৯হি.) ইমাম আশ-শাফেয়ী রহ.(মৃ.২০৪হি.). ইমাম আহমাদ রহ. (মৃ.২৪১হি.)।

বিশেষভাবে পরিচিত। এ সব দার্শনিক গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও গ্রীক দর্শনের উপর সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং এর অনেক বিষয় পরিশোধ করে এতে আরও বহু বিষয় সংযোজন করেছেন।

হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগ থেকে পরবর্তীকালে মুহাদ্দিস, ফুকাহা, আলিম ও সূফীদের মধ্যে অনেকেই এ অঙ্গনে বিরাট অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে হাকীম আত-তিরমিযী (মৃ.৩২০হি.) রচিত كتاب الذوق, اداب النفس আবূ বকর আল-খারায়েতী (মৃ.৩২৭হি.), *রচিত 'মাকারিমুল আখলাক ওয়া মা'আলিহা'*(مكارم الأخلاق ومعاليها) ও *মুসাওইয়াতুল আখলাক ওয়া মাযমুমিহা*(مساوىء الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروهها)'; আবূ বকর আল-আযরী (মৃ.৩২৭হি.) রচিত *'আখলাকু হামালাতুল কুরআন'*(أخلاق حملة القرآن) *'আখলাকুল উলামা*(أخلاق العلماء)', *'আদাবুন নাফস'*(أدب النفس); আবূ তালিব মাক্কী(মৃ.৩৮৬হি.) রচিত *'কুওয়াতুল কুলূব'*(قوت القلوب); ইবন হাযম আন্দালুসী (মৃ.৪৫৬হি.) রচিত (الأخلاق والسير في مداواة النفوس), ইমাম বাইহাকী (মৃ.৪৫৮হি.) রচিত *'শু'আবুল ঈমান'*(شعب الإيمان), আবুল হাসান মাওয়ার্দী (মৃ.৪৫০হি.) রচিত *'আদাবুদ দীন ওয়াদ দুনিয়া'*(أدب الدنيا والدين), আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (মৃ. ৫০৫হি.) রচিত *'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন'*(إحياء علوم الدين), ইবনুল জাওযী(মৃ.৫৯৬হি.) রচিত *'সিফাতুস সাফওয়াত'*(صفة الصفوة), ইমাম আন-নববী(মৃ. ৬৭৬হি.) রচিত 'রিয়াদুস সালেহীন'(رياض الصالحين), হাফিয আল-মুনযিরী (মৃ.৬৫৬হি.), *'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব'*(الترغيب والترهيب), ইবনু তাইমিয়াহ(মৃ.৭২৮হি.) রচিত *'মাজমু'উল ফাতাওয়া'*(مجموع الفتاوى), আয-যাহাবী(মৃ.৭৪৮হি.) রচিত *'আল-কাবাইর'*(الكبائر),ইবনুল কাইয়িম (মৃ.৭৫১হি.) রচিত *'আল-ফাওয়ায়েদ'*(الفوائد), *'মাদারিজুস সালেকীন'*(مدارج السالكين), *'ইগাসাতুল লাহফান'*(وإغاثة اللهفان), (الداء والدوا) (إعلام الموقعين) ইত্যাদি, ইবনুল মুফলিহ(মৃ.৭৬৩হি.) রচিত *'আল-'আদাবুশ শরী'আহ ওয়াল মানহুল মারিআহ*(الآداب الشرعية والمنح المرعية) এবং ইবন হাজার মাক্কী(মৃ.৯৭৪হি.) রচিত *'কিতাবুয-যাওয়াজির'* (الزواجر) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো ইসলামী নীতিশাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে কুরআন, সুন্নাহ, সালফ-আস-সালেহীনের বিভিন্ন উক্তি সন্নিবেশ ঘটেছে। এ সব গ্রন্থে নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবলী, শিষ্টাচার, উন্নত আদর্শ ও নীতি বিষয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

বর্তমান যুগেও ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবলীর উন্মোচনে আলিমদের চেষ্টা অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে চেষ্টা-সাধনার শীর্ষে রয়েছে আবদুল্লাহ দাররাজ কৃত *'দাসতুরুল আখলাক ফীল কুরআনিল কারীম '*(دستور الأخلاق في القرآن الكريم); মুহাম্মাদ আল-গাযালী রচিত *'খুলুকুল মুসলিম'*(خلق المسلم) ও *হাযা দীনুনা*(هذا ديننا); আবদুল ফাততাহ 'আশুর কৃত *'মানহাযুল ফী তারবিয়াতিল মুজতিম'*(منهج القرآن في تربية المجتمع), হাসান আইউব(১৯১৮-২০০৮) রচিত *'আস-সুলূকুল ইজতিমায়ী ফীল ইসলাম'*(السلوك الاجتماعي في الاسلام), সালওয়া রামাদান রচিত *'আত-তারবিয়াতুল খুলুকিয়া ফীল ইসলাম'* (التربية الخلقية في الإسلام) ও মিকদাদ ইয়ালজিন রচিত الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ও التربية الأخلاقية الإسلامية গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। গবেষণাধর্মী এ সব গ্রন্থে ইসলামী শিষ্টাচার, উন্নত চরিত্র, আত্মশুদ্ধি, নিষ্ঠা, সৎ-অসৎ গুণাবলীর বর্ণনা, সৎ গুণের কল্যাণকারিতা ও অসৎ গুণাবলীর ক্ষতি, সৎ চরিত্র অর্জনে করণীয় ও অসৎ চরিত্র বর্জনের পন্থা, নৈতিক ও সামাজিক মূলবোধ, সামাজিক আচার-আচরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষায় এসব গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা (Concept of social value):

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের[১] সদস্য হিসেবে সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে কিছু আদর্শ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও নিয়ম-কানুনকে গ্রহণ ও মান্য করতে হয়। যে সব আদর্শ, নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়– এগুলোর সমষ্টিই সামাজিক মূল্যবোধ (social value)। সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় ও ধারণা প্রদান করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

Francis E. Merrill বলেন, "A social value may be defined as a pattern of belief whose maintenance is considered important to group welfare."[২] অর্থাৎ সামাজিক মূল্যবোধ বলতে এমন এক ধরনের ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসকে বুঝায় যেগুলো দলীয় বা সামষ্টিক কল্যাণের জন্য জনগণ কর্তৃক বিবেচনা করা হয়।

অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেন, "social values are cultural standards that indicate the general goods deemed desirable for organised social life...They are the abstract sentiments or ideals." [৩]

---

১. <u>সমাজ</u> **(society)** বলতে অন্তত তিনটি প্রত্যয়কে নির্দেশ করে। প্রথমত, পরস্পর অনুভূতিশীল একই জাতীয় জীবের সমষ্টি। এই অর্থে– গোটা মানব জাতি, এমনকি টিবি কেন্দ্রিক পিঁপড়ের দল, চাক কেন্দ্রিক মৌমাছির দল প্রভৃতি এক একটি সমাজ। দ্বিতীয়ত, সমাজ বলতে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে বোঝায়, যেমন-কোন সংঘ বা সমিতি। তৃতীয়ত, কোন সমাজের যাবতীয় সম্পর্ক বা সামাজিক কার্যাবলিকে সমাজ বলে। এর অর্থ হচ্ছে, কোন জনসমষ্টি একত্রিত হলেই সমাজ গঠিত হয় না, তাদের মধ্যে মানসিক বন্ধন থাকতে হয় এবং এই বন্ধন সৃষ্টি হয় নানাবিধ সহযোগিতামূলক কার্যাবলির মাধ্যমে, এভাবেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সম্পর্কের। সুতরাং এ সব সামাজিক সম্পর্ক ও কার্যাবলিই হলো সমাজ। অতএব মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ কোন জনগোষ্ঠী এবং তাদের কার্যাবলির মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে এর বিমূর্ত রূপ বা ধারণাই হলো সমাজ। –আবদুল বাকী ও জামাল খান,*ভুবনকোষ*, পৃ.১৮৭।

2. Francis E. Merrill, *Analyzing Social Problems* (New york: Nordskog and Others, 1950) p.13.

৩. ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজতত্ব* (কলিকাতা: ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ণ, ২০০২), পৃ.৬১৪।

সমাজ বিজ্ঞানী সি. ক্লার্ক হোয়েন বলেন– সামাজিক মূল্যবোধ হলো কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাঙ্ক্ষিত বস্তু বিষয়ক ধারণা বা জ্ঞান, যার দ্বারা ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আচরণের নানাবিধ পন্থা, রীতি ও লক্ষ্যবস্তুর মধ্য হতে এক বা একাধিক পন্থা বা রীতি, যা দ্বারা তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।[১]

মোটকথা, যে সব সামাজিক আদর্শ, বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতি সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করে, সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে, সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, সমাজের মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজে বাঁধা দেয় সেই সমস্ত অমূর্ত সামাজিক উপাদানের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

সামাজিক মূল্যবোধ একটি জাতির দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস, চেতনা ও কাঙ্ক্ষিত আচরণের ফলশ্রুতি। সামাজিক মূল্যবোধ একটি অলিখিত বিধান। সমাজের রীতি-নীতি, আদর্শ, অনুমোদিত ব্যবহার, সংস্কৃতি, নৈতিক অনুভূতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে তা গড়ে ওঠে। সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিকল্পনা এবং সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চেতনা ও আকাঙ্খা সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে কাজ করে। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ, সামাজিক সংহতি রক্ষা ও সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক মূল্যবোধ একটি অপরিহার্য উপাদান। সমাজের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কাঙ্ক্ষিত রীতি-নীতি নির্ধারক শক্তি হিসেবে তা কাজ করে এবং সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমাজকে শৃঙ্খলিত করে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মূল্যবোধ: সাধারণভাবে বলা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় যে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তাই ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সমাজ জীবনের সাথে ব্যক্তি জীবনকে যুক্ত ও সুসমন্বিত করা। এ উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজন তা নিছক ব্যক্তিগত সুনীতি (Morality) নয়, বরং সেই সামাজিক সুনীতি যা অনুসারে ব্যক্তি স্বার্থকে সর্মপণ করতে হয় বৃহত্তম সমাজ কল্যাণের কাছে, আর সমাজকেও লক্ষ্য করতে হয় ব্যক্তির মূল্যবোধ ও নীতিবোধ বিকাশের দিকে। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ইসলাম ব্যক্তিকে তাকিদ দেয় তার চারদিকের মানুষ ও সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্‌কে খুঁজে পেতে। এতে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সবরকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং ব্যক্তির স্বার্থকে একাত্ম করে তোলা হয় সামাজিক কল্যাণের সাথে।
মোটকথা, ভ্রাতৃত্ব-সম্প্রীতি, মানবিকতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ-সহনশীলতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা ও সম্পদের সুষম বন্টন ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধের মৌলিক দিক।

উল্লেখ্য যে, কুরআন মানব জীবনকে দেখে থাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কুরআনে নৈতিকতার পরিধি এত ব্যাপক যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ আছে। তাই ইসলামে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ আলাদা করে দেখা হয় না। বরং ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধের আলোচনার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধও স্থান পায়। কারণ ইসলামে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনকে পৃথক করার কোন সুযোগ নেই। এটি একই সাথে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড, সামাজিক আচরণ ও নীতি-নির্ধারণসহ মানব জীবনের অন্য সকল দিককে আত্মস্থ করে নেয়।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যকার পার্থক্য ও সম্পর্ক: নীতবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ অভিন্ন নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। এখানে নৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক দায়িত্ব ভিন্নভাবে দেখা হয়। যেমন, কোন মানুষের অন্যায় না করা হচ্ছে নৈতিক দায়িত্ব। আর প্রতিবেশীর বিপদের সময় সহানুভূতি দেখানো নৈতিক দায়িত্বে পরিবর্তে বরং সামাজিক দায়িত্ব। নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও পছন্দ থেকে উদ্ভূত, যার অনুমোদন ব্যক্তির ভিতর থেকে আসে। অন্যদিকে, সামাজিক মূল্যবোধ বাইরের ব্যাপার, যা ব্যক্তির উপর বাইর থেকে আরোপ হয়ে থাকে। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে থাকে অপরের কল্যাণের চেতনা। তা সামাজিকীকরণের[২] মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে হয়ে যায়। ব্যক্তি মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আচার–ব্যবহারকে এগুলো বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণতঃ আমরা কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে কোন আদর্শের ভিত্তিতে এক ধরনের নৈতিক মূল্যায়নকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা নৈতিক দিক থেকে ভালো ও ন্যায়কে বুঝায়। আর সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সাধারণতঃ সমাজে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অব-কাঠামো ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম-কানুনকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়ার রেওয়াজকে বুঝায়। 'সদা সত্য বলবে', 'ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা কর'। এ সব নৈতিকতার বাণী। কিন্তু, 'আর্ত মানবতার সেবা কর', 'দুঃস্থকে সাহায্য কর', 'বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও'–এ সব বাণী অনেক সময় নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তে সামাজিক মূল্যবোধের অন্তর্ভূক্ত। নৈতিক

[1]. C. Kluck hohn, *Universal Categories of Culture,* উদ্ধৃত, ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৬, পৃ.৩০৮; ড. অনাদি কুমার মহাপাত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬১৪।

[২]. সমাজীকরণ–যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু সমাজের নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি অর্জন করে নিজেকে একজন সামাজিক সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে তাকে সমাজীকরণ বলে।

দায়িত্ববোধের উৎস ব্যক্তির অন্তস্থ ধারণা। এ এমন একটি স্বকীয় ও অনন্য ধারণা যা প্রত্যেক সাধারণ নীতিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে কম বেশী বিরাজ করে। কিন্তু সামাজিক দায়িত্ববোধের উৎস সামাজিক প্রয়োজন। সততা, ন্যায় ও সত্য এর প্রতি আকর্ষণ ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ বা অন্তরস্থ ধারণা থেকে উৎসারিত, অথচ আর্ত–মানবতার সেবা বা প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বাহিরের তাকিদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব, সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির বহিস্থ ধারণা।

নৈতিক মূল্যবোধ সার্বজনীন, না আপেক্ষিক–এই প্রশ্ন নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও, অধিকাংশ জনগোষ্ঠী এখনও বিশ্বাস করে যে, নৈতিকতার মূলবাণী শাশ্বত ও সর্বজনীন। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে নৈতিকতার বাণী এখনও একইভাবে সমাদৃত। বৃহত্তর পরিমন্ডলে মতানৈক্য থাকলেও, সত্য কথা বলা উচিত, হত্যা করা মহাপাপ, ইত্যাদি, নৈতিকবাণীসমূহের সর্ব সমাজে, সর্বকালে ও সর্বজনে একই মমার্থ। কিন্তু, সামাজিক মূল্যবোধ বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন রীতি-নীতি দ্বারা নির্ধারিত। তাই বিভিন্ন সময়ে একই সমাজে বা একই সময় বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, সতীদাহ প্রথা আজকের সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে গর্হিত বলে স্বীকৃত হলেও, এক সময় তা সমাজে স্বীকৃত আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হত। তাই সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে। তবে, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বা পরিবর্তন নাও বোঝাতে পারে।
তবে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ স্বতন্ত্র হলেও, উভয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কেননা নৈতিক মূল্যবোধের পরিপূর্ণতা ও বিকাশের স্বার্থে সমাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজই মানুষের নীতিবোধের শিক্ষায়তন। সত্য ও সুন্দরের কামনা অর্থহীন হবে, যদি সত্য ও সুন্দরের লালন ভূমি হিসাবে সমাজ না থাকে। সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ আমাদের নৈতিকতার জন্য অপরিহার্য। পক্ষান্তরে, নৈতিক চেতনা একটি অনন্য ধারণা হলেও সামাজিক আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এমনকি সামাজিক কুসংস্কার বা প্রথাকে পরিহার করতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। তাই বিভিন্ন কালের সমাজ সংস্কারকগণ তাদের নৈতিক মূল্যবোধের বলেই নিজ নিজ সমাজের অনেক কুপ্রথা ও অনিয়ম সংস্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।[১]

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড

মূল্যবোধ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে কিছু উৎস ও উপাদান রয়েছে। তা নির্ধারণের জন্য রয়েছে মানদণ্ড। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, সমাজ বিজ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় বৃক্তিবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি তথা মানবীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান ধর্ম। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুসারী। আর প্রত্যেক ধর্মেই কিছু না কিছু নৈতিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থ বা ধর্মীয় রীতি-নীতি দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত। এছাড়াও নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠার উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো– বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি। উৎসের এই বিভিন্নতার ফলে পৃথিবীতে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে দর্শন, নীতিবিজ্ঞান ও বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হলো-

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয় ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়। কিন্তু ভালো ও মন্দ সংক্রান্ত জ্ঞানের উৎস কি? ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি কি? কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ মন্দ? কোনটি উচিত আর কোনটি অনুচিত? কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা? কোন কাজের নৈতিক মূল্য কী? 'পরম কল্যাণ'[২] বলতে কী বোঝায়? এ সব কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? এজন্যই প্রয়োজন নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ডের। কিন্তু এ নিয়ে দার্শনিক ও নীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন–'মানুষের অভিজ্ঞতাই এ সংক্রান্ত জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস'। কারো মতে–'যুক্তির মাধ্যমেই ভালো ও মন্দের পার্থক্য করতে হবে'। আবার কারো মতে–'প্রত্যেক মানুষের মাঝে ভালো ও মন্দের পার্থক্য করবার সহজাত অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে'। কিন্তু জ্ঞানের এ সব উৎসের কোনটাই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য কোন জ্ঞান দিতে পারে না। কারণ যুক্তি ও ধারণা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে, কোন মানুষের অভিজ্ঞতাকে সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠি করাও একটি বিতর্কিত বিষয়; কারণ নানাদিক থেকে মানুষের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা আছে। আর এ বিষয়ে সমগ্র মানুষের অভিজ্ঞতা একীভূত করা অসম্ভব ব্যাপার।[৩] নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের পক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা দিয়ে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নির্ভুল ও সর্বজনীন নীতিমালা নির্ধারণ সম্ভবপর নয়।

সুদূর অতীত থেকে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় তথা মূল্যবোধ, নৈতিক আদর্শ ও মানদণ্ডের বিষয়ে দার্শনিক ও নীতিবিদগণ বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। সময়ের ব্যবধানে এ ব্যাপারে তাদের মতামতের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ আংশিক সত্যে উপনীত হয়েছেন, কেউ সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, কেউবা সত্যে উপনীত হতে

---

[১]. দেখুন, ড. এম. আবদুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮-২০।
[২] . 'পরম কল্যাণ' হল সেই কল্যাণ যাকে মানুষ তার নিজের জন্য কামনা করে থাকে।
[৩]. দেখুন, ড. জামাল আলবাদাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

পারেননি। তবে এ ব্যাপারে সবারই কোন না কোন অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এ সব দার্শনিক ও নীতিবিদদের বড় সীমাবদ্ধতা হলো, তারা সমস্যার মূল উৎসের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে মাঝখান থেকে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন।[1]

তাদের আরেক ধরনের সীমাবদ্ধতা হল, কেবল জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন, যা সম্ভবপর নয়। আর তাদের জ্ঞানের ভিত্তি মানবীয় চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নির্ভর করেছেন। সেখানে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে এতো মূল্যায়ন করা হয় যে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাই সবকিছুর নিয়ন্তা। যার দ্বারা মানুষ নিজেই সব বিষয়ে বিচার করতে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও গবেষণা ইত্যাদি জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তবে তা চূড়ান্ত নয় এবং সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ক্রুটির উর্দ্ধেও নয়। কেননা মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে। এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে (وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) " আর তোমাদের জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেয়া হয়েছে'।[2]
এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দার্শনিক ও নীতিবিদগণ বিভিন্ন সময় নৈতিক মানদণ্ড বা আদর্শ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন। যেমন–ক.সুখবাদ(Hedonism), খ. বুদ্ধিবাদ/বিচারবাদ (Rationalism), গ. স্বজ্ঞবাদ (Intuitionism), ঘ. পূর্ণতাবাদ (Perfectionism) ইত্যাদি।

সুখবাদ (Hedonism): এ মতে সুখ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই মানব জীবনের কাম্যবস্তু ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সুখই পরম কল্যাণ। কেবল সুখেরই অন্তর্নিহিত মূল্য আছে। সুখই নৈতিকতার মানদণ্ড। কোন কাজের ভালো-মন্দত্ব নিরূপনের জন্য মানদণ্ড হিসেবে সুখকে গ্রহণ করে নৈতিক অবধারণ গঠন করি। যে কাজ যত সুখ দেয় তা ততো ভালো, আর যে কাজ যত দুঃখ দেয় তা ততো মন্দ। তাই এই মত অনুসারে মানুষের একমাত্র কর্তব্য সুখ অন্বেষণ এবং দুঃখ পরিহার করা। এ মতবাদ জড়বাদী, যান্ত্রিক, প্রাকৃতিক ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ধারণার সাথে জড়িত। এ মতের প্রবক্তা হলেন, এপিকিউরাস (খ্রি.পূ.৩৪১-২৭০), সিজউইক(১৮৩৮-১৯০০) বেনথাম(১৭৪৮-১৮৩২), মিল(১৮০৬-১৮৭৮), হবস(১৫৮৮-১৯২৪), স্পেন্সার(১৮২০-১৬৭৯)।

বুদ্ধিবাদ/বিচারবাদ (Rationalism): সুখবাদের বিপরীতে উদ্ভব হয় বুদ্ধিবাদের। এ মত অনুসারে–মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। তার মধ্যে জীববৃত্তি থাকলেও বুদ্ধিবৃত্তির কল্যাণে মানুষ অপরাপর জীব থেকে পৃথক। কোন কাজ ভালো না মন্দ, ন্যায়-অন্যায় তা যাচাই করার একমাত্র উপায় হলো বুদ্ধি-বিবেক। তাই যে কর্ম বিচার-বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত, সে কর্মই মানুষের করা উচিত। মানুষের উচিত প্রবৃত্তিকে দমন করে মানুষের বিশুদ্ধ চিন্তার ভিত্তিতে জীবন যাপন করা। মানুষের কর্তব্য নির্ধারণে তার বিচার-বুদ্ধি একমাত্র সহায়ক। তাই বুদ্ধি-বিবেকের নির্দেশই নৈতিক বিচারের মানদণ্ড। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট(১৭২৪-১৮০৪) এ মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা।

স্বজ্ঞবাদ (Intuitionism): 'স্বজ্ঞ' হলো–কোন কিছুর ভালো-মন্দত্বের প্রত্যক্ষ অন্তর্দৃষ্টি। এ মতে- মানুষের অন্তরে বিবেক বা স্বজ্ঞা নামে একটি বৃত্তি আছে, যার সাহায্যে মানুষ তার কাজের সরাসরি নৈতিক বিচার করতে পারে। স্বজ্ঞাবাদীদের মতে–যে কোন ঐচ্ছিক ক্রিয়ার প্রকৃতির মধ্যেই ভালো-মন্দত্বের গুণ বিদ্যমান থাকে। ভালো-মন্দত্ব হচ্ছে কাজের অন্তর্নিহিত নৈতিক গুণ। মানুষের অন্তরে স্বজ্ঞা নামে যে বৃত্তি রয়েছে, তার সাহায্যে এই অন্তর্নিহিত নৈতিক গুণকে উপলব্ধি করা যায়। তাই স্বজ্ঞাই নৈতিক বিচারের মানদণ্ড। বাটলার(১৬৯২-১৭৫২), প্রিচার্ড(১৮৭১-১৯৪৭), স্যামুয়েল ক্লার্ক(১৬৭৫-১৭২৯), এ মতবাদের উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ।

পূর্ণতাবাদ (Perfectionism): এ মতবাদ অনুসারে– মানুষের পরম কল্যাণ নিহিত আছে তার বিচার-বুদ্ধির সহায়তায় প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করে পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি লাভ করার মধ্যে। তা-ই নৈতিকতার মানদণ্ড। সুতরাং যে কাজ পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি লাভের সহায়ক সে কাজ ভালো, যে কাজ পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি লাভের সহায়ক নয় সে কাজ

---

[1] দর্শন যে স্থান থেকে নৈতিকতার আলোচনা করে আসলে তা নৈতিকতার প্রারম্ভিক বিন্দু নয়, বরং মাঝখানের কতিপয় বিন্দু। প্রারম্ভিক বিন্দু ছেড়ে এখান থেকে আলোচনা শুরু করাই প্রথম ভুল। মানুষের কর্মকাণ্ডের ভাল-মন্দের মানদণ্ড কি? কোন সৎ গুণাবলী পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?–এ সব প্রশ্ন প্রথম পর্যায়ের প্রশ্ন নয়। এর পূর্বে মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত মানুষের পরিচয় কি? এ জগতে মানুষ কোন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত? এ প্রশ্ন এজন্য অগ্রবর্তী হওয়া প্রয়োজন কারণ মানুষের পরিচয় ও মর্যাদার স্থান নির্দেশ ছাড়া নৈতিকতার প্রশ্ন শুধু অনর্থক নয়, বরং এভাবে নৈতিক বিধান নির্ধারিত হলে তা মূলত ক্রুটিপূর্ণ হবে। ইসলাম এই বিভ্রান্তি নিরসন কল্পে সর্বপ্রথম যে বিষয়টা স্পষ্ট করে দিয়েছে তা-হল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর বান্দা ও প্রতিনিধি। মানুষের এ মর্যাদার স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ী –মানুষ যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রতিনিধি, তাই নিজের জন্য নৈতিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের অধিকার মানুষের থাকে না, বরং এটা ফায়সালা করার অধিকার ও দায়িত্ব আল্লাহর। কারণ প্রতিনিধি নিজে বিধান তৈরী করে না, মূল মালিকের দেয়া বিধান কার্যকর করাই প্রতিনিধির কর্তব্য। নৈতিকতার মানদণ্ড সম্পর্কে দার্শনিকরা যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছে তা সবই এর মাধ্যমে সমাধান হয়ে যায়। এর ভিত্তিতে মানুষের আর বিভিন্ন নৈতিক মানদণ্ডের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। [দেখুন, *ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, পৃ.১৪১-৪৩।]
এ সম্পর্কে মাও.মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন, মানুষের পরিচয় বা মর্যাদা কী? তার জন্মের উদ্দেশ্য কী? তার জীবনের লক্ষ্য কী? এই দুনিয়ার তার অবস্থান কোথায়? –এসব মানব জীবনের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের নির্ভুল জবাবই যাবতীয় জটিলতার মূল উৎস। এই জবাব সম্বলিত জ্ঞানই মানুষের জানার প্রাথমিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই জ্ঞানার্জন না করা পর্যন্ত মানব জীবনের কোন সমস্যা অনুধাবন করা এবং তার সমাধান জানা সম্ভব নয়। কেবল মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর জবাব নির্ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। অথচ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ কেবল এ উপায়ে ঐসব প্রশ্নের জবাব পেতে চেষ্টা করেছেন। আর এ কারণেই মানব জীবনের অন্যান্য সমস্যার ন্যায় নৈতিকতার সমস্যাটিও সম্পূর্ণ অমীমাংসিত আবস্থান পড়ে রয়েছে। আল্লাহর নাযিল করা কুরআন মজীদ এসব প্রশ্নের সঠিক-নির্ভুল ও সুস্পষ্ট জবাব পেশ করেছে। সে জবাবের দ্বারা সকল সমস্যার –নৈতিক সমস্যারও– সমাধান এমনভাবে হয়ে যায় যে, তাতে মন ও মগজ পূর্ণ স্বস্তি ও পরম সান্ত্বনা লাভ করে।[দেখুন, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের নীতি দর্শন* (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৪৭-৫০।]
[2]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা ১৭:৮৫।

মন্দ। এতে সুখবাদ ও বুদ্ধিবাদের সমন্বয় করা হয়েছে। পূর্ণতাবাদীদের মতে, আত্মোপলব্ধি অর্থ হলো, বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কামনা-বাসনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের আত্মার পূর্ণবিকাশ সাধন করা। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (খ্রি.পূ.৪২৭-৩৪৭), অ্যারিষ্টটল(খ্রি.পূ ৩৮৪-৩২২) এবং আধুনিক যুগের দার্শনিক হেগেল(১৭৭০-১৮৩১) ব্র্যাডলি (১৮৪৬-১৯২৪) প্রমূখ এ মতের প্রবক্তা।

কিন্তু উল্লেখিত মতবাদসমূহ শুধু মানবীয় জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর হওয়ার কারণে সময়ের ব্যবধানে এ সবের ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। যেমন, সুখবাদ (Hedonism) মতবাদে- সুখবাদীরা মনে করেন যে, সুখই পরম আদর্শ। কোন কাজ যে পরিমাণ সুখ দেবে তা সে পরিমাণ ভালো, আর কোন কাজ যে পরিমাণ দুঃখ দেয় তা সে পরিমাণ মন্দ। এখানে দেখা যাচ্ছে সুখবাদীরা আবেগ-অনুভূতি, প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়পরতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এ মতে, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, অলসতা, ইন্দ্রিয়ভোগ সবকিছুই সমর্থনযোগ্য। বিভিন্ন দিক থেকে এ মতটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ। অপরদিকে, বুদ্ধিবাদ (Rationalism) মতবাদে- বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধি-বিচারকে মানব জীবনের পরম কল্যাণ বলে মনে করেন। তাদের মতে, আবেগ-অনুভূতি মানুষকে নানা প্রলোভনের সাথে জড়িয়ে তাকে কামনা-বাসনার দাসে পরিণত করে। তাই মানুষের উচিত আবেগ-অনুভূতিকে অবদমিত করে বিশুদ্ধ বুদ্ধির ভিত্তিতে জীবন যাপন করা। এ মত অনেকটা চরমপন্থী মতবাদ। এতে মানুষের জীববৃত্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং কৃচ্ছ্রতাবাদ ও ইন্দ্রিয়-সুখকে বর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে। অথচ নৈতিক জীবনের উপাদান হল জীববৃত্তি বা অনুভূতি এবং একে বাদ দিলে নৈতিক জীবন একটি শূন্য কাঠামো ও অর্থহীন। আবার স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) মতবাদে- স্বজ্ঞাবাদীরা মানব আচরণের ভালো-মন্দ নিরূপণের ক্ষেত্রে নৈতিক স্বজ্ঞাকে একমাত্র অভ্রান্ত উপায় মনে করেন। কিন্তু স্বজ্ঞা যে সব ক্ষেত্রে অভ্রান্ত তা বলা যায় না। এটা যে অনেক সময় ভ্রান্ত হয় তারও বেশ নজির আছে। তাছাড়া ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে স্বজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং কোন কোন অবস্থায় এটা কার্যকর নাও হতে পারে। এতে নৈতিক বিচার খেয়াল-খুশীর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এবার আসা যাক পূর্ণতাবাদের বিষয়ে। আর পূর্ণতাবাদে (Perfectionism) মানুষের প্রবৃত্তিকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে একটি সুষম সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।পূর্ণতাবাদীরা সংবেদনশীল ও চিন্তাশীল জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আত্মোপলব্ধির কথা বলেন। যার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। কিন্তু সেই আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য কি কি বিধান মেনে কোন কোন কামনা-বাসনাকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করতে হবে– তার স্পষ্ট জবাব পূর্ণতাবাদে পাওয়া যায় না।[১]

এভাবে নৈতিকতার আদর্শ ও মানদণ্ড সম্পর্কে দার্শনিক ও নীতিবিদগণ একটি মতবাদ প্রচলনের পর সময়ের ব্যবধানে তার বিভিন্ন ক্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা প্রকাশ হলে তদস্থলে নতুন আরেকটি মতবাদের জন্ম দেন। উল্লেখিত মতবাদগুলোর মধ্যে তারা তুলনামূলকভাবে পূর্ণতাবাদকে উত্তম বললেও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের পক্ষে নৈতিক মানদণ্ড ও আদর্শ সম্পর্কে চূড়ান্ত, সর্বজন গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী কোন সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষ যত বড় জ্ঞানী-গুণী হোক না কেন মানবীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা খুব বেশি ও দ্রুত প্রভাবিত হয়। এটা তার জন্মগত সীমাবদ্ধতা। তাই মানুষের পক্ষে এ ব্যাপারে (নৈতিকতার আদর্শ ও মানদণ্ড নির্ধারণে) সর্বজন গ্রহণযোগ্য, চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী কোন সমাধান প্রদান করা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে মতপার্থক্য। তাই এক্ষেত্রে মানুষ নৈতিকতার মানদণ্ডের নির্ধারক হতে পারে না। আর এ সব ব্যাপারে অন্ধ বা শর্তহীনভাবে কারো মতবাদ মেনে নেয়া যায় না। জ্ঞানের নির্ভুল উৎসই কেবল এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, স্থায়ী ও সর্বজনীন উৎস ও মানদণ্ড হতে পারে।

জ্ঞানের চূড়ান্ত নির্ভুল উৎসই কোনটি?–এ নিয়েও কেউ কেউ মতভেদ করতে পারে, তবে এটা সুস্পষ্ট যে, কিছু সংখ্যক নাস্তিক ছাড়া সবাই বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, মহাপ্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান, পরম ন্যায়পরায়ন, নিরপেক্ষ, সকল ভুল-ক্রুটি, দুর্বলতা ও প্রভাবমুক্ত একক সার্বভৌম সত্তা। তিনি প্রকাশ্য, গোপন, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সাম্যক অবগত। তিনি স্থান, কাল, সময়সহ সকল প্রকার সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে। তাঁর জ্ঞানই কেবল নির্ভুল, অপরিবর্তনীয়, সার্বজনীন ও চূড়ান্ত সত্য। এমতাবস্থায় ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যসূচক সর্বাপেক্ষা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হতে পারে কেবল বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান বা 'ওহী'। কারণ মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে [আল-কুরআন ১৭:৮৫]। মানুষের চিন্তাপ্রসূত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তা ভুল-ক্রুটির উর্দ্ধে নয়। কিন্তু ওহীর জ্ঞানের এরূপ কোন সীমাবদ্ধতা নেই, বরং তা মানব জাতির জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর ও সর্বজনীন। মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও চিন্তা শক্তি যেখানে গিয়ে থেমে যায় এবং যেখানে মানুষ গভীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয় না। ওহী সেখানে সুস্পষ্টভাবে মানুষকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রদান করে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। তাই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের শাশ্বত নির্ভুল উৎস ও মানদণ্ড হতে পারে কেবল ওহী বা

[১].দেখুন, প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্ত, *নীতিবিজ্ঞান*, (কলিকাতা: ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ২০০৯) পৃ.৮৫-৮৭, ১০৮, ১১৯-১২০,১৩১; এবং ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *নীতিবিদ্যা*, পৃ.৭৭-৮২।

আসমানী গ্রন্থ। আর ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যসূচক নৈতিক মানদণ্ড যেহেতু সার্বিকভাবে মানব কল্যাণকর হতে হয় তাই এক্ষেত্রে ওহী সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ শামছুল হক আফগানী[১](১৯০০-১৯৮৩) বলেন-[২]
মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নীতি নির্ধারণের জন্য মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি বিভিন্ন কারণে যথেষ্ট নয়। কারণ ১.মানুষের লব্ধ জ্ঞানসমূহ বিজ্ঞানের নীতিমালার অধীনে, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত। আর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মূলনীতিসমূহ আকাইদ [বিশ্বাসবলী], আখলাক ও আমলের বৈশিষ্ট্যবলীর পরিচিতি ও অবগতি হতে গৃহীত। যা পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও অনুভূতির গণ্ডি বহির্ভূত। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে এগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, বরং এগুলোর জন্য কোন গবেষণাগারও নেই। ২.জ্ঞান অধিগত সিদ্ধান্তে সংশয় অনুপ্রবেশের সম্ভবনা থাকে যদ্দরুণ জ্ঞান নির্ভর সিদ্ধান্তসমূহে ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়ে থাকে। ৩.জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরস্পর পার্থক্য ও বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সুস্থ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিমাণ কম এবং বিকৃত ও অশুদ্ধ জ্ঞানসমূহের পরিমাণ সে সব ক্ষেত্রে অধিক। ৪.জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্ত অনেক সময় আবেগের অধীনে হয়ে থাকে, যদ্দরুণ তার বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রায়শ অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। এ কারণেই আল্লাহ্‌র পরিচয় ও নবুওতের তাৎপর্য অনুধাবন, কর্মের প্রতিদান, পারলৌকিক বিষয়াবলী এবং সঠিক ও ভুল কার্যাবলী সম্পর্কে পৃথিবীর জাতিসমূহের জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী।...তাই এসব বিষয়াদির ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বরং এতে ওহী ও আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআন:

জ্ঞানের চূড়ান্ত নির্ভুল উৎস হিসেবে ওহী ও আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের ইতিহাসে ওহী বা আসমানী কিতাবধারীরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। আসমানী কিতাবধারীদের মধ্যে বর্তমান পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হলো ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলিম। কিন্তু কালের পরিক্রমায় ইহুদি ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ বিকৃত হওয়ার ফলে তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল বা বাইবেল আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী তাওরাত ও ইঞ্জিল বলা যায় না। কারণ নাযিলকৃত তাওরাত কিংবা ইঞ্জিল তাঁর মূল ভাষায় পাওয়া যায় না। বরং এগুলো গ্রিক, হিব্রু ও আরামীয় ভাষায় লিখিত ধর্মীয় পণ্ডিতদের অনেকগুলো পুস্তকের সংগ্রহের সমন্বয়ে প্রণীত ও মানব সম্পাদিত। এতে কতটুকু আল্লাহ্‌র বক্তব্য অবিকৃত আছে তাও বলা মুশকিল। বিকৃতির পরও সেগুলোতে কিছু সত্য বিষয় থাকতে পারে কিন্তু মূলগ্রন্থ বিকৃতি ও মানব সম্পাদিত হওয়ায় প্রকৃত আসমানী কিতাবের মতো সে সব গ্রন্থের বক্তব্য নির্দিধায় গ্রহণ করা যায় না।

তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আল-কুরআন, যা বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত অবিকৃত ওহী। আল-কুরআন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ ও বিকৃতি থেকে মুক্ত। চূড়ান্ত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে এর জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। জীবন, জগত ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত এই মহাগ্রন্থ প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গি সহজ-সরল, সুসমন্বিত, কালোত্তীর্ণ, সর্বজনীন, পরিপূর্ণ, ত্রুটিমুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং মানবপ্রকৃতির সাথে সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ। প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল বা বাইবেল নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনের সমকক্ষ হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও এসব ধর্মগ্রন্থের যতটুকু নৈতিক শিক্ষা আল-কুরআনের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আর যতটুকু শিক্ষা আল-কুরআনের শিক্ষার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া আর যে সব ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মমত রয়েছে তাতে নৈতিক নির্দেশনা থাকলেও তার সাথেও আল-কুরআনের কোন তুলনা হতে পারে না। কেননা এ সবের অধিকাংশই মানব প্রবর্তিত এবং সেগুলোতে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলোতে মানব জীবনের নির্ভুল, চিরন্তন, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ সামাধান নেই। তাই বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনের থাকার পর অন্য উৎস থেকে মূল্যবোধ ও জীবনাদর্শ খোঁজা শুধু নিস্প্রয়োজনই নয়, বরং তাতে বিভ্রান্তির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ্‌ বলেন[৩] (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ) "আর এটিই(কুরআন) আমার সরল-সঠিক পথ। অতএব তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা হাদীসে বলা হয়েছে, একবার রাসূল (সা.) একটি রেখা টানলেন এরপর বললেন, এটা হচ্ছে আল্লাহর পথ। এরপর এর ডানে-বামে কিছু রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এগুলো হলো এমন পথ যার প্রত্যেকটিতে আছে একটি করে শয়তান, যেদিকে সে ডাকে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।[৪] তাই বলা যায়, মহান আল্লাহ প্রদত্ত সরল পথ তথা আল-কুরআন বা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথে অগ্রসর হলে বিভ্রান্ত নিশ্চিত। কুরআনের অন্য স্থানে বলা হয়েছে-[৫] (وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن

---

[১].শামছুল হক আফগানী, আফগান বংশোদ্ভুত বিংশ শতকের পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলিম ও কুরআন গবেষক।তিনি ভারতের বাহওয়াল জামেয়া ইসলামিয়ার উলুমূল কুরআন বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কুরআন বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা '*উলুমূল কুরআন*' এর বাংলায় অনুবাদ '*মানব জীবনে আল-কোরআনের প্রয়োজনীয়তা*'।

[২].শামছুল হক আফগানী, *মানব জীবনে আল-কোরআনের প্রয়োজনীয়তা*, অনু.এ.কে.এম.আব্দুল লতিফ চৌধুরী(ঢাকা:এমদাদিয়া পুস্তকালয়,১৯৯৬),পৃ.১-২[সংক্ষেপিত]।

[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১৫৩।

[৪]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.১, পৃ.৪৬৫ হা.নং ৪৪৩৭, ইবনু মাজাহ, খ.০১, হাদীস নং ১১।

[৫] . আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১১৬।

(يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) "আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথার অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে।"

এমতাবস্থায় মানব জাতির জন্য ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়-বর্জনীয় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের অন্য যে কোন ধর্ম বা মতাদর্শ অপেক্ষা প্রশ্নাতীতভাবে বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড হতে পারে কেবল আল-কুরআন। কেননা আল-কুরআনই সুসংরক্ষিত চূড়ান্ত ওহী ও মহান আল্লাহ নির্দেশিত একমাত্র গ্রহণযোগ্য সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথ। এখানেই মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক নীতিমালা দেয়া হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ বলেন-[১] (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) "রামাদান মাস, এতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত (সৎপথের দিশারী) এবং হিদায়াতের (সৎপথের) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[২] (إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) "নিশ্চয়ই এটা (কুরআন) মীমাংসাকারী বাণী।"

আমরা জানি যে, মানব ইতিহাসে অনেক নাবী-রাসূলের অবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে নূহ('আ.), হূদ ('আ.), ও সালিহ ('আ.) কে তাদের জাতি, মূসা ('আ.) কে সমসাময়িক শাসক ফিরআউন, মুহাম্মাদ (সা.) কে মক্কার কাফিররা মিথ্যাবাদী ও ফাসাদসৃষ্টিকারী হিসাবে গণ্য করেছিল। অথচ বাস্তব অবস্থা বিষয় ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ ফাসাদসৃষ্টিকারী ও মিথ্যাবাদীরাই সত্যবাদী রাসূলগণকে অন্যায়ভাবে মিথ্যাবাদী ও ফাসাদসৃষ্টিকারী সাব্যস্ত করেছিল। এ মর্মে কুরআনের ভাষ্য[৩]

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ- إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ... وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)

আমি আমার নির্দশন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম; ফিরআউন, হামান, কারূনের নিকট; কিন্তু তারা বলেছিল, এই লোকটা তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। ...ফিরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করি, এবং সে তাঁর প্রতিপালকের শরনাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ফিরআউন জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নিজেকে শান্তিকামী ও সত্যবাদী দাবী করে মূসা ('আ.) কে মিথ্যাবাদী ও ফাসাদসৃষ্টিকারী চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। অথচ ফিরআউনই ছিল মিথ্যাবাদী ও ফাসাদসৃষ্টিকারী। এভাবে যুগে যুগে দুস্কৃতিকারীরা মানুষকে সত্যের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত ও ন্যায়-অন্যায় নিয়ে এই মতপার্থক্য আদিকাল থেকে মানুষের মধ্যে চলে আসছে। আজও পৃথিবীতে এ অবস্থা বিদ্যমান। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের পক্ষে এর সমাধান সম্ভবপর হয়নি। এমতাবস্থায় সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, সত্যবাদী-মিথ্যাবাদী, সরল-হঠকারী, ভদ্র-ইতর, মুক্তি ও ধ্বংসের পথ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করার নিরপেক্ষ মানদণ্ড থাকা উচিত– যা মানুষকে এ ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনা দিবে। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, চূড়ান্ত কল্যাণের অধিকারী, পরম ন্যায়পরায়ন ও নিরপেক্ষ সত্তা বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ই কেবল এর সমাধান দিতে পারে। বলাবাহুল্য, আল-কুরআনই সেই নিরপেক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক মানদণ্ড।[৪] এই মহাগ্রন্থে মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন। মানব সমাজে সত্য ও ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন করার জন্য তিনি এই মহাগ্রন্থ নাযিল করেছেন। তাই আল-কুরআনের মানদণ্ডে যা উত্তীর্ণ তা-ই ভালো, সত্য ও সঠিক; আর যা এই মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ তা-ই মন্দ, মিথ্যা ও বাতিল। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) আল-কুরআনকে সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্যকারী মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরে ইরশাদ করেন-[৫],

> আল্লাহ্র কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সংবাদ রয়েছে। তোমাদের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ আছে। তোমাদের পার্থিব জীবনের হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ আছে। তা হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী। তাতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু নেই। অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি এটিকে পরিত্যাগ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। যে এটা ভিন্ন অন্য কিছুতে হেদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেবেন। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত মজবুত রজ্জু। এটি প্রজ্ঞাপূর্ণ স্মরণিকা এবং একটি সরল-সহজ পথ। প্রবৃত্তির অনুসারীরা এটিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে না। অন্য কিছু এর সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এর অধ্যয়ন ও জ্ঞানান্বেষণে জ্ঞানীগণ পরিতৃপ্ত হবে না। পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াতে এর স্বাদ হ্রাস পাবে না। এর অভিনবত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। জিন্নেরা যখন এ কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা থেমে থাকেনি। বরং তারা বলে উঠে, 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' [আল-কুরআন,৭২:১-২] যে ব্যক্তি এ কুরআন অনুসারে কথা বলবে সে সত্য কথা বলবে। আর যে এর অনুসারে 'আমল করবে সে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে। যে এর অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে সে ন্যায়বিচার করবে। আর যে এর প্রতি আহবান জানাবে সে সঠিক পথের দিশাপ্রাপ্ত হবে।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ: আয়াত ১৮৫।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আত-তারিক: আয়াত ১৩।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন : আয়াত ২৩-২৪,২৬।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ১০৮।

[৫]. **মূল আরবী**[كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا { **إنا سمعنا قرآنا عجبا** } { **يهدي إلى الرشد** } من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مسقيم خذها إليك يا أعور] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, হা. নং ২৯০৬।

উল্লেখ্য যে, ইসলামে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সহ জীবনের সব সমাধানের ব্যাপারে প্রধানত ওহী নির্ভর তথা আল-কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক হলেও ইজতিহাদ বা সুস্থ বুদ্ধি-বিবেকের প্রয়োগ ইসলামে স্বীকৃত। তাই নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কে দার্শনিকদের প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ যেমনঃ সুখবাদ(Hedonism), বুদ্ধিবাদ(Rationalism), স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism), পূর্ণতাবাদ(Perfectionism) বা মানব প্রবর্তিত নীতিদর্শনের অন্য মতবাদের সবই ভুল কিংবা এসবে সত্যের কোন অংশ নেই– আমরা সে কথা বলি না। বরং বলি পাশ্চাত্য বা অমুসলিমদের দর্শনে জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎস ওহী উপেক্ষিত হওয়ার ফলে তাদের প্রতিটি মতবাদ ত্রুটি-সংকীর্ণতার উর্দ্ধে নয়। এ কারণে তাদের মতবাদগুলো অনিবার্যভাবেই বারংবার পরিবর্তন ঘটেছে। একটির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতা প্রকাশ পাওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে তদস্থলে নতুন আরেকটি মতবাদের জন্ম হয়েছে। এভাবে শুধু মানবীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে দার্শনিক ও নীতিবিদ এ সমস্যার যে সমাধানের চেষ্টা করেছেন ওহীলব্ধ জ্ঞান প্রত্যাখান করার কারণে তার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হননি। তবে এ সবে যতটুকু সত্য আছে এবং যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। আর যতটুকু ভুল এবং কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক তা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ সব মতবাদ যেহেতু ত্রুটির উর্দ্ধে নয়, তাই এগুলো নৈতিকতার মূল মানদণ্ড বা আর্দশ হতে পারে না এবং তা অন্ধভাবে কোন মানুষের জন্য মেনে নেয়া সম্পূর্ণ অনুচিত ও সুস্থ বিবেকের পরিপন্থী। তবে এ সব মতবাদে যতটুকু সত্য আছে সেগুলো মূল নৈতিক মানদণ্ডের সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে ওহী তথা আল-কুরআনের শিক্ষাকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে এর সাথে মানবীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ধর্ম, দর্শন ও মানব প্রবর্তিত মতাদর্শের মত কুরআনকে সাধারণ কোন আদর্শ ও মানদণ্ড গণ্য করা উচিত নয়। কেননা আল-কুরআন অতি মর্যাদাপূর্ণ।[আল-কুরআন ৪১:৪১] নৈতিক আদর্শ ও মানদণ্ডের ক্ষেত্রে কুরআন যে বিধি-বিধান দিয়েছে তা সর্বাবস্থায় অনন্য, অতুলনীয় ও সর্বজনীন। কুরআন প্রদত্ত সেই মূল্যবোধ নির্ভুল, পরম সত্য ও সর্বাপেক্ষা ভারসাম্যপূর্ণ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার জন্য এর প্রবর্তন হয়েছে। তাই অন্যান্য ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষ নৈতিক বিধানের চেয়ে এই নৈতিক বিধান পৃথক, সম্পূর্ণ নিজস্ব ও পূর্ণাঙ্গ।

কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ওহী বিশেষ করে আল-কুরআন উপেক্ষার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারা গ্রিক, ইহুদী ও খৃষ্টান নীতিদর্শন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেও আল-কুরআন বা ইসলামী নীতিদর্শনের ব্যাপারে এক ধরনের নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অথচ খ্রীস্টিয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম জাতি পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে বিরাট অবদান রাখেন। এ দীর্ঘ সময় তারা বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ অজ্ঞতাবশত হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক এ ব্যাপারে তারা সঠিক মূল্যায়ন করেনি। তারা গ্রিক নীতিবিদ্যা আলোচনার পর সরাসরি আধুনিক নীতিবিদ্যা বা দর্শনের আলোচনায় এসেছেন। ইসলামী নীতিদর্শনের বিষয়টি তারা সরাসরি এড়িয়ে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে *The Moral World of the Qur'an* গ্রন্থে বলা হয়েছে-[১]

> A cursory glance at the treatises on general ethics written by western scholars is enough to observe that they leave a great void in this field, due to their absolute silence on Qur'anic ethics. In effect, these treatises tell us at considerable length about moral principles such as they have been viewed in Greek paganism, and then in the Jewish and Christian religious, but once these three period have been covered, they suddenly transport us, with a brisk leap to modern times in Europe, leaving aside everything that touches upon moral law in Islam.

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ওহী বা আসমানী গ্রন্থ বিশেষ করে আল-কুরআন উপেক্ষার প্রবণতা এবং ধর্মহীন নীতিদর্শনের মন্দ চর্চার পরিণতি শুভ নয়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট দার্শনিক আলিম মও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম(১৯১৮-১৯৮৭ খৃ.)বলেন-[২]

> প্রাচীন গ্রীসের নীতি দার্শনিক কিংবা বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার নীতি বিজ্ঞানী–যাঁরাই হোন, তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজিত ও সদা কার্যকর নিয়মের অধ্যয়ন ও গবেষণায় যতই ব্যতিব্যস্ত হোক না কেন, মানুষের জন্য বিশ্বস্রষ্টার নাযিল করা আইন-বিধান অধ্যয়ন ও অনুধাবনে তাঁরা কিছুমাত্র আগ্রহী নন। এ কারণে যে সব জটিল ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে বুদ্ধি-বিবেক অকেজো প্রমাণিত, সেই সর্বক্ষেত্রেও তাঁরা অনুরূপতা ও তত্ত্বানুসন্ধানের তীর অন্ধভাবে নিক্ষেপ করে প্রকৃত সত্য পথের সন্ধান করতে সচেষ্ট। এরই ফলে মানুষের নৈতিকতার গোটা ব্যাপারটি অর্থহীন ও নিষ্ফল তর্ক-বিতর্কে পরিণত হয়েছে। তার দ্বারা মৌলিক প্রশ্নের জবাব পাওয়া বা আসল সমস্যার সমাধান হওয়া একেবারেই সম্ভব হয়নি। মানবতার ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে, আল্লাহর নাযিল করা ওহী ও বিধান ছাড়া বিশ্ব-মানবতার নৈতিক সমস্যার কোন সমাধান কোন কালেই পাওয়া যায়নি, নৈতিকতা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের নির্ভুল জবাব দেয়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। বর্তমানে মানবতা যে পরিমণ্ডলে জীবন অতিবাহিত করছে, তার পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাও আমাদের বলে দিচ্ছে, এই সমস্যা সমাধানে...মানুষের কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করতে পারছে না। এ দুনিয়া বস্তুগত দিক দিয়ে যত উন্নতিই লাভ করছে, নৈতিকতার দিক দিয়ে ততই ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

---

1. Dr. M. A.Draz, *The Moral World of the Qur'an,* Trans. D.Robinson and Others (London:IB Tauris Co. ltd, 2008)p.1.

২. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের নীতি দর্শন* (ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ২০০১), পৃ.৪৬-৪৭।

বস্তুগত প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও নৈতিক অধঃপতনের সর্বাত্মক বিপর্যয় লক্ষ্য করে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেও আজও কোন ফলপ্রসূ সমাধানে উপনীত হতে পারেননি। অথচ বিশ্বব্যাপী মানুষের নৈতিক অধঃপতন ক্রমে ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় আল্লাহ কর্তৃক নাযিল করা বিধান ছাড়া নৈতিক এই মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া কিংবা নৈতিক পূণর্জাগরণ সম্ভব নয়। আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত নৈতিক বিধান দ্বারা মন স্বস্তি লাভ করে এ কারণে যে-এটা নির্ভুল, মানুষের চিন্তাপ্রসূত কথার মত নয়। এটা স্বয়ং সেই মহান সত্তার, যিনি মহাবিশ্ব ও মানুষের স্রষ্টা। স্রষ্টা হিসেবে তিনি তাঁর সৃষ্টির সমস্যার সঠিক সমাধানদাতা ও সর্বাধিক হকদার। আর এটাই আল-কুরআনের নীতিদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব।

মূল্যবোধের উৎস ও মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনের মূল্যমান ও বিশেষত্ব:
নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্ন আদর্শ ও মানদণ্ড প্রচলিত থাকলেও কুরআন প্রচলিত অন্যান্য আদর্শ ও মানদণ্ডের মত কোন আদর্শ বা মানদণ্ড নয়। বিভিন্ন দিক দিয়ে তা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সংক্ষেপে এর কিছু বিশেষত্ব তুলে ধরা হল:

কুরআন মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত, পরম মহাসত্য, নির্ভুল ও সর্বপ্রকার ক্রটিমুক্ত: মানব চিন্তাপ্রসূত ও অভিজ্ঞতালব্ধ কোন জ্ঞান বা মতবাদ ভুল-ক্রটি মুক্ত নয়। এই জ্ঞান বা মতবাদ যেমন সত্য হতেও পারে, তেমনি ভ্রান্তও হতে পারে। এসবের কোনটি ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত কুরআন এরূপ ভুল-ক্রটি ও সংশয়ের সম্পূর্ণ উর্দ্ধে। এটি পরম সত্য। এর বিশুদ্ধতা প্রশ্নাতীত। এর জ্ঞানভাণ্ডারের সব তথ্য ও তত্ত্ব সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ, নির্ভুল, সর্বপ্রকার ক্রটিমুক্ত, সুসংরক্ষিত ও অবিকৃত। এতে কোন অসত্য বা সন্দেহের বিন্দুমাত্র লেশ নেই।[১] এর প্রতিটি বাণী অতি মর্যাদাপূর্ণ। এর নৈতিক বিধান পরম সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহ্ বলেন[২] إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ "আর এটি অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।" অন্যত্র বলেন–[৩] (وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ) "আর আমি সত্যসহ তা নাযিল করেছি এবং সত্যসহই তা নাযিল হয়েছে।"
উল্লেখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ কুরআনকে জ্ঞানের নির্ভুল মহাসত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।তাই মানব জীবনের যে কোন দিকের ব্যাপারে বিশুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে কুরআনকে সামনে রাখতে হবে। এই নির্ভুল মহাসত্যকে বাদ দিয়ে শুধু মানব প্রবর্তিত জ্ঞান বা মতবাদ দ্বারা মানব জীবনের কোন দিকের সঠিক ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণকারী: আল-কুরআন সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। এতে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও হালাল-হারামের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। মানুষের জন্য কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা করে এতে ভালো-মন্দ ও হালাল-হারাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সমর্কে বলা হয়েছে-[৪](الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) "যারা অনুসরণ করে এমন এক রাসূলের যিনি নিরক্ষর নাবী,...তিনি তাদের সৎ কাজের আদেশ দেন ও নিষেধ করেন মন্দ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।"

শান্তি, কল্যাণ, সত্য ও সরল-সঠিক পথের দিশারী এবং ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির মহাআলোকবর্তিকা: আল-কুরআন মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতে যাবতীয় কল্যাণ, সফলতা ও সৌভাগ্যের উৎস।[৫] এটা বিশ্ববাসীর ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী এবং সত্য, কল্যাণ, শান্তি ও সরল-সঠিক পথের পথ প্রদর্শক। এর নির্দেশিত পথই প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তি নিহিত, আর এর নিষিদ্ধ পথই মন্দ ও অকল্যাণকর। এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ সকল ভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা ও মন্দ বিষয় থেকে মুক্তি লাভ করে লাভ করতে পারে। এটা সরল-সঠিক পথের এক মহাব্যবস্থাপত্র এবং সত্যের পথনির্দেশকারী। এটা বাতিল(অসত্য বা মিথ্যা) অশান্তি ও গোমরাহীর সকল অন্ধকারজগত থেকে পরিত্রাণকারী মহাআলোকবর্তিকা। এর দ্বারাই বিশ্বমানবতা সর্বপ্রকার ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা এবং অসত্যের অমানিশা থেকে মুক্তি পেতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ সকল ভ্রষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতা ও মুক্তি লাভ করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন[৬]–(الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) "আলিফ-লাম-রা; এ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন তাদের রবের অনুমতিক্রমে, পরাক্রমশালী, প্রশংসাভাজন

[১] .আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১- ২।
[২] . আল-কুরআন, সূরা হা-মীম-আস-সাজ্‌দাহ ৪১: আয়াত ৪১-৪২।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা'১৭: আয়াত ১০৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১০ : ১০৮।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৫৭।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল : আয়াত ৩০।
[৬] .আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম : আয়াত ০১; এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ৫৭ : ০৯।

আল্লাহর পথের দিকে।” অন্যত্র বলেন-[১] (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)-“এ আল-কুরআন মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা (দিব্য জ্ঞানের উৎস) এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।” আরও বলেন-[২]

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ- يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে এক জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং স্বীয় অনুমতিক্রমে তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তাদেরকে সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ কুরআনকে বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি-কল্যাণের উৎস, সত্যের এক মহাআলোকবর্তিকা ও হিদায়েতের উৎস হিসেবে তুলে ধরেছেন। সৎপথের পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। তাই প্রকৃত কল্যাণ ও সত্যের সন্ধান পেতে হলে এই মহাজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতে হবে। এর পথনির্দেশনা অনুসরণ করলেই মানুষ প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তি লাভ এবং সকল অকল্যাণ ও অন্ধকারজগত থেকে মুক্তি অর্জনে সক্ষম হবে। এ প্রসংঙ্গে নাবী সা. বলেছেন[৩]

নিশ্চয়ই কুরআন হল আল্লাহর রজ্জু, প্রোজ্জ্বল আলো ও অব্যর্থ নিরাময়। একে যে আঁকড়ে থাকবে, তার জন্য এটা হবে রক্ষা কবচ। যে এর অনুসরণ করবে, তার জন্য হবে মুক্তিদাতা। সে পথভ্রষ্ট হবে না যে, তাকে ভর্ৎসনা করা হবে না, আর বক্র হবে না যে, তাকে সোজা করতে হবে।

নৈতিকতার পরিপূর্ণ উৎস ও মানদণ্ড: আল-কুরআন মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নৈতিক নীতিমালা দেয়া হয়েছে। এতে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, সামাজিক আচরণ, লেন-দেন, চারিত্রিক ও আত্মশুদ্ধিসহ সবধরনের নৈতিক নির্দেশনা রয়েছে। এই নীতিমালা পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন। তাই অন্যান্য নৈতিক বিধানের চেয়ে এর নৈতিক বিধান পৃথক। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্ন আদর্শ ও মানদণ্ড প্রচলিত রয়েছে। এ সব আদর্শ ও মানদণ্ডের কোনটি পরিপূর্ণ নয়। কেবল কুরআনই পূর্ণাঙ্গ নৈতিক আদর্শ ও মানদণ্ড। এর নৈতিক বিধানই মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর, সকল বিভ্রান্তি ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের স্থায়ী শান্তি ও মুক্তি। মহান আল্লাহ বলেন–[8] وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ “আর আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি–প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ,এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদরূপে।”

মুফতী মুহাম্মদ শফী(মৃ.১৯৮৭খৃ.) বলেন[৫], “কুরআন এমন একখানি কিতাব যাতে রয়েছে প্রাচীন ও নব্য যুগের নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ এবং ব্যক্তি জীবন হতে শুরু করে সমাজ জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে সর্বোত্তম পন্থার নির্দেশ, মানবের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা এবং গৃহস্থলী হতে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যাপারের সর্বোত্তম নির্দেশনাবলী।”

বিশ্বজনীন, শাশ্বত ও কালোত্তীর্ণ: তাওরাত, ইঞ্জিলসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ নির্দিষ্ট কাল ও জাতির সম্পর্কযুক্ত ছিল, কিন্তু আল-কুরআন এর ব্যতিক্রম। এর শিক্ষা ও আদর্শ শাশ্বত, কালোত্তীর্ণ, বিশ্বজনীন, অপরিবর্তনীয় ও অতুলনীয়। মানব প্রবর্তিত বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির মত এটা পরিবর্তনশীল নয়। এর বিধি-বিধান এতই ভারসাম্যপূর্ণ যে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এই মহাগ্রন্থ নির্দিষ্ট জাতি, অঞ্চল বা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার সর্বকালের মানুষের জন্য এর শিক্ষা ও বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই এটাই বিশ্ববাসীর নৈতিক মানদণ্ড হওয়ার উপযোগী। মহান আল্লাহ্ বলেন[৬] (وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ- قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) “আর (এটা) মুমিনদের জন্য হিদায়াত(সত্যের পথনির্দেশকারী) ও রহমত। বল, ‘আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতে (অবতীর্ণ হয়েছে)। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়’। এটি তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম।”

মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল : আল-কুরআন নৈতিকতার এমন মানদণ্ড যে, এর বিধি-বিধান মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল। এখানে মানুষের জন্য সার্বিক কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা করে হালাল-হারাম ও করণীয়-বর্জনীয় নির্দেশনাবলী প্রদান করা হয়েছে।[৭] এতে এমন কোন বিধি-নিষেধ ও কর্তব্য-দায়িত্ব নেই যা মানব প্রকৃতির সাথে অসংগতিশীল। অধিকন্তু, স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব কাজ করা নিষিদ্ধ, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কুরআন ব্যক্তিকে সে সব কাজ করার অনুমতি দেয়। এই ধরনের পরিস্থিতি যতক্ষণ বিরাজ করবে ততক্ষণ সে আল্লাহ্‌র দেয়া নৈতিক বিধান পালনে ব্যর্থ হলে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে না। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৮]– إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ “নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ২০।

[২] . আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত ১৫-১৬, এছাড়া দেখুন, আল-কুরআন ১০: ২৫।

[৩].মূল আরবী [إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه] হাফিয আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৭হি.), খ.০২, পৃ.২৩১, কিতাবু কিরআতিল কুরআন, হা. নং ২২০৮।

[8] . আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল : আয়াত ৮৯. আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম: আয়াত ৩৮।

[৫] *কোরআন পরিচিতি*, সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭-১৮।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ৫৭-৫৮।

[৭] . দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৫৭।

[৮] . আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১৭৩।

জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং তা যা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে। তবে যে নিরূপায় হয়ে পড়ে, অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

সহজ-সরল ও জটিলতামুক্ত: আল-কুরআন প্রদত্ত জীবনাদর্শ সহজ-সরল, সঠিক ও সুদৃঢ়। এর বিধান সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে মানুষের জন্য এমন কোন পথ বাতলে দেয়া হয়নি, যা অসংগতিপূর্ণ। এতে নেই কোন জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধী নৈতিক বিধান। এর বিধি-বিধান অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এটা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন উত্তম পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বপ্রকার বক্রতামুক্ত এবং সর্বদিক দিয়ে সরল-সঠিক ও জটিলতামুক্ত। এর শিক্ষার মধ্যে নেই কোন উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি। তাই ভালো-মন্দের মানদণ্ড হিসেবে এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন-[১] (إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)''এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে যা সর্বাদিক দিয়ে সরল।" অন্যত্র ইরশাদ করেন-[২] (قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)''আরবী ভাষায় কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে।" উদ্ধৃত আয়াতসমূহে নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে আল-কুরআনকে মানুষের সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

আত্মিক পীড়ার মহৌষধ: দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত একজন মানুষ। কুখাদ্য, প্রতিকূল আবহাওয়া ও অসামঞ্জস্য কর্মকাণ্ড যেমন দেহের পীড়ার কারণ তেমনি পাপাচার, কুশিক্ষা, কুচিন্তা, মন্দকাজ ইত্যাদি আত্মিক পীড়ার কারণ। দৈহিক পীড়ার জন্য যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন তেমনি আত্মিক পীড়ার সুস্থতার জন্য নির্ভুল চিকিৎসা প্রয়োজন। বিশেষ করে নৈতিক উন্নয়নের জন্য আত্মিক সুস্থতা ও পরিশুদ্ধি জরুরি। মানব জীবনের ব্যবহারিক দিকের ন্যায় কুরআন মানুষের নৈতিক-আত্মিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান প্রদান করেছে। মানুষের নৈতিক, আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্রে কুরআন অতুলনীয় অভ্রান্ত ও অব্যর্থ মহৌষধ। মহান আল্লাহ্ বলেন[৩] (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) "হে মানবকুল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা (যে ব্যাধি) আছে তার প্রতিকার এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত ও রহমত।" অন্যত্র বলেন[৪] (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا) "আর আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, আর তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ কুরআনকে মানব মনের কলুষতা, সংকীর্ণতা, দ্বিধা, সংশয়, কপটতা, শিরক ও বক্রতা ইত্যাদি দূরীভূত করার এবং আত্মশুদ্ধি লাভের এক মহৌষধ ও রহমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এই ঔষধ থেকে উপকৃত হওয়ার একটি শর্ত হলো এর প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে ঈমান এনে তদানুযায়ী কাজ করতে হবে, নতুবা তা থেকে উপকৃত হওয়া যাবে না। এজন্যই দেখা যায় যে, অনেক অমুসলিম সারা জীবন কুরআন চর্চা করলেও তা থেকে উপকৃত হতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের অনুসারী দাবী করার পরও আজকের নামধারী মুসলিমরাও কুরআনের কিছু শিক্ষা পালন করলেও অধিকাংশ শিক্ষা অমান্য করে তারা নানা অন্যায়, অনাচার, দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত। ফলে আজ তারা পৃথিবীতে নানা লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অশান্তি, ক্ষতি ও বিপর্যয়ে জর্জরিত।[৫]

পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড: কুরআন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ একটি সমৃদ্ধ ও পরীক্ষিত উৎস। বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন মতাদর্শ তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে অসম্পূর্ণতা থাকায় তা সফলতা ও স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারেনি। ব্যতিক্রম কুরআন, এই মহামূল্যবান পরশপাথরের সংস্পর্শে যারাই এসেছে তারাই উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জন করে উত্তম মানুষে পরিণত হয়েছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের চরম বর্বর, অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতি আল-কুরআনের সংস্পর্শে এসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিল। উন্নত মূল্যবোধ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সুসভ্য জাতি, কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আল-কুরআন প্রদত্ত সেই উন্নত মূল্যবোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে আজও যে কোন জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং অশান্তিময় পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ সার্বিক মুক্তি অর্জন করতে পারে। মহান আল্লাহ্ যথার্থই বলেছেন[৬] (وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) "আর এই কিতাব-যা আমি নাযিল করেছি–অতি বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।"

সর্বপরি, আল-কুরআনের জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সুসংরক্ষিত ও চূড়ান্ত। তা প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল বা বাইবেলসহ অন্যান্য ঐশী ধর্মগ্রন্থ থেকে ব্যতিক্রম। অধিকন্তু, যে সব ধর্মগ্রন্থ মানব

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ০৯।
[২] . আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার : আয়াত ২৮। এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন ১৮:০১।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ৫৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৮২, এছাড়াও আল-কুরআন ৬২: ০২।
[৫]. দেখুন, সূরা আল-বাক্বারাহ :আয়াত ৮৩," তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"]
[৬] . আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১৫৫।

প্রবর্তিত সেগুলোতে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ কারণে সেগুলো আল-কুরআনের সমকক্ষ নয়। তাই আল-কুরআনের বিপরীত এ সব মানদণ্ডে বিভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আল-কুরআনই নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

আল-কুরআনে বর্ণিত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবাধের শিক্ষা সম্বলিত একটি স্থানের নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো[১]–

(قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاتَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْالْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلاَتَقْتُلُواْالنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّبِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون-وَلاَتَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْالْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَنُكَلِّفُ نَفْسًاإِلاَّوُسْعَهَاوَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىوَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)

"বলুন, 'এসো, আমি পড়ে শুনাই যা তোমাদের উপর তোমাদের রব হারাম করেছেন, তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না– আমিই রিয্ক দেই তোমাদের ও তাদেরও। আর অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না– তা প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক। আর ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তোমরা কাউকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, উত্তম পন্থা ছাড়া– যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়। আর পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে, যদিও সে নিকটাত্মীয় হয় এবং আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এসব নির্দেশ তিনি তোমাদের দিয়েছেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

কাজেই বলা যায়, আল-কুরআন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য, শাশ্বত ও সর্বজনীন উৎস ও মানদণ্ড। এই গ্রন্থ মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীত। কেননা সৃষ্টিকর্তাই তাঁর সৃষ্টির স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তাই নৈতিকতা সংক্রান্ত কুরআন প্রদত্ত আদর্শ ও বিধি-নিষেধই চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে ! এটা গ্রহণের মাধ্যমেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহ ও পরকালীন সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণ। আর দার্শনিক ও নীতিবিদগণ নৈতিকতার আদর্শ ও মানদণ্ড সম্পর্কে যে সব মতবাদ দিয়েছেন তা মানবীয় জ্ঞান, যুক্তি ও অভিজ্ঞতা নির্ভর, এতে ওহীর জ্ঞান উপেক্ষা করা হয়েছে তাই এ সব মতবাদ সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এ সবে সত্য থাকতে পারে এবং ভুলও থাকতে পারে। তাই এ সব আমরা যেমন অন্ধভাবে তা বর্জন করবো না বা তেমনি অন্ধভাবে গ্রহণও করবো না; বরং এ সব মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে যতটুকু সত্য ও উত্তম আছে তা নির্ণয় করে আমরা গ্রহণ করতে পারি। তবে এক্ষেত্রে আল-কুরআনকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে এর সাথে মানবীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় করা যেতে পারে। আর তা যেন আল-কুরআনের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১৫১-১৫২।

তৃতীয় অধ্যায়ঃআল-কুরআনের আলোকে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী উপাদান

অবক্ষয় অর্থ, মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণা

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রতিবন্ধক ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়সমূহ

ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে

পারিবারিক জীবনে

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে

আল-কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অকল্যাণ ও অশুভ পরিণতি

মানব জীবনে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও নৈতিক ভাবধারা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মূল্যবোধ। এটা সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজের শৃঙ্খলা বিধান করে। এটাই নৈতিক জীবনের মৌলিক উপাদান। কিন্তু অজ্ঞতা-মূর্খতা, সীমাহীন লোভ-লালসা, প্রাচুর্য, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, খামখেয়ালী, হঠকারিতা ও কুপ্রবৃত্তির অনুগামিতা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলীর আধিক্য মানুষের মধ্যে দেখা দিলে ধীরে ধীরে মূল্যবোধের ক্ষয় বা বিলোপ ঘটে। যখন কোন জাতি মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আক্রান্ত হয় তখন তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে এবং তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। তাই অবক্ষয় ও মূল্যবোধ বিকাশের প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরী। নিম্নে এ নিয়ে আলোকপাত করা হল:

৩.১ অবক্ষয় অর্থ, মূল্যবোধের অবক্ষয় তথা নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের ধারণা

অবক্ষয় শব্দের অর্থ–ধীরে ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি অথবা অধঃগতি।[১] মূল্যবোধ হল–মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদণ্ড, যার মাধ্যমে কোন ঘটনা বা অবস্থার ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। আর এই মূল্যবোধের অবক্ষয় হল–ধীরে ধীরে অথচ নিয়মিত মূল্যবোধের অধঃগতি, অধঃপতন বা ক্ষয়প্রাপ্তি।

নৈতিক অবক্ষয় অর্থ নীতি সংক্রান্ত অধঃগতি। ব্যক্তির নীতি ঘটিত অথবা নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনই নৈতিক অবক্ষয়। ব্যাপক অর্থে– যে কথা বলা উচিত সে কথা না বলা কিংবা তার বিপরীত কথা বলা, যে কাজ করা উচিত সে কাজ না করা কিংবা তার বিপরীত কাজ করা, যে স্বার্থ ও সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তা সংরক্ষণ না করা কিংবা আত্মসাৎ করা ইত্যাদি নানা কাজে নৈতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আর যে সব আদর্শ, নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও কার্যাবলী পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় যা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা হয় সেগুলোর প্রতি ধারাবাহিকভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করে তা থেকে সরে আসা সামাজিক অবক্ষয়। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ছাড়া মানব সমাজে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন–ধর্মীয় অবক্ষয়, সংস্কৃতিক অবক্ষয়।

দৈনন্দিন জীবনের লেন-দেন উপলক্ষ করে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চাল-চলনে যে আদর্শ বা উদ্দেশ্য ফুটে উঠে, তাতেই রয়েছে তার মূল্যবোধের পরিচিতি। শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ মানব-প্রকৃতির সমধর্মী এবং মানুষ্যত্বের জন্যে সহায়ক; অপরপক্ষে, হীন-মূল্যবোধ ও ধারণাবলী থেকে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক স্ফূরণ হয় বাধাপ্রাপ্ত আর এটাই অবক্ষয়। অজ্ঞতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, বল্গাহীন অহংকার, খামখেয়ালীপনা ও গোঁয়ার্তুমি থেকে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। আর এসব থেকেই সূত্রপাত হয় যুল্ম বা সীমালংঘন।

মূল্যবোধের অবক্ষয় বর্তমান মানব সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরকে সর্বতোভাবে গ্রাস করে মানব সমাজ বিপন্ন করে তুলেছে। সর্বত্র আজ মানবতা ভূলুণ্ঠিত। দিনে দিনে এ সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। মানব সমাজ আজ এক মহাবিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাবিপর্যয়কারী এই অবক্ষয় মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এই অবক্ষয় আজকের সভ্যতায় আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে যতখানি আগ্রহী করেছে জীবনের মূল্যবোধ অর্জনে ততখানি আগ্রহী করছে না। সীমাহীন লোভ-লালসা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, যুলম-অন্যায়, হিংসা-বিদ্বেষ, হীনস্বার্থ, অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক সুখসহ নানাবিদ বিষয় এই অবক্ষয়ের কারণ। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়া স্বতঃমূল্যগুলি (Intrisic value) মানুষের চেতনায় স্থান পাচ্ছে না। অর্থের মানদণ্ডে সবকিছুকে বিচার করার একটি প্রবণতা মানুষের মাঝে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই বিত্তবানেরা আজ সমাজপতি। বর্তমানে অর্থই পরমার্থ এবং দৈহিক সুখই পরম সুখ। সামান্য অর্থের বিনিময়ে নীতিবোধ হচ্ছে বিসর্জিত। ...সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরকে পদদলিত করে মানুষ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলছে দৈহিক ও অর্থনৈতিক এ দুটি পরতঃমূল্যের পেছনে। অথচ দেহ ও অর্থের নিজস্ব কোন মূল্য নেই।

---

[১]. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪) পৃ.৩৪ ।

বর্তমান মূল্যবোধের যে মারাত্মক অবক্ষয় ঘটেছে তার প্রধান কারণ- দৈহিক ও অর্থনৈতিক এ দু'টি পরতঃমূল্যের (Extrinsic value) উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ। আর সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এই তিনটি স্বতঃমূল্যের (Intrisic value) প্রতি প্রকাশ্য অবহেলা। বর্তমানে আমরা স্বতঃমূল্য ও পরতঃমূল্য– এ দু'টি মূল্যের হেরফের করে ফেলেছি। আমরা স্বতঃমূল্যকে মর্যাদা দিচ্ছি পরতঃমূল্যের, আর পরতঃমূল্যকে মর্যাদা দিচ্ছি স্বতঃমূল্যর। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্য দু'টির অতিমূল্যায়ন এবং সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর এ তিনটি মূল্যের অবমূল্যায়নই বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের জীবনে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দরের প্রভাব প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে। নীতিহীনতা পরিণত হয়েছে নীতিতে আর অসত্য পরিণত হয়েছে জীবনের মূলমন্ত্রে।[১]

দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্য দুটি সম্বন্ধে যদি আমাদের সঠিক উপলব্ধি ঘটে, আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, বেঁচে থাকার জন্য খুব বেশী সম্পদের প্রয়োজন নেই এবং দৈহিক সুখই পরম সুখ নয়, তাহলে আমরা অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক সুখের জন্য অন্ধভাবে ছুটতাম না। ফলে হত্যা, ধর্ষণ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি প্রভৃতি অপকর্ম অনেকাংশে লোপ পেত। কারণ অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক সুখের জন্য অধিকাংশ অন্যায়, অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়। একটি সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ে নিপতিত তখনই মনে করা হয় যখন সে সমাজে প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যখন নৈতিকতার লঙ্ঘন, দুর্নীতি-দুস্কৃতি, অন্যায়-অবিচার, ভাওতা, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, ঠগবাজি ও মিথ্যাচার সাধারণ হয়ে ওঠে। নীতিবোধ থাকে অনুপস্থিত এবং নীতিহীনতাকে অপরাধ মনে করা হয় না। পাশাপাশি, ব্যক্তি তার নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে। স্বার্থের কাছে সে অন্ধ হয়ে যায়। স্বীয় অন্যায় স্বার্থ ও উচ্চাভিলাষকে চরিতার্থ করার জন্য যা প্রয়োজন সবই সে করে। নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ন্যায়পরায়নতা, সততা ইত্যাদিকে তখন মানুষ নির্দ্ধিধায় জলাঞ্জলি দেয়। তখন সমাজের সিংহভাগ মানুষ উৎকোচ, দুর্নীতি, ঠকানো, জুলুম, নিপীড়ন, জবর-দখল, শোষণ ইত্যাদিকে ভাগ্য পরিবর্তনের সোপান হিসেবে গ্রহণ করে।

ধনলিপ্সা ও ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে সীমালংঘন ও হীনতা মূল্যবোধের ভয়ানক অবক্ষয় সাধন করছে। এ কারণে দেখা যায় শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, আমলা, পুলিশ, প্রশাসক, ব্যাংকার, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক সহ অধিকাংশ পেশাজীবী ও কর্মজীবী মানুষ আজ নিজের আখের গুছাতে ব্যস্ত। এজন্য সর্বত্র সত্য ও সততা পরিত্যক্ত হচ্ছে। সত্যের সাথে মিথ্যার ভেজাল দিয়েই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা হচ্ছে। রাজনীতি আজ ভয়ানক কলুষিত, রাজনীতিতে এখন অর্থ, অস্ত্র ও অপকৌশল নির্ধারক হয়ে উঠেছে। সঠিক তথ্য না দিয়ে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করাকে বলা হচ্ছে ব্যবসার কৌশল। ডাক্তার তার শপথের কথা ভুলে অর্থ উপার্জনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার তার কমিশনের জন্য ঠিকাদারের সাথে অশুভ আঁতাত করছে। অর্থের জন্য শিক্ষক লিখছেন গাইড বই, খুলছেন কোচিং সেন্টার। নির্বিচারে অফিস-আদালত, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা চলছে। আইন সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারছে না। মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সত্যের জন্য নিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা আজ সমাজ জীবন থেকে নির্বাসনে যেতে বসেছে। হিংসা-হানাহানির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বেড়ে যাচ্ছে দুর্নীতি ও সন্ত্রাস।[২]

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম বিকাশ সাধিত হয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তির সব ক্ষেত্রে মানুষ আজ অসাধ্য সাধন করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কি এ কথা বলা যায় যে, মানুষ মনুষ্যত্বের চরম শিখরে পৌঁছতে পেরেছে? বরং এ কথা অনস্বীকার্য যে, সকল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক সমস্যার মূলে রয়েছে নৈতিক সমস্যা। মানব জীবন থেকে আজ দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, পারস্পরিক সহানুভূতি ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে; আর তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে আস্থাহীনতা, বিতৃষ্ণা, লোভ-লালসা ও নীতিহীনতা। আজ জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সত্ত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি–ক). মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পারিবারিক ভাঙ্গন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এবং পারিবারিক মূল্যবোধ শিথিল হয়ে পড়ছে। খ). তরুণদের মধ্যে বড়দের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাচ্ছে। গ). অবাধ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে। ঘ). সততা ক্রমশ বিলুপ্ত হচ্ছে। সর্বত্রই মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঙ). আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে মানব রচিত মতবাদ ও পরাশক্তির আনুগত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। চ). সম্পদের মোহে মানুষ বেশী ছুটছে, ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তি পূজা মানুষের নানা অবক্ষয় সৃষ্টি করছে। ছ).পৃথিবীতে অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ছাড়াও ক্রমাগত ছোট-বড় অসংখ্য যুদ্ধ কোটি কোটি মানুষের জীবন ও সম্পদ নষ্ট করছে। পৃথিবীতে এসব অনাচার ও হানাহানির জন্য নৈতিক বিপর্যয়ই প্রধানত দায়ী।[৩]

ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও ধর্মীয় ক্ষেত্র সহ মানব জীবনের সর্বক্ষেত্র আজ ভয়ানকভাবে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় গ্রাস করে ফেলেছে। মানব সমাজে এখন নীতি-নৈতিকতা, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব এখন নেই বললেই

---

১. এ এফ মোঃ এনামুল হক, *মূল্যবোধ কি এবং কেন? প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭-৬৮।
২ . দেখুন, সৈয়দ তোশারফ আলী, *সমাজ ও সাহিত্য* (ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ২০০২) পৃ. ৮৫-৮৬।
৩ . ড. জামাল আল-বাদাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

চলে। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, লোভ-লালসা, প্রতিহিংসা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, শঠতা, অন্যায়, অবিচার, যুলম, ফিতনা-ফাসাদ, দুর্নীতি, হত্যা-সন্ত্রাস আজ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রসংগে আসা যাক। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক অবক্ষয় অত্যন্ত প্রবল। রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষাঙ্গন,ব্যবসায়সহ সকল পেশায় নৈতিকতা ও নীতিবোধের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও যেন আজ অনুপস্থিত। এখানে চিকিৎসক রোগীর হিতকে দেখছে না, শিক্ষক ছাত্রের হিতকে না, আমলা লোক হিতকে না, রাজনীতিবিদ জাতির হিতকে না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত নিজের বৈষয়িক উন্নতি নিয়ে। বৈষয়িক উন্নতি সাধন বা বৈষয়িক উন্নতির জন্য কাজ করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সে উন্নতি বা উন্নতির প্রয়াস যদি হয় দুর্নীতি, অনিয়ম, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, নিপীড়ন, ভাওতা, ঠগবাজি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তবে তা ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত। আহার, বিহার ও বাসস্থানের চাকচিক্য বৃদ্ধি এবং বিলাসী জীবনভোগের নিমিত্তে অন্যের অধিকার হরণ, ঘুষ-উৎকোচ গ্রহণ, শোষণ, নিপীড়ন, মিথ্যাভাষণ, সদ্‌গুণাবলীর বিসর্জন মানুষকে কতটা অধঃপতিত করে তার উপলব্ধি ও আজ মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে মানুষ আজ পাশবিকতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। কে কত পশুবৃত্তি অর্জন করতে পারে, কে কত হিংস্র হতে পারে, কে কতবেশী আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় কে কত বেশি পারঙ্গম তারই প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র। মানুষ আজ বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর ও নির্মম। দয়া, মায়া, প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য, ন্যায্যতা, সততা, দক্ষতা, নিয়মনীতি, শৃঙ্খল, শ্রদ্ধা-মূল্যবোধ ইত্যাদি তার নিকট অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। পরিণামে আমাদের সমাজে দুর্নীতি, দুস্কর্ম, বলপ্রয়োগ, অপকৌশল ইত্যাদির চর্চা দিন দিন গতি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ অবস্থা আমাদের দেশ ও জাতির জঘন্য অধঃপতন নির্দেশ করে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আমাদের দেশ ও জাতি আরো পশ্চাৎপদতায় নিপতিত হবে। আমাদের দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরো পঙ্গু ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে।[১]

আমাদের সমাজে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি-দুস্কৃতির যে বিস্তার তার মূল বীজ মানুষের হৃদয় ও মানসিকতায় গ্রথিত। দুর্নীতি-দুস্কৃতি মানুষের চিন্তা-চেতনা, মন-মগজকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর পশ্চাতে আত্মসুখ ও স্বার্থবাদিতা প্রধান ভুমিকা পালন করে। পরসুখ বা সর্বসুখ তার নিকট অর্থহীন। কেউ যদি স্বীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে পরসুখ নিশ্চিত করে সে তো খুবই উত্তম। আবার কেউ নিজের বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত সুখ বিসর্জন দেয় নাই কিন্তু পরসুখ, পরস্বার্থ ও অধিকারের ক্ষতি বা ক্ষুন্ন করে নাই সেও উত্তম। কিন্তু কেউ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যদি অপরের স্বার্থ ও অধিকারকে ক্ষুন্ন করে, অন্যের সাথে মিথ্যা, প্রতারণা, ফাঁকি ও কূটকৌশল অবলম্বন করে তাহলে তা হবে নিকৃষ্টতম কাজ। এই নিকৃষ্টতম কাজ এবং এই কাজের মানুষের সংখ্যা আমাদের সমাজে খুব বেশি। অফিস-আদালতের চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী-বণিক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এমনকি গ্রামে-গঞ্জের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও এই নিকৃষ্টদের সংখ্যা বিপুল। এরা নিজেদের অজান্তেই হয়তো পাশবিকতার চর্চায় প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা করে বেড়াচ্ছে। মমত্ববোধ, বুদ্ধ-বিবেক এরা হারিয়ে ফেলেছে। শুভবোধ, শুভদৃষ্টি ও হৃদয়ানুভূতি এদের বিলুপ্ত হয়েছে। তাই এরা পশুতুল্য। কুরআনে এমন প্রকৃতির মানুষকে চতুস্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।[২] কুরআন বলছে[৩]– لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّيَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ "তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শুনে না। তারা চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট।"

আজকের মুসলিম জাতি উন্নত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রীতিনীতির অধিকারী এবং মানবীয় ও বৈষয়িক সম্পদ সমৃদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উম্মাহর বর্তমান অধঃগতি ও দুর্ভোগ-দুর্দশার বড় কারণ তাদের ব্যাপকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়। সুতরাং সনাক্ত করতে হবে অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ। এটাই স্বাভাবিক যে, রোগ নির্ণয় না হলে সঠিক চিকিৎসা সম্ভব নয়। এই ব্যাধি সনাক্ত করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেই জাতির পরিবর্তন, সংস্কার ও পুনর্জাগরণ সম্ভব।

৩.২ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের অন্তরায় ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ:

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের অন্তরায় এবং অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়সমূহ কয়েক ধরনের। এর কিছু ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট; কিছু পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট; কিছু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট; কিছু অর্থনৈতিক বিষযের সাথে সংশ্লিষ্ট; আর কিছু শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিম্নে এ সবের বর্ণনা, কুফল, কার্যকারণ ও প্রতিরোধ কৌশল আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আলোচনা করা হল:

৩.২.১ ব্যক্তিগত জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহের বর্ণনা:

মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু মন্দ গুণ ও কর্ম রয়েছে, যেগুলো নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তা দ্বারা মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। এ সব বিষয়াবলী দু'ধরনের। ক). ব্যক্তি চরিত্র ও আচরণের সাথে

---

[১] . *দর্শন ও প্রগতি*, ১৯বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর-২০০২, (ঢাকা: গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢা. বি.) পৃ.১৩৮।
[২] . *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৯।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৭৯।

সংশ্লিষ্ট; খ). ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী এ অধ্যায়ের শেষ ভাগে আলাদা পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। আর ব্যক্তি চরিত্র ও আচরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

❑. অজ্ঞতা-মূর্খতা (الجهالة) ও বুদ্ধি-বিবেকের সঠিক প্রয়োগ না করা:

অজ্ঞতা-মূর্খতার আরবী প্রতিশব্দ জাহালাত (جَهَالَة); শব্দটি جهل ধাতু থেকে গঠিত, যা 'ইলম (জ্ঞান), আদাব (শিষ্টাচার) ও হিলম (সহিষ্ণুতা) এর বিপরীত। জাহল (جهل) ধাতু থেকে বিভিন্নরূপে কুরআনে শব্দটি ২৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[১] জাহল (جهل) এর অর্থ–জ্ঞান বিবর্জিত হওয়া, কোন কিছু সম্পর্কে ভুল বিশ্বাস রাখা, যে কাজ যেভাবে করা উচিত সেভাবে না করা।[২] স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।[৩] এছাড়াও জাহল শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ রয়েছে যেমন-কঠোরতা, দয়াহীনতা, বর্বরতা, রূঢ়তা, অশিষ্টতা, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা, আল্লাহ্র প্রতি অবিশ্বাস, মূর্তিপূজা;[৪] পূর্বপুরুষদের নিয়ে বড়াই করা বা অহঙ্কার করা ও শক্তির গর্বে গর্বিত হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় জাহল হল–"কোন বিষয় সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যা বাস্তবে তার বিপরীত।"[৫]

উল্লেখিত অর্থের আলোকে বলা যায় যে, ব্যক্তিকে অজ্ঞতা-মূর্খতা মুক্ত হতে হলে ভুল বিশ্বাস, বর্বরতা, রূঢ়তা, অশিষ্টতা, দম্ভ, অহঙ্কার, প্রবৃত্তি পূজা, শিরক, কুফর থেকে মুক্ত এবং সত্যিকারের জ্ঞানী, শিষ্টাচারী, সহিষ্ণু, আল্লাহ্তে বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে হবে। তাই প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি যদি জ্ঞান, সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচার বিবর্জিত কোন আচরণ যেমন: বর্বরতা, রূঢ়তা অবলম্বন অথবা শিরক, কুফর, নাস্তিকতা গ্রহণ করে কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে অথবা আল্লাহ্ ও তাঁর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিও অজ্ঞ-মূর্খ হতে পারে। পক্ষান্তরে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি কোন মাধ্যমে (অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানীর সাহচর্যে) নিজেকে ভুল চিন্তা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত রাখে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা শিরক, কুফর, নাস্তিকতা পরিহার করে এবং শিষ্টাচার, সহিষ্ণুতা, বিনয়-নম্রতা ও ঈমান অবলম্বন করে তবে এরূপ স্বশিক্ষিত ব্যক্তিকে অজ্ঞ-মূর্খ বলা যাবে না।

অজ্ঞতা-মূর্খতা মানব জাতির জন্য একটি বড় অভিশাপ। এটা মানুষের মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে বড় অন্তরায়। এ কারণে মানুষ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, ভালো-মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না। এটা ব্যক্তিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এ কারণে ব্যক্তি নিজে সত্য ও সঠিক পথ জানে না, অন্যকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না। ফলে ব্যক্তি নিজে যেমন সহজেই সত্যচ্যুত হয় তেমনি অন্যকেও সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। বিশেষ করে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকলে জন্ম দেয় নানা অন্যায়, অপরাধ ও অনাচারের। এমতাবস্থায় মানব সমাজে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও সুনীতি বলতে কিছু থাকে না। সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবর্তে দেখা দেয় বর্বরতা, কলহ, কুসংস্কার ও নানা অবক্ষয়। ইসলাম পূর্ব আরব সমাজ এর বড় প্রমাণ। এ কারণে আল-কুরআনে বলা হয়েছে[৬] –فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ "সুতরাং তুমি কখনো মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"এজন্য জ্ঞানীগণ বলেন, 'চারটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মন্দ চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয়। তা হলো, ক. অজ্ঞতা-মূর্খতা, খ.যুলম, গ.কুপ্রবৃত্তি, ঘ.ক্রোধ।'[৭] নিম্নে জাহালাতের কিছু অনিষ্টতা কুরআনের দৃষ্টিতে বিবৃত হল–

•অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষের ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ণয় করার শক্তিকে তিরোহিত করে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে ক্ষতি ও অকল্যাণের মুখে ঠেলে দেয় এবং কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮]

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং তাতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ।"

উল্লেখিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে– মানুষ না বুঝেই আমানত তথা ফরজ বিষয়সমূহ পালনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে। অথচ সে দায়িত্ব যথার্থভাবে পালনের জন্য কতটুকু সামর্থ্য আছে বা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হলে যে ভয়াবহ মন্দ পরিণতি আছে তা গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা না করেই-এ পথে অগ্রসর হয়। আর এটা করেছিল অজ্ঞতাবশতঃ।

•অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষকে যুল্ম ও অন্যায়ে নিমজ্জিত করে। এ কারণে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ ও বর্বরতা ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়। যেমন মধ্যযুগে ইউরোপে পোপ-পাদ্রীরা বিজ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কারের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছিল। অতীতে এ কারণেই ইউসুফ('আ.) কে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। এ

---

[১]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম* (আল-কাহিরাহ:দারুল হাদীস,১৪২৮হি.) পৃ. ২২৫-২২৬।

[২] রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ. ১৩২-১৩৩।

[৩]. নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারু তা'ভীল* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ,২য় সং) খ.৩, পৃ.৩৫৬ (সূরা ৪৩: আয়াত ৮৩)।

[৪]. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, খ. ১১, (ঢাকা: ই ফা বা, ১৯৯২) পৃ.৫৫৩।

[৫].মূল আরবী [الجهل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه] আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫হি.) পৃ.১০৮।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম : আয়াত ৩৫।

[৭]. খালিদ ইবন জুম'আহ আল-খার্রায, *মাওসুআতুল আখলাক* (কুয়েত: মাকতাবাতু আহলিল আছার, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০হি.) পৃ.২৫।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব : আয়াত ৭২।

মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১] (قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ) "তিনি বললেন, 'তোমাদের জানা আছে কি, ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে'?"
উল্লেখিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, অজ্ঞতার কারণে মানুষ হিংসা-বিদ্বেষ লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন অন্যায় সংঘটিত করে থাকে।

অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষের মধ্যে দম্ভ ও অহঙ্কারের জন্ম দেয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হল–একদা আবূ যার গিফারী (রা.) এক ব্যক্তিকে [বিলাল রা.] তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে তাচ্ছিল্য করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন,'*হে আবূ যর! তুমি তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তুমি এমন যে তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে*'।[২]

•অজ্ঞতা-মূর্খতা মানব চরিত্রের সুবৃত্তিগুলোকে ধ্বংস করে পর্যায়ক্রমে কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। এ কারণে লূত ('আ.) এর কাওম সমকামের মত জঘন্য পাপে অন্ধভাবে নিমজ্জিত হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে[৩] –(أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) "তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের নিকট গমন করবে? বরং তোমরা এমন এক কওম যারা মূর্খ।" উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অজ্ঞতা-মূর্খতা কিভাবে একটি জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন ডেকে আনে এবং মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দাস ও বিবেকশূন্য নির্লজ্জ পশুতে পরিণত করে। প্রশ্ন হতে পারে বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য সমাজে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও সমকামে লিপ্ত? এর জবাব হল, এরা বস্তুবাদী শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিত, যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা-মূর্খতা হতে মুক্তি দিতে সক্ষম নয়। তাই তাদের পক্ষে এ ধরনের অন্যায় করা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

•অজ্ঞতা-মূর্খতা এমন এক মন্দ বিষয়, যার কারণে ব্যক্তির অন্তরে কলুষতা চাপিয়ে দেয়া হয়।[৪] ফলে অজ্ঞ-মূর্খরা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করতে পারে না। যা তাদের ভ্রষ্টতা ও পশুত্বের দিকে ধাবিত করে। এটা মানুষের অন্তরকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যে, সত্য উপলব্ধি ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]– (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ) "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম বিচরণশীল প্রাণী হচ্ছে বধির, বোবা, যারা কিছুই বুঝে না।" এখানে অজ্ঞতা ও মূর্খতার নিন্দা করতে গিয়ে মূর্খ ব্যক্তিকে বধির ও বোবা প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং এটা কিভাবে ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই চরম পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।
মূর্খতা এমন মন্দ বিষয় যা থেকে রাসূলুল্লাহ সা. মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হাদীসে এসেছে[৬] –নাবী কারীম সা. যখন নিজ ঘর থেকে বের হতেন, বলতেন, [اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أوأجهل أو يجهل علي] "আল্লাহর নামে বের হলাম, তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করলাম। হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি, যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই আর আমাকে যেন পথভ্রষ্ট করা না হয়। আমার যেন পদস্খলন না হয় বা পদস্খলন করা না হয়। আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি বা করো দ্বারা অত্যাচারিত না হই। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি বা আমার সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ না করা হয়।"

•অজ্ঞতা মানুষকে অন্যায় ও পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। কেননা অজ্ঞতা-মূর্খতার কারণে মানুষ পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত হয়। সাহাবীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যত প্রকার পাপ করা হয় তা (শরী'আতের সঠিক জ্ঞান থেকে) অজ্ঞ থাকার কারণেই সংঘটিত হয়। সেটি ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক।[৭] ইরশাদ হচ্ছে[৮] إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ "নিশ্চয় তোমার রব তাদের জন্য, যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ করেছে, এরপর তারা তওবা করেছে এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। নিশ্চয় তোমার রব এসবের পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –এ আয়াতেও পাপ সংঘটনের কার্যকারণ হিসেবে অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

•অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষকে সত্যচ্যুত করে, মহান আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে। যার ফলে মানুষ শির্ক, কুফর ও বিদ'আত ইত্যাদি নানা অন্যায়ে লিপ্ত হয়।[৯] এটা মানুষের হিদায়েত লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণে প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা আল্লাহকে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপালক, রিযকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা স্বীকার করলেও ঈমান ও ইসলামে দাখিল হতে পারেনি।[১০] বর্তমান সমাজেও কবরে সিজদা, কবরবাসীর নিকট দু'আ, লোহার বালা বা লাল সুতা পরা প্রভৃতি শিরকী কাজ এবং কবর সজ্জিত করণ এবং তাতে বাতি জ্বালানো ইত্যাদি বিদ'আতী কাজ মানুষ এ কারণেই করছে। সুদূর অতীতেও মানুষ এ কারণে সত্যভ্রষ্ট হয়েছিল। এ মর্মে কুরআনে বলা

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯।
[২]. মূল আরবী [يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرو فيك جاهلية] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, হাদীস নং ১৬৬১; *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল : আয়াত ৫৫।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ১০০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল : আয়াত ২২।
[৬]. *সুনান আবূ দাউদ*, সুলাইমান ইবনুল আশআস,*আস-সুনান*, তাহক্বীক, মুহাম্মদ মহীউদ্দিন আব্দুল হামীদ (বৈরুত: দারুল ফিকর,তা.বি), কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫০৯৪।
[৭].ইবন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, তাহকীক,আহমদ মু.শাকির(বৈরুত:মুআসসাতুর রিসালাহ,১ম প্রকাশ,১৪২০হি.) খ.০৮, পৃ.৮৯।
[৮]. .আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল : আয়াত ১১৯।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭:৮৩-৮৪।
[১০]. আল-কুরআন, (২৯:৬১,৬৩) (১৩:১৬) (১০:৩১) (২৩;৮৪-৮৯) (৩৯:৩৮) (৩১:২৫) (৪৩:৭৮)।

হয়েছে[1] (قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) "তারা বলল, 'হে মূসা, তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্য তেমনি উপাস্য নির্ধারণ করে দাও। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তোমরা এমন এক কওম যারা মূর্খ।"

অজ্ঞতা মানুষকে বিপথগামী করে। এ কারণে মানুষ আল্লাহ, কিতাব ও দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন মনগড়া কথা বলে। আজকের তথাকথিত আলিম, পীর-মাশায়েখ ইসলামের মূল উৎস–কুরআন ও সুন্নাহ বাদ দিয়ে মনগড়া নানান কল্পকাহিনী, নিজেদের ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণাকে ইসলাম বলে চালিয়ে দিচ্ছে। তাদের খপ্পরে পড়ে সঠিক ইসলামী জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে সাধারণ মুসলিমরা নানা বিভ্রান্তিসহ শিরক-বিদআতে লিপ্ত হচ্ছে। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-[2] وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ- ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। –এই আয়াতে সে সব ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহ, কিতাব ও দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন মনগড়া কথা বলে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে।

•অজ্ঞতা-মূর্খতা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। এর ফলে তারা আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। তারা প্রকৃত সত্য থেকে দূরে থাকে এবং কুসংস্কারাচ্ছান্নতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। এ মর্মে বলা হয়েছে[3]– وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا "আর এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয় অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনই কাজে আসে না।" –এখানে মুশরিকদের কথা বলা হচ্ছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী মেতাবেক নিজেদের বিভিন্ন ধর্মীয় কুপ্রথার ও সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভাবন করেছে, যা তাদের সত্যভ্রষ্ট করেছে।

অজ্ঞতা-মূর্খতা মহান আল্লাহ নিকট অপছন্দনীয়। এজন্য আল-কুরআন সব ধরনের অজ্ঞতা-মূর্খতার অবসান ঘটানোর নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[4]-(جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) "আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, আর অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"

জাহালাত মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পদস্খলনের কারণ।[5] এটা এমন এক নিন্দনীয় গুণ, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নাবীগণ আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন।[6] এ প্রসংগে ইউসুফ ('আ.) এর প্রার্থনা উল্লেখযোগ্য। তিনি দু'আয় বলেন[7]– قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ "তিনি (ইউসুফ) বললেন, 'হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব'।"

অজ্ঞ-মূর্খদের সাহচর্য মানুষের জন্য নানান অকল্যাণ ও ক্ষতির কারণ। এদের সাহচর্য মানুষকে গোমরাহ করতে পারে। তাই তাদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে[8] (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)-"তুমি ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"এখানে মূর্খদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচাতে তাদের এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[9]

> আল্লাহ জ্ঞানকে এভাবে কেড়ে নেবে না যেভাবে লোকদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হয়। বরং আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে জ্ঞানকে তিনি উঠিয়ে নেবেন। এমনকি একজন আলিমও জীবিত থাকবে না। তখন মূর্খদের লোকেরা নেতা বানাবে তাদের নিকট সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তারা জ্ঞান ছাড়াই ফাতওয়া (সমাধান) দেবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।"

জাহালাত সত্যিকার মুসলিম হওয়ার পথেও বড় অন্তরায়। এটা ঈমান হ্রাসের অন্যতম কারণ। দ্বীনি ইলম যেমন ঈমান বৃদ্ধি করে অজ্ঞতা তেমনি ঈমান হ্রাস করে। বর্তমান কালের মুসলিম জাতির প্রতি তাকালে দেখতে পাই যে, তারা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে অনেক দূরে। তাদের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড বিজাতিদের মত কিংবা তাদের চেয়েও খারাপ। মুসলিম জাতির এই অধঃপতনের মূল কারণ, কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা। তারা ইসলাম

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৩৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৬:২১,১১১; ১১:২৯, ৩৯:৬৪, ৪৬:২৩, ৮২:৬-৭,০৩:১৫৪।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ : আয়াত ০৮।

৩. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজ্ম: আয়াত ২৮।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ১৮।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম :৩৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১১:৪৬, ৪৯:০২।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ৬৭।

৭. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩৩।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৯৯।

৯. মূল আরবী [إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ১০০, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ২৬৭৩।

সম্পর্কে জানে না কিংবা ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়নি। ইসলামী জীবনাদর্শ, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে তারা তেমন কোন জ্ঞান রাখে না। তাদের কেউ কেউ কালিমার মর্মার্থসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী জানেন না। কেউ কেউ দ্বীন সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা রাখলেও তা ভুলে ভরা। আরও দুঃখজনক বিষয় হল–সমাজে যারা ইসলামের নেতৃত্ব, দাওয়াত ও তা'লিম দিচ্ছেন ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অবস্থা খুবই নাজুক। তারা যুগের চাহিদা, মানব জাতির প্রয়োজন ও সমকালীন চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারছে না। ফলে মানুষ আজ ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের পরিবর্তে অন্যান্য ধর্মের মত একটি ধর্ম গণ্য করে ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে কতিপয় আচার ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতে সীমিত করেছে। এটাই আজকের মুসলিমদের বিভ্রান্তি ও পদস্খলনের প্রধান কারণ। ইসলাম মানব জাতির জন্য যে সর্বজনীন ও চিরন্তন বিধান দিয়েছে তা জানা মুসলিমদের জন্য জরুরী ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম তাদের জীবন পরিচালনা, কর্ম-আচরণ, ইবাদত, যুগ ও জীবন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা শির্ক, কুফরী ও বিদ'আতে লিপ্ত। এ কারণে মুসলিম জাতির মাধ্যমে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যে সত্য লাভ করার কথা ছিল তা তো দূরের কথা বরং বর্তমান মুসলিম কর্মকাণ্ড ও আচরণ দেখে অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিচ্ছে। এ সবের মূল হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা-মূর্খতা।

অজ্ঞতা-মূর্খতার মধ্যে দ্বীনি অজ্ঞতা মানুষের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক ও সর্বাধিক ক্ষতিকর। এটা পৃথিবীর ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। এ মর্মে নাবী সা. বলেন[১]– "কিয়ামতের আলামতের সমুহের মধ্যে অন্যতম হল, 'ইলম উঠে যাবে, অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদ পান ব্যাপক হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।"
এখানে 'ইলম বা জ্ঞান দ্বারা দ্বীনি জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এ জ্ঞানই মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও উন্নত নৈতিকতা সৃষ্টি করে। এ জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারাম সম্পর্কে অবহিত করে। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ এ জ্ঞান থেকে সরে গিয়ে পার্থিব জ্ঞানে উন্নতি লাভ করবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর সত্য দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। ফলে মানুষ চরম লোভী ও স্বার্থপর নীতি-নৈতিকতাহীন পশুতে পরিণত হবে, যা তাদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করবে।

বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ না করা: বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা কোন বস্তু সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন না করাও অজ্ঞতা-মূর্খতার অংশ বিশেষ। এটি একটি আত্মঘাতি মন্দ গুণ। এই মন্দ গুণের কারণে ব্যক্তি কোন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। এটা ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ে বিভ্রান্ত করে এবং ব্যক্তির জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। এটা ব্যক্তিকে সত্য উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তি সত্য বর্জন করে নিফাক, শিরক ও কুফরের মত নানা মন্দ বিষয়ে নিমজ্জিত হয়। এজন্য কুরআনে এর নিন্দা বলা হয়েছে[২]- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا "তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট।" অন্যত্র এসেছে-[৩] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ "আর যখন তাদের বলা হয়, 'ঈমান আন যেরূপ ঈমান এনেছে' লোকেরা(সত্যিকার মু'মিনগণ); তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব যেরূপ ঈমান এনেছে বোকারা'; সাবধান! তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।"
উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে দেখা যাচ্ছে যে, বিবেক-বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ না করায় অনেক মানুষ সত্যচ্যুত হয়েছে।

অজ্ঞতা-মূর্খতার কারণ: ওহীর বিশুদ্ধ জ্ঞান উপেক্ষা ও প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষকের অভাব, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী শিক্ষা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, মানব রচিত ভ্রান্ত দর্শন ও বিভিন্ন মতবাদের কুপ্রভাব, কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য, কুসংস্কার ও পূর্বপুরুষদের অন্ধানুসরণ।

প্রতিকারের উপায়: শিক্ষার সর্বস্তরে ওহীলব্ধ জ্ঞানচর্চা, ওহীভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা চালু, প্রকৃত জ্ঞানী শিক্ষক থেকে শিক্ষা গ্রহণ, ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত জ্ঞানের অসারতা প্রমাণ করে তা বর্জন, অজ্ঞ, মূর্খ ও নির্বোধদের বিপরীত কাজ করা।

❑. মিথ্যাচার (الكذب):

মিথ্যা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ কিয্‌ব(الكذب), যা সত্য বা সত্যবাদিতা(الصدق)এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আল-কুরআনে কিয্‌ব শব্দটি ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ২৮২ বার এসেছে।[৪] এর আভিধানিক অর্থ-অসত্য;[৫] অযথার্থ, অমূলক, কল্পিত ইত্যাদি। পরিভাষায় মিথ্যা হচ্ছে[৬] 'কোন বিষয় সম্পর্কে এমন সংবাদ পরিবেশন করা যা বাস্তবের বিপরীত, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত হোক।' অভ্যাসগত মিথ্যা বলা ছাড়াও কোন বিষয় বা ঘটনার যথার্থ বর্ণনা প্রদান না করে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃত করে তথ্য প্রদান করা কিংবা যা ঘটেনি তার রূপ দেয়াও মিথ্যা।

মিথ্যা কথা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে। তাই মিথ্যা কথা ছাড়াও মিথ্যা তথ্য, মিথ্যা সুপারিশ, কোন বিষয়ে যথার্থভাবে না জেনে মন্তব্য বা মত প্রদান, কোন বিষয়ে বাড়িয়ে বলা, নিজের মধ্যে নেই অথচ এমন কোন কিছু উল্লেখ করা ইত্যাদি

---

[১]. মূল আরবী [إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, হা.নং ৮০; *মুসলিম*, হা. ২৬৭১।
[২]. আল-কুরআন ,সূরা আল-ফুর্‌ক্বান: আয়াত ৪৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ১৩।
[৪]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭০২-৭০৬।
[৫]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ.৬৬২।
[৬]. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *ফাতহুল বারী* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৯) খ.০১, পৃ.২০১।

সবই মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত, এমনকি সত্য বর্জিত সব ধরনের কথা, কাজ ও আচরণ মিথ্যার মধ্যে গণ্য। তবে অনেক ক্ষেত্রে কথার মিথ্যাচার অপেক্ষা কর্মের মিথ্যাচার অধিক মারাত্মক। এর একটি চিত্র তুলে ধরে কুরআন বলা হয়েছে[১] –

قَالُواْ يَاأَبَانَا إِنَّاذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَاأَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ- وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

"তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমরা প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মালপত্রের নিকট,অতঃপর নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আর আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই'।' আর তারা তাঁর জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল।–এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইউসুফ ('আ.) এর ভাইয়েরা পিতার নিকট মিথ্যা কথা বলেছে এরপর তাঁর জামায় রক্ত মেখে মিথ্যা কর্ম করেছে।

মুখের কথার ন্যায় আচরণের মাধ্যমেও মিথ্যা প্রকাশ পেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[২] –"যে ব্যক্তি নিজের কৃত কাজ দ্বারা নিজকে এমন কাজের ধারক বলে প্রকাশ করে, যা তার মধ্যে নেই। তাহলে সে হলো মিথ্যার পোষাক পরিধানকারী।"

অনেক সময় শিশুদের মন ভুলানোর জন্য মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয় কিংবা মিছামিছি ভয় দেখানোর জন্য বাঘ-ভাল্লুকের কথা বলা হয়। অথচ এরূপ মিথ্যাও গোনাহের কাজ। অধিকন্তু, এতে শিশুরাও মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবন আমির বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের বাড়িতে বসেছিলেন, এমতাবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বলেন, এস তোমাকে একটি জিনিস দিব। রাসূল বলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও? তিনি বলেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে চাই। রাসূল বলেন "তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার নামে একটি মিথ্যা লেখা হতো।"[৩] আজকাল আমরা অনেক সময় কৌতুক করে বা হাসি-তামাশার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে থাকি- এটাও পাপ। হাদীসে এসেছে, "ধ্বংস ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি মানুষকে নিছক হাসাবার জন্য মিথ্যা বলে।"[৪]

মিথ্যাচার বর্তমান সমাজের একটি অবাধ প্রবাহমান অনাচার। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর সয়লাব ঘটেছে। সামাজিকতা, বিয়ে-সাদী, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেন ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে আজ মিথ্যার জয়-জয়কার। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যাকে অন্যায় মনে করা হচ্ছে না বরং মিথ্যাচারকে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা বলে গণ্য করা হচ্ছে। আর সত্যবাদিতা ও সততাকে নির্বুদ্ধিতা ভাবা হচ্ছে। অনেকে মনে করছে যে, মিথ্যা ছাড়া বর্তমান সমাজে টিকে থাকা কিংবা সফল হওয়া সম্ভব নয়। আজকাল কথাবার্তা ছাড়াও আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মিথ্যুকরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, সৎকে অসৎ ও অসৎকে সৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। সমাজে মিথ্যার এতই ব্যাপকতা দেখা দিয়েছে যে, মিথ্যা চারিত্রিক সনদ, মেডিক্যাল সনদ, অভিজ্ঞতা সনদ, বই না পড়ে প্রশংসাসূচক অভিমত প্রদান, কারো সম্পর্কে না জেনে সুপারিশ করা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে। একে অন্যায়ও মনে করা হচ্ছে না। যারা এরূপ কর্মে লিপ্ত তারা এটাকে অন্যায় মনে করেন না বরং ধারণা করে যে, তারা অন্যের উপকার করে দিল। অথচ কারো সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে এরূপ কাজ করা অবৈধ ও অনৈতিক। প্রথমত তা মিথ্যাচার, দ্বিতীয়ত এরূপ সনদে অন্য ব্যক্তি বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তৃতীয়ত একটি অন্যায় কাজকে অন্যায় মনে না করে অবাধে তা করে যাওয়াও অন্যায়। এ ব্যাপারে সতর্ক করে নাবী সা. বলেন[৫]-"কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে অন্যের নিকট যা শুনে (যাচাই ছাড়া) তাই বলে বেড়ায়।" এ ধরনের মিথ্যাচারীকে ভর্ৎসনা করে বলা হয়েছে[৬] (فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ) "অতএব দুর্ভোগ! সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য, যারা খেলাচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।"

মিথ্যা নৈতিকতা ও ঈমানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। মিথ্যাচার মু'মিনের স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়। একজন মু'মিন কখনই মিথ্যা বলতে ও গ্রহণ করতে পারে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল–মু'মিন কি ভীরু হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হল–মু'মিন কি কৃপণ হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হল–মু'মিন কি মিথ্যুক হয়? তিনি বললেন, না...।[৭] যদি কোন মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে মিথ্যাচারের প্রবণতা থাকে তবে তা মধ্যে নিফাকের (কপটতার) ব্যাধি জন্ম দেয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮]– فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ "সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে।"

মিথ্যাচার একটি মন্দ অভ্যাস ও গর্হিত কাজ। এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, এটা অকল্যাণের মূল। এর দ্বারা কখনই সফলতা অর্জন করা যায় না। মিথ্যাবাদীরা কখনও সফল হয় না।[৯] যে সমাজের মানুষের মধ্যে মিথ্যার প্রচলন আছে, সে

---

১ . আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : আয়াত ১৭-১৮ ।

২. মূল আরবী [المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৯২১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ২৬৭১।

৩. *সুনান আবূ দাউদ, প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯৯১।

৪.মূল আরবী [ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯৯০।

৫. মূল আরবী [كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع] *সহীহ মুসলিম*, মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ০৫।

৬ . আল-কুরআন, সূরা আত-তূর : আয়াত ১১-১২।

৭.**মূল আরবী**[قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا]*মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবুল কালাম, হা.১৭৯৫;

৮ . আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ : আয়াত ৭৭।

৯ . আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৯-৭০।

সমাজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন করা হয়। মিথ্যা এক ধরনের যুলুমও বটে। এটা অন্যায়, অপরাধ, পাপ ও মন্দের উদ্ভাবক এবং ফিতনা-ফাসাদের জন্মদাতা। এটা মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব লোপ করে শত্রুতা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এ কারণে অনেকে বলেন, মিথ্যা সকল পাপের জননী। তাই কুরআন মিথ্যাকে নিষিদ্ধ করেছে।এ মর্মে বলা হয়েছে-[১] (فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) "সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদী দের অনুসরণ করো না।" রাসূল সা. ও সাহাবাগণের নিকট মিথ্যা অপেক্ষা অন্য কোন অভ্যাস অধিক ঘৃণিত ছিল না।[২]

মিথ্যা ব্যক্তির অন্তরের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। অনেক ক্ষেত্রে এটা ব্যক্তির বিবেক নিষ্ক্রিয় করে তার মন ও আত্মাকে কলুষিত করে। এই কলুষতা হিদায়েত ও সত্যপথ লাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে মানুষকে পাপ ও অবাধ্যতায় নিমজ্জিত করে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৩] (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) "নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে, আর পাপ মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূল সা. বলেন-[৪], "মিথ্যা মানুষকে পাপের পথ প্রদর্শন করে, আর পাপ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হলে তাকে মিথ্যাবাদীরূপে আল্লাহর কাছে লিখে নেয়া হয়।"
মিথ্যা মানুষের রুজি-রোজগারে বরকত নষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৫], "মিথ্যা রিযক(জীবিকা)হ্রাস করে দেয়।"
মিথ্যা ইবাদত কবুলের অন্তরায়। নাবী সা. বলেন[৬],"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও গর্হিত আচরণ পরিত্যাগ করে না। আল্লাহর জন্য তার খাদ্য পানীয় পরিত্যাগের প্রয়োজন নেই।" মিথ্যার মন্দত্ব সম্পর্কে আরও বলেন[৭],"কোন বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের কারণে ফিরিশতা এক মাইল(বা দৃষ্টিসীমার বাইরে) দূরে সরে যায়।"

মিথ্যাচার ও মিথ্যা অবলম্বন কাফির, মুনাফিক ও চোগলখোর ব্যক্তিদের অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৮] তাই সমাজে দেখা যায় কাফির, মুনাফিক ও চোগলখোর ব্যক্তিরা নিজেদের সর্বদা মিথ্যা উদ্ভাবন, মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা প্রতিষ্ঠায় তৎপর রাখে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৯]-(إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) "যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যাই উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"-এ আয়াতে মিথ্যাচারকে কাফিরদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যারা অসত্য-অন্যায়ের জন্য মিথ্যা উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে।
মিথ্যাচার মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[১০],"মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি- ক. যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। খ. যখন কোন অঙ্গীকার করে তা খেলাফ করে। গ.আর যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন তা খিয়ানত করে।"

মিথ্যা সবচেয়ে বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতাও বটে। এর চেয়ে বড় প্রতারণা আর নেই। তাই সুফিয়ান ইবন উসাইদ আল-হাযরামী রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে মনে করবে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলছো।"[১১]

মিথ্যা মহাপাপসমূহের একটি। এটা এত বড় পর্যায়ের পাপ যে, কুরআন মিথ্যাকে শিরকের পাশাপাশি নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছে। এ থেকে মিথ্যার অনিষ্টতা ও ভয়াবহতা অনুমান করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন-[১২] (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)"সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা হতে।"

মিথ্যা মহাপাপ হলেও সব মিথ্যা সমান নয়। মিথ্যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ মিথ্যা হল আল্লাহ, রাসূল ও দ্বীন সম্পর্কে মিথ্যা বলা কিংবা এ সবের কোনটি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। এ ধরনের মিথ্যাচারে লিপ্তরা হিদায়েত বঞ্চিত, কাফির, বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ।[১৩] এদের জন্য রয়েছে আল্লাহর গযব ও লানত।[১৪] এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১৫]-(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ) যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিকট হতে আগত সত্য কে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?"

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বালাম : আয়াত ০৮।
[২] .মূল আরবী [ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الكذب] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৬, পৃ.১৫২, হাদীস নং ২৫২২৪।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন : আয়াত ২৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৯: ০৩, ০৭:১০১।
[৪].মূল আরবী [وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫৭৪৩, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২৬০৭।
[৫] .মূল আরবী [والكذب ينقص الرزق] হাফিজ মুনযিরী, খ.০৩, পৃ.৩৬৯, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৪৬২।
[৬].মূল আরবী [من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, হা.নং ১৮০৪; *আবূ দাউদ*, হা. ২৩৬২।
[৭].মূল আরবী [إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৭২।
[৮] . আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ১০৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৮৫: ১৯; ০৩ : ১৬৭; .৬৩:০১।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল : আয়াত ১০৫।
[১০]. মূল আরবী [آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৩।
[১১] .মূল আরবী [كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯৭১।
[১২] . আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ :আয়াত ৩০, আল-কুরআন ৩৪:০৮।
[১৩]. আল-কুরআন, ০৬:১৪৪; ১০:৬৯,।
[১৪]. আল-কুরআন, ১১ : ১৮।
[১৫].আল-কুরআন,২৯:৬৮; আরও দেখুন,আল-কুরআন ২:৩৯, ৩:১০-১১, ৫:১০,৮৬, ৬:১০-১১,৪৮-৪৯, ৭:৪০,৯২, ৮:৫৩-৫৪, ১০:৭১-৭৪, ১১:১৬, ১৫:৮০-৮৪, ১৬:৩৬,১১৩, ২২:৪৪, ২৫:১১,৩৭, ২৬:১৩৯,১৮৯, ৩০:১০,৩৮:১২-১৪, ৩৯:২৪-২৬, ৪০:০৫, ৪৩:২৩-২৫, ৫০:১২-১৪, ৫২:৯-১৬, ৫৪:৪১-৪২, ৫৬:৯২-৯৬, ৫৭:৫, ৬৪:১০, ৬৭:৬-১০, ৮৩:১৪-১৫, ৯১:১১-১৫।

মিথ্যাবাদীদের জন্য রয়েছে পার্থিব ও পরকালীন মন্দ পরিণাম। মিথ্যাবাদীরা সর্বত্রই স্থায়ীভাবে ঘৃর্ণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকেন। সমাজে তাদের মর্যাদা থাকে না। আর ভয়ের ব্যাপার হলো মিথ্যা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি, অভিশাপ, শাস্তি ও লা'নতের কারণ।[১] মহান আল্লাহ মিথ্যাকে অপছন্দ করেন।[২] শয়তান মিথ্যাবাদীর ওপর কুপ্রভাব বিস্তার করে।[৩] কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে।[৪] তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, ভয়াবহ শাস্তি ও জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন[৫]–(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ)-"সেদিন দুর্ভোগ! মিথ্যারোপকারীদের জন্য।" আরও বলেন[৬], (وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) "আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন-পীড়াদায়ক শাস্তি, তাদের মিথ্যাচারের জন্য।"

মিথ্যা মৌলিকভাবে নিন্দনীয় হলেও বিশেষ কিছুক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। যেমন- মিথ্যা না বললে বড় ধরনের ক্ষতি বা অন্যায় সংঘটিত হতে পারে। এর উদাহরণ–কোন হত্যাকারী যালিম কোন নিরপরাধ মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার জন্য খুঁজছে অথবা সম্পদ লুট হওয়ার ভয়ে তা অন্যের কাছে সরিয়ে রেখেছে যদি যালিম কারো কাছে তা জিজ্ঞাস করে কিংবা গচ্ছিত আমানত যদি যালিম ছিনিয়ে নিতে চায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এজন্য রাসূল সা. তিন স্থানে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন, ক. মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনে, খ. যুদ্ধ ক্ষেত্রে, গ. স্বামী-স্ত্রীর কথপোকথনে।[৭]

মিথ্যা ও মিথ্যাচারের কারণ: ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া কিংবা অপরাধ থেকে বাঁচা, অন্যের ক্ষতিসাধন বা অন্যের চরিত্র হনন, আত্মপ্রশংসা বা বংশের গৌরব বৃদ্ধির মতলবে, যাচাই না করে অন্যের শুনা কথা প্রচার করা, অপ্রয়োজনে বেশী কথা বলা এবং কথার অতি রঞ্জন।

মিথ্যাচার প্রতিকার পদ্ধতি: সমাজে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। কম কথা বলা, মিথ্যা না বলার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা, নির্জনতা অবলম্বন করা, বুদ্ধিবৃত্তিক নৈতিক অনুশীলন, মিথ্যাচারের পরিণতি অনুধাবন করা, শুনা কথা সঠিকভাবে যাচাইপূর্বক সত্যতা নিশ্চিত হয়ে বলা।

❑. বাতিল(الباطل) অবলম্বন এবং হক (الحق) প্রত্যাখ্যান:

বাতিল আল-কুরআনের বিশেষ পরিভাষা। আল-কুরআনে বাতিল শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৩৬বার এসেছে।[৮] বাতিল শব্দের অর্থ– অসত্য, অসার, মিথ্যা, অযর্থার্থ, অন্যায্য, যা মূলে অশুদ্ধ তাই বাতিল। আল্লামা রাগিব বলেন–'বাতিল হল হকের বিপরীত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় তার স্থিতি অসম্ভব।'[৯] 'যা মৌলিক ও গুণগতভাবে সঠিক নয়।'[১০] সার্বিকভাবে তা কল্যাণকরও নয়। বস্তুত মহান আল্লাহ এবং তাঁর সত্য দ্বীনের বিপরীত যত মত ও পথ রয়েছে তা সবই বাতিল।

বাতিল মরীচিকা সাদৃশ্য। সাময়িকভাবে চমক সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তার করলেও স্থায়ীভাবে তা টিকতে পারে না। হকের উপস্থিতিতে তা নিস্প্রভ হয়ে যায়। বাতিল বাহ্যিকভাবে কখনও কোথাও শক্তিশালী ও চমৎকার দেখালেও বাস্তবে তা অন্তঃসারশূন্য, মেকী ও নড়বড়ে। এর ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। সময়ের ব্যবধানে এর পতন ও ধ্বংস অনিবার্য, তা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। তাই বাতিলের উত্থানে ভীত হওয়ার কিছুই নেই। বাতিলের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে[১১]–

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এতে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুসারে প্লাবিত হয়, ফলে প্লাবন উপরস্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। আর অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে তারা আগুনে যা কিছু উত্তপ্ত করে তাতেও অনুরূপ ফেনা হয়। এমনিভাবে আল্লাহ হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে, তা যমীনে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন।"

অন্যত্র বলা হয়েছে-[১২] وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - "আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।"

আরও বলা হয়েছে-[১৩] بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ "বরং আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ! তোমরা যা বলছো তার জন্য।"

---

১. আল-কুরআন ০৩:৬১; ৫১:১০-১১।
২. আল-কুরআন ৩৯:৩২।
৩. আল-কুরআন ২৬:২২১-২২২।
৪. আল-কুরআন ৩৯:৬০।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মুরসালাত : আয়াত ১৫, ১৯,২৪,২৮,৩৪,৩৭,৪০,৪৫,৪৭,৪৯; আরও দেখুন,আল-কুরআন ৮৩:১০; ৩৯:২৫; ০৭:৩৬।
৬ .আল-কুরআন ,সূরা আল-বাক্বারাহ :আয়াত ১০।
৭.দেখুন, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৬০৫; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ১৯৩৯।
৮. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১।
৯. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৬৪।
১০. ড.সা'দী আবূ জাইব, *আল-কামূস আল-ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০।
১১. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ১৭।
১২. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২ : আয়াত ২৪, আরও দেখুন, আল-কুরআন (২১:১৮) (১৭:৮১)।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া: আয়াত ১৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১৭: ৮১।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে বাতিলের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, বাতিল হচ্ছে পানির উপর সৃষ্ট ফেনার মত অতি দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী। এর কোন ভিত্তি নেই, এটা ভাসমান এবং কখনো তা স্থায়ী হতে পারে না। ফেনার মত বাতিলও দুর্বল ও ভাসমান; সত্যের সামনে তা ঠিকতে পারে না এবং তার পতন অনিবার্য। তাই কেউ যেন বাতিলের উত্থান ও সাময়িক দাপটে ভীত না হয় এবং অনুসরণ না করে।

বাতিল তার অনুসারীদের বিশ্বাস ও কর্মে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা হক তথা আল্লাহ, পরকাল, নাবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী হতে পারে না। তারা হক বা সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য নানা অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। তারা হকপন্থীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হুমকি ইত্যাদি মানসিক আক্রমণে ক্ষান্ত হয় না, বরং হত্যা ও শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। সমাজে বিভিন্নভাবে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার ঘটায়। এদের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]– كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ "এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করেছিল। এবং প্রত্যেক দল তাদের রাসূলগণকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং তারা অসার বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব!" অন্যত্র বলেন[২]- مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ- لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ- "যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।"

সৎপথ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশের পর কেউ অসত্য ও অন্যায়ের পথ অবলম্বন করলে তাকে ভ্রষ্টতা ও ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এক্ষেত্রে ছামুদ জাতির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলা হয়েছে[৩]– وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ "আর সামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই তো যে, আমি তাদের পথনির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।" অন্যত্র বলেন-[৪] فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ "অতঃপর তারা যখন বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" উদ্ধৃত আয়াতসমূহে বাতিল অবলম্বনের অকল্যাণকারিতা ও মন্দ পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

বাতিল অবলম্বন ও হক বর্জন মানব জীবনে এক গুরুতর পদস্খলন। এটা মানুষকে শিরক, নিফাক ও কুফরের দিকে ঠেলে দেয় এবং পর্যায়ক্রমে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকে পরিণত হয়। এ ধরনের সত্যচ্যুত মানুষ সমাজে অন্যায় ও পাপাচারের জন্ম দেয়। এর ফলে সমাজে অন্যায় ও অসত্যের শেকড় মজবুত হয়। সমাজে নৈরাজ্য ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে সমাজে বাতিল সুসংহত হয়। সত্যের গতিধারা স্তব্ধ হয়, সমাজে বাতিলপন্থী দুস্কৃতিকারীদের আধিপত্য বেড়ে যায়। মানুষ তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে এবং সত্যের ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়। এছাড়াও এতে নানাবিধ অকল্যাণ ও ক্ষতি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৫]- إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ- "যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখান এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।" অন্যত্র বলেন[৬], وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ "বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যারা বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত'।" অন্যত্র আরও বলেন[৭]- وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ "আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না সে যমীনে তাঁকে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই। এরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।"

তাই বাতিল ও হকপন্থীরা নিকটজন হলেও পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন[৮]–(يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ) "হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইরা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না।"

বাতিল অবলম্বন ও সত্য বর্জনের ধরন: বাতিল অবলম্বন ও সত্য বর্জন নানাভাবে হতে পারে। যেমন: সত্য প্রত্যাখ্যান, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ, সত্য থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, সত্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, সত্য গোপন, সত্যের বিষয়ে নীরবতা, সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কিংবা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিতকরণ–ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। বাতিলপন্থীরা বাতিল অবলম্বন এবং সত্যকে বর্জন বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করে থাকে, নিম্নে তার রূপ ও চিত্র তুলে ধরা হল–

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ০৫।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ০২-০৩, আল-কুরআন (৪৩:০৭)।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ ৪১: আয়াত ১৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফফ ৬১: আয়াত ০৫।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ২৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৫২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহক্বাফ ৪৬: আয়াত ৩২।
[৮]. আল কুরআন, সূরা আত-তাওবা: আয়াত ২৩।

•বাতিলপন্থীদের অধিকাংশই সরাসরি সত্যকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কিংবা সত্যের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকে। তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং হঠকারিতাবশত স্বীয় বিভ্রান্তির উপর অটল থাকে। এই বিষয়টি বিশেষভাবে দেখা যায় শিরক, কুফর ও বিদ‘আতপন্থী মূর্খ লোকদের মধ্যে। সত্যগ্রহণ বা সত্যের আলোকে নিজেকে সংশোধনের আকাঙ্খা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১] (الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ) "যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত হকের অনুসরণ করে।" অন্যত্র এসেছে[২]

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ-"আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যাকে তার রবের নিদর্শনাবলী স্মরণ করে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তার কৃতকর্ম ভুলে গেছে?" উল্লেখিত আয়াতসমূহে বাতিলপন্থীদের বিশেষ পরিচয় ও স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

•বাতিলপন্থীদের এক শ্রেণী আছে যারা শুধু প্রকাশ্যে সত্য প্রত্যাখ্যান বা সত্যের বিরূদ্ধাচারণ করে ক্ষান্ত হয় না বরং তারা সত্যপন্থী মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমাজে সত্য চর্চার গতিধারা ব্যাহত করে। এতে সমাজে অন্যায়-অবিচার বেড়ে যায় এবং দুস্কৃতিকারী ও অসৎ লোকদের অশুভ তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং অন্যায়ভাবে নাবীদের হত্যা করে, আর মানুষের মধ্য থেকে যারা ন্যায়-পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, তুমি মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। ওরাই, (তারা) যাদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে নিস্ফল হয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

•বাতিলপন্থীদের আরেক শ্রেণী সরাসরি সত্যকে প্রত্যাখ্যান না করলেও তারা সত্যের প্রতি অবজ্ঞা, উদাসীনতা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা। মহান আল্লাহ বলেন[৪] مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ -لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ "যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।" আরও বলেন[৫] وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ - أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ "এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফিল। তাদেরই আবাস আগুন তাদের কৃতকর্মের জন্য।"
উল্লেখিত আয়াতসমূহে দেখা যাচ্ছে যে, বাতিলপন্থীরা সত্য গ্রহণ তো দূরের কথা, বরং সত্য নিয়ে তাচ্ছিল্য করছে।

• বাতিলপন্থীদের ভিন্ন একটি শ্রেণী সত্য বর্জনের ব্যাপারে অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন তারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে। ইহুদীরা এই গর্হিত অনাচারে বিশেষভাবে জড়িত ছিল, মহান আল্লাহ তাদের ধিক্কার দিয়ে মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন[৬]– وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না, এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" –এ আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ করে মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে।

•বাতিলপন্থীদের অন্য শ্রেণী মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করে এবং সত্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে। এতে মানুষ সত্যের ব্যাপারে সংশয়ে নিমজ্জিত হয়। আর এই বিভ্রান্তি নানাভাবে হতে পারে যেমন: বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য সত্যের ব্যাপারে ধোঁয়া সৃষ্টি, সত্যকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করা ও মূল সত্য ছেড়ে দূরবর্তী ব্যাখ্যা ইত্যাদি। যেমন কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের বক্তব্য[৭]

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ- لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ

আর যখন তাদের বলা হয়, ‘তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন’? তখন তারা বলে, ‘পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী’। এতে করে তারা কিয়ামতের দিনে নিজদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট!"

–এ আয়াতে কাফিররা সত্য (কুরআন) কে ‘পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী’ বলে এর গুরুত্ব খাটো করতে চেষ্টা করেছে এবং সত্য থেকে মানুষের মনোযোগ ভিন্ন দিকে ফিরানোর অপকৌশল অবলম্বন করছে।

•বাতিলপন্থীদের আরেক শ্রেণী পার্থিব সামান্য স্বার্থে তুচ্ছ মূল্যে সত্য বিক্রি করে। অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্য বর্জন, সত্যের পাশ কাটানো, সত্যের ব্যাপারে অপব্যাখ্যা ও সত্য পরিপন্থী ব্যাখ্যা ইত্যাদি সব ধরনের সত্যের বিনিময়ে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ০৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহফ ১৮: আয়াত ৫৭।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-‘ইমরান ০৩: আয়াত ২১-২২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ০২-০৩।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৭-৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ২৪-২৫।

তুচ্ছমূল্য গ্রহণের শামিল। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ "আর আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।"

•বাতিলপন্থীদের আর একটি শ্রেণী সত্য গোপন ও সত্যের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করে। এ ধরনের অপরাধীকে হাদীসে বোবা শয়তান বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে[২]

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاأَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَابَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

নিশ্চয় যারা গোপন করে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তারাই সে সব লোক যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আর আমি তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

সত্য গোপন এবং সত্য প্রকাশে অনীহা করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[৩], "যে ব্যক্তি (সত্য) জ্ঞানের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েও তা গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।" এই হাদীসের ভাষ্য মতে, যেখানে সত্য জ্ঞান প্রকাশ করা ফরয, সেখানে যে ব্যক্তি সত্য গোপন করবে অথবা নীরব থাকবে সেই ব্যক্তির মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।

বাতিল ও বাতিলপন্থীদের জন্য রয়েছে নানা পার্থিব ও পরকালীন অশুভ পরিণাম। সত্য অপছন্দ, সত্য অস্বীকার, সত্যের বিরোধিতা হেদায়েতের অন্তরায় ও কুফরী কাজ। এটা ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দেয়। ফলে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]- بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ "বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়েই এসেছিল। আর তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দকারী। আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আকাশসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশ বাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" বিশেষ করে সত্য বোঝার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণতি বড়ই মন্দ। এতে ব্যক্তির অন্তর কলুষযুক্ত হয়, চোখে পর্দা পড়ে, ফলে মানুষ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। এ অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[৫] (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ)"যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" আরও বলেন[৬], فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" অন্যত্র বলেন[৭]–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের উদরে আগুন ছাড়া আর কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারাই হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে তারা কতইনা ধৈর্যশীল।" অন্যত্র আরও বলা হয়েছে[৮] (تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى)-"জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।"

বাতিল অবলম্বন এবং সত্যকে বর্জনের কারণ: পূর্বপুরুষ ও সমাজপতিদের অন্ধঅনুসরণ। ভ্রান্ত মতবাদ, মূর্খ পণ্ডিত, বিভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতার অনুসরণ। পাশ্চাত্য দর্শন ও বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার কুপ্রভাব। অজ্ঞতা, জিদ-হঠকারিতা।

প্রতিকারে করণীয়: ওহীলব্ধ সঠিক জ্ঞানের অনুসরণ এবং প্রকৃত সত্য উপলব্ধি। সত্যপন্থীর অনুসরণ, পূর্বপুরুষ ও বিভ্রান্তদের অনুসরণ না করা। বস্তুবাদী শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন ও ভ্রান্ত মতবাদের ক্রটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তার পরিবর্তে ওহীর সঠিক শিক্ষার প্রসার।

❑. লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা (الشح):

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪১।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৫৯-১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২১: ১৮, (৪২ : ২৪)।

[৩].মূল আরবী[من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল'ইলম, হা.নং ৩৬৫৮; *তিরমিযী*, হা.২৬৪৯; ইবনু মাজাহ, হা.নং২৬৪।

[৪]. আল-কুরআন, আল-মুমিনূন ২৩ : আয়াত ৭০-৭১।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ২৭।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৩২।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭৪-১৭৫।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ৭০: আয়াত ১৬।

লোভ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ (شُحَّ), যার শাব্দিক অর্থ হল–লিপ্সা, কামনা, কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা; পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি।[১] পরিভাষায় লোভ হল– মহান আল্লাহ যা নিষেধ ও হারাম করেছেন তার প্রতি মনের আগ্রহ এবং ব্যক্তির জন্য সম্পদ, স্ত্রী ও অন্য যা কিছু আল্লাহ বৈধ করেছেন বা বৈধভাবে দিয়েছেন তার প্রতি তুষ্টিহীনতা।[২]

লোভ-লালসা মানব চরিত্র বিনষ্টকারী মন্দ স্বভাবগুলোর অন্যতম। এটা মানব মনকে চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদাই অতৃপ্তির দিকে ধাবিত করে। তা এমন যে, একটি আশা পুরণ হলে আরেকটি আশার উদয় ঘটায়, এভাবে লোভী যতই পায় ততই চাওয়া-পাওয়ার লিপ্সা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মৃত্যু ছাড়া কোন কিছু এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে না। তাই লোভীদের কখনও তৃপ্ত হতে দেখা যায় না। এজন্যে কুরআনে বলা হয়েছে-[৩] (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) "যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"

মানুষ স্বভাবগত ভাবেই অতৃপ্ত। এ কারণে মানুষ বিপদ ও দুঃখের সম্মুখীন হয়। এজন্য লোভের নিন্দা করা হয়েছে। রাসূল(সা.) বলেছেন, "যদি আদম সন্তানের দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদও থাকে তবে সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে। (কবরের) মাটি ছাড়া তার পেট অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হবে না।"[৪][অন্য বর্ণনায় সম্পদের স্থলে স্বর্ণের কথা বলা হয়েছে]।

লোভ-লালসা মানুষকে অন্ধ ও আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং বিভিন্ন মন্দকাজ, পাপাচার ও অপরাধে লিপ্ত করায়। লোভের কারণে মানুষ কৃপণতা করে, ফলে পরস্পরের মধ্য থেকে সম্প্রীতি ও ভালবাসা উঠে যায়। এ কারণে মানুষ আত্মীয়-স্বজনকে ওয়ারিশ থেকে বঞ্চিত করে। এটা যুলম, সীমালংঘন ও রক্তপাতের অন্যতম কারণ। ধন-সম্পদ ও অর্থের লোভে মানুষ দুর্নীতি, ঘুষ, সুদ, কৃপণতা, মজুতদারী, খাদ্যে ভেজাল মেশানো, ওজনে কম দেয়াসহ বিভিন্ন অন্যায় ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার লোভে অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা-নির্যাতন করে। সম্পদের লোভে ডাকাত নিরীহ মানুষ হত্যা করে। যশ-খ্যাতির লোভে মানুষ মিথ্যা, রিয়া ও কপটতাসহ নানা অনৈতিকতায় লিপ্ত হয়। এভাবে লোভের বশীভূত হয়ে বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাসে ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে। এজন্য লোভের নিন্দায় বলা হয়েছে[৫]

(أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ- حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ- كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ- ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ- كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ-)

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা সংগত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।"এ সূরার 'তাকাছুর' শব্দের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ আসাদ(১৯০০-১৯৯২খৃ.)বলেন[৬]

> The term *takathur* bears the connotation of "greedily striving for an increase", i.e., in benefits, be they tangible or intangible, real or illusory. In the above context it denotes man's obsessive striving for more and more comforts, more material goods, greater power over his fellow-men or over nature, and unceasing technological progress. A passionate pursuit of such endeavours, to the exclusion of everything else, bars man from all spiritual insight and, hence, from the acceptance of any restrictions and inhibitions based on purely moral values - with the result that not only individuals but whole societies gradually lose all inner stability and, thus, all chance of happiness.

লোভ-লালসার মধ্যে সম্মান ও সম্পদের লোভ অত্যন্ত মারাত্মক। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,'*ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে; সম্পদ, পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি মানুষের লোভ এর চাইতে অধিক ক্ষতি সাধন করে তার দ্বীনের।*'[৭] এই হাদীস থেকে বুঝা গেল, যে অন্তরে খাঁটি দ্বীন ও সত্য স্থান পাবে, সেখানে ধন-সম্পদ, সম্মান ও শান-শওকতের কোন স্থান থাকবে না।

লোভ-লালসা নৈতিক পদস্খলন ঘটায় এবং অবক্ষয়ের জন্ম দেয়। এর ভুড়িভুড়ি উদাহরণ আছে। অতীতকাল হতে অদ্যাবধি লোভ-লালসার দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, স্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকার লোভ বা আকাংঙ্খা আদম ('আ.) কে শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত করেছিল ফলে তিনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন।[৮] আদম ('আ.) পুত্র কাবিল তার আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে তার বোন আকলিমার সৌন্দর্যের লোভে। ক্ষমতার লোভে ফিরআউন কুফরে লিপ্ত হয়। এভাবে লোভ-লালসা যুগে যুগে মানুষকে নানা অপরাধে লিপ্ত করে। এ মর্মে রাসূল সা.বলেন[৯]

> তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। এটা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে। অতঃপর এটা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করতে বলেছে, ফলে তারা তা ছিন্ন করেছে। অতঃপর এটা তাদেরকে পাপাচারের দিকে প্ররোচিত করেছে, ফলে তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।

---

[১]. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬৩।

[২]. *মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.১০, পৃ.৪৬৮৬ (ইবনু রজব রহ. প্রদত্ত সংজ্ঞা)।

[৩] . আল কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র : আয়াত ০৯; আরও দেখুন, আল কুরআন ৬৪:১৫-১৬।

[৪] .মূল আরবী [لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হা. নং ৬০৭২।

[৫]. আল কুরআন, সূরা আত-তাকাছুর : আয়াত ১-৫।

[6] .Muhammad Asad, *The Message of The Quran* (Gibratar : Dar Al-Andlus Limited,1980) P.878.

[৭] . মূল আরবী [ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩৭৬।

[৮] . আল কুরআন, সূরা ত্বা-হা : আয়াত ১২০-১২১।

[৯]. মূল আরবী[إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, হা.১৬৯৮।

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে[১]...এটা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং তাদের মাহরামদের (যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) হালাল করেছে।

লোভ-লালসা মানুষের মনকে মন্দের দিকে ঠেলে দেয়। এটা ব্যক্তিকে স্বার্থপরে পরিণত করে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের স্বার্থহানি করতে কোনরূপ কুণ্ঠবোধ করে না। ন্যায়-অন্যায় বা বৃহত্তর কল্যাণ বিচার না করে লোভী ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত নিজের স্বার্থ পূরণে নিমগ্ন থাকে। তারা খুব কমই দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণে আসে। দেশ ও জাতির স্বার্থ অপেক্ষা তাদের নিকট নিজেদের স্বার্থ অধিক বড় হয়ে দেখা দেয়। এজন্য লোভ-লালসার পরিহারের নির্দেশ দিয়ে কুরআন বলা হয়েছে[২]-(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) "আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু'চোখ সে সবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়াছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"

লোভ মানুষের মধ্যে কৃপণতার জন্ম দেয় এবং তাতে উৎসাহিত করে। তাই লোভীদের কৃপণ হতে দেখা যায়।এ মর্মে বলা হয়েছে-[৩] (وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)"মানুষ লোভহেতু স্বভাবতই কৃপণ; আর যদি তোমরা সৎকর্ম কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত।"
উল্লেখ্য যে, লোভ কৃপণতা থেকেও বড় পাপ। কেননা লোভী অন্যের সম্পদ নিজের হস্তগত হওয়ার জন্য লোভাতুর থাকে এবং নিজের নিকটে যা আছে সে ব্যাপারেও কৃপণতা করে, আর কৃপণ শুধু নিজের সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করে।
লোভ মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে হিংসায় নিপতিত করে। এজন্য কুরআন অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্বে বা প্রাচুর্যে লোভাতুর না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–(وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) "যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা তার লালসা করো না।"
ইয়াহিয়া ইবন মায়ায রহ. বলেন, "আশা ও আকাঙ্খাই উত্তম কার্যে বাঁধাদানকারী এবং লোভ-লালসাই সত্য-বিচ্যুতকারী। অপরপক্ষে, সবর সব কার্যে সাফল্য আনায়নকারী এবং নফসই সব মন্দের আহবানকারী।"[৫]

লোভ-লালসা মানুষকে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে লক্ষ্যচ্যুত করে। মানুষ তখন কামনা-বাসনা ও অর্থ-সম্পদের গোলাম হয়ে যায়। পার্থিব ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্ভোগ জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং নীতি-নৈতিকতা তখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ক্রমাগত সম্পদ লাভের লালসা লোভী ব্যক্তিকে অন্ধ করে ফেলে। লোভীরা স্বীয় স্বার্থ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে কোন অন্যায় করতে দ্বিধা করে না। লোভের সমূহ কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে–

একজন লোভী ব্যক্তি সারাক্ষণ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় নিজকে ব্যাপৃত রাখে। জীবনের উদ্দেশ্য, স্রষ্টার একত্ববাদ তাঁর দয়া আর ক্ষমতা সবকিছুর সামনে তার দুষ্ট লোভী মন বস্তুবাদের এক বিচিত্র রংয়ের পর্দা সারাক্ষণ মেলে ধরে। বস্তুজগত তার উপাস্য হয়ে যায়, পার্থিব ধনসম্পদ সকল ক্ষমতার উৎস হয়ে তার কাছে প্রতিভাত হয়। এর উদ্ভুত ফল হলো ধনের সামান্য ক্ষতিও সে সইতে অক্ষম। সে যত পায় তার চাইতে অধিক পাওয়ার লোভে নিমগ্ন। যার ফলে সে সর্বদা অস্থিরতা, অতৃপ্তি আর হতাশার মাঝে দোল খেতে থাকে। তার বল্গাহীন ধনলিপ্সা শুধু নিজেকেই অশান্তির আগুনে দগ্ধ করে না অপরাপর মানুষকেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্মমভাবে আঘাত করে।[৬]

লোভ-লালসা একটি ঘৃর্ণিত পাপ কাজ। লোভ-লালসার পার্থিব ও পরকালীন পরিণাম মন্দ। দুনিয়ায় লোভী ব্যক্তিরা সমাজের মানুষ কর্তৃক ঘৃর্ণিত হন। এটা মানুষকে পরকালীন জীবনের ব্যাপারে উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। এতে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যা পরকালীন শাস্তির কারণ হবে।তাই লোভ-লালসা থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে[৭]
(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ)
"যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"

লোভের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। একদা রাসূল সা. তাঁর সঙ্গীদের বলেন: আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলবো না। সঙ্গীরা বলেন, হ্যাঁ বলুন! তিনি বললেন: তারা হলো নির্দয়, স্বার্থপর, লোভী ও অহংকারী।[৮]

১.মূল আরবী [اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২৫৭৮।
২. আল কুরআন, সূরা ত্বা-হা : আয়াত ১৩১; আরও দেখুন, আল কুরআন ১৫ : ৮৮।
৩. আল কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ১২৮।
৪. আল কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ৩২; আরও দেখুন, আল কুরআন০৪:৫৪।
৫. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *মিনহাজুল আবেদীন*, অনু: মুজীবুর রহমান, (ঢাকা: ইফাবা, ৭ম সংস্করণ, ২০০৪), পৃ.১১৩।
৬. *স্রষ্টা ও ইসলাম*, সংকলন, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ.৭৪-৭৫।
৭. আল কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : আয়াত ১৬।
৮.মূল আরবী [ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر] *সহীহ* আল-বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক, হা.নং৪৬৩৪; *সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল জান্নাতি ওয়া নি'মাতিহা, হা. ২৮৫৩।

বর্তমান মুসলিম জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা। অর্থ-সম্পদ, পদমর্যাদা ও ক্ষমতার লোভ তাদের মধ্যে বড়ই প্রকট। সামান্য অর্থ বা পদের লোভে তারা স্বীয় হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে জাতীয় স্বার্থ ও ঐতিহ্য বিক্রি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। অতি সামান্য অর্থ, চাকুরী বা ক্ষমতার বিনিময়ে তাদের ঈমান কেনা যায়, এজন্য তারা স্বীয় জাতি ও আদর্শের পরিপন্থী যে কোন ধরনের কাজ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ এক সময় পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে একজন মুসলিমের ঈমান কেনা যেত না। বর্তমান যুগের মানুষের অসংযত লোভ-লালসার ভয়াবহতা তুলে ধরে *Road to Mecca* বইতে বলা হয়েছে[১]–

> লোভ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। যুগে যুগে মানুষের মাঝে লোভ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের লোভ-লালসার মাত্রা এমন এক নেশার পর্যায়ে পৌঁছেছে যা সকল যুগের লোভ-লালসার পরিধিকে হার মানায়। একজনকে ছাড়িয়ে অপরজন আরো বেশী অর্থ-সম্পদ বাড়ানোর মোহ ও অদম্য লোভ মানুষকে অন্য সকল বিষয়ের প্রতি অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। মানুষ কেবলই সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত। আজ যা আছে আগামীকাল তার চেয়ে আরো বেশী চাই, আগামী পরশু আরো বেশী। লোভের চাহিদা এমনভাবে বেড়ে চলেছে যেন এক মহামানব মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে চাবুক মেরে অসীম লোভের রাজ্যে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। জাগতিক সকল কিছু দু'হাতে অর্জনের নেশা আজকের মানুষকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অদম্য এ লোভকে আরো বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভোগ্য পণ্যসমূহ নিত্য নতুন মোড়কে, নিত্য নতুন সাজে লোভনীয়, মোহনীয় ভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। অতঃপর মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে আকৃষ্ট করে চলেছে। এমন সব পণ্য বাজারে আসছে যেন মানুষের চোখের ও মনের ক্ষুধা কবরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্বাপিত না হয়।

লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার কারণ: বেশী বেশী পার্থিব পাওয়ার আশা-আকাঙ্খা ও ভোগ-বাসনা। আত্মকেন্দ্রিক হীনচিন্তা, ব্যক্তি স্বার্থ। পাশ্চাত্য বস্তুবাদী জীবনধারার প্রভাব। পরকালীণ জবাবদিহিতার প্রতি উদাসীনতা।

প্রতিকারের উপায়: স্বল্পতুষ্টি, দুনিয়ার জীবনের সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করা। দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা। তাকদীরের প্রতি গভীর আস্থা। পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় লালন করা। উন্নত চরিত্র অর্জন, মানব কল্যাণ ও সৃষ্টির সেবা।

❑. কৃপণতা (اَلْبُخْلُ):

কৃপণতার আরবী প্রতিশব্দ আল-বুখল (اَلْبُخْلُ)। কৃপণতা হল–শরীয়তের নির্দেশিত অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে খরচ না করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করা। ইমাম আল-কুরতুবী (মৃ.৬৭১হি.) বলেন–[هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه]'কৃপণতা হল মহান আল্লাহ যে সব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় আবশ্যক করেছেন সেক্ষেত্রে তা ব্যয় থেকে বিরত থাকা।'[২] কৃপণতার দুটি দিকের একটি হলো, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের, স্ত্রীর, সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন পূরণ না করা; আরেকটি দিক হলো ভালো, ন্যায় ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা। কুরআনে শব্দটি বিভিন্নরূপে **১২**বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

কৃপণতা একটি অন্তরের নিকৃষ্ট ব্যাধি, সম্পদের প্রতি অতিলোভ ও অন্তরের কাঠিন্য থেকে তা জন্ম লাভ করে। কৃপণতা মনুষ্যত্ব বিবর্জিত অবস্থা এবং আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার শামিল। এটা ব্যক্তির মনে হীনমন্যতা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে এবং বিবেককে অন্ধ করে ফেলে। এর ফলে মানুষ নির্দয়, নিষ্ঠুর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তারা নিজের, নিজ পরিবার, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ ও মৌলিক প্রয়োজন ঠিকভাবে পূরণ করে না। নিজেরা কৃপণতা অবলম্বন করার সাথে সাথে তারা অন্যকেও তাতে প্ররোচিত করে। কৃপণরা ধন-সম্পদকে নিজ জ্ঞানলব্ধ অর্জন মনে করে। তারা ধন-সম্পদকে আল্লাহর অনুগ্রহ স্বীকার করতে চান না–যা শুধু অকৃজ্ঞতা নয়, বরং এক ধরনের কুফর। মহান আল্লাহ বলেন-[৪] الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا "যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় আর গোপন করে তা, যা আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন, আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি।" –এখানে কৃপণতাকে আল্লাহর অনুগ্রহ গোপন তথা অকৃতজ্ঞতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ ধরনের কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কাফিরের মত শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

কৃপণরা সমাজ ও মানবতার কল্যাণ থেকে দূরে থাকে। তারা অসহায়-দুঃস্থদের পাশে দাঁড়ায় না ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করে না। তারা সমাজে মানব কল্যাণে কাজ করে না, বরং অন্যদেরকেও নিরুৎসাহিত করে। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং হকদারের হক দিতে চায় না।[৫] কোন কিছু দিতে বাধ্য হলে বেছে বেছে খারাপটি ব্যয় করে। মানব কল্যাণ অপেক্ষা এরা নিজ স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এজন্য কৃপণতা নিন্দা করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন[৬] –

> (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-)

---

[১] .Muhammad Asad, *Road to Mecca* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust,1996) P.310.

[২]. ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন* (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫), খ.০৫, পৃ.১৯৩।

[৩] . মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১।

[৪] .আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ৩৭, আরও আল-কুরআন ১৪: ০৭, ৪৭:৩৮; ৫৭ :২৪।

[৫] . আল কুরআন, সূরা আল-ফাজর : আয়াত ১৫-২০।

[৬] . আল কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৮০; আল কুরআন ১৭:১০০।

"আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য; তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ তা সম্যক জ্ঞাত।"

অন্যত্র ঘোষণা করেন[১] -وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى- وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى- وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى-

"আর যে কার্পণ্য করল ও নিজেকে স্বয়ংসম্পুর্ণ মনে করল। আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে। আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেব। আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।"

এ প্রসংঙ্গে আবূ হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি–"ব্যক্তির মধ্যে মন্দ স্বভাব হল লোভ বা কৃপণতা, যা তাকে হকদারের হক দানে বিরত রাখে, আর ভীরুতা যা যুদ্ধক্ষেত্রে তার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে।"[২]

কৃপণতা ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ নিঃশেষ করে দেয়। এটা মানুষের উত্তম চরিত্র যেমন দয়া, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি নষ্ট করে এবং ব্যক্তির মধ্যে কঠোরতা, রূঢ়তা, নির্দয়তা ইত্যাদি মন্দ গুণ সৃষ্টি করে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৩]

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ- فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ- الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ- وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)

তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে। সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

উল্লেখিত আয়াতে কৃপণের অমানবিক চরিত্র তুলে ধরে এরূপ ব্যক্তিকে দ্বীন অস্বীকারকারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কৃপণতা ব্যক্তির অন্তরে নিফাকের ব্যধি সৃষ্টি করে।[৪] দানে অনীহা এবং কৃপণতা অবলম্বন মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।[৫] এটা মু'মিনের চরিত্র বিরোধী। কোন মু'মিনের মধ্যে তা থাকতে পারে না।[৬] রাসূল সা. যথার্থই বলেছেন-[৭], "দুটি নিকৃষ্ট স্বভাব মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না, কৃপণতা, ও অসচ্চরিত্র।"

কৃপণরা সমাজের মানুষের দ্বারা ঘৃর্ণিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে কৃপণদের প্রতি হকদার ও গরীবদের হিংসা ও ক্ষোভ থাকে, যার ফলে তারা প্রতিনিয়ত কৃপণের ধ্বংস কামনা করে। আর এজন্য কৃপণতার অনিষ্টতা সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন–"কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, বেহেশত থেকে দূরে এবং মানুষ থেকে দূরে। কৃপণ ইবাদতকারী অপেক্ষা অজ্ঞ দানশীল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।"[৮]

কৃপণতা আল্লাহর বড়ই অপছন্দনীয় বিষয়। কৃপণতা শয়তানের আনুগত্যের নামান্তর। শয়তান মানুষকে দরিদ্রতার ভয় দেখিয়ে মানব মনে কৃপণতার প্রেরণা জাগ্রত করে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[৯] (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" তাই কৃপণতা পরিহারে হাদীসে বলা হয়েছে-[১০]"(আল্লাহর পথে/ভালো কাজে) খরচ কর, হিসাব করো না, তাহলে আল্লাহ তোমার বেলায়ও হিসাব করে দিবেন। গোপন করো না, তাহলে আল্লাহ তোমার বেলায়ও গোপন করবেন।"

কৃপণ লোকেরা মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে না। কৃপণদের সম্পদে বরকত থাকে না। সূরা আল-কালামে দেখা যায় যে, কৃপণতার কারণে বাগানের মালিকদের বাগান ধ্বংস হয়ে যায়।[১১] মূসা ('আ.) এর সমসাময়িক কারূন ছিল পৃথিবীর অঢ়েল সম্পদের অধিকারী। কৃপণতার কারণে সমুদয় সম্পদসহ সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়।[১২] এভাবে পৃথিবীতে যুগে যুগে কৃপণদের মন্দ পরিণাম জুটেছে। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম। মহান আল্লাহ বলেন[১৩]

(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)

---

১ . আল কুরআন, সূরা আল-লাইল : আয়াত ০৮-১১।

২ .মূল আরবী [شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع الهلع الجزع] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৫১১।

৩ .আল-কুরআন, সূরা আল-মা'ঊন : আয়াত ০১-০৭; আল-কুরআন ৮৯: ১৫-২০।

৪ .নিফাক অর্থ, কপটতা; মুনাফিকি। দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯ : আয়াত ৭৬-৭৭।

৫ .আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ : আয়াত ৫৪।

৬ .আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ৩৮।

৭. মূল আরবী[خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخيل وسوء الخلق] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৬২।

৮. **মূল আরবী** [والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أحب إلى الله عز و جل من عابد بخيل] *সুনান আত-তিরমিযী*, বাবু বির্রি ওয়া সিলাহ, হা.১৯৬১;

৯ .আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২৬৮।

১০.মূল আরবী[أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল হিবা, হা.নং ২৪৫১, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হা.১০২৯।

১১ . আল কুরআন, সূরা আল-ক্বালাম : আয়াত ১৭-৩৩।

১২ . আল কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস : আয়াত ৭৮,৮১।

১৩ . আল কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ : আয়াত ৩৪-৩৫।

"আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে,অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। (বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে,সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[১]

(وَيْلٌ [لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ-يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ- كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ)-

"(দুর্ভোগ তার জন্য) যে অর্থ জমায় এবং তা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে)।"

কৃপণতার অকল্যাণ আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল সা. বলেন-[২], "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করে; তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে উত্তম প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দাও।"

উদ্ধৃত আয়াত ও হাদীসে কৃপণদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি এবং এর মহাশাস্তির কথা বর্ণনা করে মানুষকে এই মন্দ চরিত্র বর্জনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই আমরা যারা নিজের ভোগ-বিলাস ও বাড়ী-গাড়ীর জন্য খরচ করছি কিন্তু দুঃস্থ-অসহায় মানবতার কল্যাণে কিংবা ধর্মীয় কাজে ব্যয় করতে পারছি না–তাদের উচিত কৃপণদের পরিণাম চিন্তা করে কাজ করা।

কৃপণতার কারণ: ধন-সম্পদের মহব্বত, লোভ-লালসা, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার আশা, পার্থিব জীবনের প্রতি আগ্রহ, সন্তান-সন্ততির জন্য সম্পদ রেখে যাওয়ার আকাঙ্খা, নিবুদ্ধিতা ও আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা।

কৃপণতা দূরীকরণে করণীয়: কৃপণতার কারণ উদঘাটন এবং তা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দান করার আগ্রহ হওয়া মাত্রই দান করা। কৃপণদের মন্দ পরিণাম ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের চিন্তা করা। দানশীলদের সাহচর্যে থাকা এবং কৃপণতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া।

❑. অহঙ্কার, গর্ব, দম্ভ, আত্মগরিমা ও আত্মতুষ্টি (العجب, المرح, الفخر, الكبر):

অহঙ্কার, বড়াই, অহমিকা, বড়ত্ব, ইত্যাদি আরবী আভিধানে কিবর(الكبر) অর্থে;[৩] গর্ব, গৌরব ও সম্মান ফখর (الفخر) অর্থে;[৪] উল্লাস, আনন্দ, দম্ভ ও বড়াই মারাহ (المرح) অর্থে;[৫] এবং আত্মগরিমা ও আত্মপ্রসাদ 'উজব অর্থে ব্যবহৃত হয়। অহঙ্কার (الكِبْر)হল–মানুষের মনের এমন এক স্ফীত অবস্থা, যাতে অন্যের মর্যাদার উপর নিজের মর্যাদা দেখে নিজেকে বড় মনে করা এবং তাতেই আকৃষ্ট হওয়া।[৬]

সাধারণত কথাবার্তার মাধ্যমে যে অহঙ্কার প্রকাশ পায় তা ফখর বা গর্বের অন্তর্ভুক্ত। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে অহঙ্কার প্রকাশ পায় তা মারাহ বা দাম্ভিকতার অন্তর্ভুক্ত। আর নিজের কোন ভালো গুণ বা নি'আমতকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত না করে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে প্রকাশ করা, তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ তা তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করতে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া এবং তাতে প্রসন্ন হওয়া আত্মগরিমা বা আত্মম্ভরিতা(العجب)।[৭] আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের উপর উচ্ছৃঙ্খল হওয়া, তার শোকর আদায় না করাও আত্মম্ভরিতার অন্তর্ভুক্ত।

অহঙ্কার সম্পর্কে রাসূল সা. কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাস করলো যে, মানুষ সুন্দর জামা-কাপড়-জুতা পছন্দ করে, এটা কি অহঙ্কার? তিনি বললেন–আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।(অর্থাৎ তা অহঙ্কারের পর্যায়ভুক্ত নয়) অহঙ্কার হল–"সত্যকে দম্ভভরে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।"[৮] –এর অর্থ সত্যকে সত্য জেনেও মিথ্যার উপরে দৃঢ় থাকা এবং বিভিন্ন অজুহাতে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা। আর 'অন্যকে তুচ্ছ মনে করা' অর্থ সর্বদা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা এবং অন্যের কাছে নিজের মূল্যায়ন কামনা করা।তার চাহিদামত যথাযথ মূল্যায়ন না পেলে অন্যকে হেয় জ্ঞান করা।

আবূ ওয়াহাব আল-মারওয়াযী বলেন-[৯], আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করলাম 'অহংকার' কাকে বলে? তিনি বললেন, মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'আত্মম্ভরিতা' কাকে বলে? তিনি বললেন, তোমার কাছে যা আছে, অন্যের কাছে তা নেই বলে ধারণা করা।

অহঙ্কারের কতিপয় নিদর্শন রয়েছে। যেমন–নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যকে নিজের তুলনায় তুচ্ছ গণ্য করা মানুষের কাছে নিজের বড়ত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রদর্শন করা এবং নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা। অন্যের আনুগত্য ও সেবা করাকে অপমানজনক মনে করা। দুর্বল, দরিদ্র ও অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহার কিংবা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা। মিথ্যা বা ভুলের উপর

---

[১] . আল কুরআন, সূরা আল-হুমাযাহ : আয়াত ০২-০৪, আরও দেখুন, আল-কুরআন ৬৯:৩০-৩৪; ৭৪:৩৮-৪৬।

[২] .মূল আরবী [ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৭৪, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০১০।

[৩] . ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫৮।

[৪] . *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬০৬।

[৫] . *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫৭।

[৬] . আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ.৩৪৪।

[৭].ইবন হাজার মাক্কী, *কিতাবুয যাওয়ায়ির*, অনু.মাও. মুশতাক আহমদ (ঢাকা:আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০১০), পৃ.৪১-৪২।

[৮]. মূল আরবী [الكبر بطر الحق وغمط الناس] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৯১, *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, হা. নং ৪০৯২।

[৯] .শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি.) খ.০৮, পৃ.৪০৭।

জিদ করা। ইত্যাদি। অহঙ্কারীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]– (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ) “যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, তারা এ ব্যাপারে সফলকাম হবে না।”

অহঙ্কার মহান আল্লাহর ভূষণ। এটা কেবল তাঁর জন্যই শোভানীয়। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সব ধরনের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এজন্য হাদীসে ‘অহংকারকে তাঁর চাদর’ বলা হয়েছে। সর্বপ্রকার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক একমাত্র তিনি। তাই তাঁর এক নাম ‘মুতাকাব্বির’। এটা কোন সৃষ্টির জন্য অনধিকার চর্চার শামিল। এতদসত্ত্বেও কেউ তাতে লিপ্ত হলে সে নিন্দিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এজন্য যুগে যুগে অহঙ্কারীরা নিন্দিত ও ধ্বংস হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[২] (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) “নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।”

সৃষ্টিকুলের কারো জন্য অহঙ্কার এক ধরনের অশোভনীয় ও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, সৌন্দর্য, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র দান। তিনি যে কোন সময় এগুলি ফিরিয়ে নিতে পারেন। আমরা সবসময় দেখতে পাচ্ছি যে, অনেক ধনী নিঃস্ব হয়েছেন, অনেক ক্ষমতাবান ক্ষমতা হারিয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন, বহু সুন্দরী ও শক্তিমান ব্যক্তি রোগে বা বার্ধক্যে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েন। তাছাড়া মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। মৃত্যুর পর সে লাশে পরিণত হবে। তাই অহংকার করা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। নির্বোধ লোকেরা নি‘আমত লাভের পর তার চূড়ান্ত উৎস ও পরিণতি চিন্তা না করে তা নিজের অর্জন মনে করে অহঙ্কারে মেতে উঠে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–
(فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
“মানুষকে বিপদ আপদ স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে; অতঃপর যখন আমি আমার কোন নিয়ামত দ্বারা তাকে অনুগৃহীত করি, তখন সে বলে, আমাকে তো এটা দেয়া হয়েছে আমার জ্ঞানের কারণে। বস্তুত এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।” –উদ্ধৃত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন জ্ঞানী ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি অহংকার করতে পারে না। এরপরও যদি কেউ অহঙ্কারে লিপ্ত হয় তবে সে নির্বোধ ও মূর্খ।

অহঙ্কারের কুভাব ও অনিষ্টতা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তা মানুষের সদগুণাবলী বিনষ্ট করে ফেলে এবং বিভিন্ন মন্দ স্বভাব সৃষ্টি করে। যদি কারো অন্তরে অহংকার স্থিতি লাভ করে, তবে তার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং বোধশক্তি লোপ পায়। এর কুপ্রভাব সম্পর্কে আবুল আলিয়া রহ.(মৃ.৯০হি.) বলেন[৪],“লাজুক কিংবা অহংকারী জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়।” এটা নৈতিক গুণাবলী বিকাশ ও সত্যিকার মুমিন হওয়ার পথে বড় অন্তরায়। এজন্য দেখা যায়, অহঙ্কারীরা বিনয়-নম্রতা অবলম্বন, ক্রোধ দমন, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জনে সক্ষম হয় না। তারা নিজেকে অন্য অপেক্ষা উত্তম মনে করায় অন্যদের থেকে ভালো কিছু শিখতে চান না এবং নিজেদের ভুলও সংশোধন করতে চান না। বরং অন্যের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে অহঙ্কারী অন্যের দোষ অন্বেষণ ও গীবত করে থাকে। সে অন্যের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করায় কাঙ্ক্ষিত সম্মান না পেলে মানুষ থেকে সরে পড়ে। এক সময় সে নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অহঙ্কার রজায় রাখতে ব্যক্তি যে কোন মন্দ কাজ করতে এবং ভালো কাজ বর্জনে দ্বিধা করে না। এভাবে অহঙ্কার ব্যক্তির ভালো গুণাবলীকে নষ্ট করে ব্যক্তিকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। তাই এই নিন্দিত গুণ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে-[৫] وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا “ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।”
অহঙ্কারের নৈতিক কুফল সম্পর্কে মিশরীয় চিন্তাবিদ হাসান আইউব(১৯১৮-২০০৮) বলেন-[৬]

> অহংকার মু’মিনকে আরেক ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করতে দেয় না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং তাকে বিনয়ী হতেও দেয় না। অহংকারী হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত হতে পারে না এবং রাগ-গোস্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সে নিজে হিংসাকে হজম করতে পারে না, কোন উপদেশদানকারীর উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষা কবুল করে না। মানুষের সাথে রাগ-ক্ষোভ ও হিংসা-বিদ্বেষ সহকারে কথা বলে, চলা ও বলার সময় গর্ব প্রকাশ করে, উপদেশ দিলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। কথা বলার সময় জটিল কথা বলে, মানুষের সাথে বসলে নেতৃত্ব ও প্রথমে কথা বলার সুযোগ কিংবা অধিক সম্মান ও মর্যাদা না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

অহঙ্কার মানুষকে সত্য গ্রহণ, সত্যের আনুগত্য, সৎপথ লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণে অহঙ্কারীরা সত্য অবলম্বনে ব্যর্থ হয়। তাই দেখা যায় সত্যভ্রষ্টদের অধিকাংশই অহঙ্কারী। পরিণতিতে বাতিলের উপর মৃত্যু হয় এবং মন্দ

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আল-মু’মিন : আয়াত ৫৬, আরও দেখুন,.আল-কুরআন ৪১:৫০-৫১, ৩৯ : ৪৯, ১১ : ১০, ১৭ : ৮৩, ৩৬ :৭৭-৭৯।
[২].আল-কুরআন ,সূরা আন্-নিসা’: আয়াত ৩৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১৬:২৩।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার : আয়াত ৪৯, আরও দেখুন আল-কুরআন ১১: ১০; ৪১: ৫১; ১৭ : ৮৩; ৩৬ :৭৭-৭৯।
[৪].মূল আরবী [لا يتعلم مستحي ولا متكبر] আবূ নুআইম ইসপাহানী, *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (বৈরুত:দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫হি.) খ.২, পৃ.২২০।
[৫] .আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ : **আয়াত** ৩৭-৩৮। আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩১ : ১৮-১৯।
[৬]. হাসান আইউব, *আস-সুলূকুল ইজতিমা‘ঈ ফীল ইসলাম*, (আল-কাহিরাহ : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ২০০২) পৃ.৫৪।

পরিণতি ভোগ করতে হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[১] (يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) "আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[২] –

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ

যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহঙ্কার করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দিব, আর তারা আমার নিদর্শনসমূহ দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না, এবং তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্তপথ দেখলে তা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফিল।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সত্য গ্রহণ ও সৎপথ লাভের পথে প্রতিবন্ধক অপশক্তি হিসেবে অহঙ্কারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবী সালমান (রা.) কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন মন্দ কাজের উপস্থিতিতে সৎকর্ম উপকারী হয় না', তিনি বললেন,'অহঙ্কার'।[৩] মুহাম্মাদ ইবন হুসাইন ইবন আলী(রহ.) বলেন–"কোন মু'মিনের অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করলে সেই পরিমান জ্ঞান লোপ পায়। কম প্রবেশ করলে কম আর বেশী প্রবেশ করলে বেশী লোপ পায়।"[4]

অহঙ্কার মানুষকে আত্মপূজারী, স্বেচ্ছাচারী ও উদ্ধত্য বানায়। কেননা অহঙ্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো নিজের প্রাধান্য ও অধিকার সম্পর্কে মাত্রাতীতভাবে সচেতনতা। অন্যের প্রতি চরম উপেক্ষা ও উদাসীনতার মনোভাব পোষণ করে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখা। কথায় আর ব্যবহারে মানুষের মনে আঘাত দিতে সে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করে না। এই মানসিকতা এতই ভয়ংকর যে, ধীরে ধীরে নিজের অজান্তেই তার তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস হালকা করে চরম ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। নিজের ক্ষমতা আর প্রাধান্যকে পরম এবং নিজের মৌলিক গুণের ফলপ্রসূত বলে ধারণা করে, যার ফলে মনের দিক থেকে সে নিজেই হয়ে উঠে আত্মপূজারী। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৫]– (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلا) "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে ? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।" বস্তুত অহঙ্কারী ও প্রদর্শন ইচ্ছুকরাই আত্মপূজায় লিপ্ত হয়।

অহঙ্কার কুফর ও নিফাকের অন্যতম কার্যকারণ। অহঙ্কার শয়তানকে অভিশপ্ত কাফিরে পরিণত করে।[৬] এটা এমন একটি মন্দ গুণ, যা শুধু মানুষকে কুফর ও নিফাকে নিমজ্জিত করে না বরং ঈমান ও হিদায়েত গ্রহণের তাওফীক থেকে বঞ্চিত করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭] وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ "আর যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৮] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ "আর তাদের যখন বলা হয় এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদের দেখতে পাবে, অহঙ্কারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে।"

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন[৯], সমস্ত পাপের উৎস হ'ল তিনটি : (১) অহংকার, যা ইবলীসের পতন ঘটিয়েছিল। (২) লোভ, যা জান্নাত থেকে আদম-কে বের করে দিয়েছিল। (৩) হিংসা, যা আদম('আ.)-এর এক সন্তানের বিরুদ্ধে অপর সন্তানকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিল। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে সে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। কেননা কুফরীর মূল উৎস হ'ল 'অহংকার'। পাপ কর্মের উৎস হ'ল 'লোভ'। আর বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উৎস হ'ল 'হিংসা'।

অহঙ্কার মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি, অভিশাপ ও লাঞ্ছনার প্রধান কারণ। এর একটি দৃষ্টান্ত– ইবলীস, যে দীর্ঘকাল ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য এবং ফিরিশতাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিল। কিন্তু শুধু অহঙ্কারের কারণে সে সব মর্যাদা হারিয়ে চরম লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়। যা কুরআনে এভাবে এসেছে[১০] –

(قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ)

"সে (ইবলীস) বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন, এ স্থান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বাহির হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন : আয়াত ৩৫, আরও দেখুন আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন: আয়াত ৫৬।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৪৬।
[৩].মূল আরবী[وسئل سليمان عن السيئة التي لاتنفع معهاحسنة فقال الكبر]আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*(বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি), খ.০৩, পৃ.৩৩৯।
[4].মূল আরবী [ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو كثر] আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০৩, পৃ.৩৩৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ৪৯।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ: আয়াত ৩১, আরও দেখুন .আল-কুরআন ০২:৮৭, ০৭:৭৩-৭৬,৮৫-৮৯,১৬:২২, ২৫:২১,২৮:৩৮-৪০,৩১:৭,৩৭:৩৫,৪৫:৮,৭১:১-৭।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিক্বূন ৬৩: আয়াত ৫।
[৯]. ইবনুল ক্বাইয়িম, *আল-ফাওয়ায়েদ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৫৮।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৩, আল-কুরআন ১৫:৩২-৩৩।

এজন্য আল্লাহর নাবী নূহ(‘আ.)মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্রকে অন্তিম অছিয়ত হিসেবে দু’টি নিকৃষ্ট মন্দবিষয় থেকে নিষেধ করেন। নিষেধকৃত সেই মন্দ বস্তু দু’টি হচ্ছে শিরক ও অহংকার।[১]
সুফিয়ান আস-সাওরী রহ.(মৃ. ১৬১হি.)বলেন-[২], “কুপ্রবৃত্তির কারণে যে সব গুনাহ সংঘটিত হয়, তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। আর অহঙ্কারবশতঃ যে সব গুনাহ সংঘটিত হয়, তা থেকে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় না। ইবলীসের গুনাহের মূল কারণ ছিল অহঙ্কার। আর আদম আ. স্খলনের মূল কারণ ছিল প্রবৃত্তি।”

অহঙ্কার পতন ও ধ্বংস ডেকে আনে। অহঙ্কারীরা যত শক্তিশালী হোক না কেন তার পতন অবশ্যম্ভাবী। কুরআনে বর্ণিত আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফিরআউন, হামান, কারূন সহ যুগে যুগে অহঙ্কারীদের ধ্বংসের ঘটনা আজও ইতিহাসে জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। পৃথিবীতে তারা বিপুল পরিমাণ প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল, যে কারণে তারা অহঙ্কারী হয়ে উঠে। ফলে মহান আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৩] –

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

“আর ‘আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহঙ্কার করত এবং বলত, ‘আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। অতঃপর আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু পাঠালাম অশুভ দিনগুলোতে যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাতে পারি। আর আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।” আরও বলা হয়েছে[৪]-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ- فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

আর ফির‘আউন বলল, ‘হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও তারপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রসাদ তৈরী কর; যাতে আমি এতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’। আর ফির‘আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ..فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ

কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল।...অতঃপর আমি কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।”[৫]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে যারাই অহঙ্কারে লিপ্ত হয়েছে তারাই ধ্বংস ও পতনের সম্মুখীন হয়েছে।

অহঙ্কারের পার্থিব ও পরকালীন পরিণতি অতি মন্দ। দাম্ভিক ও অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।[৬] পার্থিব জীবনে অহঙ্কার আল্লাহর গযব ও শাস্তির কারণ। কুরআনে বলা হয়েছে (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا) “ আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা তাদের জীবন উপকরণ নিয়ে দম্ভ করত।”[৭] পরকালে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,[৮] (وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)-“যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে ব্যাপারে অহংকার করেছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।” অন্যত্র বলেন[৯]–(إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)“যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।”
অহঙ্কার জান্নাত লাভের পথে অন্তরায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন-[১০], “যার অন্তরে অণু পরিমান অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” তিনি আরও বলেন-[১১] ‘আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ’ল বাতিল কথার উপর ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারী’। তিনি অন্যত্র বলেন-[১২]

---

[১] .দেখুন, *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ. ০২, পৃ.১৬৯, হাদীস নং ৬৫৮৩।
[২]. ইবনু হাজার আল-‘আসকালানী, *আল-ইসতি‘দাদ লি ইয়াওমিল মা‘আদ (الاستعداد ليوم المعاد)*, (দারুত তারবিয়াহ, তা.বি.) পৃ.২৬।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ : আয়াত ১৫-১৬।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস : আয়াত ৩৮-৪০।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস : আয়াত ৭৬-৮১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪০ : ৮২-৮৩।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ : আয়াত ৩৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১৬:২৩।
[৭] . আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস : আয়াত ৫৮; আরও দেখুন, সূরা আল-আন্‘আম : ৪৪।
[৮] . আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : আয়াত ৩৬, আরও দেখুন আল-কুরআন ০৭ : ৪০-৪১, ৬:৯৩,১৬:২৮-২৯, ৩৯:৫৬-৬০,৭১-৭২,৪০:৬৯-৭৬,৪৬:২০।
[৯] . আল-কুরআন, সূরা আল-মু’মিন : আয়াত ৬০; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৩৯ : ৬০।
[১০] . মুল আরবী [لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر] *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৯১।
[১১] .মুল আরবী [ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر] *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং ৪৬৩৪; *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল জান্নাতি সিফাতি নি‘মাতিহা, হাদীস নং ২৮৫৩।
[১২] . মুল আরবী [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نارالأنيار يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبا] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রাক্বায়িক ওয়াল ওরা‘, হাদীস নং ২৪৯২।

অহংকারী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের রূপে পিঁপড়া সদৃশ্য। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদের বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের 'বূলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদের ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ 'ত্বীনাতুল খাবাল' নামক নদী থেকে পান করবে।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহে অহঙ্কারের অনিষ্টতা ও অহঙ্কারীদের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে।

অহঙ্কারের ন্যায় আত্মগরিমারও অনিষ্টতা নানামুখী।[১] এ থেকে মানুষের মধ্যে অহঙ্কারের জন্ম হয়। এ কারণে মানুষ নিজ ইবাদত ও কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকে এবং আত্মতুষ্টিতে ভোগে। ফলে সে নিজের গুনাহর কথা ভুলে যায় এবং তওবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। নিজের প্রশংসা নিজেই করে থাকে। নিজ জ্ঞান-বুদ্ধিতে তুষ্ট থাকে, অন্যের ত্রুটি খোঁজে, অপরকে মূর্খ গণ্য করে, অন্যের উপর বড়াই করে, অন্যের কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং জ্ঞানীদের পরামর্শ ও উপদেশ কর্ণপাত করে না। এটা ব্যক্তির আল্লাহর উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেয় এবং আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক হয়ে যায়। ফলে তা ব্যক্তির অকল্যাণ ও ধ্বংস বয়ে আনে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস ধ্বংস সাধনকারী। ক. প্রবৃত্তি পূজারী হওয়া , খ.লোভের দাস হওয়া এবং গ. আত্ম অহংকারী হওয়া। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে মারাত্মক।[২]

কা'ব আল-আহবার রা. জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং মজলিস অলংকৃত করার মর্যাদা লাভ থেকে দূরে থেকে সন্তুষ্ট হও। আর মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। কেননা তুমি যদি আসমান-যমীন ভর্তি জ্ঞানের অধিকারী হও, আর তোমার মধ্যে আত্মম্ভরিতা থাকে, তবে আল্লাহ কেবল তোমার নিকৃষ্টতা ও ত্রুটিই বাড়িয়ে দেবেন'।[৩]

•অহঙ্কার ও আত্মপ্রসাদের কিছু কারণ ও উপাদান রয়েছে। মানুষ সাধারণত অর্থ-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, জ্ঞান-বুদ্ধির ইত্যাদি কারণে একে অন্যের উপর অহঙ্কার ও আত্মগরিমা করে থাকে।[৪] ইমাম আল-গাযালী রহ. মতে- সাতটি কারণে মানুষ অহঙ্কার করে। তন্মধ্যে পারলৌকিক পূর্ণতা সম্পর্কিত বিষয় দু'টি–ইলম(জ্ঞান), নেক আমল(কর্ম)। আর পার্থিব পূর্ণতা সম্পর্কিত বিষয় পাঁচটি–বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য, শক্তি, ধন-সম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধব ও সাথীদের প্রাচুর্য।[৫]

অহঙ্কার, দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা প্রতিকারে করণীয়: ক.মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। সেইসাথে নিজেকে জানা, নিজের সৃষ্টি ও সর্বদিক দিয়ে নিজের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্‌র দাস মনে করা। খ.মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ করা, অহঙ্কারীদের দুনিয়া ও আখিরাতের মন্দ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। গ.অহঙ্কার প্রকাশ পায় তার বিপরীত কাজের অনুশীলন করা। যেসব বিষয় মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করে, সেগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত পরিণতি চিন্তা করা। যেসব পোষাক, চাল-চলন, বাহন বা আসবাবপত্র মনে অহঙ্কার সৃষ্টি করে, তা পরিহার করা। ঘ.মহৎ ব্যক্তিদের অনুসরণ করা। অসহায়-দরিদ্র মুমিনদের সঙ্গে থাকা, রোগীর সেবা করা, নিজের বোঝা-ব্যাগ নিজে বহন করা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, কাপড়-জুতা পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করা; মানুষকে ক্ষমা করা ও সর্বদা নম্রতা অবলম্বন করা। ঙ.ভুলে বা উত্তেজনা বশে অহঙ্কার প্রকাশ পেলে সাথে সাথে বান্দার কাছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া। চ.-মনে অহঙ্কার উদয় হলে তওবা করা, নিরাহঙ্কার হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা। গোপন আমল করা। ছ.-নিজের সৎকর্মগুলি আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হচ্ছে কি-না সেই ভয়ে সর্বদা ভীত থাকা।

❑. হিংসা(الحسد) ও বিদ্বেষ (الحقد):

হাসাদ (الحسد) এর আভিধানিক অর্থ–হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা।[৬] আল-কুরআনে হাসাদ শব্দটি ০১ বার, হাসিদ ০১ বার ও ক্রিয়ায় ০৩ বার সহ মোট ০৫ বার এসেছে।[৭] হাসাদ বলতে বুঝায়–'নিয়ামত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির কল্যাণ ও ভালো দেখে জ্বলে-পুড়ে ভষ্ম হওয়া এবং এই নিয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করা।'[৮] ভাষাবিদ আল-জাহিয (মৃ.২৫৫হি.) বলেন–হিংসা হল, মানুষ অন্যের মধ্যে কোন গুণ ও মর্যাদা দেখে ব্যথিত হওয়া এবং তা তার থেকে দূর করার জন্য চেষ্টা করা।[৯]

আল-গাযালী বলেন, হিংসার অবস্থা দু'ধরনের হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে–অপরের নিয়ামত দেখে দুঃখিত হওয়া এবং তার থেকে তা বিলুপ্তি কামনা করা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, অপরের নিয়ামত দেখে খারাপ মনে হবে না এবং তার থেকে তা বিলুপ্তি কামনা করবে না, বরং সে আকাঙ্খা করবে যেন সে-ও সেই নিয়ামত লাভ করে। এ অবস্থাকে বলা হয় গিবতা(ঈর্ষা)। প্রথম অবস্থা হারাম,দ্বিতীয় অবস্থা বৈধ।[১০] এজন্য ফুদাইল(মৃ.১৮৭হি.)বলেন,'মু'মিন ঈর্ষা করে আর মুনাফিক হিংসা করে।"[১১]

---

১ . আত্মগরিমা বা আত্মপ্রসাদের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে দেখুন আল-কুরআন ০৯:২৫; ১৮:৩২-৪৪, ১৮:১০৩-১০৬; ২৮:৭৮-৭৯; ৫৩:৩২; ৫৯:২।

২ . মুল আরবী [ثلاث مهلكات ! شح مطاع و هوى متبع و إعجاب المرء بنفسه] ইমাম বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ. ৪৭১, হাদীস নং ৭৪৫।

৩. আবূ নুআইম ইসপাহানী, *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.) খ. ৫, পৃ. ৩৭৬।

৪ . আল-কুরআন, ১৮:৩২-৩৬; ৪০ : ৮৩; ২৮ : ৩৮-৪০; ৭৬-৭৮; ৪১:১৫-১৬, ৪:৪৯; ৭:১৩ ১৫:৩২-৩৩।

৫ . আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.৩৪৭।

৬ . ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৮।

৭ . মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৭।

৮ . মুহাম্মদ নাসীম, *জাদীদ লোগাতুল কুরআন*, অনুঃ শাহ আব্দুল হালীম (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০১১,) পৃ.১০৩৭।

৯ . আল-জাহিয, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬।

১০ . আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০৩, পৃ.১৮৯।

১১ . [إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد] আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০৩, পৃ.১৮৯।

হিংসা একটি হীন মানসিক ব্যাধি। এটা মানুষের মন ও চরিত্রের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এটা সমাজে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালায়, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি নষ্ট করে। এজন্য হিংসুককে মানুষ ঘৃণা করে। হিংসা হিংসুকের অন্তরকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে ফেলে। ফলে সে কঠোর হয়ে যায়। সে অন্যের অকল্যাণ কামনা করে এবং কার ভালো কিছু পছন্দ করে না। তাই এই নিন্দনীয় গুণ ইসলামে পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ বলেন[১]–(وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) "যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যেরও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না।" -এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর মহান দান। আর আল্লাহ কারো প্রতি অনুগ্রহ করলে হিংসার মাধ্যমে তা রোধ করা যায় না। এতদসত্ত্বেও কারো প্রতি হিংসা করা নির্বুদ্ধিতা। কেউ হিংসা করলে তা তার নিজেরই অকল্যাণ বয়ে আনবে।

হিংসা অনৈতিকতা, অন্যায় ও অপরাধের জন্ম দেয়া। হিংসার কারণে হিংসুকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ আদম ('আ.) কে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন তাতে শয়তান প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে। এক পর্যায়ে সে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত চরম অবাধ্যতা ও কুফরীর কারণে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়।[২] হিংসা মানুষের মানবিক সদগুণাবলী বিলোপ সাধন করে মানুষের মধ্যে নির্মমতা ও হিংস্রতা পয়দা করে। হিংসার কারণে আদম ('আ.) এর ছেলে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল।[৩] হিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউসুফ('আ.) কে তাঁর ভাইয়েরা কুয়ায় ফেলে দেয়।[৪] ইরশাদ হচ্ছে-[৫]
(إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ- اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ)
"স্বরণ কর, তারা বলেছিল, আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার ভাই আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে। তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর বা তাকে কোন স্থানে ফেলে আস, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।"

ইমাম মালিক সূত্রে আল-কুরতুবী (মৃ.৬৭১হি.) বলেন, হিংসা ও অহংকার হলো প্রথম পাপ, যা আসমানে করা হয়। ইবলীস আদমকে হিংসা করেছিল।[৬] পৃথিবীতে প্রথম যে পাপ হয় তা হলো কাবীল তার ভাই হাবীলকে হিংসা করে অতঃপর তাকে হত্যা করে। এভাবে হিংসার কারণে সুদূর অতীত থেকে মানুষের মধ্যে নানা অন্যায় ঘটে আসছে এবং আজও বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে সামাজিক পর্যায়ের হিংসা-বিদ্বেষ বেশী ভয়াবহ ও অধিক ক্ষতিকর। তা সমাজ, দেশ ও জাতীয় জীবনকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত ও দুর্বিষহ করে ফেলে। এতে সমাজ ও দেশের মানুষ সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ইসলাম হিংসাকে নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন[৭],

> তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, এক অপরের দামের উপর মূল্যবৃদ্ধি করো না, ঘৃণা ও বৈরীভাব পোষণ করো না, শত্রুতা করো না, একজন আরেকজনের বিক্রির ওপর বিক্রি করো না, তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম মুসলিমের ভাই। একে অপরের উপর যুলম করবে না এবং অন্য ভাইকে ঘৃণা ও লাঞ্ছিত করবে না। তাকওয়া হচ্ছে এখানে। একথা বলে তিনি নিজ বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেন।

সত্যের প্রতি যেসব কারণে বিরাগ সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, হিংস-বিদ্বেষ ও হটকরিতা। এটা মানুষকে সত্যবিমুখ করে ফেলে। এতে সত্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে ইহুদীদের সত্যগ্রহণের তাওফীক কেড়ে নেয়া হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৮] (وَمَااخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْالْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"

হিংসা আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৈরিতার ও অসন্তুষ্টির নামান্তর। কারণ হিংসুক মূলত আল্লাহর ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হয়। যা ব্যক্তিকে আল্লাহর নাফরমানীতে অংশ গ্রহণ করায়। ফলে সে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়। এ কারণে হিংসুকদের নিন্দা ও সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[৯]–(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ) "বরং তারা কি লোকদেরকে হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে?"

---

[১] . আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ৩২।
[২] . আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ৩৪।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ : আয়াত ২৭।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯ ।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : আয়াত ০৮-০৯।
[৬] . ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন* (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫), খ.০১, পৃ. ২৯৬।
[৭]. মূল আরবী[لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৬৪।
[৮] . আল কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৯; আল কুরআন০২:১০৯ ও ২১৩।
[৯] . আল কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ৫৪।

হিংসা একটি নিকৃষ্ট গুণ, যা ব্যক্তির তাকওয়া ও দ্বীনকে বিনষ্ট করে দেয়, ভালো কাজকে ম্লান করে দেয় এবং পূণ্যকে নষ্ট করে ফেলে। এটা মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের অন্তরায়।[১] কোন মু'মিনের মধ্যে হিংসা থাকতে পারে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[২] – [ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد] 'কোন মু'মিন বান্দার অন্তরে ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারে না'। তিনি আরও বলেন[৩]–"তোমরা হিংসা পরিহার কর। কেনন হিংসা নেকী(ভালো কাজ)কে সেভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে।"

সর্বপরি, হিংসা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। হিংসুক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করার আগে সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সে কোন অবস্থায় শান্তি পায় না। তার কোন সৎবন্ধু জোটে না। সে কখনো সুপথপ্রাপ্ত হয় না। কেননা সে সর্বদা মানসিকভাবে পেরেশানী, সংকীর্ণতা ও হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। তার চেহারা সর্বদা মলিন থাকে। অন্যের ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। প্রতিপক্ষের হামলার ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকে। এভাবে হিংসুক ব্যক্তির অন্তর হিংসার আগুনে কুরে কুরে খায়। এটাই তার দুনিয়াবী শাস্তি। আর মৃত্যুর পরে তাকে গ্রাস করে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন। এই হিংসুকের অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল-কুরআন শিখিয়েছে[৪]– قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ "বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার....এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।"

হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই জান্নাতের অধিকারী। এ মর্মে আনাস (রা.) বলেন-[৫],

> একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন: এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী লোক আসবে। এমন সময় জনৈক আনসারী বাম হাতে জুতা নিয়ে আগমন করল। তার দাঁড়ি থেকে ওযুর পনি টপকে পড়ছিল। সে এসে সালাম দিল। দ্বিতীয় দিন রাসূল (সা.) আবার একই কথা বললেন। সেদিনও সেই ব্যক্তিই আগমন করল। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা সংঘটিত হল। রাসূল (সা.) গৃহে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. সেই আনসারী ব্যক্তির পেছনে পেছনে গেলেন এবং তাকে বললেন: আমার পিতার সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। এতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনদিন বাড়ী যাব না। আপনি অনুমতি দিলে তিন দিন আপনার গৃহেই রাত কাটাবো। লোকটি বলল, কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ তিন দিন তার গৃহে অবস্থান করে দেখলেন, সে রাত জেগে ইবাদত করে না, তাহাজ্জুদের সময় শয্যাত্যাগ করে না। তবে রাতে প্রত্যেক পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় আল্লাহর যিকির করে। অবশ্য ফজর নামাজে যথাসময়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনদিন অতিবাহিত হবার পরেও আব্দুল্লাহ তার আমলের কোন ওজনই বুঝতে পারলেন না। অগত্যা তিনি লোকটিকে বললেন: হে আল্লাহর বান্দা, আমার পিতার সাথে আমার কোন বাদানুবাদ হয়নি; কিন্তু আমি রাসূল (সা.)-এর মুখে আপনার শানে এ কথা শুনেছিলাম। তাই আপনি কি আমল করেন, তা দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আপনাকে তো খুব বেশী আমল(নফল ইবাদত) করতে দেখলাম না। বলুন তো কিভাবে আপনি জান্নাতী হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন? লোকটি বলল, আমার আমল তো তাই, যা আপনি প্রত্যক্ষ করলেন। আমি তার কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিছুদূর অগ্রসর হতেই সে আমাকে ডেকে নিল এবং বলল: আমার আমল তো তাই যা আপনি দেখেছেন, কিন্তু ব্যাপার এতটুকু, *আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন মুসলিমকে যে নেয়ামত দান করেন, তাতে আমার মনে কোনরূপ মলিনতা ও হিংসা আসে না। আমি বললাম : এই কারণেই আপনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন।* আমাদের দ্বারা এটা সম্ভব নয়।

বিদ্বেষ (হাকদ): বিদ্বেষ অর্থ–কাউকে অসহ্য মনে করা এবং তার প্রতি অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করা। যখন মানুষ প্রতিশোধ নিতে অসমর্থ হয়, তখন সে ক্রোধ হজম করে ফলে তা অন্তরে বিদ্বেষে পরিণত হয়। ভাষাবিদ আল-জাহিয (মৃ.২৫৫হি.) বলেন–"বিদ্বেষ হল, প্রতিশোধ নিতে অসমর্থ হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অনিষ্ট পোষণ করা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পর্যন্ত মনের মধ্যে তা গোপন রাখা।"[৬]

বিদ্বেষ নৈতিক অবক্ষয় ও মন্দের উৎস। বিদ্বেষ মানুষের অন্তরে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে রাখে। ফলে এটা ব্যক্তিকে অন্যের দোষ অন্বেষণ করা, গীবত করা, অন্যের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা ও অন্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে প্ররোচিত করে– যা সমাজে অশান্তি ও ফিতনার কারণ। কারো অন্তরে বিদ্বেষ স্থান করে নিলে তখন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসা স্থাপন জটিল হয়ে যায়, মানুষ তখন কঠোরতা ও বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ে, পারস্পরিক সম্পর্ক এমনকি আত্মীয়তা সম্পর্কও ছিন্ন করতে দ্বিধা করে না, ফলে তারা বিভিন্ন ফাসাদে লিপ্ত হয়। এটা ব্যক্তির দ্বীনি ব্যাপারে অনাসক্তি সৃষ্টি করে এবং এতে ব্যক্তির মনের প্রশান্তি দূর করে। সর্বপরি, শয়তান জ্ঞানী ব্যক্তিদের শিরক ও কুফরে লিপ্ত করতে সক্ষম না হলেও এ ধরনের অনাচারে লিপ্ত করে তার ও আল্লাহর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। তাই ইসলামে তা নিষিদ্ধ। কুরআনে এই শিক্ষা দিতে বলা হয়েছে[৭] (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

---

[১]. দেখুন, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৬৫।

[২]. আহমাদ ইবনু শুআইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, কিতাবুল জিহাদ (হালাব: মাকতাবাহ আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়াহ,১৯৮৬), হাদীস নং ৩১০৯।

[৩]. মূল আরবী [إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হা. নং ৪৯০৩ (হাদীস সনদের দিক থেকে দুর্বল)।

[৪]. আল কুরআন, সূরা আন-নাস : আয়াত ০১, ০৫।

[৫]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৩, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ১২৭২০।

[৬]. আল-জাহিয, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩।

[৭]. আল কুরআন,সূরা আল-হাশ্‌র : আয়াত ১০; আর দেখুন, আল কুরআন ৬৪:১৬।

বিদ্বেষ থেকে সৃষ্ট সব অনিষ্টতাই মন্দ ও ক্ষতিকর। এ প্রসংঙ্গে আবূ হামিদ আল-গাযালী (মৃ.৫০৫হি.) বলেন–

> বিদ্বেষ ক্রোধের ফল, তা থেকে আটটি মন্দ বিষয় উৎপন্ন হয়। ক. হিংসা তথা অপরের কাছ থেকে নিয়ামতের অবসান কামনা করা, তার নিয়ামত দেখে দুঃখ পাওয়া এবং তা দূর হওয়ার প্রত্যাশা করা, খ.অন্তরে হিংসা এমন বেড়ে যাওয়া যে, অপরের বিপদে শত্রুর ন্যায় হাসতে প্রস্তুত থাকা। গ. অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যদিও সে সম্পর্ক রাখতে চায়। ঘ. অপরকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে করা। ঙ. অপরের সম্পর্কে অবৈধ কথা বলা যেমন গীবত করা, মিথ্যা বলা। চ. কথাবার্তায় তার সাথে বিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্য করা। ছ.তাকে প্রহার করে দৈহিক কষ্ট দেয়া। জ. তার কিছু প্রাপ্য থাকলে তা পরিশোধ না করা।[১]

বিদ্বেষ মূল্যবোধ বিনাশী একটি নিকৃষ্ট হারাম কাজ। এটা ব্যক্তির মধ্যে মন্দ গুণাবলী সৃষ্টি করে। তাই এ থেকে সতর্ক করতে নাবী কারীম সা. বলেছেন [২]–"তোমার(কোন মুসলিম) ভাইয়ের বিপদ দেখে খুশি হয়ো না। হতে পারে যে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন (তার বিপদ দূর করে দেবেন) আর তোমাকে বিপদগ্রস্থ করবেন।"
বিদ্বেষ পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের পথে অন্তরায়। রাসূল সা. বলেন-[৩] "চোগলখুরী, গালি-গালাজ ও জিদ-অহমিকা ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে–চোগলখুরী ও বিদ্বেষ ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।"

হিংসা-বিদ্বেষের কারণ: ক.শত্রুতা, ক্ষোভ ও প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষমতা। খ. প্রার্থিত লক্ষ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। গ.সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ্য করতে না পারা। ঘ. অহংকার করা ও অপরকে হেয় জ্ঞান করা। ঙ. অপরকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে দেখে আশ্চার্যবোধ করা। চ. সম্পদ,সম্মান ও ক্ষমতার লাভের লালসা। ছ. হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা।

প্রতিকারে করণীয়: ক.অন্তরে উদিত হিংসা যা দাবী করে তার বিপরীত কাজ করা। খ.ঈর্ষিত ব্যক্তির অগোচরে তার প্রশংসা করা। গ. হিংসার পরিণাম অনুধাবন করে তা থেকে নিজকে বিরত রাখা। ঘ.তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ ও অহঙ্কার দূর করা। ঙ.ধৈর্য ধারণ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের পরিণাম চিন্তা করা। চ.আল্লাহর উপর ভরসা এবং তাকওয়া অবলম্বন করা। ছ. যিকর, দু'আ, তাওবা, আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া, সাদাকা করা মৃত্যুর কথা স্মরণ এবং আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা।

❑. আত্মবিস্মৃতি, উদ্‌ভ্রান্ত জীবন যাপন, সময়ের অপব্যবহার এবং জীবনের সফলতা নির্ণয়ে বিভ্রান্তি:

আজকের বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবী আর্থিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে ফেলেছে। বর্তমানে একমাত্র আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরই মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ভরশীল। নৈতিকতা বা মানবতার বিচারে সে যত জঘন্য প্রকৃতিরই হোক না কেন,...সামাজিকতার সমস্ত উপকরণ তার করায়ত্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বিত্তহীন ব্যক্তি বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মাপকাঠি অনুযায়ী তার কোন মূল্যই নেই। এর ফলে সাধারণ লোকদের সামাজিক মূল্য কতটুকু নীচু হতে নীচুতর হয়ে যেতে পারে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আমরা বর্তমানের সামাজিক পরিবেশে ভূরি ভূরি দেখতে পাই।

আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? আমার শেষ গন্তব্য কোথায়? কে আমাকে সৃষ্টি করেছে? কেনইবা আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব-কর্তব্য কী? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন ও উদ্‌ভ্রান্ত। শাসক-শাসিত, পেশাজীবি, শ্রমজীবি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণীর মানুষ আজ পার্থিব জীবনের সফলতা, অর্থ-সম্পদ, সুখ-শান্তি, আনন্দ-বিনোদন ও ভোগ-সম্ভোগ লাভের জন্য এতই ব্যস্ত যে, এসব নিয়ে তাদের ভাবার অবকাশ নেই। তবে কি মানুষকে শুধু পার্থিব ভোগ-বিলাস ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এর উত্তর, না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ "তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না? আরও বলেন[৫]-أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى- "মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?"
উদ্ধৃত আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তাকে নিরর্থক ছেড়েও দেয়া হবে না।

মহান আল্লাহ মানুষকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।[৬] কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সে ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপহীন। শুধু তাই নয়, আজ তারা জীবিকা নির্বাহ, আর্থিক সমৃদ্ধি, বাড়ী-গাড়ী, সুখ-সাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি জাগতিক ভাবনার বাইরে তাদের অধিকাংশের কোন ভাবনা নেই। 'পার্থিব অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও সফলতা লাভের প্রতিযোগিতায় সবাই বিভোর।'[৭] পার্থিব জীবন এবং এর সফলতাই তাদের নিকট মুখ্য। মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাদের নিকট গুরুত্বহীন। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও সফলতার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ উদাসীন। তারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে চায় না। কুরআন এসব উদাসীনদের বিভিন্ন মন্দ বিশেষণ দ্বারা পরিচয় করে দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতি তুলে ধরে বলা হয়েছে[৮]–

---

[১] .আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ. ১৮১।
[২].মূল আরবী [لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাতি ওয়ার রাক্বায়িকি ওয়াল ওরা', হা. নং ২৫০৬।
[৩].হাফিয মুনযিরী, ০৩, পৃ.৩২৪, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪২৭১ ও ৪২৭২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন : আয়াত ১১৫।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫: আয়াত ৩৬।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন : আয়াত ৫৬।
[৭]. আল-কুরআন , সূরা আত-তাকাছুর : আয়াত ১-৫।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৭৯ ,আল কুরআন ১০:৭-৮, ৭:১৪৬।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দ্বারা দেখে না, এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না; তারা পশুর ন্যায় বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত । তারাই গাফিল ।" অন্যত্র বলেন[১]–

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফিল। সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে পার্থিব জীবনের সফলতায় বিভোগ ও পরকালীন জীবনের প্রতি উদাসীন মানুষের কথা বলা হয়েছে। যাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের সামান্য সুখ-শান্তির জন্য। তারা নিজ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবে না এবং সেজন্য কাজ করে না। এ কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহ, শ্রবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর মোহর করে দিয়েছেন।

মানুষ মরণশীল, সবকিছু ছেড়ে প্রত্যেককে একদিন একা চলে যেতে হবে। মৃত্যু পরবর্তী সেই জীবন অনন্ত ও সীমাহীন। পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে সেখানে অবশ্যই চিরস্থায়ী পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে, এর বিকল্প কিছুই সেখানে নেই। সেই চিরস্থায়ী সফলতা অর্জন এবং মহাক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অবগত হয়ে জীবদ্দশায় স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা জরুরী। অথচ এ ব্যাপারে মানুষ উদাসীন। ইরশাদ হচ্ছে[২]–

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ- مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ- لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ

"মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে সময় তথা জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন মানুষদেরকে অসার কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসার আহবান জানানো হয়েছে এবং মহাক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা ও চিরস্থায়ী সফলতা অর্জনের সময়ের সদ্ব্যবহারের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্যহীন ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবন যাপনকারী মানুষের শেষ পরিণতি মন্দ। তাই যথাসময়ে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে সত্য গ্রহণ না করে উদাসীনভাবে জীবন যাপন করে মৃত্যুর সময় সত্য উপলব্ধি করলে কোন লাভ হবে না। ইরশাদ হচ্ছে[৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ-وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান–সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্বরণে উদাসীন না করে ,যারাা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ। আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসবার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! কিন্তু যখন কারও নির্ধারিত কাল উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে সময়ের সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। সময়ের সত্য অন্বেষণ সময়ের কাজ সময়মত শেষ করতে না পারলে পরবর্তীতে আফসোস করে কোন লাভ হবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৪],

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক পা নড়তে দেয়া হবে না। ক). জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে? খ). যৌবন শক্তি-সামর্থ্য কি কাজে ব্যয় করেছে? গ). ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে? ঘ). উপার্জিত সম্পদ কি কাজে ব্যয় করেছে? ঙ). দ্বীন সম্পর্কে যা জেনেছে সে অনুযায়ী কতটুকু কাজ করেছে?

উদাসীনতাবশত: প্রকৃত সত্য উপলব্ধি না করে বাপ-দাদা ও সমাজের অন্ধানুকরণ করে বিপথগামী হলে পরকালে এ ব্যাপারে কোন প্রকার ওজর আপত্তিও গ্রহণ করা হবে না। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৫]–

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ-أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' এটা এজন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন না বল,

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল : আয়াত ১০৭-০৮।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া : আয়াত ০১-০৩।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকূন : আয়াত ০৯-১১।
৪. মূল আরবী [لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রাকায়িক, হাদীস নং ২৪১৬ ।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৭২-১৭৩।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ তো পূর্বে শির্ক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন'?

উদ্দেশ্যহীন ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবনযাপনকারী মানুষের পরিণতি অতি মন্দ। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এবং সফলতা অর্জনের কার্যকরী পন্থা কুরআন বাতলে দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[১]-فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
"তবে যে তাওবা করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

জীবনের সফলতা নির্ণয়ে বিভ্রান্তি: যান্ত্রিক উৎকর্ষ, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি এবং ব্যাপকহারে বস্তু সামগ্রীর উৎপাদন জাগতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন গণ্য হলেও ইসলাম এর দ্বারা কোন জাতির উন্নতি বা অবনতির বিচার করে না। পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতিকে কুরআন নিন্দনীয় বলে না; বরং একে উৎসাহিত করে; তবে পরকালকে বিসর্জন দিয়ে নয়।[২] তাই কুরআনের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নতি বাদ দিয়ে জাগতিক উন্নতি একেবারে মূল্যহীন। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৩]

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"

পার্থিব ধন-সম্পদ, সুখ-সম্ভোগ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনকে অধিকাংশ মানুষ সফলতা ও মর্যাদার মানদণ্ড মনে করে থাকেন। এ সফলতা অর্জনে তারা বিভোর। অথচ এগুলো প্রকৃত সফলতার মানদণ্ড নয়। মহান আল্লাহ বলেন[৪]–

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ -وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ-وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

সত্য প্রত্যাখানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি কুফরী করে আমি তাদের গৃহসমূহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও ঊর্ধ্বে আরোহণের সিঁড়ি তৈরী করে দিতাম এবং তাদের গৃহসমূহের জন্য দরজা এবং পালঙ্ক, যাতে তারা হেলান দেয় (তা করে দিতাম) স্বর্ণ নির্মিত। আর এই সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। আর মুত্তাকীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ। এ মর্মে আরও বলা হয়-[৫]

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَاابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ- وَأَمَّاإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

"আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিয্‌ককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন'। "
উল্লেখিত আয়াতসমূহে এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, পার্থিব অর্থ-সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধি আল্লাহ সন্তুষ্টির নিদর্শন বহন করে না। একে কেউ পার্থিব সাময়িক সফলতা মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটা কোন সফলতা নয়।

কিন্তু আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ পার্থিব জীবনের সফলতাকে সফলতা গণ্য করেন। তারা পার্থিব অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, বাড়ী-গাড়ী, চাকুরী, পদমর্যাদা, সম্মান-সুখ্যাতি, ভোগ-বিলাসতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনকে জীবনের সফলতা বলে গণ্য করে থাকেন। আর এই সফলতা অর্জন করতে গিয়ে তাদের অনেকে ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যার পরওয়া করেন না। কিন্তু প্রকৃত সফলতা কিসে? এ ব্যাপারে তারা উদ্‌ভ্রান্ত। অর্থ-সম্পদ যদি সফলতার চূড়ান্ত বিষয় হতো তবে কারূনই পৃথিবীর অন্যতম সফল ব্যক্তি। আবার ক্ষমতা যদি সফলতার চূড়ান্ত বিষয় হতো তবে ফিরআউনই পৃথিবীর অন্যতম সফল ব্যক্তি। জীবনের সফলতা সম্পর্কে এই বিভ্রান্তি হাদীসে সতর্ক করে বলা হয়েছে–[৬]
"মানব সমাজের জন্য এমন একটি যুগ আসন্ন যখন তাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হবে তাদের উদর, তাদের মান-মর্যাদা নির্ণীত হবে তাদের আসবাবপত্র দিয়ে, তাদের 'কিবল'(অনুসরণীয়) হবে তাদের নারীরা, তাদের ধর্ম হবে তাদের দিরহাম ও দীনার, ওরা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম; ওদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন হিস্‌সা নেই।"

প্রকৃতপক্ষে মানুষ সফলতা নির্ধারণে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত সফলতা কিসে ও কোথায় তা অবগত হয়ে সে পথে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃত বিচক্ষণতা। পার্থিব জীবনের ক্ষণিকের এই সফলতাই প্রকৃত সফলতা নাকি চিরস্থায়ী আখিরাতের সফলতা প্রকৃত সফলতা–এ কথা ভেবে দেখলেই এর উত্তর মিলবে। এ সম্পর্কে কুরআনের ফায়সালা হলো-[৭]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৬৭।
[২]. আল-কুরআন ০২:২০০-২০২] ।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুল্‌ক ৬৭: আয়াত ০১-০২; এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন (১০:০৪, ১১:০৭)।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আয্‌-যুখরুফ : আয়াত ৩৩-৩৫।
[৫]. আল-কুরআন, ৮৯:১৫-১৬।
[৬].মূল আরবী[يأتي على الناس زمان همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شرار الخلق لا خلاق لهم عند الله] *কানজুল উম্মাল*, খ.১১, পৃ.২৮৫, কিতাবুল ফিতান, হাদীস. নং ৩১১৮৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৮৫।

> কুরআন আরও বলেছে-[১] يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ "স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশ নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে মানব জাতিকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা আখিরাতের সফলতার মধ্যেই নিহিত।সেদিন যারা জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে দাখিল হবে তারাই সফলকাম।

আত্মবিস্মৃতি ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবন যাপনের কারণ: ক.পার্থিব জীবনের সফলতা অর্জনে বিভোর থাকা। খ. কুরআন-সুন্নাহ ও আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা। গ.অন্তরের কাঠিন্য ও জগৎ-সংসার থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা। ঘ.ঈমানী দুর্বলতা।

আত্মবিস্মৃতি এবং জীবনের সফলতা নির্ণয়ে করণীয়: ক.পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ও চূড়ান্ত পরিণতি অনুধাবন। খ. কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জন ও প্রকৃত জ্ঞানীদের সাহচর্য। গ.মৃত্যু ও আখিরাতের জীবনের পরিণাম চিন্তা করা। ঘ.ঈমানী ব্যাধির চিকিৎসা।

❑.কথা ও কাজে গরমিল ও কৃত্রিমতা:

কথা ও কাজে গরমিল কুরআনের দৃষ্টিতে একটি নৈতিকতা বর্জিত অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এটা মুনাফিকদের অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কথা ও কাজে বৈপরিত্য, উপদেশ দান করে নিজে না করা এবং 'ইলম অনুযায়ী 'আমল না করা ইত্যদি সবই শুধু ইসলামী নীতি বিবর্জিত নয়, বরং এটা আল্লাহর নিকট অতি অপছন্দীয় ও ঘৃণিত কাজ। এ কারণে কুরআনে পূববর্তী আলিমদের গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন।[২] তাই এই নিন্দনীয় চরিত্র পরিহার করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-[৩](يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।" –উল্লেখিত আয়াতে কথার সাথে কাজের, জ্ঞানের সাথে আচরণের অসামঞ্জস্যতাকে ইসলামী নৈতিকতা পরিপন্থী মূল্যহীন কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য পরকালে রয়েছে মন্দ পরিণাম। এ সম্পর্কে নাবী সা. বলেন-[৪]

> মি'রাজের রাতে আমি এমন কিছু লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহবা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাইলকে ('আ.) জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিবরাইল বলল–এরা আপনার উম্মতের পার্থিব স্বার্থপূজারী উপদেশদানকারী যারা অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজে তা করত না।

ইমাম আশ-শা'বী (রহ.) বলেন-[৫], "জান্নাতের কিছু লোক জাহান্নামের কোন কোন লোককে দেখে বলবেন: তোমরা জাহান্নামে গেলে কেন ' আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের শিক্ষা দানের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন? তারা বলবে, আমরা অপরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম' কিন্তু নিজেরা তা পালন করতাম না।"

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে এই অনৈতিক বিষয়টি আমাদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে সাধারণ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, বক্তা, আলিম ও ওয়ায়েযরা যা বলছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেরা তা পালন করছে না। ফলে তাদের কথার যেমন মানুষের উপর প্রভাব পড়ছে না তেমনি সমাজ সংশোধন হচ্ছে না। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে ইবন সাম্মাক (রহ.) বলেন-[৬],

> অনেক মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহকে ভুলে আছে। অনেকে আল্লাহর সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু নিজেরা ভয়হীন। অনেক মানুষ অপরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অনেক মানুষ আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, কিন্তু তার আয়াতসমূহ থেকে দূরে থাকে।"

কথা ও কাজে বৈপরিত্যের মতো কৃত্রিম আচরণ ও ভান করা ঘৃণিত অনাচার। এটা প্রতারণা ও কপটতার অংশ। যা মানুষকে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। এজন্য এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন[৭] قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ "বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" আনাস রা. হতে বর্ণিত,উমার রা. বলেন, '(রাসূল সা. কর্তৃক) আমাদের কৃত্রিম লৌকিকতা দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে'।[৮]

এর কারণ: ঈমানী দুর্বলতা, নিফাক ও রিয়ার ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া, তাকওয়ার অভাব, লোভ-লালসা, পার্থিব যশ-খ্যাতির মোহ।
দূরীকরণে করণীয়: ঈমানী দুর্বলতা, নিফাক ও রিয়ার ব্যধির চিকিৎসা, পরকালীন পরিণতি চিন্তা করে আত্মশুদ্ধি অর্জন।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন : আয়াত ০৯, আরও দেখুন আল-কুরআন ৪৫:৩০, ৮৫:১১, ০৪:১৩, ০৬:১৬।
[২] .আল-কুরআন, ৬২:০৫; ০৭:১৭৬।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্‌ফ : আয়াত ০২-০৩।
[৪] .মূল আরবী[مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ. ১২০, ১৮০, ২৩১, ২৩৯ হাদীস নং ১২২৩২,১২৮৭৯,১৩৪৪৫,১৩৫৩৯।
[৫]. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৬৩।
[৬] .আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী(রহ.), *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৬৩।
[৭] . আল-কুরআন, সূরা সাদ : আয়াত ৮৬।
[৮] .মূল আরবী [كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল এ'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, হাদীস নং ৬৮৬৩।

❑. হতাশা, অস্থিরতা এবং মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ-ফুর্তি / ভারসাম্যহীন জীবন যাপন:

হতাশা, অস্থিরতা: দুঃখ, বিষণ্নতা, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও হতাশা-নিরাশা ইত্যাদি মনের এমন অশান্তিময় অবস্থা, যা কোন অপছন্দনীয় বিষয় বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে কিংবা প্রিয়বস্তু হারিয়ে ফেলার বিরহ থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব জীবন ফুলশয্যা নয়। জীবন চলার পথে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ব্যক্তিকে ব্যথিত, অস্থির ও হতাশাগ্রস্ত করে ফেলে। এ ধরনের নিরর্থক দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও হতাশা মানুষের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে অকর্মণ্যতার দিকে ঠেলে দেয়। এটা মানুষের জীবন গতিহীন ও নিঃশেষ করে ফেলে। এ কারণে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। শরীর-স্বাস্থ্যকে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে বিনষ্ট করে ফেলে। এটা ব্যক্তিকে জাগতিক কার্যক্রম ও ধর্মীয় বিষয়ে অনাগ্রহী করে ফেলে। দুঃখ ও হতাশার আতিশয্য মানুষকে অনৈতিকতা, ভারসাম্যহীনতা ও মূর্খতাসুলভ আচরণের দিকে ধাবিত করে। কুরআনে হতাশা-নিরাশা বর্জন করে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে[১]–(لِّكَيْلاَتَحْزَنُواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) "যাতে তোমাদের যা হারিয়ে গেছে এবং তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে (কষ্ট) তার জন্য দুঃখ না কর।" অন্যত্র বলা হয়েছে[২] (وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ) "আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না।" আরও বলা হয়[৩] (وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) "আর তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয় সকল মর্যাদা আল্লাহর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"
উল্লেখিত আয়াতসমূহ শিক্ষা দেয় যে, জীবন যুদ্ধে মানুষ যেন তার উপর আপতিত দুঃখ-কষ্ট ভেঙ্গে পড়ে আল্লাহ বিমুখ না হয়। বরং জীবন যুদ্ধে আপতিত দুঃখ ও বিপদের জন্য হতাশা-নিরাশা না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে।

দুঃখ ও হতাশার আতিশয্য অস্বাভাবিক আচরণ অনৈতিক। হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটা মানুষকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্টি ও কুফরীতে লিপ্ত করে। অস্থিরতা, বিষণ্নতা ও হতাশা কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। এতে বিপদ আরও বাড়ে। এতে মহান আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্যে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করা হয়। হতাশা-অস্থিরতা অনেক সময় মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। রাসূল সা. বলেন[৪]–"বিপদের সময় যে নিজের গালে চপেটাঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে শোক প্রকাশ করে এবং জাহিলী যুগের মানুষের মত কথাবার্তা বলে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

পার্থিব দুঃখ-কষ্টে চরম হতাশা-নিরাশা অনৈতিক। এটা মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং মানুষকে ভ্রষ্টতা, শয়তানের পথ ও কুফরীর দিকে ধাবিত করে। তাই কাফির ও বিপথগামী ছাড়া অন্য কেউ হতাশা হতে পারে না। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]- وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ "আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'।" এজন্য রাসূল সা. নিজেও হতাশা, নিরর্থক দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[৬] আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন[৭], "দুটি বিষয় ধ্বংসাত্মক–একটি নৈরাশ্য আর অপরটি আত্মপ্রসাদ।"

মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ-ফুর্তি: আনন্দ-ফুর্তি হল মনের এমন তৃপ্তিময় অবস্থা, যা প্রিয়বস্তু লাভ কিংবা কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের উচ্ছাস থেকে সৃষ্টি হয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির জন্য খুশী হওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটা দোষণীয় বিষয় নয়, বরং তা কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ-ফুর্তি মানুষকে সীমালংঘনে প্রবৃত্ত করে। এটা মানুষের অন্তরকে বিনষ্ট ও শক্ত করে ফেলে। কখনও কখনও এটা ব্যক্তির মধ্যে দম্ভ-অহঙ্কার সৃষ্টি করে। তাই তা পরিহারের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে[৮]-(لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)"তোমরা উৎফুল্ল না হও। নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধতকে পছন্দ করেন না।"

পার্থিব জগত মানুষের জন্য একটি পরীক্ষাস্থল। এখানে সুখ-দুঃখ মানুষের নিত্য সাথী। তবে দুঃখ যেমন জীবনে চিরস্থায়ী নয়, তেমনি সুখ স্থায়ী হয় না। বরং দুঃখের পর সুখ এবং সুখের পর দুঃখ চক্রাকারে মানব জীবনে আবর্তিত হয়।[৯] এর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করা হয়। তাই দুঃখের আতিশয্যে শোকে পাথর হওয়া যেমন কোনভাবেই কাম্য নয় এবং সুখের আতিশয্যে তেমনি সীমালংঘন করাও সমীচীন নয়। কারণ সুখ ও দুঃখের আতিশয্য মানব জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। ফলে মানুষ বিভিন্ন অন্যায় ও অনাচারের পথে পা বাড়ায়। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-[১০]

---

[১] . আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৫৩।
[২] . আল কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল: আয়াত ১২৭, আরও দেখুন, ২৭:৭০, ৩১:২৩, ৬:৩৩।
[৩]. আল কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৫. আরও দেখুন, আল-কুরআন ১০:৭৬, ৫:৪১, ৩:১৩৯।
[৪].মূল আরবী [ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হা. নং১২৩২,*সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল ঈমান, হা.১০৩।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ: আয়াত ৮৭, আর দেখুন, আল কুরআন ১৫:৫৬, ২৯:২৩।
[৬].মূল আরবী[اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবু সুজূদিল কুরআন, হা.নং ১৫৪১, *তিরমিযী*, হা.৩৪৮৪; *নাসায়ী*, হা.৫৪৪৯।
[৭] . মূল আরবী [الهالك في اثنتين القنوط والعجب] আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ. ৩৬৯।
[৮]. আল কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস: আয়াত ৭৬ ।
[৯] . আল-কুরআন, সূরা আল-ইনশিরাহ: আয়াত ০৫-০৬।
[১০] . আল-কুরআন, সূরা হূদ : আয়াত ৯-১১; আর দেখুন, আল-কুরআন ১৭:৮৩।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ-وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ-

"যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তার নিকট হতে তা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হবে। আর যদি দুঃখ-দৈন স্পর্শ করবার পর আমি তাকে সুখ–সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলবে, আমার বিপদ-আপদ কেটে গেছে, আর সে তো হয় উৎফুল্ল অহংকারী।"

বস্তুত মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যকার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমের মাধ্যমে। এজন্য দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং সুখের সময় স্বাভাবিক থেকে শুকরিয়া আদায় করা বাঞ্চনীয়। কোন বিষয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তা যেন কারো জীবনকে গতিহীন না করে, আবার কোন ব্যাপারে আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে ঔদ্ধত্য পর্যায়ে না যায় সে ব্যাপারে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১] - كَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ "যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে, এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"
উদ্ধৃত আয়াত সুখ-শান্তির আতিশয্যে মানুষ যাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারে লিপ্ত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

বস্তুত মানুষ সাধারণত সুখ-সফলতায় অতি আনন্দে মেতে উঠে আবার দুঃখ-ব্যর্থতায় চরমভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এ দুই অবস্থাই মানুষের নৈতিক দুর্বলতা। কুরআন মানুষকে এই দুর্বলতা কেটে উঠতে তাকদীরে বিশ্বাস ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনেরই শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে ইকরামা রহ. (মৃ. ১০৪/১০৫হি.) বলেছেন-[২], "সুখ-দুঃখ ভোগ করে না এমন কেউ নেই। তবে তোমরা সুখকে শোকরে (কৃতজ্ঞতা) এবং দুঃখকে ধৈর্যে পরিণত কর।"

ভারসাম্যহীন জীবন: ইসলাম ভারসাম্যহীন জীবন যাপনের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা.) দিনভর রোযা রাখত এবং রাতভর ইবাদতে মশগুল থাকত, রাসূল সা. তা জানতে পেরে তাঁকে বললেন–তুমি এরূপ করো না। তুমি রোজা রাখবে, আবার মাঝে মাঝে রোজা রাখবে না। রাতে ইবাদত করবে এবং কিছু সময় ঘুমাবে। কেননা *তোমার দেহের হক রয়েছে, তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে।*[৩] রাসূল সা. মদীনায় সালমান রা. ও আবূ দারদা রা. মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। সালমান রা. দেখলেন আবূ দারদা রা. দিনে রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং তিনি স্ত্রী ও দুনিয়াবিমুখ। তখন সালমান রা. ও আবূ দারদা রা. কে বলেন: *"তোমার উপর তোমার রবের হক আছে, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রী-পরিজনের হক আছে। কাজেই তুমি প্রত্যেক হকদারের হক প্রদান কর।"*[৪]

হতাশা ও অস্থিরতার কারণ: জীবনযুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাত, ব্যর্থতা, গ্লানি, অপমান, সঠিক দ্বীনি জ্ঞানের অভাব এবং তাকদীরে অনাস্থা। জীবন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পার্থিব জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা কেন্দ্রিক যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টা।

প্রতিকারে করণীয়: ধৈর্যধারণ, আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ এবং তাকদীরে সন্তুষ্টি, তাওবা-ইস্তেগফার, দু'আ ও যিকির, দ্বীনি জ্ঞানার্জন, দুনিয়ার ব্যর্থতা-সফলতায় প্রভাবিত না হয়ে আখিরাতের সফলতার জন্য চিন্তা ও আমল এবং মূর্খদের বর্জন।

❑.কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ (اتباع الهوي) ও আত্মতুষ্টি:

কুপ্রবৃত্তি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হাওয়া(هوى)। কামনা-বাসনার প্রতি মানব মনের ঝোঁক, অনুরাগ ও আগ্রহই কুপ্রবৃত্তি।"[৫] আল্লামা জুরজানী বলেন–"উপভোগ্য জিনিসের প্রতি শরী'আতের কোন অনুমোদন ছাড়াই মনের যে ঝোঁক তৈরী হয় তাকে হাওয়া বলে।"[৬] আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হল, কামনা-বাসনার প্রতি মনের ঝোঁক-প্রবণতা ও অনুরাগকে অগ্রাধিকার দান এবং তার দাবী পুরণে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে তার আনুগত্য করা।[৭] আত্মতুষ্টি কুপ্রবৃত্তির একটি বিশেষ দিক।

কুপ্রবৃত্তি মানুষকে মন্দকর্মে প্ররোচনাদানকারী ভয়ঙ্কর অপশক্তি এবং মন্দ কর্মের মূল চালিকাশক্তি। এই কুপ্রবৃত্তি সর্বদা মানব মনকে নানাবিধ অন্যায়, অপরাধ, অশ্লীলতা, অপকর্ম ও পাপের প্ররোচিত করে থাকে। এজন্য এই অপশক্তিকে নৈতিক অবক্ষয়ের প্রসূতি বলা যেতে পারে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮] - (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ)"মানুষের মন অবশ্যই মন্দপ্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রব দয়া করেন।"

কুপ্রবৃত্তির অনুগামীদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা দৈহিক ও মানসিক সুখ লাভের জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নানাবিধ অবৈধ কাজ লিপ্ত থাকে। এ শ্রেণীর লোকের নিকট ন্যায়-অন্যায় ও নৈতিক-অনৈতিক

---

১ .আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ: আয়াত ২৩ ।

২. মূল আরবী [ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ، ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً] সাইয়েদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন*, http://www.altafsir.com খ.০৭, পৃ.১৩৮।

৩ .মূল আরবী [فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৮৭৪, ১৮৭৬।

৪ .মূল আরবী [إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৮৬৭।

৫ . রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৭১২।

৬ . মূল আরবী [الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع] আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২০।

৭ .*মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম*,*প্রাগুক্ত*, ৯ম খণ্ড, পৃ.৩৭৫২।

৮ .আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ৫৩।

মুখ্য বিষয় নয়, বরং মনে যা ভালো লাগে তাই গুরুত্বপূর্ণ। সত্য যতই সুন্দর হোক মনঃপুত না হলে তারা তা গ্রহণ করে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]–(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ) "সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করত তারই অনুসরণ করত এবং তারা ছিল অপরাধী।"

প্রবৃত্তির অনুসারীরা নিজেকে অনেক বড় মনে করায় তার পক্ষে অন্যের আনুগত্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি তার স্রষ্টার আনুগত্যও। এভাবে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অনেক লোককে কুফরীতে নিক্ষেপ করে। কারণ খেয়াল-খুশি তার মনে বাসা বেঁধেছে এবং তার নফসের উপর একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করেছে। ফলে সে খেয়াল-খুশির হাতে বন্দী ও তার প্রতারণার শিকার হয়েছে। এ শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতও চালু করে। নিম্নে বর্ণিত আয়াতে তাই বলা হয়েছে[২]–أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না।"
আলী রা. বলেন–'আমি তোমাদের ব্যাপারে কেবলই দু'টি মন্দ জিনিসের ভয় করছি। ক. দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা, খ. কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ। কেননা দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়, আর কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ সত্যপথ থেকে ফিরিয়ে রাখে।'[৩]

কুপ্রবৃত্তির অনুগামীতা ও আত্মতুষ্টি মানুষের নৈতিক অধঃপতনের বড় উপাদান। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে অসৎ কাজ ও পাপাচারের রাস্তা খুলে যায়। এটা বিবেক-বুদ্ধি বিলোপ ঘটিয়ে মানুষের মধ্যে পশুত্বের জন্ম দেয়। এটা ব্যক্তিকে নির্লজ্জ ও বিকৃতরুচির অধিকারী করে। এই শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা কামনা-বাসনার দাবী অনুযায়ী কাজ করে। তারা খেল-তামাশা, হাস্যরস, অশ্লীলতা ও পাপাচার পছন্দ করে। তারা পাপাচারীদের পছন্দ করে এবং জ্ঞানী ও পূণ্যবানদের অপছন্দ করে। স্বীয় বাসনা পূরণে তারা যে কোন অন্যায় করতে কোন দ্বিধা করে না। এ গুণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে স্বৈরাচারী, হঠকারী ও যালিমে পরিণত করে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে হারাম পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জনে প্ররোচিত করে। এটা মানুষকে সত্যবিমুখ করে, আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে এবং গোমরাহির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ "তুমি খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।"
কুপ্রবৃত্তির আনুসরণ মানুষকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংসের অতল গহবরে নিয়ে যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫] –

> (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ- وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)
>
> আর তুমি তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও, যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনাবলী, অত:পর সে তা থেকে সরে গেল, তারপর শয়তান তার পিছু নেয়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এটি হচ্ছে সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের একজন শ্রেষ্ঠ বুজুর্গের কথা বলা হয়েছে, যিনি পরিপূর্ণ মা'রিফাত হাসিল করেন। পরবর্তীতে কুপ্রবৃত্তি তার উপর জয়যুক্ত হয়ে গেলে সে বিপথগামী হয় এবং তার চরম অধঃপতন ঘটে। ফলে তার সমস্ত জ্ঞান ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কুকুরের সাথে লঞ্ছনাকর তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরার মাধ্যমে পূণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সকল মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, যেন কেউ প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, নতুবা তারাও মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের অন্তরকে নষ্ট করে দেয়। এটা মনকে মন্দ পথে পরিচালিত করে।[৬] এটা সত্য উপলব্ধির ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে ফেলে। ফলে খেয়াল-খুশির অনুসারী উদ্ভ্রান্তের মত দিশেহারা হয়ে যায়। সে সরল পথের দিশা লাভে অসমর্থ্য হয়ে পড়ে। কেননা সে হিদায়াত ও তাওফীকের মূল উৎস থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার খেয়াল-খুশির অনুসারী হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন[৭] (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) "তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে

---

[১]. আল কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ২৩, আরও দেখুন, আল কুরআন ৪৭:১৪, ১৬; ২৫ : ৪৩-৪৪, ৫৩ :১৯-২৩; ২০:১৬; ৬:১৫০।
[২].আল কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ২৩, আরও দেখুন, আল কুরআন ৪৭:১৪, ১৬; ২৫ : ৪৩-৪৪, ৫৩ :১৯-২৩; ২০:১৬; ৬:১৫০।
[৩].মূল আরবী[إنما أخاف عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فان طول الأمل ينسي الآخرة وان اتباع الهوى يصد عن الحق] ইবনু আবী শাইবা, *আল-মুসান্নাফ* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.) খ.০৭, পৃ.১০০, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৩৪৪৯৫।
[৪]. আল কুরআন, সূরা সাদ : আয়াত ২৬।
[৫]. আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ: আয়াত ১৭৫-১৭৬।
[৬]. আল কুরআন, সূরা নাজম : আয়াত ২৩।
[৭]. আল কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ২৩, আরও দেখুন, আল কুরআন ৪৭:১৪, ১৬; ২৫ : ৪৩-৪৪, ৫৩ :১৯-২৩; ২০:১৬; ৬:১৫০।

দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" –এখানে প্রবৃত্তি পূজাকে শিরকতুল্য মহাঅপরাধ গণ্য করা হয়েছে। কেননা প্রবৃত্তিপূজারী ব্যক্তি মূর্তিপূজারী মুশরিকদের ন্যায় আল্লাহর বিধি-বিধান উপেক্ষা করে স্বীয় নফসের আনুগত্য করে থাকে।

প্রবৃত্তির গোলামী সত্য গ্রহণে, সত্য পথে চলতে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যে প্রতিবন্ধকতা করে। যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের হৃদয় ও শ্রবণ শক্তির উপর মোহর মেরে দেয়া হয়। ফলে তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়, সত্যের অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না। এ কারণে প্রবৃত্তি পূজারী ব্যক্তিকে কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত হতে দেখা যায়। এটা ব্যক্তিকে সত্যচ্যুত করে ক্ষান্ত হয় না; বরং অন্যদেরও পথহারা করে এবং সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]–(وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ)"অনেকে অজ্ঞতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সমন্ধে সবিশেষ অবহিত।"

প্রবৃত্তির অনুসরণ সত্যিকার মুসলিম হওয়ার পথে অন্তরায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজ প্রবৃত্তিকে আমার আনীত দ্বীনের অনুগামী করবে।"[২]

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন[৩], (فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ) -"তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না।" কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের মধ্যে অহঙ্কার ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এটা আত্মত্যাগ ও বিনয়ের মতো মহৎ গুণকে নষ্ট করে ফেলে। এজন্য নিঃশর্তভাবে খেয়াল-খুশির অনুসরণ নিষেধ করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[৪]–"তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে: অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, প্রবৃত্তির ভালো লাগা ও মন্দ লাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতামতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।" আবূবকর আল-ওর্য়ারাক[৫] বলেন-[৬], "যখন খেয়ালখুশি জয়যুক্ত হয় তখন হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর হৃদয় যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। মন যখন সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। আর চরিত্র যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সৃষ্টিকুল তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে, আবার সেও তাদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করে'।"

কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ মানুষকে ধর্মীয়, চারিত্রিক, নৈতিক ও আত্মিকভাবে দেউলিয়া করে ফেলে। প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির মন কঠোর হয়ে যায়। আর মন যখন কঠোর হয়ে যায় তখন সে পাপ-পঙ্কিলতাকে তুচ্ছ মনে করে। মানুষের মাঝে যে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অনিষ্টতার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে রয়েছে এর অনুসরণ। এ কারণে যুগে যুগে মানুষ বিপথগামী ও ধ্বংস হয়েছে। ইবরাহীম ('আ.) এর পরবতী বংশধরদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭] –(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) "তাদের পরে আসল এমন অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা সম্পর্কে মুহাম্মাদ কুতুব(মৃ.২০১৪) বলেন–

> মানুষ একবার যদি তার প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমার্পণ করে তাহলে পুনরায় আর কোনদিন সে উহাকে কাবু করতে পারে না। কেননা যতই সে পেতে থাকে ততই তার লোভও বাড়তে থাকে। এমনি করে করে মানুষ পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায় এবং আনন্দ ও ভোগ–বিলাসের সাগরে এমনভাবে ডুবে যায় যে, অন্য কিছুর হুশ বলতে তার কিছুই থাকে না। অনস্বীকার্য যে, মানবীয় জীবনে এবং উহার বহুমুখী সমস্যা সম্পর্কে এই গতিবিধি বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারে না । কেননা বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা। এই শর্ত পালিত হলেই বিজ্ঞান, কলা ও ধর্মীয় জগতে উন্নতি লাভ করা সম্ভব।[৮]

কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও যালিমদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এসব মন্দগুণের অধিকারীরা নিজের সব কর্ম ও আচরণকে যথার্থ মনে করে। ফলে তারা আত্মতুষ্টিতে ভোগে ও অহংকারী হয়ে উঠে। সর্বদা নিজের প্রশংসা পছন্দ করে এবং সমালোচনা পছন্দ করে না। এদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ বলেন[৯]– أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً - "তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজদের পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে পবিত্র করেন।" আরও বলেন[১০], (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ) "বরং সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন কে তাকে হিদায়াত করবে? আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"

---

১ . আল কুরআন, সূরা আল-আন্'আম : আয়াত ১১৯।

২.মূল আররী [لا يؤمن أحدكم حتى يكونهواه تبعا لماجئت به] ইমাম বাগাভী, *শরহুস সুন্নাহ*(বৈরুত:আল-মাকতাবুল ইসলামী,২য় প্রকাশ,১৯৮৩) কিতাবুল ঈমান, খ.০১, পৃ.২১৩, হা.১০৪।

৩. আল কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১৩৫, আরও দেখুন– আল-কুরআন ৫:৪৮-৪৯, ৩৮:২৬।

৪ . মূল আরবী[وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه] হাফিজ মুনযিরী, খ.০১, পৃ. ৪৫, কিতাবুল ইখলাস, হাদীস নং ৮৬।

৫. তিনি আবুবকর ইবন উমার আল-ওর্য়ারাক আল-বালখী আস-সুফী। তিনি তিরমিযে জন্মগ্রহণ করে এবং বলখে জীবন যাপন করেন। তিনি ২৪০হি. এর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

৬.ইবনুল জাওযী, *যাম্মুল হাওয়া, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯, /*যাম্মুল হাওয়া* (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪১৮হি.) পৃ.৫৪।

৭ . আল কুরআন, সূরা মার্‌ইয়াম : আয়াত ৫৯।

৮. মুহাম্মাদ কুতুব, *শুবহাত হাওলাল ইসলাম* (কায়রো : দারুশ শুরক, ১৯৯২), পৃ.২২-২৩।

৯ . আল কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ২৩, আরও দেখুন, আল কুরআন ৪৭:১৪, ১৬; ২৫ : ৪৩-৪৪, ৫৩ :১৯-২৩; ২০:১৬; ৬:১৫০।

১০. আল কুরআন, সূরা আর-রূম : আয়াত ২৯; আরও দেখুন– আল কুরআন, ০২: ১২০, ১৪৫; ১৩:৩৭; ৪৫: ১৮।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ কাফির, মুশরিক, মুনাফিক, যালিম ও পাপাচারী ব্যক্তির কাজ। কোন জ্ঞানী মুত্তাকী ব্যক্তি কখনও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে পারে না।

কুপ্রবৃত্তি অনুসরীরা বিপথগামী ও শয়তানের দোসর। এ শ্রেণীর লোকেরা পার্থিব ক্ষেত্রে নানা যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারী হলেও কখনই তাদের অনুসরণ করা যাবে না। এরা সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ বলেন[১]– (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) "আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।" অন্যত্র বলেন[২],(وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ)"এবং এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ বিচ্যুত হয়েছে।"

প্রবৃত্তির অনুসরণ একটি ধ্বংসাত্মক মন্দ বিষয়। রাসূল সা. বলেছেন–"ইবলিস বলেছে যে, মানুষকে আমি গুনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, আর মানুষ আমাকে ধ্বংস করেছে গুনাহ মাফ চেয়ে। অতঃপর আমি তাকে ধ্বংস করলাম নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়ে। তখন তারা ভাবে যে, তারা সুপথেই আছে। ফলে তারা আর গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে না।"[৩]
কুপ্রবৃত্তি অনুসরণকারীদের নিবাস জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন[৪] فَأَمَّا مَن طَغَى-وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا-فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى "অনন্তর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস।" এ সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৫]–"জাহান্নাম প্রবৃত্তি দ্বারা বেষ্টিত আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-কষ্ট দিয়ে।"

কুপ্রবৃত্তি অনুসরণ ও আত্মপূজার কারণ: ক.শৈশবে মাতা-পিতার মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা ও আদরের কারণে খেয়াল-খুশি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া। খ.খেয়াল-খুশির অনুসরণের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। গ.পাপাচারী ও প্রবৃত্তি পূজারীদের সাহচর্য। ঘ.কাঙ্ক্ষিত বৈধ জিনিস লাভে অতিমাত্রায় তৎপরতা দেখানো। ঙ.দৈহিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভকে অগ্রাধিকার। চ.আহমিকা বা আত্মগরিমা এবং আল্লাহ, পরকাল ও দ্বীন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব।

কুপ্রবৃত্তি দমনে করণীয়: ক. দৃঢ়সংকল্প ও ধৈর্য অবলম্বন করে খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনার বিপরীত কাজ করা। খ.তাকওয়া অবলম্বন, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং কুপ্রবৃত্তি অনুসরণের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা। গ.আলেম ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের সাহচর্য অবলম্বন। ঘ.খেয়াল-খুশির অনুসারীদের সাথে উঠাবসা না করা। ঙ.কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে আল্লাহ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা, দো'আ, আত্মশুদ্ধি ও তাহাজ্জুদ আদায়। চ.দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য ও আড়ম্বরতা থেকে দূরে থাকা। ছ.দ্বীন ও সুস্থ বিবেক অনুযায়ী কাজ করা, সত্য যেখানেই পাওয়া যাবে তা গ্রহণে প্রস্তুত ও আন্তরিক হওয়া।

❑.তাগূতের (الطَّاغُوت) অনুসরণ:

তাগূত(الطَّاغُوت) শব্দটির মাসদার(طغيان), যা(طغو/طغى)মূলধাতু থেকে নির্গত। কুরআনে طَغو/طغى ধাতু শব্দটি বিভিন্ন রূপে মোট ৩৯ বার এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ- যে বা যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে[৬] অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সীমালংঘন, প্রচণ্ড অবাধ্য, প্রত্যেক এমন জিনিস যা সীমা অতিক্রম করে, আল্লাহদ্রোহী শাসক। কুরআনে তাগূত শব্দটি শয়তান;[৭] মূর্তি-দেবতা;[৮] যাদুকর-গণক[৯] ও কুফর[১০] অর্থে এসেছে। আর তুগইয়ান শব্দটি ক. পথভ্রষ্টতা; খ. সীমালংঘন ও অবাধ্য; গ. যুলম; ঘ. বৃদ্ধি পাওয়া বা সীমা অতিক্রম হওয়া; ঙ. ক্ষতি ও কম[১১] অর্থে এসেছে।
তাগূতের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তাফসীর ইবন কাছীরে উদ্ধৃত করা হয়েছে-[১২]
•উমার রা.(মৃ.২৩হি.) বলেন, তাগূত হচ্ছে–'শয়তান'। •মুজাহিদ রহ.(মৃ.১০৩হি.) বলেন–'মানুষরূপী শয়তান। মানুষ যার কাছে নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তির আবেদন জানায় এবং যে তাদের হর্তা-কর্তা হিসেবে তাদের উপর কর্তৃত্ব করে।'
•ইমাম মালিক রহ.(মৃ.১৭৯হি.) বলেন, তাগূত হচ্ছে 'প্রত্যেক ঐ জিনিষ, আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত (গোলামী) করা হয়।'
•রাগিব আল-ইসফাহানী (মৃ.৫০২হি.) বলেন[১৩]–" তাগূত হল প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয়। ...অবশ্য যাদুকর, গণক, পথভ্রষ্ট শয়তান ও সত্যবিমুখ ব্যক্তিও তাগূত এর অন্তর্ভুক্ত।"

---

[১]. আল কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ: আয়াত ২৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ : আয়াত ৭৭।
[৩].মূল আরবী[إن إبليس قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفارفلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون فلايستغفرون] হাফিজ মুনযিরী,খ.১,পৃ.৪৬,অধ্যায়:ইখলাস, হা.৮৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাযি'আত : আয়াত ৩৭-৩৯।
[৫].মূল আরবী [حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৬১২২, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জান্নাত, হা. ২৮২২।
[৬]. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৫, পৃ.০৭।
[৭]. আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২৫৬।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল : আয়াত ৩৬।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ৫১।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : আয়াত ৮১।
[১১] .ক.আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত১৫; খ. আল কুরআন ২০:১৪; গ. আল কুরআন ৯৬:৬; ঘ. আল কুরআন ৬৯:১১; ঙ. আল কুরআন ৫৫:৮-৯।
[১২]. ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩৩৪।
[১৩]. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩৯৭।

•কারো কারো মতে, "তাগূত হল সেই শক্তি যে বা যারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে অন্য বিধান বানায়, অতঃপর অন্যকে তা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে কিংবা বাধ্য করে।"[১]

মোটকথা, প্রত্যেক যুগে যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের মতবাদ বা মন মতো আইন তৈরী করে মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের করে নিজেদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে তারাই তাগূতের ধ্বজাধারী।

তাগূতের সংখ্যা অনেক। এ সংখ্যা নিরূপনে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রধান প্রধান তাগূত হলো: [২] ক. শয়তান ও ইবলিস। খ. যে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে মানুষকে অন্য কিছুর ইবাদতের দিকে আহবান করে।[আল-কুরআন ৩৬:৬০], গ. আল্লাহ্‌র হুকুম (আইন)পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক।[আল-কুরআন০৪:৬০] ঘ. আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধানের বিপরীত হুকুম প্রদানকারী কিংবা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বিরোধী আইন প্রবর্তনকারী। [আল-কুরআন ০৫:৪৪] ঙ. গায়েব জানার দাবীদার, আল্লাহ্ ছাড়া গায়েবের খবর রাখার অন্য কোন দাবিদার। [আল-কুরআন ৭২:২৬-২৭;০৬:৫৯] চ. যে নিজের ইবাদতের জন্য মানুষকে আহবান করে, আল্লাহ্ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং সে এই ইবাদতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। [আল-কুরআন ২১:২৯]

মূলকথা, তাগূত দ্বারা আল্লাহকে বর্জনের যত পথ-পদ্ধতি ও কর্মনীতি থাকতে পারে তার সবগুলোকে বুঝানো হয়েছে। হতে পারে তা শয়তান, আল্লাহর বিধান বিরোধী আইন বা জীবনবিধান প্রবর্তনকারী চাই তা মানবীয় মতবাদ হোক কিংবা দার্শনিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতা প্রবর্তিত রীতি-নীতি হোক না কেন।

তাগূত সব যুগে ছিল এবং সব যুগে থাকবে। এটা সর্বকালের ঘৃর্ণ্য ও বর্জনীয় অপশক্তি। এটা ঈমান ও সত্যের পথে চলার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নাবী-রাসূলের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল তাগূত নির্মূল। প্রত্যেক নাবী-রাসূল তাগূতের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩] – وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল।" নাবী-রাসূলের অনুপস্থিতিতে আজ এ দায়িত্ব মু'মিনদের উপর।

মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত তাগূত বর্জন। এটা বর্জন ছাড়া মুমিন ও সত্যের অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক মুমিনকে স্বীয় যুগের তাগূতকে চিনে সর্বাত্নকভাবে তা বর্জন করতে হবে, নতুবা ঈমানের দাবী সঠিক হবে না। মহান আল্লাহ বলেন[৪] – فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহে ঈমান আনবে সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে যা কখনও ভাংগবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।" – উদ্ধৃত আয়াত ঈমান আনার পূর্বে তাগূত বর্জনকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তিকে মু'মিন হতে হলে তাগূতের সকল পথ-পদ্ধতি ও কর্মনীতি সাথে কুফরী করা অপরিহার্য নতুবা ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

তাগূত বর্জনের অর্থ হলো আল্লাহর পথ ছাড়া যত পথ ও মত আছে তা পরিত্যাগ করা। মুখে ঈমানের দাবী করে স্বীয় কর্মকাণ্ড ও শক্তি-সামার্থ্য দিয়ে আল্লাহদ্রোহী শক্তির সহযোগিতা বা কোন ক্ষেত্রে তাদের গ্রহণ করার নাম তাগূত বর্জন নয়। ইরশাদ হচ্ছে[৫] أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَاأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায় যদিও তা প্রত্যাখ্যানের জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাগূতের অনুসরণের অমঙ্গল বহুবিদ। তাগূত বাতিল ও গোমরাহির ধারক-বাহক। এটা যুলুম ও অকল্যাণের উদ্‌গাতা। তাগূত ব্যক্তিকে সত্যচ্যুত করে আল্লাহর দেয়া বিধি-ব্যবস্থা থেকে ফিরিয়ে কুফর, ভ্রষ্টতা ও বাতিলের দিকে ধাবিত করে এবং কাফিরদের তত্ত্বাবধায়নে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন[৬]– وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই অগ্নি অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" অন্যত্র বলেন[৭] أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً "তুমি কি তাদের দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল,তারা জিবত(শয়তান, প্রতীমা, যাদুকর) ও তাগূতের বিশ্বাস করে? তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এদেরই পথ মু'মিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।

---

[১].মুহাম্মদ আমিনুর রহমান, *বিশ্বায়ন তাগুত খিলাফাহ* (ঢাকা: প্রকাশক, মতিয়া হাসান, ৩য় সং., ২০০৪) পৃ.৩৩।
[২].দেখুন, ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীর*, খ.০২, পৃ.৩৩৪, পৃ.; রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত*, খ.০২, পৃ.৩৯৭; আবদুল্লাহ আজ-জারবু, *আছারুল ঈমান*, খ.১, ৪৪-৪৯।
[৩] .আল-কুরআন,সূরা আন্-নাহ্ল : আয়াত ৩৬।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২৫৬।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ৬০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২৫৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ৫১।

কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা যুগে যুগে তাগূতের অনুসরণ ও সংরক্ষণ করেছে। তাই যারা তাগূত অবলম্বন করবে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ "এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[২] إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ - "নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক করেছিল এবং মনে করত নিশ্চয় তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

তাগূত অবলম্বনের যেমন অনেক ক্ষতি রয়েছে তেমনি তাগূত বর্জনের নানা উপকার রয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ- "আর যারা তাগূতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদের।"

তাগূত অনুসরণের কারণ: অজ্ঞতা-মূর্খতা, যালিম শাসক, মূর্খ পণ্ডিত, বিভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতার অনুসরণ, ভ্রান্ত মতবাদ, পাশ্চাত্য দর্শন ও বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার কুপ্রভাব।

তাগূত বর্জনে করণীয়: ওহীর সঠিক শিক্ষা তথা কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ। তাগূত অনুসরণের পরিণতি অনুধাবন করা।

❑. শয়তান/শয়তানী শক্তির আনুগত্য(اتباع الشيطان):

শয়তান(الشَّيْطَان) শব্দটির উৎপত্তি দু'ভাবে হতে পারে। ক. তা شَطَن থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ দূর হওয়া। এ হিসেবে যে কোন অবাধ্য জিন, মানুষ ও বিচরণশীল প্রাণীকে শয়তান বলা হয়, যেহেতু তারা সঠিক ও ন্যায় থেকে দূরে। খ. الشَّيْطَان শব্দটি شاط يشيط থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ বাতিল হওয়া। যে কোন অবাধ্যই স্বীয় কল্যাণের ব্যাপারে বাতিল ও ভ্রষ্ট হওয়ায় তাকে শয়তান বলা হয়।[৪] কুরআনে শয়তান শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৮৮ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

শয়তান বলতে অনেকেই শুধু ইবলিকে বুঝে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে শয়তানের অগণিত বংশধর ও অনুসারী রয়েছে। জীনের বড় অংশ শয়তানের বংশধর এবং মানুষের মধ্য থেকে একটি অংশ শয়তানের অনুসারী। এছাড়া কাফির, মুশরিক ও জঘন্য পাপীরা শয়তানের ঘনিষ্ঠ দোসর, যাদের মাধ্যমে শয়তান তার অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন[৬]– وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا "আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে।" আরও বলেন[৭]- هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ-تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ "আমি কি তোমাদের জানাব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়। তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।"

শয়তান মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের সবচেয়ে বড় দুশমন ও সকল অনিষ্টের মূল। সে মানুষকে সর্বদা অকল্যাণের পথই নির্দেশ করে এবং ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। আদি পিতা আদম ('আ.) কে সিজদা না করার কারণে শয়তানকে অভিশপ্ত ঘোষণা করার পর থেকেই শয়তান মানুষের চিরশত্রুতে পরিণত হন। তখন থেকে তার দুশমনী ও ষড়যন্ত্র শুরু হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত আদম সন্তানের উপর তা অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে-[৮] إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ "শয়তান তো তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহবান করে কেবল এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।"

> قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إَلاَّ قَلِيلا- قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا- وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا
>
> সে (শয়তান) বলল, 'আপনি কি বিবেচনা করেছেন, আপনি আমার উপর এই ব্যক্তিকে (আদম 'আ.) মর্যাদা দান করলেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব।' তিনি বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে'। 'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদের উপর আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদের ওয়াদা দাও'। আর

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ৭৬।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ৩০।
[৩].আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার : আয়াত ১৫-১৭।
[৪] .ফখরুদ্দীন আল-রাযী, *আত-তাফসীরুল কবীর/মাফাতীহুল গাইব* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খৃ.) খ.০১, পৃ.৬১।
[৫]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৯-৪৭১।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম : আয়াত ১১২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা': আয়াত ২২১-২২২,আল-কুরআন ৪৩ : ৩৬-৩৭ , ২২:০৩, ০৭ : ২৭।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির : আয়াত ০৬, আরও দেখুন, আল কুরআন ১২:০৫, ৩৬:৬০, ০২:২০৮।

শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদের কোন ওয়াদাই দেয় না। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও[১] এবং তাদের ওয়াদা দাও'। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোন ওয়াদাই দেয় না।[২]

শয়তানের শত্রুতা ও অনিষ্টতা অতি ভয়ঙ্কর, সর্বগ্রাসী ও সার্বক্ষণিক। সে সর্বদা মানুষকে পাপাচার ও দুষ্কর্মে প্ররোচিত করে। সে একটার পর একটা ক্রমাগত অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। তার এক ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেলে আরেক ষড়যন্ত্র নিয়ে হাজির হয়। এভাবে সে মানুষের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একটির পর একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওৎ পেতে থাকে। কোন এক মুহূর্তের জন্য মানুষের প্রতি তার শত্রুতা বন্ধ থাকে না। মানুষকে চূড়ান্তভাবে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে গহবরে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার চক্রান্ত বন্ধ করে না। ইরশাদ হচ্ছে[৩]–

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ- ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ- قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

"সে (শয়তান) বলল, 'আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট আসবই তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না'। তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবই।"

وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا- وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا-يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

সে বলে, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব'। 'আর আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দিব ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবই এবং অবশ্যই তাদের নির্দেশ দিব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে, আর শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনামাত্র।[৪]

শয়তান দুষ্কর্মের মূলহোতা। সে মানুষের মনে নানা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে মহান আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ করে, ভ্রান্তবিশ্বাস সৃষ্টি করে শিরক, কুফর, নিফাক, বিদআতে নিমজ্জিত করে, কুকল্পনা জাগ্রত করে অশ্লীল, মন্দ কাজ ও পাপচারে লিপ্ত করে। মানুষের হৃদয়ে স্থান করে তাকে অহঙ্কার, হিংসা, রিয়া অথবা আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতার দুর্বলতায় নিক্ষেপ করে। মানুষের বাকশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে মিথ্যা, গীবত-পরনিন্দায় লিপ্ত করে। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৫] وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল নির্দেশ দেয় তোমাদের মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার যা তোমরা জান না।" অন্যত্র বলা হয়েছে- اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ[৬]-"শয়তান এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিক্র ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।" আরও অন্যত্র বলা হয়েছে-[৭] كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ "এটা শয়তানের মত, সে মানুষকে বলে, কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" অন্যত্র এসেছে- وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا-"শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।"[৮]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে শয়তানের নানামুখী ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে মহান আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন।

শয়তান মহাপ্রতারক ও ভয়ানক কুচক্রী। মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে সে মানুষকে প্রতারিত করে।[৯] সে মানুষের বন্ধুবেশী এক ভয়ানক মহাশত্রু। তার চক্রান্ত অতিসূক্ষ্ম ও মারাত্মক। সর্বদা সে মানুষের নিকট পাপ কাজ সুশোভিত করে দেখায় এবং তাতে উৎসাহিত করে। মানুষকে অন্যায়ে লিপ্ত করিয়ে তার ক্ষতি সাধন করে কেটে পড়ে। তার প্রতারণার একটি চিত্র[১০]–

---

[১]. মানুষের ধন-সম্পদে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে সুদ-ঘুষ, আত্মসাত, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মাধ্যমে তা অর্জন করা এবং অন্যায় পথে তা ব্যয় করা। সন্তানে শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে ব্যভিচারের মাধ্যমে জারজ সন্তান পয়দা হওয়া। শয়তানের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে- দুনিয়াটাই আসল, কোন পুনরুত্থান নেই, কোন হিসাব-নিকাশ বা প্রতিদান নেই, জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। *-ইবন কাসীর, তাফসীর ইবন কাসীর*, খ.০৫, পৃ.৯৪।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৬২-৬৪।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১৬-১৮।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১১৮-১২০ ।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ১৬৮-১৬৯, আল-কুরআন ২৪:২১।

[৬]. আল-কুরআন, ৫৮:১৯।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র : আয়াত ১৬ ।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ৬০ ।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম : আয়াত ২২।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ২০-২২।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ- وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِين- فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"অতঃপর শয়তান তাদের (আদম ও হাওয়া 'আ.) প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের নিকট প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং সে বলল, 'তোমাদের রব তোমাদের কেবল এজন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন পরে যাতে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'। আর সে তাদের নিকট শপথ করল যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামীদের একজন'। এভাবে সে তাদের প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল। তাই তারা যখন গাছটির ফল আস্বাদন করল তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজদের ঢাকতে লাগল এবং তাদের রব তাদের ডেকে বললেন যে, 'আমি কি তোমাদের ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদের কি বলিনি যে নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু'?"

এখানে শয়তান আদম ও হাওয়া ('আ.) এর শুভাকাংঙ্খী সেজে প্রতারণা করে তাদের বিভ্রান্ত করে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করায়। শয়তান যে মন্দ কাজে উৎসাহদাতা চরম ধোঁকাবাজ ও মহাপ্রতারক তার প্রতারণার আরেকটি চিত্র[১] –

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"আর স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করল এবং বলল, 'আজ মানুষের মধ্য থেকে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকব'। অতঃপর যখন দু'দল একে অপরকে দেখল, তখন সে পিছু হটল এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা'।"

এখানে শয়তান ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কাফিরদের বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়েছিল এবং বিপদের মুহূর্তে সে কেটে পড়েছিল। তাই মহান আল্লাহ বলেন[২]–وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا-"শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।"

শয়তান ছাড়াও শয়তানের ঘনিষ্ঠ দোসর কাফির, মুশরিক ও জঘন্য পাপীরাও মানব জাতির জন্য কম বিপদজনক নয়। তারাও মানুষকে সত্যচ্যুত করে চরম ভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ "নিশ্চয় শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।"

শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণার পন্থা ও দিকসমূহ: শয়তান নানাভাবে মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। শয়তানের চক্রান্ত বহুমুখী ও বহুরুপী। সে মানুষের নিকট এমন সব পথে প্রবেশ করে যে, অধিকাংশ মানুষ সে সম্পর্কে বেখবর থাকে। যারা শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে সতর্ক নন, তারা অনেক ক্ষেত্রেই শয়তানের গোলামী করে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা পূণ্যের কাজ করেছে। এভাবে শয়তান অপরাধীদের নিকট তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দেখান। নিম্নে শয়তানের কুমন্ত্রণার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তুলে ধরা হল–

• প্রতারণা ও ছলচাতুরতার মাধ্যমে পাপাচার ও আল্লাহর অবাধ্যতাকে আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলে ধরা। যেমন আদম ('আ.)-এর ঘটনায় শয়তান আল্লাহর অবাধ্যতাকে সুশোভিত করে উপস্থাপন করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে[৪]– قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى "সে বলল, হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনদায়িনী একটি বৃক্ষের কথা বলব (যার ফল খেলে তুমি এখানে চিরকাল থাকতে পারবে) এবং বলব এমন রাজত্বের কথা, যার কখনো পতন হবে না ?"

• শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে শয়তান মানব মনে অন্যায় কাজকে সুকৌশলে বৈধ করার নানাযুক্তি কল্পনা-ভাবনার মাধ্যমে জাগিয়ে দেয়। এভাবে সুকৌশলে ক্রমে ক্রমে মন্দ কাজ সুশোভিত করে মানুষকে চরম ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচারে লিপ্ত করে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৫] –(وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ)"সে তাদের কাছে কসম করে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের জন্যে হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।" এখানে শয়তান শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আদম ও হাওয়া ('আ.) কে শপথ করে জানিয়েছিল যে সে বিশ্বস্ত, অথচ বাস্তবে তা ছিল উল্টো।

• অন্তরে সংকীর্ণতা ও ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে। যেমন, যাকাত, দান-সাদাক করার সময় শয়তান মানুষের অন্তরে কৃপণতার জন্য কুপ্ররোচনা দেয় এবং ভয় দেখায় যে, আল্লাহর পথে খরচ করলে দরিদ্র হয়ে যাবে। জিহাদের সময় মৃত্যুর ভয় দেখায়, ইত্যাদি। শয়তান মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়। সম্ভব ও অসম্ভব সকল উপায়ে সে তাদের বুদ্ধিতে এটা প্রবেশ করায় যেন তারা কল্যাণময় কাজ থেকে বিরত থাকে। মহান আল্লাহ বলেন[৬]–(إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) "এই হচ্ছে তোমাদের (প্ররোচনাদানকারী) শয়তান

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল : আয়াত ৪৮।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌কান : আয়াত ২৯।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম : আয়াত ১২১।
৪. আল কুরআন, সূরা ত্বহা : আয়াত ১২০।
৫. আল কুরআন, সূরা আল-আরাফ : আয়াত ২১।
৬. আল কুরআন, সূরা আল-ইমরান : আয়াত ১৭৫।

তারা তাদের নিকটজনদের ভয় দেখাচ্ছিল, তোমরা কোনো অবস্থায়ই তাদের ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও।"

• শয়তান মানুষের কুপ্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে মানব অন্তরে কুকামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, ক্রোধ ও হিংসা-বিদ্বেষ উদ্ভব করে মানুষকে পাপাচারের জন্য উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন-[১] إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا "নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়;শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"

• শয়তান মানুষকে বিপথগামী করার জন্য তার অসংখ্য অনুসারী নিয়ে প্রতিনিয়ত নানা ষড়যন্ত্রে তৎপর থাকে। শয়তান পাপী-পূণ্যবান ও জ্ঞানী-মূর্খ ব্যক্তিভেদে আলাদা আলাদাভাবে মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে থাকে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করে পাপ ও অন্যায় সংঘটিত করে থাকে। তাই শয়তানের নানামুখী চক্রান্ত বুঝতে ও জানতে হলে পূর্ববর্তী বিভিন্ন বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন[২]–-وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ- "শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ নি?

এছাড়াও শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অপকৌশল প্রয়োগে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে। কাউকে শিরক, কাউকে কুফর, কাউকে নিফাক, কাউকে বিদ'আত, কাউকে অধিকাংশ কবিরা গুনাহের মাধ্যমে জাহান্নামে নিপতিত করে। আবার কারো নিকট সগীরা গুনাহ তুচ্ছ করে তুলে ধরে তাতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত করায়ে বড় ক্ষতিতে নিক্ষেপ করে। কাউকে অনুত্তম ও ছোট কাজের মাধ্যমে উত্তম ও বড় কাজ থেকে বিরত রাখে, ফলে তার প্রতিদান কমে যায় এবং পুণ্য ক্রটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। কাউকে বড় পাপ করাতে সক্ষম না হলে ছোট পাপের দিকে ধাবিত করে ক্রমে বড় পাপে নিক্ষেপ করে। যেমন কারো দ্বারা মিথ্যা বলাতে না পারলে তাকে অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত করে ক্রমে গীবত-পরনিন্দায় লিপ্ত করেন। এরপর তার চেয়েও বড় পাপের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং এভাবেই অবিরাম তার অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।

শয়তানের আনুগত্যের পরিণতি: শয়তান সৃষ্টিকুলের সর্বনিকৃষ্ট সঙ্গী।[৩] সে মানুষের সদগুণাবলী নষ্ট করে মানুষকেও তার মত নিকৃষ্টে পরিণত করে। মানুষের নিকট মন্দ বিষয়গুলোকে ভালো বলে উপস্থাপন করে এবং মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথ থেকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ বলেন[৪] –وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا "আর আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।" অন্যত্র বলেন-[৫] - وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ- كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ "মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের, তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে।"

শয়তানের অনিষ্টতা ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়: শয়তান মানুষের এক ভয়ানক শত্রু, যার মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট বহুমুখী তাই তা থেকে রক্ষা পেতে বহুমুখী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়তে হবে। এক্ষেত্রে করণীয়:

ক).শয়তানের সব ধরনের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণা থেকে প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক থাকা। কোন পাপ বা ভুল হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবা করা, বেশি বেশি ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা।

খ).শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য দু'আ-যিক্র ও কুরআন তিলাওয়াত করা। যেমন: আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, ফালাক্, নাস ও সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন দোয়া পড়া। শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার মহান আল্লাহ বলেন-[৬] وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ "আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর আশ্রয় চাও, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে যখন তাদের শয়তান কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্বরণ করে, তৎক্ষণাৎ তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।" ইবন আব্বাস (রা.) বলেন[৭]: "শয়তান মানুষের অন্তরে চেপে বসে থাকে। যখন সে ভুল করে বা উদাসীন হয়, তখনই সে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর যখন সে হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সে পশ্চাতে সরে যায় কুমন্ত্রণা দেয়া ছেড়ে দেয়।"

গ).সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করা। এ মর্মে কুরআনে শিখানো একটি দো'আ-[৮]وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ- وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ-'বল, হে আমার রব! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রব! আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে।'

ঘ). প্রতিটি বিষয়ে ধীর-স্থিরতা অবলম্বন করা। বিসমিল্লাহ্ বলে প্রত্যেক কাজ করা। অপব্যয়-অপচয় না করা।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৫৩।
২.আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬২।
৩. আল-কুরআন, ০৪: ৩৮।
৪. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১১৯।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ : আয়াত ৩-৪।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ২০০-২০১,আল কুরআন ৪১:৩৬।
৭.মূল আরবী[الشيطان جاثم على قلب بن آدم فاذا سها وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس] *আল-মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা*, খ.০৭, পৃ.১৩৫ পৃ. কিতাবুয যুহদ, রিওয়ায়েত নং৩৪৭৭৪।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন : আয়াত ৯৭-৯৮।

ঙ).শয়তানকে খুশী করে এমন কাজ থেকে দূরে থাকা। যেমন গৃহে বাদ্যযন্ত্র, কুকুর, ছবি, প্রতিকৃতি ইত্যাদি না রাখা।
চ). পরনারীর সাথে নির্জনে একত্রিত না হওয়া। বিনা প্রয়োজনে নারীর নিজ গৃহ থেকে বাইরে না যাওয়া।
ছ).সর্বপরি, কুরআন-সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ করা। কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী সকল কর্মকাণ্ড পরিহার করা। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত যত পথ ও মত আছে তার সবগুলোই শয়তানের।

❑.পার্থিব সম্পদ ও সুখ-সম্ভোগের প্রতি আসক্তি এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতাঃ

আল-কুরআন তাঁর অনুসারীদের দুনিয়ার জীবনকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে বলে না, তবে দুনিয়ার প্রতি নিমগ্ন হতে নিষেধ। কুরআন বলে দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে। কুরআন মতে, দুনিয়া মানব জীবনের একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র। কিন্তু এর বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য অতি মোহনীয়, যা সকলকে আকৃষ্ট করে থাকে। ফলে অধিকাংশ মানুষ পার্থিব জীবনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু এটি গুরুতর বিভ্রান্তি ও চরম নির্বুদ্ধিতা। তাই এর ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১]– (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ)-"হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের প্রবঞ্চিত না করে।" অন্যত্র এসেছে[২] بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى "তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও চিরস্থায়ী।"

পার্থিব জীবন এবং এর দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি আসক্তি মানুষের দ্বীন ও নৈতিকতার জন্য মারাত্মক বিপদ। এ দুনিয়ার ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য, ক্ষেত-খামার, স্ত্রী-সন্তান, গাড়ী-বাড়ী, শোভা-সৌন্দর্য মানুষের নিকট আকর্ষণীয় বস্তু। এগুলো মানুষের মধ্যে সীমাহীন লোভ-লালসার সৃষ্টি করে।[৩] এগুলো ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করে,[৪] ব্যক্তির অন্তরকে কঠিন করে ফেলে এবং মানুষের চিন্তা-চেতনার মধ্যে সংকীর্ণতার জন্ম দেয়। তখন মানুষের নিকট পার্থিব সফলতা, চাওয়া-পাওয়া ও সুখ-সম্ভোগ জীবনের মুখ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ মানুষ এসব পার্থিব সম্পদ ও ভোগ সামগ্রী পাওয়ার জন্য নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে থাকে। এজন্য তারা যে কোন ধরনের অন্যায় করতে কোন দ্বিধা করে না এবং তাদের জীবনে নীতি-নৈতিকতা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। অধিকন্তু, এগুলো মানুষকে আখিরাতের প্রতি উদাসীন করে ফেলে এবং আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফিল করে দেয়। পর্যায়ক্রমে তা মানুষকে কুফরের দিকে ধাবিত করে। তাই দুনিয়ার প্রতি এই আসক্তি সকল অধঃপতনের কারণ। এজন্য পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ সামগ্রীর অসারতা তুলে ধরে কুরআনে বলা হয়েছে-[৫]

> زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ- قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ-
>
> "মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে–নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা,চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ। এগুলো দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। বল, 'আমি কি তোমাদের এ সবের চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"

উদ্ধৃত আয়াত সমূহে মানুষকে দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগসামগ্রী ধোঁকার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও আকর্ষণ সর্বপ্রকার অনৈতিকতা ও পাপের মূল উৎস। দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্যই ভাই ভাইকে হত্যা করছে, মানুষ আমানতের খিয়ানত করছে, অঙ্গীকার ভংগ করছে, জনগণের অধিকারহরণ করছে, স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে, একে অপরকে হামলা করছে, শক্তিশালী দুর্বলকে বিপর্যস্ত করছে, ব্যবসায়ীরা মাপে কম দিচ্ছে, পণ্যে ভেজাল দিচ্ছে, কালোবাজারীর ও চোরাচালানীর আশ্রয় নিচ্ছে। শাসক শ্রেণী জনসাধারণের উপর যুলম করছে, বিচারকরা অবিচার করছে, অফিস-আদালতে ঘুষ ও দুর্নীতি চলছে, ধনী শ্রেণী বিলাসিতা ও অপব্যয় করছে, দুর্বল চিত্তের মানুষ মুনাফিকী করছে। এ দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর আলিম দ্বীনের মূল সত্য কথাকে গোপন করছে, সাংবাদিকরা মিথ্যা খবর প্রচার করছে এবং সত্য সংবাদ গোপন করছে ও অত্যাচারী শাসকের মহিমা কীর্তন করছে। পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই আজ রক্তপাত হচ্ছে। মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো বলা হচ্ছে। দ্বীন, মান-সম্মান ও দেশকে বিক্রি করা হচ্ছে। এ সবকিছু করা হচ্ছে দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে।

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির: আয়াত ০৫। আরও দেখুন, আল-কুরআন ২০ : ১৩১, ০৪:৫৪; ১৮:২৮; ৮৭:১৬-১৭ ।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'লা ৮৭:১৬-১৭।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৪-১৫।
[৪] .আল-কুরআন, সূরা সাদ : আয়াত ৩১-৩৩।
[৫] .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪-১৫।

রাসূলুল্লাহ সা. যথার্থই বলেন–‘এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ হালাল বা হারাম কি পন্থায় সম্পদ অর্জন করেছে সে ব্যাপারে কোন খেয়াল করবে না।’[১]

দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য বজায় না রাখলে পার্থিব জীবনই হয়ে উঠে চরম লক্ষ্য। তখন দুনিয়ার আসক্তি মানুষকে ভোগবাদ ও বস্তুবাদের দিকে ধাবিত করে। তখন মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বিলোপ ঘটে। ফলে পার্থিব তুচ্ছ সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসের প্রতিযোগিতায় মানুষ পশুর মত হিংস্রতায় লিপ্ত হয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[২] - فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ অতএব, তুমি তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। এটাই তাদের জ্ঞানের শেষসীমা।” অন্যত্র বলেন[৩]

(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ)

হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করত?’ তারা বলবে, ‘আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।’ বস্তুত পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল, আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিল কাফির।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে আজকের মানব জাতির প্রতি তাকালে দেখতে পাই যে, তারা পার্থিব জীবন ও ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তিতে নিমজ্জিত। ফলে তারা ব্যাপকভাবে অনৈতিক কর্মে লিপ্ত। পার্থিব জীবন, ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মোহে মানুষ আজ ন্যায় ও অন্যায়ের বাছ-বিচার করছে না। এটাই সব নৈতিক অধঃপতনের মূল। হাদীসে যথার্থই বলা হয়েছে, ‘পার্থিব জীবনের মোহ সব অনর্থের মূল।’[৪]

পার্থিব জীবন ও ধন-সম্পদের প্রতি আসক্তির কারণে আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বাতিল ও অন্যায়ের জয়জয়কার হওয়া সত্ত্বেও অসত্য ও অন্যায়ের বিরূদ্ধে সংগ্রামে সাহস করে না। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন[৫], ‘যখন তোমরা ঈনা (সূদের একটি পন্থা) পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরবে (দ্বীনের অনুসরণ না করে, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিবে) চাষাবাদেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর্ পথে জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ তোমাদের উপর থেকে লাঞ্ছনা উঠিয়ে নেবেন না’। রাসূল সা.আরও বলেন[৬], ‘আমি তোমাদের ওপর দরিদ্রতার আশংকা করছি না, বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দেওয়া হয়েছিল। আর তোমরা তার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে যেমন তারা তাতে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর তা তোমদের আখিরাত বিমুখ করবে যেমন তাদের বিমুখ করেছিল।’

সর্বপরি, দুনিয়া সম্পদ ও শোভা-সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। এ কারণে তারা আখিরাতের জীবন অস্বীকার করে পার্থিব সুখ-শান্তিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং পার্থিব ভোগ-বিলাস ও সফলতাকেই জীবনের প্রকৃত সফলতার বলে মনে করে।এর ফলে মানুষ পরকালীন জবাবদিহিতার কথা ভুলে গিয়ে বিভিন্ন অনাচার ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।এমনকি তারা পার্থিব সামান্য স্বার্থ হাসিলের জন্য মহান আল্লাহর পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।[৭] মহান আল্লাহ বলেন[৮]

(إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ-أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)

“নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে এবং তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে গাফিল। তাদেরই আবাস অগ্নি তাদের কৃতকর্মের জন্য।”

দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা: বাহ্যিকভাবে পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, ক্ষমতা ও সুখ-সম্ভোগ অত্যন্ত মনোহর। ফলে অধিকাংশই দুনিয়ার ধোঁকায় নিপতিত হয়। এই ধোঁকা থেকে বাঁচতে হলে পার্থিব জীবনের স্বরূপ এবং এর শোভা-সৌন্দর্যের চূড়ান্ত বাস্তবতা উপলব্ধি করা দরকার। এ ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে তুলে ধরা হল–

দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য, ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান ও সুখ-সম্ভোগ পরীক্ষার সামগ্রী।[৯] এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন প্রতিফলন নয়। এটাকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা নির্বুদ্ধতা। তাই কোন পাপাচারী বা দুর্নীতিবাজের সম্পদের পাহাড় দেখে একথা মনে করার কারণ নেই যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং সে সফলকাম। আবার কারো দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য দেখে একথা মনে করার কারণ নেই যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং সে হতভাগা ও ব্যর্থকাম। এজন্য

১.মূল আরবী [يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ‘, হা.নং ১৯৫৪; *সুনান আন-নাসায়ী*, হা.৪৪৫৪|

২ .আল-কুরআন, সূরা আন-নাজ্ম : আয়াত ২৯-৩০।

৩. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির : আয়াত ১৩০, আরও দেখুন, আল কুরআন ১৬ : ১০৪- ১০৯।

৪. মূল আরবী [حب الدنيا رأس كل خطيئة] *কানজুল উম্মাল*, খ.০৩, পৃ.৩৫৩, কিতাবুল আখলাক, হাদীস নং ৬১১৪।

৫. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল ইজারাহ, হাদীস নং ৩৪৬৪।

৬.মূল আরবী [أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক,হা.নং ৬০৬১।

৭ .আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ০৩।

৮ .আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস : আয়াত ৭-৮।

৯.আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল : আয়াত ২৮।

পার্থিব জীবনের ধোঁকা থেকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[১]–إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "নিশ্চয় পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।" আরও বলেন[২], (إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)-"নিশ্চয় যমীন আল্লাহর তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।" অন্যত্র বলেন[৩], (اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ) "আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উল্লসিত, অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য।" এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৪] –'দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যার কোন ঘর নেই; আর সেই ব্যক্তির সম্পদ, যার কোন সম্পদ নেই, আর তা কেবল সেই ব্যক্তি জমা করে, যার জ্ঞান নেই।'

পার্থিব জীবনের সুখ-সাচ্ছন্দ্যকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকৃত সফলতা মনে করে তাতে নিমগ্ন হতে পারে না। কেননা রাসূল সা. বলেন[৫], "নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয় বস্তু। আল্লাহ তোমাদেরকে এতে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি দেখবেন তোমরা কী 'আমল কর। কাজেই তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর।" আরও বলেন,[৬] "প্রত্যেক জাতির জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু আছে। আমার উম্মাতের পরীক্ষার বস্তু হল-ধন-সম্পদ।"

দুনিয়ার সুখ-সম্পদ খুবই ক্ষণস্থায়ী। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও সৌন্দর্য একটি মরীচিকা সাদৃশ্য বিষয়, যা মানুষকে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে প্রতিনিয়ত নানা প্রলোভনে নিমজ্জিত রাখে। যারা পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অর্জনকে সফলতার বস্তু মনে করে, তারা প্রকৃত সফলতা বিষয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও ধোঁকায় নিমজ্জিত। পার্থিব জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও উদাসীন। দুনিয়ার ধোঁকা ও অসারতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৭]

> (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)
>
> "নিশ্চয় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অতঃপর তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু খেয়ে থাকে। অবশেষে যখন যমীন তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে উঠে এবং তার অধিকারিরা মনে করে সেগুলো (যমীনে উৎপন্ন ফসল) তাদের আয়ত্তাধীন, তখন তাতে রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ এসে পড়ে। অতঃপর আমি সেগুলোকে এমনভাবে নির্মূল করে দেই মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।"
>
> (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)
>
> তোমরা জেনে রাখ যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁক-জমক, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহঙ্কার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।[৮]

উল্লেখিত আয়াতে দুনিয়ার স্বরূপ ও বাস্তবতা তুলে ধরে তার মহাপ্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দুনিয়ার জীবন এবং এর জৌলুস ও ভোগসামগ্রী একেবারে মূল্যহীন। এর বাস্তবতা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে,

> একদা রাসূল(সা.) একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, এক দিরহামের বিনিময়ে একে ক্রয় করতে পসন্দ করবে? সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো একে কোন কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া তার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট'।[৯]
>
> অন্যত্র বলেন,'দুনিয়া আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমতুল্য হলেও তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানি পান করাতেন না।[১০]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করে মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা মুক্তির বাস্তব পথনির্দেশ করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা করেছেন। তাঁর দেখানো পথ আমাদের উত্তম আদর্শ।

---

১ .আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ : আয়াত ০৭,আল কুরআন ০৩:১৮৬।

২ . আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১২৮।

৩ .আল-কুরআন, সূরা আর্‌-রা'দ : আয়াত ২৬।

৪.মূল আরবী[الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له] *মুসনাদ আহমাদ*, খ.০৬, পৃ.৭১, হা.২৪৪৬৪; *কানজুল উম্মাল*, খ.০৩, পৃ.৩৪৪, হা.৬০৮৬।

৫.মূল আরবী[إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ, হাদীস নং২৭৪২।

৬ . মূল আরবী [إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩৩৬।

৭. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস : আয়াত ২৪।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : আয়াত ২০।

৯. আল-খাতীব আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*(বৈরুত:আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫হি.), কিতাবুর রাক্বায়িক, হা.নং ৫১৫৭[মুসলিম হা.২৯৫৭]।

১০ . মূল আরবী [لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا من شربة ماء] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩২০।

পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তির পরিণাম মারাত্মক। এটা ব্যক্তিকে দুনিয়া ও লোভ-লালসার দাসে পরিণত করে। লোভ-লালসা ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধকে ক্রমে বিলোপ সাধন করে। এর ফলে মানুষ দুনিয়ায় কিছু সুখ-সম্ভোগ লাভ করলেও আখিরাতের সফলতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে যা তাকে আখিরাতে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইরশাদ হচ্ছে[১]

(مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ- أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।"

(مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ)

"যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে বৃদ্ধি করে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না।"[২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন[৩]–(فَأَمَّا مَن طَغَى- وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا- فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) "অনন্তর যে সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস।"

পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত আখিরাত বিমুখতা সৃষ্টি করে। এ মর্মে সুফিয়ান ইবন উয়ায়না রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, তার হৃদয় থেকে আখিরাতের ভীতি দূর করে দেয়া হয়"।[৪]

আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা: ঈমানী ব্যাধি, বিশ্বাসগত দুর্বলতা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থেকে সৃষ্ট অনিষ্টের অন্যতম আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। এটি এমন এক মন্দ বিষয়, যা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংকীর্ণ দুনিয়ামুখী করে ফেলে। এ কারণে মানুষের নিকট পার্থিব জীবনের উন্নতি, সমৃদ্ধি, সফলতা ও সুখ-সম্ভোগ মুখ্য হয়ে ওঠে। এজন্য মানুষ সবকিছু করতে প্রস্তুত হয় এবং নৈতিকতার প্রশ্ন তাদের নিকট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার এই বাস্তবতা বর্তমান মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে আজকের মুসলিম জাতি বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত। পার্থিব জীবনের সুখের মোহচ্ছন্নতা তাদের পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতিকে ক্ষীণ করে ফেলেছে। দুনিয়ার প্রতি আসক্তি তাদের আখিরাত ব্যাপারে গাফিল করে দিচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন[৫] (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)"তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।"
এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "ধ্বংস হোক! দীনার ও দিরহামের (টাকা-পয়সার) গোলামরা। তাদের এ সব কিছু দেয়া হলে তারা সন্তুষ্ট থাকে, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।"[৬]

ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন আখিরাতের তুলনায় তুচ্ছ ও অতি নগণ্য। কিয়ামতের দিন মনে হবে দুনিয়ার জীবন এক সন্ধ্যা বা এক সকালের ক্ষণকাল।[৭] তাই চিরস্থায়ী আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন চরম নির্বুদ্ধিতা। এজন্য মু'মিন আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করবে না। সে দুনিয়াকে নিজের করায়ত্ত করবে কিন্তু নিজেকে দুনিয়ার করায়ত্তে যেতে দেবে না। এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে[৮]–وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ- "আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।" অন্যত্র এসেছে[৯] (قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً)-"বল, পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তার জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমানও যুলুম করা হবে না।"

আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার ক্ষতি অপূরণীয়। এজন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন–[১০]

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ- وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)

"যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস! সেখানে আমরা যে ত্রুটি করেছি তার উপর।' তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! আর দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না?" অন্যত্র বলেন[১১]

---

১ .আল-কুরআন, সূরা হূদ : আয়াত ১৫-১৬।
২.আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা: আয়াত ২০ ,আল-কুরআন ১৭:১৮।
৩.আল-কুরআন, সূরা আন-নাযি'আত : আয়াত ৩৭-৩৯।
৪. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৭, পৃ.২৬৮।
৫. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম : আয়াত ০৭।
৬.মূল আরবী [تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হা.নং ২৭৩০|
৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নাযি'আত ৭৯: আয়াত ৪৬।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত : আয়াত ৬৪।
৯. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ৭৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম : আয়াত ৩১-৩২।
১১. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত ১০-১৪।

(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ- يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ- يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ)

"ধ্বংস হোক মিথ্যাচারীরা! যারা সন্দেহ–সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'প্রতিদান দিবস' কবে'? 'যেদিন তাদের অগ্নিতে শাস্তি দেয়া হবে'।"

অন্যদিকে, আখিরাতের প্রতি তৎপরতা বান্দার জন্য বহুবিদ সৌভাগ্য বয়ে আনে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[১]

যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য চিন্তান্বিত হন আল্লাহ তার অন্তরের মধ্যে প্রাচুর্য দান করেন। তার যাবতীয় প্রয়োজন সংগ্রহ করে দেন এবং তার বৈষয়িক সুখ-সুবিধাও তাকে পুরোপুরি দিয়ে দেন। পক্ষান্তরে, যার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা কেবল দুনিয়াকে কেন্দ্র করে, আল্লাহ তার দারিদ্র্য তার দু'চোখের সামনেই রেখে দেন, তার প্রয়োজনাবলী ছিন্ন ভিন্ন করে দেন। আর দুনিয়ায় সে ততটুকু লাভ করে, যতটুকু তার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তার বেশী একটুও নয়।

দুনিয়ার আসক্তি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতার কারণ: ক.সমাজের সর্বত্র পার্থিব সফলতাকে অধিক গুরুত্ব দান করা। খ.ক্ষমতা, প্রতিভা, ভালো পদে চাকুরী, ধন-সম্পদ, বাড়ী-গাড়ী ইত্যাদি পার্থিব অর্জনকে সফলতা ও মর্যাদার মানদণ্ড গণ্য করা। গ.মৃত্যু ও আখিরাতের কথা ভুলে যাওয়া। ঘ.অজ্ঞতা, ভ্রান্ত ধর্মীয়বিশ্বাস ও আখিরাতের প্রতি ইয়াকীনে ঘাটতি।

দুনিয়ার আসক্তি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা থেকে মুক্তির পন্থা: ক.দুনিয়া পূজারীদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। খ.মৃত্যু ও আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করা। গ.দুনিয়ার অসারতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করা। ঘ.নিয়মিত কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান চর্চা ও নিষ্ঠা সহকারে 'আমল। ঙ.পূর্ববর্তীদের পরিণাম চিন্তা করা এবং সৎকর্মশীলদের সাহচর্য।

❑. আত্মহত্যা, বিকলাঙ্গ ও চেহারা-আকৃতি পরিবর্তন :

স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশ করাই আত্মহত্যা। আত্মহত্যা হল–"যে মৃত্যুতে মানুষ নিজেই নিজের জীবন নিঃশেষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।"[২]

আত্মহত্যা জীবনের একটি অস্বাভাবিক অবসান। এটা জীবন থেকে এক প্রকার পলায়নী মনোবৃত্তি। এর মাধ্যমে নিজের প্রতি অবিচার করা হয়। জীবন চলার পথে দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, অভাব-অনটন, সামাজিক ধিক্কার ইত্যাদি অবমাননাকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে আত্মগ্লানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ আত্মহত্যার আশ্রয় নেয়। কিন্তু আত্মহত্যা কোন সমস্যা সমাধানের পন্থা নয়। আত্মহত্যা সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করে তোলে। আত্মহত্যার প্রবণতা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অর্থহীন করে তোলে। এক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে সাহসিকতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ইত্যাদি সদগুণাবলী প্রকাশিত না হয়ে ভীরুতা, কাপুরুষতা, হীনমন্যতা, জীবন বিমুখতা ইত্যাদি অসদগুণাবলী প্রকাশিত হয় বলে আত্মহত্যা ধর্ম ও নৈতিকতা বিরোধী। এজন্য তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে[৩]– وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا "আর তোমরা নিজদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। যে কেউ সেটা করবে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে, অচিরেই আমি তাকে প্রবেশ করাব আগুনে।"

ইসলামী নৈতিকতার দাবী জীবনের কঠিন বাস্তবতা মুকাবিলায় ব্যক্তি যেন সাহসী ও সুদৃঢ় থাকে। ইসলাম জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে জীবন থেকে পালায়নের অনুমতি কাউকে দেয় না। তাই আত্মহত্যা কিংবা জীবন ধ্বংসকারী কাজ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪] وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।"

আত্মহত্যা পরিবার ও সমাজের জন্য একটি আতঙ্ক। সাধারণত আত্মহত্যায় মহিলাদেরকেই বেশী অংশ নিতে দেখা যায়। এতে সে বিবাহিত ও সন্তানের মা হলে তার উপর নির্ভরশীলরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে একটি অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রে সমাজে আত্মহত্যাকারীর পরিবার-পরিজন সামাজিকভাবে হেয় হতে দেখা যায়। এতে শুধু আত্মহত্যাকারীর পরিবার ও স্বজনেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং এ কারণে সমাজ ও দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিও আসে। কারণ আত্মহত্যাকারীর কাছ থেকে সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে যে সেবা পেতো বা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আত্মহত্যার বড় একটি ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের নৈতিক ব্যবস্থার উপর গিয়ে পড়ে। এতে সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আত্মহত্যার মত ঘটনায় ধর্ম ও নৈতিকতার অনুশীলন-অনুশাসন শিথিল হয়, নিজকে ভালোবাসার সৌন্দর্যবোধে ঘাটতি আসে, জীবনবোধে সংকীর্ণতা দেখা দেয় এবং বিবেকবোধ কার্যকারিতা হারায়।[৫]

আত্মহত্যার পরকালীন পরিণতিও অতি মন্দ। কেউ যাতে আত্মহত্যায় প্ররোচিত না হয় সেজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৬] –

যে ব্যক্তি পাহাড় হতে নিজকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তি নিজকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করল, আর সে তাতে চিরকাল থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে, সে ব্যক্তি এমন হবে যে, তার হাতে বিষ

[১]. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার বাক্বায়িক ওয়াল ওরা'আ, হাদীস নং ২৪৬৫।

[২] .মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *আত্মহত্যার আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ.৯ [সমাজ বিজ্ঞানী এমিল ডুরখেইম প্রদত্ত সংজ্ঞা]।

[৩] .আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' : আয়াত ২৯-৩০।

[৪] .আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ১৯৫।

[৫].মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭।

[৬].মূল আরবী[من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا) *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তিব, হা.নং ৫৪৪২; *মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.১০৯।

থাকবে এবং জাহান্নামের আগুনে সে সর্বদা বিষ পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোন ধারাল অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে তার হাতে ঐ ধারাল অস্ত্র থাকবে আর সে তার পেটে তা দ্বারা সর্বদা আঘাত করতে থাকবে।

আত্মহত্যার কারণ: বিভিন্ন কারণে আত্মহত্যা ঘটে থাকে। যেমন- হতাশা, বিষন্নতা, হীনমন্যতা, আত্মগ্লানি, ধর্ষণ, অবৈধ যৌনসম্পর্ক ও গর্ভধারণ, প্রেমে ব্যর্থতা, যৌতুক, নারী নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা, নিজ জীবন ও সমাজের প্রতি ঘৃণা-বিতৃষ্ণা, সামাজিক ধিক্কার, দারিদ্র্য-বেকারত্ব, দুরারোগ্য ব্যাধির যন্ত্রণা, মানসিক আঘাত ইত্যাদি।

আত্মহত্যা থেকে মুক্তির পথ: মানব জীবন সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতামূখর এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে জীবন চলার পথে প্রাপ্ত দুঃখ, দুর্দশা, বাধা-বিপত্তি, হতাশা, ব্যর্থতা, সামাজিক ধিক্কার ইত্যাদি ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করা। সচেতনতা সৃষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ, ঘৃণ্য কর্ম থেকে বেঁচে থাকা, আত্মহত্যার ক্ষতি ও পরকালীন পরিণতির কথা চিন্তা করা।

বিকলাঙ্গ ও চেহারা-আকৃতি পরিবর্তনকরণ: প্রাক ইসলামী যুগে কুসংস্কাচ্ছন্ন আরবরা বিভিন্ন কুপ্রথা সমাজে চালু করেছিল। যেমন, তারা পশুর কান ছিদ্র করত বা ফেড়ে দিত। তারা নানাভাবে আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করত। এ সব মূলত শয়তানী কর্ম। বর্তমান সমাজে এ সব কুপ্রথা বিদ্যমান। অনেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্লাষ্টিক সার্জারী ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চেহারার পরিবর্তন সাধন করে। এতে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে মহিলার আকৃতি এবং মহিলাকে পুরুষের আকৃতি গ্রহণ করতেও দেখা যায়। এটা শুধু অনৈতিকই নয় বরং জঘন্য শয়তানী কর্ম। এছাড়া অনেক সমাজে দুস্কৃতিকারীরা অনাথ-আশ্রয়হীন পথশিশুকে বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নামিয়ে অর্থ উপার্জন করে, যা চরম অনৈতিক, গর্হিত ও অমানবিক কাজ। এ ধরনের সব শয়তানী কর্ম ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ মর্মে কুরআন বলা হয়েছে[১] - وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا "(শয়তান বলে) এবং অবশ্যই তাদেরকে(মানুষ) আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।" অন্যত্র বলা হয়েছে[২]– لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"

❑.চারিত্রিক দুর্বলতা, মন্দ স্বভাবের আধিক্য, দুর্বল চিত্ততা ও অসৎ সংকল্প:

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের মধ্যে কতগুলো নৈতিক সদ্‌গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, যা ব্যক্তিকে ভালো ও সঠিক পথের উপর দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে– এ সব গুণাবলী না থাকা এবং যে সব গর্হিত স্বভাব মানুষের মধ্যে থাকাই উচিত নয় তার আধিক্যই চারিত্রিক দুর্বলতা।

স্বভাবজাতভাবে মানুষের মধ্যে কিছু মন্দ দিক রয়েছে। আল-কুরআন মতে, তা হলো- অস্থিরচিত্ততা, তাড়াহুড়াপ্রবণতা[৩]' সীমালংঘনপ্রবণতা, অকৃতজ্ঞতা,[৪] কলহপ্রিয়তা,[৫] হা-হুতাশকারী, সংকীর্ণমনা, কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, ঐশ্বর্যলোভী, কল্যাণের প্রতি ঈর্ষাপ্রবণ, ইত্যাদি।[৬] এসব প্রকৃতিগত স্বভাবগুলোকে কুরআন নিন্দিত বলে চিত্রিত করে মানুষকে তা বর্জনের তাকিদ দিয়েছে। এগুলো নিয়ন্ত্রণ না করলে মানুষ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মে জড়িত হতে পারে। এ মর্মে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে[৭]- (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا-) "নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিশয় কৃপণ।" অন্যত্র এসেছে-[৮] (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নি'আমত আস্বাদন করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'আমার থেকে বিপদ-আপদ দূর হয়ে গেছে, আর সে হবে অতি উৎফুল্ল, অহঙ্কারী।

মন্দ স্বভাবের আধিক্য মানুষের মধ্যে চরিত্রিক দুর্বলতার জন্ম দেয়। চারিত্রিক দুর্বলতার চরম পর্যায়ে মানুষ চরিত্রহীন হয়ে যায়। চরিত্রহীনতা মানুষের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দেয়। চারিত্রহীন ব্যক্তিরা নিজেকে ছাড়াও সমাজ জীবনকে নানাভাবে কলুষিত করে। এজন্য কুরআনে এর নিন্দায় বলা হয়েছে-[৯] (وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) "এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলূষাচ্ছন্ন করবে।" এ মর্মে হাদীসেও কঠোর সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[১০] –"ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা আলাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকারী, ও অসৎ চরিত্রের অধিকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১১৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম : আয়াত ৩০।
[৩]. আল-কুরআন ২১ : ৩৭, (৭০:১৯), ।
[৪]. আল কুরআন, ৪৫: ২৩, ৪৭:১৪, ১৬; ২৫ : ৪৩-৪৪, ৫৩ :১৯-২৩; ২০:১৬; ৬:১৫০, ১০০:০৬।
[৫]. আল-কুরআন (১৮:৫৪)।
[৬]. আল-কুরআন (১০: ১২,২১-২৩) (১৭:৬৭) (১১:০৯-১০) (৪১:৫০-৫১) (১৭: ১১,১০০), (৮৯:২০), (৯:৩৩), ৪৮:২৮), (৬১:৯), ১০০:০৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ৭০ : আয়াত ১৯-২১।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা হূদ : আয়াত ১০।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শাম্‌স : আয়াত ১০।
[১০]. মূল আরবী [لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري الغليظ الفظ] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮০১।

বস্তুত প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাবের কুপ্রভাব রয়েছে। মন্দ স্বভাবগুলো মানুষের মধ্যে নৈতিক পদস্খলন ও মন্দ চরিত্রের বিস্তার ঘটায়। মানুষের মধ্যে তা মন্দত্ব বৃদ্ধি করে এবং ভালো স্বভাব মিটিয়ে দেয়। এজন্য উমার রা. বলেন[১]– "*কোন যুবকের মধ্যে নয়টি উত্তম স্বভাবের সাথে যদি একটি মাত্র গর্হিত স্বভাব স্থান পায় তবে সব ক'টি ভালো স্বভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে।*"

অসৎ চিন্তা-সংকল্প: চিন্তা-সংকল্প মানুষের কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভালো চিন্তা মানুষকে কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে, মন্দ চিন্তা ও সংকল্প মানুষকে খারাপ কাজে ধাবিত করে। ইসলামে মানুষের কমের্র ফলাফল তার সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। তাই ইসলাম মানুষকে মন্দ চিন্তা ও সংকল্প করতে নিষেধ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে-[২]

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
>
> "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে উত্তম বস্তু তোমরা ব্যয় কর এবং তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।"

উদ্ধৃত আয়াতে মন্দ চিন্তা-সংকল্পকে অনৈতিক ও গর্হিত গণ্য করে মানুষকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

❑.ভীরুতা ও কাপুরুষতা (الجبن):

ভীরুতা ও কাপুরুষতা হল, যেখানে সুদৃঢ় থাকা ন্যায়সঙ্গত সেখানে অন্তরের দুর্বলতা প্রদর্শন করা।এটা সাহসিকতার বিপরীত।

ভীরুতা ও কাপুরুষতা নিন্দনীয় গুণ। এ মন্দ গুণ মহৎ কাজ সম্পাদনের পথে অন্তরায়। এরূপ ব্যক্তিরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারে না। এটা ঈমানের পরিপন্থী। এটা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায়। কেননা ভীরুরা সত্য প্রতিষ্ঠা, সত্যের পক্ষ অবলম্বন, বাতিলের রিরোধিতা ও অন্যায় প্রতিহত করতে সক্ষম হয় না। এটা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৩] ভীরুতা ও কাপুরুষতা দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ। এটা নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীরুরা বিপর্যয় ও পরাজয় ডেকে আনে। মানুষের মধ্যে যখন ভীরুতা ও কাপুরুষতা ব্যাপক মাত্রায় থাকবে, তখন মানুষ দ্বীন ও ঈমানের জন্য ত্যাগ ও কুরবানি দিতে প্রস্তুত থাকবে না। যুল্ম, নির্যাতনের ভয়ে হক অবলম্বন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সাহস পাবে না। আর তাদের মধ্যে সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব দেয়ার লোক না থাকার কারণে তাদের মধ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করার মত নেতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে তা জাতির অধঃপতন বয়ে আনবে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]–

> فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى
>
> অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না'? বল, 'দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম।

ভীরুতা ও কাপুরুষতা মুসলিম ব্যক্তিত্বে বেমানান। কোন মু'মিনের মধ্যে এ মন্দ গুণ থাকতে পারে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়[৫]– وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ "মানুষের মধ্যে কতক বলে আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা নিগৃহীত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে।" অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌র পথে নিপীড়নকে মুনাফিকদের অসহনীয় ও ভীতিকর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
ভীরুতা ও কাপুরুষতা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। এ সম্পর্কে নাবী সা. বলেন[৬], "দ্বীনদারী ও সৎকর্ম ছাড়া কোন মানুষ সম্মানিত হতে পারে না। আর ব্যক্তি নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য অশ্লীল, নির্লজ্জ, কৃপণ ও কাপুরুষ হওয়াই যথেষ্ট।"

আজকের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায়-অপকর্ম ও দুর্নীতি-দৃস্কৃতির যে সয়লাব তা বাধঁহীন গতিতে চলছে। দৃস্কৃতিকারীরা তার অন্যায় কর্ম স্বাচ্ছন্দ্যভাবে করে যাচ্ছে। এর পেছনে তেমন কোনো বাঁধা আসছে না। সমাজের ভালো মানুষগুলোর নৈতিক শক্তি ও সাহসের অপর্যাপ্ত, অনৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি দৃস্কৃতিকারীকে অপরাধ ও অন্যায় করতে সাহস যোগায়। এভাবে অপরাধ, অপকর্ম নির্বিঘ্নে চলার কারণে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও অপরাধ চরম আকার ধারণ করে।

যে সব কারণে ভীরুতা ও কাপুরুষতা হয়ে থাকে তার প্রধান কারণ হলো- দুনিয়াপ্রীতি, স্ত্রী-সন্তানের মায়া, লোভ-লালসা, মৃত্যুর ভয়, ঈমানী দুর্বলতা ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,[৭]

---

১. মূল আরবী [وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ، فيفسد الخلق] ইবনু কাছীর(রহ), *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ.০৩, পৃ.১৯৩।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৭,আরও দেখুন আল কুরআন০৪:০২, ০৪: ০৫।।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব: আয়াত ৯-১১।
৪ . আল কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ : আয়াত ২৩, আরও দেখুন, আল কুরআন ৪৭:১৪, ১৬; ২৫ : ৪৩-৪৪, ৫৩ :১৯-২৩; ২০:১৬; ৬:১৫০।
৫ . আল কুরআন, সূরা আল-'আনকাবুত ২৯ : আয়াত ১০, আরও দেখুন, আল কুরআন ০৯:৫৭, ৩৩:১৬, ।
৬ .মূল আরবী[ليس لأحد فضل الا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل ان يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৪, পৃ.১৪৫, হাদীস নং ১৭৩৫১।
৭ . *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল মালাহিম, হাদীস নং ৪২৯৭।

এমন একটি সময় আসবে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোকরা এমনভাবে আক্রমণ করে বসবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী লোকেরা খাবার পাত্রের উপর আক্রমণাত্মকভাবে বসে থাকে। এ কথা শোনে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের সংখ্যা কম হবে ? তিনি বললেন, না, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। তবে তোমরা বন্যার পানির উপরিভাগে ভাসমান খড়কুটার মত হবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবে। আর তোমাদের অন্তরে 'ওহান' ঢেলে দেবে। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওহান' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মুহাব্বাত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

ভীরুতা-কাপুরুষতা প্রতিরোধে করণীয়: বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় ঈমান, তাকদীরে আস্থাশীল থাকা, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, তাঁর নিকট দু'আ করা, পার্থিব জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি, আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়া ও সাহসীদের সান্নিধ্যে থাকা।

❑. অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ, হঠকারিতা, কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা ও অসহিষ্ণুতা (الغضب):

ক্রোধ হচ্ছে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা মানুষের হৃদয়ের উপর উঁকি মারে। আগুন যেমন ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন করে তেমনি ক্রোধের আগুন অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে প্রচ্ছন্ন থাকে।[১]

ক্রোধের তিনটি স্তর আছে। ক.স্বল্পতার স্তর। ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ না হওয়া, যেমন: কুফর ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ বা জেদ না থাকা খুবই অন্যায়। খ. বাহুল্যের স্তর। যেমন: ক্রোধ এত প্রবল যে, জ্ঞানবুদ্ধি, ধর্মের আনুগত্য ও শাসন ডিঙ্গিয়ে যাওয়া। গ. ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যবর্তী স্তর। যেমন–ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ দেখে ক্রোধ প্রকাশ।[২] এ ধরনের ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রশংসনীয়, যা প্রত্যেক মু'মিনের থাকা অপরিহার্য [এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ " কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তদের প্রতি কঠোর হও।"
ক্রোধের স্বল্পতা ও বাহুল্য নিন্দনীয়। মধ্যবর্তী স্তরটি কাম্য। যার ক্রোধশক্তি বিলুপ্তপ্রায় তার উচিত আপন নফসের চিকিৎসা করা যাতে ক্রোধ শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে, যার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ তার উচিত আপন নফসের চিকিৎসা করা যাতে ক্রোধ মধ্যবর্তী পর্যায়ে নেমে আসে।[৪]

অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ, অন্যায় জিদ ও হটকারিতা এক ধরনের খারাপ বৃত্তি। অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা ও নির্বুদ্ধিতা থেকে এর উদ্ভব ঘটে। এটা শয়তানের হাতিয়ার এবং বিভিন্ন অনিষ্টের চাবি। এর থেকে বিভিন্ন অনিষ্টের জন্ম হয়, যা অনেক মানুষকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। ক্রোধের প্রভাবে ব্যক্তি অকথ্য ও অশ্লীল গালি-গালাজ করতে থাকে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ক্রোধের আতিশয্যে মানুষ মারামারি, আত্মহনন, যখম, হত্যা ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ক্রোধ সমাজে দ্বন্দ্ব, কলহ, অশান্তি, ফিতনা-ফাসাদ ও ঘৃণা-বিদ্বেষের জন্ম দেয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসংযত ক্রোধ ও হটকারিতা জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয়, দুর্ভোগ ও অশান্তি বয়ে আনে। এই নিন্দনীয় গুণ ব্যক্তির ভালো গুণাবলীকে ম্লান করে ফেলে। ক্রুদ্ধ অবস্থায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় ফলে বিভিন্ন অনৈতিকতা ও মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়। অসংযত ক্রোধ ও জিদ মানুষকে কুফরীতে নিমজ্জিত করে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]– (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) "যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিল, জাহিলী যুগের আহমিকা।"
–এ আয়াতে আল্লাহ কাফিরদের এ কারণেই নিন্দা করেছেন যে, তারা অন্যায় জেদ ও অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা ও কুফরীর উপর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এজন্যই ইসলাম অন্যায় ক্রোধ ও জিদ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়েছে।
হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর নিকট উপদেশ চাইলো। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন[৬], 'রাগ করো না।' লোকটি আরও কয়েকবার উপদেশ চাইলো। রাসূল সা. বারবার বললেন, 'রাগ করো না।'

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বাহ যথার্থই বলেছেন–কুফরের চারটি স্তম্ভ আছে,(তা হলো)–ক্রোধ, কুপ্রবৃত্তি, নির্বুদ্ধিতা ও লোভ-লালসা।[৭] জনৈক আলিম বলেছেন, চারটি আচরণের মধ্যে কুফর নিহিত। রাগের মধ্যে, কামনা-বাসনার মধ্যে, আসক্তির মধ্যে এবং ভয়-ভীতির মধ্যে। তন্মধ্যে আমি নিজে দু'টো দেখেছি। এক ব্যক্তিকে দেখেছি সে রেগে গিয়ে তার মাকে খুন করে ফেলেছিল। আরেক ব্যক্তিকে দেখেছি প্রেমের টানে খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিল।[৮]

ক্রোধ, জিদ ও হটকারিতা মানুষের সত্য গ্রহণের সক্ষমতা বিলোপ সাধন করে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে। কাফির ও ইহুদীরা জিদ ও হটকারিতার দরুন সত্য লাভে অসমর্থ্য হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৯]– وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ "আর তারা বলে, 'তুমি আমাদেরকে যার প্রতি

---

১ .আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.১৬৪।
২ .দেখুন. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৭-১৬৯।
৩ .আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ : আয়াত ৭৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪৮:২৯।
৪ .দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৭-১৬৯।
৫ . আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্হ: আয়াত ২৬।
৬ . *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫৭৬৫।
৭ . **মূল আরবী** [للكفر أربعة أركان الغضب والشهوة والخرق والطمع] আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০৩, পৃ. ১৬৬।
৮ . **মূল আরবী** [الكفر في اربعة اشياء في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة] ইবনুল জাওযী, *যাম্মুল হাওয়া*, তাহকীক, মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ(মাকতাবাতুশ শামিলাহ) পৃ. ২৪।
৯. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ: আয়াত ০৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:৯১।

আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত,আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা আর তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়। অতএব তুমি (তোমার) কাজ কর, নিশ্চয় আমরা (আমাদের) কাজ করব।"

জিদ ও হটকারিতা ইহ ও পরকালে শুধু ক্ষতিই বয়ে আনে। এই মন্দ স্বভাবের দরুণ মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[১] (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) "আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না'।"
ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, মানুষ তিনটি দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১) সন্দেহ, যা তাকে আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে (২) প্রবৃত্তি, যা তাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উপর আপন স্বেচ্ছাচারিতাকে উস্কে দেয় (৩) ক্রোধ, যা তার মাঝে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে।[২]

ক্রোধ, রূঢ়তা, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ও অসহিষ্ণুতা মন্দ চরিত্রের নিদর্শন ও বহিঃপ্রকাশ। অহঙ্কার, দম্ভ, গৌরব, আত্মতুষ্টি, নিজের ব্যাপারে উচু ধারণা ইত্যাদি থেকে ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা জন্ম হয়। মানব সমাজে এসব হিংস্রতা, অমানবিকতা, অশান্তি ও বিভেদের জন্ম দেয়। এটা মহান আল্লাহ, ফিরিশতা ও মানুষের অসন্তোষ সঞ্চার করে। এগুলো নানা অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্যের কারণ এবং আল্লাহর রহমত, হিদায়েত ও কল্যাণ লাভের অন্তরায়। এসব মন্দ গুণের নিন্দা করে মহান আল্লাহ বলেন[৩] –(فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) "দুর্ভোগ! সেই ব্যক্তিদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।" অন্যত্র বলেন[৪], وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ "আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।"

ক্রোধ, রূঢ়তা, নির্দয়তা ও অসহিষ্ণুতা মানুষকে দয়া, কোমলতা, মানবিকতা ও সহমর্মিতার মত মহৎ গুণ থেকে বঞ্চিত করে। এ সব মন্দ গুণ শুধু মহান আল্লাহ নিকট মন্দ ও অপছন্দনীয় নয়, বরং মানব সমাজেও তা অগ্রহণযোগ্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ "যদি তুমি রুঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশ-পাশ হতে সরে পড়ত।" এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"কঠোর হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ থেকে সবচেয়ে দূরে।"[৬] অন্যত্র বলেন–"যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়।"[৭] তিনি আরও বলেন, "হৃদয়হীন ও দুর্ভাগা ব্যক্তির উপর থেকে রহমত ছিনিয়ে নেয়া হয়।"[৮]
ক্রোধ, রূঢ়তা, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতার পরকালীন পরিণাম অতি মন্দ। আবূ মাসউদ (রা.) বলেন, আমি আমার এক ক্রীতদাসকে প্রহার করছিলাম এমন সময় আমি আমার পিছন থেকে বলতে শুনলাম, হে আবূ মাসউদ! জেনে রেখো তুমি তোমার ক্রীতদাসের উপর যত শক্তিশালী আল্লাহ তোমার উপর তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। পিছনে আমি তাকিয়ে দেখি রাসূল (সা.)। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত দিয়ে দিলাম। রাসূল (সা.) বলেন, 'যদি তুমি তা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে গ্রাস করতো'।[৯]
ফুদাইল ইবনু ইয়ায রহ. (মৃ.১৮৭হি.) বলেন, "পাঁচটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। অন্তরের কঠোরতা, চোখের নিশ্চলতা(কান্না না আসা), নির্লজ্জতা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্খা।"[১০]

ক্রোধ, জিদ, হটকারিতা, কঠোরতা, রূঢ়তা, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা ও অসহিষ্ণুতা দূরীকরণের উপায়:
ক). যখন বেশী ক্রোধ দেখা দেয় তখন বসে পড়া অথবা শুয়ে পড়া। যদি তাতে তা দূর না হয় তবে ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করা। কেননা ক্রোধ একটি শয়তানী প্রবণতা। শয়তান আগুন থকে সৃষ্টি হয়েছে। আর পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। খ). ক্রোধ, হটকারিতা, কঠোরতা, নির্দয়তা ও অসহিষ্ণুতা দমনে সাধনা করা এবং তা দমন করার সাওয়াব অনুধাবন করা। গ). চুপ থাকা, অনর্থক বেশী কথা থেকে বিরত থাকা, কেননা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অধিক কথা অন্তরকে কঠিন করে দেয়।[১১] ঘ). অন্তরে কোমলতার জন্য দরিদ্র ও ইয়াতীমদের খাওয়ানো এবং তাদের খোঁজ-খবর রাখা। ঙ). রাগের সময় শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া, আউযুবিল্লাহ পাঠ করা।

---

[১] . আল-কুরআন,সূরা আল-মুল্‌ক : আয়াত ১০।
[২] . ইবনুল ক্বাইয়িম , *আল-ফাওয়ায়েদ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৩ হি.) খ.০১, পৃ.৫৮।
[৩] .আল-কুরআন,সূরা আয্‌-যুমার : আয়াত ২২; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২:৭৪; ৫:১৩ ৬:৪৩, ২২:৫২-৫৩,
[৪] .আল কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : আয়াত ১৬।
[৫] .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৫৯ ।
[৬] .মূল আরবী [وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৪১১।
[৭] .মূল আরবী [من يحرم الرفق يحرم الخير] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৯২।
[৮] . মূল আরবী [لا تنزع الرحمة إلا من شقي] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯২৩।
[৯] . *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আইমান, হাদীস নং ১৬৫৯।
[১০].মূল আরবী[خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب و جمود العين و قلة الحياء و الرغبة في الدنيا و طول الأمل] বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ. ০৬, পৃ.১৪৮, রিওয়ায়েত নং ৭৭৪৭।
[১১] .মূল আরবী [لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৪১১।

❑.অকৃতজ্ঞতা:

অনুগ্রহকারী বা উপকারকারীর উপকার স্বীকার করার নামই কৃতজ্ঞতা, আর এর বিপরীত অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞতা আরবীতে বলা হয় কুফর(كفر)। অকৃতজ্ঞতা দু'ধরনের হতে পারে। ক). স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা, খ).সৃষ্টির প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

ক).স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা: নাস্তিকতা, শিরক, কুফর তথা আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত সত্যে অবিশ্বাস ইত্যাদি হলো স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা। অনেক নাস্তিক ও অমুসলিমের মধ্যেও কিছু নৈতিক গুণ দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষই তাদের নীতিবান ও মহৎ গণ্য করে থাকে। কিন্তু যারা তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত সত্য অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে, এবং সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ দাঁড় করায় ও সর্বদা তার অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে –তার চেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ ও অনৈতিক মানুষ আর কে হতে পারে! আবার অনেকে স্রষ্টা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তাঁর প্রদত্ত নি'আমত যেমন সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিভা, ইত্যাদিকে নিজের অর্জন মনে করে দম্ভ ও অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করে। এসবই স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অনৈতিক। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে-[১] (إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ)-নিশ্চয় মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।

খ).সৃষ্টির প্রতি অকৃতজ্ঞতা: অনেক অপর থেকে প্রাপ্ত উপকার, অনুগ্রহ, অবদান ভুলে যান কিংবা স্বীকার করেন না। এ সব সৃষ্টির প্রতি অকৃতজ্ঞতা। অনেক মানুষের মধ্যে এই অনৈতিক গুণ দেখা যায়। যেমন- দরিদ্র পরিবারের কেউ কেউ উচু পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলে নিজ দরিদ্র স্বজনদের ভুলে যান বা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে চান না, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক।

উভয় অকৃতজ্ঞতাই কুফরের অংশ। সৃষ্টির মধ্যে অকৃতজ্ঞতা সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট করে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট হয়। স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দুর্ভাগ্য ও অকল্যাণের কারণ। এর পরিণাম ধ্বংস। এ অকৃতজ্ঞতার কারণে নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করেন। এর ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও নি'আমতে হ্রাস ঘটে। তাই মহান আল্লাহ বলেন[২]–وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"

……

ব্যক্তিগত পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশের অন্তরায় এবং অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। উপরে বর্ণিত বিষয়াবলী মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশ এবং উত্তম চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই ব্যক্তি জীবনে উন্নত নৈতিকতা অর্জন এবং উত্তম চরিত্র ও আচার-আচরণের অধিকারী হতে হলে মানুষকে উল্লেখিত মন্দ ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: পারিবারিক জীবনে বর্জনীয় বিষয়সমূহের বর্ণনা:

পরিবার[৩] মানুষের আদি সংস্থা। পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র শাখা হলেও সুষ্ঠু সমাজ গঠনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটা মানব সন্তানের চরিত্র গঠন, সুনাগরিক তৈরী, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ও ভাঙ্গনের ফলে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত হয়। পরিবার সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন না করলে সুনাগরিক তৈরী ও সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব নয়। ত্রুটিপূর্ণ পরিবার ব্যবস্থা, পারিবারিক অব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক ভাঙ্গন নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টির জন্য বহুলাংশে দায়ী। তাই যে সব বিষয় পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে নিম্নে বিষয়গুলো আলোকপাত করা হলো–

❑. বৈরাগ্যবাদ (الرهبانية), বিবাহ বা দাম্পত্য জীবনে অনীহা ও সামর্থ্যবানদের বিলম্বে বিবাহ:

বৈরাগ্যবাদ, সন্ন্যাসবাদ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ রাহবানিয়্যাত (رَهْبَانِيَّةً) যার অর্থ বিবাহ-সংসারে অনাসক্তি।[৪] বিবাহের অনীহা ও সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধতাই বৈরাগ্যবাদ।

ইসলাম জৈবিক চাহিদা ও প্রকৃতির দাবিকে বিকৃত করতে কিংবা অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। বৈরাগ্যবাদ আল্লাহ প্রদত্ত কোন বিধান নয়, বরং এটা মানুষ প্রবর্তিত। কিন্তু কোন কোন ধর্ম ও সমাজ এটাকে অনুমোদন দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে–যারা পোপ বা পাদ্রী কিংবা সাধু-সন্নাসী হন তাদের ক্ষেত্রে বিবাহ একটি নিষিদ্ধ কর্ম গণ্য করা হয়। সেখানে অনেকে তার জৈবিক তাড়না নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অন্যায় পথে পা বাড়ান। তাই আজকাল গীর্জার পাদ্রী-পুরহিত কর্তৃক নারী-শিশু বলাৎকার, সমকাম এবং সন্নাসী-ঠাকুর কর্তৃক মন্দিরে নারী ধর্ষণ অহরহই

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আদিয়াত: আয়াত ০৬।
[২]. আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম ১৪: আয়াত ০৭।
[৩]. সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে–বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে গোষ্ঠী তাই পরিবার। কিন্তু ইসলামে পরিবারের পরিসর আরো ব্যাপক। সেখানে শুধু স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মধ্যেই পরিবার সীমাবদ্ধ নয় বরং পিতা-মাতা ও ছোট ভাই-বোন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
[৪]. আরবী-বাংলা অভিধান, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৬) খ.০১, পৃ.১০৫৮।

ঘটতে দেখা যায়। অথচ বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে এই অনৈতিককর্মসমূহ বন্ধ করা সম্ভব। পাদ্রী-পুরহিত কর্তৃক উদ্ভাবিত বৈরাগ্য রীতি মানব প্রকৃতি ও নৈতিকতা বিরুদ্ধ কাজ। এটা তারা ভালো উদ্দেশ্যে প্রচলন করলেও মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ায় তারা তা রক্ষা তা করতে সামর্থ্য হয়নি। এজন্যে কুরআনে বলা হয়েছে-[১] (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءِ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) "আর সন্ন্যাসবাদ, এটা তো তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। এটা আমি তাদের ওপর লিপিবদ্ধ করে দেইনি; অথচ তারা তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেনি।"

উল্লোখিত আয়াতে বৈরাগ্যবাদকে সম্পূর্ণ মনগড়া বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ কিংবা তাঁর কোন নাবী-রাসূল এই অস্বাভাবিক বিধান মানুষকে দেননি। পাদ্রী, বৈরাগী ও সন্নাসী শ্রেণীর কিছু লোক এটাকে তৈরী করে নিয়েছে, কিন্তু স্বভাব বিরুদ্ধ এই রীতি তারা রক্ষা করতে পারেনি, তাই মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন ।

বৈরাগ্যবাদ বা অন্যায়ভাবে যৌনপ্রবৃত্তি দমনের কুফল সম্পর্কে ভয়ানক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ই. এইচ. লেকী বলেন–[২]

> তেইশতম জন বিশপ খোদ্ নিজ মা-বোনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। কন্ট্রোবেরীর লাট পাদ্রী ১১৭১ খৃষ্টাব্দে একই স্থানে সতেরটি অবৈধ সন্তানের জন্ম দেন। স্পেনের পাদ্রী ১১৩০ খৃষ্টাব্দে সত্তরটি দাসী রক্ষিতা রাখেন। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে হেনরী তৃতীয় সেশরের পাদ্রী ষাটটি অবৈধ সন্তান জন্ম দেন। এ কালের পাদ্রীরাও এ ব্যাপারে কম নয়। তাদের ব্যভিচারের কাহিনীরও ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। অস্পৃশ্যদের আশ্রম আর আশ্রম ছিলো না, বরং তা ছিল ব্যভিচার, ব্যভিচার ও পাপাচারের বীভৎস আখড়া ও অবৈধ সন্তানের লীলা। ব্যভিচার ও পাপাচারের উন্মাদনায় মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ও গাইর মাহরামের (যাদের সাথে বিবাহ হারাম নয়) বাছ-বিচারও উবে গিয়েছিল। নিজ মা-বোন থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে পাদ্রীদের জন্য বারংবার আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।... খোদ ত্রানকর্তাদেরই ছিলো এই অবস্থা! তারাই ছিলেন সর্বাধিক দূরাচারী ও পাপিষ্ঠ। ... কিন্তু কেন? বস্তুত এ ছিল সেই বিবাহ ব্যবস্থারই নিষেধাজ্ঞার বিষময় ফল। বিবাহের মত প্রাকৃতিক ও পবিত্র প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করাই ছিলো সমস্ত নষ্টের মূল।

এই অবস্থা শুধু ইউরোপ, আমেরিকা বা ভারতে সীমাবদ্ধ নয় বরং যেখানে এই বৈরাগ্যবাদ চালু হয় সেখানেই কমবেশী একই ফলাফল দেখা গিয়েছে।[৩]

ইসলাম মানব প্রকৃতির সহজাত ধর্ম। ইসলাম মানুষের যৌনপ্রবৃত্তিকে যেমন অস্বীকার করে না, তেমনি বল্গাহীনভাবে যৌনচাহিদা পূরণের কোন অনুমতি দেয় না। এই উভয়েই ব্যক্তি ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। তাই ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন অনুমোদন নেই।[৪] বরং ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে বৈধভাবে যৌনচাহিদা পূরণের সাথে সাথে প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, অন্যের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য ও সমাজের জন্য বহুমুখী কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। এজন্যই ইসলাম বৈরাগ্যবাদে নিরুৎসাহিত করে বিবাহে উৎসাহ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৫] فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً "তোমরা বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন, অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।"

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, যখন উসমান ইবন মাযঊন (রা) স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুলাহ সা. তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া রাসূলালাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না। রাসূল (সা.) বলেন-[৬] আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো (নফল) সিয়াম পালন করি, কখনো করি না, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। *যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।"*

স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে বিবাহ না করার অনেক অপকারিতা রয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবনু নাফীস বলেছেন, 'শুক্র প্রবল হয়ে পড়লে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে। মন ও মগজের দিকে তা এক প্রকার অত্যন্ত খারাপ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত করে, যার ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়া, মৃগী জাতীয় রোগ সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাধি সৃষ্টি হয়'।[৭]

আজকাল বিভিন্ন সমাজে পারিবারিক জীবনের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবাধ একত্রে বাস ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে (লিভ টুগেদার)। এটা সম্পূর্ণ অনৈতিক। এতে বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে উপেক্ষা করা হয়, যা পাবিরারিক জীবনের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা। এটা মানব সমাজের জন্য অশনি সংকেত। এর ফলে মানব জাতি শুধু পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হবে না, বরং ভবিষ্যত মানব জাতি বড় ধরনের নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : আয়াত ২৭।

[২]. W.E.H.Lecky, *History of European Morals*,উদ্ধৃত, সাইয়েদ হামেদ আলী,*একাধিক বিবাহ*,অনু মু.হাসান রহমতী,(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী,১৯৯৬), পৃ.৪১।

[৩] .দেখুন, যে কোন বৈরাগ্যবাদের ইতিহাস গ্রন্থ। অতুল সূর রচিত 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস'ও সাইয়েদ হামেদ আলী রচিত 'একাধিক বিবাহ' গ্রন্থে এ বিষয়ে মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

[৪]. মূল আরবী [لا رهبانية في الإسلام] ইমাম বাগাভী, *শরহুস সুন্নাহ*, কিতাবুত তাহারাত, খ.০২, পৃ.৩৭১।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৩।

[৬]. আব্দুল্লাহ দারিমী, *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭হি.), খ.০২, পৃ. ১৭৯, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ২১৬৯।

[৭]. উদ্ধৃত, মাওলানা আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ.৮৫।

সামর্থ্যবানদের বিলম্বে বিবাহ : বাল্যবিবাহ যেমন ক্ষতিকর তেমনি প্রাপ্ত বয়স্কদের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিলম্বে বিবাহও ক্ষতিকর। এটা চারিত্রিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এর ফলে অনেকে ব্যভিচার ও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। আর একবার কারো নৈতিক স্খলন ঘটলে তার জন্য বিপথের দ্বার উন্মোচন হয় এবং সুপথে ঠিকে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই নৈতিক পবিত্রতা রক্ষায় প্রাপ্ত বয়সে সামার্থ্যবানদের দ্রুত বিবাহ সম্পাদন একটি জরুরী বিষয়। কিন্তু আজকাল প্রাপ্ত বয়স্কদের বিলম্ব বিবাহ করা একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে–যা সমাজকে নানাভাবে কলুষিত করছে।

বর্তমান সমাজে উচ্চ শিক্ষা, চাকুরী লাভ ও নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নামে যৌবন অতিবাহিত করে এমন সময়ে বিবাহ করছে যখন বিবাহ সমাজের রীতি রক্ষার উপলক্ষ্য মাত্র। এর ফলে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা জৈবিক চাহিদা পূরণে অবৈধ প্রেম-প্রণয়, পরকীয়া, ব্যভিচার, বিবাহ বহির্ভূত একত্রে বাস(লিভ-টুগেদার), সমকাম ও গর্ভপাতসহ নানা অনৈতিক কর্মে অবাধে জড়িয়ে পড়ছে। আজকাল সমাজে এরূপ ঘটনা অহরহ দেখা যাচ্ছে। অথচ কুরআনে প্রাপ্ত বয়স্কদের অবিলম্বে বিবাহ নির্দেশ দেয়া হয়েছে[১] – وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ "আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ সম্পাদন কর। তারা অভাবী হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।"
-যারা অস্বচ্ছলতার অজুহাতে বিবাহ বিলম্ব করেন এই আয়াতে বিবাহকে তাদের স্বচ্ছলতার উপায় হিসেবে গ্রহণের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।

❑. বিবাহ কেন্দ্রিক কুসংস্কার ও অনৈতিকতা :

পারিবারিক জীবন গঠন প্রাথমিক ধাপ বিবাহ। নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা, বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও বৈধ পন্থায় বংশ বিস্তারে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। সময়মত বিবাহ, সঠিক সঙ্গী নিবাচন, বিবাহ পরবর্তী স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার রক্ষা ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে নৈতিকতা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

বিবাহ বৈধভাবে যৌনচাহিদা পূরণের একমাত্র পবিত্র মাধ্যম। আল-কুরআন বিবাহকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার(মীছাকুন গালীযা) বলা হয়েছে।[২] এটা হলো নর-নারীর পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার একটি বলিষ্ট অঙ্গীকার। এটা এমন এক ধরনের অঙ্গীকার যার নিহিত আছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, সুখ-শান্তি ও স্বস্তি-তৃপ্তি পরিপূর্ণতা।[৩] কিন্তু আজকাল সমাজে প্রতরণাপূর্বক ভুয়া বিবাহ, গোপন বিবাহ, সাময়িক আনন্দ লাভের জন্য মুতা বিবাহ, যৌনবাসনা পুরণের জন্য যুবক-যুবতীর সাক্ষীবিহীন বিবাহের স্বীকারোক্তি, সামার্থ্যহীনদের একাধিক বিবাহ এবং বিবাহের পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয়া, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমান আচরণ না করা, বিভিন্ন প্রলোভনের বিনিময়ে বিবাহের পর কেটে পড়া এবং তুচ্ছ কারণে বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদির ফলে বিবাহ যেন একটি খেল-তামাশার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে -যা সম্পূর্ণ অনৈতিক।

ইসলাম আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এতে দাম্পত্য অশান্তি দেখা দেয়। এতদসত্ত্বেও বর্তমান সমাজে অনেক অসামর্থ্যবান যুবককে যৌতুক নিয়ে বিবাহ করতে দেখা যায়, তারা স্ত্রী-সন্তান ভরণ-পোষণ সহ মৌলিক দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় না। এজন্য কুরআন বলেছে[৪]- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ "আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" নাবী সা. বলেন-[৫], "তোমাদের মধ্য যার বিয়ে করার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম।"

আজকাল নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিবাহের পূর্বে ছেলে-মেয়েরা আড্ডা, একসাথে ঘুরাঘুরি, ফোনালাপ ও প্রেম করে তারপর বিবাহ করে। এক্ষেত্রে অনেকে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এমনকি ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। এভাবে তারা দাম্পত্য জীবনের শুরু করে জঘন্য পাপ ও নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে। এই অনৈতিকতার কুপ্রভাব পড়ে নিজেদের ও সন্তানদের জীবনে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন হয়ে যায় অপবিত্রময়। অথচ ইসলাম পর্দা ও নৈতিকতা রক্ষা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।[৬] এ ধরনের অপকর্ম বৈবাহিক পবিত্রতা, গাম্ভীর্যতা ও বিবাহের গুরুত্বকে হালকা করে দিচ্ছে।

ইসলাম জীবন সঙ্গী পছন্দের ক্ষেত্রে দ্বীনদারী ও নৈতিকতা গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূল সা. বলেন, 'তুমি দ্বীনদার মহিলাকেই প্রাধান্য দাও, নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[৭] চরিত্রহীন সুন্দরী সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে,

---

[১]. আল- কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩২।
[২]. আল- কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ২১।
[৩]. আল- কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০ : আয়াত ২১।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩৩।
[৫].মূল আরবী [ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৭৭৮, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং ১৪০০।
[৬]. দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩০-৩১।
[৭].মূল আরবী [تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং৪৮০২; *মুসলিম*, হা. ১৪৬৬।

‘নিকৃষ্ট বংশের সুন্দর নারী থেকে বেঁচে থাক’।[১] কিন্তু আজকাল তা উপেক্ষা করে অর্থ-সম্পদ, সৌন্দর্য, চাকুরী, পদমর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদিকে অধিক গুরত্ব দেয়া হয়। আজ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে অর্থ-সম্পদ, সৌন্দর্য, ডিগ্রী, চাকুরী, পদমর্যাদা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ ছেলেরা সুন্দরী ও সম্পদশালী অধার্মিক মেয়েকে আগ্রহ সহকারে বিবাহ করছে, অন্যদিকে মেয়েরাও সম্পদশালী ও ভালো চাকুরীজীবী অধার্মিক ছেলেকে কোন আপত্তি করছে না। বর-কনে উভয় পক্ষই দ্বীনদারী ও নৈতিকতা অপেক্ষা অর্থ-সম্পদ, সৌন্দর্যকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকওয়া মানুষের নিকট গুরুত্বহীন হয়ে গেছে।[২] আজকাল সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহের ক্ষেত্রে বর বা কনের ব্যাপারে বিভিন্ন ভুয়া তথ্য দেয়া হয় অথবা অনেক বাড়িয়ে বলা হয়, অনেকে জোরপূর্বক মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে বিবাহ করে ইত্যাদি সব অনৈতিক, যা নানা ধরনের সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

দাম্পত্য জীবন শান্তিময় করার জন্য বিবাহে বর-কনের মধ্যে সমতা রক্ষার বিধান দিয়েছে। আজ অনেক ক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করে ধর্মিকতা, বয়স ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকে অসম বিবাহ করার ফলে দাম্পত্য অশান্তি ও তিক্তময় হয়ে উঠে, এমনকি এতে কারো কারো সংসারও ভেঙ্গে যাচ্ছে। আবার এর বিপরীতে নিজের অপছন্দ সত্ত্বেও পিতামাতা বা অভিভাবকের পীড়াপীড়িতে তাদের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে অনেক বিবাহ করে থাকেন। এটাও অন্যায় ও অনৈতিক। এতে দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় অশান্তি হয়। এজন্য বিবাহের পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক পছন্দের বিষয় ইসলাম যেমন গুরুত্ব দিয়েছে,[৩] তেমনি এক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিও নিতে বলেছে।

আজকাল বিবাহে বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার পালন যেমন, নাচ-গান, ব্যাণ্ড পার্টি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে থাকে। একদিকে তা ইসলামী সংস্কৃতি পরিপন্থী।[৪] বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যাপক অপচয় করে থাকে–যার ব্যয়ভার বহন অনেক পরিবারের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, এটাও ইসলামে নিষিদ্ধ।[৫] বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা বলতে ইসলামে কিছু নেই। এটা বহিরাগত ঐতিহ্য।[৬] বিবাহ ওলীমা ভোজে বেছেবেছে ধনীদের দাওয়াত দেয় হয় এবং কোন কোন সমাজে ওলীমায় উপহার গ্রহণ করা হয়, যা ইসলামের রীতি বিরুদ্ধ ও অনৈতিক। এছাড়া মুসলিম সমাজে বিবাহগুলোতে এখন অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা ব্যাপকতা লাভ করেছে, যা সম্পূর্ণ হারাম (অবৈধ)।

বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদাপূরণ বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কুরআন স্ত্রীর সাথে যৌনাচরণকে শস্যক্ষেত্রে গমনের সাথে তুলনা করে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করার অনুমতি দিয়েছে।[৭] কিন্তু মাসিক চলাকালে ও গুহ্যদ্বার দিয়ে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ।[৮] অনেকেই এ নির্দেশ উপেক্ষা করে তাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান উপেক্ষা করে বড় গুনাহতে লিপ্ত হচ্ছে।

মাহর[৯] স্ত্রীর একটি মৌলিক অধিকার, যা প্রদান করা স্বামীর জন্য ফরয। কিন্তু আজকাল অনেক সমাজের মধ্যে বিবাহে মোটা অংকের মোহর বাঁধা হয়, কিন্তু তা আদায় করা হয় না। বাকীতে মোহর পরিশোধ করার অনুমোদিত হলেও নগদ প্রদান করাই উচিত। কিন্তু অধিকাংশ স্বামী তার স্ত্রীর এ অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। অনেকে কৌশলে মোহর মাফ করিয়ে নেয়, কিন্তু এতে তা মাফ হয় না। এ ধরনের ছলচাতুরী করে মাফ করিয়ে নেয়া সম্পূর্ণ অনৈতিক। মোহর আদায়ে কুটকৌশল বা তালবাহান গর্হিত কাজ। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে[১০]-[أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان] “কোন ব্যক্তি যদি তার উপর ধার্যকৃত দেনমোহর– চাই কম হোক, আর বেশী হোক – তা না দেওয়ার ইচ্ছা করে এবং তা না দিয়ে স্ত্রীকে ধোঁকা দেয়, অতঃপর সে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিন যিনাকারী হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।”

ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে। কাকে বিবাহ করা যাবে, আর কাকে বিবাহ করা যাবে না– ইসলামে এটা সুস্পষ্ট।[১১] কিন্তু অনেকেই তার পরওয়া করছে না। আজ স্ব-স্ব ধর্ম বহাল রেখে অমুসলিম-মুসলিমের মধ্যকার বিবাহ হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ [আল-কুরআন ০২:২২১]। এ বিষয়গুলো পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিক বন্ধনকে শিথিল করে দিচ্ছে। এ সব পরিবারের সন্তানেরা পরস্পর বিপরীতমুখী মূল্যবোধ ধারণ করার কারণে মূল্যবোধে ক্ষেত্রে বিকৃত সাধন করছে।

---

১. ড.আল-হুসাইনী হাশিম, ড. সা‘দ যাল্লাম ও অন্যান্য,*ইসলামে শিশু পরিচর্য (আল-মানহাজুল ইসলামী লি-রি‘আয়াতিল আতফাল)*, অনু.ড.এ.বি. বফিক আমেদ ও মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩) পৃ.২৩। [হাদীসটির মূল সূত্র, দারে কুতনী ও দায়লামী]

২. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১৩।

৩. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ৪: আয়াত ০৩।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ৬: আয়াত ১৫২, আল কুরআন ৭:৩৩।

৫ .আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ৪: আয়াত ৩১, আল কুরআন৬:১৪১।

৬. ড.মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি,*ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ*, অনু.শেখ এনামুল হক (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট,১৯৯৮), পৃ.১১৩।

৭. আল-কুরআন,০২:২২৩।

৮. আল-কুরআন ০২:২২৩।

৯. বিবাহবন্ধন উপলক্ষে স্বামী বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রীকে যে নগদ অর্থ, সোনা-রুপা বা স্থাবর সম্পত্তি আকারে যে মাল প্রদান করে তা-ই মহর।*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রাগুক্ত*,পৃ.৪০১।

১০. আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু‘জামুল আওসাত*, (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.), খ.০২, পৃ.২৩৭, হা.নং ১৮৫১।

১১. মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়, দুগ্ধ-মাতা, দুধ-ভগ্নী, শাশুরী, গর্ভজাত কন্যা, ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী, দুই বোনকে একত্র করা এবং অন্যের বিবাহিত স্ত্রী নিষিদ্ধ। [আল-কুরআন ৪:২৩-২৪] এছাড়া মুশরিক ও কাফিরদের সাথে বিবাহ ইসলামে নিষিদ্ধ। [২:২২১, ৬০:১০]

❑.দাম্পত্য কলহঃ

বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক কিছু দায়িত্ব বর্তায়। এর উপর নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি। কিন্তু পারস্পরিক এই সব দায়িত্বের প্রতি উদাসীনতা থেকে সূত্রপাত হয় মনোমালিন্য ও দাম্পত্য কলহের। দাম্পত্য কলহ স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে অশান্তিময় করে তোলে। দাম্পত্য কলহে অনেক স্বামী তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে এবং স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। আবার অনেক স্ত্রী তার স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করে। দাম্পত্য কলহ চরম পর্যায়ে পৌঁছলে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য কলহ তীব্র আকার ধারণ করলে বড় ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়। এর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে স্বামী-স্ত্রীসহ সন্তানদের জীবনেও। তাই ইসলাম শান্তিময় দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পরস্পারিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার আদায় রক্ষার তাকিদ দেয়।

বিভিন্ন কারণে দাম্পত্য কলহ হতে পারে। তবে বেশীর ভাগ দাম্পত্য কলহ স্বামী-স্ত্রীর যে কোন একজন বা উভয়ের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তবে সাধারণত স্বামীর পক্ষ থেকে যে সব কারণে দাম্পত্য কলহ হয়ে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অসামর্থ্যবানদের একাধিক বিবাহ, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বৈষম্য ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানে গরিমসি, স্ত্রী প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনীহা, শাশুড়ীদের নির্যাতন, যৌতুক, পরকীয়া ইত্যাদি।এ সব দাম্পত্য কলহ নিরসনে কুরআন বলেছে[১] (عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)"তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে।" এই আয়াতের তাফসীরে 'আলুসী বলেন-[২]

> 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।'–এখানে সদ্ভাবে অর্থ হল এমনভাবে যা শরী'আত ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ও অন্যায় নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য কথা ও কাজে সুন্দরতম আচরণ এবং একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ সহকারে ভরণ-পোষণ ও অংশ বন্টন। এই সদ্ভাবে মধ্যে এ কথাও শামিল যে, স্ত্রীকে প্রহর করবে না, তার সাথে খারাপ কথা বলবে না এবং তার সাথে সদা হাসিমুখে সন্তুষ্টচিত্তে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।

এছাড়া অসামর্থ্যবানদের স্বচ্ছলতা আসার পর বিবাহ করা। একাধিক বিবাহ থেকে বিরত থাকা। সামর্থ্যবানদের যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় তবে সেক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা। সামর্থ্য না থাকলে কিংবা দাম্পত্য জীবনে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে না পারলে একাধিক বিবাহ না করা। মহান আল্লাহ বলেন-[৩]

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যেও না এবং অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখও না, যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

স্ত্রী পক্ষ থেকে সাধারণত যে সব কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল-স্বামীর অবাধ্যতা, স্বামীর অনুপস্থিতি তার সম্পদ ও সন্তানাদির দেখাশুনা না করা, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি। এ অনাচাররোধে কুরআন বলেছে[৪]–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

"পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পূণ্যবতী নারীরা অনুগতা, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিণী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ্ হিফাযাত করেছেন। " -উদ্ধৃত আয়াতে স্বামী ও স্ত্রীকে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পারস্পরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলা হয়েছে। বস্তুত এর মাধ্যমে শান্তিময় দাম্পত্য জীবন গঠন এবং অধিকাংশ দাম্পত্য কলহ নিরসন সম্ভব।

আজকাল অনেক স্বামী বিবাহের পর নববধু বা যুবতী স্ত্রীকে রেখে বছরের পর বছর দীর্ঘ প্রবাসে থাকেন। এটা খুবই অন্যায়। এতে স্ত্রীর প্রতি চরম অবিচার করা হয়। এ কারণে অনেক প্রবাসী ব্যক্তির স্ত্রী পরকীয়া ও অনৈতিক সম্পর্কের দিকে যায়। এজন্য ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক চার মাসের অধিককাল স্ত্রী থেকে দূরে থাকা কোনভাবেই সমীচীন নয়।

দাম্পত্য কলহরোধে করণীয়: স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, নিজ নিজ কর্তব্য পালন, অসামর্থ্যবানদের একাধিক বিবাহ থেকে বিরত থাকা, একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফপূর্ণ আচরণ, স্ত্রীর ন্যায়সংগত ভরণ-পোষণ প্রদান, যৌতুক ও পরকীয়া রোধ।

❑. পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিবাহ বিচ্ছেদ (الطلق):

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান ছাড়াও পিতা-মাতা ও ছোট ভাই-বোন মুসলিম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আজকাল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পরস্পরের জন্য স্বার্থত্যাগ, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মানসিকতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ ও আরাম-আয়েশ অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতার ফলে পারিবারিক ভাঙ্গন বেড়ে যাচ্ছে। আজ পিতা-মাতার অধিকারের প্রতি অধিকাংশ সন্তানেরা বড় উদাসীন। বিভিন্ন সমাজে আজ বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধদের আশ্রমে বাস করতে হচ্ছে। আবার পাশ্চাত্য দেশ ছাড়াও অনেক পিতা-মাতাও তাদের আরাম-আয়েশ ও সুখ-ভোগকে অগ্রাধিকার দিতে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৯।
[২]. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *তাফসীর রূহুল মা'আনী*, খ.০৪ (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), পৃ.২৪৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪:১২৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৪।

গিয়ে সন্তানের ব্যাপারে উদাসীন থাকছে। ফলে পিতা-মাতার স্নেহ বঞ্চিত থেকে শিশুরা অনাথ বা শিশু আশ্রমে প্রতিপালিত হচ্ছে। এর ফলে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়েছে, মানবীয় গুণাবলীতে ধ্বস নামছে, নৈতিক স্খলন ও কিশোর অপরাধজনিত সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে যৌন স্বেচ্ছাচার, পারিবারিক ভাঙ্গন ও মাদকাসক্তি। এতে সামাজিক সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

পারিবারিক ভাঙ্গনের একটি বিশেষ কারণ তালাক। দাম্পত্য কলহ যখন স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে দুর্বিষহ করে ফেলে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্তময় হয়ে যায় এবং একে অপরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সম্পর্কচ্ছেদ বা তালাক অনিবার্য হয়ে পড়ে। তালাক ইসলামে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ হলেও এ ব্যাপারে ইসলাম বরাবরই নিরুৎসাহিত করে। কারণ তালাকের নেতিবাচক ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এর কুপ্রভাব শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনেই পড়ে না, বরং এতে সন্তানাদিসহ সমগ্র পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্ত্রী বা স্বামীর মানসিক কষ্ট, সামাজিক বঞ্চনা ছাড়াও তাদের সন্তানদের জীবন চরম অনিশ্চয়তা ও সংকটের মুখে পড়ে যায়। এ সব ভঙ্গুর পরিবারের সন্তানদের বড় অংশ পারিবারিক তত্ত্বাবধানের অভাবে বিভিন্ন অন্যায়ে ও অবক্ষয়ে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজ নানা অনাচার বেড়ে চলছে। এজন্য ইসলাম একসাথে তিন তালাক প্রদান নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়, তালাকের পূর্বে স্ত্রীকে তিন স্তরে সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে। প্রথমত: উপদেশ দান; এতে কাজ না হলে দ্বিতীয়ত, বিছানা আলাদা; এতেও কাজ না হলে তৃতীয়ত, মৃদ প্রহারের অনুমতি দিয়েছে।[১] এতেও কাজ না হলে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের পক্ষ থেকে দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমাঝোতার জন্য পারিবারিক পর্যায়ে সালিসের ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।[২] দাম্পত্য কলহ যখন চরম তিক্তকর ও দুর্বিষহ পর্যায়ে পৌঁছে এবং দাম্পত্য জীবনে প্রেম-ভালবাসা ও সুখ-শান্তির কোনই সম্ভবনা না থাকে কেবল তখনই ইসলাম তালাকের অনুমতি প্রদান করে। ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে নয়, তাই কুরআনে পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন কেবল স্ত্রীর খারাপ দিকটা না দেখে তার ভালো দিকসমূহ বিবেচনা করে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[৩] –فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا আর যদি তোমরা তাদের(স্ত্রী) কে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।

আজকাল ছোটখাটো দাম্পত্য কলহের কারণে যে আশঙ্কাজনক হারে বিবাহ বিচ্ছেদের বাড়ছে, তা রীতিমত এক উদ্বেগ জনক বিষয়। এর ফলে বিবাহ বন্ধন তুচ্ছ বন্ধনে পরিণত হয়েছে। পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর একশ্রেণীর বিকৃতরুচির, হীনস্বার্থপর ও কুচক্রী নারী-পুরুষ স্বামী বা স্ত্রী কুপ্ররোচনা দিয়ে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি ও বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য উস্কানি দিয়ে থাকে। এতে বিপথগামী হয়ে অনেকে স্বামী বা স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করে থাকে। এটা জঘন্য অনাচার। এ ধরনের মন্দ কাজে লিপ্ত সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, “*যে ব্যক্তি কারও স্ত্রী বা দাস-দাসীকে, তার স্বামী বা মনিবের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।*” [৪]

বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাকে অনৈতিকতা:: দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট-খাট মতপার্থক্য ও কলহ হতে পারে। কিন্তু সামান্য বিবাদের কারণে রাগের বশবর্তী হয়ে এক সাথে তিন তালাক আজকাল অহরহ সমাজে দেখা যায়, যা অন্যায় এবং ইসলামী নীতিমালার শিষ্টাচার বহির্ভুত। আবার অনেকে তালাক না দিয়ে স্ত্রীকে দীর্ঘদিন বর্জন করে থাকে। এ সবই সম্পূর্ণ অন্যায় ও অনৈতিক। পূর্বেই বলা হয়েছে তালাকের ব্যাপারে ইসলাম সুচিন্তিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তিনটি স্তর অবলম্বন করতে বলেছে। কোন কারণে যদি তালাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেক্ষেত্রে তা উত্তমভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে বলা হয়েছে-[৫]

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“তালাক দু’বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই।”

অনেক স্বামী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাদেরকে বিবাহের সময় প্রদান করা সম্পদ নিতে দেন না। আবার কেউ কেউ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহে বাঁধা সৃষ্টি করে থাকেন–এ সবই অন্যায়। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৬]

يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ لاَيَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْض مَاآتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

---

[১]. আল-কুরআন সূরা আন্-নিসা’ ০৪: আয়াত ৩৪।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ০৪: আয়াত ৩৫।

[৩]. আল-কুরআন সূরা আন্-নিসা’ ০৪: আয়াত ১৯।

[৪]. মূল আরবী [ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ২১৭৫।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৯।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ০৪:১৯-২০।

"হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন। আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীকে বদলাতে চাও আর তাদের কাউকে তোমরা প্রদান করেছ প্রচুর সম্পদ, তবে তোমরা তা থেকে কোন কিছু নিও না। তোমরা কি তা নেবে অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে? "

উদ্ধৃত আয়াতে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে অমানবিক আচরণ, অপবাদ দিয়ে তাকে প্রদত্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া অথবা তাকে ন্যায় সংগত অধিকার বঞ্চিত করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আজকাল শরীয়া সম্মত তিন তালাক প্রদানের পর আবার সেই স্ত্রীর সাথে সংসার করতেও দেখা যায়। এটা ইসলামী নীতি পরিপন্থী, সম্পূর্ণ হারাম কাজ ও কবীরা গুনাহ। [আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩০]

তালাকের কারণ: দাম্পত্য কলহ, নির্যাতন, দাম্পত্য কলহ মীমাংসায় অসহিষ্ণু মনোভাব, বিবাহ পূর্ব প্রেম, পরকীয়া, ইত্যাদি।

তালাকের প্রতিকার: স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, পারস্পরিক অধিকার রক্ষা, দাম্পত্য কলহ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ বর্জন ও বিবাহের পূর্বে পরস্পর সম্পর্কে ভালোভাবে জানা, দাম্পত্য কলহ মীমাংসার ব্যবস্থা।

❑. হিল্লা বিবাহ (التحليل):

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চূড়ান্তভাবে তিন তালাক সংঘটিত হলে তাহলে তারা পরস্পরের জন্য হারাম হয়ে যায়। তবে তারা যদি পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় সেক্ষেত্রে ইসলাম শুধু একটি পন্থা বাতলে দিয়েছে। তা হলো, এই স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ করতে হবে। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের সেই স্বামী শরীয়াহ সম্মতভাবে যদি তাকে তালাক দেয়, তবে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। এটাই তাহলীল বা হিল্লা। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-[১]

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

"অতএব যদি স্বামী তাকে তালাক দেয় তাহলে সে (উক্ত) স্বামীর জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন একজন স্বামী সে গ্রহণ না করে। অতঃপর সেই স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের অপরাধ হবে না যে, তারা একে অপরের নিকট ফিরে আসবে, যদি দৃঢ় ধারণা রাখে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে।"

উল্লেখিত আয়াতে এটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের সেই স্বামী যদি শরীয়াহ সম্মতভাবে তালাক দেয়, তবে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। কিন্তু আজকাল সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্বামী রাগের মাথায় অনেকে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। পরে সন্তান-সংসারের কথা চিন্তা করে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় বিবাহ করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা বিশেষ ব্যক্তির সাথে কোন কিছুর বিমিয়ে চুক্তি করে যে, এই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহের এক রাত পরেই যেন তালাক দেয়। এভাবে পূর্বের স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করে। এটা কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও অনৈতিক কাজ। এটা এক ধরনের প্রতারণা। এতে বিবাহের মত পবিত্র সম্পর্ককে অশ্রদ্ধা করা হয়। এতে মহান আল্লাহর কিতাবের সাথে তামাশা করা হয়। এজন্য এ ধরনের কাজে 'যে ব্যক্তি হালালকারী হয় এবং যার জন্য হালালকারী হয় তাদের উভয়কে রাসূল সা. লা'নত করেছেন।[২]

হিল্লার কারণ: দাম্পত্য জীবনে অসহিষ্ণুতা, কথায় কথায় তালাক, দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইত্যাদি।

প্রতিকারে করণীয়: তালাকের ব্যাপারে সতর্কতা, দ্বীনী মৌলিক জ্ঞানার্জন, সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিকভাবে প্রতিরোধ ইত্যাদি।

❑.সন্তান-সন্ততির প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবহেলা ও উদাসীনতা:

সন্তান-সন্ততি মানুষের মূল্যবান সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ও পবিত্র আমানত। উপযুক্তভাবে লালন-পালন ও উত্তম শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই আমানত ও সম্পদের সুরক্ষা করতে হয়। কিন্তু অনেক পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ সন্তানের উত্তমভাবে লালন-পালন ও সঠিক শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাকে। ফলে সন্তান বিপথগামী হয়ে যায়। বিপথগামী সন্তান নানা ধরনের অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়, যা পরিবার ও সমাজের জন্য দুর্ভোগ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কুরআন এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে-[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে রক্ষা কর।" কুরআনে আরও বলা হয়েছে-[৪],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

-إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ-

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩০।

[২].মূল আরবী [لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحلل والمحلل له] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৯৩৪ ও১৯৩৫।

[৩]. আল-কুরআন,সূরা আত-তাহ্রীম ৬৬: আয়াত ০৬।

[৪]. আল-কুরআন,সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ১৪-১৫।

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী–স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা তাদের মার্জনা কর, তাদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহাপুরুস্কার।" অন্যত্র আরও বলেন[১], قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ-"ক্ষতিগ্রস্থ তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও উত্তম নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উদাসীনদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসেও সতর্কতা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[২]–"*কোন ব্যক্তির পাপাচারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যাদের লালন-পালনের ভার তার উপর ন্যস্ত তার উদাসীনতার কারণে তারা বিনষ্ট হয়ে যায়।*"

❑.পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য:

পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয়েই আল্লাহর দান। এ ব্যাপারে কারো নিজস্ব কোন ইখতিয়ার কার্যকরী নয়। তথাপিও আদি কাল থেকে অদ্যাবধি নানা কারণে[৩] মানুষ পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কন্যা সন্তানের জন্মে অসন্তুষ্ট হন এবং মানসিক অশান্তি ও হীনমন্যতায় ভুগে থাকেন। কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করে তার প্রতি অবহেলা ও বৈষম্য করে থাকেন। প্রাক ইসলামী যুগের অসভ্য আরবের মানুষের মত আজকের কথিত সভ্য সমাজের মানুষের মধ্যেও এটা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, আজকের কথিত আধুনিক সভ্য পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে ভারতে মাতৃগর্ভে কন্যা সন্তানের উপস্থিতি নিশ্চিত হলে গর্ভপাত করা হয়। এ তো প্রাক ইসলামী যুগে আরবের কন্যা সন্তানের জীবিত কবর দেয়ার মতই। সে যুগের মত আজকের সমাজে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অনেক পিতার কন্যা সন্তানের জন্মের কথা শুনলে মুখ মলিন করে ফেলে। কন্যা সন্তানের প্রতি এই অনৈতিক ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র তুলে ধরে কুরআনে বলা হয়েছে-[৪] وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়।"

ইসলাম এই ঘৃণ্য অমানবিক ও অনৈতিকতা কঠোর নিষিদ্ধ করে কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই গণ্য করেছে।[৫] হাদীসে বরং তিন বা দুই জন কন্যা সন্তান বা বোনেকে উত্তমভাবে লালন-পালন করে সৎপাত্রস্থ করা পিতাকে জান্নাতে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।[৬] তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা কন্যা বা বোন এমনকি নিজ স্ত্রীর প্রতিপালনের জন্য ব্যয়িত অর্থকে সাদাকা গণ্য করেছে।[৭] কুরআনে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করতে গিয়ে একটি সূরার নামকরণ করেছে 'আন-নিসা'(নারী)।

সুদূর অতীত থেকেই নারীরা অর্থনৈতিক ও উত্তারাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল। হিন্দু সমাজে বিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নারীর উত্তারাধিকারের বিধান ছিল না। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের এ অধিকার চালু হলেও অতীতে তা ছিল না। অথচ আল-কুরআন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই নারীদের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও উত্তারাধিকার সুনিশ্চিত করেছে। সমাজে অর্থনৈতিক ও উত্তারাধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে নীতিহীনতা ও বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ সমাজে কন্যা সন্তানদের উত্তারাধিকার সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় অথবা সম্পদের নাম মাত্র কিছু মূল্য দিয়ে তাদের সম্পদ জবরদখল করা হয়। এটা নীতি গর্হিত ও সম্পূর্ণ অবৈধ। এসব অনাচারের প্রতিবাদে এবং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৮]–لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا "পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে।"

উদ্ধৃত আয়াতে মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের সম্পদে পুরুষদের মত নারীদের যে অধিকার রয়েছে তা বলিষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে গরিমসি করা কিংবা নারীদের ঠকানো বা বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও গর্হিত অপরাধ।

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নাহ্ল ৩৯: আয়াত ১৫।

[২]. মূল আরবী [كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৯২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ৯৯৬।

[৩]. যে সব কারণে কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্য করা হয়: মেয়েরা শত্রুর মোকাবিলা, ক্ষেত-খামারে কাজ, অর্থ উপার্জন করতে পারে না, উপরন্তু তাদেরকে বিয়েতে যৌতুক দিতে হয়, বিবাহের পর মেয়েরা পরিবারের তেমন কোন উপকারে আসে না, ইত্যাদি।

[৪]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ৫৮, আল কুরআন (৪৩:১৭)।

[৫]. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩২, আল কুরআন (০৬:১৫১) (১৭:৩১) (০৪:০৭)।

[৬]. মূল আরবী [من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة/ ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫১৪৭, ৫১৪৮।

[৭].দেখুন, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, হা. নং ২৫৯১।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৭।

ইসলাম সন্তানদের প্রতি ভালবাসা, অর্থ ব্যয়, দান ইত্যাদি সব ব্যাপারে সমতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। সম্পদের ব্যাপারে পুত্র-কন্যা বৈষম্যের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[১]–"যে ব্যক্তি ওয়ারিশের অংশ ছিন্ন করে দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতের মীরাস ছিন্ন করে দিবেন।"

ইসলাম নারীদের ঠকিয়েছে বলে তথাকথিত একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা অভিযোগ করেন। তারা এটা প্রচার করেন যে,–"ইসলাম নারীদের উত্তারাধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার না দিয়ে অর্ধেক দিয়ে তাদেরকে ঠকিয়েছে। যারা এ অভিযোগ করেন তারা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা ইসলামে বিবাহপূর্বে একজন নারীর ভরণ-পোষণ সহ যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করেছে তার পিতা কিংবা তার অভিভাবকের উপর আর বিবাহ পরবর্তীতে এ দায়িত্ব দিয়েছে তার স্বামীর উপর। ফলে এ ব্যবস্থায় একজন নারীর অর্থনৈতিক ব্যয় তেমন নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, একজন পুরুষকে স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ছাড়াও তার পিতা-মাতা, বিধবা-তালাকপ্রাপ্ত বোন সহ আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই সংগত কারণে ইসলাম সম্পদের উত্তারাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিগুণ এবং নারী একগুণ সম্পদ দিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলাম নারীদের ঠকিয়েছে বলে যারা অভিযোগ করেন তাদের জানা উচিত যে, প্রাকইসলামী যুগে আরব সমাজে নারীদের যখন কোন অধিকার ছিল না, তখন ইসলাম তাঁর যাত্রার শুরুতেই নারীদের এ অধিকার দিয়েছে।[২] এ প্রসঙ্গে ক্যারেন আর্মস্ট্রং বলেন-[৩] "পাশ্চাত্যের বহু শতাব্দী আগেই কুরআন মহিলাদের সম্পদের উত্তারাধিকার এবং স্বামী বিচ্ছেদের ক্ষমতা দিয়েছে।"

বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজে নারী-পুরুষের উত্তারাধিকার সম্পদে সমান অংশ নির্ধারণ দেখে কেউ কেউ তা মুসলিম সমাজে প্রয়োগের পরামর্শ দেন। এখানে বোঝা করা উচিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ প্রথা ও পরিরারিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছে এবং সেখানে অবাধ যৌন স্বাধীনতার ফলে যৌবন শেষে নারীদের নিঃসঙ্গতা ও নিরাপত্তাহীনতা কাটাতে হয়। তাই তারা নারীর উত্তারাধিকারের ক্ষেত্রে এটা করতে বাধ্য হয়েছে।

❑.পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং তাদের প্রতি অসদাচার:

সৃষ্টিকর্তার পরই মানুষের প্রতি ইহসানকারী ব্যক্তিরা হলেন–পিতা-মাতা। কোন সন্তানের পক্ষে তার পিতা-মাতার ইহসানের প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য ইসলাম পিতা-মাতার সদ্ব্যবহারসহ সন্তানের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য ন্যাস্ত করেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে সন্তানদের বড় অংশ পিতা-মাতার সেসব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। কিছু সমাজে বৃদ্ধ পিতা-মাতারা আজ মানবেতার জীবন যাপন করছে, তারা সন্তানের নিকট সদ্ব্যবহার ও সেবা-যত্ন তো দূরের কথা থাকার আশ্রয়টুকুও পাচ্ছে না। ফলে অনেক পিতামাতাকে ঠাই নিতে হচ্ছে বৃদ্ধ আশ্রমগুলোতে। এরচেয়ে অমানবিক আর কী হতে পারে? অথচ কুরআন সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছে-[৪]

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....لاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاًكَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। ... তাদের 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের আচরণের কেমন হবে তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহর অধিকারের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকার আলোচনা করে এর গুরুত্বের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে। তাই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের ব্যাপারে সন্তানদের আন্তরিক হওয়া একান্ত কর্তব্য।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং তাদের প্রতি সদাচার না করা শুধু অনৈতিকই নয়, বরং এর জন্য রয়েছে অতি মন্দ পরিণাম। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন[৫] "আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং জেনে শুনে মিথ্যা কসম করা কবীরা গুনাহ।" তিনি অন্যত্র বলেন[৬], 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ক. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খ. মদ্যপ, গ. দান করে খোঁটা দানকারী।

আলী রা বলেন, আমি রাসূল সা. বলতে শুনেছি-[৭] "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে(পশু-পাখি) যবেহ করে তার উপর আল্লাহর লা'নত, যে কেউ কোনো বিদআতকে আশ্রয় দিয়ে তার ওপর আল্লাহর লা'নত, যে ব্যক্তি তার মা-বাপকে লা'নত দেয় তার ওপর আল্লাহর লা'নত এবং যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত।"

---

[১]. মূল আরবী [من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদীস নং ২৭০৩।

[২] .আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪:আয়াত ৩২।

[৩] .ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *ইসলাম : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, অনু. শওকত হোসেন, (ঢাকা: সন্দেশ প্রকাশনী, ২০০৪) পৃ.৪৭-৪৮।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৩-২৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪:৩৬; ৪৬:১৫, ২:৮৩; ৬:১৫১।

[৫]. মূল আরবী [الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর, হাদীস নং ৬২৯৮।

[৬].মূল আরবী [لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২৫৬২।

[৭]. মূল আরবী [لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কাদর, হা.নং ১৯৭৮।

❑.আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকরণ(قطع صلة الرحم) এবং আত্মীয়দের অধিকারহরণ:

আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা এবং তাদের অধিকার রক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।[১] অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা কিংবা তাদের অধিকার রক্ষা করেন না। আবার এমনও কেউ কেউ আছেন যারা আত্মীয়ের প্রতি অন্যায়-অবিচার করে থাকে। আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন কিংবা তাদের অধিকারহরণ বড় যুলম ও মহাপাপ। এটা মহান আল্লাহ নিকট বড় অপরাধ। এ কারণে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারীরা পার্থিব জীবনে মহান আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং নানা বিপদ, বিপর্যয় ও অকল্যাণের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ মর্মে আল-কুরআনে বলা হয়েছে[২]–

> وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
>
> "আর যারা আল্লাহ্‌র সংগে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে এবং তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে(ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, বিধি-বিধান ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে), যা আল্লাহ্ অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করে, তাদের জন্যই লা'নত আর তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের মন্দ আবাস।"

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি, মনোমালিন্য ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি থেকে আত্মীয়তা সম্পর্ক খারাপ হয়ে থাকে। কারো ক্ষেত্রে এরূপ ঘটলে দ্রুত তার সমাধান করতে হবে এবং তাদের সকল প্রাপ্য দিতে হবে।

আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকরীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অকল্যাণ রয়েছে। এটা আল্লাহর রহমত ও ইবাদত কবুলের অন্তরায়। এ কারণে দুনিয়াতে শাস্তি নাযিল হতে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক করতে রাসূলুল্লাহ সা.বলেছেন–'*যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয় না।*'[৩] তিনি আরও বলেন, '*আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।*'[৪]

....

পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশের অন্তরায় এবং অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। উল্লেখিত বিষয়াবলী মানুষের পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও কলহ রক্ষা পেতে হলে মানুষকে উল্লেখিত অবক্ষয়সৃষ্টিকারী মন্দ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

৩.২.৩ সামাজিক পর্যায়ে বর্জনীয় বিষয়সমূহের বর্ণনা:

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষায় কতগুলো রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান গ্রহণ করে। এগুলোর সমষ্টি থেকে গড়ে উঠে সামাজিক মূল্যবোধ। সমাজের মানুষের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা অনেকাংশে সামাজিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল। তাই সামাজিক মূল্যবোধ গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আচরণের কারণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটে এবং নৈরাজ্য ও বিপর্যয় দেখা দেয়। নিম্নে সমাজে অবক্ষয়সৃষ্টিকারী এই বর্জনীয় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হল:

❑. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা (القتل):

হত্যার আরবী প্রতিশব্দ اَلْقَتْلُ। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণনাশ করাই হত্যা। হত্যাকর্মে অংশগ্রহণকারী ছাড়াও যে সব লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেমন: কথা, পরামর্শ বা অর্থ যোগানের দ্বারা হত্যার সাথে জড়িত তারাও হত্যাকারীর মধ্যে গণ্য। অংশ গ্রহণের মাত্রা অনুযায়ী তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য ও আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে। উদ্দেশ্য ও ধরণ বিচারে হত্যা পাঁচ প্রকার। ক. ইচ্ছামূলক হত্যা, খ.প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা, গ.ভুলবশত হত্যা, ঘ. প্রায় ভুলবশত হত্যা, ঙ.কারণবশত হত্যা। প্রতিটি হত্যাই মন্দ ও অকল্যাণকর হলেও সব ধরনের হত্যার অপরাধ বা শাস্তি সমান নয়।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪:৩৬; ৪৬:১৫, ২:৮৩; ৬:১৫১।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ২৫;আরও দেখুন,আল কুরআন ০২:২৭; ২৪:২২।
[৩]. আল-খাতীব আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ* (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫হি.), কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯৩১।
[৪]. মূল আরবী [لا يدخل الجنة قاطع] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৩৮; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৫৬।

হত্যা মানবতা ও নৈতিকতা বিরোধী একটি চরম জঘন্যতম অপরাধ। অন্যায়ভাবে নিরপরাধ ব্যাক্তিকে হত্যা করা ব্যক্তি ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি স্বরূপ। বিধিবহির্ভূত হত্যা একটি মারাত্মক অপরাধ, যা সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা চরমভাবে বিঘ্নিত করে। হত্যার ফলে নিহতের নিকটজনের মধ্যে ক্রোধ ও প্রতিশোধের স্পৃহা জ্বলে উঠে। নিহতের নিকটজনেরা হত্যাকারীকে হত্যা করতে কোন দ্বিধা করে না। ফলে সমাজে অশান্তি ও প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। সমাজে ছড়িয়ে পড়ে নানা অবক্ষয় ও অপরাধ। এজন্য অন্যায়ভাবে হত্যা ইসলামে কঠোভাবে নিষিদ্ধ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–[১] وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ "আর তোমরা এমন কাউকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তবে ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।" অন্যত্র আরও ইরশাদ করেন[২]– وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون-"আর তোমরা কাউকে হত্যা করো না ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তিনি তোমাদের এসব নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।"

শিরকের অমার্জনীয় অপরাধের পর বিধি বহির্ভূতভাবে মানব হত্যা ইসলামে সবচাইতে বড় অপরাধ। ইসলাম হত্যাকে শুধু মহাপাপ ও নিষিদ্ধ কাজ গণ্য করেনি, বরং এজন্য কঠোর শাস্তি বিধান করেছে। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা এতই মারাত্মক যে, তা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমপর্যায়ের মারাত্মক অপরাধ। পক্ষান্তরে, কারো জীবন রক্ষা করা দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করার মত মহাপূণ্যের কাজ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩] مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا– "মানব হত্যা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি তার প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন-[৪]

> সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে বিরত থাকো। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেগুলো কি কি ? তিনি বলেন, ১.আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, ৪. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়ন করা। এবং ৭. সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করা।

অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করা আরও মারাত্মক জঘন্য মহাপাপ। এটা এক ধরনের কুফরী। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৫]-'মুসলিমকে গালি দেয়া ফুসূক। আর তাকে হত্যা করা কুফরী।' অন্যত্র বলেন-[৬],"অন্যায়ভাবে একজন মু'মিন নিহত হওয়ার তুলনায় সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহর নিকট অধিকতর হালকা ব্যাপার।"

অন্যায়ভাবে হত্যার পরকালীন শাস্তি ছাড়াও পার্থিব শাস্তি ভয়ানক। এই অপরাধের জন্য আল-কুরআন কিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান দিয়েছে; অর্থাৎ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে ইসলামী আদালতের রায়ের ভিত্তিতে হত্যাকারী ব্যক্তি থেকে নিহতের আত্মীয়রা কিসাস গ্রহণ করতে পারবে।[৭] অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃত হত্যা ছাড়া অন্যান্য হত্যার ক্ষেত্রে ইসলাম দিয়াত (রক্তপণ) ও কাফফারা-এর বিধান দিয়েছে। অন্যায়ভাবে হত্যার জন্য পরকালে মন্দ পরিণাম রয়েছে। কোন নিরপরাধ মানুষকে ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে কেউ হত্যা করলে হত্যাকারী তাওবা ছাড়া মারা গেলে সে পরকালে জাহান্নামে স্থায়ী হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৮] وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا -"আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" এ প্রসংঙ্গে হাদীসে কঠোর সতর্ক বার্তা এসেছে। আবূ বকরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি যে,

> 'দু'জন মুসলিম তাদের অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামে যাবে।' আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ হত্যাকারী তো অপরাধী, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিল'।[৯]

অন্যায়ভাবে হত্যার কারণ: বিভিন্ন কারণে সমাজে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যেমন: পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, পূর্বশক্রতা, যুলম, ধন-সম্পদের লোভ, অপরাধ গোপন, পরকীয়া প্রেম, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, সুবিচার না থাকা ও অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দ্বীনি জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫১।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩২।
[৪].মূল আরবী [قال (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال (الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, হা. নং ২৬১৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ৮৯।
[৫]. মূল আরবী [سباب المسلم فسوق وقتاله كفر] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৮, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৬৪।
[৬].মূল আরবী[لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুদ দীয়াত, হা.নং ১৩৯৫; *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবু তাহরীমিদ দম, হা.৩৯৮৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ৫: আয়াত ১৭৮-১৭৯; সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩৩। [কিসাস সম্পর্কে দেখুন, অত্র অভিসন্দর্ভের ৪র্থ অধ্যায়ে]
[৮]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' 8: আয়াত ৯৩।
[৯].মূল আরবী [إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النارفقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২৮৮৮।

অন্যায়ভাবে হত্যা প্রতিরোধে করণীয়: দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বা কুরআন ঘোষিত কিসাসের বিধান চালু করা, যাতে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত হয়। এ অপরাধের জন্য পরকালীন পরিণতি তুলে ধরা এবং সমাজে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। যে সব কারণ মানুষকে হত্যার দিকে উস্কে দিতে পারে তা থেকে দূরে থাকা।

❑. ব্যভিচার ও ধর্ষণ (الزنا):

ব্যভিচার এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে যিনা(الزِّنَى); এর আভিধানিক অর্থ–পাপকর্ম করা। আল-কুরআনে যিনা শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ০৯ বার এসেছে। সাধারণভাবে যিনা বা ব্যভিচার বলতে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন মিলনকে বুঝায়। ইসলামী পরিভাষায়–"বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালিগ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন দু'জন নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গম ক্রিয়াকে যিনা বলা হয়।"[১]

কার্যত যিনা (ব্যভিচার) করাই শুধু যিনা নয়, বরং যিনার পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। রাসূল সা. বলেন[২] –"চোখের যিনা হচ্ছে দৃষ্টি। মুখের যিনা হচ্ছে এ সংক্রান্ত কথাবার্তা। কানের যিনা হচ্ছে এ সংক্রান্ত শ্রবণ। হাতের যিনা হচ্ছে হস্ত সম্প্রসারণ। পায়ের যিনা হচ্ছে পদক্ষেপ। মন আকাংখা ও বাসনা করে আর যৌনাংগ তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে।" কার্যত বৈধ স্ত্রী ও দাসী ছাড়া হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন বা অন্য যে কোন পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করাই অবৈধ যৌনাচার ও সীমালংঘন এবং তাও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হারাম কর্ম। কুরআনে এ সবই নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে[৩] وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "আর অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না–তা প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক।"

বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত স্ত্রী কিংবা শরীয়াহ স্বীকৃত অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া অন্য যে কোন নারীর সাথে যৌন চাহিদা পূরণ করা করাই যৌন অনাচার ও ব্যভিচার। ব্যভিচার ঈমান ও মুমিনের চরিত্র বিরোধী কাজ। কোন মু'মিন জেনে-বুঝে তাতে লিপ্ত হতে পারে না। বিভ্রান্ত হয়ে কেউ এতে লিপ্ত হলে কখনই তাতে অভ্যস্ত হতে পারে না।এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪]

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَر-وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا- يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا -

"আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যার হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।" মহান আল্লাহ আরও বলেন[৫]

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ- إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ- فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ-

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।...যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।" উল্লেখিত আয়াতসমূহে মু'মিনের মৌলিক নৈতিক চরিত্র দিকসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। ব্যভিচার মু'মিনের স্বভাব-চরিত্র বিরোধী গর্হিত কাজ। কোন মু'মিন ব্যভিচারী স্বভাবের হতে পারে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[৬]

> কোন ব্যভিচারী মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মুমিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটেরা লুটতরাজ করে না মুমিন অবস্থায়, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।

ব্যভিচার একটি চরম গর্হিত অনৈতিক ও জঘন্য অশ্লীল কাজ। এটা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস ও ভীষণভাবে কলুষিত করে। ব্যভিচার ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিমূলে ভয়ানকভাবে আঘাত করে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে নির্লজ্জতা ও লাম্পট্য তার চরিত্রকে গ্রাস করে ফেলে। তাই কুরআন এই জঘন্য পাপাচারকে চরম নির্লজ্জ, ঘৃণ্য অপকর্ম ও অপকর্মের সুরঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৭] –إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً-"নিশ্চয়ই এটা একটি অশ্লীল কাজ এবং অকল্যাণের সুরঙ্গ পথ।" কেউ যাতে এই দুষ্কর্মের নিকটে আসতে পারে না সেজন্য কুরআনে বলা হয়েছে-[৮] (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى) "আর তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না।" এখানে "যিনার নিকটবর্তী হয়ো না"–এর অর্থ–যিনার প্ররোচনা ও উস্কানী দিতে পারে এমন কার্যাবলীর নিকটেও যেয়ো না। যে সব কাজ যিনার পথকে সহজ করে সে সব কাজ নিজেও করো না এবং তা হতেও দিও না।

---

[১]. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯), পৃ.১১৯-১২০।

[২]. মূল আরবী [إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه] -*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইস্তিযান, হাদীস নং ৫৮৮৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কাদর, হাদীস নং ২৬৫৭।

[৩]. আল কুরআন,সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১৫২।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান ২৫ : আয়াত ৬৮।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ০১, ০৫-০৭।

[৬]. মূল আরবী [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩৪৩, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৭।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩২।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩২।

যিনা-ব্যভিচার একটি অত্যন্ত জঘন্য, কুৎসিত ও বীভৎস অপরাধ। তা সমাজ সংস্থাকে কুরে কুরে খায়, পারিবারের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন করে। সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পরিবারের ভাঙ্গন এবং চরম লাম্পট্য সৃষ্টি করে। বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধনের দিকে নারী-পুরুষের তীব্র অনীহার সঞ্চার করে। তা মানবীয় মর্যাদার জন্য বিধ্বংসী ভূমিকা পালন করে। তার দরুণ বংশধারা বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে এবং সন্তান বিনষ্ট করে। তা ব্যাপক হলে সমাজের যুবক-যুবতীরা শরীয়ত সম্মত বিবাহে জড়িত না হয়ে পশুকুলের ন্যায় পাশবিক যৌনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।[১]

ব্যভিচার সমাজ-সভ্যতাকে চরম ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার জলন্ত উদাহরণ–আজকের ইউরোপ ও আমেরিকা। অবাধ যৌনাচার ও নৈতিক বিধি-নিষেধের পরওয়া না থাকায় বর্তমান ইউরোপীয় ও আমেরিকান সমাজ চরম বিপর্যয়ের মুখে। ব্যভিচার মানুষকে নীতিহীন পশুতে পরিণত করে। ফলে ব্যভিচারী চরিত্রহীন ব্যভিচারীনি নারীকে বিবাহ করতে কোন দ্বিধা করে না। ইরশাদ হচ্ছে[২]– الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না।"

ব্যভিচার নানা ধরনের অকল্যাণের উৎস। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লাঞ্ছিত হওয়ার সাথে সাথে তার পরিবার ও বংশের লোকদের সম্মান নষ্ট হয়। অনেক সময় এ থেকে ভয়ানক শত্রুতার জন্ম নেয়। ব্যভিচারের ফলে গর্ভধারণ করলে অধিকংশ ক্ষেত্রে গর্ভপাত করা হয়, যা মানবতা বিরোধী। গর্ভপাত ঘটাতে না পারলে কিংবা গর্ভপাত থেকে বেঁচে যাওয়া অবৈধ সন্তান সমাজ ও পরিবারের বোঝা। ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়া জারজ সন্তান সে সামাজিকভাবে বিভিন্ন বঞ্চনার স্বীকার হয়। এরা সমাজে অনাদর ও অবহেলায় মানুষ হয়। সারা জীবন তারা সমাজের ঘৃণা ও ধিক্কার বয়ে বেড়ায়। বর্তমান অবৈধ সন্তানের সংখ্যা উদ্বেগজনভাবে বৃদ্ধি এবং কুমারী মাতা সমস্যা নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়কে প্রকট করে তুলছে। অধিকন্তু, ব্যভিচারের কারণে নানাবিদ কঠিন যৌনব্যাধি যেমন– সিফিলিস, গণোরিয়া, প্রমেহ ও এইডস ইত্যাদি সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে এইডস আজ মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য বড় হুমকি। তাই রাসূল সা. ইরশাদ করেন[৩]–"কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি ও বহু রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা তাদের পূর্ববতীদের মধ্যে ছিল না।" এছাড়াও ব্যভিচারের কারণে বিভিন্ন খোদায়ী গযব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। ব্যভিচার সহ সকল অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন[৪] – قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ "বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা।" অন্যত্র বলেন[৫]- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ "হে নাবী! যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।"

ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষাকল্পে ইসলাম শুধু এ কাজকে নিন্দা করে হারাম ঘোষণা করেনি, বরং এজন্য কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। সমাজ থেকে এই অপরাধ প্রতিরোধে কুরআনে বলা হয়েছে-[৬]

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"

ব্যভিচার মারাত্মক মহাপাপ। শিরক ও অন্যায়ভাবে হত্যার পর সবচেয়ে মারাত্মক মহাপাপ হচ্ছে ব্যভিচার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৭], "শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুণাহ হলো নিজের বীর্যকে এমন মহিলার স্ত্রী গর্ভে নিক্ষেপ করা যে তার জন্য হালাল নয়।" অন্যত্র বলেন[৮], "মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না, তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তারা হলেন ক.বৃদ্ধ ব্যভিচারী, খ.মিথ্যাবাদী বাদশাহ, গ.অহঙ্কারী ফকির।"

ধর্ষণ: সাধারণত কোন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তার সম্মতি ব্যতীত বা ভয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করে বা অন্যায়ভাবে তাকে বুঝিয়ে বা চৌদ্দ বছরের কম বয়স্কা বালিকাকে তার সম্মতি নিয়ে যৌন সহবাস করলে তা-ই ধর্ষণ।[৯] ইসলামী দৃষ্টিতে ধর্ষণ হচ্ছে, কোন পুরুষ বা নারী বল প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে কোন নারী বা পুরুষের সাথে সঙ্গম করা।[১০]

---

[১]. মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, (ঢাকা: ই ফা বা, ৩য় সং., ২০০৭), পৃ. ২১৭।

[২] .আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০৩; আরও দেখুন,আল-কুরআন ০৪:২৫।

[৩].মূল আরবী [أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط.حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا] *ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, হা.৪০১৯।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৩৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ ৬০: আয়াত ১২।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০২।

[৭]. ইবন আবী দুনিয়া, *কিতাবুল আল-ওরা'অ*, (কুয়েত : দারুস সালাফিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.) পৃ.৯৪, হা.নং ১৩৭। ইবনু কাছীর, *তাফসীর*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫; পৃ.৭২-৭৩।

[৮]. মূল আরবী [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১০৭।

[৯]. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *দণ্ডবিধি* (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪) পৃ.৫৫৩।

[১০]. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা: ই ফা বা, ১৯৯৫) খ.১, পৃ.৩৩৬।

ধর্ষণ একটি ঘৃণ্য অনৈতিক কর্ম ও অপরাধ। নৈতিক ও সামাজিকভাবে এর কুপ্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এটা শুধু একজন নারী কিংবা তার পরিবারের জন্য অবর্ণনীয় মনঃকষ্ট ও চরম লাঞ্ছনার বিষয় নয়, বরং সমাজের সকল নারীর নিরাপত্তাহীনতা ও লাঞ্ছনার পথ প্রশস্ত হয়। এতে দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। এর ফলে সামাজিক অবক্ষয়ের চরমভাবে বিস্তার ঘটে। অনেক সময় নরপশুরা ধর্ষণের পর অপরাধ গোপন করার জন্য ধর্ষিতাকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলে, যা অতি জঘন্য অপরাধ। তাই ইসলাম ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ইসলামী আইনে ধর্ষণকারী ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করবে তবে ধর্ষিত শাস্তিযোগ্য হবে না।[১] নাবী সা. এর সময়ে এক মহিলা অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার পথে ধর্ষিত হলে তিনি ধর্ষণকারীকে পাকড়াও করে পাথর মেরে হত্যার শাস্তি দেন, আর ধর্ষিতাতে সান্তনা দিয়ে বিদায় দেন।[২]

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ষণ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এটা আজ অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। বর্তমান ধর্ষিতাদের মধ্যে বড় অংশ স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা, কর্মজীবী মহিলা, গৃহ পরিচারিকা, ছাত্রী ও শিশু। ফলে সমাজের সর্বত্রই নারীদের নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে ধর্ষণ ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে কুরআনে বলা হয়েছে-[৩] (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)"প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না।" –এই আয়াত অনুযায়ী ধর্ষণ বন্ধ করতে হলে যে সব জিনিস মানুষের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায় তার সবই সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

ব্যভিচার ও ধর্ষণের কারণঃ ক. অশালীন পোষাক ব্যবহার, পর্দার বিধান উপেক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, পরনারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া, প্রেমালাপ ও গোপন যোগাযোগ। খ. অপসংস্কৃতির আগ্রাসন। অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, সিনেমা ও পর্ণগ্রাফী ব্যাপক সয়লাব। গ. অবৈধ প্রেম ও পরকীয়ার ব্যাপকতা। ঘ.স্বামী-স্ত্রীর একজন অন্যজন থেকে দীর্ঘ দিন প্রবাসে বা আলাদা থাকা। ঙ. বিলম্বে বিবাহ করার প্রবণতা। চ.গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রনের উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা। ছ.প্রচলিত আইনে ব্যভিচার ও ধর্ষণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর না হওয়া, ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা। ঝ.প্রতিহিংসা, ক্রোধ, জিদ (যেমনঃ প্রেমে ব্যর্থ হওয়া, সম্মানহানি বা নাজেহাল করার ইচ্ছা ইত্যাদি)।

ব্যভিচার ও ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয়ঃ ক. প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের শালীন পোষাক ব্যবহার, দৃষ্টিশক্তির হিফাযত এবং পর্দার বিধান পালন। খ. গৃহ অভ্যন্তরে ও অন্যের গৃহে প্রবেশের ইসলামী শরয়ী বিধানের অনুসরণ। গ. প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা এবং বিবাহকে সহজকরণ। ঘ. অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ, সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা। ঙ.আত্মসংযম তথা তাকওয়ার অনুশীলন। চ. সমাজে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ছ. ধর্ষক ও ব্যভিচারীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়া ঘোষিত কঠোর শাস্তি জনসম্মুখে প্রদান করলে এই অপরাধ সমাজ বন্ধ হয়ে যাবে। জ.ব্যভিচার ও ধর্ষণের নিকটবর্তী করে এমন সব অশ্লীল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ। ধর্ষণ, অজাচার ও যিনার দিকে ধাবিত করতে পারে এমন সকল উপসর্গ ও কর্মকাণ্ড উপায়-উপকরণ বন্ধ করা। যেমন, নির্জনে একত্রিত হওয়া, প্রেমালাপ, অশ্লীল সিনেমা, ম্যাগাজিন, পর্ণগ্রাফী ও নীল ছবি ইত্যাদি রোধ। অবৈধ ও পরকীয়া প্রেম এবং নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা রোধকল্পে নারী-পুরুষের আলাদা শিক্ষা ও পৃথক কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা।

❑. সমকাম ও বিকৃত উপায়ে যৌনাচার (اللوطاط):

সমকাম হচ্ছে–সমলিঙ্গে তথা পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে যৌনাচার করা।

সমকাম এক ধরনের অস্বাভাবিক ও বিকৃত যৌনচার। এটা জঘন্য অনৈতিক কর্ম, যা মানুষের মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধকে ভয়ানকভাবে ধ্বংস করে মানুষকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নিয়ে যায়। যারা সমকামিতায় লিপ্ত তারা পশুর চেয়েও অধম। কেননা কোন পশুর মধ্যে সমকামিতার মত অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় না। পৃথিবীতে সমকাম ও বিকৃত যৌনাচার সূচনা করে কাওমে লূত। এই অপকর্ম তাদের নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলীকে ধ্বংস করে পশুত্বের চরম নিকৃষ্ট স্তরে নিয়ে যায়।এই অপকর্ম মানুষের মধ্যে কিভাবে ভয়াবহ কুপ্রভাব বিস্তার করে তার একটি চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে[৪]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

"আর (প্রেরণ করেছিলাম) লূতকে। সে যখন তার কওমকে বলল, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি'? 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় এরা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়'।"

---

[১]. আল-কুরআন ২৪:৩৩।
[২].বিস্তারিত দেখুন, *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ১৪৫৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৮০-৮২।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে কুপ্রভাব বিস্তারকারী অপকর্ম সমকাম কিভাবে মানুষকে নির্লজ্জতা, হীন মানসিকতা ও নোংরা চরিত্রে অন্ধ করে ফেলে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমকাম শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতে গর্হিত নয়, বরং এটি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর। এই ঘৃণ্য অপকর্ম শুধু নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করছে না, বরং এটা জন্ম দিচ্ছে নানা মরণব্যাধি। মানব সভ্যতাকে গুরুতর হুমকি স্বরূপ মরণব্যাধি এইডসের উপলক্ষ সমকাম। এছাড়াও কঠিন যৌনব্যধি ও বিভিন্ন দূরারোগ্য ব্যাধি সমকাম থেকে জন্ম নেয়। এক সময় এই ঘৃর্ণিত কর্ম অতি গোপনে সংঘটিত হলেও বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্বসহ অনেক সমাজের মানুষ প্রকাশ্যে নিজেদের সমকামী ঘোষণা দিয়ে বিবাহ করছে। সমকামিতা পশ্চিমা বিশ্বে এত বেশী প্রসার লাভ করেছে যে, তারা এই কুকাজের স্বীকৃতির জন্য অনেক দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাশ করেছে। এটা অতি জঘন্য বিষয়।

সমকাম ছাড়াও এক শ্রেণীর পশুরূপী নারী-পুরুষ আজকাল কুকুর, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি বিভিন্ন পশুর সাথে এবং কৃত্রিম অবৈধ যৌন উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে যৌনাচার করে থাকে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের জন্য এর চেয়ে লজ্জাকর ও অধঃপতন আর কি হতে পারে! জঘন্য ও হীনতর এই আচরণে মানুষ আজ পশুকেও ছাড়িয়ে গেছে। আইয়্যামে জাহেলিয়ার আরবের অসভ্য মানুষগুলোও আজকের নব্য জাহেলিয়ার কথিত সুসভ্য মানুষের মত এত নীচে নামেনি, বরং তাদেরও নৈতিক চরিত্র এদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। নব্য জাহেলিয়াতের এসব মানুষরূপী শয়তান বর্তমান সমাজকে চরম নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সমকামের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। এই অপকর্মরোধে সমকামীদের আজীবন বা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড অথবা হত্যার বিধান দিয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[১] وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً
"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন স্বাক্ষী তলব করবে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের কে গৃহে অবরুদ্ধ করবে।"

সমকাম বা পশুতে উপগত হওয়া জঘন্য অন্যায় ও অনৈতিক। এই অপকর্ম প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত কঠোর। এ ঘৃর্ণ্য অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কতা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–[২],

> "অভিশপ্ত মালঊন যে তার পিতাকে গালি দেয়, অভিশপ্ত যে তার মাতাকে গালি দেয়, অভিশপ্ত যে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জবাই করে, অভিশপ্ত যে জমি-জমার আইল পরিবর্তন করে, অভিশপ্ত যে কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে, *অভিশপ্ত মালঊন যে কোনো প্রাণীতে উপগত হয়, অভিশপ্ত মালঊন যে সমকামিতায় লিপ্ত হয়*।
>
> রাসূল(সা.) আরও বলেন-[৩] "তোমরা যখন কাউকে লূতের জাতির মত কাজে(সমকামে) লিপ্ত দেখবে, তখন এর কর্তা এবং যার সাথে এরূপ করা হবে, উভয়কে হত্যা করবে।" তবে রাষ্ট্রনায়ক ইচ্ছা করলে সমকামীদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারেন। খলীফা আবূ বকর (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) তাদের শাসনকালে সমকামীদের আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন।[৪]

সমকামের কারণ: বিকৃতরুচি, অসৎ ব্যক্তির সাহচর্য, কুচিন্তা, অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন, স্ত্রী থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকা, সমকামের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া, বিভিন্ন দেশে সমকামের অনুমোদন।

সমকাম প্রতিরোধে করণীয়: ব্যভিচার ও ধর্ষণ প্রতিরোধের বিষয়সমূহ পালনের সাথে সাথে অতিরিক্ত করণীয় বিষয় হল–সামাজিকভাবে এ ধরনের অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন।

❑.পতিতাবৃত্তি (الْبِغَاء):

অর্থের বিনিময়ে কোন নারী কর্তৃক বিবাহ বহির্ভূতভাবে কোন পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপনকে পতিতাবৃত্তি বলা হয়। পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত মহিলাকে পতিতা, বেশ্যা বা গণিকা বলা হয়। সাধারণত পতিতা, বেশ্যা বা গণিকা নারীরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জীবন ধারণের জন্য অথবা অন্য কোন সম্পদ বা সুযোগের বিনিময়ে স্বামী নয় এমন ধরনের যে কোন পুরুষের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

ব্যভিচারের ন্যায় পতিতাবৃত্তিও নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। পতিতারা সমাজে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়। ফলে যুবসমাজ খারাপ কাজে আকৃষ্ট হয়, কোন সমাজে পতিতাবৃত্তি চালু থাকলে সেখানকার তরুণ ও যুবকেরা বিপথগামী এবং ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হয়। এভাবে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। তাই কুরআন চরিত্রবিধ্বংসী এই অনাচারকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। বর্তমান পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ কথিত সভ্য দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পতিতাবৃত্তি অনুমোদিত। এসব দেশে পতিতাদের থেকে ট্যাক্স নেয়া হয়। অথচ নৈতিকতা বিরোধী এ কাজ সভ্য সমাজ সায় দিতে পারে না। তাই এটাকে নব্য জাহেলিয়াত বলা যায়। কেননা জাহেলী যুগে আরবরা দাসীদের পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত করিয়ে মুনিবরা অর্থ উপার্জন করত। ইসলাম পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। এ

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৫।

[২].মূল আরবী [ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.১, পৃ.২১৭, হাদীস নং ১৮৭৫।

[৩].মূল আরবী[من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল হুদূদ, হা.৪৪৬২, *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল হুদূদ, হা.২৫৬১।

[৪] দেখুন, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনু. ড.মাহফুজুর রহমান (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০৯) পৃ.৩৬-৩৭।

সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[১] وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।" এই কাজ রোধে নাবী সা. কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জিত অর্থ, গণকের উপার্জিত অর্থ নিষিদ্ধ করেছেন।"[২]

পতিতাবৃত্তির কারণ: ক. দারিদ্র্যতা। খ. তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগের অপব্যবহার। গ. প্রেমে ব্যর্থ ও ধর্ষণের শিকার নারীদের বিপথগামীতা। ঘ.অসাধু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আবাসিক হোটেল মালিকের অনৈতিক বিনোদনের সুবিধা দান। ঙ. দালাল ও পাচার চক্রের চক্রান্ত ও চাকুরীর প্রলোভন। চ.প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতা।

পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে করণীয়: ক. বিবাহের মাধ্যমে পতিতাদের পুর্নবাসন এবং নিষিদ্ধ পল্লী উচ্ছেদ। খ. দুঃস্থ, অসহায়, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। গ. দালাল, পাচার চক্র ও যেসব আবাসিক হোটেলে অনৈতিক কর্ম হয় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ। ঘ. সচেতনতা সৃষ্টি ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার।

❑.অজাচার (Incest):

নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংগমকে অজাচার নামে অভিহিত করা হয়।[৩] যেমন–পিতা-কন্যায়, মাতা-পুত্রে, ভাই-বোনে, চাচা-ভাতিজী, মামা-ভাগিনীয় প্রভৃতি নিকটাত্মীয়ের মধ্যকার অবৈধ যৌনাচার। এই অনাচার রোধে ইসলাম এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের মাহরাম[৪] ঘোষণা করেছে।

সকল ধর্মে অজাচার নিষিদ্ধ। এটা মানব সভ্যতা অধঃপতনের সর্বাপেক্ষা লজ্জাজনক অধ্যায়। এটা এমন এক চরম জঘন্য অপকর্ম, যা শুধু পারিবারিক মূল্যবোধ চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ করে দেয় না, বরং তা মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব থেকে নিকৃষ্ট পশুর পর্যায়ে নিয়ে যায়। পবিত্র আত্মিক বন্ধন ও পারিবারিক পবিত্রতা অটুট রক্ষার জন্য ইসলাম মাহরামদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে।[৫] বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকাসহ অমুসলিম দেশ ও সমাজে পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজী ও মামা-ভাগিনীয় সহ যাদের সাথে বিবাহ চিরনিষিদ্ধ তাদের মধ্যে যৌনাচার তথা অজাচার অঘোষিতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানকার নারী-পুরুষরা নিজ গৃহে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন থাকে ফলে তারা জৈবিক চাহিদা পুরণে পশুর মতই ভাই-বোন, সন্তান ও পিতা-মাতার মধ্যে কোন বাছ-বিচার করে না। এই ভয়ানক অনৈতিক আচরণ মানব সভ্যতাকে চরম বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই জঘন্য অনৈতিক কর্ম ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এজন্য কুরআনে হারাম করা হয়েছে- মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুরী ও স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্র বিবাহ করা। [আল-কুরআন, ০৪: ২৩।] কুরআনে এ ধরনের জঘন্য অপকর্মের নিন্দায় বলেছে-[৬] إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً "নিশ্চয় তা হল অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ।" এ অপকর্ম রোধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[৭], "*যে ব্যক্তি মাহরামদের সাথে ব্যভিচার করে তাকে হত্যা কর।*"

অজাচারের কারণ: অপসংস্কৃতির আগ্রাসন, নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, পর্ণগ্রাফী, গৃহের অভ্যান্তরে নগ্নতা, প্রাপ্তবয়স্কদের ছেলে-মেয়ের একই বিছানা বা কক্ষে শয়ন, অশালীন সংক্ষিপ্ত পোষাক ব্যবহার ও পর্দার বিধান উপেক্ষা।

অজাচার প্রতিরোধে করণীয়: প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের শালীন পোষাক ব্যবহার, গৃহ অভ্যন্তরে পর্দা ও ইসলামী শরয়ী নীতিমালা পালন, প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের আলাদা কক্ষে আলাদা বিছানায় শয়ন, প্রাপ্ত বয়স্কদের দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা, আত্মসংযম তথা তাকওয়ার অনুশীলন, নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও অপসাংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ।

❑. গর্ভপাত বা ভ্রুণ হত্যা (الإجهاض) ও অবৈধ সন্তান:

অভিধানে গর্ভ অর্থ–ভিতর, মধ্য,উদর, গর্ভাশয়, ভ্রূণ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা। আর গর্ভপাত অর্থ অসময়ে বা অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভ থেকে নিঃসরণ, গর্ভস্রাব, ভ্রূণহত্যা, কৃত্রিম উপায়ে গর্ভনাশ।[৮] আরবীতে গর্ভপাত বুঝাতে ইজহায(إجهاض)

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩৩।

[২].মূল আরবী[أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা. ২১২২,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা.১৫৬৭।

[৩]. ড. মো.আহসান হাবিব, *তুলনামূলক সমাজ ব্যবস্থা*, (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১০), পৃ.৯৭।

[৪]. মাহরাম শব্দের অর্থ–নিষিদ্ধ। মাহরাম হল এমন সব নারী যাদেরকে আত্মীয়সম্পর্কের কারণে, দুধপান জনিত কারণে অথবা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার কারণে যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ। (*আল-মু'জামুল ওসীত*, খ.০১, পৃ.১৬৯) পুরুষের জন্য মাহরাম হল–স্বীয় মাতা/দাদী/নানী বা উর্ধতন, কন্যা/নাতনী বা অধঃস্থন, আপন ভগ্নী, বৈমাত্রিয় বা বৈপিত্রেয় ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুরী ও স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে মিলন হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা নিজ অভিভাবকত্বে আছে এবং ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা। তবে স্ত্রীর সহদোর বোনের সাথে বিবাহ সাময়িক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তার সাথে পর্দা করতে হবে। নারীর জন্য মাহরাম হল–স্বীয় দাদা/নানা বা পূর্বপুরুষ, পিতা, ছেলে-নাতী বা অধঃস্থন, আপন ভাই, বৈমাত্রীয় বা বৈপিত্রেয় ভাই, চাচা, মামা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, দুগ্ধ-পিতা, দুগ্ধ-ভাই, শশুর, স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে। [আল-কুরআন০৪:২২-২৩]

[৫]. আল-কুরআন ০৪:২২-২৩।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ২২।

[৭]. মূল আরবী [ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ১৪৬২|

[৮]. ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৭।

শব্দ ব্যবহৃত হয়।[১] এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Miscarrage, Abortion. পরিভাষায়– "গর্ভে স্থিতি হওয়ার পর হতে গর্ভকাল পূরণ হওয়ার পূর্বে গর্ভস্থিত বস্তুকে অপসারণ করাকে গর্ভপাত বলে।"[২]

সাধারণভাবে গর্ভপাত একটি অনৈতিক কর্ম। অন্যায়ভাবে গর্ভপাত একটি বড় ধরনের অপরাধ ও মহাপাপ। এটা নিরপরাধ প্রাণ হত্যার শামিল। অবৈধ গর্ভপাত শুধু ঘৃণ্য কাজই নয় বরং এটা মানবতার প্রতি চরম অবমাননাকর। বর্তমানকালে উদ্বেগজনক হারে ব্যভিচার, ধর্ষণ ও অজাচার বেড়ে যাওয়ার ফলে অবৈধ সন্তান রোধে ব্যাপক হারে গর্ভপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা মানব সভ্যতায় বিপর্যয় অন্যতম কারণ। সমাজ এর নেতিবাচক প্রভাব অনিবার্য। মানবতাবিরোধী এই অপকর্ম মানুষের মধ্য থেকে দয়া, মায়া-মমতা, মানবিকতা ইত্যাদির বিলোপ ঘটিয়ে মানুষকে নির্দয়, নির্মম ও অপরাধ প্রবণ করে তোলে। এ সব কারণে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেন[৩] –. وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ "আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না– আমিই রিয্‌ক দেই তোমাদের ও তাদেরও।" অন্যত্র ইরশাদ করেন-[৪] .وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ "নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।"

গর্ভনিরোধের উপায় হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে গর্ভপাত প্রচলিত থাকলেও সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহসহ বিভিন্ন দেশ ও সমাজে বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচারের ফলে লোক লজ্জার ভয়ে ব্যাপকভাবে গর্ভপাত হচ্ছে। গর্ভপাত ঝুঁকিমুক্তভাবে সহজসাধ্য হওয়ায় এ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশ-সমাজে মাতৃগর্ভে কণ্যা সন্তানের উপস্থিতি জানার পর তা নষ্ট করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা আইয়্যামে জাহিলিয়্যার আরবদের কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দেয়ার মতই অপরাধ। অনেক ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণের ভয়েও গর্ভপাত করা হয়। যে কোন ধরনের অন্যায় উদ্দেশ্যে গর্ভপাত হোক না কেন প্রাণ হত্যা গুরুতর অপরাধ। আর ইসলামে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে অবশ্যই কিয়ামত দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ "অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা তাদের সন্তানদের নির্বুদ্ধিতার দরুন অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে এবং হারাম করে নিয়েছে তা যা আল্লাহ তাদের রিয্‌ক হিসেবে দিয়েছেন, কেবল আল্লাহর উপর মিথ্যা সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা উদ্দেশ্যে। অবশ্যই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি।" অন্যত্র বলেন-[৬] وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ -بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ "যখন জীবন্ত সমাধিস্ত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে,কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।" গর্ভপাত শুধু ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে গর্হিত অন্যায় নয়। বরং এটা মানবতা বা প্রাণের প্রতি এক চরম অবজ্ঞাপ্রদর্শন। এর ভয়ঙ্কর কুফল সম্পর্কে ড. ওমর হাসান কাসুলী বলেন[৭]–

> গর্ভপাত উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ অবারিত করে। মানব হত্যার মত অপরাধ সংঘটিত হওয়া ছাড়াও সমাজে গর্ভপাতের সুযোগ থাকায় মানুষ নির্ভয়ে দায়-দায়িত্বহীনভাবে যৌনাচারে লিপ্ত হয়।... গর্ভপাত সমাজে সন্ত্রাস ও হত্যার পরিবেশ তৈরী করে। গর্ভপাত বৈধকরণের মাধ্যমে মানব জীবনের প্রতি যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় তা পরিণামে মানুষকে সহজেই জীবনঘাতি যে কোন পন্থাকে উসকে দেয়। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণকে যারা উৎসাহিত করে তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

ইসলামী নৈতিক দৃষ্টিতে গর্ভপাত অবৈধ হলেও শর্তসাপেক্ষে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে গর্ভপাতের অনুমতি রয়েছে। যেমন–
-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গর্ভাবস্থা অব্যহত থাকলে তা যদি মায়ের জীবনের গুরুতর ক্ষতি সাধন হয় তখন।
-গর্ভস্থ সন্তান গুরুতর বিকৃত আকৃতি সম্পন্ন হয়, যা চিকিৎসার মাধ্যমে প্রতিকার অসম্ভব এবং এমতাবস্থায় জন্মগ্রহণ করলে তার জীবন হবে চরম বিষাদময় এবং তার পরিবারের জন্য হবে মারাত্মক কষ্টদায়ক এরূপ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে গর্ভপাত করা যেতে পারে।

গর্ভপাতের কারণ: ক.ব্যভিচার, অজাচার, ধর্ষণ। খ.চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে ঝুঁকিমুক্তভাবে সহজসাধ্য গর্ভপাত। গ.ক্লিনিক বা হাসপাতালে নীতিহীনভাবে অসাধু লোকদের দ্বারা গর্ভপাতের অবাধ সুযোগ।

গর্ভপাত প্রতিরোধে করণীয়: ক.অবাধ যৌন অনাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ। খ. ব্যভিচারের দৃষ্টান্তমূলক শরয়ী শাস্তি সমাজে চালুকরণ। গ.সমাজে ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। ঘ.প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা।

❑.যুল্‌ম তথা অবিচার, আগ্রাসন, জবর-দখল, সীমালংঘন, স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার ও হয়রানি (الظلم):

যুল্‌ম (الظلم)ব্যাপক অর্থবোধক আরবী শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ–কোন বস্তুকে তার প্রকৃত স্থলে প্রয়োগ না করে অন্যত্র প্রয়োগ করা, বাঁধা দেয়া,[৮] অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার, অন্যায় আচরণ,[১] অন্যায়, অবিচার, অধিকারহরণ,[২]

---

[১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪।
[২]. গাজী শামছুর রহমান, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ.৫৩৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌'আম ০৬: আয়াত ১৫১,আল-কুরআন(১৭:৩১)।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ ৬০: আয়াত ১২।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌'আম ০৬: আয়াত ১৪০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাক্‌ভীর ৮১: আয়াত ০৮-০৯।
[৭]. ড. ওমর হাসান কাসুলী, *মেডিকেল এথিক্স: ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, অনু. ড. শারমিন ইসলাম ও ডা. আবু খলদুন আলমাহমুদ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০) পৃ-৩৩।
[৮]. ইবরাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওসীত*, তাহকীক, মাজমা'উল লুগাতিল আরাবিয়্যা, (দারুদ-দাওয়াত, মাকতাবাতুশ শামিলাহ) খ.০২, পৃ. ৫৭৭।

সীমালংঘন, সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া, প্রাপ্য অধিকার না দেয়া বা কম দেয়া ইত্যাদি। এটা আদল ও ইনসাফের বিপরীত। কুরআনে যুল্‌ম শব্দটি– 'শিরক'[৩], 'আল্লাহ প্রতি মিথ্যারোপ করা' বা 'কুফর'[৪], 'আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচার'[৫], 'অবিচার করা বা ন্যায্যপ্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা'[৬], 'কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ বা জবরদখল করা'[৭] ও 'সীমালংঘন'[৮] ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সীমালংঘন ক্ষেত্রে সাধারণত 'উদওয়ান শব্দ ব্যবহার হয়। অত্যাচার ও সীমা অতিক্রম করে বাড়াবাড়ি করাকে 'উদওয়ান বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়–"বিধি-বিধান লংঘন করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, হক ও বাতিলের ব্যাপারে হক ছেড়ে বাতিলের অনুরক্ত হওয়াকে শরিয়তে যুলম বলে।"[৯]
আল-কুরআন যুল্‌ম শব্দটি (ظلم) মূলধাতু থেকে বিভিন্ন রুপে শব্দটি ৩১৫বার ব্যবহৃত হয়েছে।[১০]

যুল্‌ম কথা ও কাজ উভয় মাধ্যমে হতে পারে। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি কর্তৃক দুর্বল ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা, হত্যা করা, সম্পদ কেড়ে নেয়া, গালি বা কষ্ট দেয়া, গীবত বা সম্মান হানি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সত্য গোপন করা, শ্রমিক থেকে কাজ করিয়ে নিয়ে ন্যায্য মজুরী না দেয়া, ফাইল আটকিয়ে ঘুষ আদায়, ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়, শাসক কর্তৃক জনগণের প্রাপ্য আদায় না করা, বিচারক কর্তৃক সত্যের সীমা লংঘন করা, নিয়োগকর্তা কর্তৃক যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করা, স্বামী তার স্ত্রীর হকের প্রতি লক্ষ্য না করা, স্ত্রী তার স্বামীর বা সন্তানের হকের প্রতি লক্ষ্য না করা, ইয়াতীম ও আত্মীয় অংশীদারের হক আদায় না করা, যুল্‌ম। অনুরূপভাবে সন্তুষ্টির স্থলে ক্রুদ্ধ হওয়া এবং ক্ষোভের স্থলে সন্তুষ্ট থাকা, কঠোরতার স্থলে নরম এবং কোমলতার স্থলে কঠোরতা, সামান্য শাস্তির স্থলে বেশী শাস্তি দেয়া, বিনয়ের স্থলে অহঙ্কার এবং আত্মমর্যাদার স্থলে হীনতা, পশু-পাখিকে কষ্ট দেয়া, ইত্যাদি সবই যুলম। যে ব্যক্তি এ সব অন্যায় কাজের কোন একটি করল সে যালিম, এমনকি এ অন্যায় কাজে যালেমকে যে সহয়তা করল সেও যালিম। আর যার উপর যুল্‌ম করা হল সে মাযলুম। যে কোন যুল্‌ম অনৈতিক হলেও সব যুল্‌মই সমান নয়। সবচেয়ে ভয়ানক যুল্‌ম হল আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা বলা। ইরশাদ হচ্ছে[১১] إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -"নিশ্চয় শির্‌ক হল বড় যুল্‌ম।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১২] فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "অতঃপর যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

যুল্‌ম একটি সামাজিক অনাচার। এটা সমাজকে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেয়। এটা সমাজের মূল্যবোধ, শান্তি-শৃঙ্খলা, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, ইনসাফ-ন্যায়বিচার, ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে ফেলে। যুল্‌ম অসহায় মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ বয়ে আনে। এতে দুর্বৃত্তরা স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করে স্বীয় স্বার্থ হাসিল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও অপরাধের জন্ম দেয়। এজন্য ইসলাম সব ধরনের যুল্‌ম হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[১৩]- وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ- الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
"আর সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না; যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।"

যুল্‌ম হারাম হওয়া সত্ত্বেও আজ সমাজের সর্বত্র তা উদ্বেগজনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শক্তিমান দুর্বলের উপর, শাসক শাসিতের উপর, ভূমিদস্যু অসহায় কৃষকের উপর, কৃষক ভাগচাষীর উপর, মহাজন ঋণগ্রহীতার উপর প্রতিনিয়ত যুল্‌ম করছে। ফলে সমাজে সবল কর্তৃক দুর্বল নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। ক্ষমতা ও সম্পদের মোহে মানুষ আজ অন্ধ হয়ে অন্যের উপর যুল্‌ম করে চলছে। তারা এর পরিণাম চিন্তা করছে না। অথচ যুল্‌মের দ্বারা যালিম সাময়িকভাবে কিছু সুবিধা করলেও তার চূড়ান্ত পরিণাম মন্দ। এই যুল্‌ম যালিমের জন্য মহাদুর্ভাগ্যের কারণ হবে। এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণী[১৪]-وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا। "আর তোমাদের মধ্যে যে যুলম করবে তাকে আমি মহাআযাব আস্বাদন করাব।" মহান আল্লাহ আরও বলেন[১৫] وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا "আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলম বহন করবে।"এ ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[১৬], "কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমনকি

---

[১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪৯।
[২]. মুহাম্মদ 'আলা উদ্দীন আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ.১৭০৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা লুক্‌মান ৩১: আয়াত ১৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ১৭; আল কুরআন (২৭:৪৪)।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ২৩।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৪০।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৬০।
[৯]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৯৯৮), পৃ.১৩০।
[১০]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, প.৫৩৩-৫৩৯।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা লোকমান ৩১: আয়াত ১৩।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৪৪।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা ২৬: আয়াত ১৫১-১৫২।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ১৯।
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১১১।
[১৬].মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء] *সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২৫৮২।

শিংবিহীন ভেড়া শিংবিশিষ্ট ভেড়ার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবে।" অন্যত্র বলেন[১] 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমান যমীন অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তবক যমীন লটকিয়ে দেয়া হবে'। অন্যত্র আরও বলেন[২]

> তোমরা কি জান নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ বলেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যার কোন অর্থ-সম্পদ ও জীবন সামগ্রী নেই। তিনি (সা.) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃস্ব হতভাগা যে হাশরের দিন নামাজ, রোজা ও যাকাতসহ উপস্থিত হবে সত্য, কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়েছে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, অথবা অন্যায়ভাবে কাউকে মেরেছে। ফলে ঐ সমস্ত মাযলুম লোকদেরকে তার নেকী দিয়ে দেয়া হবে। দায়শোধের আগে তার নেকী শেষ হয়ে গেলে, তার উপর তাদের গুনাহ চাপিয়ে দেয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

যুল্‌ম ও সীমালংঘনের কুপ্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এটা তার অনুসারীকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী বানায়। এ শ্রেণীর লোকেরা নীতি-নৈতিকতা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা ইত্যাদির কোন বাছ-বিচার না। ফলে তারা ভয়ানক পাপী, দুস্কৃতিকারী, সত্যভ্রষ্ট ও অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন[৩] – وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ "সীমালংঘনকারী যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করত এবং তারা ছিল অপরাধী।" আরও বলেন[৪], بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ "বরং সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, কে তাকে সৎ পথে পরিচালিত করবে ? আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।" উল্লেখিত আয়াতসমূহে যালিমদের কুপ্রবৃত্তিপূজারী ও স্বার্থপর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে গিয়ে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার না করে অন্যায়ে লিপ্ত হয়।

যুলুম ও সীমালংঘন মানুষের মধ্যে বিনয়-নম্রতা ও নীতিবোধ বিলোপ সাধন করে ব্যক্তির মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন[৫] كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى- أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى "বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।" তাই যুল্‌ম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে যালিম ও মাযলুমকে রক্ষায় রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,[৬]

> তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে যালিম হোক কিংবা মাযলুম। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মাযলুমকে আমরা সাহায্য করব এটা তো বুঝলাম, কিন্তু যালিমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য তার (যালিমের) হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।

যুল্‌ম ও সীমালংঘন সত্য, সুপথ ও হিদায়াত লাভের অন্তরায়। এটা মানুষকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে। সীমালংঘন ও যুল্‌মের কারণে অনেক সময় সত্য গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন[৭]– يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ "আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে।" এ আয়াতে যুলমকে যালিমদের বিভ্রান্তির অনুষঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যুলম মানুষের পতন ও ধ্বংসের কারণ। ক্রমাগত যুলমের মাধ্যমে যালিম যখন বেপরোয়া হয়ে সীমালংঘন করে তখন মাযলুমের অভিশাপ ও বদদোয়া যালিমের ওপর বিপদ ও অকল্যাণ বয়ে আনে। ফলে আল্লাহ যালিমকে পাকড়াও করেন এবং ধ্বংস করে দেন।[৮] তাই রাসূল সা. বলেন[৯],"তুমি মাযলূমের দু'আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মাযলূমের দু'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই।" এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[১০] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ "হে মানুষ! তোমাদের যুল্‌ম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হয়ে থাকে, পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও, পরে আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আমি তোমাদের জানিয়ে দেব তোমরা যা করতে।"

মানব জীবনের সর্বাবস্থায় যুল্‌ম হারাম। যালিমরা সর্বদাই ঘৃর্ণার পাত্র। তারা যত অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ও ক্ষমতাশীল হোক না কেন সর্ববস্থায় তারা বর্জনীয়। মহান আল্লাহ বলেন[১১] – وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ "আর যারা যুলম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, পড়লে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আর এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য

---

[১].মূল আরবী[من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হা.নং ২৩২০,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা. ১৬১০।

[২].মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২৫৮১।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ১১৬।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ২৯, আল-কুরআন (১০:১২)।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আলাক ৯৬: আয়াত ৬-৭।

[৬].মূল আরবী[انصرأخاك ظالما أومظلوما قالوا يارسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال تأخذ فوق يديه]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩১২।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ৩৪।

[৮]. আল-কুরআন ১১:১০২; ১৮:৫৯; ২২:৪৫।

[৯].মূল আরবী [اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩১৬;*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ১৯।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ২৩।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ১১৩।

করা হবে না।” আরও বলেন[১], وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ “তোমরা সীমালংঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।” হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন-[২]‘হে আমার বান্দা, আমি নিজের উপর যুলম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। কাজেই তোমরা একে অন্যের উপর যুলম করো না।’

যুল্‌ম মহান আল্লাহ অসন্তোষ ও ক্রোধের জন্ম দেয়। যালিমরা পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা ঘৃণিত এবং মানুষের আক্রোশের স্বীকার হয়। আল্লাহ যালিমদের ভালবাসেন না এবং হিদায়েত তথা সঠিক পথ দেখান না।[৩] তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ও লানত থাকে।[৪] এরা কখনও সফলকাম হয় না।[৫] পরকালীন জীবনে এদের জন্য রয়েছে নির্মম শাস্তি। ইরশাদ হচ্ছে-[৬]

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ-مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء-وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

তুমি কখনও মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি তাদের সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ভীত-বিহবল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরাবে না এবং তাদের অন্তর হবে উদাস। যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যারা যুলম করেছে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহবানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব’। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই?

আরও বলা হয়েছে[৭]-وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ-“এবং নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা হবে আগুনের অধিবাসী।” আরও এসেছে[৮]-وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا-“যালিমরা তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।” মহান আল্লাহ আরও বলেন[৯] فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ-“সেদিন সীমালংঘনকারীদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজ আসবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেয়া হবে না।” অন্যত্র আরও বলেন[১০]

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ- وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ-

“আর যারা যুলম করেছে, দুনিয়ায় যা আছে যদি তা সব এবং এর সমপরিমাণও তাদের জন্য হয়; তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণস্বরূপ তারা তা দিয়ে দেবে। সেখানে আল্লাহর কাছে থেকে তাদের জন্য এমন কিছু প্রকাশিত হবে, যা তারা কখনো কল্পনাও করত না। আর তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা–বিদ্রূপ করত তা–ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।”

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,[১১] “যে ব্যক্তি কারো সম্ভ্রম হানি কিংবা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন অর্থ-সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা থেকে যুল্‌মের দায় পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার কোন নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।”[১২] তিনি আরও বলেন–“তোমরা ‘যুল্‌ম থেকে বেঁচে থাক। কেননা ‘যুল্‌ম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে’।”

যুল্‌ম–এর কারণ: ক.ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, পার্থিব স্বার্থ, সুখ-সম্ভোগ ইত্যাদি হাসিলের জন্য মোহ ও লোভ-লালসা। খ. সঠিক জ্ঞান ও বিবেক প্রয়োগ করে কাজ করার অভাব। গ.কুপ্রবৃত্তি ও যালিমদের অনুকরণ। ঘ. পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। ঙ.অহঙ্কার, শত্রুতা ও বিদ্বেষ। চ. নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে সৃষ্ট ক্ষোভ।

প্রতিকারে করণীয়: ক.যালিমদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ। খ. পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রতকরণ। গ. সামাজিকভাবে যালিমদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং মাযলুমের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ। ঘ. আদল-ইনসাফ তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে যালিমদের দমন। ঘ. যুল্‌মের প্রতিদানে যুল্‌ম না করে ধৈর্য অবলম্বন।

❑.সমাজে ফিতনা(الفتنة)-ফাসাদ(الفساد) ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ :

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯০।

[২].মূল আরবী [يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব,হাদীস নং ২৫৭৭।

[৩]. আল-কুরআন, ৩: ১৪০, ০৫:৫১; ৪২:৪০।

[৪]. আল-কুরআন, ১১: ৫৪, ০৭:৪৪; ৪০:৫২।

[৫]. আল-কুরআন, ০৬:২১।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ৪২-৪৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু’মিন ৪০: আয়াত ৪৩।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্‌র/আল-ইন্‌সান ৭৬:৩১।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৫৭।

[১০]. আল-কুরআন,সূরা আয্‌-যুমার ৩৯: আয়াত ৪৭-৪৮, আরও দেখুন– আল-কুরআন (১০:৫৪)।

[১১].মূল আরবী[اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২৫৭৮;*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হা.নং ২৩১৫।

[১২]. মূল আরবী [من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه] *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩১৭।

ফিতনা ও ফাসাদ দু'টি আরবী শব্দ। ফিতনা শব্দের সাধারণ অর্থ- পরীক্ষা, কষ্টকর অবস্থা। আল-কুরআনে ফিতনা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন: ক. আল্লাহর ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, কুফর ও শির্ককে বলা হয়েছে।[১] খ. জোরপূর্বক সত্য দমন করা এবং সত্য গ্রহণে বাধাঁ দেয়া।[২] গ.মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথে চালিত করা এবং সত্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও বলপ্রয়োগের চেষ্টা করা।[৩] ঘ. অসত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ ও রক্তপাত করা।[৪] ঙ.অত্যাচার-অবিচার করা, ন্যায্য অধিকার হরণ করা, বাড়ী-সম্পদ জবরদখল এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া।[৫]

ফাসাদ শব্দটি সালাহ (শন্তি ও কল্যাণ) শব্দের বিপরীত। এর বাস্তবতা হল, সরল-সোজা পথ ছেড়ে তার বিপরীত পথে যাওয়া। এর দ্বারা ভূপৃষ্ঠে মানব সৃষ্ট সব ধরনের বিপর্যয় ও অশান্তি; যেমন: যুল্ম, নির্যাতন, মানুষের অধিকারহরণ, হত্যা, সন্ত্রাস, মন্দকাজ, পাপাচার, কুফর, শিরক, মানুষের নৈতিক আচরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি সবই উদ্দেশ্য।[৬] কুরআনে ফাসাদ শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ক. স্বৈরশাসন, যুলুম, অন্যায়ভাবে হত্যা ও দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার করা।[৭] খ.ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীত পথে জীবন পরিচালনা।[৮] গ. আগ্রাসনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়।[৯] ঘ. শান্তিপূর্ণ সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।[১০] ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা-বিভেদ ইত্যাদি সবই ফিৎনা-ফাসাদের অংশ বিশেষ। আল-কুরআনে ফিতনা শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৬০বার এসেছে। আর ফাসাদ শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৫০বার এসেছে।

ফিৎনা-ফাসাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। সীরাত বিষয়ক উর্দূ বিশ্বকোষ '*নকুশ*'–এ বলা হয়-[১১]: "মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু, ঈমান, কায়-কারবার ইত্যাদি যার কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তাই হলো 'ফিতনা' এবং যার কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় তাই হলো ফাসাদ।" যে সব সামাজিক সম্পর্ক ও আত্মীয়তা মানব সভ্যতার ভিত্তি, সেগুলো নষ্ট করা ফাসাদের শামিল। কুরআনে ফাসাদসৃষ্টিকারীদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে[১২]– وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ "আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের জন্য লা'নত আর তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের মন্দ আবাস।"

এখানে 'সম্পর্ক ছিন্ন করা' অর্থ শুধু আত্মীয়তা ছিন্ন করার অর্থ নয়, বরং মানব সমাজের সামাজিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত সম্পর্ক গড়ে উঠে সেই সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক, প্রতিবেশীর সম্পর্ক, অর্থনৈতিক লেন-দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার এবং বিভিন্ন দেশ ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা এ সব সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমেই মানব সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

ফিৎনা-ফাসাদ সমাজে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা ও অবক্ষয় সৃষ্টির প্রধান কারণ। অর্থ-সম্পদের লালসা, হীনস্বার্থ, হিংসা-বিদ্বেষ, মদ-জুয়া, নারী লিপ্সা, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অনর্থক কথাবার্তা ইত্যাদি দ্বারা ফিৎনা-ফাসাদের শুরু হয়। এ থেকে সমাজে শত্রুতা, হিংস্রতা এমনকি রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের জন্ম হয়। সমাজে শান্তি, ঐক্য-সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট এবং ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। সমাজ জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। ফিৎনা-ফাসাদ চরমে পৌঁছে গেলে তা আযাবের কারণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন[১৩] -(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোন কোন কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"

–এখানে 'ফাসাদ' (বিপর্যয়) বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকান্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়া, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কমে যাওয়া, ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বুঝানো হয়েছে। ...আর এসব বিপদাপদের মূল কারণ, 'মানুষের অপকর্ম ও গুনাহ। তন্মধ্যে শির্ক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক।[১৪]

অনেকে ফিৎনা-ফাসাদকে অপরাধ গণ্য করলেও বড় পর্যায়ের অপরাধ মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবে ফিৎনা-ফাসাদ অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ। হত্যার চেয়েও এটি মারাত্মক। এটি সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে নানা ধরনের নৈরাজ্য, যুলম,

---

[১].আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৭।
[২]. আল-কুরআন,সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৮৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৭৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ৩৩: আয়াত ১৪।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ১১০।
[৬]. আল-কুরআন, ০২:২৫১, ২২০; ৫:৩২, ০৭:৮৫, ৩০:৪১, ৮৯:০৯-১২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাজ্র ৮৯: আয়াত ১১-১২।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ৩৪।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ৫৬।
[১১]. উদ্ধৃত, মোঃ মুখলেছুর রহমান, *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহাভবতা ধর্ম ইসলাম* (ঢাকা: এনআরবি গ্রুপ, ২০১১) পৃ.২১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আর-রা'দ ১৩: আয়াত ২৫।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৪১।
[১৪]. শিহাব উদ্দীন আল মাহমূদ আল-আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ.২১, পৃ.৪৭-৪৮।

ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা ও রক্তপাতের জন্ম দেয়। এ কারণে আল-কুরআন একে হত্যার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ গণ্য করেছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১] –(وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ)"ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়।" এ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[২] "অচিরেই মানুষের নিকট এমন ধোঁকাবাজির যামানা এসে যাবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী বলে মনে করা হবে, সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করা হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে, আর আমানতদার তা খিয়ানত করবে। নীচ প্রকৃতির বদলোকেরা নেতৃত্ব করবে।"

ফিৎনা-ফাসাদ কিছু ক্ষেত্রে শিরকের চেয়েও ভয়াবহ। এ থেকে বেঁচে থাকা কতটা জরুরী, তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করতে পারি। তাহলো- মূসা ('আ.) তাওরাত লাভের উদ্দেশ্যে তূর পর্বতে চল্লিশ দিন ইবাদতে মগ্ন থাকাকালীন সময়ে বনী ইসরাইল গোবৎস পূজা শুরু করে। এ সময় মুসা('আ.) এর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর ভাই হারূন ('আ.)বনী ইসরাইলের সাথে ছিলেন। তিনি বনী ইসরাইলকে গোবৎস পূজা থেকে বারণ করে। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। তখন হারূণ আ. ফিৎনা-ফাসাদ আশংকায় তাদের বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ (যুদ্ধ) গ্রহণ করেননি। তূর পর্বত থেকে ফেরার পর জাতির অধঃপতন দেখে মূসা আ. সহোদর হারূন ('আ.)কে তিরস্কার করলে হারূন বলেন– قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي "তিনি বলল, হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরো না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি।"[৩]–এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ফিৎনা-ফাসাদ এড়ানোর জন্য শিরকের মত মহাপাপে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে হারূন('আ.) তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ গ্রহণ করেননি। এ থেকে ফিৎনা-ফাসাদের ভয়াবহতা অনুমান করা যায়।

ফিৎনা-ফাসাদ শুধু মানব সমাজ-সভ্যতার জন্যই ক্ষতিকর নয় বরং তা আল্লাহর নিকট বড়ই অপছন্দনীয়। এ কারণে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন[৪] –(وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) "এবং তুমি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।"

ফিৎনা-ফাসাদ শয়তানের অস্ত্রসমূহের মধ্যে বড় ধরনের অস্ত্র। এর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে সত্যচ্যুত ও বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে। তাই এর সর্বগ্রাসী অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৫] – وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ "তোমরা ভয় কর এমন ফিতনাকে যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদের উপরই আপতিত হবে না। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"

ফিৎনা-ফাসাদকারীদের স্বরূপ: কাফির ও মুনাফিকদের মধ্যকার কুচক্রী-দুস্কৃতিকারীরা সমাজে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির হোতা। এরা সমাজের মানুষের কাছে নিজের প্রকৃত স্বরূপ গোপন রেখে নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে। তারা বাহ্যিকভাবে ভদ্রতার বেশধারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর হিংস্র ও কপট। তাদের অন্তরের অবস্থা বাহ্যিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা সমাজে শান্তিকামী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিলেও বাস্তবে এরাই অশান্তি সৃষ্টির হোতা। এরা গোপনে অশান্তি তৎপরতা চালায় আর জনসম্মুখে শান্তির কথা বলে। এদের স্বরূপ উন্মোচন করে মহান আল্লাহ বলেন[৬]-

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ-وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ- وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ -)

"আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে, সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। *আর যখন তাকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মসম্মান তাকে পাপে স্ফীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর অবশ্যই তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।*"

উল্লেখিত আয়াতের শিক্ষানুযায়ী কোন মুমিন ব্যক্তি ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত: খলীফা হারূনুর রশীদ(১৭০-১৯৩ হি.) এর নিকট এক ইহুদীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে দীর্ঘদিন ঘুরেও খলীফার সাক্ষাত লাভ ও তার প্রয়োজন পুরণ করতে পারছিল না। একদিন সে রাজপথের গেটে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় খলীফা তার সামনে এসে গেল। সে খলীফাকে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন'। তখন খলীফা ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা থেকে উঠে ইহুদীর প্রয়োজন পুরণের নির্দেশ দিলেন এবং তার প্রয়োজন মিটালেন। এরপর খলীফাকে বলা হল, আপনি একজন ইহুদীর জন্য সওয়ারী থেকে নামলেন? জবাবে তিনি বললেন, তার কথার কারণে নয়, বরং আমার এই আয়াতটি স্মরণ হল, "*যখন তাকে বলা হয় 'আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মসম্মান তাকে পাপে স্ফীত করে তোলে। অতএব তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আর অবশ্যই তা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।*"[৭]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৭।
[২].**মূল আরবী**[سيأتي على الناس سنوات خداعات.يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق.ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين.وينطق فيها الرويبضة] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান,হা.৪০৩৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৯৪।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৭৭।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২০৪-২০৬। আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১১-১২।
[৭]. ইমাম আল-কুরতুবী, খ.০৩, পৃ. ১৯;(সূরা বাক্বারাহ ২/২০৬ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

ফিৎনা-ফাসাদ ভয়ানক অপরাধ। এর প্রতিরোধ করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব, এজন্য প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদ বৈধ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" ফিৎনা-ফাসাদ নির্মূলে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত শক্ত। একবার উরাইনা ও উকাইল গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এসে রাসূল সা. এর নিকট আশ্রয় চান। সেখানে তারা অসুস্থ হলে রাসূল সা.তাদের যাকাতের উটের দুধ ও প্রস্রাব পানের নির্দেশ দেন। তারা সুস্থ হয়ে উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে ধৃত হন এবং তাদের হাত-পা কেটে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[২] এভাবে দুর্বৃত্ত-ফাসাদসৃষ্টিকারী দমনে দয়ার মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ সা. কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

ফিৎনা-ফাসাদের একটি দিক ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্র হলো প্রতিপক্ষের ক্ষতি সাধনের জন্য সূক্ষ্ম ও গোপনভাবে কথা ও কাজের মাধ্যমে কুট-কৌশল অবলম্বন করা। হিতাকাঙ্খী সেজে প্রত্যেক জনপদে এক ধরনের কুচক্রী শঠতার মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর কাজ করে থাকে। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৩]- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ -"আর এভাবে আমি প্রতিটি জনপদে তার অপরাধীদের সর্দারদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। আর তারা শুধু নিজেদের সাথেই চক্রান্ত করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না।"

ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ: ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ এক ধরনের সামাজিক অবক্ষয়। নিজ স্বার্থ বা নিজের মতকে ত্যাগ করে বিরোধী পক্ষের মতামত মেনে নিতে না পারা অথবা নিজের মতের উপর কঠোর অবস্থান থাকার দ্বারাই ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ সৃষ্টি হয়। এটা ফিৎনা-ফাসাদের অংশ এবং সমাজে ব্যাপক অনিষ্টতা সৃষ্টির কার্যকারণ। ঝগড়া-বিবাদকালীন গালাগালি ও মারামারি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। এতে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে। এতে সমাজের নিরাপত্তা-সংহতি বিনষ্ট সাধন হয়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে-[৪](وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا)"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" রাসূল (সা.)বলেন-[৫]"যে ব্যক্তি তার কথায় সত্য হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক এড়িয়ে চলে আমি জান্নাতে আমার পাশে তার জন্য একটি ঘরের জিম্মাদার হব।"

ঝগড়া-বিবাদ ও পারস্পরিক শত্রুতা কারণে মানুষের মধ্যে হীন মনোবৃত্তির জন্ম হয়। এতে একে অপরের অমঙ্গল কামনা করে এবং অপরের বিপদে আনন্দিত হয়। এটা শুধু ঘৃণ্যই নয়, বরং এটা কাফির-মুশরিকদের চরিত্র। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৬] إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا -"যদি তোমাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়।"

ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ সৃষ্টি করা ফাসাদকারী মূর্খদের কাজ। এর দ্বারাই তারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। কাজেই সর্বাবস্থায় তারা বর্জনীয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]- (وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ)-"এবং ফাসাদকারীদের পথ অনুসরণ করো না।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন[৮],"আল্লাহর নিকট সেই লোক সর্বাধিক ঘৃণিত যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।" তিনি আরও বলেন[৯]– "আরব উপদ্বীপের মুসলিমদের নিকট শয়তান আনুগত্য পাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, মনো-মালিন্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি।"

ঝগড়া ও বাক-বিতণ্ডার কোন কল্যাণ নেই। তাই কুরআন একে নিরুসাহিত করে। এটা মুমিনের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।[১০] কোন মুমিন এতে লিপ্ত হতে পারে না। এ মর্মে রাসূল(সা.) বলেন-[১১]"মু'মিন ব্যক্তি কটুভাষী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও ভর্ৎসনাকারী হয় না।" তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা সত্যকে বিজয়ী এবং বাতিলকে পরাস্ত করার জন্য বিতর্ক হতে পারে। সত্যের খাতিরে কখনও অমুসলিদের সাথে কোন মুমিনকে যদি বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে হয় তবে সেক্ষেত্রে উত্তম ভাষা ও কর্মনীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[১২]– وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -"আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না।"

ফিৎনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-বিভেদের পরকালীন পরিণতি অতি মন্দ। এদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[১৩] মহান আল্লাহ বলেন[১]- (الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ) "আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৩৯।
[২].দেখুন, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২৩১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কাসামাহ, হা. নং ১৬৭১।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম ০৬: আয়াত ১২৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ৫৬।
[৫]. মূল আরবী [أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮০০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩: আয়াত ১২০।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৪২।
[৮].মূল আরবী[إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩২৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, হা. নং২৬৬৮।
[৯]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন , হাদীস নং ২৮১২।
[১০]. আল-কুরআন ২৫:৬৩।
[১১]. মূল আরবী [ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৭৭।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৬।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৫।

করব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারীদের; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।" তাই কোন ব্যক্তি যদি নিজে সত্যের উপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ এড়ানোর জন্য স্বীয় দাবী পরিত্যাগ করে তার জন্য রয়েছে বড় পুরস্কার।

ফিৎনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদের কারণ: কুপ্রবৃত্তি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্ধ অনুসরণ, হীন স্বার্থ হাসিলকারীদের অপতৎপরতা ও অপকৌশল, পারস্পরিক ভুল ধারণা বা ভুল বোঝাবুঝি, ধন-সম্পদ ও পার্থিব ক্ষমতার লোভ, দ্বীনি জ্ঞান ও তাকওয়ার অভাব।

প্রতিকারের উপায়: ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ, সালফে সালেহীনের[২] কর্মনীতির অনুগামী হওয়া, ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবিলা, পরস্পরকে হক ও তাকওয়ার উপদেশ দান, দ্বীনি জ্ঞানার্জন এবং ফিৎনা-ফাসাদ থেকে দূরে অবস্থান।

ফিৎনা মুকাবিলায় বিশেষ করণীয়: বর্তমানে সমাজে নানামুখী ফিতনা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এমতাবস্থায় ঈমান ও দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। ক্রমাগত তা বিস্তৃত হতেই থাকবে। কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা ভয়ানকরূপ নেবে। তখন মু'মিনের কর্মনীতি কী হবে সে সম্পর্কে নাবী সা. দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। নাবী সা. বলেন-[৩]

> কিয়ামতের আগে ফিতনা এরূপ ধারণ করবে, যেরূপ রাতের গভীর আঁধার। সে সময় লোক সকালে মু'মিন হলে সন্ধ্যায় কাফিরে পরিণত হবে এবং সন্ধ্যায় মু'মিন হলে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। এ সময় মানুষ তার দ্বীনকে দুনিয়ার স্বার্থে বিক্রি করবে। তখন বসা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে এবং পদাচারী দ্রুতগামী ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। এ ফিতনার সময় তোমরা তোমাদের তীর-ধনুক ভেঙ্গে ফেলবে এবং তরবারী পাথরের উপর আঘাত করে ভোতা করে ফেলবে। এরপরও যদি কেউ তোমাদের উপর হামলা করতে চায়, তবে সে যেন আদমের উত্তম সন্তান(হাবিল) এর মত হয়।' অন্য হাদীসে এরূপ ফিতনায় সময় করণীয় সম্পর্কে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলে রাসূল সা. বলেন-[৪] (সে পরিস্থিতে) নিজ গৃহে অবস্থান করবে।

❑. পরনিন্দা (الغيبة) ও অন্যায়ভাবে দোষারোপ (البهتان):

গীবত শব্দের আভিধানিক অর্থ কুৎসা, পরনিন্দা, পরোক্ষ নিন্দা।[৫] আর বুহতান অর্থ অপবাদ, দুর্নাম, মিথ্যা, রটনা।[৬] পরিভাষায় গীবত হল,'তোমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান কোন মন্দ বিষয় তার অনুপস্থিতে উল্লেখ করা, যা সে গোপন রেখেছে কিংবা যা সে অপছন্দ করে।'[৭] আর বুহতান হলো ব্যক্তির সম্পর্কে এমন মন্দ বলা যা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই।[৮]

গীবত ও বুহতানের পরিচয় হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল গীবত কী? তিনি বলেন– "গীবত হচ্ছে, তোমার ভাইয়ের এমন বিষয় উল্লেখ করা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? তিনি উত্তরে বলেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে, আর যদি তার মধ্যে তা না থাকে, তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ(বুহতান) দিলে।"[৯] বর্তমানকালের অধিকাংশ মানুষ ফাসিক, তারা অপরের ব্যাপারে মন্দ কথা কারো থেকে শুনে কথা যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রচার করে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আংশিক সত্য থাকলেও আংশিক মিথ্যাও থাকে।এক্ষেত্রে যা সত্য তা গীবত, আর যতটুকু মিথ্যা তা বুহতান।

ইমাম নববী রহ. বলেন, গীবত হলো, মানুষ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে। চাই তা তার দেহ সম্পর্কে হোক, বা তার দ্বীনি, বা দুনিয়াবী অথবা ব্যক্তিসত্তা, চরিত্র, আকৃতি, কিংবা তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সেবক, দাস-দাসী, অথবা তার পাগড়ী, কাপড়-চোপড়, হাটা-চলা, নড়া-চড়া, হাসি, চরিত্রহীনতা, ভ্রুকুটি, চেহারার প্রসন্নতা সম্পর্কে কিংবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন কিছু সম্পর্কে হোক, চাই তা কথার মাধ্যমে হোক, লেখার মাধ্যমে হোক, আকার-ইঙ্গিতে হোক, চোখ, হাত, মাথা অথবা অনুরূপ কিছুর ইশারার দ্বারা হোক। যেমন কারো শরীর সম্পর্কে বলা অন্ধ, কানা(ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন), লেংড়া, খাটো, লম্বা,কালো ইত্যাদি। দ্বীন সম্পর্কে বলা ফাসিক, পাপী, মুনাফিক ইত্যাদি। চরিত্র সম্পর্কে বলা চরিত্রহীন, ভণ্ড, চোর, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি। পার্থিব বিষয় সম্পর্কে বলা বেয়াদব, বাচাল, পেটুক ইত্যাদি। পিতামাতা সম্পর্কে বলা মুচি, নাপিত, পশু ব্যবসায়ী, ইত্যাদি। মোটকথা যা সে অপছন্দ করে।[১০]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৮৮।

[২]. সালফে সালেহীন হলেন- পূণ্যবান সাহাবী রা. ও তাবিয়ীগণ।

[৩].মূল আরবী[إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৪২৫৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.১১৮।

[৪]. মূল আরবী [قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم...] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৪২৬২।

[৫]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭৮।

[৬]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭০।

[৭]. ইবরাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওসীত*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৬৬৭।

[৮].মূল আরবী [أن تذكر أخاك بما يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته] আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১০।

[৯].মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৮৯; *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৭৪।

[১০].মূল আরবী [**فأما الغيبة** : فهي ذكرُك الإنسانَ بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه، أو نفسه أو خَلقه أو خُلقه، أو ماله أو ولده أو والده، أو زوجه أو خادمه أو مملوكه، أو عمامته أو ثوبه، أو مشيته وحركته وبشاشته، وخلاعته وعبوسه وطلاقته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك، أو رمزتَ أو أشرتَ إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك . أما البدن فكقولك : أعمى أعرج أعمش أقرع، قصير طويل أسود أصفر . وأما الدِّينُ فكقولك : فاسق سارق خائن، ظالم متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس باراً بوالده، لا يضعُ الزكاة مواضعَها، لا يجتنبُ الغيبة . وأما الدنيا : فقليلُ الأدب، يتهاونُ بالناس، لا يرى لأحد عليه حقاً، كثيرُ الكلام، كثيرُ الأكل أو النوم، ينامُ في غير وقته، يجلسُ في غير موضعه، وأما المتعلّق بوالده فكقوله : أبوه فاسق، أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف بزاز نخاس نجار حداد حائك . وأما الخُلُق فكقوله : سيء الخلق، متكبّر مُرَاء، عجول جبَّار، عاجز ضعيفُ القلب، مُتهوِّر عبوس، خليع، ونحوه . وأما الثوب : فواسع الكمّ، طويل الذيل، وَسِخُ الثوب ونحو ذلك، ويُقاس الباقي بما ذكرناه . وضابطُه : ذكرُه بما يكره .] ইমাম নববী রহ.,*আযকারুল নববী*, http://www.almeshkat.net/ পৃ.৩৩৫।

গীবত ও বুহতান সমাজে অবক্ষয়, ফিতনা-ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বড় উপাদান। এতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। গীবতের মাধ্যমে ব্যক্তি সংশোধিত না হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে উঠে। এর ফলে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ পারস্পরিক ঘৃণা ও কলহের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব বিষয় সমাজে মারামারি ও রক্তপাত ঘটায়। এটা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ও পূণ্য বিনাশকারী ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ। এতে গীবতকারীর হীন মানসিকতা ও কুপ্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ কারণে আল-কুরআন গীবতকে মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার মত মারাত্মক জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করে এর চর্চা ও শ্রবণকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১] وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ "এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।" আরও বলেন[২], وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী।"

গীবত ভয়ানক পাপ। এর ভয়াবহতা অনুমান করা যায় নাবী সা. এর মন্তব্য থেকে। আয়েশা রা. (নাবী সা.অপর স্ত্রী) সফিয়া রা. সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে তো এরূপ এরূপ, অর্থাৎ সে বেঁটে। তখন নাবী সা. বলেন,(হে আয়েশা) 'তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে নিক্ষেপ করা হয় তবে তাতে সমুদ্রের সব পানি দূষিত হয়ে যাবে'।[৩] অন্য এক হাদীসে এসেছে, মায়েয আসলামী রা. ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি দিয়ে স্বীয় পাপমুক্তির জন্য শাস্তি চাইলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। দু'ব্যক্তি এ নিয়ে একে অপরকে বলছিল-এই লোকটির দোষ আল্লাহ গোপন রেখেছিল। কিন্তু সে নিজে তা গোপন থাকতে দিল না। ফলে সে কিভাবে কুকুরের মত পাথরের আঘাতে নিহত হলো। এরপর রাসূল সা. পথে মরা-পচা গাধা দেখে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা এই পচা গাধার গোশত খাও। তারা বলল, মাফ করবেন, একি খাওয়া যায়? তখন রাসূল সা. বললেন, একটু আগে তোমরা তোমাদের ভাই সম্পর্কে যা বললে তা এই পচা গাধা খাওয়ার চেয়েও খারাপ কাজ। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, 'মায়েয এ মুহূর্তে জান্নাতের ঝর্ণায় গোসল করছে।'[৪]

গীবত শ্রবণ মানুষকে অন্যের দোষ অন্বেষণ ও পাপাচারে প্ররোচিত করে তাই গীবত শোনাও নিষিদ্ধ। কারণ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের জীবন, মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ হারাম। অধিকন্তু, এটা অনর্থক কাজ, যাতে কোন মু'মিন লিপ্ত হতে পারে না।[৫] বরং এক্ষেত্রে প্রত্যেকের উচিত তার অনুপস্থিত ভাইকে সাহায্য করা। হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার থেকে জাহান্নাম ফিরিয়ে রাখবেন।'[৬] তাই যদি অনুপস্থিত ভাইকে সাহায্য করা সম্ভব না হয় তবে মজলিস ত্যাগ করা যতক্ষণ না অন্য কথায় লিপ্ত হয়।

গীবতে কোনই কল্যাণ নেই রবং তাতে নানাবিধ অকল্যাণ রয়েছে। গীবতকারীর দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তার নেক আমলও আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। তার ভাগ্যে তাওবার সুযোগ হয় না। আবূ কালাবা রহ. বলেন–"গীবত করলে মানুষের অন্তর হিদায়েত কবূল করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে–সুপ্রবৃত্তি ধ্বংস হয়ে যায়।"[৭] গীবত ও বুহতানকারীর পরকালীন পরিণাম অতি মন্দ। নিন্দাকৃত ব্যক্তি ক্ষমা না করলে আল্লাহ গীবত ও বুহতানকারীকে ক্ষমা করবেন না। সে নিন্দাকৃত ব্যক্তির পাপ বহন করবে এবং নিন্দাকৃত ব্যক্তি তার পূণ্য নিয়ে যাবে। ফলে সে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে। নাবী সা.বলেন[৮], "মিরাজের রাত্রিতে তিনি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের নখ ছিল তামার, তা দিয়ে তারা তাদের চেহারা ও বুক আঁচর দিচ্ছিল। জিবরাঈলের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, এরা মানুষের গীবত ও সম্মান নষ্ট করত।" এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. এই মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলেন[৯]–"যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান(যবান) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান (যৌনাঙ্গ) এর জামিন হতে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো।"

গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ: গীবত নিষিদ্ধ বিষয় হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত। ইমাম নববী(রহ.)এর মতে যে সব ক্ষেত্রে গীবত দোষণীয় নয় বা গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ ছয়টি। যেমন–১. যুলমের প্রতিকার চাওয়ার জন্য: মাযলুম ব্যক্তি শাসনকারী বা অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট অভিযোগ পেশ করে বলতে পারে যে, অমুক আমার উপর এরূপ যুল্‌ম করেছে। ২. অন্যায় বা মন্দ কাজ প্রতিহত করার ব্যাপারে সাহায্য কামনা করা। ক্ষমতা প্রাপ্তব্যক্তির নিকট এ কথা বলা যায় যে , অমুক ব্যক্তি এ অন্যায় করেছে, তাকে প্রতিহত করুন। ৩. কোন বিষয়ে ফাতওয়া চাওয়ার সময়- মুফতি সাহেবের কাছে এ কথা বলা যায় যে অমুক ব্যক্তি এ কাজ করেছে, সে কি তা করতে পারে বা আমার এ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? ৪. কোন অসৎ ব্যক্তি সম্পর্কে মুসলিমদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে, যাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। বিয়ে-শাদী সম্পর্কিত পরামর্শ

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১২।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুমাযাহ ১০৪: আয়াত ০১।
[৩]. মূল আরবী [لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته...] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৭৫, *সুনান আত-তিরমিযী*, হা.২৫০২।
[৪]. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ৪৪২৮(সংক্ষেপিত)।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৫৫।
[৬].মূল আরবী [من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৬, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৭৫৮৩।
[৭]. ইমাম গাযালী, *মিনহাজুল আবেদীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৩,
[৮].**মূল আরবী** [لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হা.৪৮৭৮;
[৯]. মূল আরবী [من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস ৬১০৯।

দানের ক্ষেত্রে, আমানত রাখা বা অংশীদার করা, অথবা প্রতিবেশী করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণ কামনায় সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করা। আসাধু ও অযোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া যে, অমুক ব্যক্তি মদ্যপায়ী বা ঘুষখোর। রাবী বা সাক্ষীর চারিত্রিক দোষত্রুটি উন্মোচিত করা। ৫. কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ ও বিদ‘আতে লিপ্ত হলে। ৬. কোন ব্যক্তি মন্দনামে বা ত্রুটির কারণে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে তাকে পরিচয় করে দেয়ার জন্য যেমন অন্ধ, বধির।[১]
সুফইয়ান ইবন উয়ায়নাহ (রহ.) বলেন, "তিন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা গীবত নয়। অত্যাচারী শাসক, ঘোষণা দিয়ে দুষ্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি এবং ঐ বিদ‘আত পন্থী যে মানুষকে বিদ‘আতের দিবে আহবান করে।"[২]

গীবত ও বুহতানের কারণ: ক. কারো প্রতি শত্রুতা বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে মনের ক্ষোভ মিটাতে। খ. অপরের দেখাদেখি সুর মেলাতে গিয়ে এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করতে। গ. কোন দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার লক্ষ্যে। ঘ. হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব ও অহংকারের কারণে। ঙ.উপহাস, বিদ্রুপ ও হাস্য-রস করতে গিয়ে। চ. কাউকে ঘৃণার পাত্র করার লক্ষ্যে। ছ. হীন মনোবৃত্তি চরিতার্থের জন্য। জ. অন্যের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে কারণে। ঝ. বচালতা, অনর্থক কথাবার্তা থেকে।

গীবত ও বুহতান থেকে বাঁচার উপায়: ক.গীবত কুফল ও ভয়ানক পরিণতি অনুধাবন করে যবানের হিফাযত করা, অনর্থক কথা ও আড্ডা পরিহার করা। খ.কারো গীবত করতে ইচ্ছা হলে নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করা। গ. গীবতকৃত ব্যক্তির মনঃকষ্ট নিজেকে দিয়ে অনুমান করা। ঘ. ক্রোধ দমন করা। ঙ. অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা। চ. দ্বীনি জ্ঞানার্জন, নেক আমল ও আত্মশুদ্ধি অর্জন। ছ. পরিবারের সবাইকে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দান। জ. প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা, মানুষকে সন্তুষ্ট করতে কারো নিন্দা না করা। ঝ.যে সব কারণে গীবত করা হয় তা থেকে দূরে থাকা।

এ থেকে মুক্তিতে করণীয়: তাওবার মাধ্যমে গীবত ও বুহতানের ভয়াবহতা রক্ষা পাওয়া যায়। তাওবার শর্তগুলো হলো: ক. অনুশোচনা, খ. ভবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। গ. যার নিন্দা করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

❑.অন্যের গোপন দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, গুপ্তচরবৃত্তি (التجسس) ও কানাঘুষা:

মানুষ তার যে সব দোষ-ত্রুটি গোপন রাখতে চায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে প্রকাশ করে দেয়াই গুপ্তচরবৃত্তি(التجسس)। অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা ও খুঁজে খুঁজে দোষ বের করা একটি গর্হিত অনৈতিক কাজ। বিশেষ করে কারো প্রতি মন্দ ধারণা, শত্রুতা-বিদ্বেষ বা কৌতুহলের বশীভূত হয়ে কিংবা অসৎ উদ্দেশ্যে কারো ক্ষতি করার মানসে এরূপ করা সম্পূর্ণভাবে জঘন্য অন্যায়। এটা ব্যক্তির হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এতে মানুষের সম্মান নষ্ট হয়। এটা সমাজে অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদের জন্ম দেয়। কেননা কেউ অন্যের দোষ বের করলে সেও তার দোষ বের করবে। ফলে সমাজে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে। এজন্যে ইসলামী রাষ্ট্রও তার গোয়েন্দা বাহিনীকে এই অনুমতি দেয় না যে, মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটি খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের শাস্তি দেবে। বরং যে সব অপরাধ ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়ে কেবল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। তাই সাধারণভাবে অথবা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষ-ত্রুটির গুপ্তচরবৃত্তি করা হারাম। মহান আল্লাহ মুমিনদের এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন- وَلَا تَجَسَّسُوا[৩] "এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" মুফাস্‌সিরগণ বলেন, তাজাসসুস হলো কোন মুসলমানের গোপন কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা। সুতরাং, 'ওয়া-লা তাজাস্‌সুস' মানে হলো আল্লাহ যখন কারো দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে তখন তোমরা কেউ তোমাদের সে ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ফাঁস করে দেবে না।[৪]
উল্লেখ্য যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে, সমাজকে ফাসাদমুক্ত করার জন্য বৃহৎ কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রয়োজনে সীমিত ক্ষেত্রে গুপ্তচরবৃত্তি সাময়িকভাবে অনুমোদিত বলে আলিমগণ মত দিয়েছেন।

নাবী-রাসূল ছাড়া কোন মানুষ পাপ ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।বিশেষ করে বর্তমানকালে আমরা প্রায় সবাই নানা ধরনের বড় বড় পাপে নিমজ্জিত। কিন্তু আমরা নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো দেখি না, আমাদের দৃষ্টি অন্যের প্রতি। আমরা নিজেদের ভালো মনে করে অন্যের দোষ খুঁজে খুঁজে বের করে তা সমাজে ছড়িয়ে দেই। এটা অতি নিকৃষ্ট মানসিকতা। ইসলামে এটা সম্পূর্ণ হারাম। বিকৃতরুচির নিকৃষ্ট লোকেরাই ছাড়া কোন মুমিন এতে লিপ্ত হতে পারে না। তাই এ ধরনের গর্হিত অপরাধ থেকে বিরত থাকতে রাসূল(সা.) বলেন[৫],..."অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করো না এবং অপরের গোপন কথা কান পেতে শুনবে না। পরস্পরে শত্রুতা-বিদ্বেষ করো না। বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।"

অপরের গোপন বিষয় অন্বেষণ আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। এ কাজের পরিণতি অতি মন্দ। এ মর্মে নাবী(সা.) বলেন-[৬]"যদি কোন ব্যক্তি অপরের কথা কান পেতে শোনে যা সে অপছন্দ করে তবে কিয়ামতের দিন তার কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হবে।"

---

[১]. ইমাম নববী, *রিযাদুস সালেহীন* (ঢাকা:তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১) পৃ. ৬৭৩-৬৭৫। [সংক্ষেপিত]
[২].মূল আরবী [ثلاثة ليست لهم غيبة الإمام الجائر والفاسق المعلن بفسقه والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته] ইমাম বাইহাকী, শু‘*আবুল ঈমান*, খ.৫,পৃ.৩১৮,রিওয়ায়েত নং ৬৭৯২।
[৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১২।
[৪]. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *কিতাবুল কাবায়ের*, বাংলা অনু. আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২) পৃ. ১৯৯।
[৫]. মূল আরবী [...ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৬৩।
[৬].মূল আরবী[ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তা‘বীর হা. নং ৬৬৩৫।

কানাঘুষা বা কানাকানি : কানাঘুষা গীবত ও চোগলখুরীতে উদ্ধুদ্ধকারী একটি মন্দ কাজ। এর মাধ্যমে অন্যের দোষ চর্চা করা হয়। এতে ভুল বোঝাবুঝি ও পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[১] إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "কানাঘুষা তো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে যাতে মু'মিনরা কষ্ট পায়। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই উপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।"

হাসান বসরী (র.) বলেন, "যে অন্যের কথা তোমার কাছে বলে, মনে রাখবে সে তোমার কথাও অন্যের কাছে বলবে।"...ইবন মুবারক (রহ.) বলেন, "যারজ সন্তান কোন কথা গোপন রাখতে পারে না।"[২] –এ উক্তি দ্বারা তিনি এই দিকে ইশারা করেছেন যে, যারা কথা গোপন রাখে না এবং কুৎসা রটনা করে বেড়ায় বুঝতে হবে এরা জারজ সন্তান।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"তিনজন লোকের মধ্য থেকে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দু'জনে যেন কানাঘুষা না করে, হ্যাঁ যদি লোকজন সমাগম হয় তবে দোষ নেই। কেননা তৃতীয় লোকের মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হতে পারে।"[৩]

অন্যের গোপন দোষ অন্বেষণ, গুপ্তচরবৃত্তি ও কানাঘুষা -এর কারণ ও প্রতিকারে জন্য দেখুন গীবতের কারণ ও প্রতিকার।

❑.চোগলখুরী (النميمة):

নামীমা শব্দের আভিধানিক অর্থ–কুৎসা, অপবাদ, চুগলি, বিশ্বাসঘতকতা।[৪] পরিভাষায় নামীমা(চোগলখোরী) হচ্ছে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তির কথা অপর ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করা।[৫] এই বর্ণনা কথায়, লেখায় বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে হতে পারে।

নামীমাকারী অর্থাৎ চোগলখোর ব্যক্তির চারিত্রিক প্রধান বৈশিষ্ট হল সে দু'মুখী নীতি গ্রহণ করে থাকে। সে প্রত্যেকের মনোরঞ্জনের জন্য কথা বলে এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। সে কারো সামনে তার প্রশংসা এবং পিছনেই নিন্দা করে। সে সর্বদা মিথ্যা, গীবত-নিন্দা, বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, হিংসা, মুনাফেকী ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়।

চোগলখোরী এমন একটি নিকৃষ্ট স্বভাব, যা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে কলহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টিতে এক জঘন্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়। মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা ধ্বংস করে দেয়। সমাজে ব্যাপকভাবে ফাসাদ, অশান্তি ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। এই মন্দ কর্মটি ব্যক্তিকে অতি নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত করে। কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মুমিন ব্যক্তি এতে লিপ্ত হতে পারে না। কুরআনে এরূপ মন্দ স্বভাবের ব্যক্তিদের বর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেছে-[৬]

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ- هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ-مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ- عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

"অনুসরণ করো না তার –যে কথায় কথায় শপথ করে, সে লাঞ্ছিত, পিছনে নিন্দাকারী, যে চোগলখুরী করে বেড়ায়। যে কল্যাণ কাজে বাঁধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ; দুষ্ট প্রকৃতির, তারপর জারজ।"

চোগলখোর সমাজে শান্তির দুশমন, ঐক্য-সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও সমাজের অকল্যাণ সৃষ্টির হোতা। তারা বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ বের করার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। এজন্য রাসূল সা. বলেন–'আমি তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে সে সম্পর্কে বলব না? তারা(সাহাবীগণ) বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, 'যারা চোগলখুরী করে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং নিরপরাধ মানুষের উপর পাপ আরোপ করে।'[৭]

নামীমা (চোগলখোরী) হারাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন–"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৮] তিনি আরও বলেন-"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতিওয়ালাকে। সে এমন লোক, যে একরূপ নিয়ে আসে একজনের নিকট এবং আরেকরূপ ধরে যায় আরেক জনের নিকট।"[৯] এরা এতই নিকৃষ্ট যে, আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন এদেরকে কুকুরের চেহারায় উত্থিত করবেন।[১০] এবং এদের আগুনের দু'টি জিহবা থাকবে।[১১]

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করছে। কিন্তু তারা বড় কোন অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করছে না। তার মধ্যে এক ব্যক্তি প্রসাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত'।[১২]

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮: আয়াত ১০।

২. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০৩, পৃ.১৫৪।

৩.মূল আরবী[إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইস্তিযান, হা. নং ৫৯৩২, *মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, হা.২১৮৪।

৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯০১।

৫. মূল আরবী [وأما النميمة : فهي نقلُ كلام الناس بعضِهم إلى بعضٍ على جهةِ الإفساد] ইমাম নববী রহ.,*আযকারুন নববী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩৫।

৬. আল-কুরআন,সূরা আল-ক্বালাম ৬৮: আয়াত ১০-১৩।

৭.মূল আরবী[الا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال فشراركم المفسدون بين الأحبة المشاءون بالنميمة الباغون البرآء العنت...] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৬, পৃ.৪৫৯, হা.নং ২৭৬৪২।

৮.মূল আরবী [لا يدخل الجنة نمام] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং১০৫, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৭০৯।

৯.মূল আরবী[تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হা.নং ৫৭১১; *সহীহ মুসলিম*,হা.নং ২৫২৬।

১০. মূল আরবী[...الهمازون واللمازون والمشاؤون بالنميمة الباغون للبرآء العنت يحشرهم الله في وجوه الكلاب.] হাফিজ মুনযিরী, খ.৩, পৃ.৩২৫, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৪২৭৭।

১১. মূল আরবী [من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৭৩।

১২.**মূল আরবী**[مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুত তাহারাত, হা.২০;

নামীমার(চোগলখোরী) কারণ: ক. কারো প্রতি মনের ক্ষোভ মিটানো। খ. কোন দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার জন্য। ঘ. হিংসা-বিদ্বেষের কারণে। ঙ. কাউকে ঘৃণার পাত্র করার লক্ষ্যে। ছ. হীন মনোবৃত্তি ও পরশ্রীকাতরতা। জ. স্বার্থ হাসিল।

নামীমা (চোগলখোরী) থেকে বাঁচার উপায়: ক. নামীমার ভয়ানক পরিণতি অনুধাবন করে যবানের হিফাযত। খ.কারো নামীমা করতে ইচ্ছা হলে নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করে ধৈর্যধারণ। গ. যে সব কারণে নামীমা করা হয় তা থেকে দূরে থাকা। ঙ.দ্বীনি জ্ঞানার্জন, নেক আমল ও আত্মশুদ্ধি অর্জন। চ.পরিবারের সবাইকে ইসলামী আদব-আখলাক শিক্ষা দান।

কারো নিকট কেউ চোগলখুরী করলে করণীয়: ক.যাচাই-বাছাই ছাড়া চোগলখোরকে বিশ্বাস না করা। খ. চোগলখোরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া। গ. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ঘৃণা করা। ঘ. যার সম্পর্কে মন্দ বলা হয়েছে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা। ঙ. তার নিকট যা বলা হয়েছে তার সত্যতা যাচাই করার পরও এর পিছনে লেগে না থাকা।

নামীমা ক্ষতিপুরণে করণীয়: যার নামীমা করা হয়েছে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা। সম্ভব হলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। যে সব স্থানে তার গীবত, নামীমা ও ছিদ্রান্বেষণ করা হয়েছে সেখানে তার সদগুণাবলী আলোচনা করা।[১]

❑. মিথ্যা অপবাদ (القذف) ও অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া :

মিথ্যা অপবাদ বলতে সাধারণত ব্যভিচারের অপবাদ বুঝানো হয়। যার আরবী প্রতিশব্দ কাযফ (قذف)। কাযফ এর আভিধানিক অর্থ: নিক্ষেপ করা, সঞ্চয় করা। কাউকে গালি দেয়া, দোষারোপ করা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শরী'আতের পরিভাষায়–"কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে স্পষ্টকারে কিংবা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদ আরোপ করাকে কাযাফ বলা হয়।" অনুরূপভাবে কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সমকামিতা বা পশুর সাথে সঙ্গম কিংবা কোন মহিলার পশ্চাদ্দার দিয়ে সঙ্গমক্রিয়ার অভিযোগ আরোপও কাযাফ–এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[২]

কাযাফ এক ধরনের যুলম ও নিকৃষ্ট অনৈতিক কর্ম। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করা হয়। এর মাধ্যমে নির্দোষ ও সম্মানিত ব্যক্তির চরিত্রে অন্যায়ভাবে কালিমা লেপন করা হয়, যা ব্যক্তির ও তার পরিবারের জন্য সম্মানহানিকর। এতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর সমাজের মানুষের প্রচণ্ড নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। জনগণের আস্থা থেকে চিরবঞ্চিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির লজ্জা, কষ্ট ও লঞ্ছনার কোন সীমা থাকে না। অভিযুক্ত অবিবাহিতা মেয়ে হলে বিবাহ অনিশ্চিত হয়ে যায়। বিবাহিত হলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা নষ্ট ও দাম্পত্য কলহ স্থায়ী রূপ নেয়। আত্মীয়-স্বজনের কাছে শ্রদ্ধা-ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায়। এটা সমাজে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এ কারণে ইসলাম এই অপরাধ প্রতিরোধে মুসলিমদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে-[৩] وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ "এবং জেনে শুনে কোন অপবাদ রটাবে না।" এই অন্যায়রোধে ইসলাম কঠোর সতর্ক বাণী দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এ অপরাধে কেউ লিপ্ত হলে তাকে ফাসিক (পাপাচারী) গণ্য করে তার জন্য শাস্তি হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাতের বিধান দিয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৪] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ "আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর এরাই হলো ফাসিক।"

মিথ্যা অপবাদ আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই গুরুতর অপরাধ।[৫] এটি সাতটি ধ্বংসাত্মক মহাপাপের অন্যতম।[৬] মিথ্যা অপবাদ দাতার জন্য রয়েছে আল্লাহর গযব ও লানত।[৭] পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। মহান আল্লাহ বলেন-[৮], إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "নিশ্চয় যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" অন্যত্র বলেন- [৯], وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا "আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করল।" আরও বলেছেন-[১০], وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا "আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় যা তারা করেনি, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।"

---

[১]. বিস্তারিত দেখুন, আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০৩, পৃ.১৫০-১৬১।
[২]. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩।
[৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-মুমতাহিনাহ ৬০: আয়াত ১২।
[৪]. আল-কুরআন,সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০৪।
[৫]. আল-কুরআন,সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ১১-১৭।
[৬]. মূল আরবী[اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওসায়া, হাদীস নং ২৬১৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮৯।
[৭]. আল-কুরআন, ১১ : ১৮।
[৮]. আল-কুরআন,সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২৩।
[৯]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ৪ : আয়াত ১১২।
[১০]. আল-কুরআন,সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৫৮।

কাযাফ-এর কারণ: শত্রুতা, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ, আত্মকোন্দল, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও প্রতিশোধপরায়নতা ও হীন মানসিকতা। ক্ষমতার মোহ ও কারো প্রতি অন্ধভক্তি প্রদর্শন করতে।

কাযাফ প্রতিরোধে করণীয়: অপবাদাতাকে কুরআন ঘোষিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রদান। দ্বীনি জ্ঞানার্জন, আমল, আত্মশুদ্ধি ও পরকালীন পরিণতি চিন্তা।

❑. মিথ্যা সাক্ষ্য (قَوْلَ الزُّورِ) ও মিথ্যা শপথ:

মিথ্যা সাক্ষ্য বলতে সাধারণভাবে বুঝে থাকি কোন পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করা। কিন্তু বিষয়টির পরিধি বিস্তৃত। গ্রাম্য সালিস বা বিচালয়ে ছাড়াও আজকাল পুলিশ কেসের চার্জসীটে, ডাক্তাররা বাদী বা আসামীর মেডিকেল রিপোর্ট তৈরীতে ও উকিলরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য যে সবমিথ্যার আশ্রয় নেন, মূলত তা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের শামিল। যত ধরনের মিথ্যাচার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দান।

মিথ্যা সাক্ষ্য দান একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। এটি সামাজিক অবক্ষয় ও যুলমের অন্যতম হাতিয়ার। এতে নিরপরাধ ব্যক্তি যুলম ও হয়রানির স্বীকার হয়। এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং অন্যায়ের প্রসার ঘটে। তাই এ অপকর্ম নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন[১]–وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ-"আর তোমরা দূরে থাক মিথ্যা সাক্ষ্য হতে।"

মিথ্যা সাক্ষ্য আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য মহাপাপ।[২] রাসূল সা. বলেন–[৩]"কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা, মানুষ হত্যা করা, এবং মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।" কোন মু'মিন কখনই কোন অবস্থাতেই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪]–وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا "আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার কার্যকলাপের পাশ দিয়ে চলে তখন তারা সসম্মানে চলে যায়।"

মিথ্যা সাক্ষ্যদানের জঘন্য পরিণতি অতি মন্দ। এ সম্পর্কে নাবী কারীম সা. বলেন[৫] –"মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তারা হলেন– 'যারা উপকার করে খোঁটা দেয়, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্য বিক্রি করে এবং যারা অহংকারবশে কাপড় পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে'।"

মিথ্যা সাক্ষ্যের ন্যায় মিথ্যা শপথ ও সত্য সাক্ষ্য গোপন অনৈতিক ও জঘন্য মহাপাপ। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৬] إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -"যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।"

–এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার মালপত্র বিক্রির জন্য বাজারে গিয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলল যে, সে এত পরিমাণ মূল্য দিয়ে তা খরিদ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সে ঐ মূল্য দিয়ে তা খরিদ করেনি। উক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।[৭]

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কারণ: হীন স্বার্থ হাসিল, স্বজনপ্রীতি ও অর্থপ্রাপ্তির লোভ, পারস্পরিক বিবাদ-শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ।

প্রতিকারে করণীয়: নৈতিক শিক্ষা, মহান আল্লাহর ভয়, পরকালীন জবাবদিহিতা অনুভূতি সৃষ্টি এবং মন্দ পরিণাম চিন্তা করা।

❑. ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য (السخرية, الاستهزاء):

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও উপহাস হলো এমন একটি গর্হিত কাজ যে, কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্য তার দোষ-ত্রুটি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে শ্রোতার হাসি পায়। একে আরবীতে السخرية বা الاستهزاء বলে। এটা কথাবার্তা ছাড়াও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাধ্যমে কিংবা আকার-ইঙ্গিতেও হতে পারে।

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ইত্যাদি সবই ব্যক্তির মূর্খতার নিদর্শন। এ সবের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজকে উত্তম মনে করে এবং অন্যকে হেয়-তুচ্ছজ্ঞান করে, যার দ্বারা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিদ্রুপ-উপহাস ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা অহমিকাবশত অশোভন আচরণ ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী। এতে পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৩০।
[২]. মূল আরবী [عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আকদিয়াহ, হাদীস নং ৩৫৯৯।
[৩].**মূল আরবী**[أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুদ দিয়াত,হা.৬৪৭৭; *মুসলিম*,কিতাবুল ঈমান, হা.৮৭
[৪]. আল-কুরআন,সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫: আয়াত ৭২।
[৫].**মূল আরবী**[ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান,হা.১০৬; *আবূ দাউদ*, হা.৪০৮৭
[৬]. আল-কুরআন,সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৭৭।
[৭]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং ১৯৮২ ও কিতাবুশ শাহাদাত, হাদীস নং ২৫৩০।

যায়। এতে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যকে বিদ্রুপ করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে, যা এক ধরনের যুল্ম। প্রত্যেক মানুষ সমাজে সম্মান-ইজ্জতের সাথে বাস চায় করতে। কিন্তু বিদ্রূপ-উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিলের কারণে উপহাসকৃত ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় ও মনে কষ্ট পায়। এতে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অনেক সময় তাতে ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করে। তাই কুরআনে এ কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ “হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ বা সম্প্রদায় যেন অপর কোন পুরুষ বা সম্প্রদায়কে উপহাস না করে, হতে পারে যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে, হতে পারে যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম।”
উল্লেখিত আয়াতের শিক্ষা দেয় যে, উপহাসকারী পুরুষ বা উপহাসকারিণী নারী অপেক্ষা উপহাসকৃত নারী বা পুরুষ আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত হতে পারে, তাই বোধসম্পন্ন কারো উচিত নয় কাউকে বিদ্রূপ, উপহাস ও তাচ্ছিল্য করা।

বিদ্রুপ-উপহাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অনর্থক কথাবার্তা আত্মশুদ্ধির পথে অন্তরায়। এ কারণে ব্যক্তির অন্তর পাপের কালিমা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, যা অনেক সময় সত্যগ্রহণ ও উপদেশ লাভে প্রবিন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]– فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ “তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে।”

বিদ্রূপ-উপহাস কাফির, মুনাফিক ও দুর্বৃত্ত পাপাচারীদের বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে ব্যক্তির অহঙ্কার, কৌলিণ্য ও নির্বুদ্ধিতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এরূপ চিত্রই ফুটে উঠেছে-[৩]

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ- وَإِذَامَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ- وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ- وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ

“নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত। আর যখন তারা মু'মিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। আর যখন তারা পরিবার–পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। আর যখন তারা মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত,‘নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট’।”
বিদ্রূপ-উপহাস ব্যক্তির নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। অভদ্র-নির্বোধ ছাড়া কোন মু'মিন ব্যক্তির মধ্যে এই মন্দ গুণ থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা.বলেছেন[৪]–“ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে,কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে।” অন্যত্র বলেন, ‘কোন মু'মিন ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী, ভর্ৎসনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজী হতে পারে না।’[৫]

বিদ্রূপ-উপহাস অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে কুফরীতে নিমজ্জিত করে, বিশেষ করে তা যদি হয় দ্বীনি বিষয় নিয়ে। এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৬]- وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا “যারা কুফরী করেছে তারা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে।” আরও বলা হয়েছে[৭]-ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا -“এজন্যই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রাসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে।”

❑. মন্দ বা বিকৃত নামে সম্বোধন:

একটি সুন্দর সমাজ গঠন এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির জন্য যতগুলো মৌলিক উপাদান বা মূল্যবোধ রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ কিছু কারণে বিনষ্ট হয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধাহীনতা, একে অপরকে অসম্মান করা এবং কাউকে মন্দ নামে সম্বোধন করা তন্মধ্যে অন্যতম। কেউ কাউকে মন্দ নামে সম্বোধন করলে সম্বোধনকারীর প্রতি সম্বোধনকৃতের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ক্ষোভ-শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে সমাজে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট হয়। তাছাড়া কাউকে মন্দ নামে ডাকা দ্বারা তাকে হেয়জ্ঞান করা হয়, এতে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই কুরআন মুমিনদের এসব মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[৮] وَلَاتَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ “আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দনাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম।”

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১১। আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৩১: ১৮।
[২]. আল-কুরআন,সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ১১০।
[৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন ৮৩: আয়াত ২৯-৩২।
[৪].মূল আরবী[حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم...] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.নং২৫৬৪; *সহীহ আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হা.৪৮৮২।
[৫]. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৭৭।
[৬]. আল-কুরআন,সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৫৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ১০৬।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১১।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি শারীরিক ক্রটির কারণে মন্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলে তার পরিচয় করে দেয়ার জন্য তাকে উক্ত মন্দ নামে ডাকা দোষণীয় হবে না। যেমন: কোন এক ইমামের পরিচয় দেওয়া হয় আল-আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন)।

বিদ্রূপ-উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণ: ক.বিদ্রূপকারী নিজকে শ্রেষ্ঠ, গুণী ও যোগ্যতাসম্পন্ন মনে করে এক ধরনের অহংকার ও আত্মম্ভরিতায় ভোগা। খ.অপরের শারীরিক ক্রটি, জ্ঞান-বুদ্ধিগত কমতি, সামাজিক মর্যাদাহীনতা, কৃত কোন অন্যায়। গ.আদর্শিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত আক্রোশ, প্রতিহিংসা ও মন্দ লোকের সাহচর্য ।

বিদ্রূপ-উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রতিকারে করণীয়: প্রত্যেক মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং সম্মান প্রদর্শন করা। কারো কোন আচরণ অপছন্দ হলে সংশোধনের জন্য ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা।

❑. কুধারণা পোষণ (الظن السوٴ):

কুধারণা হলো কারো প্রতি অকাট্য ও যথার্থ প্রমাণ ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করা। কুধারণা একটি খারাপ মনোবৃত্তি। এতে পরস্পরের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। ফলে পারস্পরিক সুসম্পর্কে ফাটল ধরে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের সূত্রপাত হয়। বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ও কুধারণা দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নিঃশেষ করে দেয়। এ ধরণের সন্দেহ ও কুধারণা জীবনকে তিক্ততর করলে বিবাহবিচ্ছেদসহ নানান বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। অনেক সময় কুধারণাকারী অন্যের সম্পর্কে এমন ধারণা করে, যা সত্য নয়। ফলে নিরপরাধ ও নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি মারাত্মক যুলম করা হয়ে থাকে, যা সমাজে বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এসব কারণে কুধারণা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন[১], يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ "হে মু'মিনগণ! তোমার অধিক অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান পাপ।"

কুধারণা একটি গুরুতর আত্মিক ব্যাধি ও অনৈতিক কাজ। এটা মন্দ লোকের স্বভাব, যা মানুষকে বিভ্রান্তি, মিথ্যা ও যুলমে নিক্ষেপ করে। বিশেষ করে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে সৃষ্ট কুধারণা কুধারণাকারীকে অন্যের ব্যাপারে নিন্দা ও গীবত করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ মন্দ স্বভাব মানুষকে অন্যের দোষ খুঁজতে উৎসাহিত করে। তাই এ থেকে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[২]

> তোমরা কুধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা কুধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা। কারো পিছে গোয়েন্দাগিরি করো না। কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিও না। একে অন্যকে ধোঁকা দিও না, পরস্পরের প্রতি হিংসায় লিপ্ত হয়ো না। পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতা করো না। পরস্পরের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়ো না। বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।

কুধারণার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো আল্লাহর প্রতি কুধারণা। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।[৩] মানুষের প্রতি বেশী আশা বা ভয় করা। আল্লাহর প্রতি কুধারণা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।যেমন: কেউ ভাবল বা বলল, আমার জন্য আল্লাহর বণ্টন যথাযথ হয়নি, আমার আরেকটু বেশী পাওয়া দরকার ছিল, আল্লাহ অন্যকে দিল কেন আমাকে দিল না? আমার ভাগ্যে এ সব মন্দ? আমাকে এত কম সম্পদ, মর্যাদা দিল কেন? আমাকে আরেকটু বেশী ভালো হত, আমি যতটুকুর অধিকারী তা আমাকে দেয়া হয়নি ইত্যাদি। কেউ যদি এসব বিষয় মুখে প্রকাশ নাও করে তার অন্তর বলে আল্লাহ আমার ব্যাপারে অন্যায় করেছে। তাও তা আল্লাহর প্রতি কুধারণার মধ্যে গণ্য হবে। এভাবে মানুষ বিভিন্নভাবে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণায় লিপ্ত হয়, যা মানুষকে কুফর ও নিফাকে নিমজ্জিত করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪] - يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ "তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জাহিলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল,'আমাদের কি কোন বিষয়ে অধিকার আছে' বল, 'নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহ্র'।"

উল্লেখ্য যে, কুধারণা হারাম ও পাপ কাজ হলেও কিছু ক্ষেত্রে তা ওয়াজিব: যেমন-ক.কেউ প্রকাশ্যে কুফরে লিপ্ত বা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করলে। খ.এমন দল বা গোষ্ঠী সাথে জড়িত হলে যারা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের সাথে জড়িত। গ.প্রকাশ্যে আল্লাহ বা রাসূলের অবাধ্যতা করলে কিংবা প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ফাসিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে।

কুধারণার কারণ: ক. কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, খারাপ ইচ্ছা, ক্রটিপূর্ণ সংকল্প। খ. সন্দেহ প্রবণতা, হীন মানসিকতা ,অহংকার ও দম্ভ। গ. মন্দ লোকের সাহচর্য ও সঠিক শিক্ষার অভাব।

কুধারণা প্রতিরোধে করণীয়: ক. কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন কাজ থেকে দূরে থাকা, সন্দেহযুক্ত কর্ম ও স্থান পরিহার করা। অসৎ সঙ্গ ও মিথ্যা থেকে দূরে থাকা। খ. আত্মসমালোচনা করা এবং কুধারণার মন্দ পরিণতি স্বরণ করা। গ. সামষ্টিক ক্ষেত্রে ইসলামী আচরণগত শিষ্টাচার মেনে চলা।

❑. প্রশংসা ও নিন্দায় আতিশয্য:

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১২, আল কুরআন ১৭:৩৬।

[২].**মূল আরবী** [إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হা. ৫৭১৭।

[৩]. আল-কুরআন (২৯:২৩)।

[৪]. আল-কুরআন সূরা আলে-ইমরান ০৩: আয়াত ১৫৪।

সমাজ জীবনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নিজ পছন্দীয় ব্যক্তি, পূন্যবান ব্যক্তি, দলীয় বা ধর্মীয় নেতা, কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিকের প্রশংসায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তাদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এমন অনেক কথা বলেন যা তাদের মধ্যে আদৌ নেই। আবার প্রতিপক্ষ দলীয় বা ধর্মীয় নেতা, ধর্মবিশ্বাস কিংবা কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক বা অপছন্দীয় ব্যক্তির নিন্দায়ও বাড়াবাড়ি করে থাকেন। অনেক সময় তাদের চরিত্র হননে মিথ্যা অপবাদও আরোপ করেন। প্রশংসা বা নিন্দায় এ ধরণের সীমাহীন বাড়াবাড়ি অনৈতিক কাজ। কেননা এ সব বাড়াবাড়ি সমাজে মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, ফিতনা-ফাসাদ ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। এজন্য কুরআনে মুশরিকদের দেব-দেবীকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে।[১] কুরআন পূববর্তী সব নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রতি যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব দিয়েছে, কারো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেনি।[২]

অনেক রাসূল সা. ওলী-আউলিয়া ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করে থাকে, তাদের এহেন কর্মকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। সচরাচর দেখা যায় যে, ওলী-আউলিয়া ও পূণ্যবান ব্যক্তি যেমন–শায়খ আবদুল কাদির রহ. ও শায়খ মাঈনুদ্দীন চিশতী প্রমূখের প্রশংসায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করা হয়। তাদের ব্যাপারে এমন সব কথা বলা হয় যা কেবল আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। আজকাল অনেক নেতা বা দার্শনিকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রশংসায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। এতে অনেকে শিরক ও কুফরে লিপ্ত হচ্ছেন। আল-কুরআনের শিক্ষা উপেক্ষা করাই এসব বিভ্রান্তির প্রধান কারণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত সাহাবী উসমান ইবন মাজউন রা. এর মৃত্যুর পর জনৈক আনসারী মহিলা সাহাবী(যিনি তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী ছিলেন) তাঁর প্রশংসায় বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করবেন অর্থাৎ জান্নাত লাভ করবেন। সেখানে নাবী সা. উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহিলার সে কথা অপছন্দ করে বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করবেন।... *"আল্লাহ্র কসম আমি জানি না (সেদিন) আমার কি হবে? অথচ আমি আল্লাহ্র রাসূল।"*[৩]

মুসলিমদের অনেকেই মুহাম্মাদ সা. প্রশংসায় সীমাহীন বাড়াবাড়ি করেন-এটা উচিত নয়। সন্দেহ নেই যে, তিনি পৃথিবীর সর্বকালের সেরা মহামানব, সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয়দিক থেকে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সফলতম ব্যক্তিত্ব। মহান আল্লাহ বলেন[৪] –وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ-"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, রাসূল সা. মহান আল্লাহর একজন সৃষ্টি, যিনি নিজেকে মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। কুরআনে তিনি নিজেকে আল্লাহর রাসূল মর্যাদা প্রদানের সাথে তাঁকে অন্য মানুষের মত একজন মানুষ গণ্য করেছে। এ মর্মে বলা হয়েছে-[৫] قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ "বল, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ।" এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সা. বলেন[৬]–"তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেরূপ খ্রিষ্টানরা মারিয়ামপুত্র ঈসার ব্যাপারে করেছে। আমি আল্লাহ্র একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলো, আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল।" উল্লেখ্য যে, অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে খৃষ্টানরা 'ইসা ('আ.) কে আল্লাহর পুত্র বা তিন খোদার একজন গণ্য করেছে, যা বড় শিরক।

লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ সা. সেরা মহামানব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হওয়া সত্ত্বেও পরকালীন জীবনে নিজের চূড়ান্ত পরিণতির বিষয়টি একান্তভাবে মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৭]– قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ "বল, আমি কোন নূতন রাসূল নয়। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমার প্রতি যা ওহী অবতীর্ণ করা হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৮] قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا- قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ "বল, আমি তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক নই। বল, আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।কেবল আল্লাহর বাণী ও তাঁর রিসালাত পৌঁছানোই আমার দায়িত্ব।" অন্যত্র আরও বলা হয়েছে[৯] قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা।"

[১]. আল-কুরআন, ০৬:১০৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩৫-১৩৬।
[৩].মূল আরবী[والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১১৮৬।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ১০৭।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১: আয়াত ০৬।
[৬]. মূল আরবী[لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২৬১।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্ক্বাফ ৪৬: আয়াত ০৯।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-জিন্ন ৭২: আয়াত ২১-২৩।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৭: আয়াত ১৮৮, আরও দেখুন- আল-কুরআন(০৬:৫০)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে রাসূল সা. ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তাতে সবার উচিত কারো প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা। অনুরূপভাবে কারো নিন্দার ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি না করা। কেননা একজন দৃশ্যমান পূণ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু ঈমানের উপর নাও হতে পারে, আবার একজন পাপী মৃত্যু পূর্বমুহূর্তে ক্ষমা পেয়ে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেন-[১]

> তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতের আমল করতে থাকে এমনকি জান্নাত ও তার মধ্যে এক হাত দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার তাকদীর তার উপর অগ্রগামী হয় তখন সে জাহান্নামীর কাজ করতে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের মধ্যে কেউ জাহান্নামীর আমল করতে থাকে এমনকি জাহান্নাম ও তার মধ্যে এক হাত দূরত্ব থাকে। এমন সময় তার তাকদীর তার উপর অগ্রগামী হয় তখন সে জান্নাতের কাজ করতে থাকে এবং জান্নাত প্রবেশ করে।

উল্লেখ্য যে, জীবিত মুসলিমদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কিন্তু যা মৃত্যু ইসলামের বিরোধীতা ও কুফরীর উপর হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

❑. অন্ধানুসরণ-অন্ধানুকরণ(التقليد):

সত্য-মিথ্যা, সঠিক-বেঠিক ও ভালো-মন্দের বাছ-বিচার না করে মনে-প্রাণে কারো অনুসরণ ও অনুকরণ করাই অন্ধানুসরণ -অন্ধানুকরণ। একে আরবীতে বলা হয় التقليد (তাকলীদ)। অন্ধানুসরণ সাধারণত পূর্বপুরুষ, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, দার্শনিক, সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা কিংবা সমাজের রীতি-নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মানুষকে বিভ্রান্তকারী ও সত্যবিমুখকারী বিষয়সমূহের মধ্যে অন্ধানুসরণ-অন্ধানুকরণ অন্যতম।[২] এটা মানুষকে ভ্রষ্টতা, পশ্চাৎপদতা এমনকি শিরক ও কুফরের দিকে ধাবিত করে। এতে মানুষ বাপ-দাদা, নেতা-নেত্রী, ধর্মগুরু কিংবা সমাজের পূজারীতে পরিণত হয়। এ কাজ বড় ধরনের মূর্খতা। বিবেকহীন মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কেউ এ কাজ করতে পারে না। এতে মানুষের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও নৈতিক শক্তিকে ক্রমাগত নিষ্ক্রিয় ও ভোঁতা করে ফেলে। এটা মানব সমাজে জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের। সুদূর অতীত থেকে অদ্যাবধি যুগে যুগে এটা অসংখ্য মানুষকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করেছে। কুরআনে বর্ণিত ইবরাহীম ‘আ. এর জাতির আচরণে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ইরশাদ হচ্ছে-[৩]

> إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ-قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ-قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ-أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ-قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ-قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ-أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ
>
> “যখন তিনি (ইবরাহীম ‘আ.) তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কিসের ইবাদত কর? তারা বলল, আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে এগুলোর পূজায় রত থাকব। সে বলল, ‘যখন তোমরা প্রার্থনা কর তারা কি শোনে?’ ‘অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে’? তারা বলল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এরূপ করতে দেখেছি। তিনি বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা কিসের পূজা করছ’? তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা ?” রাসূল সা. এর সমসাময়িক আরব মুশরিকদের মধ্যেও একই চিত্র দেখা যায়-[৪]
>
> (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ)
>
> “আর যখন তাদের বলা হয়,‘তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন’, তখন তারা বলে,‘বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই বুঝত না এবং হিদায়াত প্রাপ্তও ছিল না?”

উল্লেখিত আয়াতসমূহে দীলল-প্রমাণবিহীনভাবে কারো অন্ধানুসরণ কিভাবে মানুষকে শিরক, কুফর ও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায় তার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বৃহৎ মানব গোষ্ঠী কিছু অজ্ঞ লোকের অন্ধানুসরণের কারণে সত্যচ্যুত হয়ে আল্লাহর প্রেরিত সত্য নাবী-রাসূলগণ ও কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে স্বহস্তে নির্মিত দেবতার উপাসনা করছে।

অতীতকাল থেকে মানুষের মধ্যে অন্ধানুসরণের বিশেষ প্রবণতা দেখা গেলেও বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও তা আরও বেড়ে গেছে। এখন ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে অন্ধানুসরণ করতে দেখা যায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাধারণত নিজ মাযহাব ও পীরদের অনুসারীরা স্বীয় মাযহাব ও পীরদের অন্ধানুসরণ করে থাকে; যদিও মাযহাবের ইমাম কোন ক্ষেত্রে ভুল করে থাকেন কিংবা পীর প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী আদেশ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ মানুষ মানব রচিত বিভিন্ন মতাদর্শ এবং নিজ দলীয় নেতা-নেত্রীদের অন্ধানুসরণ করে চলছে। প্রকাশ্য শরীয়াহ বিরোধী বিধান রচনা করলেও কেউ তার অনুসরণে দ্বিধা করে না। অনুরূপভাবে শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আজ পাশ্চাত্যসহ বিভিন্ন জাতির অন্ধানুসরণ-অন্ধানুকরণের জয়জয়কার চলছে। কথিত জ্ঞানীরা এই অপকর্মে পিছিয়ে নেই। ফলে তাদের দ্বারা সাধারণ জনগোষ্ঠী ধোঁকায় পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে, এ সমস্ত লোক এক ধরনের কুফর ও শিরকে লিপ্ত। এদের ক্ষেত্রে কুরআনের এই আয়াতটি প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ্ বলেন-[৫], اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ “তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতদের এবং দরবেশদেরকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করেছে।” –এই আয়াতের ব্যাখ্যায়

---

[১]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু বাদয়িল খালক, হাদীস নং ৩০৩৬; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কাদর, হাদীস নং ২৬৪৩।
[২]. অন্ধানুকরণ অর্থ–নির্বিচারে অনুসরণ, যুক্তিহীন অনুরূপ আচরণ। (*বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* প্রাগুক্ত, প.৩৭)।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু‘আরা’ ২৬: আয়াত ৬৯-৭৬।
[৪]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭০; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৩১: ২১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা তাওবা ০৯:৩১।

আদী ইবন হাতিম(রা.) বলেন, ‘রাসূল সা. কে উক্ত আয়াতটি পাঠ করতে শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করিনি! তিনি বলেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা তা তোমাদের জন্য হালাল করলে তোমরা কি তা হালাল বলে গ্রহণ করনি? আর আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করলে তোমরা কি তা হারাম বলে মেনে নাওনি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এ-ই হলো তাদের ইবাদত করা।’(তিরমিযী) হুযাইফা (রা), ইবনু আব্বাস(রা) প্রমুখ সাহাবী বলেন যে, ইহূদী-খৃস্টানদের পণ্ডিত-দরবেশগণ যখন আল্লাহর বিধান উল্টে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করত তখন তারা তা মেনে নিত। আর এই আনুগত্যই ছিল তাদের ‘রব’ মানা।[১]

আজকাল মুসলিম সমাজেও অনেক মানুষকে জাগতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ ব্যক্তি, পীর সাহেব ও নেতা-নেত্রীর অন্ধানুসরণ করতে দেখা যায়। এভাবে দীলল-প্রমাণ ছাড়া কারো অন্ধানুসরণ করা অত্যন্ত নির্বোধ সুলভ কাজ ও অনৈতিক। আর যদি কোন নেতা-নেত্রী, দার্শনিক, পীর সাহেব, ধর্মীয় নেতার কথা আল-কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হয় তবে আল-কুরআন ও হাদীস বর্জন করে তাদের অন্ধানুসরণ করা সুস্পষ্ট কুফর ও মারাত্মক ভ্রষ্টতা। পূর্ববর্তী ইহুদী-খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্মগুরুদের অন্ধভাবে মেনে নেয়ার কারণে তাদের বলা হয়েছে *“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পুরহিতদেরকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করেছে।”* তাই কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত নেতা-নেত্রী, দার্শনিক, পীর সাহেব, ধর্মীয় নেতার কথা অন্ধভাবে মেনে নেয়া কুফর ও শিরক। কাজেই যে বিষয়ে কারো সুস্পষ্ট দীলল ও সঠিক জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে সঠিকভাবে না জেনে কারোও অন্ধানুসরণ করা যাবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২] – وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً “আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।”

আজকাল বিশুদ্ধ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণের কথা বলা হলে তিনি উত্তর দেন আমার মাযহাবের ইমাম এত বড় আলিম, আমার পীর এত বড় বুজুর্গ, তারা কি ভুল করতে পারেন? হতে পারে তাদের কাছে কোন কারণে অধিক বিশুদ্ধ হাদীস পৌঁছেনি। কিন্তু আজ বিশুদ্ধ হাদীস পৌঁছার পর কিভাবে একজন বিবেকবান মুমিন দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের আমল করতে পারে। এরূপ কর্মনীতি তো গোমরাহী। এ ধরনের কর্মনীতি কাফির-মুশরিকদের কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়, যারা তাদের পূর্বপুরুষের অন্ধানুসারী ছিল। অথচ সত্যপন্থী ইমাম ও আলিমগণ এ ধরণের অন্ধানুসরণ-অন্ধানুকরণ প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। তারা অন্ধানুসরণ করতে নিষেধ করেন। এ প্রসংঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, “তোমাদের কেউ যেন তার দ্বীনের ব্যাপারে কারো অন্ধানুসরণ না করে।”[৩] এ প্রসংঙ্গে

• ইমাম মালিক রহ. (মৃ.১৭৯হি.) বলেন, “এই কবরবাসী তথা রাসূল সা. ছাড়া অন্য সব মানুষের (মর্যাদা হচ্ছে এই যে, তার) কথার কিছু অংশ গ্রহণও করা যায়, বর্জনও করা যায়।”[৪] তিনি আরও বলেন, “আমি তো একজন মানুষ। ভুলও করি আবার শুদ্ধও করি। আমার মতামতের প্রতি তোমারা দৃষ্টিপাত করবে। এবং যা কিছু কুরআন-হাদীসের মোতাবেক হবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যা কিছু কুরআন-হাদীসের মোতাবেক হবে না তা তোমরা বর্জন করবে।”[৫]

• ইমাম আবূ হানীফা রহ.(১৫০হি.) ও আবূ ইউসুফ রহ.(১৭৬হি.) বলেন, “আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়।”[৬] আবূ হানীফা রহ. আরও বলেন, “যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।”[৭]

• ইমাম আহমাদ রহ. (মৃ.২৪১হি.) বলেছেন, “তুমি অন্ধভাবে আমার অনুসরণ করবে না। আর না অন্ধ অনুসরণ করবে মালিক, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ীর। বরং তারা যে স্থান থেকে(শরীয়তের) বিধি-বিধান গ্রহণ করেছেন তুমিও সেই স্থান থেকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে।”[৮]

মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান হলো বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অন্ধানুসরণকারীরা এই মহান দানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়, সত্য উপলব্ধি করতে চায় না। যারা এরূপ করে তারা কুরআনের দৃষ্টিতে পশু তুল্য কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট।[৯] এ শ্রেণীর মানুষ যুগে যুগে নাবী-রাসূল ও সত্যপন্থীদের বিরোধিতা করেছে। ফলে তারা হিদায়েত, সত্যপথ ও কল্যাণ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[১০]–

(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ - قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ)

---

[১]. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং ৩০৯৫; ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীরুল কুরআনিল* ‘*আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৪, পৃ.১৩৫।

[২]. আল কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ : আয়াত ৩৬।

[৩]. মূল আরবী[لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة]তাবারানী, *আল-মু‘জামুল কাবীর*, খ.০৯,পৃ.১৫২, হা. ৮৭৬৪।

[৪]. মূল আরবী[كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.] শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৮, পৃ.৯৩।

[৫]. মূল আরবী[إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق االكتاب والسنة فاتركوه]ইবনুল কাইয়িম, *ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন*,*প্রাগুক্ত*, খ.০১,পৃ.৭৫;

[৬]. মূল আরবী [لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه] ইবনুল কাইয়িম, *ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন* (বৈরুত : দারুল জাইল, ১৯৭৩) খ.০২, পৃ.২১১।

[৭]. মূল আরবী [إذا صح الحديث فهو مذهبي] *রাদ্দুল মুহতার* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, http://www.al-islam.com/), মুকাদ্দামাহ, খ.০১, পৃ.১৬৬।

[৮]. মূল আরবী[لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا] ইবনু তাইমিয়াহ, *রফ‘উল মালাম আনিল আয়িমাতিল আলাম* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, http://www.saaid.net/), পৃ.৪৯।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : আয়াত ১৭৯ ,আল কুরআন ১০:৭-৮, ৭:১৪৬।

[১০]. আল-কুরআন,সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ২৩-২৪।

আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলেছে, 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। তখন সে (সতর্ককারী) বলেছে, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথে নিয়ে আসি তবুও কি'? (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বলেছে, 'নিশ্চয় তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার প্রত্যাখ্যানকারী।

(فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ- وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)

অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'এ তো মিথ্যা যাদু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরূপ কথা আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও শুনিনি'। আর মূসা বলল, 'আমার রব সম্যক অবগত আছেন, কে তাঁর কাছ থেকে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয় যালিমরা সফল হবে না'।[১]

উল্লেখিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তির সঠিক ব্যবহার না করার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পূর্বপুরুষ বা ধর্মীয় নেতার অন্ধানুসরণ করছে এবং নাবী-রাসূল ও সত্য আসমানী কিতাবকে মিথ্যা গণ্য করছে। ইবনু'ল জাওযী (মৃ.৫৯৭ হি./১২০১খ্রী.) এ সম্পর্কে বলেন,

অন্ধ অনুসরণকারীগণ এক অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর তাতে বিবেক বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজ করে রাখা হয়। বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-বিবেচনা শক্তি মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহৎ গুণ। অন্ধ অনুসরণের নীতি গ্রহণ করা হলে এ মহৎ গুণের যাবতীয় কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। যার হাতে আলোর মশাল সে যদি তা নিভিয়ে অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে, তবে তার এ হাস্যকর আচরণ কোন ক্রোমেই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হতে পারে না।[২]

কাজেই দ্বীনের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত ওহীর নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী রাসূল সা. এবং আল্লাহ ও রাসূল সা. এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল নেতা ছাড়া অন্য কারোই অন্ধানুসরণ ও অন্ধানুকরণ করা যাবে না, তিনি বড় আলিম, বুজুর্গ বা পীর হোক না কেন; অন্যথা ভ্রষ্টতা ও অকল্যাণ অনিবার্য।

অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণের কারণ: নেতা-নেত্রী, ধর্মগুরু ও পূর্বপুরুষের প্রতি অতিভক্তি, সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার যাচাই না করে গ্রহণ। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ও আন্দাজ-অনুমান। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর অপতৎপরতা।

অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ বর্জনে করণীয়: কুরআন-সুন্নাহর দলীল ছাড়া কারো কথা বা দাবী গ্রহণ না করা। সমাজ ও পূর্বপুরুষদের প্রতিটি রীতি-নীতি ও বিশ্বাস সত্য জ্ঞানের মাপকাঠিতে যাচাই-বাছাইপূর্বক গ্রহণ করা। ভ্রান্ত ও কুসংস্কারপূর্ণ রীতি-নীতি ও বিশ্বাস বর্জন এবং তার অসারতা সমাজের মানুষের নিকট যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা।

❑.অসৎ সঙ্গ ও মন্দ পরিবেশ:

সমাজে চলতে গেলে মানুষের সঙ্গী ও বন্ধুর প্রয়োজন হয়। সঙ্গী বা সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। সৎ সঙ্গী যেমন উপকারী তেমনি অসৎ সঙ্গী ক্ষতিকর। প্রবাদ আছে–'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। কুরআনেও এর বাস্তব চিত্র দেখতে পাই– প্রখ্যাত রাসূল নূহ ('আ.) এর এক পুত্র (কিনান) নাবী পরিবারের সদস্য হয়েও দুস্কৃতিকারী কাফিরদের সংসর্গে থাকায় কুপথে পরিচালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে নাবী বংশের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।[৩] অসৎ সঙ্গীর প্ররোচনায় মানুষ মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত ফিরআউন ও তার সঙ্গী হামানের কথা উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সমাজেও অনেক অপরাধের নেপথ্যে দেখা যায় অসৎ সঙ্গীর কুপ্রভাব। অসৎ সঙ্গীর সাহচর্যে অপরাধী বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্ম ও অপরাধে জড়িয়ে যায়। এজন্য কুরআন অসৎ সঙ্গের অকল্যাণের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছে[৪]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইরা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।" অন্যত্র এসেছে[৫]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা অধিক ভয়াবহ। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে।" আরও বলা হয়েছে[৬] – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "হে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৩৬-৩৭।
[২]. ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস* (বৈরুত: দারুল ফিক্‌র, ২০০১) পৃ.৭৪।
[৩]. দেখুন, আল-কুরআন ১১:৪২-৪৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯:আয়াত ২৩, এছাড়া দেখুন আল-কুরআন (০৩:২৮, (৩:১০০), (০৪:১৪৪),(৫:৫৭), (৬০:০১-০২) (৫৮:২২), (০৬:৬৮)।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ০৩: আয়াত ১১৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৫১।

মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু।আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে,সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।"
উল্লেখিত আয়াতে বিভিন্ন শ্রেণীর অসৎ সঙ্গীর পরিচয় উল্লেখপূর্বক তাদের সাহচর্যের অনিষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তাই কারো সাহচর্য লাভ কিংবা বন্ধুত্ব করার পূর্বে তার স্বভাব, দ্বীন ও বিশ্বাস সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত।

অসৎ সঙ্গের ক্ষতি শুধু পার্থিব জীবনের মধ্যে সীমিত নয়। বরং এজন্য পরকালে রয়েছে অপূরণীয় ক্ষতি। আল-কুরআনে পরকালীন জীবনে অসৎ সঙ্গের সর্বনাশা ক্ষতির একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে মানুষকে সতর্ক হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[১]–

(وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ- قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ- وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

আর তুমি যদি দেখতে যালিমদের, যখন তাদের রবের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম'। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, তাদেরকে বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদের তা থেকে বাঁধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'। আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা, যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাদেরকে বলবে, 'বরং এ ছিল তোমাদের দিন–রাতের চক্রান্ত, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং তাঁর শরীক স্থির করি'। আর তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে।" কুরআনে আরও বলা হয়েছে-[২]

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي- يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا-يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম'! 'হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। 'অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক'।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে[৩]–وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ-"আর অপরাধীরাই শুধু আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল"।

অসৎ সঙ্গের অনিষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৪]–"মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই, তোমাদের খেয়াল করা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো?"

মন্দ পরিবেশ: সঙ্গীর মত মানুষ পরিবেশের দ্বারাও দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। এটা মানব প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত আশংকাজনক, যা মানুষের অন্তরকে কদাকার ও নিঃশেষ করে দেয়। পঙ্কিল পরিবেশ তার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে এমন সব রোগের জন্ম দেয়, যা তার অনুভূতির পবিত্রতা ও রুচিবোধের সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। ফলে সে তখন স্বচ্ছ বিশুদ্ধ মধুর পরিবর্তে দুর্গন্ধযুক্ত মদ পান করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের অনেক লোক বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও মন্দ পরিবেশ ও শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে তারা সৎপথ লাভ করতে পারেনি। মহান আল্লাহ্ বলেন[৫] وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ "আর 'আদ ও সামূদকে (আমি ধ্বংস করেছিলাম),তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) আবাসভূমির কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। আর শয়তান তাদের কাজ তাদের চোখে শোভিত করে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, অথচ তারা ছিল দারুণ বিচক্ষণ।"

গাজী শামছুর রহমান বলেন–"মানুষ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, সমাজে বড় হয়ও পরিবেশে প্রতিপালিত হয়। আর যখন বংশ, পরিবার, ও পরিবেশ সুষ্ঠু সুন্দর না হয়, তখন পরিবেশের অসৎ সঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে অপরাধে লিপ্ত হয়।"[৬]

❑. মাদকাসক্তি (الخمر) :

মদ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ খামর(خَمْر); খামর-এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে ফেলা, আচ্ছাদিত করা, আচ্ছন্ন করা। মদপানের ফলে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায় বলে তাকে খামর বলা হয়। আল-কুরআনে خَمْر মূলধাতু থেকে শব্দটি ০৭ বার এসেছে।[৭] শরী'আতের পরিভাষায়–"যে সকল বস্তু মত্ততা বা নেশা সৃষ্টি করে এবং বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে খামর বা মাদক বলা হয়।"[৮]

---

১. আল-কুরআন, সূরা সাবা' ৩৪: আয়াত ৩১-৩৩, এছাড়া দেখুন আল-কুরআন, ২৬: ৯৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান ২৫: আয়াত ২৭-২৯।
৩. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা ২৬: আয়াত ৯৯।
৪.মূল আরবী[الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হা. নং ৪৮৩৩, *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতবুল আদাব, হা. ২৩৭৮।
৫ . আল কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত : আয়াত ৩৮।
৬. গাজী শামছুর রহমান, *অপরাধ বিদ্যা*, (ঢাকা: পল্লব পাবলিসার্স, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক হউজ, ১৯৮৯), পৃ.৪৬।
৭. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম, প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০১-৩০২।
৮. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, খ.০৪, পৃ. ২৫৪।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'খামার' হ'ল সেই বস্তু যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে দেয়'।[১]

মাদকদ্রব্য বা নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তন্মধ্যে বর্তমানে উল্লেযোগ্য হল- মদ, গাঁজা, আফিম, ভাং, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা, কোকেন, ক্যাফেইন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, হুইস্কি, তাড়ি, বিড়ি-সিগারেট, তামাকজাত দ্রব্য ইত্যাদি। এ সবই নেশা ও নেশা সৃষ্টিকারী। সব ধরনের মদ ও নেশা নিষিদ্ধ। এ মর্মে নাবী সা. বলেন[২], 'নেশা সৃষ্টিকারী যে কোনো পানীয় হারাম'। অন্যত্র বলেন[৩],'প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ, আর সকল মাদক দ্রব্যই হারাম'।

মদ পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে। যে পরিবারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে, সেখানে সর্বদা অশান্তি লেগে থাকে। মাদকসেবী নেশার অর্থ যোগানের জন্য প্রয়োজনে ঘরের মূল্যাবান জিনিষপত্র ও অলংকার অতিস্বল্প মূল্যে বিক্রি করে। মদের অর্থ যোগান দিতে গিয়ে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি প্রভৃতি অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে, এমনকি টাকার জন্য ভাড়াটে খুনী হিসাবে কাজ করতেও দ্বিধা করে না। ফলে সমাজের মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। মদ পানের কারণে প্রচুর আর্থিক অপচয় হয়। মদ্যপ এক পর্যায়ে সর্বহারা হয়ে পড়ে। মদ্যপায়ীরা নিজ স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের কোন দায়িত্ব পালন করে না, অধিকন্তু, তাদের সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করে। গাড়ী চালকদের মধ্যে বড় অংশ মাদকাসক্ত, যারা মাদকাসক্ত অবস্থায় গাড়ী চালাতে গিয়ে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটায়। মদ বা নেশা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনের পথ থেকে গাফিল করে দেয়। মদ পানকারীরা মদপানের পর মাতাল হয়ে তার সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তাই মহান আল্লাহ বলেন[৪]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ "হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।"

মাদকাশক্তি সামাজিক অবক্ষয় এবং অপকর্মের একটি প্রধান উপকরণ। মদ্যপ ব্যক্তি নেশা করার পর মাতাল হয়ে অশ্লীল ও মন্দ কথা বলে থাকে। মাতাল অবস্থায় সে বুঝতে পারে না কি তার জন্য কল্যাণকর, আর কি তার জন্য ক্ষতিকর। এমতাবস্থায় তার ভালো-মন্দ বোধ, দায়িত্ব-কর্তব্য জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোপ পায়। এটা মানুষের বুদ্ধি-বিবেককে অন্ধ করে দেয়। তখন সে আকৃতিতে মানুষ থাকলেও প্রকৃতিতে পশু হয়ে যায়। ফলে নেশার ঘোরে সে বড় বড় অপরাধ ও পাপের কাজ করে বসে। এমনও দেখা গেছে যে, মদ্য পানে মত্ত হয়ে মানুষ অনেক সময় আপন জনকে হত্যা কিংবা ব্যভিচার করতে দ্বিধা করে না। মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি শত্রুর নিকট নিজেদের গোপন তথ্য অকপটে প্রকাশ করে দেয়। এছাড়াও মদ তার পানকারীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সঞ্চার করে এবং সৎ কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫]- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ "শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং আল্লাহর স্বরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা চায়। তবে কি তোমরা কি বিরত হবে না?"

মদ যাবতীয় পাপ ও অকল্যাণের উৎস। এটা সকল অনিষ্টের মূল।[৬] এর ব্যাপক অনিষ্টতা সম্পর্কে উসমান রা. বলেন[৭]-

> 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটি হ'ল পাপের উৎসমূল। তিনি বলেন, তোমাদের পূর্বেকার জনৈক ব্যক্তি সর্বদা ইবাদতে রত থাকত এবং লোকালয় থেকে দূরে থাকত। একদা এক ভ্রষ্টা মেয়ে তাকে প্রলুব্ধ করল এবং তাঁর কাছে তার দাসীকে পাঠিয়ে দিল। সে গিয়ে বলল যে, আমরা আপনাকে আহ্বান করছি একটি ব্যাপারে সাক্ষী থাকার জন্য। সাধু লোকটি তার সাথে চলতে চলতে একটি ঘরে প্রবেশ করল। অমনি ঘরের কপাট বন্ধ করে দিয়ে তাকে একটি সুন্দরী মহিলার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তার নিকট একটি বালক ও একটি মদের পাত্র রক্ষিত ছিল। তখন ঐ মহিলাটি তাকে বলল, আমি আপনাকে সাক্ষী করার জন্য ডাকিনি। বরং ডেকেছি আমার সাথে যেনা করার জন্য, অথবা এই বালকটিকে হত্যা করবেন কিংবা এই এক পেয়ালা মদ পান করবেন। এই তিনটি কাজের যে কোন একটি না করা পর্যন্ত তোমাকে যেতে দেয়া হবে না। লোকটি (কম মাত্রার পাপ মনে করে) বললো, আমাকে সুরা পান করতে দাও। তাকে সুরা পান করতে দেয়া হল। সে বার বার চেয়ে অনেক বেশী পরিমান মদ পান করল। পরে সে মাতাল হয়ে মেয়ে লোকটির সাথে যেনা করল এবং বালকটিকেও হত্যা করল। অতএব তোমরা তা পরিহার কর। কেননা মদ ও ঈমান কখনও একত্রে থাকতে পারে না। বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়।' -এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে, মদ হচ্ছে সব দুষ্কৃতি ও যাবতীয় পাপ কজের উৎস।

মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হয়। দৈহিক ও মানসিক মারাত্মক ক্ষতি সাধন ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। মদ পানের ফলে বিভিন্ন শারীরিক রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়, বিশেষ করে পাকস্থলী ও লিভার ক্ষতিগ্রস্থ হয়, হজমশক্তি হ্রাস পায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য লোপ পায়, যৌনশক্তি কমে যায়, স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, মেযাজ খিটখিটে হয়, ফুসফুস ও কিডনী নষ্ট হয়, অনেক ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এছাড়া চিত্তবৈকল্য, অনিদ্রা, মাথা ঘোরা, দৃষ্টিভ্রম হওয়া ইত্যাদি নানা সমস্যা দেখা দেয়। এভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তি অসুস্থ ও অকর্মণ্য হয়ে

---

[১]. মূল আরবী [الخمر ما خامر العقل] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং ৪৩৪৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং ৩০৩২।

[২]. মূল আরবী[كل شراب أسكر فهو حرام] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আশরিবাহু, হাদীস নং ৫২৬৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, হা. নং ২০০১।

[৩]. মূল আরবী [كل مسكر خمر وكل مسكر حرام] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং ২০০৩।

[৪]. আল কুরআন, সূরা আন-নিসা : আয়াত ৪৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৯১।

[৬]. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬২।

[৭]. মূল আরবী [اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث....] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং ৫৬৬৬।

পড়ে। অনেক মাদকসেবী অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সর্বপরি, মদপান আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ও কবীরা গুনাহ। এটা নোংরা ও নাপাক বস্তু। এর উৎপাদন ও সেবনে প্রচুর অর্থের অপব্যয় হয়। এভাবে আরও বহুবিদ অকল্যাণ থাকায় কুরআন মদকে চিরতরে নিষিদ্ধ করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীরসমূহ তো ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

মানব সভ্যতার জন্য মাদকদ্রব্য ভয়ানক অভিশাপ হওয়ায় তা থেকে রক্ষাকল্পে ইসলাম মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, মজুত, সেবন ও ব্যবসা হারাম ঘোষণা করেছে। মদের সাথে সম্পৃক্ত আট ব্যক্তিকে লা'নত করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[২]

> আল্লাহ তা'য়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদ পানকারীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, তার ক্রয়কারীর উপর, তার বিক্রেতার উপর, তার উৎপাদনকারীর উপর, তার উৎপাদন যে করায় তার উপর, তার বহনকারীর উপর এবং যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর।

মদ বিভিন্ন রোগের উৎস। তারিক ইবন সুয়াঈদ জু'ফী রা. মদ ব্যবহার করা সম্পর্কে নাবীকে সা. জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি এটা ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন অথবা এর প্রস্তুত করার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করলেন। তারিক বললেন, আমি তা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করি। তিনি বললেন: 'এটা কোনো ঔষধ নয় বরং এটা নিজেই একটা রোগ'।[৩]

মাদকদ্রব্য সেবন একটি ঘৃর্ণিত কাজ। এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে লাঞ্ছনা রয়েছে। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) বলেন, 'রাসূল(সা.) মদ্যপানের শাস্তি স্বরূপ মদ্যপায়ীকে জুতা ও খেজুরের ডাল দিয়ে পিটাতেন এবং আবূবকর(রা.) চল্লিশ ঘা মেরেছেন'।[৪] নাবী সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করবে আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল করবেন না।'[৫] মদ্যপানের পরকালীন ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে নাবী সা. বলেন: যে কেউ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করবে আল্লাহ তাকে 'তীনাতুল খাবাল' খেকে পান করাবেন। লোকেরা জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি? উত্তরে তিনি বললেন: তা হচ্ছে, জাহান্নামবাসীদের ঘাম ও তাদের রক্ত ও পুঁজ।[৬]

মাদকাসক্তি ও নেশার কারণ: জীবনে কোন কারণে ব্যর্থতা, হতাশা ও মানসিক অস্থিরতা, সঙ্গদোষ/ অসৎ সঙ্গ, বেকারত্ব, মাদকতার কুফল সম্পর্কে অসচেতনতা, প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয়তা, মাদকদ্রব্যের সহজ লভ্যতা, উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদের কৌতুহল, ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব ও অপসংস্কৃতির জয়জয়কার।

প্রতিকারে করণীয়: মাদকদ্রব্য উৎপাদন, মজুতকরণ, বিপনন বন্ধকরণ। মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণ, পাঠক্রম ও গণমাধমে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক প্রতিরোধ ও প্রশাসনিক কঠোর অবস্থান গ্রহণ, হতাশা ও অসৎসঙ্গ পরিহারে পারিবারিক উদ্যোগ এবং বেকারত্ব দূরীকরণে কর্মসংস্থান।

❑. জুয়া(الْمَيْسِر):

জুয়ার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে–মায়ছির (الْمَيْسِر); যার অভিধানিক অর্থ–সহজলভ্য, জুয়া, বাজি। লটারীও এক ধরনের জুয়া। জুয়া হল–'বাজি রেখে যে সব খেলা বা কাজ করা হয়, যার মাধ্যমে অন্যকে ঠকিয়ে প্রতারণামূলকভাবে অর্থ উপার্জন করা হয়ে থাকে'। আতা' রহ.(মৃ.১১২হি.) মুজাহিদ রহ. (মৃ. ১০৩ হি.) ও তাউস রহ. (মৃ. ১০৬ হি.) বলেন,[৭]
"বাজি রেখে যে খেলা করা হয় সেটাই জুয়া। এমনকি ছেলেরা বাজি রেখে যে কড়ি খেলে সেটাও জুয়া।"
কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ রহ. (মৃ.) বলেন[৮]–"যা কিছু আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে ভূলিয়ে রাখে তার সবই জুয়া।"
ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৭১হি.) বলেন[৯] "পাশা, চওসর ও শতরঞ্জ ইত্যাদি যে সবের মধ্যে একপক্ষের হার ও অপরপক্ষের জেতার আশঙ্কা আছে তাই জুয়া।" আল-কুরআনে মায়ছির (الْمَيْسِر) শব্দটি خَمْر শব্দের সাথে ০৩বার ব্যবহৃত হয়েছে।

জুয়া এক ধরনের সামাজিক অনাচার। এর মাধ্যমে অন্যকে ঠকিয়ে প্রতারণামূলকভাবে অর্থ উপার্জন করা হয়। এতে ব্যক্তি ও সমাজ কলুষিত হয়। জুয়ারীরা জুয়ার টাকা সংগ্রহের জন্য নিজের সম্পদ নষ্ট করে। তারা টাকার জন্য চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, সন্ত্রাস প্রভৃতি কাজে জড়িয়ে পড়ে। জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে তারা স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যায়। পরিবার, সমাজ ও জনগণের ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকে। এটা মানুষের কর্মক্ষমতা শিথিল করে ব্যক্তিকে অলসে পরিণত করে, যা পরিবার ও সমগ্র জাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এ ধরনের লোক নিজের স্বার্থের জন্য নিজ ধর্ম, ইজ্জত ও

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৯০।

[২].মূল আরবী[لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আশরাবিয়া, হা.নং৩৬৭৪, *মুসনাদ আহমাদ*, হা.৪৭৮৭

[৩]. মূল আরবী [إنه ليس بدواء ولكنه داء] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং ১৯৮৪।

[৪].মূল আরবী[أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল, হাদীস নং৬৩৯১; *মুসলিম*, হা. নং১৭০৬।

[৫].মূল আরবী[من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আশরাবিয়া, হা. নং ১৮৬২।

[৬].মূল আরবী [كل مسكر حرام إن على الله عز و جل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, হাদীস নং ২০০২।

[৭]. ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.১৭৮।

[৮]. মূল আরবী [كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر] *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৮।

[৯].মূল আরবী [كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر] ইমাম আল-কুরতুবী,*আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ..৫২।

দেশ-জাতিকে বিক্রি করতে কুণ্ঠিত হয় না। জুয়ার অশুভ প্রভাবে জুয়াড়ীরা ভালো কাজ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]–يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও, কিন্তু তাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।"

জুয়া একটি ঘৃণ্য শয়তানী ও অনৈতিক কর্ম। এতে একজনকে ঠকিয়ে কিভাবে অন্যজন অর্থ হাসিল করতে পারে এই নেশায় প্রত্যেকে বিভোর থাকে। এতে মানুষের সম্পদ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেওয়া হয়। এতে ভ্রান্ত আশা, লোভ ও প্রতারণা কার্যকর থাকে। এতে বিন্দুমাত্রও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মতি নেই। জুয়ার পরাজিত পক্ষ যদিও তার প্রতিপক্ষ সম্পর্কে নীরব থাকে কিন্তু তার এই নীরবতা ক্রোধ ও অপমানবশত। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অনেক সময় সে মারামারি ও রক্তপাতের জন্য উদ্যত হয়। ফলে জুয়াড়ীদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এতে পরাজিত পক্ষের ব্যর্থতা ও বঞ্চনায় বিজয়ী পক্ষ সুখানুভব করে এবং সব সময় এই নেশায় তৎপর থাকে। আর এই মানসিকতা পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও ভদ্রতা বিনষ্ট করে এবং অন্যের ধ্বংসের মধ্যে নিজের কল্যাণ মনে করার প্রতি প্ররোচিত করে মনুষ্যত্ববোধ বরবাদ করে দেয়। এবং যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার উপর সমাজের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত তা বন্ধ হয়ে থাকে। এর আরও ক্ষতিকর দিক হলো, এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবলম্বন বেকার হয়ে পড়ে এছাড়াও জুয়া আরও নানা অপকর্মের জন্ম দেয়। এটা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়। এসব কারণে ইসলাম জুয়াকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে[২]

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ-
>
> "হে মু'মিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীরসমূহ তো ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। "শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং আল্লাহর স্বরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা চায়। তবে কি তোমরা বিরত হবে না?"

উদ্ধৃত আয়াতে জুয়াকে শয়তানের কর্ম বলে তা হারাম করা হয়েছে। আর এই হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, জুয়ার অভ্যাস সম্পদের ধ্বংস করে, কলহ-বিবাদ বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গাফিল করে।

জুয়ার কারণ: অসৎ সঙ্গীর প্ররোচনা, আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, বেকারত্ব, ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের অভাব।

প্রতিরোধে করণীয়: আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ, সামাজিক প্রতিরোধ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

❑. চুরি (السَّرِقَةُ):

চুরির প্রতিশব্দ চোরাচালান, চোরাকারবার ইত্যাদি। চুরির আরবী প্রতিশব্দ السَّرِقَةُ, সাধারণ অর্থে চুরি হল–গোপনে অন্যের ধন-সম্পদ করায়ত্ব বা আত্মসাৎ করা। অন্যের অলক্ষ্যে কোন কিছু অবৈধভাবে হস্তগত করা ইত্যাদি। পরিভাষায় -'চুরি হল প্রাপ্ত বয়স্ক বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা অপরের সম্পদ গোপনে হরণ করা, যার মূল্য দশ দিরহাম, যা কোন সংরক্ষক দ্বারা সুরক্ষিত।'[৩] সরাসরি চুরি করা ছাড়াও চুরিতে সহায়তা করা কিংবা জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করাও চুরির অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সা. বলেন,"যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায়ে শরীক হয়ে গেল।"[৪]

আজকাল সমাজে চুরি বা আত্মসাৎ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রচলিত চোর ছাড়াও এখন সমাজে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রবেশী অনেকেই চুরিতে লিপ্ত। সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন অফিসের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেখা যায় যারা কলমের খোঁচায় বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে স্বীয় প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কোষাগার থেকে অর্থ চুরি করে থাকে। আবার জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই যেমন: সংসদ সদস্য, মেয়র, কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান, মেম্বারদের একটি বড় অংশ জনগণের সম্পদ চুরি বা আত্মসাতে লিপ্ত। প্রচলিত চুরি অপেক্ষা ভদ্রবেশী চুরি আজকাল সমাজে ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে।

চুরি একটি গর্হিত সামাজিক অপরাধ। এটা ঈমান ও নৈতিকতা বিরোধী কাজ। ধর্মীয় দৃষ্টিতে চুরি একটি মহাপাপ। কোন মু'মিন পুরুষ বা নারী এতে লিপ্ত হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন[৫]-لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ- "তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না।" উবাদা ইবন সামিত রা. বলেন, আমি কিছু সংখ্যক লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এ মর্মে বাই'আত গ্রহণ করছি যে-[৬],

> তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না। কোন অপবাদ অর্থাৎ হাত ও পায়ের মাঝে অবস্থিত স্থান (যৌনাঙ্গ) সম্পর্কে কোন অপবাদ দিবে না এবং কোন নেক কাজে অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৯০-৯১।
[৩]. ইবন হুমাম, *শরহে ফাতহুল কাদীর* (কোয়েটা: রাশিদিয়া লাইব্রেরী, পাকিস্তান), খ.০২, পৃ.১৩০।
[৪]. মূল আরবী [من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها] ইমাম বাইহাকী, *আস্-সুনান,আল-কুবরা*, কিতাবুল বুয়ূ, খ.০৫, পৃ.৩৩৫, হা.নং ১০৬০৮।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্তাহিনাহ ৬০: আয়াত ১২।
[৬].মূল আরবী[بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবাহ, হাদীস নং ৩৬৮০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হুদূদ, হা. নং ১৭০৯।

> যারা এসব ঠিক ঠিক পালন করবে আল্লাহর কাছে তার পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা এগুলো লঙ্ঘন করে গুনায় লিপ্ত হবে, তাকে যদি দুনিয়াতে এ ব্যাপারে শাস্তি প্রদান করা হয় তা হলে তার গুনাহর 'কাফ্‌ফারা' হয়ে যাবে এবং সে পবিত্র হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যদি কারো গুনাহর কাজ গোপন রেখে থাকেন তা হবে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন কিংবা ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবেন।

চৌর্যবৃত্তির ফলে সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিরতা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। চুরির ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যহত হয়। কেননা চোরের পরিশ্রমবিমূখ ও অলস প্রকৃতির হয়ে থাকে। চোররা চুরিকৃত মূল্যবান জিনিসপত্র সস্তায় বিক্রি করে। এছাড়াও চুরির আরও কুফল থাকার সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে চৌর্যবৃত্তি নির্মূল ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে আল-কুরআন চোরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[১]–

> وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
>
> "আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় শাস্তি; আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু সীমালংঘনে পর কেউ তাওবা করলে ও নিজকে সংশোধন করলে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"

উল্লেখ্য যে, আল-কুরআন চুরির জন্য যে কঠোর শাস্তি দিয়েছে তা সে সব লোকের জন্য যারা পেশাদার চোর। যারা অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ গ্রহণে অভিলাসী, যাদের কারণে সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং যারা বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে জনগণের অধিকারহরণ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করে, মূলত তাদের দমনের লক্ষ্যে ইসলাম এই কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। তবে যে কোন তুচ্ছ বা অরক্ষিত জিনিস এবং অপ্রকৃতিস্থ বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ চুরি করলে শাস্তি হিসেবে চোরের হাত কাটা যাবে না। বরং চুরির শাস্তি কার্যকরের কিছু শর্ত রয়েছে।[২] এ মর্মে রাসূল সা. বলেন-[৩]

> যে ফল বৃক্ষের শাখায় ঝুলন্ত এবং যে জন্তু পাহাড়ের উপর বিচরণশীল, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। অবশ্য জন্তুকে গো-শালায় এবং ফলকে স্তূপীকৃতভাবে সংরক্ষিত রাখা হলে তখন হাত কাটা যাবে। যদি চুরিকৃত মালের মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়।

উল্লেখ্য যে, চুরিকৃত মাল চোরের হাতে থাকলে এ মাল অবশ্যই মালিককে ফেরত দিতে হবে। কিন্তু মাল নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা নষ্ট করে ফেলা হলে একই সঙ্গে হাত কর্তন ও জরিমানা করা যাবে না। হাত কাটা হলে জরিমানা হবে না, আর জরিমানা হলে হাত কাটা হবে না।

চুরি-চোরাকারবারী কারণ: ক. অভাব, দুর্ভিক্ষ। খ. নেশা ও মাদকদ্রব্য সেবন। গ.আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও শাস্তিহীনতার সংস্কৃতি। ঘ. অলসতা, কর্মবিমুখতা ও বেকারত্ব। ঙ. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

চুরি-চোরাকারবারী বন্ধে করণীয়: ক.দারিদ্র বিমোচন ও বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি। খ.চোরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চালু। গ. অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার। ঘ. চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত অভিযান।

❑. পাচারঃ

পাচার শব্দের আভিধানিক অর্থ– গোপনে অপসারণ, চুপিচুপি সরিয়ে ফেলা, চুরি করে নিঃশেষকরণ।[৪] সাধারণত পাচার বলতে বোঝায়–মিথ্যা তথ্য দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে অথবা অন্য কোন অপকৌশলে কিংবা জোরপূর্বক অপহরণ করে কাউকে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে অসৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করা। পাচার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমনঃ নারী-শিশু পাচার, দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য পাচার, মাদকদ্রব্য পাচার।

মানব পাচার একটি মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধ সুদূর অতীতেও মানব সমাজে বিদ্যমান ছিল। এ প্রসংগে কুরআনে বর্ণিত ইউসুফ ('আ.) এর ঘটনা[৫] উল্লেখযোগ্য। রাসূল সা. এর আবির্ভাবকালীন সময়ে আরব সমাজে তা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন আরব সমাজের দাস শ্রেণীর একটি অংশ ছিল পাচারকৃত। রাসূল সা. এর বৈপ্লবিক সংস্কারের পর পৃথিবীর বৃহৎ অংশ থেকে তা রোধ হলেও বর্তমানকালে এই অনাচার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেখানকার দরিদ্র-অসহায় মানুষের দুর্বলতার সুযোগে এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত পাচারকারীরা দেশে-বিদেশে চাকুরীর মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারী, শিশু

---

১. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫:আয়াত ৩৮-৩৯।

২.যেমন: চুরির নিসাব তথা দশ দিরহামের কম মূল্যের মাল চুরি করলে, অরক্ষিত মাল চুরি করলে, দূর্ভিক্ষের সময় চুরি করলে, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, বইপত্র ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করলে, মেহমান, নিজ চাকর বা কর্মচারি মালের অংশিদার ঋণদাতা কর্তৃক চুরি প্রমাণিত হলে চোরকে বাধ্য করা হলে বা চোর গ্রেফতারের পূর্বেই আত্মসমর্পণ করলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে চুরির হাত কাটা কার্যকর হবে না। তবে এ সব ক্ষেত্রে অপরাধী অন্য যে কোন শাস্তিযোগ্য হবে। [অত্র অভিসন্দর্ভের ৪র্থ অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

৩.মূল আরবী [قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ১৫১৮।

৪. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩৯।

৫. আল-কুরআন সূরা নং-১২, সূরা ইউসুফ,আয়াত ১৯-২১।

বা পুরুষকে প্রলোভন দেখিয়ে, ফুসলিয়ে ও বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজ বাড়ী বা এলাকা থেকে বের করে পাচার করে থাকে। পাচারকৃত এসব নিরীহ মানুষকে বিভিন্ন অপরাধমূলক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন: পতিতাবৃত্তি, রক্ষিতা, যৌনদাসী, অশ্লীল চিত্র তৈরী, মাদকদ্রব্য পাচার, চোরাচালান, অঙ্গহানি করে ভিক্ষাবৃত্তি, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিক্রি, উটের জকি ইত্যাদি। মানব পাচার ছাড়া বিভিন্ন পণ্য পাচার দেশের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সৃষ্টি করে।

মানব পাচার বা স্বাধীন মানুষকে দাস হিসেবে বিক্রি করা মারাত্মক অপরাধ ও মহাপাপ। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেছেন-[১],

> মহান আল্লাহ বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে, *যে ব্যক্তি স্বাধীন লোককে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে* এবং যে ব্যক্তি কোন মজুর নিয়োগ করে তার নিকট থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করে কিন্তু তার মজুরী দেয় না।"

পাচারের কারণ ও উপাদান: ক. দারিদ্র্য, বেকারত্ব থেকে মুক্তি পেতে দালাল চক্রের চাকুরীর প্রলোভনের ফাঁদ। খ. তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা নারী ও ছিন্নমূল শিশুদের আশ্রয়হীনতা, অসচেতনতা ও অজ্ঞতা। গ. মোবাইল ফোনে প্রেমের ছলনার মাধ্যমে সরলমতি নারী-শিশুদের পটিয়ে বিক্রি। ঘ. অপ্রতুল আইন, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা। ঙ. দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সৃষ্টি ও অধিক মুনাফা লাভের আশা।

পাচার প্রতিরোধে করণীয়: ক. পাচার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পাচারকারীদের প্রতারণা ও অপকৌশল সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা। খ.প্রয়োজনীয় আইন প্রনয়ন করে পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ.মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে নৈতিক শিক্ষা।

❑. ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ (حرابة- قطع الطريق) ও চাঁদাবাজি:

ডাকাতি ও লুণ্ঠনকে আরবীতে হিরাবাহ বা কাতউত তারিক (حرابة- قطع الطريق) বলা হয়, যার অর্থ–যুদ্ধ, দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠণ ও অপহরণ করা। ডাকাতি বলতে বুঝায় "কোন সশস্ত্র ব্যক্তি বা দল কর্তৃক পথে-ঘাটে, ঘর-বাড়ীতে কিংবা নদী-মরুভূমিতে নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালিয়ে কিংবা ভয়-ভীতি দেখিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাদের সম্পদ বা রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠন করা কিংবা কাউকে হত্যা করা, কারো ইজ্জত নষ্ট করা অথবা জনজীবনে ত্রাস সৃষ্টি করা।"[২]
ছিনতাইকে আরবীকে 'غصب' বলা হয়। গাসফ এর আভিধানিক অর্থ 'কোন কিছু অন্যায়ভাবে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া'। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়,"কোন বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের অধিকারভুক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে অপহরণ করাকে 'غصب' বলা হয়।"[৩] ছিনতাই ও অপহরণ কাছাকাছি হলেও অপহরণের ক্ষেত্রে সাধারণত অস্ত্রের মুখে বা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করে কাউকে উঠিয়ে নিয়ে তার মুক্তির জন্য অর্থ-সম্পদ কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশেষ কিছু দাবী করা, আদায়ে ব্যর্থ হলে অপহরণকৃতকে হত্যার হুমকি দেয়া। আর চাঁদাবাজি হচ্ছে–স্বীকৃত অধিকার ছাড়াই কারো নিকট অন্যায়ভাবে অর্থ দাবী করা। বস্তুত ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজি এক ধরনের স্বেত ডাকাতি।

ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ ও চাঁদাবাজি প্রভৃতি অপরাধ গুরুতর সামাজিক অপরাধ এবং মারাত্মক পর্যায়ের যুলুম। এগুলো সমাজে নানা ধরনের অন্যায় ও অবক্ষয়ের জন্ম দেয়। এতে সমাজের সর্বসাধারণের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তহীন হয়ে যায়। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা চরম বিঘ্নিত হয়। এসব অপরাধের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র চরম উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করে। সমাজে দুর্বলরা সন্ত্রাসী কর্তৃক জিম্মি হয়ে পড়ে। সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং সব ধরনের উন্নয়ন ব্যাহত করে। এসব ক্ষেত্রে শুধু জোরপূর্বক অন্যের অর্থ-সম্পদ নেয়াই হয় না বরং অনেক সময় হত্যা, নির্যাতন করে থাকে। এ কারণে ইসলাম এই অপরাধসমূহকে নিষিদ্ধ করে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]–إِنَّمَاالسَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِالْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ "যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।"
এ সম্পর্কে নাবী সা. বলেন–"সাবধান! তোমরা কেউ কারো উপর যুলম করবে না। সাবধান! কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়।"[৫] তিনি আরও বলেন–"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের কোন বস্তু গ্রহণ না করে, খেলাচ্ছলেও নয় এবং বাস্তবিকভাবে তো নয়ই। যদি কেউ তার ভাইয়ের লাঠিও নেয়, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।"[৬] আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) বলেন, "নাবী কারীম (সা.) লুটতরাজ এবং বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।"[৭]

---

[১]. **মূল আরবী**[قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা.২১১৪।
[২]. দেখুন, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*,(ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৯) পৃ.৭৯-৮০,
[৩]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৪২।
[৫]. মূল আরবী [ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه]*মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৫, পৃ.৭২, হাদীস নং ২০৭১৪।
[৬]. মূল আরবী [لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫০০৩।
[৭]. মূল আরবী [نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النهبى والمثلة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩৪২।

রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লুটপাট বা ডাকাতি করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

ডাকাতি, ছিনতাই ও অপহরণ কারণ: আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, অস্ত্রের সহজ লভ্যতা, অভাব-অনটন, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়।

প্রতিকারে করণীয়: আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সমুন্নত রাখা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদান। অপরাধীদের সংশোধনকল্পে ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র স্থাপন এবং কর্মসংস্থান করা।

❑. আত্মসাৎ, বিশ্বাসঘাতকতা (الخيانة) এবং অঙ্গীকার, চুক্তি ও শপথ ভঙ্গ:

আরবী খিয়ানত(الخيانة) শব্দটি মাসদার, যা আমানত এর বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ– অসাধুতা, বিশ্বাসঘাতকতা।[২] খিয়ানত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক হলেও বিশেষত তা গোপনে আমানত ও চুক্তির খেলাফের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষায়, الخيانة: جحود ما اؤتمن عليه "খিয়ানত (الخيانة) হল অর্পিত আমানত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা।"[৩]

খিয়ানত একটি ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়। কারো গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার মধ্যে তা সীমিত নয়। বরং তা মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন– সম্পত্তি রক্ষা, সামাজিক চুক্তি পালন, উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার, কোন ব্যক্তি বা দলের গোপনীয়তা রক্ষা না করা ইত্যাদি। কাজেই কোন ব্যক্তির গোপন বিষয় অন্যের নিকট প্রকাশ বা প্রচার করা[৪] এবং দেশ ও জাতির গোপনীয় বিষয় বহিঃশত্রুর নিকট পাচার করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, সমাজ ও জাতীয় জীবনে স্বীয় কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করা কিংবা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করাও এক ধরনের খিয়ানত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–"আমরা যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর তাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন দেই, এরপর সে যা কিছু গ্রহণ করে তা খিয়ানত বা চুরি।[৫] মানুষকে ভুল পরামর্শ দেয়াও খিয়ানতের মধ্যে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন বিষয়ে এমন পরামর্শ দিল অথচ সে জানে যে, সঠিক বিষয়টি এর বিপরীত তবে সে খিয়ানত করল।"[৬]

খিয়ানত একটি গর্হিত অপরাধ। খিয়ানত মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। খিয়ানত এর মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে মানুষের জন্য বড় রকমের অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। অনেক সময় খিয়ানত দেশ ও জাতি ভয়ানক বিপর্যয় নিয়ে আসে। তাই খিয়ানতকারী সমাজ, দেশ ও জাতির শত্রু। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা অনৈতিক কর্ম ও পাপের কাজ। এজন্য মহান আল্লাহ খিয়ানত নিষিদ্ধ করে বলেন[৭]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজদের আমানতসমূহের।" অন্যত্র বলেন[৮], وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ -"কেবল বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার আয়াত অস্বীকার করে।" আরও বলেন[৯], إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ -"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।" অন্যত্র আরও বলেন[১০], وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا -এবং তুমি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না।" –উল্লেখিত আয়াতে খিয়ানতকে একটি গর্হিত অনৈতিক কর্ম এবং এ অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ থেকে মানুষকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

খিয়ানত কুফর ও নিফাকেরও অংশ বিশেষ। এটা ব্যক্তির মধ্যে লোভ, স্বার্থপরতা, হীন মানসিকতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ও ঘৃণ্য পাপীতে পরিণত হয়। নিজ স্বার্থ অর্জনে তারা দেশ ও জাতি সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কোন দ্বিধা করে না। তাই সবার কর্তব্য তাদের কোন ধরনের আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়া। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[১১]

> وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا-يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا
>
> আর যারা নিজদের খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না খিয়ানতকারী পাপীকে। তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

খিয়ানতকারীদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা। তারা সাময়িক কিছু স্বার্থ হাসিল করলেও কখনও চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করে না। এ মর্মে বলা হয়েছে[১২] وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ -"নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র

---

[১]. মূল আরবী [ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ৪৩৯১।
[২]. মুহাম্মদ 'আলা উদ্দীন আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ–১২৭৭।
[৩]. ড. সা'দী আবূ জাইব, *আল-কামূস আল-ফিকহী*, (দামিস্ক: দারুল ফিহর, ২য় সং. ১৪০৮হি.) পৃ. ১৮৯।
[৪]. আল কুরআন,সূরা আত-তাহ্রীম: আয়াত ৩-৪।
[৫]. মূল আরবী [من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল খারাজ, হাদীস নং ২৯৪৩।
[৬]. মূল আরবী [ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ৩৬৫৭।
[৭]. আল-কুরআন,সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২৭।
[৮]. আল-কুরআন,সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ৩২।
[৯]. আল-কুরআন,সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৩৮।
[১০]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০৫।
[১১]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০৭-১০৮।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৫২।

সফল করেন না।" তাদের পরকালীন পরিণতি অতি ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন-[১] وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ "আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হবে না।"

খিয়ানত ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। হাদীসে এসেছে: উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন নাবী সা. এর কয়েকজন সাহাবা বলছিল অমুক অমুক শহীদ হয়েছে। অবশেষে তারা এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, অমুকও শহীদ হয়েছে। তখন রাসূল সা. বললেন, কখনও নয়, সে একটি চাদর বা জামা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে আত্মসাৎ করার দরুণ আমি তাকে জাহান্নামে আগুনের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। অতঃপর রাসূল সা. বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব ! যাও এবং মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, *মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না*। উমার রা বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলাম এবং ঘোষণা দিলাম যে, *সাবধান! মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না*।[২]

খিয়ানতকারী ও বিশ্বাসঘাতকের ইহ ও পরকালীন অশুভ পরিণতি রাসূল সা. এর কতিপয় বাণী–[৩],

- •যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন মুসলিমের অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাৎ করলো, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সেটা যদি সামান্য জিনিস হয়? তিনি উত্তরে বললেন–সেটা পিল গাছের ছোট শাখা হলেও।"
- •অন্যত্র ইরশাদ করেন[৪], "কোন ব্যক্তি যদি এক মুসলিমের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন। ..."
- •আরও বলেছেন[৫],'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে লোকেদের উপর দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। অতঃপর সে তার লোকদের সাথে খেয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন'।
- •অন্যত্র আরও বলেন,[৬] 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের কোমরে একটা করে ঝাণ্ডা স্থাপন করা হবে। যা তার খিয়ানতের পরিমাণ অনুযায়ী উঁচু হবে। মনে রেখ, সেদিন সবচেয়ে উঁচু ঝাণ্ডা হবে প্রধান শাসকের খেয়ানতের ঝাণ্ডা'।

খিয়ানতের কারণ: অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার লোভ-লালসা, ঈমানী দুর্বলতা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

প্রতিকারের উপায়: খিয়ানতকারীদের পার্থিব লাঞ্ছনা ও পরকালীন পরিণতি চিন্তা করা, দ্বীনি জ্ঞান চর্চা ও তদানুযায়ী আমল।

❑.দুষ্কর্মে সহযোগিতা, অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দান ও ভালো কাজে অবাধ্যতা:

ইসলামী নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিতে যা গর্হিত এবং ইসলামী শরী'আতে যা নিষিদ্ধ এমন কোন কাজ করা এবং আল্লাহ যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা না করাই পাপ। এই মন্দ বা পাপ কাজ সংঘটনে কাউকে সহায়তা বা আশ্রয় দান করা কিংবা অন্যায়কারীর অন্যায় কাজে বাধাদানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাধা দান না করাই দুষ্কর্মে সহযোগিতা।

মন্দ কর্মে সহযোগিতা কিংবা অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশয় দান এক ধরনের অপরাধ। এর মাধ্যমে সমাজে অন্যায়, অপরাধ ও ফাসাদের বিস্তার ঘটায়। সমাজ দুস্কৃতিকারী ও অপরাধীদের অভয় বিচরণস্থলে পরিণত হয়। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, অপরাধ দমন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, ক্রমে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি দুর্বৃত্তদের হাতে চলে যায়। সত্য, ন্যায়পরায়নতা, নীতি ও নৈতিকতা মুখ থুবড়ে পড়ে। মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। এতে লিপ্ত ব্যক্তিদের নীচতা, হীনতা ও অমানবিকতার প্রকাশ পায়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৭]-وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"

ইসলামে অপরাধ সংঘটিত করা যেমন গুরুতর অন্যায় তেমনি অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া কিংবা তাদের সহায়তা করাও সমান পর্যায়ের অন্যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায়ে শরীক হয়ে গেল।"[৮] তাই কুরআনে অপরাধীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৯], وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا "আর যারা নিজদের ব্যাপারে খিয়ানত করে তুমি তাদের সমর্থনে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না তাকে, যে খিয়ানতকারী, পাপী।" অন্যত্র বলেন[১০], مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا -"কেউ কোন

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৬১।

[২]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১১৪।

[৩].**মূল আরবী**[من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسير يا رسول الله ؟ قال وإن قضيبا من أراك] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.১৩৭।

[৪].মূল আরবী [من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল খুসুমাহ, হা. নং ২২৮৫।

[৫]. মূল আরবী [ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৪২।

[৬]. মূল আরবী [لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস নং ১৭৩৮।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০২।

[৮].মূল আরবী [من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها]ইমাম বাইহাকী, *আস্-সুনান আল-কুবরা*, কিতাবুল বুয়ূ, খ.০৫, পৃ.৩৩৫, হা.নং ১০৬০৮।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০৭, আরও দেখুন- আয়াত ১০৫।

[১০].আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৮৫।

ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে নযর রাখেন।”

পাপ ও মন্দ কর্মে সহযোগিতার জন্য পরকালে রয়েছে দুর্গতি। এ মর্মে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[১],

অচিরেই আমার পরে এমন কতিপয় শাসকের আবির্ভাব হবে, যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে এবং তাদের যুলুমে সহায়তা করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং আমি তার দলভুক্ত নই। আর সে হাওযে কাওসারে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শে যাবে না, তাদের যুলুমে সহায়তা করবে না এবং তাদের মিথ্যাচারকে সমর্থন করবে না, সে আমার এবং আমি তার। সে হাওযে কাওসারে আমার সাক্ষাত লাভ করবে।

অসৎ কাজে বাঁধা না দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ না করা এক ধরনের অনৈতিক কর্ম। এতে প্রকারান্তে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হয়। যারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও এ দায়িত্ব পালন করে না তারা অপরাধী। ইতিহাস সাক্ষী যে, বনী ইসরাইল তথা ইহুদী জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ ছিল–তারা অন্যায় ও অসৎ কাজে পরস্পরকে বাধা প্রদান করতো না। এ কারণে তারা অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২]

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ-كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

“বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ!”

অসৎ কাজে বাঁধা না দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ না করা শুধু অনৈতিক কাজ নয়, বরং এ কাজে অবহেলার জন্য শাস্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ বলেন[৩]–“সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে অন্যথায় আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। যে শাস্তি ভালো -মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করবে, তারপর তোমরা আল্লাহর নিকট মুক্তির জন্য দো'য়া করবে কিন্তু তোমাদের দো'য়ার কোন সাড়া দেয়া হবে না।”

ভালো কাজে অবাধ্যতা নৈতিক পদস্খলনের অন্যতম উপকরণ। এ কারণে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا...وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ “হে নাবী! মুমিন নারীগণ যখন তোমার নিকট এসে বাইয়াত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না...এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না।”

❑. গণমাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন (তথ্য সন্ত্রাস):

গণমাধ্যম তথা প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বর্তমান যুগে মানব জীবনের একটি অপরিহার্য দিক। তথ্য আদান-প্রদান, জনসচেতনতা ও জনমত গঠনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে নিরপেক্ষ ও সঠিক তথ্য পরিবেশনের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে আজকাল সত্য-মিথ্যা নির্ণয় দুস্কর হয়ে পড়েছে। গণমাধ্যম সমাজ উন্নয়নের একটি সেবামূলক সংস্থা হলেও আজ বেশীভাগ ক্ষেত্রে এ পেশায় অর্থ উপার্জন, রাজনৈতিক অভিলাস চরিতার্থ কিংবা কোন গোষ্ঠী বা সংস্থার স্বার্থে কাজ করছে–যা সম্পূর্ণ অনৈতিক। দুঃখজনক বিষয় হল, একশ্রেণীর অসৎ সাংবাদিক স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য মিথ্যা ও ভুল সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও সমাজে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও নানা অবক্ষয় সৃষ্টিতে লিপ্ত। আদর্শগত বিরোধ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-শত্রুতা, প্রতিহিংসা, প্রতিপক্ষকে হেনস্তা-ঘায়েল, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত এই অপকর্মের সাথে জড়িত। বাতিলের স্বার্থরক্ষা ও হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরা সদা তৎপর কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে তারা অন্ধ, বোবা ও বধির। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন উপর ভিত্তি অনেক সময় নিরপরাধ লোকের উপর যুল্‌ম করা হয়, ন্যার্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সম্মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা হয়। এতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দেশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। তাই সশস্ত্র সন্ত্রাস চেয়ে এ ধরনের তথ্য সন্ত্রাসকে কোনভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা ইসলামের যেখানে কোন অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদ যাচাই-বাছাই করে সত্যতা নিশ্চিত না হয়ে ছাড়া প্রচার করা নিষিদ্ধ ও অনৈতিক; সেখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা গুরুতর অন্যায় কাজ। এ ব্যাপারে সতর্ক করে নাবী সা. বলেন[৫]-

“কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে অন্যের নিকট (যাচাই না করে) তাই বলে বেড়ায়।”

সংবাদিকতা একটি দায়িত্বশীল মহৎ পেশা। কিন্তু এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত সাংবাদিকের কারণে এ পেশা আজ কলঙ্কিত হচ্ছে। অনেকের হলুদ সাংবাদিকতা ও তথ্য সন্ত্রাসের কারণে মিডিয়া আজ আতঙ্কের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ফলে এই আগ্রাসন থেকে কেউই নিরাপদ বোধ করছে না। অথচ মিডিয়ার দায়িত্ব হলো- নিরপেক্ষভাবে সঠিক তথ্য ও প্রকৃত ঘটনা

---

[১].মূল আরবী [أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২২৫৯।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৭৮-৭৯।

[৩].মূল আরবী[والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হা.নং ২১৬৯।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনাহ ৬০: আয়াত ১২।

[৫]. মূল আরবী [كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع] *সহীহ মুসলিম*, মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ০৫,

তুলে ধরা, ন্যায়ের পথ দেখানো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, মানুষের সমস্যা ও সম্ভবনা তুলে ধরা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট ও প্রয়োজনের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, ক্ষমতাসীনদের অন্যায়, অপকর্ম ও জনস্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক সমালোচনা করা এবং তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া। অন্যায়, অনাচার, কুসংস্কার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। কিন্তু মিডিয়া সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে অন্যায়, অসত্য ও মন্দের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেছে। প্রায়ই দেখা যায় অনুমাননির্ভর তথ্য, অসত্য ঘটনা কিংবা ঘটনার গভীরে না গিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে। অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা কারো পক্ষ হয়ে কিংবা কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্রতিপক্ষ ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিষাদগার করেন। এটা রীতিমত অনৈতিক বিষয়। ইসলাম এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১] – قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ "সুলাইমান বলল, আমরা দেখব, 'তুমি কি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'।" –এই আয়াতে সংবাদের সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ গ্রহণ করা যাবে না–সেই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে।

তথ্যসন্ত্রাস, মিথ্যা বা ভুল সংবাদ পরিবেশন এবং গণমাধ্যমে অনৈতিকতা প্রতিরোধে করণীয়:

•বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক তথ্য ছাড়া অনির্ভরযোগ্য সূত্র, নিছক অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনকিছু প্রচার না করা। প্রতিটি তথ্য ও সংবাদ পরিবেশনের পূর্বে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তার সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা। তাই শুনা কথা যাচাই-বাছাই ছাড়া যা ইচ্ছা তা লেখা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।"

উল্লেখিত আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তার সত্যতা নিশ্চিত সম্পর্কে হতে হবে। কারণ দুস্কৃতিকারীরা স্বীয় অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করতে পারে। তাই যাচাই-বাছাই ছাড়া প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ঘটতে পারে। এতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে।

• সর্বদা সত্যের পক্ষ অবলম্বন করা। অর্থাৎ যা বলা বা লেখা হবে তাতে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকতে হবে। সততা ও নিরপেক্ষতার অবস্থান থেকে কথা বলতে হবে। কারো নিন্দা বা বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে সীমালংঘন করা যাবে না, আবার কারো প্রশংসায় অতিরঞ্জনও করা যাবে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ,অন্যায়কারীকে সতর্ক, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে জোরালো ভূমিকা পালন করা। এক্ষেত্রে কারো চাপে নতি স্বীকার বা নমনীয় না হয়ে সৎ সাহসের পরিচয় দেয়া। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–(إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا)- আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে।"

• সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে মিথ্যা থেকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। সত্য গোপন এবং সত্যের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টিও করা যাবে না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করা যাবে না। মিথ্যা অবলম্বনকারী বা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশকারীদের মুখোশ উন্মোচন করা। মহান আল্লাহ বলেন[৪] – وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "আর তোমরা মিশ্রিত করো না হককে বাতিলের সাথে এবং গোপন করো না হককে, যখন তোমরা জানো (হক)।"

• কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদ পরিবেশন করে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। এ ব্যাপারে পরকালে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৫] –(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) "আর তাদেরকে থামাও, অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে'।"

• কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কারো বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো যাবে না। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। জনস্বার্থে কারো বিরুদ্ধে কিছু প্রচার করতে হলে শালীনতা বজায় রাখা। মহান আল্লাহ বলেন[৬] –(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) " আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৭]-"মুসলিম সেই যার মুখ ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।

•মিডিয়ায় সত্য, সুন্দর, নির্দোষ ও মার্জিত বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। অশ্লীল লেখা ও অনৈতিক বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। খারাপ কথা, অশ্লীল দৃশ্য ও চিত্র ধারণ করা থেকে এড়িয়ে যেতে হবে। [৮] নেতিবাচক বিষয়কে এড়িয়ে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নামল ২৭: আয়াত ২৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৬।
[৩]. আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম ০৬: আয়াত ১৫১-১৫২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪২।
[৫]. আল কুরআন, সূরা আস- সাফফাত৩৭ : আয়াত ২৪।
[৬]. আল কুরআন, সূরা আল-ইসরা'১৭ : আয়াত ৩৬।
[৭].মূল আরবী [المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪০ ও ৪১, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১০।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ১৪৮,আল কুরআন৭:৩৩।

ইতিবাচক বিষয় অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে যুল্ম রোধে সত্য তুলে ধরতে কার্পণ্য করা যাবে না। সামাজিক কুসংস্কার, অপসাংস্কৃতি ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সর্বদা অবস্থান গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
"আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর।"
সর্বপরি, উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

❑.বর্ণবাদ, বৈষম্য, জাতিগত দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতনীতি:

বর্ণবাদ হলো–কোন জনগোষ্ঠীর প্রতি ভিন্ন গাত্রবর্ণের কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের নীতি।[২] মানুষের মধ্যে প্রভেদ বা ভেদাভেদ নির্ণয়ের কয়েকটি মৌলিক বিষয় হল: নরগোষ্ঠীগত, লিঙ্গগত, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদাগত ইত্যাদি। এই ভেদাভেদ ধারণার ফলে সমাজের কিছু সংস্কারমূলক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ফলে বর্ণে-বর্ণে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, নর-নারীতে, ধনী-দরিদ্রে প্রভেদের ধারণা সৃষ্টি এবং সমাজে তা লালিত হতে থাকে। এই ধারণা থেকেই সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত প্রত্যয় জন্মে। প্রভেদের ধারণা অতিমাত্রায় প্রকাশ পেলে সমাজে চাপা দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রেষারেষি সৃষ্টি হয়।[৩]

বৈষম্য ও বর্ণবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি চিরাচরিত অন্যায়। আদিকাল থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতি-গোষ্ঠীতে এই অন্যায় চলে আসছে। অতীতে নূহ আ. জাতিতে এবং ইহুদী সমাজেও বর্ণ-বৈষম্য বিদ্যমান ছিল।[৪] গ্রীস, রোম, মিসর, ইরান ও ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার সর্বত্রই তা বিদ্যমান ছিল। ইউরোপের সামন্তপ্রথার[৫] যুগের শ্রেণীভেদের অবস্থার বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইসলামের অবির্ভাবকালে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতি ভিত্তিক আভিজাত্যবোধ ও কৌলীন্য ব্যাপকভাবে চালু ছিল। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে মানুষ বর্ণ, গোত্র, বংশ মর্যাদা, জাতি, দেশ, সম্পদ, পেশা ও কর্মের ভিত্তিতে উচু শ্রেণী ও নিচু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্যক্তিগত যোগ্যতার কোনও মূল্য ও মর্যাদা সে ব্যবস্থায় ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য উন্নতির দ্বার সর্বদা বন্ধ ছিল। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সেবা করা। কুরআনে সেই চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে[৬] وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
"আর তারা বলল,'এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না'?।"

বর্ণবাদ ও বৈষম্য এমন একটি অন্যায়, যার কুপ্রভার অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজে লক্ষ্য করা যায়। এটা সমাজের মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এটা সমাজে বিভেদের প্রাচীর তৈরী করে। তা সমাজ ও জাতির মধ্যে বিভিন্ন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। সামাজিক যে কোন ধরনের বৈষম্যই সমাজে বিভেদ, পারস্পরিক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাতের জন্ম দিতে পারে এবং এভাবে বিনষ্ট হতে পারে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। এই কু-প্রথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। এর দ্বারা উচ্চ শ্রেণী কর্তৃক নীচু শ্রেণী সর্বযুগেই শোষিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েছে। উচ্চ শ্রেণী বরাবরই নীচু শ্রেণীকে বঞ্চিত করেছে। এভাবে শ্রেণী বৈষম্যের মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ অন্য শ্রেণীর মানুষকে নিজেদের দাসে পরিণত করেছিল। হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথা[৭] এবং মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্তপ্রথা এর বড় প্রমাণ। অতীতের প্রায় সব সমাজ ব্যবস্থাতেই এই প্রথার দ্বারা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ ও নিস্পেষণ করত। অধুনিক সমাজ ব্যবস্থাতেও এটা বিদ্যমান। আজকের কথিত সভ্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যেমন, হিন্দু সমাজে, আফ্রিকা ও পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গে এবং ধনী-দরিদ্র সমাজে বিভিন্নভাবে বর্ণ ও জাতি বৈষম্য চলছে। আধুনিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের যুগেও কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে অধিকার ও মর্যাদার যে বৈষম্য রয়েছে এবং কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেণীর প্রতি শ্বেতাঙ্গ শ্রেণী যে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে তা কারও অজানা নয়। কুরআন বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য ও বর্ণবাদকে যুল্ম গণ্য করে সব ধরনের বৈষম্য ও ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে সকল মানুষকে একই পতাকা তলে এনে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে। কুরআন সকল বৈষম্যকে যুলম চিহ্নিত করে এর পরকালীন মন্দ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে বলেছে[৮]– وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا " (সেদিন) চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট

---

১. আল কুরআন, সূরা আল-ইসরা'১৭ : আয়াত ৫৩।
২. হারুনুর রশীদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৩।
৩. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৩।
৪. আল কুরআন, ১১:২৭; ২:২৪৭।
৫.**সামন্তপ্রথা/সামন্ততন্ত্র:** মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, সমাজস্থ লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে যাজক সম্প্রদায় ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল অভিজাত শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল সর্বসাধারণ। এই তিন শ্রেণীর কাজকর্ম সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক ছিল। তাদের জীবন যাপন করার রীতিতেও পার্থক্য ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি শ্রেণীর পদমর্যাদা আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট করা ছিল। আইনের চোখে সবাই সমান– এই নীতি তখন বলবৎ ছিল না। একই প্রকার অপরাধের জন্য অভিজাত সম্প্রদায়ের লোককে এবং সাধারণ লোককে ভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়া হত। অন্যান্য আইন সম্মত অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য ছিল। তৃতীয়ত, সামন্ততন্ত্রে কেবল প্রথম দুটি শ্রেণীর লোকেরা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতেন। সাধারণ লোকের কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। -পরিমলভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব*, (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ),পৃ.২০৯।
৬. আল-কুরআন,সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৩১।
৭. **বর্ণপ্রথা**–হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ ভগবত গীতায় গুণ ও কর্মে মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–১.ব্রাক্ষণ, ২.ক্ষত্রিয়, ৩.বৈশ্য, ৪.শুদ্র। বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতে এই প্রথা প্রচলিত। এই প্রথায় উচু সম্প্রদায় যেমন ব্রাক্ষণ কর্তৃক নীচু সম্প্রদায় বিশেষ করে শুদ্ররা সুদূর অতীত থেকে সমাজে চরম নিগৃীত হয়ে আসছে। দেখুন–মনুস্মৃতি, অষ্টম অধ্যায়-শ্লোক ২৭০, দশম অধ্যায়-শ্লোক ৫১, ৫২, আরও দেখুন, গীতা, ঋগবেদ, রামায়ন, পুরাণ।
৮ .আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১১১।

সকলেই হবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে যুলুমের ভার বহন করবে।" বস্তুত এটি ইসলামের একটি অতি উজ্জ্বল সাফল্য। ইসলামের শিক্ষানুসারে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে মানুষের বিভক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের পারস্পরিক পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা।[১] আজকের পৃথিবীতে ইসলামের এই গুণটির বড়ই প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আর্নল্ড টোনবী বলেন[২]–

> আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার প্রধান বিষয়গুলোর জগা-খিচুড়ী চিন্তার (ধর্ম-জাতি-নীতি নিরপেক্ষ) মানুষ্য জীবদের সম্মিলন দু'টি বিপদ এনে উপস্থিত করেছে– একটি হল উৎকট বর্ণ সচেতনতা, অপরটি হল মদ, এবং এগুলোর প্রত্যেকটির মোকাবিলায় ইসলামের শক্তি এমন খেদমত দান করতে পারে যাকে গ্রহণ করলে আমরা উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে পারি। মুসলমানদের মধ্য থেকে বর্ণবাদ মানসিকতার বিলোপ সাধন ইসলামের একটি মহৎ অবদান। আজকের সমসাময়িক পৃথিবীতে ইসলামের এই মহান নীতির ব্যাপক প্রচার অতীব জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।... ইসলামের বর্ণবাদ বিরোধী শক্তির সময়োপযোগী ব্যবহার দ্বারাই বর্ণবাদের বিলোপ ঘটিয়ে সহিষ্ণুতা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব।"

জাতিগত দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতনীতি: জাতিগত দ্বন্দ্ব পৃথিবীর নতুন কোন সমস্যা নয়। এটিও আদিকাল থেকে তা চলে আসছে। এ কারণে পৃথিবী নানা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিত্তিতে এক জাতিকে আর অন্য জাতিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং একপক্ষ অন্য পক্ষের উপর তাদের দুস্কর্মের বোঝা চাপিয়ে দেয়। আজও পৃথিবী এ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এ কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার ফলে কোটি কোটি প্রাণহানিসহ পৃথিবী এক বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

আদর্শ ও জাতিগত দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত একটি নিকৃষ্ট অনাচার হল দ্বৈতনীতি। এ নীতির ফলে বন্ধুভাবাপন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতি এক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি, আর শত্রুভাবাপন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের প্রতি ভিন্ন নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান এই দুষ্ট নীতির অশুভ ফলাফল প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। এই নীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্ব। এ নীতি অশুভ পরিণতি থেকে আজ দেখতে পাই যে, মুসলিম অধ্যুষিত ফিলিস্তিন, ভারতের কাশ্মীর, রাশিয়ার চেচনিয়া, বার্মার আরাকান দীর্ঘ আন্দোলন করেও স্বাধীনতা লাভে ব্যর্থ। অথচ মুসলিম রাষ্ট্রে খৃষ্টান অধ্যুষিত পূর্বতিমূর, দক্ষিণ সুদান সামান্য আন্দোলনে রাতারাতি স্বাধীনতা লাভ করেছে। আজ বিশ্বের সন্ত্রাসের মূলহোতা আমেরিকা, ইসরাইল ও ইউরোপ সন্ত্রাসবাদের নামে ইরাক, আফগানিস্থান, সিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের বড় অংশকে আজ রক্তাক্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। এর মূলে যে অশুভ চক্র তা হলো–দ্বৈতনীতি। এ নীতি থেকে বের না হয়ে আসলে পৃথিবীতে শান্তি সুদূর পরাহত। এই হীন স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠে আল-কুরআন ন্যায়, সমতা ও ইনসাফের নির্দেশ দেয়। এ মর্মে বলা হয়েছে[৩] (وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ)- "কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"

❑.নারী নির্যাতন ও যৌতুক:

নারী নির্যাতন একটি ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক প্রত্যয়। সাধারণভাবে বলা যায়, নারীর শরীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির সমষ্টি কর্তৃক বিভিন্ন অজুহাতে নারীর উপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো, যৌন হয়রানি অথবা নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কিছু করতে বাধ্য করাই নারী নির্যাতন।

নারীরা সাধারণত লজ্জাশীল ও সহজ-সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে। নারীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজের দুষ্ট ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকেরা শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, বৈষম্য, অন্যায় ও অনৈতিক আচরণ করে থাকে। এ সব নির্যাতন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন: শরীরিক নির্যাতন, যৌতুক, নিকট রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের দ্বারা সহিংসতা, কর্মস্থলে নির্যাতন, নারী পাচার, পতিতাবৃত্তি, ইভটিজিং (অশালীন ও যৌন উস্কানিমূলক কথা ও ইঙ্গিত), এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, অপছন্দনীয় পুরুষকে বিবাহে বাধ্যকরণ, তালাকপ্রাপ্তদের অন্যত্র বিবাহে বাধা দান, বিবাহোত্তর সন্তান ধারণের বাঁধা দেওয়া, মাতৃকালীন হয়রানি, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, বিকৃত অশ্লীল চিত্র, মানসিক নির্যাতন, লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক আচরণ, গৃহকর্মী হিসেবে নির্যাতন ও পুলিশী হয়রানি, ইত্যাদি। কুরআন এ সবের বিরুদ্ধে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]-وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ- আর তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালজ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলম করবে।

আদিকাল থেকে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সমাজে নারীর প্রতি অন্যায় ও বৈষম্য করা হয়েছে।[৫] জাহিলী যুগের আরব সমাজে নারীদের প্রতি চরম অবিচার করা হত এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হত।[৬] ইউরোপ যখন তমসাচ্ছন্ন যুগে নিমজ্জিত ছিল তখন নারীর আত্মার প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক হত তাদের আত্মা মানবিক কিনা। আজকের কথিত সভ্য সমাজেও নারীর প্রতি বৈষম্য আচরণ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ কন্যা সন্তানের প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক মানসিকতা পোষণ করে থাকে। কন্যা সন্তানের জন্মের পর অনেক পিতার মুখ

---

[১]. আল-কুরআন, ০৪ : ০১, ৪৯:১৩।

[2].Arnold Toynbee,*Civilization on Trial*, P.205-206. উদ্ধৃত, খুরশিদ আহমদ, *গোড়ামী,অসহনশীলতা ও ইসলাম*, অনু.আবুল আসাদ (ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ ২০০২),পৃ.৩৯;

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ ০৫: আয়াত ০৮।

[৪]. আল-কুরআন, ০২: আয়াত ২৩১; আরও দেখুন, ০৪:০৪, ২৪-২৫।

[৫].হিন্দু ধর্মে নারী, বৌদ্ধ ধর্মে নারী, খ্রিষ্টান ধর্মে নারী, ইহুদী ধর্মে নারী এবং বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতায় নারী মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে জানুন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, -সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ,*নারী নির্যাতনের রকমফের*(ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি,২০০২),পৃ.১১-৬৪, আবদুল খালেক, *নারী ও সমাজ*(ঢাকা:ইফাবা,২০০৪),পৃ০১-১৮।

[৬]. আল-কুরআন, ১৬: ৫৮; ৮১:৮-৯।

মলিন হয়ে যায়। জন্মের পর থেকে মেয়েরা পরিবার ও সমাজ থেকে নানা বৈষম্য ও নির্যাতনের স্বীকার হয়। নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের ফলে অসংখ্য নারীর জীবনে চরম দুর্ভোগ ও অবর্ণনীয় কষ্ট নেমে আসে। এটা পরিবার ও সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়, অশান্তি, অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এটা সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

যৌতুক: নারী নির্যাতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যৌতুক। সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যৌতুক বলতে বিবাহে কন্যা পক্ষ কর্তৃক বর পক্ষকে বাধ্যতামূলভাবে প্রদেয় মাল-সামগ্রীকে বুঝায়।[১] ব্যাপক অর্থে বিবাহের সময় কনের অভিভাবক ও পরিবার মেয়ের ভবিষ্যত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে পাত্র পক্ষকে যে অর্থ-সম্পদ, অলংকার, আসবাবপত্র ও ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যাদি প্রদান করে থাকে তাকে যৌতুক বলে।[২]

যৌতুক হিন্দু সমাজের একটি কুপ্রথা। হিন্দু সমাজে মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা না থাকায় হিন্দু মেয়েদের বিবাহের সময়ে যৌতুক হিসেবে অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয়। কিন্তু এই কুপ্রথা বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংক্রামক ব্যধির ন্যায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। এই কুপ্রথা আজ বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে অভিশপ্তময় করে ফেলেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে যৌতুক না পেলে নারীর জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এই কুপ্রথা অনেক নারীকে জীবন কেড়ে নিয়েছে, অনেকের ওপর নেমে এসেছে অমানবিক শারীরিক নির্যাতন, অনেকের সংসার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার অনেক নানা লাঞ্ছনার বোঝা নিয়ে অশান্তিময় দাম্পত্য জীবন পার করতে হয়েছে। অনেকে লাঞ্ছনায় অতিষ্ট হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এতে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক ভাঙ্গন ও তালাক বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রথার কারণে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের মেয়েকে ভালো একটি বিবাহের জন্য মোটা অংকের টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব বিক্রি করে নিঃস্বে পরিণত হতে হয়েছে। আবার এ অর্থের জোগান দিতে পিতা অনেক সময় বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। এই প্রথা এখন সমাজের অঘোষিত রীতিতে পরিণত হওয়ায় আর্থিক অনটনের কারণে পিতা যথাসময়ে বিবাহ না দেয়ার কারণে অনেকে অবৈধ প্রেম ও ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ছে। এই কুপ্রথার কারণে হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজে নারীদের উত্তারাধিকার সম্পদে অংশ দেয়া হয় না। এই কুপ্রথা মুসলিম সমাজে চালুর ফলে মুসলিম পরিবারগুলোতে মেয়েদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অংশ প্রদান করা হচ্ছে না। এ কারণে নারীদের প্রাপ্য মোহর আদায় করা হয় না। কুরআন যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতনসহ সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এ মর্মে কুরআন বলেছে[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. "হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে,তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। "

নারী নির্যাতনের কারণ: অজ্ঞতা-মূর্খতা, মানসিক সংকীর্ণতা ও বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা, পুত্র সন্তানের কাম্যতা, যৌতুক প্রথা, সহশিক্ষা, সহ কর্মস্থল, নারী অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা।

প্রতিকারে করণীয়: ইসলাম প্রদত্ত নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে জনমত সৃষ্টি। গণমাধ্যমে নারী নির্যাতন বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করা। নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। জুমু'আর খুতবা ও পাঠ্যপুস্তকে নারী নির্যাতন বিরোধী আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা।

❑. অন্যের অধিকারহরণ, ইয়াতীম, দুর্বল ও অসহায়দের সাথে দুর্ব্যবহার:

বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মানুষ নিয়ে একটি সমাজ গড়ে উঠে। সামাজিক শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের কিছু অধিকার আছে। কিন্তু আবহমানকাল থেকে সমাজের শক্তিমান মানুষেরা শক্তি প্রয়োগ করে কিংবা বিভিন্ন অপকৌশলে দুর্বল ও অসহায় মানুষের সে সব অধিকার হরণ, শোষণ ও নিপীড়ন করে আসছে। এতে সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও যুলমের বিস্তার ঘটে। সমাজে দুর্বল ও অসহায় মানুষের কষ্ট ও দুর্ভোগ বেড়ে যায় এবং তাদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠে। এতে সমাজে শান্তি-সংহতি, স্থিতিশীলতা, পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়। অসহায় মানুষের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণকারীদের ভৎর্সনা করে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين - فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ-"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।"
এখানে ইয়াতীম ও অভাবের তাড়নায় আগত সাহায্যপ্রার্থীর সাথে ভৎর্সনা ও মন্দ আচরণকারী ব্যক্তিকে পরকালীন জীবনের হিসাব, জবাবদিহিতা, পুরস্কার ও শাস্তি অস্বীকারকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা একজন কাফিরের বৈশিষ্ট্য। আজ সমাজে অহরহ দেখা যাচ্ছে ধনীশ্রেণী রকমারি সুস্বাদু খাবার, পোষাক ও আসবাবপত্র ব্যবহার করছে অন্যদিকে অনাথ-অভাবী ক্ষুধার জ্বালায় ছেঁড়া ও মলিন পোষাকে ধনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছে। আর তারা অভাবের তাড়নায়

---

[১]. *যৌতুক ও ইসলাম*, সম্পাদনা, মুহাম্মদ সিরাজুল হক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং, ২০১২) পৃ.১৪।
[২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৯।
[৪]. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'ঊন ১০৭: আয়াত ০১-০৩।

ধনীদের দ্বারে গেলে অনেকেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এ আচরণ কেবল পরকাল অস্বীকারকারী অহংকারী কাফিরই করতে পারে, কোন মুসলিম এটা করতে পারে না।

আজকাল গ্রাম-শহরের সর্বত্রই ধনী ও সবল শ্রেণী কর্তৃক দরিদ্র, দুর্বল, ইয়াতীম ও অসহায় শ্রেণীকে আপন-পর নির্বিশেষে শোষণ ও নিপীড়ন করে আসছে এবং ক্রমাগত তা বেড়েই চলছে। অসহায়, দুর্বল ও দরিদ্র মানুষকে ঠকানো এবং তাদের সম্পদ গ্রাস করে তাদের ন্যার্য পাওনা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য সবল ও ধনী শ্রেণী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা উপায় ও অপকৌশল অবলম্বন করে থাকেন। সমাজের মহাজন ও সম্পদশীল ব্যক্তিরা সামান্য ঋণের বিনিময়ে অসহায়-দুর্বলদের থেকে মোটা অংকের সুদ ও আসল আদায় করছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা নামমাত্র মূল্য দিয়ে অসহায়-দুর্বলদের মূল্যাবান সম্পদ ও জমাজমি গ্রাস করছে। আবার সমাজে শ্রমিকদের খাটিয়ে ন্যার্য মুজুরী ও সময়মত বেতন-ভাতা পরিশোধ করছে না। চাকর, চাকরাণী, কাজের মেয়ের প্রতি নির্দয় ও অমানবিক আচরণ বর্তমান সমাজের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এ সব অন্যায়। এতে সমাজে বৈষম্য ও ভেদাভেদ বাড়ছে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য কমছে।

মুসলিম-অমুলিম নির্বিশেষে সব সমাজে আজকাল দুর্বল উত্তারাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ দেয়া হয় না। বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে ইয়াতীম, বোন, কন্যা ও দরিদ্র আত্মীয়দের প্রাপ্য উত্তারাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কোথাও সম্পদের নামমাত্র কিছু মূল্য দিয়ে তাদের সম্পদ কুক্ষিগত করা হয়। আবার কোথাও ভয় দেখিয়ে বা শক্তি প্রয়োগ করে সবল কর্তৃক দুর্বলদের অধিকার হরণ ও সম্পদ জবরদখল করা হয়। এভাবে সমাজের শক্তিশালীরা বিভিন্নভাবে দুর্বলদের সম্পদ ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এসব অন্যায়ের নিন্দা করে এর কারণ সনাক্ত করে মহান আল্লাহ বলেন[১] كَلَّابَل لَّاتُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ.وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا.وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا "তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, অভাবগ্রস্থদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। উত্তারাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ তোমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেল এবং তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস।"

উল্লেখিত আয়াতে থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পদের লোভে, নিজ স্বার্থ ও সুখ-শান্তি অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে মানুষ দরিদ্র, দুর্বল, ইয়াতীম ও অসহায়দের প্রতি দুর্ব্যবহার ও তাদের অধিকার হরণ করে থাকে। কিন্তু এর পরিণতি অতি মন্দ। এটা পরকালে দুর্ভোগের কারণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন[২] مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر - قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ "(জাহান্নামীদের জিজ্ঞাসা করা হবে) কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? তারা বলবে,'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'।'আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না'।" অন্যত্র ইরশাদ করেন[৩]– إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ- " নিশ্চয় সে তো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করত না, আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না। অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না।"

প্রতিকারে করণীয়: ক) ইসলামী উত্তারাধিকার নীতিমালা বাস্তবায়ন, খ) রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। গ)শক্তিমানদের যুলম ও অন্যায় প্রতিরোধ। ঘ) পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি।

❑. যাদু (السحر) চর্চা ও প্রয়োগঃ

যাদু(السحر) প্রত্যেক ঐ জিনিষকে বলা হয়, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল হয় এবং যার কারণসমূহ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে।[৪] এটা এমন সূক্ষ্ম কাজ ও তন্ত্র-মন্ত্র যা শরীর ও অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। যাদুতে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করে কারো অন্তরে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয় এবং গোপনীয় চতুরতা দ্বারা তাকে বশীভূত করা হয়।

যাদু, বান-টোনা ও মায়াবিদ্যা ইত্যাদিতে কুফর ও শিরক বাক্য এবং পাপাচারের মাধ্যমে জ্বিন ও শয়তানদের সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। যাদুর সাহায্যে সচরাচর মানুষের ক্ষতি সাধন করা হয়। এর মাধ্যমে অন্যায়ভাবে স্বার্থসিদ্ধি করা হয়। যাদুকর মানুষের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। যাদু-টোনা মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম, অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত করে। এটা মানুষকে ক্রমাগত অনৈতিকতা ও ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। যাদুতে রয়েছে অন্যায় ও অমঙ্গল। এ ছাড়া এতে রয়েছে মানুষের পরস্পরের অধিকার তথা আর্থিক ও মানবিক ক্ষেত্রে সীমালজ্ঘন। এর দ্বারা সমাজে নানাপ্রকার ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। যাদুর মাধ্যমে ইতঃপূর্বে মানব সমাজে নানারকম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্য

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আল-ফাজ্‌র ৮৯: আয়াত ১৭-২০।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছির ৭৪: আয়াত ৪৩-৪৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাক্ব্কাহ ৬৯: আয়াত ৩৩-৩৬।
[৪]. ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.৩৭১।

হাদীসে যাদুকে মারাত্মক ক্ষতিকর সাতটি মহাপাপের অন্যতম গণ্য করেছে।[১] তাই এই কুকর্ম থেকে আত্মরক্ষার উপদেশ দিয়ে কুরআন এর অনষ্টিতা তুলে ধরেছে [২]

> وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ
>
> আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফিরিশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা স্বরূপ; সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না।

উল্লেখিত আয়াতে যাদু শিক্ষা করাকে কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, যাদু মানুষের অকল্যাণ সাধন করে থাকে। তা সমাজে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার ঘটায় এবং মানুষকে কুফর ও শিরকের দিকে ধাবিত করে।

যাদুর কারণ: অন্যায়ভাবে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, প্রতিহিংসাবশত অন্যের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা।

যাদু প্রতিরোধে করণীয়: যাদু চর্চা নিষিদ্ধকরণ এবং যাদুর উপকরণ ধ্বংস সাধন, যাদুকারীদের শাস্তির বিধান চালু।

....

সামাজিক পর্যায়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। উল্লেখিত বিষয়াবলী সমাজ জীবনে অবক্ষয় সৃষ্টি করে এবং মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক জীবনে অবক্ষয়, অশান্তি-বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ-কলহ রক্ষা পেতে হলে উল্লেখিত মন্দ বিষয়গুলোর সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা এবং সমাজ জীবন থেকে এ সব প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশের অন্তরায় ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়সমূহ

সমাজের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। উন্নত ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের কতগুলো শর্ত রয়েছে। এর উপরই রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নির্ভর করে। তবে অসৎ নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন ভুল নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। যা রাষ্ট্রের নাগরিকের জীবনে নানা দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাড়ায়। যে সব বিষয়ের কারণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবক্ষয় সৃষ্টি হয় নিয়ে নিম্নে তা নিয়ে আলোচনা করা হলো-

❑· সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল-কুরআন উপেক্ষা:

আল-কুরআন প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। এটি আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।[৩] মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যাপারে ইসলামের নিজস্ব সুস্পষ্ট বিধান ও দিকনির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের মুসলিমদের বড় অংশই এ ব্যাপারে অজ্ঞ ও উদাসীন। তারা ইসলাম বলতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কতিপয় বিশ্বাস ও নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতকে বুঝে থাকেন। এ কারণে তারা ইসলামকে নিদিষ্ট কিছু ইবাদত ও আমলের তথা কালেমা, নামাজ, রোজা, হাজ্জ, যাকাত,

---

[১].মূল আরবী [اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওসায়া, হা. নং ২৬১৫; *মুসলিম*, হা. নং ৮৯।

[২]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১০২।

[৩]. আল-কুরআন ০৩:১৯, ০৫:০৩।

কতিপয় যিকির, দোয়া ও 'আমল ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। তারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান গণ্য না করে অন্যান্য ধর্মের মত কতিপয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব একটি ধর্ম গণ্য করেন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় তারা ধর্মকে নির্দিষ্ট কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। তারা ব্যক্তি জীবনের আংশিক পর্যায়ে মহান আল্লাহ্‌র দাসত্ব করেন, আর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাগূতের দাসত্ব করে থাকেন। বস্তুত এটা ইসলাম সম্পর্কে বড় ধরনের অজ্ঞতা ও গুরুতর বিভ্রান্তি। কেননা ইসলাম মানুষের জীবনকে ধর্মীয় ও পার্থিব এ দু'ভাগে ভাগ করেনি। বরং সমগ্র জীবনকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই জীবনের সব কাজই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে যদি তা ইসলামের নির্দিষ্ট বিধানের ভিত্তিতে করা হয়। আর 'মুসলিম ঘোষণা করার পর কারো জন্যই এ অবকাশ নেই যে, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে জীবনের অন্যসব বিষয়ে ইচ্ছেমত চলবে। কেউ নিজেকে মুসলিম দাবী এরূপ করলেও কার্যত সে মুশরিক, কাফির ও মুনাফিকদের দলভুক্ত হবে। এতে তার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি সুদূর পরাহত। বিশেষ করে পরকালে সে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মান্য করা, আর সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিকসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে সেকেলে বা অনুপযোগী মনে করে তা উপেক্ষা করে ইচ্ছামত বিধান তৈরী করা শুধু মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি অনাস্থা নয় বরং তাঁর প্রভুত্বের প্রতি অনাস্থার শামিল–যা ভয়ানক অনৈতিক কাজ। এভাবে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মসজিদ ও মাদ্রাসার চার দেয়ালে সীমিত করে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে থেকে তাঁর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব উপেক্ষা করে নিজেকে মুসলিম দাবী করা কি স্ব-বিরোধী নয়? রাসূল (সা.) যে কাজ করেছেন তা না করা যদি আমরা তাকওয়া ও দ্বীনদারী মনে করি তবে কি রাসূল (সা.) কে কম তাকওয়াবান বলে ধারণা করা হয় না? নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও যিকির যদি যথেষ্ট হত তবে কেন রাসূল (সা.) ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলেন? কেনইবা এতগুলো যুদ্ধ ও রাজনীতি করলেন? তবে কি তাঁর দেখানো কর্মপদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ না করেই সংক্ষেপে তাকওয়াবান হওয়া ও পরকালীন মুক্তি অর্জন সম্ভব? অথচ আল-কুরআনে বলা হয়েছে[১]-
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
"আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"
এই আয়াতের আবেদন শুধু ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং মানব জীবনের সব দিক ও বিভাগের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের মত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এ জেড. এম. সামসুল আলম এ সম্পর্কে বলেন-

> আল-কুরআন কোন আংশিক জীবন-ব্যবস্থা দেয়নি। আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর উপর ঈমান রেখে কোন মুসলিম এ কথা ভাবতে পারে না যে, ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা আমি মানি, আর অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা আমি মানি না, কেননা বর্তমান যুগে ইসলামী চিন্তা-ধারণা অচল। তাই বিশেষ বিশেষ দার্শনিক বা নেতা যা বলেছেন তাই আমরা গ্রহণ করি। এ তো পরোপুরি শির্‌ক। অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা বাতিল, যুগের অনুপযোগী এবং অন্য কোন পণ্ডিত যা বলেছেন, তাই যুগোপযোগী এবং সঠিক পন্থা–এরূপ বিশ্বাস করার মানেই হলো বিশেষ ব্যক্তি বা দার্শনিককে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা এবং আল্লাহর বিধানকে অন্য বিধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে না করা।
> এরূপ বিশ্বাস নিয়ে কি করে একজন মু'মিন থাকতে পারে, তা আমার বুদ্ধির অতীত। একমাত্র রাসুল (সা.) এর জীবনই আমাদের মডেল বা জীবনাদর্শের বাস্তব রূপ। আমি যদি অন্য কোন বিশ্বপ্রতিভাকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশ্বাস বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আদর্শ মনে করি– তবে কিভাবে আমরা কিয়ামতের দিন তাঁর শাফা'আত কামনা করব? সেদিন তিনি হয়ত আমাদের বলবেন, তোমরা তো আমাকে তোমাদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে করনি। নামাজ-রোজা, দাফন-কাফন প্রভৃতি ব্যাপারে আমাকে আদর্শ মেনে নিয়েছিলে, এ ব্যাপারে ভুল-চুক যা হয়েছে তার জন্য আমি শাফা'আত করব। আর অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-পরিচালনা–এ সমস্ত ব্যাপারে তোমরা যাদেরকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলে শাফা'আতের জন্য তাদের কাছে যাও। এরূপ বলা কি অসঙ্গত হবে? [২]

কিন্তু আজ মানুষ আল্লাহ বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিধান তৈরী করে নিয়েছে। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র আজ অশান্তি, নৈরাজ্য, অন্যায় ও অনাচার ভরে গেছে। অন্যায়-অবক্ষয়ের সর্বগ্রাসী ছোবলে মানবতা আজ দিশেহারা। কোন প্রতিষেধকই কাজ হচ্ছে না, বরং সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। আর এটাই স্বভাবিক। মানুষ তার সর্বজ্ঞ স্রষ্টার বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেরাই প্রভু সেজেছে। দাসেরা আজ মনে করছে তাদের প্রভুর আধুনিক জ্ঞান নেই, নেই মুক্তবুদ্ধি। তাই তারা প্রভুর বিধান সেকেলে মনে করে তার পরিবর্তে নিজেরা বিধান তৈরী করছে। অথচ মানুষের প্রকৃতি তার স্রষ্টার চেয়ে আর কে ভালো জানে? আর কে আছে যে সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার চেয়ে অধিক কল্যাণকর বিধান দিতে পারে? এ মর্মে কুরআনের ভাষ্য[৩]–أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ "তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?" অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন[৪]–

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩: আয়াত ৩৬।
[২]. শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ.৬৫-৬৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা মায়িদাহ ০৫: আয়াত ৫০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা মায়িদাহ ০৫ : আয়াত ৪৯।

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ-

"আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক।"

বর্তমানকালের মুসলিমদের একটি বড় অংশ বিশ্বাস করে যে, একবার কালিমা পড়লে জীবনে যত পাপ করুক না কেন একবার না একবার বেহেশতে যাবেই। তারা মনে করে যে, পাপের কারণে জাহান্নামে নির্দিষ্ট পরিমানে শাস্তি লাভের পর অবশ্যই তারা বেহেশতে যাবে। জান্নাতে প্রবেশ করার এই সহজ পথ থাকার কারণে তারা সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, হত্যা, যুলুম, অবৈধ উপার্জন, বিশ্বাসঘাতকতা ও তাগূতের অনুসরণ সহ বহুবিদ অপকর্মে লিপ্ত। তাদের অনেকেই বড় শিরক ও কুফর মত ঈমান বিনষ্টকারী ভয়ানক মহাপাপে লিপ্ত হয়ে ঈমান নষ্ট করে কাফির, মুশরিক ও তাগূতের পূজারীতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের আশা করে–যা একেবারেই অমূলক। এটা একটি বড় ধরনের ভুল ধারণা। ইতঃপূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানরাও এ ধরনের দাবী করেছিল। তারা মনে করত যে, তারা যতই পাপ করুক না কেন পাপের কারণে কয়েকদিন জাহান্নামে থাকার পর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরও এ ধরনের ভিত্তিহীন বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে-[১] وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"তারা বলে, দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না। বল, তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ, অতএব আল্লাহ্ তার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করবেন না কিংবা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জান না?"

বর্তমান মুসলিমদের একটি অংশ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের কথা শুনলেই আঁতকে উঠে। তারা মনে করেন যে, ধর্মই সব অনর্থের মূল ও প্রগতির অন্তরায়। মূলত তারা মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইউরোপে ধর্মের নামে রাজাদের সাথে পোপ, পাদ্রী ও পূরহিতদের যোগসাজসের মাধ্যমে যে নানা ধরনের যুল্ম, নির্যাতন ও অপকর্ম করেছিল। যার পটভূমিতে ধর্মহীন রাষ্ট্রের ধারণা ও আন্দোলন সূচনা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে আজকের পাশ্চাত্য জগতে সব রাষ্ট্রই ধর্মহীন। আজকের কথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে ইসলামের ব্যাপারে একই ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করে থাকে। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামকেও তারা একইভাবে মূল্যায়ন করেন। এরাই ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে তা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বস্তুত তারা দ্বীন-ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে দু'টি বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন জিনিস বলে মনে করে। এই মনোভাবের ফলে তারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়ার সাথে সাথে ধর্মীয় নেতা হুকুম ও কর্তৃত্ব পালন করাও দরকারী বলে মনে করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া কেবল আল্লাহর হুকুমই নয়, সেই সঙ্গে ধর্মনেতা তথা পীর সাহেবের হুকুম পালন করাও দরকারী বলে মনে করে। জীবনের বৃহত্তম দিক– রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক কাজকর্মকে ইসলামের আওতার বাইরে বলে মনে করে। সেখানে মেনে নেয়া হয় রাজনীতিক ও শাসকদের বিধান। নামাযের ইমামতি ধার্মিক লোকই করবে বলে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাসিক-ফাজির তথা ইসলামের দুশমনদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতেও কোন দ্বিধাবোধ করা হয় না। বরং একে (সামাজিক, রাজনীতি, অর্থনীতি কর্মকাণ্ড) ইসলামের বিপরীত কাজ মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনে যারা ধর্মকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করে– পালন করা দরকার মনে করে, তারাই যখন রাজনীতি করতে নামে, তখন সেখানে চরম ইসলাম বিরোধী রাজনীতি, চরম শরীয়ত বিরোধী সামাজিকতা এবং সুস্পষ্ট হারাম উপায়ে লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে। কেননা এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে বিধানদাতা মানতে রাজী হয় না। এক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে তার প্রয়োজনও মনে করেন না। ইসলামের তাওহীদি আকীদায় সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে এই হল এক মারাত্মক বিদ'আত ও বিভ্রান্তি। এই পর্যায়ে এসে সমাজের ধার্মিক লোকেরা আল্লাহকে পাবার জন্য পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে। এর ফলে আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে ধর্মনেতার(পীর-বুযুর্গদের) এবং সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে অভিনবভাবে এক বড় ধরনের শিরক চালু করেছে।[২] অথচ মহান আল্লাহ বলেন[৩] ...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ... فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ... فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।...তারাই যালিম।...তারাই ফাসিক।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে একই ব্যক্তিকে কাফির, ফাসিক ও যালিম বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রা. বলেন, "যে আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে সে কাফির। আর যে তা স্বীকার করবে কিন্তু তদানুযায়ী ফায়সালা করে না সে ফাসিক ও যালিম।"[৪] কাজেই যারা মনে করে যে, ইসলামে রাজনীতি আছে তবে বর্তমানে তা কার্যকরী করার মত নয়। কেননা বর্তমান যুগ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইসলামী রাজনীতির তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গেছে। তারা নিঃসন্দেহে কাফির। ইসলামে তাদের কোনই অংশ নেই। আর যারা স্বীকার করে যে, আল্লাহর বিধানের সবকিছুর ফয়সালা হওয়া উচিত কিন্তু

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮০, আল-কুরআন (০৩:২৪)।

[২]. দেখুন, মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭-৪৮।

[৩].আল-কুরআন, সূরা মায়িদাহ ০৫: আয়াত ৪৪, আল কুরআন (০৫:৪৫) (০৫:৪৭)।

[৪].মূল আরবী [من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق] ইবন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, খ. ১০, পৃ.৩৫৭।

ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তদানুযায়ী ফায়সালা করে না তারা ফাসিক ও যালিম। আর যারা মনে করে যে, ইসলাম নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ্জ সর্বস্ব এটি ধর্মমাত্র। এতে রাষ্ট্রনীতির কোন স্থান নেই। তারা মারাত্মক পথভ্রষ্ট এবং মুসলিম নামধারী কাফির। এদের ক্ষতিকর প্রভাবও প্রকৃত কাফিরের তুলনায় কম ক্ষতিকর ও বিপদজনক নয়। কারণ, তারা দ্বীনের কোন অংশ বিশেষের উপর ঈমান এনে অপর কোন অংশকে প্রত্যাখান করছে, যা সুস্পষ্ট কুফুরী। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[১]-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً- أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তাঁর রাসূলদেরকেও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চায় এবং বলে আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি। আর তার মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির, এবং আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।"

উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে বর্তমান মুসলিম জাতির প্রতি তাকালে দেখা যাবে– তারা ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের আংশিক কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলছে, আর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধানের পরিবর্তে মানব প্রবর্তিত বিধি-বিধানের অনুসরণ করছে। ফলে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুফরীর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে। এ ধরনের কর্মনীতির পরিণতিতে তারা পার্থিব জীবনে হীনতা এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। [আল কুরআন, ০২: ৮৩ ।]

বর্তমানকালের মুসলিম জাতির এই দুরবস্থা এবং তার কারণ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ তাকী উসমানী বলেন–
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে মৌলিকভাবে ছয়টি শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। যেমন– ১.আকাইদ (বিশ্বাসাবলী), ২. ইবাদত (উপাসনা), ৩. মুয়ামালাত (অর্থনৈতিক লেন-দেন), ৪. মুয়াশারাত (সামাজিকতা), ৫. সিয়াসত (রাজনীতি), ৬. আখলাক (নৈতিকতা)। এ ছয়টি শাখার প্রত্যেকটি দ্বীনের আবশ্যকীয় অঙ্গ, এর কোনটিকে দ্বীন থেকে পৃথক করাও সম্ভব নয়। আবার এর কোনটিকে পূর্ণ দ্বীন বলাও সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু লোক শুধু আকীদা ও ইবাদতকে দ্বীন মনে করে দ্বীনের অন্যান্য শাখা পরিত্যাগ করেছে। কেউ মুয়ামালাত (অর্থনৈতিক লেন-দেন) সংক্রান্ত বিধি-বিধানকে দেখে মন্তব্য করছে ইসলাম মূলত একটি স্বার্থক অর্থ ব্যবস্থা। কেউবা রাজনৈতিক শিক্ষাকে অধ্যয়ন করে মনে করে দ্বীনের মূল উদ্দেশ্য রাজনীতি অন্যান্য শাখা তার অধীন। এ সম্পর্কিত সর্বাধিক ভুল বুঝাবুঝিটি হয়েছে, দ্বীনকে মনে করা হয়েছে শুধু আকাইদ ও ইবাদতের নাম। জীবনের অন্যান্য সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা নেই,–এই ভ্রান্ত ধারণাকে ব্যাপকরূপ দেয়ার কাজে তিনটি বিষয় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে-১.মুসলিম বিশ্বে অমুসলিম শক্তিসমূহের রাজনৈতিক আধিপত্য, যা দ্বীনের কর্তৃত্ব ও প্রভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে বিতাড়িত করে তাকে শুধু মসজিদ ও মাদ্রাসার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলাম শিক্ষার প্রচলন না থাকায় মানুষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এ চিন্তার প্রসার ঘটেছে যে, দ্বীন শুধু নামাজ-রোজার নাম। ২.ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা, যা সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে। এই চেতনার ফলে মানুষ মনে করে যে, ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি পর্যন্ত একে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া পশ্চাৎপদতারই নামান্তর। ৩.আমরা নিজেরা নিজ নিজ কর্মপন্থার দ্বারা উদ্ভব করেছি যে, দ্বীনের বিশেষ কিছু অংশ যেমন-আকীদা ও ইবাদতকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করছি আর অর্থনৈতিক লেন-দেন, সামাজিকতা, রাজনীতি ও আখলাকের ব্যাপারে তার দশভাগের একভাগও গুরুত্ব দিচ্ছি না। এর ফলে আজ সামাজিকতা, অর্থনৈতিক লেন-দেন, রাজনীতি ও আখলাক সম্পর্কে অজ্ঞতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এগুলো যেন দ্বীনের কোন অংশই নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আকাইদ ও ইবাদতকে গুরুত্ব প্রদানের সাথে সাথে মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, আখলাক ও সিয়াসতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ দ্বীন শুধু আকাইদ বা ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এতে সামাজিকতা, লেন-দেন ও নৈতিক দিকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। তবে আকাইদ ও ইবাদত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধু সামাজিকতা, অর্থনৈতিক লেন-দেন, রাজনীতি ও আখলাক প্রতি দৃষ্টি দিলেও দ্বীন বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হবে। আবার আকাইদ ও ইবাদতবিহীন সামাজিকতা, লেন-দেন, রাজনীতি ও আখলাক নিষ্প্রাণ দেহ ও ভিত্তিহীন অট্টালিকায় পরিণত হবে। কাজেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধন করতে হবে।[২]

বস্তুত উল্লেখিত আলোচনায় আল-কুরআনের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি ঘটেছে। হাদীসেও এর সত্যতা বিদ্যমান। রাসূল সা. বলেন, "ঈমানের শাখা ষাটের বেশী। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো–*'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* এই কালেমার আন্তরিক স্বীকৃতি প্রদান করা। আর সর্বনিম্ন শাখা হলো–রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।"[৩] এ হাদীসে ঈমানের শাখায় আকাইদ ও ইবাদত সাথে সামাজিকতা, অর্থনৈতিক লেন-দেন, রাজনীতি ও আখলাকও স্থান পেয়েছে।

তাই বলা যায় যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মের নাম, বরং তা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যারা ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে দেখেন তাঁরা মূলত ইসলামকে খণ্ডিত করে ফেলেন। কারণ, সেক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে মানুষের জীবনের একটা অংশের সাথে, পুরো জীবনের সাথে নয়। জীবনের অন্য দিকগুলো রয়ে যায় অন্য কোন দীন বা জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। সেরকম অবস্থায় জীবন হয়ে পড়ে পরস্পর বিরোধী কতগুলো দীন বা জীবন ব্যবস্থার সংমিশ্রণ, যা মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেয়। মানুষের জীবনের সার্বিক দিকের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে শুধু একটি অংশ ধর্মীয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার ফলে ইসলাম যে বৈপ্লবিক অবদান রাখতে পারত একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, একটি জাতির সামাজিক জীবনে, একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জীবনসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সে অবদানটুকু আর সে রাখতে পারছে না। এটা ইসলামের ব্যর্থতা নয়। বরং এটা একইসাথে সমগ্রভাবে বিশ্ব মানবতার ব্যর্থতা ও তার

---

১. আল কুরআন,সূরা আন-নিসা'০৪: আয়াত ১৫০-১৫১।
২. দেখুন, তাকী উসমানী, *ইসলাম ও আমাদের জীবন* (*যিকর ওয়া ফিকর*), অনু. মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, (ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০৮), পৃ.২০-২২।
৩. মূল আরবী [الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৮।

পাশাপাশি দুর্ভাগ্যও বটে যে, ইসলামের মত সর্বরোগ সংহারকারী অব্যর্থ ঔষুধ হতের কাছে সহজলভ্য অবস্থায় সর্বদা উপস্থিত থাকতেও শত দুরূহ রোগে আক্রান্ত ও জর্জরিত বিশ্ব মানবতা। সে ঔষুধ সেবন না করে বরং বিশ্বব্যাপী দাওয়া খুঁজে ফিরছে। ....অথচ মানুষ যদি ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে না দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থা হিসেবে দেখত, তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো সে নিজেই।[১]

❑. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল-কুরআনের পরিবর্তে বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ:

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেননি। মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য জীবনবিধান দিয়েছেন। আল-কুরআন মহান আল্লাহ মনোনীত চূড়ান্ত জীবনবিধান। এতে রয়েছে মানব জীবনের সব মৌলিক সমস্যার সমাধান, ইহলোকের শান্তি-নিরাপত্তা এবং পরকালীন মুক্তির পথনির্দেশ। কিন্তু মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এই জীবন বিধানকে সেকেলে ও অনুপযোগী মনে করে তাঁর পরিবর্তে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন মতবাদ তৈরী করে নিয়েছে। এক্ষত্রে কেউ ধর্মনিরপেক্ষবাদকে[২], কেউ সমাজতন্ত্রকে[৩], কেউ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে[৪], কেউ জাতীয়তাবাদকে[৫] কিংবা অন্য কোন মতবাদকে মুক্তির মূলতন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে এসব মানব রচিত মতবাদ বাতিল ও তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। এ সব মতবাদ বিভিন্নভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এতে মানব জীবনের সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ সামাধান নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন-[৬] أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ "তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে অধিক উত্তম?"

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান আল-কুরআনের পরিবর্তে মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিধি-বিধান প্রণয়ন করে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাকে জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে। আর মুসলিমদের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান আল-কুরআনকে সর্বোত্তম বিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীমহল মুক্ত চিন্তা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীবাসীকে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে যে সব মতবাদের জন্ম দিয়েছে। তা মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য বড় বড় শ্লোগান দিয়ে সাময়িক কিছুটা চমক দেখাতে চেষ্টা করলেও সত্যিকার অর্থে মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ, শান্তি, মুক্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের রচিত এসব মতাদর্শ অল্পকালের মধ্যেই আবেদন হারিয়ে বিশ্বের শান্তি, মুক্তি ও নিরাপত্তা প্রত্যাশী মানুষকে হতাশ করেছে। এসব মতবাদে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ অনুপস্থিত। পক্ষপাতদুষ্ট এসব মতবাদে বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও মুক্তির পরিবর্তে বিশেষ জাতি ও গোষ্ঠীর কল্যাণ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের মত সার্বিক কল্যাণকর, নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন নয়। আর জ্ঞানের স্বল্পতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার কারণে মানুষের পক্ষে সার্বিক কল্যাণকর বিধি-বিধান প্রনয়ণ করা সম্ভবপরও নয়। তাই এ সবের দ্বারা কখনই শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থায়ী মুক্তি আসবে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭] وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ " আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথার অনুসরণ করো, তবে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করে এবং শুধু অনুমান ভিত্তিক কথা বলে।" আরও বলা হয়েছে [৮] وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ "তাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" আরও ইরশাদ হয়েছে[৯] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ- "হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।" অন্যত্র আরও বলা হয়েছে[১০] قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ "বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহবান কর, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না, করলে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।"

---

[১]. জিয়াউল হক, *ইসলামী শাসন ব্যবস্থা : মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭), পৃ.০৫।

[২]. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম সংশ্লিষ্ট হতে পারে না এমন বিশ্বাসই হল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। [*অক্সফোর্ড এডভান্সড লার্নারস ডিকশনারীর]* অন্যত্র বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা হলো একটি রাজনৈতিক বা সামাজিক দর্শন যা কেবল ধর্ম বিশ্বাসকে নাখোচ করে দেয়। [*র‍্যানডম হাউজ অব দ্যা ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা*]– মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম. *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন,২০০৯) পৃ.১৯৯।

[৩]. সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদের বিপরীত মতবাদ। এতে বস্তুগত উৎপাদন যন্ত্রের মালিক ব্যক্তি নয়, এতে ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ করে জনগণের মালিকানার নামে সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে এনে সরকারী মালিকানা কয়েম করা হয়। এতে উৎপাদন ও বন্টন পরিচালিত হবে এই নীতির ভিত্তিতে যে, 'প্রত্যেকে সামর্থ মতো কাজ করবে এবং প্রয়োজন মতো ভোগ করবে। [*ইসলামী অর্থনীতি*, ইফাবা, ২০০৪, পৃ.১৬]

[৪]. গণতন্ত্র হলো এমন ধরনের শাসন ব্যবস্থা যাতে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ক্ষমতার স্থায়িত্বকরণ, দেশ পরিচালনায় জনগণ ও তাদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মো. আব্দুস সালাম ও অন্যান্য, *রাজনৈতিক তত্ত্ব ও সংগঠন* (ঢাকা:এন এস পাবলিকেসন্স, ২০১৩) পৃ.২৬৬।

[৫]. জাতীয়তাবাদ হলো এমন একটি মানসিক চেতনা যা কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য, ভাষা ও গৌরব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং নিজেদের অন্যান্য মানব গোষ্ঠী থেকে পৃথক ভাবতে শেখায়।-মো. আব্দুস সালাম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯২।

[৬]. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৫০।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১১৬।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৩৬।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪৯।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ৫৬।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে ফুটে উঠেছে যে, মানুষের পক্ষে সার্বিক কল্যাণকর, নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বজনীন বিধি-বিধান প্রনয়ণ করা সম্ভব নয়। এবং মানব প্রবর্তিত এ ধরনের বিধি-বিধান মানুষের নানা কল্যাণ, অশান্তি ও দুর্ভোগই বয়ে আনবে।

আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে নানা অস্থিরতা, অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, নৈতিক অধঃপতন ও মানবিক বিপর্যয় বিরাজমান তার মূল কারণ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। মানব চিন্তাপ্রসূত ত্রুটিপূর্ণ এই মতবাদ সমূহের অনিষ্টতা এই সমস্যা ও সংকট সৃষ্টির জন্য কম দায়ী নয়। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন[১] –وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا "যে আমার স্বরণে (কুরআন থেকে) বিমুখ হয় থাকবে, অবশ্য তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত।" আরও বলেছেন [২]- وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ "যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্বরণে(কুরআন থেকে) বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে ।"
উল্লেখিত প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রা. থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়, একটি হল–'তার জন্য রয়েছে এমন জীবন যেই জীবনে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে।' দ্বিতীয়টি হল–'মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে কোন নি'আমত দান করেন, অথচ সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তবে তাতে কোন কল্যাণ হয় না–এটাই হল সংকীর্ণ জীবন।' তিনি আরও বলেন,'যে সব গুমরাহ লোক অহংকার করে সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অথচ তারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল, তবুও তাদের জীবন হয় সংকীর্ণ।'...যাহ্হাক র. বলেন[৩] 'ضَنكًا'অর্থ:"অসৎ কর্ম ও হারাম রিযিক।" আর দ্বিতীয় আয়াতে কুরআনবিমুখ জাতির ভ্রষ্টতা ও অকল্যাণ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যত্র এসেছে–[৪] مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا- "তা থেকে যে বিমূখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে।"
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর(রহ.) বলেন[৫]–"যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অন্য কোথাও হতে জীবন চলার পথ খোঁজে আল্লাহ তাকে গুমরাহ করেন এবং জাহান্নামের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।"

সর্বপরি, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- মহান আল্লাহকে বিশ্বজগতের রব তথা সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিশ্বপরিচালক মেনে নিলে কেবল তাঁকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিধানদাতা মেনে নিতে হবে। যদি আল্লাহকে বিধানদাতা মানা না হয় তবে আল্লাহর রব হিসেবে অস্বীকার করা হবে। আর আল্লাহকে বিধানদাতা মেনে নিয়ে যদি মানুষেরও জীবনবিধান রচনার অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা হয় তবে তা হবে শিরক। তাই আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানকে বর্জন করে মানব রচিত মতবাদ ও বিধান দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অনধিকার চর্চা এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করার শামিল। এ প্রসংগে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ '*শিরক ও বিদাআত*' গ্রন্থে বলেন-
ইসলামী তাওহীদি আকীদায় আল্লাহর একত্ব ও অনন্যতা স্বীকৃত। যেমন–বিশ্বসৃষ্টি, লালন-পালন, রিযিকদান এবং দু'আ-ইবাদত পাবার অধিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে (আল্লাহর একক), অনুরূপভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে আনুগত্য করে চলতে হবে কেবল এক আল্লাহরই। মানুষের নিকট এই আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া আর কারোই এ অধিকার নেই, যেমন সমগ্র বিশ্বলোক-বিশ্বলোকের অণু-পরমাণু পর্যন্ত আনুগত্য করে চলছে কেবল এক আল্লাহর। পরন্তু নিখিল জগতের সবকিছুর উপর আইন-বিধান চলে এক আল্লাহর, তেমনি মানুষের জীবনের সর্বদিকে ও বিভাগে আইন জারী করার নিরংকুশ অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্ট এই মানুষের উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোই আইন জারী করার অধিকার নেই। মানুষ পারে না আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে নিতে ও পালন করতে। করলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে অনধিকার চর্চা, অন্যায় এবং অনাচার; তা হবে সুস্পষ্টরূপে শিরক।[৬]

যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রত্যাখ্যান করে মানব রচিত মতবাদ গ্রহণ করে পার্থিব জীবনে তারা হবে সত্যচ্যুত, বিপথগামী, তাগূত ও শয়তানের অনুসারী।[৭] এর দ্বারা কখনই তারা চূড়ান্ত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে পারবে না। আর আখিরাতের জীবনে তা দুর্ভোগ ও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৮]– وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ-"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত ।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[৯]–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

[১]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০ : আয়াত ১২৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩ : আয়াত ৩৬-৩৭।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০ : আয়াত ১২৪।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০ : আয়াত ১০০।
[৫]. ইবনু কাছীর(রহ), *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ.৩১৫।
[৬]. মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, *শিরক ও বিদাআত*, (ঢাকা: আল-ফুরকান প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০৫), পৃ.৪৪।
[৭]. আল-কুরআন, ২০ : ১২৪; ৪৩ : ৩৬-৩৭।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৮৫।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৫৭।

"আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যাকে তার রবের নিদর্শনাবলী স্মরণ করে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তার কৃতকর্ম ভুলে গেছে?"আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা এটে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহবান করলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না।"

মহান আল্লাহ আরও বলেন[১] وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين "যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" অন্যত্র বলা হয়েছে[২]– قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا "আর রাসূল বলবে, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।"

উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী মানুষকে পার্থিব শান্তি-কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর প্রদত্ত বিধানের অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি আসবে না।

বর্তমানকালে মুসলিম জাতি পৃথিবীব্যাপী যুলম, নির্যাতন ও বৈষম্যের স্বীকার। বিজাতিদের হাতে তারা সর্বত্র মার খাচ্ছে ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। তাদের উপর চলছে অকথ্য নির্যাতন। তারা বিজাতিদের আক্রোশের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অজুহাতে ইহুদী, খ্রীষ্টান হিন্দু ও বৌদ্ধরা আজ মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করছে। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিমরা আজ আত্মরক্ষারও সামর্থ্য হচ্ছে না। এই দুরবস্থার মূল কারণ আল-কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধান পরিত্যাগ করে তাগূতের অনুসরণ। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন,[৩] "কোন জাতির শাসকবর্গ যখন আল্লাহ্র কিতাবের আইন অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধি-বিধান তাদের মনঃপূত হয় না, তখন আল্লাহ্ তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করে দেন।" কবি আল্লামা ইকবাল(মৃ.১৮৭৭-১৯৩৮খৃ.) এর কণ্ঠে এটাই ধ্বনিত হয়েছে-[৪]

"ওহ যমানে মেঁ মুআয্যায থে মুসলমাঁ হো কর আওর তুম খার হুয়ে তারেকে কুরআঁ হো কর"
"মুসলমানের তরেই তখন যে-যুগ করিত গর্ববোধ, কুরআন ছাড়িয়া এখন হয়েছ যুগ কলঙ্ক, হায় অবোধ!"

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান বর্জনের কারণ: ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপপ্রচার, বস্তুবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদের জয়গান, ক্ষমতাসীনদের ইসলাম বিরোধী ভূমিকা ও পার্থিব ভোগ-বিলাসের জন্য ক্ষমতার লিপ্সা।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণে করণীয়: ইসলামী জীবন বিধানের কল্যাণ এবং মানব রচিত মতবাদের ক্রটি-অকল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, জনসাধারণের কাছে ইসলামের প্রকৃতরূপ তুলে ধরে ব্যাপক ভিত্তিতে দাওয়াতি কাজ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উত্তম পন্থার মাধ্যমে ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতা ও অপপ্রচারের জবাব দান।

❑. অসৎ-অযোগ্য নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নঃ

অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্ব যে কোন জাতি ও সমাজের জন্য বড় ধরনের অভিশাপ। অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রে যুল্‌ম, অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি, শোষণ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। এটা মানুষকে কখনও সত্যিকার কল্যাণ দিতে পারে না। অসৎ নেতৃত্ব মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অসৎ নেতৃত্ব কিভাবে একটি জাতিকে ভ্রষ্টতা এবং ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত হিসেবে আল-কুরআন ফির'আউন ও তার জাতির কথা তুলে ধরেছে। ফির'আউন তার জাতিকে আল্লাহর নাবী মূসা. এর অনুসরণ থেকে শুধু বিরতই রাখেনি বরং তাদের সত্যচ্যুত করে ধ্বংসের চূড়ান্ত গহবরে নিমজ্জিত করেছে। স্বজাতিকে বিভ্রান্ত করতে ফির'আউন অপকৌশল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫]

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ- أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ- فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ- فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

"আর ফির'আউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বলল, 'হে আমার কওম, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ–নদী কি আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না'? 'আমি কি এই ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন এবং স্পষ্ট বর্ণনা করতে প্রায় অক্ষম'(মূসা আ.)? 'তবে তাকে কেন স্বর্ণবলয় প্রদান করা হল না অথবা দলবদ্ধভাবে ফিরিশতাগণ তার সাথে কেন আসল না?' এভাবেই সে তার কওমকে বোকা বানালো, ফলে তারা তার আনগুত্য করল। নিশ্চয় তারা ছিল এক ফাসিক কওম।" অন্যত্র বলেন[৬] (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَ)"আর ফির'আওন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, অসৎ নেতৃত্ব একটি জাতিকে চূড়ান্তভাবে সত্যচ্যুত করে মারাত্মক বিভ্রান্তি এবং ধ্বংসে নিমজ্জিত করতে পারে। তাই অসৎ নেতৃত্বের মিথ্যাচার ও ধোঁকা থেকে সবার সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্ফ ৬১: আয়াত ০৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫: আয়াত ৩০।
[৩] .মূল আরবী[وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৪০১৯।
[৪]. আল্লামা ইকবাল. *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া*, অনু.মোহাম্মদ সুলতান ও গোলাম মোস্তফা (ঢাকা : আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০২) পৃ.৮০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৫১-৫৪।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৭৯।

অসৎ ও অযোগ্য নেতৃত্বের আনুগত্য অমঙ্গল ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ অসৎ নেতাদের অনুসরণে বিপথগামী হয়ে অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছে। ফলে মানুষ মহাক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে কুরআনে বলা হয়েছে-[১]

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا-رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

আর তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও মুরুব্বীদের আনুগত্য করেছিলাম, তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল'।' হে আমাদের রব, আপনি তাদের দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদের বেশী করে লা'নত করুন'।

অসৎ নের্তৃত্ব পৃথিবী ধ্বংসের আলামত। রাসূল সা. কে জনৈক বেদুইন জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি বললেন—আমানত যখন নষ্ট হবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা কর। সে জিজ্ঞেস করল, আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, (সরকারী) কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর।[২]

অসৎ নেতৃত্ব নানা দুর্গতি ও অকল্যাণ বয়ে আনে। অন্যায় কাজের আনুগত্যের পার্থিব পরিণতি শুভকর হয় না। আর এজন্য পরকালে রয়েছে অতি ভয়াবহ মহাশাস্তি। তাই প্রত্যেকের উচিত অসৎ নেতৃত্ব বর্জন করা। এ মর্মে কুরআনের ভাষ্য[৩]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَاوَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ-إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْأَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ -يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ-وَأُتْبِعُواْ فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ

"আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে। কিন্তু তারা ফির'আউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করল, আর ফির'আউনের কার্যকলাপ সঠিক ছিল না। কিয়ামত দিবসে সে তার জাতির অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে তাদের প্রবেশ করানো হবে তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান! আর এখানে তাদের (দুনিয়ায়) লা'নত করা হয়েছিল এবং কিয়ামত দিবসেও তারা অভিশপ্ত হবে। কত নিকৃষ্ট প্রতিদান, যা তাদের দেয়া হবে।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[৪]

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ- وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ

"তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত; কিয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মানুষকে আনুগত্যের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই কারো এমনভাবে আনুগত্য করা যাবে না, যা আনুগত্যকারীকে অভিশপ্ত করবে এবং জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

আনুগত্যের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা: আল-কুরআন আনুগত্যের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে। নেতার আনুগত্যের ব্যাপারে ইসলাম তাকিদ প্রদান করলেও এটা সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, পাপ ও অন্যায় কাজে কারোই আনুগত্য যাবে না। অনুরূপভাবে অসৎ নেতৃত্ব বা যালিমদের আনুগত্য থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৫]–(الَّذِينَ يُفْسِدُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ -فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ) "সীমালংঘনকারীদের আদেশ মানবে না; 'যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।" অন্যত্র বলেন[৬] فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا "সুতরাং ধৈর্যের সাথে তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার আনুগত্য কর না।" অন্যত্র আরও বলেন[৭] وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ "আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে।"

—উদ্ধৃত আয়াতে অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী, ফাসাদসৃষ্টিকারী, কাফির, মুশরিক, পাপিষ্ট, প্রবৃত্তিপূজারী ইত্যাদি মন্দগুণের অধিকারীদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আজকের সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকাংশ নেতারাই এ সব মন্দগুণের গুণের অধিকারী। তাই তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে মু'মিনদের সতর্ক হওয়া উচিত।

মনে রাখা দরকার যে, কুরআনে পাপ ও অন্যায় কাজে স্বেচ্ছাচারী ও অসৎ ব্যক্তির আনুগত্য তো দূরের কথা, স্বীয় পিতামাতার অন্যায় নির্দেশের পালন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৮] وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে মানবে না।" তবে কোন ধরনের অনুসরণ ও আনুগত্য করা যাবে সে সম্পর্কে কুরআন বলেছে[৯] وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ-"যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার(আল্লাহ) অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব ৩৩ : আয়াত ৬৭-৬৮।

২. মূল আরবী [بينما النبي صلى الله عليه و سلم في حلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة ؟ قال (فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة) . قال كيف إضاعتها ؟ قال (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৫৯।

৩. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১ : আয়াত ৯৬-৯৯।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৪১-৪২, আল-কুরআন(০২:১৬৭) (১৬:২৫)।

৫. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা' ২৬: আয়াত ১৫১-১৫২, আল-কুরআন (১৮:২৮)।

৬. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহর/আল-ইনসান ৭৬: আয়াত ২৪।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম ০৬: আয়াত ১৫০।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ০৮, আল-কুরআন(৩১:১৪-১৫)।

৯. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৫।

হাদীসেও অন্যায় ও অনৈতিক কাজে নেতার আনুগত্য করা নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য-[১]

> কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সা. সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে জনৈক লোককে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন। ঐ নেতা কোন কারণে ক্ষুদ্ধ হয়ে তার বাহিনীকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে বলেন, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। তখন তাদের মধ্যে একদল লোক আগুনে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল। (যেহেতু নেতার নির্দেশ) কিন্তু আরেক দল বলল, আমরা তো আগুন থেকেই বাঁচতে চাচ্ছি। (তাহলে কিভাবে এখন আগুনে প্রবশ করব?) পরবর্তীতে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সা.এর নিকট উল্লেখ করা হল। তিনি বললেন, "তোমরা আগুনে প্রবেশ করলে কিয়ামত পর্যন্ত সেই আগুনের মধ্যেই অবস্থান করতে।" তারপর বললেন, *'পাপ ও আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য হবে শুধু ভালো কাজে।'*

এ হাদীছটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করে কোন ব্যক্তির আনুগত্য করা চলবে না, চাই সে কোন বাদশাহ্ বা নেতা হোক অথবা আলিম হোক বা ওলী-পীর হোক।

অসৎ-অযোগ্য নের্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার কারণ: ক. ক্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, কালো টাকা। খ.জনগণ ও রাজনৈতিক দলের নেতা নির্বাচনে ভুল নীতি। গ.নিজ স্বার্থ ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের প্রচ্ছন্ন খাহেশ। ঘ. পাশ্চাত্য জড়বাদী সমাজ ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন আমলের অশুভ প্রভাব। ঙ.আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিদেশী শক্তির চক্রান্ত।

অসৎ-অযোগ্য নের্তৃত্ব প্রতিরোধে করণীয়: ক.যোগ্য ও সৎ নেতৃত্বের তৈরীতে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার। খ.অসৎ ও অযোগ্য নের্তৃত্বের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। গ.ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশী চক্রান্ত মোকাবেলা। ঘ.পাশ্চাত্য জড়বাদী ও মানব রচিত ক্রটিপূর্ণ মতাদর্শ বর্জন করে ওহী ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিত্তিক রাজনৈতিক দল বা মতবাদ গঠন।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও নীতিহীন রাজনীতি: রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন একটি ব্যাপক বিষয়। এতে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বৈরশাসন, জনগণের মৌলিক অধিকারহরণ, অবৈধ কর্তৃত্ব লাভ বা প্রভাব বিস্তার, সন্ত্রাস ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন-নিপীড়ন ইত্যাদি সব বিষয় শামিল। এছাড়া রাজনীতিতে মিথ্যাচার, মিথ্যা ওয়াদা-আশ্বাস, দলীয়করণ, সরকারী অর্থ আত্মসাৎ, প্রতিপক্ষের দুর্নাম, পারস্পরিক দোষারোপ, প্রতিহিংসা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতা, ক্রটিপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি, অসহনশীলতা, জবাবদিহিতার অভাব, সংঘাত-সংঘর্ষ, তোষামোদ ও বিভাজনের রাজনীতি, ব্যক্তি কেন্দ্রিক রাজনীতি, সংঘাত ও নীতিহীনতার রাজনীতি ইত্যাদিও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের অংশ। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, জনজীবনে অশান্তি ও দুর্ভোগ নেমে আসে, দেশ ও জাতির অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে নৈতিক অবক্ষয় ও অপরাধের প্রসার ঘটে। অতীতেও রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন বিদ্যমান ছিল। মূসা ('আ.) সময় ফির'আউন বনী ইসরাইলের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়েছিল। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[২] - وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ "আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের ফির'আউনের দল থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারা তোমাদের কঠিন আযাব দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদের যবেহ করত এবং তোমাদের নারীদের বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহাপরীক্ষা।"

বর্তমান বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশেই অসুস্থ রাজনৈতিক ধারা বিরাজমান। প্রচলিত এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নৈতিকতাবিহীন প্রতারণার রাজনীতি চলছে। শাসনের মাধ্যমে জনগণের সেবা করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল নিজের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা ও ক্ষমতার অপব্যবহার। নৈতিকতার বাছ-বিচার না করে হীন স্বার্থে রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করা। ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে বিরোধীদের দমনে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা, যুলম-নির্যাতন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা দমন-পীড়ন ও স্বৈরশাসন চালায়। জনগণের অর্থের নিদারুন অপচয়। বিরোধী দল বা যারাও ক্ষমতায় নেই, তারাও যে কোন মূল্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য কথায় কথায় ধর্মঘট ডাকেন, শিল্প কারখানায় আগুন লাগান, সাধারণ মানুষদের নানা দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেন। এ সবই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনৈতিকতা ও রাজনীতিক দুর্বৃত্তায়ন।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কারণ: ক.দলের মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব। খ. রাজনৈতিক অস্থিরতা, আইনগত বিধানের সীমাবদ্ধতা। গ.নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নৈতিক পদস্খলন। ঘ.দুর্নীতিবাজদের রাজনীতি ও অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতা।

প্রতিকারে করণীয়: ক.দেশপ্রেম ও আদর্শিক রাজনৈতিক ধারা চালু। খ.রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও গণপ্রতিরোধ। গ.যোগ্য, সৎ ও নীতিবান লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

❑.ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি, আইনে ক্রটি এবং অপরাধ সংশোধনের অপ্রতুলতা:

যে কোন রাষ্ট্র ও সমাজের সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য আইনের শাসন, ন্যায়পরায়নতা ও সুবিচার একটি অপরিহার্য বিষয়। এ অবস্থার ব্যত্যয় ঘটলে সে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র নৈতিক ধস নামে, যুলুম ও অনাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে অশান্তি, অস্থিরতা, হানাহানি, হত্যা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায়। সমাজে দুর্বৃত্তদের দাপট ও কর্তৃত্ব বেড়ে যায় এবং তাদের হাতে সমাজের মানুষ জিম্মি হয়ে পড়ে। ফলে নানা অপরাধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

১.মূল আরবী[لاطاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তামান্না, হা.নং ৬৮৩০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ,হা.নং ১৮৪০।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪৯।

বিস্তার লাভ করে। বিচার বিভাগ ও বিচারকের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি পায়। এ মর্মে নাবী সা. বলেন-"*...যদি কোন জাতির মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকে তখন তাদের মধ্যে রক্তপাত ছড়িয়ে পড়ে... ।*"[১]

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র ও সমাজের দিকে তাকালে ব্যাপকভাবে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে এ সব রাষ্ট্র ও সমাজে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অনৈতিকতা, অন্যায়-অবিচার, দুর্বলের অধিকারহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়। প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ত্রুটি ও আইনি ফাঁক-ফোকড় থাকায় অপরাধীদের যথার্থ বিচার হয় না। কোন কোন সময় অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘুষের বিনিময়ে সঠিক তদন্ত রিপোর্ট প্রদান না করে মিথ্যা রিপোর্ট দেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিচারকরা উৎকোচের মাধ্যমে অপরাধীকে ছেড়ে দেয়। ফলে অপরাধীরা পুনরায় অপরাধ করার সাহস পায়।

আইনজীবীদের অনেকেই মিথ্যা মামলা সাথে জড়িত এবং বিভিন্ন কৌশলে মক্কেলদের পকেট উজারে ব্যস্ত। তাদের কাছে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় অপেক্ষা মামলায় জিতিয়ে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে অনেক আইনজীবী সত্যকে মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তর করতে খুব পারদর্শী। আবার বিচারকদের বড় অংশ ন্যায়বিচার না করে শাসকগোষ্ঠীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। অনেক বিচারক ঘুষ গ্রহণ সাথেও জড়িত। প্রচলিত বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতার ফলে মামলা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিত্তহীন বাদী-বিবাদী পক্ষ সর্বস্বান্ত হয়। এভাবে আইন-বিচার বিভাগ নানা অনিয়মে জর্জরিত। আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিস ও গোয়েন্দা বাহিনীর বড় অংশ ঘুষ, দুর্নীতি, নিরীহ মানুষকে হয়রানি, অনেক নিরপরাধ ধরে লোককে অমানবিক নির্যাতন করে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়, হত্যা ও গুমসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মের সাথে জড়িত। তাদের দায়িত্ব ছিল- প্রকৃত অপরাধী সনাক্ত করা এবং অপরাধের জন্য দায়ী করে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। একের অপরাধের জন্য অন্যকে শাস্তি প্রদান না করা। আজ অহঃরহ এর উল্টো ঘটছে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা স্বীয় অসৎ স্বার্থ হাসিলের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করে না। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র দুস্কৃতিকারী দ্বারা জিম্মি হয়ে পড়েছে। এভাবেই সমাজে অবক্ষয়ের বিস্তার ঘটছে। সমাজ থেকে ন্যায়-নীতি উঠে যাচ্ছে। সমাজে একের পর এক অন্যায় ঘটে চলছে নেই কোন সুবিচার। ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতে মানুষ নীরব। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। এর ফলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে বলা হয়েছে[২]-

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আর আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন, দু'জন ব্যক্তি, তাদের একজন বোবা, যে কোন কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোঝা। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়, কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সে আর ঐ ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং রয়েছে সরল পথের উপর?

আইনে ত্রুটি : ত্রুটিপূর্ণ আইন ও শাস্তির বিধান অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রচলিত আইনে অপরাধ করেও আইনের ফাঁক দিয়ে অপরাধী বেঁচে যায়। যদি অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা হত তবে মানুষ ভয়ে অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকত। প্রচলিত আইনের একটি নীতি হলো '*একশত জনের মধ্যে নিরানব্বই জন অপরাধী মুক্তি পেয়ে যাক কিন্তু যেন একজন নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়।*'–এই নীতি আইনের একটি বড় ত্রুটি। এটা মূলত প্রকৃত অপরাধী সনাক্ত করার ব্যর্থতা ঢাকার অপপ্রয়াস মাত্র। কেননা অপরাধ সঠিকভাবে তদন্ত করলে এবং বাদী ও বিবাদীর আইনজীবী আন্তরিক হলে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু বর্তমান আইন ব্যবসা মিথ্যাচারসহ নানা অনাচারে আক্রান্ত। বিচারপতি অনেক সময় প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করেও মিথ্যা সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে রায় দেন, তাঁর কিছুই করার থাকে না। এরপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অনুপস্থিতিও অপরাধ বৃদ্ধির কারণ। এভাবে প্রচলিত আইন ও বিচার বিভাগ বিভিন্ন ত্রুটি সমাজ অন্যায় ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায় এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে।

অপরাধ সংশোধনের অপ্রতুলতা: অপরাধ সংশোধনের অপ্রতুল ব্যবস্থা ও ত্রুটিপূর্ণ শাস্তি পদ্ধতি থাকার ফলেও অপরাধ ও অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত জেল ব্যবস্থায় যখন অপরাধীকে অপরাধের শাস্তি হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে জেলে রাখা হয়। অপরাধী সেখানে চোর, ডাকাতি, খুনী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধী পরস্পরের সংস্পর্শে আসা ও তাদের সাথে সহাবস্থানের ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং অপরাধের প্রশিক্ষণ পায়। শাস্তির মেয়াদ শেষে অপরাধী ছাড়া পেয়ে সমাজে আরও বড় অপরাধী হিসেবে অবির্ভূত হয় এবং বড় বড় অপরাধ করে। অধিকন্তু, জেলে অপরাধ সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় সাজাকালীন সময়ে আসামীর পিছনে বিপুল রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হয়। অথচ জেলে অপরাধ সংশোধনের ব্যবস্থা থাকলে আসামীর নৈতিক উন্নতি ও সংশোধন সাপেক্ষে শাস্তি হ্রাস করলে সমাজে অপরাধ কমে যেত এবং বিপুল জাতীয় অর্থের অপচয় রোধ হত।

---

১. মূল আরবী [ولا حكم قوم بغير الحق الا فشا فيهم الدم] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৯৮১।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-নাহল ১৬ : আয়াত ৭৬।

আইনের শাসন ও ন্যায়পরায়নতার অভাব কারণ: রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলায় নিযুক্ত দুর্নীতিপরায়ন, কর্মচারীদের আধিপত্য ও ঘুষ গ্রহণ, অপরাধীকে যথার্থ শাস্তি প্রদান না করা, সরকারের দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন নীতির অনুপস্থিতি, বিচারকার্যে দীর্ঘসূত্রিতা, ক্ষমতাধরদের বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা।

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী: প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগসহ সর্বত্র সৎ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ দান, রাষ্ট্রে নিয়োজিত সকল কর্মচারীদের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের চাকুরীচ্যুত কিংবা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।

❑. দুর্নীতি:

দুর্নীতি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। দুর্নীতি শব্দের অর্থ–নীতি বিরুদ্ধ কাজ। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Corruption. Corrupt. দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

Oxford Reference Dictionary তে বলা হয়েছে–Willing to act dishonestly in return for money or personal gaing.[১]

Oxford Advanced Learner's Dictionary তে বলা হয়েছে– Willing to use their power to do dishonest or illegal things in return money or to get an advantage.[২]

Social Wark Dictionary তে দুর্নীতির সংজ্ঞায় বলেন–Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain usually through bribery, extortion, influence pedding and special treatment given to some citizens and not to others.[৩]

মোটকথা, দুর্নীতি বলতে সাধারণত রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য অপব্যবহারকে বোঝায়।

দুর্নীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। বর্তমানকালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ও সমাজের প্রশাসন, রাজনীতি, আইন-বিচার বিভাগ, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দুর্নীতি বিস্তার লাভ করেছে।

দুর্নীতির অনেক দিক রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক হল– কর্তব্যে অবহেলা, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, বেআইনি কার্যকলাপ, ঘুষ গ্রহণ, অর্থ আত্মসাৎ, স্বজন প্রীতি, তহবিল তসরুফ(অপচয়) বা আর্থিক অব্যবস্থাপনা, অযোগ্য বা মন্দ বিষয়ে সুপারিশ ও পক্ষপাতমূলক বিচার ইত্যাদি।

দুর্নীতি অন্যায়-অবিচার ও অপরাধের সৃষ্টির একটি মূখ্য মাধ্যম। এটা দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক। এটা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে ফেলে। দুর্নীতি আশ্রায়িত বিপুল পরিমান অর্থ-সম্পদ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিমন্দা ও দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। এ কারণে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়। অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। ক্ষমতাহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতির অকল্যাণ ও ক্ষতি অনেক। এর মাধ্যমে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজের দাপটে নিজ আত্মীয় কিংবা কোন অর্থ বা স্বার্থের বিনিময়ে এমন ব্যক্তিকে সুবিধা দেয় যা সে পাওয়ার যোগ্য নয়। এর ফলে অন্যের প্রতি অবিচার করা হয় এবং অন্যের অধিকার বঞ্চিত হয়। দুবৃর্ত্তদের দাপট সমাজে বেড়ে যায়। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটে। দুর্নীতির মাধ্যমে অযোগ্য লোক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়, যার ফলে এসব অযোগ্য ও অপদার্থ লোকেরা নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্ষম হয় না। সমাজে সম্প্রীতি ও ভারসাম্য নষ্ট করে, সমাজে বৈষম্যের জন্ম দেয়। এছাড়াও সমাজ ও জাতীয় জীবনে দুর্নীতির নানামুখী ক্ষয়-ক্ষতি ও অকল্যাণ রয়েছে। এজন্য ইসলামে সব ধরনের দুর্নীতি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়াদাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করও না।" মহান আল্লাহ আরও বলেন[৫]–

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
>
> "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।"

---

1. Cathine Soanes, *Oxford Reference Dictionary*, *Op.cit.*, p.183.
2. Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *Op.cit.*, p.297.
3. Robert L. Barker, *Social Wark Dictionary,* (Washington DC: NASW Press, 1995), P.82.

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮৮।

৫. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৩৫। আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০৮।

বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও সমাজে তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পর্যন্ত কোথাও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও সংস্থা থাকলেও তা নীরব ও স্থবির। কোথাও কোথাও সামান্য জবাবদিহিতা থাকলেও তা ততটা ফলপ্রসূ নয়। দুর্নীতি ও অনিয়ম পাওয়া গেলেও ঘুষ ও তদবীরের মধ্যে অপরাধীরা রেহাই পাচ্ছে। ফলে সর্বত্র অনিয়ম, দুর্নীতি, অনাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা প্রতিরোধ জরুরী। এ ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা বলিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১]–"যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তারপর সে তার আনুকুল্যের ভিত্তিতে কাউকে গভর্ণর কিংবা কোন কাজে নিয়োগ করে তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তাকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে, আল্লাহ তার কোন ফরজ ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না।"

দুর্নীতির কারণ: জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের আগ্রহ, রাতারাতি ধনী হওয়ার বাসনা, অপর্যাপ্ত বেতন-ভাতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, সামাজিক অস্থিরতা, নৈতিক অবক্ষয়, আত্মস্বার্থের তাড়না, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতার অভাব।

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায়: আইনের শাসন ও স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, জনসচেতনতা সৃষ্টি, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক লোকদের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার।

❑. ঘুষ(السُّحْت ,الرشوة) :

ঘুষ শব্দের আভিধানিক অর্থ–উৎকোচ, অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক।[২] ঘুষের আরবী প্রতিশব্দ الرشوة (আর-রিশওয়াত) বা السُّحْت, (আ-সুহত)। পরিভাষায় ঘুষ হল–"কোন বিশেষ সুবিধা আদায় অথবা অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা অথবা কারো বৈধ অধিকার বাতিল করার জন্য কাউকে কিছু প্রদান করা।"[৩] ভিন্ন মতে, যে কাজ করা কারো দায়িত্বে আবশ্যক সেই কাজ করে বিনিময় গ্রহণ করা কিংবা বিনিময় ব্যতীত সে কাজ না করা। তদ্রূপ যে কাজ না করা কারো উপর আবশ্যক স্বার্থের বিনিময়ে সে কাজ করা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত।[৪] কেউ কেউ বলেন, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন কিংবা সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, অথবা তার প্রতিপক্ষের উপর তাকে জিতিয়ে দেবে অথবা তাকে কোন কাজ দেবে অথবা তার প্রতিপক্ষের কাজ গৌন বা বিলম্বিত করে দেবে ইত্যাদি–ই ঘুষ।[৫]

বর্তমান সমাজে অনেক ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থ হাসিল, বিভিন্ন সুবিধা বা চাকুরী লাভের জন্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তির নিকট থেকে সুপারিশ বা তদবীর করিয়ে থাকেন যা পাওয়ার মত কোন যোগ্যতা তার নেই। এরূপ ক্ষেত্রে সুপারিশকারীকে সুপারিশকৃত ব্যক্তি অর্থ-সম্পদের পরিবর্তে বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন বা সুবিধা দিয়ে থাকেন। সমাজের অনেকে এটাকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু এটা উপহার নয়, বরং এক প্রকার ঘুষ। কারণ এটা প্রদান করা হয় প্রতিদান লাভের আশায়। আর উপহার হল যা কোন রকম সাহায্য-সহানুভূতির শর্ত ব্যতীত কাউকে কিছু প্রদান করা হয়, যা ঘুষের বিপরীত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের মুসলিম ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করার বিনিময়ে হাদীয়া প্রাপ্ত হয় এবং সেই হাদীয়া গ্রহণ করে, তবে সে ঘুষ বা সুদের এক বড় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো।"[৬] এ প্রসংগে উল্লেখ যে-[৭]

> রাসূলুল্লাহ সা. আযদ গোত্রের ইবনুল লাতবিয়াকে যাকাত সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। ইবনুল লাতবিয়া যাকাত সংগ্রহ শেষে ফিরে এসে বলেন, এটা আপনাদের জন্য, আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বরের উপর আরোহন করেন এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠের পর বলেন– আল্লাহ আমাকে যে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন তার জন্য আমি তোমাদের কাউকে যখন কাজে নিয়োগ করি তখন সে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্য, আর এটা আমাকে প্রদত্ত উপঢৌকন। সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে সে কেন নিজ মা-বাপের বাড়ীতে বসে উপহার আসে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে না? আল্লাহর শপথ, তোমাদের কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করে তাহলে, কেয়ামতের দিন তা বহন করা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।...তারপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

মোটকথা, ঘুষ হল কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় অসৎ উদ্দেশ্যে হাসিল করার জন্য কিংবা অন্যায় দাবী আদায়ের জন্য নিজের পক্ষে কাজ করে নেয়ার জন্য কিংবা রায় নিজের পক্ষে নেয়ার জন্য অথবা কোন ব্যাপারে প্রভাবিত করার নিমিত্তে কোন সরকারী কর্মচারী, বিচারক বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিকে যে অবৈধ সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

---

[১].মূল আরবী [من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا حتى يدخله جهنم] হাকিম নাইসাপূরী, *আল-মুস্তাদরাক 'আলা সহীহাইন* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,১ম সং,১৪১১হি.),খ.৪, পৃ.১০৪, কিতাবুর আহকাম, হা. নং৭০২৪।

[২]. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৯।

[৩]. ড.ইবরাহীম মাকদুব ও অন্যান্য,*আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাতি ওয়াল আ'লাম*,(ভারত: হুসাইনিয়া কুতুবখানা, দেওবন্দ, ১ম সং-১৯৯৭), পৃ.৪১।

[৪]. আবূ হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, *তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.) খ.০৫, পৃ.৫১৬।

[৫]. ড.ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*. (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৪২১।

[৬].মূল আরবী [من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল ইজারাহ, হাদীস নং ৩৫৪১।

[৭]. মূল আরবী [استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى أم لا ؟ والذي نفسي بيده لايأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ৬৭৫৩।

ঘুষ একটি গর্হিত অনৈতিক কর্ম ও মহাপাপ। ঘুষ শুধু ব্যক্তির জীবনকে কলুষিত করে না বরং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। ঘুষ মানুষের মধ্যে শুধু উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ঘুষ মানুষের মধ্যে দয়া, উদারতা, সহযোগিতা ও উপকারের মনোভাবের পরিবর্তে সীমাহীন লোভ, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নির্মমতা ও কৃপণতা ইত্যাদি অসৎ গুণের জন্ম দেয়। ঘুষের মাধ্যমে একদিকে ঘুষদাতা অবৈধভাবে সুবিধা গ্রহণ করে, অন্যদিকে ঘুষগ্রহীতা অবৈধ সুবিধার বিনিময়ে অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করে অন্যায়ের পক্ষে কাজ করে। ঘুষের মাধ্যমে ব্যক্তি যা পাওয়ার যোগ্য নন তা পান কিংবা এর মাধ্যমে নায্য পাওনাদারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এতে অন্যায় ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায়ে পরিণত করা হয়, যা বড় ধরনের যুল্ম। ঘুষের কারণে মানুষ অপচয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘুষ মানুষকে লজ্জাহীন করে ফেলে। অধিকন্তু, ঘুষ এমন এক ঘাতক ব্যাধি, যা কোন সমাজ ও জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে সেই সমাজ ও জাতি থেকে ন্যায়-নীতি, ইনসাফ, সাম্য-সুবিচার, সৌভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সমৃদ্ধি বিদায় করে দেয়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়, দেশের উৎপাদন কমে যায়, অর্থনীতিকে পঙ্গু হয় এবং জনজীবনে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। সেই সমাজ ও জাতির উন্নতির স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বৃত্তদের হাতে চলে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রে অসৎ লোকদের দাপট, অন্যায়, যুলম ও দুর্নীতি বেড়ে যায় এবং অথনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সাধারণ নাগরিক ও অসহায়-নির্যাতিত লোকে তাদের ন্যার্য অধিকার ও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হন। এ সব কারণে ইসলামে ঘুষ নিষিদ্ধ। এ মর্মে বলা হয়েছে[১]– وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়াদাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।"

উল্লেখিত আয়াতে 'বাতিল' শব্দের তাফসীরে আবূ হাইয়্যান আল-আন্দালুসী(মৃ.৭৪৫হি.) বলেছেন–'জোরপূর্বক দখলদারী, জুয়া, গণকের শিরনী, খিয়ানত, ঘুষ এবং যা জ্যেতিষীরা গ্রহণ করে এবং ঐ বস্তু যা গ্রহণ করতে শরী'আত অনুমতি দেয়নি, এসব কিছু বাতিলের অন্তর্ভুক্ত হবে।' আর (وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) এর তাফসীরে উল্লেখ করেন–'বিচারকদের অর্থ-সম্পদ দ্বারা ঘুষ দেবে না যাতে করে তিনি তোমাদের মর্জি মোতাবেক রায় প্রদান করে অতিরিক্ত কিছু দিয়ে দেন।'[২] তাফসীর কুরতুবীতে (وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) এর তাফসীরে কয়েকটি মত তুলে ধরা হয়েছে তন্মধ্যে নির্ভরযোগ্য মত হল[৩]-"তোমরা বিচারকের নিকট তোমাদের সম্পদের ব্যাপারে এমন কর্ম করো না যে, তোমরা তাদেরকে ঘুষ প্রদান করবে আর তারা তোমাদের প্রাপ্যের চেয়ে বেশী প্রদান করার ফায়সালা করে দেবে।"

সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ঘুষ বন্ধে ইসলাম একে হারাম ঘোষণার পাশাপাশি এ ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সা. 'ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার উপর অভিসম্পাত[৪] করেছেন'।[৫] অন্য হাদীসে 'ঘুষদাতা, ঘুষগ্রহীতা এবং ঐ ব্যক্তি যে তাদের দু'জনের মাঝে মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, তাদের সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন'।[৬]

উল্লেখ্য যে, নিজের ন্যার্য অধিকার ঘুষ না দেয়া ছাড়া পাওয়ার অন্য কোন পথ না থাকে অথবা এমন যুলমে পড়ে গেছে যে, ঘুষ না দেয়া ছাড়া নিস্কৃতির কোনই পথ নেই। এমতাবস্থায় যদি কেউ সব হালাল পথ যাচাই করে ফল না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবে ঘুষ দিতে বাধ্য হয় এবং তাতে যদি অন্যের অধিকার ব্যাঘাত না ঘটে তবে এরূপ ক্ষেত্রে ঘুষগ্রহীতা অপরাধী হবে, ঘুষদাতা নয়।[৭]

ঘুষ গ্রহণের কারণ: ক.লোভ-লালসা, উচ্চভিলাস ও ভোগ-বিলাসী মানসিকতা। খ.অভাব-অনটন, অপ্রতুল বেতন-ভাতা। গ.নৈতিক মূল্যবোধের ধস। ঘ.যথাযথ আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা না থাকা। ঙ.সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভাব।

ঘুষ প্রতিরোধে প্রতিবন্ধকতা: ক.অভিযুক্তের প্রতি সহমর্মিতা, খ.প্রমাণে জটিলতা, গ.কর্তৃপক্ষের আস্থা, ঘ.প্রভাবশালীদের তদবীর, ও ঙ.শাসক গোষ্ঠীর আশ্রয়-প্রশ্রয়।

ঘুষ বন্ধে করণীয়: ক.নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ। খ.সর্বত্র জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। গ.সৎ ও যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ। গ.ঘুষ গ্রহীতা ও প্রদানকারীর কঠোর শাস্তিবিধান। ঘ.সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎসের সন্ধান। ঙ.উপযুক্ত বেতন-ভাতা প্রদান।

❑.কর্তব্যে অবহেলা এবং জনগণের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে উদাসীনতা:

ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য উপেক্ষা করা, করণীয় কর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন না করা, কিংবা কর্ম সম্পাদনে ঢিলেমি বা অলসতা করা ইত্যাদি নামই কর্তব্যে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা। এটা একটি ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক বিষয়। এর মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত,পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সব ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত। যেমন: কোন কর্মচারী উপযুক্ত

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮৮।
[২]. আবূ হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৬২-৬৩।
[৩]. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩৪০; ।
[৪]. অভিসম্পাত অর্থ-পরকালে আল্লাহর শাস্তি এবং দুনিয়াতে তাঁর রহমত ও তাওফীক(আল্লাহর পক্ষ থেকে সফলতা) থেকে বঞ্চিত করা। *(আল-মুফরাদাত)*
[৫].মূল আরবী[لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আকদিয়াহ, হা.৩৫৮০; তিরমিযী, হা. ১৩৩৭, *ইবন মাজাহ*, হা. ২৩১৩।
[৬]. মূল আরবী [لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي والرائش] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৫, পৃ.২৭৯, হাদীস নং ২২৪৫২।
[৭]. ড.ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪।

কারণ ও কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে কিংবা অর্পিত কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করলে অথবা নিয়মিত দেরীতে অফিসে আসলে এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অফিস ত্যাগ করলে তা কর্তব্যে অবহেলা।

কর্তব্যকর্মে অবহেলা ব্যক্তি, পারিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে বড় ধরনের ক্ষতি, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু লোকের কর্তব্যে সামান্য অবহেলার কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্ভোগ ও কষ্ট হয়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্যে অবহেলায় অপরাধ বেড়ে যায় এবং জনজীবনে নৈরাজ্য, অরাজকতা ও দুর্ভোগ নেমে আসে। সেনাবাহিনীর কর্তব্যে অবহেলায় যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। পিতামাতার কর্তব্যে অবহেলায় সন্তান বিপথগামী হয়। বিশেষ করে পিতা-মাতার যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করলে শিশু-কিশোরদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। শিক্ষকের অবহেলায় শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নৈতিক শিক্ষাদানে উদাসীনতা শিক্ষার্থীকে নীতিহীনতার দিকে উৎসাহিত করে। ডাক্তাররা হাসপাতাল অপেক্ষা প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত, হাসপাতালে তারা ভালোভাবে রোগী দেখেন না, তাদের অবহেলায় হাসপাতালে অনেক সময় রোগী মারা যায়। বিচারকের কর্তব্যে অবহেলায় মানুষ বিচার কার্যের দীর্ঘসূত্রিতা হয় এবং মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। ড্রাইভারের কর্তব্যে অবহেলায় গাড়ী যাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌছতে পারে না, আবার কখনও দুর্ঘটনায় সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারী এবং সমাজ সচেতন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো- জনসাধারণের জীবন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিক্ষা ও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে তাদের সতর্ক করা, বিপদে তাদের পাশে দাড়ানো এবং তাদের কল্যাণে কাজ করা। কিন্তু তাদের উদাসীনতা দেশের মানুষের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ও অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। এভাবে কর্তব্যে অবহেলা নানা ধরনের ক্ষতি সাধিত হয় এবং মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এজন্য কুরআনে কর্তব্য অবহেলা না করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে–وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ-"আর তুমি গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"[১]

কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি স্বীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করে তবে তাকে সতর্ক করতে রাসূল সা. বলেছেন, "*কোন শাসক যদি মুসলিমদের যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়, তারপর সে তাদের উপকারের জন্য কোন রকম চেষ্টা না করে এবং তাদের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর না হয় তবে সে তাদের সাথে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।*"[২]

কর্তব্যে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণ: স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্যের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন না করা, অযোগ্য, দায়িত্বহীন লোককে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগদান, দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা, দায়িত্বকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতা, নিজেকে উপযুক্ত মনে না করে এ কাজের দায়িত্ব বড়দের মনে করা, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সব কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার হতে হয়, তার উপর ধৈর্য ধারণের মানসিকতা না থাকা এবং মানুষের পক্ষ হতে সমালোচনার ভয় করা, কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, জবাবদিহিতার অভাব এবং দোষীদের শাস্তি না হওয়া।

কর্তব্যে অবহেলারোধে করণীয়: সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নৈতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিরোধ করা, কর্তব্যে অবহেলাকারীর অপসারণ বা শাস্তির ব্যবস্থা করা।

❑.সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ (الإرحاب) ও ধর্মের ব্যাপারে উগ্রপন্থা (الغلو في الدين):

আভিধানে–সন্ত্রাস শব্দটি 'ত্রাস' থেকে উদ্ভুত। ত্রাস হলো–ভয়, শংকা, ভীতিকর।[৩] ইংরেজী প্রতিশব্দ Terroize, এর আরবী প্রতিশব্দ الإرحاب। - সন্ত্রাস অর্থ–আতঙ্কগ্রস্ত করা, ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা।[৪] সন্ত্রাসের সংজ্ঞা প্রদান করা জটিল। তবে সাধারণভাবে বলা যায় সন্ত্রাস হলো–যে কোন স্বার্থচারিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা, জবরদস্তি প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা।

জঙ্গিবাদ শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ militancy. "জঙ্গি হলো যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।" কিন্তু বর্তমানে 'জঙ্গি' বলতে বুঝি যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত। আর যারা প্রচলিত সাধারণ কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলি। "জঙ্গিবাদ" শব্দটি 'ইসলামের নামে সহিংসতা' অর্থে ব্যবহার হলেও মূলত ইসলামের নামে, অন্য কোনো ধর্মের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে, গণতন্ত্রের নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, অন্য যে কোনো মতবাদ, আদর্শ বা অধিকারের নামে উগ্রতার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষকে জঙ্গি বলা চলে এবং তার মতামতকে জঙ্গিবাদ বলা চলে।[৫]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যেমন- ফিলিস্তিনী কোন ব্যক্তি ইসরায়েলি সৈন্যকে পাথর ছুঁড়লে তখন সেটা হয় সন্ত্রাস, কিন্তু ইসরায়েলি সৈন্যরা ফিলিস্তিনিদের গুলি করে হত্যা করলে কিংবা আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারতীয় সৈন্য

---

১. আল-কুরআন, ৭:২০৫।
২.মূল আরবী [ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ১৪২।
৩. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৭।
৪. *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৬১।
৫. দেখুন, ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ* (বাংলাদেশ, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় সং. ২০০৯), পৃ.৮-১০।

কর্তৃক বসনিয়া, ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্থান ও কাশ্মীরের নিরীহ মুসলিম হত্যা এবং তাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করলে তা সন্ত্রাস হয় না। মূলত এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য ও ইসলাম বিদ্বেষী মহলের মধ্যে দ্বৈতনীতি দেখা যায়।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রতা ও নৈরাজ্য যে নামেই হোক না কেন তা নিন্দনীয়। এ সব বিবেকহীন মানুষের অস্বাভাবিক ও পাশবিক আচরণের ফসল। এটা যুল্মের হাতিয়ার। এটা মানবিক সংকট সৃষ্টি করে, সমাজের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট করে এবং জনজীবনকে বিপন্ন করে তোলে। সমাজে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি করে ফলে সমাজ সন্ত্রাসীদের দ্বারা জিম্মী হয়ে যায়। এতে মূলত হত্যা, অত্যাচার ও হিংসাত্মক কার্যাবলীর মাধ্যমে ভয় ও ত্রাসের সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসীরা জনমনে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবৈধভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানা ধরনের যুলুম-অত্যাচার করে। সন্ত্রাস ও অস্ত্রের ভয়ে সাধারণ মানুষ অপরাধ প্রতিরোধে সাহসী হয় না। ফলে সমাজে অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তাই ইসলাম শুধু এ অপরাধ নিষিদ্ধই করেনি বরং এরজন্য কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]–

> إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ- إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
>
> যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশস্তি। তবে তারা ছাড়া, যারা তাওবা করে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে; সুতরাং জেনে রাখ যে,আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

আজকাল বিশেষ কিছু গোষ্ঠীকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ ও সহিংসতা লক্ষ্য করা যায়। এসব মূলত ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। ষড়যন্ত্রকারীরা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত লোকদের দলে ভিড়িয়ে স্বার্থসিদ্ধ করে থাকেন।এ ধরণের সহিংসতা ও হত্যা-সন্ত্রাস ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম সশস্ত্র যুদ্ধ শর্তসাপেক্ষে শুধু শত্রু সৈন্যের সাথে কিংবা তাদের সহায়তাকারীদের সাথেই করতে অনুমতি দেয়। সেক্ষেত্রেও কোন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যার অনুমতি দেয় না। তাই জিহাদের নামে সন্ত্রাস করে নিরীহ লোক হত্যা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিসহ কোন ধরনের অন্যায়ের সুযোগ ইসলামে নেই। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[২]- وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ "আর তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" -এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সবধরনের সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ধর্মের ব্যাপারে উগ্রপন্থা: ধর্মীয় চরমপন্থা ও উগ্রতা অবক্ষয় সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ইসলামে কোন ব্যাপারে চরমপন্থা ও উগ্রতার কোন স্থান নেই। মানুষের সহ্য ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ ব্যক্তির উপরে চাপিয়ে দেয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে বাড়াবাড়িমূলক কর্মকাণ্ড স্বভাব বিরুদ্ধ। এতে দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্লান্তি অনিবার্য। এজন্য একবার রাসূল (সা) তাঁর একজন বিশিষ্ট সাহাবী মুয়াযের রা. ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তিনি নামাযের ইমামতিতে দীর্ঘ সময় নিয়েছিলেন বলে একজন মুসল্লী অভিযোগ করেন। রাসূল (সা.) তাকে বলেন, "হে মুয়ায, তুমি কি মুসল্লীদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করছ?"[৩]

ধর্মীয় ব্যাপারে উগ্র মতাদর্শ ও উগ্রপন্থা মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে। চরমপন্থা সমাজ জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যুগে যুগে চরমপন্থা সমাজে ভয়ানক দাঙ্গা ও রক্তপাতের জন্ম দিয়েছে। অনেক প্রাণকে অনর্থক সংহার করেছে এবং সমাজের শান্তি বিনষ্ট করেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে গিয়ে পড়ে। এতে মানুষ ধর্মের ব্যাপারে অনীহ ও উদাসীন হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ধর্মের কিছু অতি উৎসাহী লোক এই অপকর্মের মূলহোতা। এই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে[৪]– وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ "আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করেছিল। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন।"

উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তার স্থান ইসলামে নেই। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন–"যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার দিকে মানুষকে আহবান করে সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার প্রেরণায় যুদ্ধ করে সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার কারণে মারা গেছে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৫]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩৩-৩৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯০।
[৩]. *মুসনাদ আহমাদ*, খ.০৩, পৃ.৩০৮, হাদীস নং ১৪৩৪৬।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ১৭।
[৫].মূল আরবী[ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৫১২১।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রতার কারণ: ক. যুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন, ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি, দ্বৈতনীতি। খ. ক্ষমতায় টিকে থাকাকে প্রতিপক্ষ দমন ও রাজনৈতিক দুবৃত্তায়ন। গ.অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশয় দান। ঘ.উগ্র মানসিকতা ও জিহাদ বা দ্বীন সংক্রান্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা। ঙ. দ্বীনি অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞ আলিমের ভুল ব্যাখ্যা।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রতার বন্ধে করণীয়: ক.ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং যুলুম-নির্যাতন ও দ্বৈতনীতির অবসান। খ. সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। গ.সন্ত্রাসের অস্ত্র ও অর্থের যোগান বন্ধ করা। ঘ.নৈতিক শিক্ষার প্রসার ও সংশোধন কেন্দ্র সংশোধনের ব্যবস্থা। ঙ. বিজ্ঞ আলিমের মাধ্যমে দ্বীনের সঠিক শিক্ষার প্রসার।

❑.অন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহ (القتال غير الحق):

অন্যায় যুদ্ধ মানব সভ্যতা ও মানব কল্যাণের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। তা বিশ্বশান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে। আধুনিক যুদ্ধে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে ধ্বংযজ্ঞের সৃষ্টি হয় তার চিত্র অতি ভয়াবহ। যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত রাষ্ট্রে মানব মন কলুষিত হয়ে মানব মনে শুধু ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা-বিদ্বেষের জন্ম দেয় না, বরং মানব মনে হীন ও বর্বরোচিত মনোভাব এমন প্রকটভাবে দেখা দেয় যে, এতে মানব মনে সদগুণাবলী বিনষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধ সমাজ বা রাষ্ট্রের স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিঘ্নিত করে মানব সভ্যতাকে পঙ্গু করে ফেলে। যুদ্ধে কত নিরীহ মানুষের প্রাণ যে অকাতরে বিলীণ হয়, কত মানুষ হতাহত হয়, কতজন পঙ্গুত্ব বারণ করে, তার হিসেব নেই। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকার বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে অবমাননা করে পাশবিক প্রবৃত্তির কথাই স্মরণ করে দেয়। যুদ্ধ মানব সম্পদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তাও বর্ণনাতীত। যুদ্ধ শুধু ধন-সম্পদ বিনষ্ট কিংবা রক্তপাত ঘটায় না, বরং মানব জাতির মধ্যে বড় ধরনের বহুবিদ বিপর্যয় বয়ে আনে। যুদ্ধ একটি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হলেও নৈতিক সমস্যাও বটে, কেননা তা মানুষের সদগুণাবলী বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ পৃথিবীতে অত্যাচারী শাসকগণ কর্তৃক বর্তমান সময় পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিভিন্ন যুদ্ধ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ইসলাম মানবতা বিরোধী সকল অন্যায় যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। এ মর্মে কুরআনের ঘোষণা হল[১]– مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"

অন্যায় যুদ্ধ কারণ: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল, প্রতিপক্ষকে দমন করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, শক্তির দম্ভে অন্যকে বশীভূত করার মানসিকতা, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের ব্যর্থতা।

সন্ত্রাস ও অন্যায় যুদ্ধ বন্ধে করণীয়: যুদ্ধের কুফল সম্পর্কে বিশ্ববিবেক জগ্রতকরণ, জাতিসংঘকে সংস্কার সাধন এবং যুদ্ধ বন্ধের কার্যকরী ক্ষমতা প্রদান এবং অন্যায়ভাবে যুদ্ধের হোতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান।

....

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। এই বিষয়াবলী রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের মধ্যে অশান্তি-বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ-কলহ সৃষ্টি এবং মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এগুলো থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষকে উল্লেখিত মন্দ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্জনীয় বিষয়সমূহ:

অর্থনীতি মানুষের জীবনের চালিকাশক্তি। জীবন-জীবিকার তাকিদে প্রত্যেক মানুষকে অর্থ উপার্জন করতে হয়। উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ দু'টি পন্থা রয়েছে। অবৈধ পথে উপার্জন মানুষকে অনৈতিকতায় নিমজ্জিত করে। তাই মানুষ যাতে অবৈধ পথে উপার্জন না করে সেজন্য ইসলাম পথনির্দেশিকা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসলাম ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা, মজুতদারী, মুনাফাখোরি, খাদ্য ও পণ্য দ্রব্যে ভেজাল, অপচয়-অপব্যয়, ভোগ-বিলাসসহ সব ধরনের অবৈধ উপার্জনসহ অর্থনৈতিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। নিম্নে উপার্জনে অবৈধ পন্থাসমূহ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়সমূহ আলোকপাত করা হলো-

❑.অবৈধ উপার্জন ও ভোগ এবং অবৈধ বৈধ করার অপকৌশল:

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩২।

সাধারণত কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালা বহির্ভূত পন্থায় উপার্জনকেই অবৈধ উপার্জন বলা হয়। ব্যাপক অর্থে অবৈধ উপার্জন বলতে বুঝায় সে উপার্জন যা কোন কর্মের বিনিময় বিহীন−সুযোগ সন্ধানী, সুবিধাবাদী, ফটকা উপায়ের শ্রমবিহীন ও মধ্যস্বত্ব জাতীয় উপার্জন। যেমন: সুদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি; অথবা বৈধ অধিকার বিহীন উপার্জন যথা−চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ঘুষ, যুল্ম, প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি; অথবা যা কোন ক্ষতিকর দ্রব্যের বিনিময়ে অর্জিত যেমন মাদক দ্রব্য, শুকর ও অবৈধ বিনোদন উপকরণের মূল্যে।[১] লেনদেনের এমন প্রক্রিয়া যা পাপ অথবা এমন বস্তুর বেচাকেনা করা যার মূলগত দিক অপবিত্র অথবা যে সব লেনদেনে প্রতারণা বা ধোঁকা রয়েছে বা যাতে অন্যের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, উপার্জনের এ জাতীয় প্রক্রিয়া ইসলামের অর্থনীতির দৃষ্টিতে হারাম।[২] অবৈধ উপার্জনের মধ্যে গণ্য একটি হলো জবরদখল। জোর করে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়াকে আরবীতে গসফ বলে। ইসলামী পরিভাষায়−কোন বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অপরের অধিকারভুক্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে জোর করে দখল করাকে গসফ বলা হয়। জবরদখল তা হতে পারে সহায় সম্পদ, জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ী, আয়-উপার্জনের উপায় ইত্যাদি। এ সবই অবৈধ।

হারাম উপার্জন যেহেতু বিভিন্ন অবৈধ পন্থা, প্রতারণা, ছল-চাতুরী, অপকৌশল, অন্যায়ভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। তাই হারাম উপার্জনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্তির উপর পতিত হয়। ফলে ব্যক্তির মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে যায় এবং ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়বোধ লোপ পায়। শুধু তাই নয়, হারাম উপার্জনকারীরা অর্থের নেশায় পাপাচার ও নীতিবর্জিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। হারাম উপার্জনের মাধ্যমে প্রকারান্তে রিজকদাতা হিসেবে মহান আল্লাহর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এসব কারণে হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৩] −

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا-

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না, কিন্তু তোমাদের পরস্পরের রাযী হয়ো ব্যবসা করা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। আর যে কেউ সীমালংঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে তাকে অগ্নিতে দগ্ধ করব। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-[৪]

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়াদাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ কর না।"

উদ্ধৃত আয়াতে '*বাতিল*' শব্দের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।

- শিহাবুদ্দীন আলুসী বলেন−'বাতিল' দ্বারা উদ্দেশ্য হারাম এবং প্রত্যেক ঐসব বস্তু যা গ্রহণ করতে শরী'আত অনুমতি দেয়নি। যেমন সুদ, জুয়া, ন্যার্য মূল্য না দেয়া, যুলম ইত্যাদি পন্থায়।[৫]
- আল-কুরতূবী বলেন−"ঐ সব সম্পদও বাতিলের অন্তর্গত হবে যা জুয়া, ধোঁকা, জোরপূর্বক, হক নষ্ট করে, তার মালিকের নিকট থেকে তার সন্তুষ্টি ব্যতীত গৃহীত হয়, অথবা মালিক যে সম্পদ স্বেচ্ছায় দিয়েছে কিন্তু শরী'আত এ কার্যক্রমকে অবৈধ করেছে যেমন, বেশ্যার উপার্জন, শুকর ও মদের মূল্য...।"[৬]
- মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন−ভ্রান্ত ও অবৈধ পন্থায় তোমরা কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না। এতে কারো সম্পদ কেড়ে নেওয়া এবং চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত; যাতে অন্যের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সুদ, জুয়া, ঘুষ প্রভৃতি এবং যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেন এরই আওতাভূক্ত, যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে জায়েয নয়; যদিও তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে। মিথ্যা কথা বলে কিংবা কসম খেয়ে কোন মাল হস্তগত করে নেওয়া অথবা এমন রোযগার, যা শরীয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা পরিশ্রমের বিনিময়ে হলেও বাতিল বা হারাম বলেই গণ্য হবে।[৭]

হারাম উপার্জন ব্যক্তির নৈতিক ও আত্মিক কলুষতা সৃষ্টি করে, তাই তা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন−"স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের সম্মতি ছাড়া তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করা কারো বৈধ নয়।"[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে−"কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তার ভাইয়ের লাঠিখানি নেয়াও তার সন্তুষ্টি ছাড়া।"[৯] তাই যে সম্পদ চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, জোরপূর্বক গ্রহণ করা হয়েছে তাও জেনেশুনে ক্রয় করা বৈধ নয়। এজন্যই নাবী সা. বলেছেন−"যে ব্যক্তি জেনেশুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার অন্যায়ে শরীক হল।"[১০]

আজকাল অনেক চাকুরীজীবী ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, কর্মজীবনে ঘুষ ও অবৈধ পন্থায় বিপুল অর্থ উপার্জন করে পরে চাকুরী শেষে তাওবা করে এবং সেই অর্থ-সম্পদের কিছু ভালো কাজেও ব্যয় করে এবং তারা মনে করে যে, এটা তাদের

---

[১] .ইয্যুদ্দীন বালীক, *মিনহাজুস সালেহীন*, বাংলা অনু. মাও. মুহাম্মদ ইসমাঈল (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০৪) খ.০২, পৃ.৫৫৮।
[২] .*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১৩।
[৩] .আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ২৯-৩০।
[৪].আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ০২: আয়াত ১৮৮।
[৫]. শিহাবুদ্দীন আলুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ.১৫।
[৬]. ইমাম আল-কুরতুবী, *তাফসীর কুরতুবী*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩৩৮।
[৭]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ. ৪৩৩।
[৮]. মূল আরবী [ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه]*মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ.১১৩,যথাক্রমে হাদীস নং ২১১১৯।
[৯] .ইবনু হিব্বান,*সহীহ ইবনু হিব্বান*, তারতীব ইবনু বালবান (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩), খ.১৩, পৃ.৩১৬, কিতাবুল রিহান, হাদীস নং ৫৯৭৮।
[১০]. মূল আরবী [من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشرك في عارها واثمها] ইমাম বাইহাকী, *আস্-সুনান*,*আল-কুবরা*, কিতাবুল বুয়ূ, খ.০৫, পৃ.৩৩৫, হা.নং ১০৬০৮।

পাপ ও অপকর্মকে দূর করে কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। এভাবে অবৈধ অর্জিত সম্পদ কখনই বৈধ হয় না। এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) কে প্রশ্ন করা হয়, 'এক ব্যক্তি একটি প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল। তখন সে যুলুম করে ও অবৈধভাবে ধনসম্পদ উপার্জন করে। পরে সে তাওবা করে এবং সেই সম্পদ দিয়ে হজ্জ করে, দান করে এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে।' তখন ইবন আব্বাস বলেন, '*হারাম বা পাপ কখনো পাপমোচন করে না।*' ইবনু মাসউদ (রা) অনুরূপ বলেছেন, তবে তিনি অতিরিক্ত বলেন, 'হালাল টাকা থেকে ব্যয় করলে পাপ মোচন হয়।'[১]

হারাম উপার্জনের কুফল বহুবিদ। এটা ইবাদত, দু'আ কবুল ও নৈতিকতা অন্তরায়। এতে সম্পদে বরকত নষ্ট হয়। এটা আত্মিক কলুষতা সৃষ্টি করে। এই সম্পদ পরবর্তী বংশধরদের জন্যও অকল্যাণ বয়ে আনে। এ থেকে দান করলে তা গৃহীত হয় না। এর দ্বারা গড়ে উঠা রক্ত-মাংস স্থান জাহান্নামে। এ সম্পর্কিত নাবী সা. কতিপয় উক্তি–

- 'অবৈধ খাদ্য থেকে যে রক্ত-মাংস বৃদ্ধি পায় তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত স্থান'।[২]
- 'হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পাক-পবিত্র ছাড়া কিছুই কবুল করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করেছে, ধূলাধূসরিত, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, হস্তযুগল আকাশপানে উত্তোলন করে দো'আ করে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ সবই হারাম। এমনকি সে হারাম দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। সুতরাং তার দো'আ কিভাবে কবুল করা হবে'?[৩]
- নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্র বন্টন করে দিয়েছেন যেমন তোমাদের মধ্যে জীবিকা তোমাদের বন্টন করে দিয়েছেন। তিনি যাকে ভালবাসেন তাকেও দুনিয়া দান করেন আবার যাকে ভালবাসেন না তাকেও দুনিয়া (ধন-সম্পদ,সুখ-শান্তি) দান করে থাকেন। আর দ্বীন শুধু তাকেই তিনি দান করেন যাকে তিনি ভালবাসেন। আর যাকে দ্বীন দান করেন তাকে তিনি ভালবাসেন। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বান্দা মুসলিম হয় না যে পর্যন্ত না তার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলিম হয়। বান্দা মু'মিন হয় না যে পর্যন্ত না তার অনিষ্ট থেকে তার তার প্রতিবেশী নিরাপদ হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনিষ্ট কি? উত্তরে তিনি বলেন, প্রতারণা ও যুলুম ইত্যাদি। আর বান্দা হারাম উপায়ে মাল উপার্জন করে, অতঃপর তা থেকে খরচ করে, তার খরচে বরকত হয় না এবং যে দান করে সেই দান গৃহীত হয় না। সে যা কিছু তার পশ্চাতে রেখে যাবে তা হবে তার জন্য জাহান্নামের যাওয়ার পাথেয়। আল্লাহ তা'য়ালা মন্দকে মন্দ দ্বারা মুছে ফেলেন না। বরং তিনি মন্দকে মিটিয়ে থাকেন ভালো দ্বারা। কলুষতা কলুষতাকে দূর করে না।[৪]

অবৈধকে বৈধ করার অপকৌশল: আজকাল অর্থোপার্জনের উপায় হিসেবে হারামকে হালাল করার বিভিন্ন অপকৌশল চলছে। ইসলামে সুদ, জুয়া, মদ, ইত্যাদি হারাম। অথচ আজ ব্যাংক-বীমায় ইসলামিক নাম দিয়ে সুদ বা হারামকে হালাল করা হচ্ছে। অনেকে আজ নামে-বেনামে মদ ও জুয়াকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করছে। এ সব অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ মহান আল্লাহ বলেন[৫] – وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ "তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য বল না,এটা হালাল এবং এটা হারাম, যারা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা সফলকাম হয় না।" এই অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং আল্লাহর বিধানের সাথে তাচ্ছিল্য করছে। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে[৬] وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে তামাশার বস্তু করো না।"
এ ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূল সা.বলেন[৭], "হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটির মাঝখানে আছে কতিপয় সন্দেহপূর্ণ জিনিষ সেগুলো সম্পর্কে অনেক লোকই জানে না। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি সেগুলো থেকে দূরে থাকল, সে নিজের দীন ও মান-মর্যাদা রক্ষা করল। আর যে সন্দেহপূর্ণ জিনিষসমূহের মধ্যে নিপতিত হল, সে হারামের মধ্যে নিপতিত হল।"

হারামকে হালাল করার অপপ্রয়াস অতীব গর্হিত ও চরম অনৈতিক। এ কাজ মানুষকে ভ্রষ্টতা ও কুফরের দিকে ধাবিত করে। এর মাধ্যমে মানব সমাজে নানা অনৈতিকতার প্রসার ঘটে। তাই এ কাজে লিপ্তদের ভর্ৎসনা করে মহান আল্লাহ বলেন-[৮] قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ "বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছো আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করছো? বল, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?"

---

১. মূল আরবী [سُئِلَ ابنُ عباس عمَّن كان على عمل ، فكان يَظلِمُ ويأخُذُ الحرام ، ثم تابَ ، فهو يحجُّ ويعتِق ويتصدَّق منه ، فقال : إنَّ الخبيث لا يُكَفِّرُ الخبيثَ ، ولكن الطَّيِّبَ يُكَفِّرُ الخبيث] ইবনু রাজাব হাম্বলী, *জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম* (বৈরুত : দারুল মাআরিফ,১৪০৮হি.), খ.১, পৃ.১০২।

২. মূল আরবী [إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به] ***মুসনাদ ইমাম আহমাদ***, খ.৩,পৃ.৩২১, হা.নং ১৪৪৮১; *সুনান আত-তিরমিযী*, আবুবুস সাফর, হা. ৬১৪।

৩. মূল আরবী [أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০১৫; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.২, পৃ.৩২৮, হাদীস নং ৮৩৩০।

৪. মূল আরবী [إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز و جل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالامن حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله عز و جل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لايمحو الخبيث] *মুসনাদ আহমাদ*, খ.১, পৃ.৩৮৭, হা. নং ৩৬৭২।

৫. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ১১৬।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩১।খ.১২, পৃ.১০।

৭. মূল আরবী [الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبها استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ন ৫২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ১৫৯৯।

৮. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৫৯।

হারাম উপার্জনের কারণ: দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অতিমাত্রায় লোভ-লালসা, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, দ্রুত ধনী হওয়ার বাসনা, বিলাসী জীবনের প্রতি আগ্রহ, দুনিয়ার জীবনের প্রতি আসক্তি এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা।
হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকার উপায়: তাকদীরে সন্তুষ্টি, স্বল্পতুষ্টি এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার চিন্তা, রিয্কের বিলম্ব দেখে হারাম পথে ধাবিত না হওয়া, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, অবৈধ উপর্জনকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট।

❑. সুদ (الربا):

সুদ এর আরবী প্রতিশব্দ হল রিবা(الرِّبَا); যার আভিধানিক অর্থ–মূল সম্পদের উপর বৃদ্ধি পাওয়া, বেশী হওয়া।[১] আল-কুরআনে রিবা শব্দ দ্বারা এমন বৃদ্ধিকে বুঝানো হয়েছে যার বিপরীত কোন বিনিয়োগ নেই।এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Interest. রিবা বা সুদের সংজ্ঞা সম্পর্কে আবূ বকর আল-জাস্সাস (মৃ.৩৭০হি.) বলেন–"যে ঋণ পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ দেয়া থাকে এবং তাতে মূলধনের অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত থাকে তাই রিবা।"[২]
ভাষাবিদ আবূ ইসহাক (মৃ.৩১১হি.)বলেন–"প্রতিটি ঋণের ক্ষেত্রে আসলের অতিরিক্ত যা কিছু নেয়া হয় তাই রিবা।"[৩]
কুরআনে রিবা শব্দটি ০৮বার এসেছে। ক্রিয়াপদে বিভিন্ন অর্থে আরও ১০বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

সুদ একটি নিকৃষ্ট বিনিময়। সুদের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর। এর অনিষ্ট শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত নয় বরং নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর অশুভ প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিনাশে সুদের কুফল নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল-

সুদ যুল্ম ও শোষণের হাতিয়ার। সুদ ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। সুদ ধনীদের আরও ধনী এবং দরিদ্রদের আরও দরিদ্র করে। ঋণগ্রহীতা কঠোর পরিশ্রম করে যে অর্থ উপার্জন করে তার বড় অংশ বিনাশ্রমে সুদখোর পেয়ে যায়। কোন কারণে ঋণগ্রহীতার লোকসান হলে যথারীতি সুদ দিতে হয়। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ঋণগ্রহীতাকে নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। ঋণগ্রহীতা অনেক সময় বিষয় সম্পত্তি বাড়ীভিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ঋণগ্রহীতা অর্থাভাবে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ঋণ, বঞ্চনা ও অভাবের তাড়নায় তারা অনেক সময় নানাবিদ অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়। সুদখোররা অর্থ-বিত্তের কারণে অন্যায়ভাবে সমাজে স্বীয় দাপট বজায় রাখে। তারা সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র ঋণগ্রহীতা মানুষগুলোর সর্বস্ব হাতিয়ে নেয়। অনেক সুদখোর ব্যবসায়ীরা অধিক ও নিশ্চিত লাভের আশায় বিভিন্ন অহিতকর খাতে যেমন–মজুতদারী, কালোবাজারী, মাদক দ্রব্য বিপণনে অর্থ খাটায়। এতে সমাজের মানুষের মধ্যে নানাবিধ নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম নেয়। এছাড়াও সুদের আরো নানাবিদ কুফল থাকায় ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[৫]–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে মু'মিনগণ! তোমরা সুদ খাবে না ক্রমবর্ধমানহারে এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" আরও বলেন-[৬] وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যার পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে স্থায়ী হবে।"

সুদ মানুষের মধ্যে অর্থলিপ্সা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। তাই দেখা যায়, সুদখোর ব্যক্তি লোভী, কৃপণ, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ও অর্থলিপ্সু পিশাচে পরিণত হয়। সুদ নানা অন্যায় ও পাপের উৎস হওয়ার কারণে এর বহুমুখী অশুভ প্রভাব সুদখোরের উপর গিয়ে পড়ে। যে সমাজে ব্যাপকভাবে সুদ প্রচলিত থাকে সেখানে লোভ-লালসা, কার্পণ্য, স্বার্থপরতা, ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা ইত্যাদি নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন– الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায়(কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, *ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত** ।অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"[৭]

---

[১]. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.২৪৮।
[২]. আবূ বকর আল-জাস্সাস (৩৭০হি.), *আহকামুল কুরআন* (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি.) খ.২, পৃ.১৮৪।
[৩]. *তাজ আল-আরূস*, উদ্ধৃত, মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি, কেন, কিভাবে?* (ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স), পৃ.৫০।
[৪]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬৮।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৩০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৫।
[৭]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৫।
**সুদ ও ব্যবসার মধ্যকার পার্থক্য:* অনেক সুদকে ব্যবসার মত গণ্য করেন কিন্তু বিষয়টি তা নয়, আসলে সুদ ও ব্যবসার মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট। "সুদ ও ব্যবসার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, ক. ব্যবসায় ঝুঁকি বিদ্যমান এবং এজন্য তা অনুমোদিত, আর সুদে ঝুঁকি নেই এবং তা মুনাফার মত পরিবর্তশীল নয়। খ. ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করলে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা উদ্যোগ, যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রতিফল। সুদের ক্ষেত্রে তা হয় না; কারণ ঋণদাতা কোন উদ্যোগ ও যোগ্যতা ছাড়াই নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে। গ.ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত মূল্য পণ্য হস্তান্তর করার সাথে সাথেই লেন-দেন শেষ হয়ে যায়। এরপর ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে আর কিছুই দিতে হয় না। কিন্তু সুদের সম্পূর্ণ আসল ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সুদ আদায় করতে থাকে। ঘ. ব্যবসা উৎপাদনশীল ; ব্যবসায়ী কারবারে তার শ্রম ও দক্ষতা বিনিয়োগ করে লাভবান হয়। পক্ষান্তরে সুদের মধ্যে বেকার সমস্যা সৃষ্টি করার প্রবণতা বিদ্যমান। সুদের হার বিনিয়োগ তথা উৎপাদনে স্থবিরতা আনে এবং অর্থনৈতিক মহামন্দা, তথা বাণিজ্য চক্রের সৃষ্টি করে। ঙ. ব্যবসা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সভ্যতার

সুদ কিভাবে ব্যক্তিকে ভয়ানক নিষ্ঠুর ও অর্থলিপ্সু পিশাচে পরিণত করে তার একটি চিত্র দেখতে পাই প্রখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যিক সেক্সপিয়র রচিত '*The Merchant of Venice*' গল্পের ইহুদী সুদী মহাজন সাইলক চরিত্র।[১] সুদের অশুভ প্রভাব সম্পর্কে মওলানা হিফজুর রহমান বলেন–

> সুদখোর মানুষ অর্থ-সম্পদের নেশায় মাতাল হয়ে পড়ে। সে মানবিক নৈতিকতা বোধ, মনুষ্যত্ব, সমবেদনা এমনকি মানবতাকে অর্থহীন বলে মনে করতে থাকে। স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা এবং অন্যদের ধ্বংস করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা তার জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজের স্বার্থের ধাঁধায় সব সময় সে পাগল কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। নির্যাতিত-নিপীড়িত ও অসহায়দের দুরবস্থা ও আর্তনাদ সে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। সে অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে।[২]

সুদের আরও অপকারিতা আছে। যেমন–সুদ উৎপাদন হ্রাস ঘটায়, বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে, অর্থনৈতিক মন্দা ও অস্থিশীলতা সৃষ্টি করে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, বেকারত্ব বৃদ্ধি করে, সামাজিক শান্তি-স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে, সমাজে কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত করে না, রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে, পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভব করে এবং পুঁজিবাদ বিকাশে সহায়তা করে, আর পুঁজিপতিরা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য সমাজ ও দেশে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়। সুদ সম্পদের বরকত নষ্ট করে ফেলে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদের মাধ্যমে যদিও সুদখোরের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এতে বরকত থাকে না। এর ফলে যেমন তার শত্রু বৃদ্ধি পায় তেমনি সম্পদের প্রাচুর্যের দরুন মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ "মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।" অন্যত্র বলেন[৪]- يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"

ধর্মীয় দৃষ্টিতে সুদ একটি অবৈধ বিনিয়োগ, পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলদের শরীয়াতেও তা নিষিদ্ধ ছিল। এ মর্মে বলা হয়েছে-[৫] وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا -"আর (তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল) তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

ইসলামে সুদ শুধু নিষিদ্ধই নয়, বরং তা অতি ভয়ানক মহাপাপগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. সাথে যুদ্ধ করার মত চরম ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক অনাচার। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন[৬]–

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ
>
> "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সুদের যা আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধেও ঘোষণা দাও। আর যদি তামরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।"

রাসূলুল্লাহ সা. সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী এবং সুদের দলীল লেখক–সকলের উপর লা'নত করেছেন।[৭] তিনি সুদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করেন। এ প্রসংঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উক্তি–

-'সুদের গুনাহ সত্তর প্রকার। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্করটি হল–একজন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচার করারর সমান।'[৮]

-কোন ব্যক্তি যদি জেনে-শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করে তবে তা ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ।[৯]

-যে জাতিতে সুদ প্রকাশ্যে চলে সে জাতি দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। আর যে জাতিতে ঘুষ প্রকাশ্যে চলে সে জাতি ভীতি কবলিত হয়।[১০]

সুদের এতসব অপকারিতা থাকা সত্ত্বেও আজকাল উদ্বেগজনকভাবে সুদে লেন-দেন বেড়েই চলছে। ফলে বিভিন্ন জাতির মানুষ সুদের কবলে নির্যতিত। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল থেকে বিশ্বব্যাপী সুদ লেন-দেন ব্যাপকভাবে চালু থাকায় সহসা সহজে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ অসম্ভব। তবে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং এক্ষেত্রে আশার আলো সঞ্চার করেছে।

অগ্রগতি সাধন করে অথচ সুদ কৃপণতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রীকতার জন্ম দেয়। কাজেই নৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সুদ হচ্ছে মানবতা বর্জিত শোষণের অন্যতম হাতিয়ার। অন্যদিকে ব্যবসা হচ্ছে সামাজিক অগ্রগতি ও সমঝোতার বহক।" -এম এ মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক রিচার্স ব্যুরো, ১৯৮৩),পৃষ্ঠা.১৩২।

[১].ইহুদী সূদী মহাজন সাইলক থেকে একবার ভেনিসের দানশীল ব্যক্তি এ্যান্টনিও কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুদে কিছু টাকা ধার করে। তাতে শর্ত ছিল নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সাইলক এ্যান্টনিও-এর শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারবে। নিদিষ্ট সময়ে এ্যান্টনিও ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সাইলক এ্যান্টনিও-এর শরীর থেকে মাংস নেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। বিষয়টি আদালতে গড়ালে আদালত রায় দেয় রাক্তপাত ছাড়া মাংস নিতে। এতে এ্যান্টনিও-অমানবিকতা থেকে রক্ষা পেলেও সাইলকের যে নির্দয়তা ও অর্থলিপ্সুতার বহিঃপ্রকাশ তার মূলে ছিল সুদ বা সুদের টাকা আদায়।

[২]. মওলানা হিফজুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনু: মওলানা আবদুল আউয়াল(ঢাকা: ইফাবা, ৩য় প্রকাশ,২০০০),পৃ.২১৮।

[৩].আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৩৯।

[৪].আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৬।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৬১।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৮-২৭৯।

[৭].মূল আরবী [لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা. নং ১৫৯৭; *আবূ দাউদ*, *কিতবুল বুয়ূ'*, হা. ৩৩৩৩।

[৮].মূল আরবী [الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه] *সুনান ইবন মাজাহ*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং ২২৭৪।

[৯]. মূল আরবী [درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৫, পৃ.২২৫, হাদীস নং ২২০০৭।

[১০]. মূল আরবী[ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيه الرشا إلا أخذوا بالرعب] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৪, পৃ.২০৫, হাদীস নং ১৭৮৫৬।

সুদের কারণ: অর্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত লোভ-লালসা, কৃপণতা, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কুপ্রভাব ও বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা। *সুদ বন্ধে করণীয়:* সুদের কুফল সম্পর্কে জনমত গঠন, সুদমুক্ত ঋণ এবং ব্যাপকভাবে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং চালু করণ।

❑. প্রতারণা, ছলচাতুরী, ধোঁকাবাজি, নকল-জালিয়াতি ও ভুয়া বিজ্ঞাপন (الغش):

প্রতারণা শব্দের অর্থ–প্রবঞ্চনা, ছলনা, ঠকামি, শঠতা, জুয়াচুরি।[১] এর আরবী প্রতিশব্দالغش, পরিভাষায় প্রতারণা হলো অন্তরে যা গোপন আছে, মুখে তার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ করা। এমন বস্তুকে বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত করা যার কোন অস্তিত্ব নেই।[২]

প্রতারণা একটি সামাজিক অপরাধ। প্রতারণা মুনাফিকের কাজ। নিজ স্বার্থসিদ্ধি ও অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করার জন্য প্রতারক-ধোঁকাবাজরা এই অন্যায়ের পথ বেছে নেয়। প্রতারণায় প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ভিন্ন অবস্থার ভান করা হয়। দূর্বৃত্তরা প্রতারণার মাধ্যমে হীনস্বার্থ হাসিলের জন্য ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণের জন্য নানা ধরনের অপকৌশল ও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এতে সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হয় এবং প্রতারণার বেড়াজালে পড়ে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই এ থেকে বিরত থাকতে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ الْسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার কর না; করলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলিয়ো যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে; তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"

বর্তমান সময়ে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে প্রতারণা, ছলচাতুরী ও ধোঁকাবাজি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ মানব জীবনের এমন কোন ক্ষেত্রে নেই যেখানে বর্তমানে কোন প্রতারণার আশ্রয় নেই। প্রতারণা যেমন ব্যাপকতর হয়েছে তেমনি প্রতারণার নানামুখী অপকৌশল বিস্তার ঘটেছে। যেমন– অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওজনে কম, পণ্যে ভেজাল, নকল বা মন্দ জিনিস ভালো বলে চালানো হয় নানা প্রতারণা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য নানা প্রতারণা আশ্রয় নেয়া হয়। তবে অন্যান্য ক্ষেত্র অপেক্ষা অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতারণার মাত্রা বেশী হয়।

গবাদি পশু, কাঁচামাল ও মাছ ইত্যাদি কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে বাজারে দালাল থাকে, যারা ক্রেতা না হয়ে ক্রেতা সেজে পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। ফলে ক্রেতাদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে কিনতে হয়। এসব দালালদের সাথে বিক্রেতাদের যোগাযোগ থাকে। এ প্রক্রিয়ায় ক্রেতা প্রতারিত হওয়ায় এ ধরনের দালালি অনৈতিক। ইসলাম সব ধরনের প্রতারণা, ছল-চাতুরী ও ধোঁকাবাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে হারাম ঘোষণা করেছে। এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ্য যে,–

> একবার রাসূলুল্লাহ সা. এক খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় নিজ হাত এর ভেতরে ঢুকান। তাতে তাঁর আঙ্গল ভিজে যায়। তিনি প্রশ্ন করেন, হে খাদ্যের মালিক! এটা কি? সে জাওয়াব দিল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির পানি পড়ে তা ভিজে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-তুমি এটাকে উপরে রাখলে না কেন যাতে লোকেরা তা দেখতে পায়? (জেনে রাখ) *যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।*[৪]

ক্ষতি বা প্রতারণার আশঙ্কায় ইসলাম দালালী, ভাগচাষ, অনুমানে বিক্রি ও ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রি নিষেধ করেছে। হাদীসে এসেছে, নাবী সা. দালালী, ভাগচাষ, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল বিক্রি করা এবং ফল পুষ্ট হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে, গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা নগদ মূল্য ব্যতীত বিক্রি করতে নিষিদ্ধ করেছেন।[৫] ব্যবসায় প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে রাসূল সা. বলেন[৬], "সাবধান! তোমরা বিক্রয়ে অধিক শপথ থেকে বিরত থাক। কেননা তা পণ্য(তৎক্ষাণিক) চালিয়ে দেয় তারপর ব্যবসা ধ্বংস করে।"
মুনাফাখোরি এবং পারস্পরিক ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে একপক্ষের শুধু লাভ গ্রহণ ও লোকসান গ্রহণ না করা অবৈধ ও অনৈতিক। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, লোকসানের দায়িত্ব না নেয়া পর্যন্ত লভ্যাংশ গ্রহণও জায়েয নয়।[৭]

বৈধভাবে উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ব্যবসা-বাণিজ্য। আর ব্যবসা হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত সততা ও আমানতদারি। পক্ষান্তরে, ব্যবসায় প্রতরণা বড় ধরণের অপরাধ ও বিশ্বাসঘতকতা। এটা ব্যক্তির জন্য ইহ ও পরকালীন লাঞ্ছনা কারণ হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন[৮], "কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহাঅপরাধী হিসাবে উত্থিত হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, সততা ও ন্যায়ের সাথে ব্যবসা করবে তারা ব্যতীত।"

---

[১]. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭৯।
[২]. *আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাতি ওয়াল আ'লাম* (লেবানন: আল-মাকতাবাত আল-শারকিয়্যা, ১৯৮৬ইং) পৃ.১৭০।
[৩]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬ : আয়াত ৯৪।
[৪].মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ! ما هذا ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله ! قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ ثم قال من غش فليس منا]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং ১০২, *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতবুল বুয়ূ', হা.নং ১৩১৫।
[৫].মূল আরবী[نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ২২৫২, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং ১৫৩৬।
[৬].মূল আরবী [إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা. নং১৬০৭; *সুনান আন-নাসায়ী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা.নং ৪৪৬০।
[৭]. মূল আরবী [لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك] *সুনান তিরমিযী*, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং ১২৩৪।
[৮]. মূল আরবী [إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বু'য়ূ, হাদীস নং ১২১০।

প্রতারণা, ছলচাতুরী ও ধোঁকাবাজি অতি মন্দ কাজ। এর পরকালীন পরিণতি অতি মন্দ। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ বলেন-[১]

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না ; তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" -আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য কিছু জিনিস আনলো এবং কসম করে বলতে শুরু করলো যে, লোকে এ জিনিসের এতো এতো মূল্য দিচ্ছে। অথচ কেউ তা দেইনি। এ মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমরা যাতে তার এ কথা বিশ্বাস করে তার নিকট থেকে জিনিসটা ক্রয় করে। এর প্রেক্ষিতে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়।[২] এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৩]

-আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। ক. যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, তা বেশি মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। খ. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য আসরের নামাজের পর মিথ্যা কসম করে এবং গ. যে ব্যক্তি তার নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আজ আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব না। কেননা তুমি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দাওনি, অথচ তা তোমার সৃষ্টি ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেন[৪]-'ধোঁকাবাজ, দান করে খোঁটা দানকারী ও কৃপণ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

নকল-জালিয়াতি ও ভুয়া বিজ্ঞাপন: নকল ও জালিয়াতি এক ধরনের প্রতারণা। নকল ও জালিয়াতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন: খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, মুদ্রা,সনদ, পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কোন কোন ব্যবসায়ী পণ্যের অধিক বিক্রির জন্য চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের অস্বাভাবিক গুণ বর্ণনা করে প্রচারণা চালিয়ে ক্রেতা সাধারণকে উক্ত পণ্যের ব্যাপারে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করে। এটাও সম্পূর্ণ অনৈতিক ও নিষিদ্ধ কর্ম। এটা নিষেধ করে বলা হয়েছে[৫]- قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "বল, 'মন্দ ও ভালো এক নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নেরা! আল্লাহকে ভয় কর–যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

প্রতারণা ও নকল-জালিয়াতির কারণ: অতিমাত্রায় লোভ-লালসা, দ্রুত ধনী হওয়ার ইচ্ছা, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, অসৎ সঙ্গ, ঈমানী দুর্বলতা, দ্বীনি জ্ঞানের অভাব, নৈতিক পদস্খলন ও উপযুক্ত শাস্তি না থাকা।

প্রতারণা ও নকল-জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়: সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, অপরাধীকে কঠোর হস্তে দমন, নৈতিক শিক্ষা, তাকওয়া সৃষ্টি, অল্পতুষ্টি, সৎসঙ্গ, মৃত্যু ও পরকালীন পরিণতির কথা স্মরণ।

❑.ওজন ও মাপে কম দেয়া:

পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনের সময় ওজনে ও মাপে কম দেয়া কিংবা নেয়ার সময় বেশী নেয়া একটি অনৈতিক কর্ম। ইসলামে এটা গর্হিত অবৈধ কর্ম। কেননা এতে একদিকে নিজের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে বেশী অর্জন করা হয়, অন্যদিকে অন্যের ন্যায়সংগত অধিকার ও পাওনা আদায় করা হয় না। কিভাবে অন্যকে ঠকানো ও বঞ্চিত করা যায় এখানে এই অপচেষ্টা করা হয়। এই অনাচার মানুষকে ব্যবসায়িক অসাধুতার বিস্তার ঘটাতে উৎসাহিত করে। এর ফলে একে অপরের প্রতি অনাস্থার সৃষ্টি হয়। এতে সমাজে ইনসাফের পরিবর্তে যুলুম ও ফিতনা-ফাসাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে মানুষ প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে আগ্রহী হয় এবং অনৈতিকতার প্রসার ঘটে। এই অনাচাররোধে মহান আল্লাহ বলেন-[৬]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ-الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْعَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ-وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ-أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ

"দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নিবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়,তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে –মহাদিবসে।"

লেন-দেন সংক্রান্ত এই ব্যাধি অতীতের মানব সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে শু'আয়ব ('আ.) জাতির মধ্যে তা ব্যাপকতা লাভ করে। তিনি সমাজ থেকে তা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। কিন্তু তাঁর জাতি তা অমান্য করে ওযনে কম দিত এবং নেওয়ার সময় বেশী নিত। ফলে তারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে যায়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭]–

فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ৭৭।

[২]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আলে ইমরান, হাদীস নং ৪২৭৬।

[৩]. মূল আরবী [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং২২৪০।

[৪]. মূল আরবী [لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل] *সুনান আত-তিরমিযী*, বাবু বির্রি ওয়া সিলাহ, হাদীস নং ১৯৬৩।

[৫]. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১০০।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩: আয়াত ১-৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৮৫।

"সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ার শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর।" কুরআন আরও ঘোষণা করা হয়[১]–

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ-وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ- وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হও না এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।" আরও বলা হয়েছে-[২] وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ -"এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে ।"

মাপ-ওজনে কম দেওয়ার অপরাধের পরকালীন শাস্তি ছাড়া নানান পার্থিব অকল্যাণ রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,...যে জাতির মধ্যে মাপ-ওজনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয় তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দুঃখ-কষ্ট ও শাসকের যুলুম-উৎপীড়ন চাপিয়ে দেয়া হয়।[৩]

মাপে কম দেয়ার কারণ: অসৎ ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের আকাঙ্খা, পণ্যসামগ্রীর অপ্রতুলতা ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি। *প্রতিকারের উপায়*: আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কঠোর হস্তে দমন, মানুষের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ সৃষ্টি করা।

❑.খাদ্য ও পণ্যে ভেজাল:

ভেজাল একটি বহুল পরিচিত বাংলা শব্দ।এর আরবী প্রতিশব্দ الْخَبِيثُ-এর আভিধানিক অর্থ-মিশ্রিত, মেকি, খাঁটি নয় এমন।[৪] কোন বিশুদ্ধ বা খাঁটি বস্তুর সাথে নকল, দূষিত বা নিম্নমান সম্পন্ন পণ্যের মিশ্রিতকরণকে সাধারণভাবে ভেজাল বলা হয়।

খাদ্য ও পণ্যে ভেজালের স্বরূপ ও বিভিন্ন দিক: খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে ভেজাল প্রদান করা হয়। যেমন: ক). সমজাতীয় খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে নিম্নমানের জাতের সাথে ভালো জাতের মিশ্রিতকরণ। যেমন: নিম্নমানের চাল বা গমের সাথে ভালো চাল বা গম মিশ্রিত করে বিক্রি। খ). বিপরীতধর্মী এক জাত দ্রব্যের সাথে অন্য জাতের দ্রব্যের মিশ্রিতকরণ। যেমন-দুধের সাথে পানি মিশিয়ে বিক্রি। গ). এক জিনিসের কথা বলে অন্য জিনিস প্রদান। যেমন: মহিষের গোশত গরুর গোশত হিসেবে বিক্রি। ঘ).অখাদ্যকে খাদ্য হিসেবে বিক্রয়। যেমন–মৃত মুরগী, মৃত ছাগল অথবা শিয়াল-কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর গোশত ছাগলের গোশত হিসেবে বিক্রি, পচাঁ ডিম, পচাঁ মাছ, নষ্ট ফল-মূল ইত্যাদি অখাদ্যকে বিক্রয়। ঙ).ভোক্তাদের নিকট নিম্নমানের জিনিস ক্যামিক্যাল লাগিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা। যেমন–ঝড়ে পড়ে যাওয়া অপরিপক্ক আম রঙিন করে পাকিয়ে বিক্রি। চ).মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ, গুড়াদুধ সহ বিভিন্ন খাদ্যদ্র্য বিক্রয়। ছ). কৃত্রিম উপায়ে অপরিপক্ক ফল পাকাতে, ফলের রঙ আকর্ষণীয় করতে, কিংবা পাকা ফল, পচনশীল ফল, শাক-সবজির পচনরোধে এবং সজীব-সতেজ রাখতে কার্বাইড, ফরমালিন, পার-অক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বইডসহ বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা। আবার কখনও অখাদ্য, ক্ষতিকর ও পরিত্যক্ত জিনিষকে খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশানো– ইত্যাদি সবই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মধ্যে পড়ে। এছাড়া জেনে-শুনে পণ্যের দোষ-ক্রুটি গোপন করে পণ্য বিক্রিও ভেজালের মধ্যে পড়ে।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রদান ও বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার মানবতা বিরোধী জঘন্য অনৈতিক কাজ। ভেজালকারী মানবতা ও সামজের দুশমন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের দ্বারা মানুষ প্রতারিত হয় এবং ভোক্তার অধিকার ক্ষুন্ন হয়। এতে দ্রব্যের মান, পুষ্টিগুণ ও স্বাদ নষ্ট হয়। বিশেষ করে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত ভেজালযুক্ত খাবার মানব দেহে মারাত্মক মরণ ব্যাধির জন্ম দেয়। এর ফলে মানবদেহের লিভার, কিডনী, পাকস্থলী ও ফসফুস ইত্যাদি অঙ্গ ক্যান্সারসহ নানা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। মানব দেহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। গর্ভবর্তী মহিলাদের নানা জটিলতা, বিকালঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম নিতে পারে। এভাবে ভেজালকারী সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের চরম ক্ষতি সাধন করে। ভেজাল প্রদান একটি মানবতা বিরোধী এই জঘন্য অপকর্ম। ভেজাল প্রদান শুধু স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর নয়, বরং এগুলো নিকৃষ্ট অনৈতিক কাজ। ধর্মীয়ভাবে এসব মারাত্মক মহাপাপের কাজ। এসব অন্যায় ও অনৈতিক কাজকে নিষিদ্ধ করে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]–وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ "এবং ভালোর সাথে মন্দ বিনিময় করবে না।" অন্যত্র এসেছে[৬] – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে উত্তম বস্তু তোমরা ব্যয় কর এবং তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না।"

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৭]"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সুতরাং কোন মুসলিমের জন্য হালাল নয় যে, সে যখন অন্য ভাইয়ের নিকট কোন দোষযুক্ত জিনিস বিক্রয় করে তখন সেই দোষ বর্ণনা না করে গোপন রাখা।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা'২৬: আয়াত ১৮১-১৮৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ৮৫; ১৭: আয়াত ৩৫, ৫৫: আয়াত ৮-৯।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫২।

[৩]. মূল আরবী [ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أثخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাব আল-ফিতান, হাদীস নং ৪০১৯।

[৪]. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩৬।

[৫]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০২।

[৬]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৭।

[৭]. মূল আরবী [المسلم أخو المسلم . ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له]*সুনান ইবন মাজাহ*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং ২২৪৬।

খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের কারণ: ক.অসাধু ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফাবৃত্তির কারণ। খ. পচনশীল ফল বা সবজির পচন রোধ। গ.অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করা।
ভেজাল প্রতিরোধে করণীয়: ক.ভেজাল বিরোধী যথোপযুক্ত আইন প্রনয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। খ.গণমাধ্যম ও পাঠ্যসূচীতে ব্যাপকভাবে ভেজাল বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করা। গ.ভেজাল প্রদানের ক্ষতিকর ক্যামিক্যাল বিক্রিতে শর্তারোপ।

❑.অবৈধ (হারাম) ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন:

ইসলাম যে কোন উপায়ে সম্পদ অর্জনের অবাধ স্বাধীনতা দেয়নি। সম্পদ অর্জন, উৎপাদন ও বিপণন করার ক্ষেত্রে নৈতিক বিধিমালা দিয়েছে। এখানে প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবৃদ্ধি, গুদামজাত, অবৈধ মুনাফাখুরী ইত্যাদি মাধ্যমে সম্পদ অর্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনুরূপ মানব জীবনের জন্য সার্বিক ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করাও এখানে অবৈধ। যেমন, মদ তৈরী, শূকর প্রতিপালন, বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ, চিত্র, প্রতিমা ও ভাস্কর্য তৈরী ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা যেসব দ্রব্য হারাম করেছেন, সেসব দ্রব্যের ব্যবসাও হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মদ, মৃত প্রাণী, রক্ত, প্রতিমা এবং শূকরের গোশত প্রভৃতি হারাম করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের প্রতি মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত হারাম করা হয়েছে' [আল-কুরআন ৫:৩]। অন্যত্র বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলো থেকে বিরত থাক, যাতে তোমরা সফলকাম হও' [আল-কুরআন ৫:৯০]।

সব ধরনের অবৈধ বস্তু মানুষের দেহ ও আত্মার জন্য ক্ষতিকর। তাই এ সবের উৎপাদন, বিপণন ও ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন[১], 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃত দেহ, শূকর ও মূর্তি বেচা-কেনাকে হারাম করেছেন। তখন বলা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! আপনি কি মনে করেন যে, লোকেরা মৃত পশুর চর্বি দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়, তা দিয়ে চামড়ায় বার্ণিশ করে এবং লোকেরা তা চকচকে করার কাজে ব্যবহার করে? তখন তিনি বললেন, না, তা হারাম। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, কারণ মহান আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছেন অথচ তারা একে গলিয়ে নেয় এবং তা বিক্রি করে ও তার মূল্য ভক্ষণ করে'। যে সব পেশা অবৈধ এবং যে সব কর্ম অনৈতিক এমন সব পেশায় উপার্জনও অবৈধ। এছাড়া হারাম বস্তু ও অবৈধ উপায়ে উপার্জনও হারাম। হাদীসে এসেছে- নাবী সা. কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জিত অর্থ, গণকের উপার্জিত অর্থ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২] এ সব ছাড়াও মানুষের জীবনের ক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী, ঔষধপত্র ও প্রসাধনসামগ্রী উৎপাদন, বিপণন ও ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে অবৈধ ও অনৈতিক।

❑.মজুতদারী (الاحتكار) ও কালোবাজারী:

মজুতদারীর(Hoarding)। শাব্দিক অর্থ–জমা বা সঞ্চিত করে রাখা। এর আরবী প্রতিশব্দ *আল-ইহতিকার*। পরিভাষায় মজুতদারী হল–নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বা কোন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিক্রি না করে গুদামে আটকে রাখা, মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায় পর তা উচ্চমূল্যে বিক্রি করা।

কালোবাজারি (Black Market) এর আভিধানিক অর্থ-গোপনে নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে জিনিস বিক্রি করা। পরিভাষায়–অধিক লাভের প্রত্যাশায় (নিত্যপ্রয়োজনীয়) পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে মজুত করে রাখা এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হলে সে মজুতকৃত পণ্য সংকটকালে অধিক লাভে পশ্চাতদ্বারে বিক্রি করাকে বলে কালোবাজারি।[৩]

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে মজুতদারী, কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ও কালোবাজারি বড় রকমের অনৈতিক কাজ ও মহাপাপ। অসাধু ব্যবসায়ীরা সিণ্ডিকেট গঠন করে পণ্য মজুদ করে। ফলে ব্যবসায়ী বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে সংকট সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফা হাতিয়ে নিয়ে বাজারে পণ্য ছাড়ে। এটা অনৈতিক ও অতি হীন মানসিকতার পরিচায়ক। এতে গুটি কতেক অসৎ ব্যবসায়ী লাভবান হলেও সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে জাতীয় জীবনে অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, জনজীবনে দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভোগ নেমে আসে। অভাবগ্রস্ত লোকেরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে হিমশিম খেয়ে যায়। ব্যবসায়ীদের মালে ভেজাল ও ওজনে কম দেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই ঘৃণ্য অপকর্মের নিন্দা করে এর ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪] –

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ-يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ- كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

"(দুর্ভোগ তার জন্য) যে অর্থ জমায় এবং তা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়(প্রজ্জ্বলিত আগুন)।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[৫]

---

[১]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং ২১২১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ১৫৮১।
[২].মূল আরবী[أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা. ২১২২,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা.১৫৬৭।
[৩]. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম. *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বণ্টন* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, ২০০৭) পৃ.৩২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুমাযাহ ১০৪: আয়াত ০২-০৪।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ৭০: আয়াত ১৫–১৮।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَى- نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى- تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى- وَجَمَعَ فَأَوْعَى

"না কখনই নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি, যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল।"

মজুতদারী ও কালোবাজারি একটি গর্হিত অনৈতিক কর্ম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-"যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্যদ্রব্য মওজুতদারী করে সে পাপী।" অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"মজুতকারী অভিশপ্ত।"[১]

মজুতদারী ও কালোবাজারি এমন মন্দ কাজ, যে কারণে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে শাস্তি রয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[২]

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ-

"আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে,অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।"যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে,অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে,সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর'।"

উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা. কে বলতে শুনেছি–'যারা মুসলিমদের থেকে নিজেদের খাদ্যশস্য আটকিয়ে রেখে মজুতদারী করে (কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে) আল্লাহ তাদের উপর মহামারী ও দরিদ্রতা চাপিয়ে দেন।'[৩]

মজুতদারী ও কালোবাজারির কারণ: আত্মকেন্দ্রিকতা, হীনস্বার্থপরতা, অধিক মুনাফার লোভ-লালসা।
প্রতিকারে করণীয়: মজুতদারী ও কালোবাজারির মন্দ পরিণতি চিন্তা করা, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তা বন্ধ করা।

❑. অপচয়-অপব্যয় (الاسْراف, التَبذِير), বিলাসিতা ও প্রাচুর্য:

ইসরাফ (الاسْراف)অর্থ–অপচয় করা, সীমা অতিক্রম করা, আরবী ভাষায়–اسْراف হল, দান করার ক্ষেত্রে ন্যায়ানুগ পন্থা অবলম্বন না করা। তা দু'ভাবে হতে পারে। সীমালংঘন করে অতিরিক্ত প্রদান করার মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত অংশ হতে কম প্রদান করার মাধ্যমে।[৪] কারো কারো মতে-বৈধ কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকে ইসরাফ বা অপচয় বলা হয়।[৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. (মৃ. হি.) বলেন, তাবযীর (التَبذِير) অর্থ হল–সম্পদ অন্যায় পথে ব্যয় করা। কাতাদাহ রহ. (মৃ.১১৭হি.)বলেন–তাবযীর বলা হয়, আল্লাহর নাফরমানী, অন্যায় ও ফাসাদের কাজে অর্থ ব্যয় করা। মুজাহিদ রহ. (মৃ.১০৩হি.) বলেন–যদি কোন মানুষ হক পথে তার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে তবুও তাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। আর যদি অন্যায় পথে এক মুদ পরিমান সম্পদ ব্যয় করে তবুও সে অপব্যয়কারী গণ্য হবে।[৬]

যেসব দ্রব্য ভোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে না বরং দক্ষতা লঘব করতে পারে তা-ই বিলাস দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত। দামী পোষাক ও গহনা, ব্যয়বহুল গাড়ি, দামী আসবাবপত্র, রাজকীয় বাড়ি, অগণিত চাকর-চাকরানী প্রভৃতি বিলাস সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত।[৭] এছাড়াও অপরিমিত পোষাক, দামী প্রসাধনীসামগ্রী, থাল-বাসন, বিপুল অর্থ ব্যয়ে হরেকরকম খাবার আয়োজন, বিবাহ অনুষ্ঠানে বাহুল্য ব্যয়, বিভিন্ন উৎসবে আতশবাজি, আলোকসজ্জা, ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থের অপচয় বিলাসিতার মধ্যে পড়ে। বিলাসিতা ইসরাফ ও তাফযীরের অংশ। তবে ঘর-বাড়ী পরিপাটি রাখা, সুন্দর পোষাক ব্যবহার, সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ নয় এবং এগুলো অপচয়, অপব্যয়, বিলাসিতার মধ্যে পড়ে না।[৮]

কুরআনে 'ইসরাফ' শব্দটি ০২ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ০৬ বার, মুসরিফ ০২বার এবং বহুবচনে ১৩ বার সহ মোট ২৩ বার এসেছে। আর তাবযীর শব্দটি (بذر) মূলধাতু থেকে ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে মোট ৩বার ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্যক্তিগত সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসতা একটি গর্হিত কাজ। অপচয়, অপব্যয়, বিলাসিতা, আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে বিরাজমান থাকাও কোনো সমাজের নৈতিক সংকট নির্দেশ করে। এতে সম্পদ নষ্ট হয় এবং সম্পদের অভাব হয়। এটা দরিদ্র্যের অন্যতম কারণ। এটা অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছাড়াও অনেক অনাচারের জন্ম দেয়। এজন্য ইসলাম একে শয়তানের কাজ হিসেবে চিহ্নিত তা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৯] وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورً-

---

[১].মূল আরবী [من احتكر فهو خاطئ] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা. নং ১৬০৫, *আবূ দাউদ*, কিতাবুল ইজারাহ, হা.৩৪৪৭, *তিরমিযী* হা.১২৬৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ০৯: আয়াত ৩৪-৩৫।
[৩]. মূল আরবী [من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং ২১৫৫।
[৪].ইবন জারীর তাবারী,*জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.১২, পৃ.১৭৬।
[৫]. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৩৮।
[৬]. ইবনু কাছীর(রহ), *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ. ৬৯।
[৭]. ড. এম এ মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক রিচার্স ব্যুরো, ১৯৮৩),পৃ.৬৫।
[৮]. আল-কুরআন, ৭:৩২।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৬-২৭।

"কিছুতেই অপব্যয় কর না, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" অন্যত্র বলেন-[১] وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহে সব ধরনের অপচয়-অপব্যয়কে অন্যায় কাজ সাব্যস্ত করে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এর সমর্থন হাদীসেও রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সা. বলেন– মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন, তা হলো, অনর্থক কথা বলা, বেশী প্রশ্ন বা যাচঞা করা এবং অর্থ-সম্পদ নষ্ট করা।[২]

অপচয়, অপব্যয় ও বিলাসিতা মানব সমাজে অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায়। এ সব মাধ্যমে মানুষের অর্থের অপচয় হয়। এসব মানুষের মধ্যে অহঙ্কারের জন্ম দেয়। এগুলো পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের বাসনা মানুষকে নানাবিদ অপকর্ম, অনাচার ও অবৈধ উপার্জনের দিকে ধাবিত করে। স্বাভাবিক উপায়ে জীবন যাত্রার চাহিদা পূরণের সামার্থ্য যাদের নেই তারা অন্যায় পথ বেছে নেয়। দুর্নীতি ও ঘুষের পিছনে ভোগ-বিলাস একটি বড় কারণ। ভোগবৃত্তিকে পুরণ করতে গিয়ে মানুষ অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। ভোগ-বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনের নানা অকল্যাণ নিহিত থাকায় এ ব্যাপারে কুরআনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নাবীর পরিবারের জন্যও এর অনুমোদন দেননি। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩] – يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا "হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল,তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা কর তবে এসো আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই। এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দেই।"

বিলাসিতা মানুষের মধ্যে আলস প্রবণতার জন্ম দেয়। বিলাসিতা ও অপব্যয়-অপচয় কাফির-মুশরিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে, মিতব্যয়, মধ্যনীতি ও ভারসাম্য জীবন যাপন মু'মিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।[৪] কোন মুমিন বিলাসী হতে পারে না। কিন্তু আজকের সমাজের মুসলিমদের মধ্যে ভোগ-বিলাসের প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের শহর জীবন ছড়িয়ে গ্রামীন জীবনেও বিত্তশীল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থা থেকে সতর্ক করতে কুরআনে বলা হয়েছে[৫] – وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ "যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই তাদের নিবাস।" এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন–"দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাত তুল্য।"[৬]

পার্থিব ভোগ-বিলাস কোন গৌরবের বিষয় নয়, বরং তা আখিরাতে মন্দ পরিণতির কারণ হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন[৭]

> وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ
>
> "যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে'। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।"

বিলাস-বহুল বাড়ী, গাড়ী ও আসবাবপত্র ইত্যাদির মন্দ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৮], 'প্রত্যেক বিলাস-বহুল বাড়ি তার মালিকের জন্য শাস্তির কারণ হবে। তবে বসবাসের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, এরূপ বাড়ি নির্মাণে কোন ক্ষতি নেই'। মু'আয ইবন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. যখন তাঁকে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠান তখন বলেন-[৯], "সাবধান! বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা কখনো বিলাসী হয় না।"

অর্থ-বৃত্ত ও প্রাচুর্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ সব আমানত ও পরীক্ষার বস্তু বিশেষ। এ ব্যাপারে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।[১০] অর্থ-সম্পদের অপব্যবহারের সতর্কতা জরুরী। কেননা প্রাচুর্যের অধিকারীরা ঐশ্বর্যের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়ে অর্থ-বৃত্ত নানা অন্যায় ও অপকর্মে ব্যয় করে। এটা মানুষকে সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটা একদিকে সমাজে অবক্ষয় ও অনাচারের জন্ম দেয়, অন্যদিকে তা আল্লাহর আযাব ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে আসে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১১]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ৩১, আল-কুরআন (০৬:১৪১)।

[২].মূল আরবী[ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়াহ, হাদীস নং ১৭১৫।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ২৮।

[৪]. আল-কুরআন,সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫: আয়াত ৬৭।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ১২।

[৬] .মূল আরবী [الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر] সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাক্বায়িক, হাদীস নং ২৯৫৬।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ ৪৬: আয়াত ২০।

[৮].মূল আরবী [أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا] সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫২৩৭।

[৯]. মূল আরবী [إياي والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين] মুসনাদ ইমাম আহমাদ,খ.০৫,পৃ.২৪৩, হাদীস নং ২২১৫৮; ইমাম বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, হা.নং ৬১৭৮।

[১০]. আল কুরআন, সূরা তাকাসূর :আয়াত ৮।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা সাবা' ৩৪: আয়াত ৩৪-৩৬।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ- وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ- قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"আর আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই সেখানকার বিত্তবান অধিবাসীরা বলেছে,'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে অবশ্যই আমরা তা প্রত্যাখ্যানকারী'। তারা আরো বলেছে, 'আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব না'। বল, 'আমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

উদ্ধৃত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, অর্থ-বৃত্ত ও প্রাচুর্য মানুষকে মহান আল্লাহ প্রেরিত সত্য গ্রহণ এবং নাবী-রাসূলের অনুসরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং এটা মানুষের মধ্যে অহঙ্কার ও অবাধ্যতার জন্ম দিয়েছে।

পৃথিবীতে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক লোককে আল্লাহ প্রাচুর্যের দিয়েছেন, তারপরও সমাজ অসংখ্য ফিতনা-ফাসাদের দ্বারা ভারাক্রান্ত। যদি আল্লাহ সকলকে প্রাচুর্যের অধিকারী করতেন তবে পৃথিবী ফিতনা-ফাসাদে ভরে যেত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[১] "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ" "আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন।" এ সম্পর্কে নাবী কারীম সা. বলেন[২], "পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর তাহলে লোক তোমাকে ভালবাসবে।"

অর্থ-বৃত্ত ও প্রাচুর্য মানুষকে পার্থিব জীবনে পেরেশানীতে রাখে। পরকালীন জীবনে এটা মানুষের জন্য দুর্ভোগের কারণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন-[৩] وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا- إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا- وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا- "আর ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে। আর তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দাও। নিশ্চয় আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রজ্জ্বলিত আগুন। এবং কাঁটাযুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। "

❑.অর্থনৈতিক বৈষম্য, সম্পদের অসম বণ্টন এবং পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আগ্রাসন :

নৈতিকতাবর্জিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শোষণ ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে, অবৈধ সম্পদ অর্জনের স্বপ্ন দেখায়, শুভ, সুন্দর ও সত্যেকে অবহেলা করে ভোগ-বিলাস ও বৈষয়িকতার প্রতি লোলুপ করে, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা তথা মনবতাকে উপেক্ষা করে কেবল সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতায় মানুষকে লিপ্ত করে। এতে কেবল ক্ষমতা ও কৌশল যার আয়ত্তে সে-ই পুঁজির মালিক হয়। এতে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ জমা হয় আর সিংহভাগ লোক থাকে অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত।

ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ভারসাম্যতা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। কেননা তা না হলে দ্বীন-দুনিয়া উভয়েই বরবাদ হতে বাধ্য। বর্তমান মানব সমাজ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এখন লোকেরা শুধু বর্তমান ও নিজকে নিয়েই চিন্তায় বিভোর, ভবিষ্যত বা অন্যকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার যাবতীয় সম্পদ শুধু যেন নিজের জন্য, অন্যদের ব্যাপারে যেন তার কোনই দায়-দায়িত্ব নেই। বর্তমান সমাজে বিত্তহীনদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিত্তশালীরা দিন দিন আরো বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। এ ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা নানা ধরনের সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এটা সমাজে ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করছে। এজন্য কুরআন ঘোষণা করেছে- মহান আল্লাহ বলেন[৪]-وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "তাদের(ধনীদের) সম্পদে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।" এই আয়াত অনুযায়ী ধনীদের কর্তব্য দরিদ্রদের যাকাত, সাদাকা, সুদমুক্ত ঋণ প্রদান ও বিপদ-আপদে সহযোগিতা করা।

বর্তমান বিশ্বে অশান্তি, অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও সম্পদের অসম বণ্টন। বিশ্বের এক অংশ তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের জনগণ, যাদের সংখ্যা ১২০ কোটির উপরে, তারা আজ চরম দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থানের ফলে ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, গৃহহীনতা ও রোগে ভুগছে। অন্যদিকে, বিশ্বের অপর একটি অংশ তথা শিল্পোন্নত দেশসমূহের জনগণ, যারা বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় এক দশমাংশ, তারা চরম ভোগ-বিলাসে অর্থ অপচয় করছে। বর্তমান বিশ্বে উৎপাদিত খাদ্যের পরিমান বর্তমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদার দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বে শুধু অনাহারে লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করছে। অথচ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা বিপুল সম্পদ অপব্যয় করছে সামরিক গবেষণা এবং মানব বিধ্বংসী নতুন নতুন সমরাস্ত্র নির্মাণে।[৫] এই অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং পুঁজিবাদী শোষণ ও আগ্রাসন অধিকাংশ অপরাধ ও অনৈতিক কর্মের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এর ফলে সমাজের গুটি কতেক ধনী মানুষের হাতে অধিকাংশ মানুষ জিম্মী। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ এই বৈষম্য সৃষ্টির মূল হোতা।

---

[১].আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ২৭।

[২].মূল আরবী [ازهد في الدنيا يحبك الله . وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪১০২।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩: আয়াত ১১-১৩।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত ৫১: আয়াত ২০।

[৫]. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী অর্থনীতি* (ঢাকা: জমজম প্রকাশনী, ২০১২), পৃ.৭৬।

ধনী শ্রেণী অসৎ উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে বিলাসবহুল বাড়ী-গাড়ী করছে এবং নানারকম সুস্বাদু খাবার খেয়ে ব্লাড পেসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে, দরিদ্র মানুষের মাথা গোজার ঠাই নেই, দু'বেলা ডাল-ভাত জুটছে না, ফলে তারা পুষ্টিহীনতায় নানা অসূখে ভূগছে।একদল ভূগছে অতিভোজনে আর একদল ভূগছে অনাহারে।

বিশ্বের বেশীর ভাগ সম্পদ গুটিকতেক ব্যক্তির হাতে জিম্মি। আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফাম-এর রিপোট ২০১৫ মতে, বিশ্বের মাত্র ৬২জন ধনকুবের হাতে যে পরিমান অর্থ-সম্পদ আছে, তা পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যার সম্মিলিত ধন-সম্পদের সমান। আর শীর্ষ ১শতাংশ ধনী ধারণ করছে ৯৯ শতাংশ মানুষের সমান সম্পদ। অক্সফাম আরও বলেছে, বিশ্বের শীর্ষ ধনীরা ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছেন। অপরদিকে গরিবরা আরও বেশি দারিদ্র্যে ডুবে হচ্ছেন। অক্সফাম জানায়, সবচেয়ে ৬২ জন ধনকুবের মোট সম্পদের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় বেড়েছে ৪৪ শতাংশ। সেখানে পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা, যার মধ্যে আছে প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি লোক, তাদের ধন-সম্পত্তির পরিমাণএকই সময়ের মধ্যে কমেছে ৪১ শতাংশ।[১] অক্সফার্ম রিপোর্ট-২০১৩ মতে, বিশ্বের সবচেয়ে ১০০(একশত)জন শীর্ষস্থানীয় ধনী যাদের সম্পদের পরিমাণ ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) কোটি ডলার। এই সম্পদ দ্বারা বিশ্বের চরম দরিদ্র, যাদের মাথাপিছু আয় সোয়া এক ডলার, তাদের দারিদ্র ০৪(চার) বার দূর করা সম্ভব। (সূত্র বিবিসি)

উল্লেখ্য যে, মানুষের আনুপাতিক হারে পৃথিবীতে সম্পদের কমতি নেই। কিন্তু সুষম বণ্টন না থাকায় এই দুরবস্থা। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে অভুক্ত রেখে মুষ্টিমেয় মানুষ সব সম্পদ কুক্ষিগত রাখবে এর চেয়ে অবিচার আর কি হতে পারে! বর্তমানকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানব জাতিকে দুটি মতবাদ তথা পূঁজিবাদ[২] ও সমাজতন্ত্র[৩] এই শোষণ ও নিষ্পেষণের জন্য প্রধানত দায়ী। এ উভয় মতবাদের দ্বারা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আগ্রাসন ও ক্ষতির স্বীকার হয়েছে।

পূঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির সীমাহীন স্বাধীনতা থাকায় তা অর্থনৈতিক শোষণ, বৈষম্য, সংকট সৃষ্টির অন্যতম হাতিয়ার। এর ফলে ধনী-দরিদ্র ব্যবধান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূঁজিবাদের প্রবক্তরা রাজনৈতিক সাম্যের কথা বললেও তা প্রহসন মাত্র। কারণ পূঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা রাষ্ট্রযন্ত্রসহ যাবতীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে ন্যস্ত করে রাখেন যাতে দরিদ্র ও মেহনতী মানুষ কখনোই পূঁজিপতিদের সমকক্ষ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা আইনগত অধিকার ভোগ করতে না পারে। পূঁজিপতিদের যথেচ্ছা ভোগ-বিলাস, অপচয়-অপব্যয়, অবাধ স্বাধীনতার নামে অনৈতিক বেহায়াপনা ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড সমাজের মানুষকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় সাধন করছে। বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় অন্যায়ভাবে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে পূঁজিপতি হওয়ার অদম্য স্পৃহা মানুষকে চরম নীতিহীনতা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবাধে জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ দখল, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, মজুতদারী, কালোবাজারী, ফটকাবাজারী, মুনাফাখেরী, প্রতারণা, ভেজাল, চুরি, ডাকাতি, ওজন কম দেয়া, মত অন্যায় অহরহ ঘটে চলছে। অর্থনীতি ছাড়াও এখন পূঁজিপতিদের হাতে রাজনীতি ও সংস্কৃতির চাবিকাঠি। ফলে আজ পূঁজিবাদ আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের মূলে নিয়ামক শক্তি পূঁজিবাদ। বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশে দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্বের পূঁজিবাদী দেশসমূহের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা মানব সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করেছে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রের ছোবলে অনেক মানুষ নিজের সর্বস্ব হারিয়েছে। সমাজতন্ত্র তত্ত্বগত ও অর্থনৈতিক বিবেচনায় যদিও জনসাধারণকে বস্তু-সম্পদের দাসত্ব মুক্তি দিয়ে থাকে, কিন্তু তা তাদেরকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দাসে পরিণত করে।

❑.দারিদ্র্য ও বেকারত্ব (الفقر):

দারিদ্র্য একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। দারিদ্র্য মানুষের ঈমান, নৈতিকতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য জন্য হুমকি স্বরূপ। এটা ব্যক্তির নৈতিকতা কুড়ে কুড়ে নিঃশেষ করে দেয়। দারিদ্রের কষাঘাত ও তীব্রতা মানুষকে বিপথগামী করে তোলে, হারাম কাজে প্ররোচিত করে এবং মানবতাবোধের বিলোপ ঘটায়। এ কারণে অনেককে নিজের সন্তানকে বিক্রি করতেও দেখা যায়। এজন্য মানুষ ভ্রুণ বা গর্ভের সন্তানও হত্যা করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا “দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।”

অভাব ও ক্ষুধার তাড়না মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে ফেলে। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র-দুঃখী লোকেরা আয়-রোজগার ও কাজ-কর্মের সুযোগ না পেলে মানুষ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদিতে বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়। এমনকি

---

[১]. সূত্র, *দৈনিক যুগান্তর*, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ জানুয়ারী ২০১৬, পৃ.০১ ও ১৪।

[২]. পূঁজিবাদ-'যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান তাকে পূঁজিবাদ বলে।' ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৭।

[৩]. সমাজতন্ত্র- পুঁজিবাদের বিপরীত মতবাদ। এতে বস্তুগত উৎপাদন যন্ত্রের মালিক ব্যক্তি নয়, এতে ব্যক্তি মালিকানা বিলোপ করে জনগণের মালিকানার নামে সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে এনে সরকারী মালিকানা কয়েম করা হয়। এতে উৎপাদন ও বন্টন পরিচালিত হবে এই নীতির ভিত্তিতে যে, 'প্রত্যেকে সামর্থ মতো কাজ করবে এবং প্রয়োজন মতো ভোগ করবে। [*ইসলামী অর্থনীতি*, ইফাবা, ২০০৪, পৃ.১৬]

[৪]. আল-কুরআন,সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩১।

দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর দিকে ধাবিত করে।[১] এটা মানুষের জন্য কষ্টকর ও অভিশাপ হওয়ায় এ থেকে আশ্রয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এজন্য রাসূল সা. নিজে আল্লাহর নিকট দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[২] রাসূল সা. বলেছেন–"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাই।"[৩]

ইসলাম দারিদ্র্য ও ঋণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ থেকে আশ্রয় চেয়ে দোয়া করতেন-"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি।" একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি ঋণ থেকে এত বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।[৪]

> রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৫] একদা এক ব্যক্তি ...দানের উদ্দেশ্যে অর্থ নিয়ে বের হলো এবং (অজ্ঞাতে) এক চোরকে তা দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করল, এক চোরকে দান করা হয়েছে। ...আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) এক ব্যভিচারিণীকে দান করল। সকালে লোকেরা বলাবলি করল, এ রাতে এক ব্যভিচারিণীকে দান করা হয়েছে। ... পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এ সব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়তবা এর কারণে চোরটি চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে; এবং ব্যভিচারিণী ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে...।

এই হাদীসে দরিদ্রতার সাথে অনৈতিকতা এবং সম্পদশালীতাকে নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত বলে ইংগিত করা হয়েছে।

দারিদ্র্য মানুষের নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার উপর দারুণ কুপ্রভাব ফেলে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা– একবার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী রহ. (মৃ.১৮৯হি.) (যিনি আবূ হানিফা রহ. ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন) কে তাঁর গৃহপরিচারিকা এসে বলল, ঘরের আটা ফুরিয়ে গেছে, তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন, তোমার এ সংবাদে আমার মাথা থেকে চল্লিশটি মাসআলা উধাও হয়ে গেছে।[৬]

বেকারত্বঃ বেকারত্ব[৭] অভাব বৃদ্ধি করে। এটা সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। এটা সমাজে নানাবিদ অপরাধের জন্ম দেয়। বেকাররা অধিকাংশ সময় হতাশাগ্রস্থ থাকে। ফলে এদের অনেকের দ্বারা বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়। অনেক বেকার ব্যক্তি জীবিকার তাকিদে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবজি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি অন্যায় বেছে নেয়। আবার অনেকে চাকুরীর পাওয়ার জন্য ঘুষ ও অবৈধ পথ অন্বেষণ করে। কর্মসংস্থান ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বণ্ঠন থাকলে এ শ্রেণীর দ্বারা সাধারণত অপরাধ সংঘটিত হয় না। তাই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন[৮], [إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة] *"যারা আখিরাত ও দুনিয়ার কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে অযাথা সময় নষ্ট করে আমি তাদেরকে অপছন্দ করি।"* বেকারত্ব নিরসনে ইসলাম বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন ও শিল্পসহ বিভিন্ন কর্মে উৎসাহিত করা হয়েছে। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পরে এসেছে।]

❑.ভিক্ষাবৃত্তি ও অলসতা-অকর্মণ্যতাঃ

ভিক্ষাবৃত্তি এক ধরনের সামাজিক অভিশাপ। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণী কর্মস্পৃহা হারিয়ে অলসতা ও অকর্মণ্যতার দিকে উৎসাহিত হয়। অনেক লোক পরিশ্রম থেকে বাঁচারও জন্য ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেয়, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক। বর্তমানে এক শ্রেণীর অপরাধী চক্রের লোকেরা ভিক্ষাবৃত্তিকে উপার্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা শিশুদের বিভিন্ন পন্থায় বিকালঙ্গ পঙ্গু ও প্রতিবন্ধী বানিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির অর্থ উপার্জন করছে। ইসলাম জীবনোপকরণের জন্য শ্রম বিনিয়োগ না করে ভিক্ষাবৃত্তি বর্জনে নির্দেশ দেয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৯]-"যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চাইতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারায় কোন গোশতও থাকবে না।"

ভিক্ষাবৃত্তি ব্যক্তির আত্মসম্মান নষ্ট করে এবং ব্যক্তিকে অলসতায় উৎসাহিত করে। আর কর্মক্ষম ব্যক্তির নিষ্কর্মা হয়ে দান-সাদাকার উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা সম্পূর্ণ অনৈতিক। নাবী(সা.) বলেছেন[১০],"ধনী ও কর্মক্ষম(সুস্থ ও শক্তিমান) ব্যক্তির জন্য দান-সাদাকা গ্রহণ করা বৈধ নয়।" তাই মু'মিন দুঃস্থ-দরিদ্র হতে পারে কিন্তু আত্মমর্যাদাহীন হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করতে পারে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[১১]- لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا "(সদাকা) সেসব দরিদ্রের জন্য যারা আল্লাহ্র রাস্তায় আটকে

---

১. আবূ নুআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০৩, পৃ. ৫৩।

২.মূল আরবী [وأعوذ بك من فتنة الفقر]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুদ দু'আত, হাদীস নং ৬০০৭; *সহীহ মুসলিম*, হা. ৫৮৯, *সুনান আবূ দাউদ*, হা.১৫৪৪।

৩. মূল আরবী [اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৫০৯০; *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতবুল ইস্তেআযাহ, হা.নং ৫৪৬৫।

৪. মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو في الصلاة ويقول (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) . فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم ؟ قال (إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف)] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইসতিকরাদ, হাদীস নং ২২৬৭।

৫. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং১৩৫৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০২২।

৬. ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *মুশকিলাতুল ফাক্বরি ওয়া কাইফা 'ইলজুহা ফীল ইসলাম* (বৈরুত : মু'আসাসতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), পৃ.১৬।

৭. বেকারত্ব হলো কর্মক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও যোগতা অনুসারে কাজ না পাওয়া।

৮. আবূ নুআইম ইসপাহানী, *হিলইয়াতুল আউলিয়া* (বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি) খ. ০১, পৃ. ১৩০।

৯. মূল আরবী [ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪০৫।

১০. মূল আরবী [لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ৬৫২।

১১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৩।

গিয়েছে, তারা যমীনে ঘুরে বেড়াতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অনবগত ব্যক্তি তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চিহ্ন দ্বারা। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না।" এজন্য ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করে

> রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন–"উপরের হাত(দাতার হাত) নীচের হাতের(গ্রহীতার হাত) চেয়ে উত্তম।"..."যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন।"[১] তিনি আরও বলেছেন[২]-"তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জ্বালানী কাঠের আঁটি বেঁধে তা বিক্রি করতে পারে। এতে আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করবেন, আর এটা লোকদের নিকট এমন সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, যে সওয়ালে তারা কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।"

ভিক্ষাবৃত্তির মত নিন্দনীয় কাজকে রাসূল সা. শুধু নিরুৎসাহিতই করেননি বরং তা উচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একবার জনৈক(সুস্থ-সবল) ভিক্ষুক রাসূল সা. এর নিকট ভিক্ষার জন্য আসলে তিনি ভিক্ষুকের নিকট জানতে চান তার কাছে কোন সম্পদ আছে কিনা? ভিক্ষুক জানান একটি কম্বল ও একটি পেয়ালা তার সম্বল। এরপর নাবী সা. তা বিক্রি করে তা দিয়ে কুঠার কিনে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহের পথ বাতলে দেন। (এভাবে তার জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।) মাত্র পনের দিন দশ দিরহাম উপার্জন করে নতুন পোষাকে নাবী সা. সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তখন নাবী সা. তাকে বলেন ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে এটা উত্তম। ভিক্ষাবৃত্তি কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা বীভৎস করে দিত। এরপর ইরশাদ করেন-[৩], "তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য ভিক্ষা বৈধ নয়, ক. নিঃস্ব দরিদ্র, খ. প্রচণ্ড ঋণে জর্জরিত, গ. যার উপর রক্তপণ আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে তার জীবন বিপন্ন।"

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূল সা. ইচ্ছা করলে ভিক্ষুককে দু' দিরহাম সাহায্য দিয়ে কুঠার কিনে দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষের নিকট হাত পাতার পরিবর্তে আত্মমর্যাদা সহকারে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়ার জন্য তা না করেননি।

ভিক্ষাবৃত্তি না করা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকা বড় পূণ্যের কাজ। এ মর্মে রাসূল(সা.) বলেন[৪], "যে ব্যক্তি এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে, সে অন্যের নিকট যাঞ্চা করবে না। আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করব।"

ভিক্ষাবৃত্তির চেয়েও মন্দ জিনিস অলসতা-অকর্মণ্যতা। এটা মানুষকে পরনির্ভশীলতা ও দরিদ্রতায় নিমজ্জিত করে। দেশ, জাতি ও পরিবারের জন্য তা অকল্যাণকর। এতে দেশে ও পরিবার উন্নয়ন ব্যহত হয়। অলস-অকর্মণ্য লোকেরা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে না। এদের অনেকেই বিনাশ্রমে অর্থ উপার্জনের জন্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ইত্যাদি নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই ইসলামে অলসতা, অকর্মণ্যতা ও ভিক্ষাবৃত্তির কোন স্থান নেই।

পরিশ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয়, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও তাকদীরের দোহাই দিয়ে কর্মবিমুখ ব্যক্তিরাই অলসতা-অকর্মণ্যতা ও ভিক্ষা বৃত্তিতে লিপ্ত। এ থেকে মুক্তি পেতে করণীয় হলো : সর্বদা নিজেকে কর্মব্যস্ত রাখা, পরিশ্রমী লোকদের সান্নিধ্যে থাকা, শারীরিক অসুস্থতা থাকলে চিকিৎসা ও ব্যায়াম করা, অতিরিক্ত রাত না জাগা, মহামানবদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা।

....

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী উল্লেখযোগ্য বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। এই বিষয়াবলী মানুষকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনৈতিক পথে ধাবিত করে। তাই অর্থনৈতিক জীবনে অবৈধ ও অনৈতিক পন্থায় উপার্জন ও ভোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষকে উল্লেখিত মন্দ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

ষষ্ট পরিচ্ছেদ: শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বর্জনীয় বিষয়সমূহ

শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানব জীবনকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে। নৈতিকতা বর্জিত বস্তুবাদী শিক্ষা ও অপসংস্কৃতি মানুষের জীবনকে উচ্ছৃংখলতা, অশ্লীলতা ও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দেউলিয়াপনা যে কোন জাতির নৈতিক অধঃপতন তরান্বিত করে। আজকের বিভিন্ন জাতির নৈতিক অধঃপতনের মূলে রয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দেউলিয়াপনা।

❑.নৈতিকতা বর্জিত বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা:

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সুসভ্য, মার্জিত ও পরিশীলিত মানুষ করা। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের জন্ম দেয়া এবং মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ সাধন। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ তৈরীর পরিবর্তে মানুষকে

---

[১].মূল আরবী [اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৬১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০৩৪।

[২]. মূল আরবী [لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ২২৪৫।

[৩].**মূল আরবী** [إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع (الفقر الشديد) أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, হা.১৬৪১; *ইবন মাজাহ*, হা.২১৯৮।

[৪]. মূল আরবী [من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৪৩।

অসভ্য, অমার্জিত ও দুর্নীতিবাজ রূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। আজকের বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ তার বড় প্রমাণ। এই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ তুলনামূলকভাবে অধিক দুর্নীতিবাজ, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মম্ভরী। এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে মানুষও অন্যান্য জীবের মতো একটি জীব। সুখ-শান্তিই তার একমাত্র কাম্য। ফলে এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা সীমাহীন লোভ-লালসার ও ভোগ-বিলাসের প্রতি ঝুকে পড়ছে। এবং এদের বড় অংশ বিভিন্ন অনাচার ও অনৈকতায় জড়িয়ে পড়ছে। তাই দেখা যায় যে, এই শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের নৈতিক মান আর গ্রামের একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের নৈতিক মানে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বরং গ্রামের একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ তুলনামূলকভাবে সহজ-সরল, ভদ্র-নম্র, সৎ ও স্বার্থত্যাগী। অথচ শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানী, শিষ্টাচারী ও সহিষ্ণুরূপে গড়ে তোলার কথা, কিন্তু আজকের প্রচলিত শিক্ষা তা দিতে পারছে না। বরং তার উল্টো চিত্র আমরা দেখতে পাই। ফলে আজকের কথিত শিক্ষিত মানুষ অনেকাংশেই 'জাহল'। তাদের কর্ম ও আচরণ জাহালত তথা 'ইলম (জ্ঞান), আদাব (শিষ্টাচার) ও হিলম (সহিষ্ণুতা) এর বিপরীত। আজকের শিক্ষা বর্তমান সমাজের মানুষকে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত দার্শনিক টি এস ইলিয়টের এর বক্তব্যে তারই বাস্তবচিত্র দেখতে পাই, তিনি বলেন-[১] "All our Knowledge brings us nearer to our ignorance. All our ignorance brings us nearer to death." অর্থাৎ– আমাদের জ্ঞান আজ আমাদেরকে নিয়ে চলছে অজ্ঞতার অন্ধকারে আর অজ্ঞতা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের কিনারে। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং বস্তুবাদী শিক্ষাই এর প্রধান কারণ। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা থাকলে সামাজিক অনাচার অনেক অংশে রোধ হতো। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[২]– (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) "আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।"
এ আয়াত অনুযায়ী যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি করতে পারে না তা সত্যিকারের শিক্ষা নয়।

মনে রাখা দরকার যে, সব জ্ঞান-শিক্ষাই উপকারী নয়। বিশেষ করে যে শিক্ষা মানবতার কল্যাণ সাধন করে না এবং যে শিক্ষার প্রতিফলন ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রে প্রতিফলন হয় না, তা সত্যিকার শিক্ষা নয়। অধিকন্তু, যে শিক্ষা মানুষকে ঈমানের পথে পরিচালিত করে না তা দুর্ভাগ্যের উপকরণ। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন সব জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন যা উপকারী নয় (অকল্যাণকর)।[৩] মূলত এ সব জ্ঞানই নৈতিকতা বর্জিত। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এমন অনেক বিষয় আছে, সেগুলোকে অধ্যয়ন ও তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে ডিগ্রী অর্জন করতে হয়। সত্য পরিপন্থী এ সব বিষয় চর্চা করে অনেকে বিপথগামী ও নাস্তিক্যবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। কাজেই অকল্যাণকর ও অন্তঃসারশূন্য এই শিক্ষার ক্রটি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে হবে, নতুবা ভ্রষ্টতা অনিবার্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো কার থেকে শিখছি। তিনি কি সত্যিকার জ্ঞানী? তিনি সঠিক জ্ঞান দান করেন নাকি প্রকৃত সত্যপ্রকাশে কুটকৌশলের আশ্রয় নেন? এ ব্যাপারে সতর্ক করতে কুরআনে জ্ঞানপাপীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–[৪] الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে।" –কাজেই জ্ঞানপাপী সত্যগোপনকারীর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

❑.**তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির বিকৃতচর্চা:** মুক্তবুদ্ধির চর্চা আজ বহুল প্রচলিত বিষয়। কথাটি বাহ্যিকভাবে ভালো হলেও একে মন্দভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আজ মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে খুব বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধির যেন কোন সীমা-পরিসীমা ও নিয়ন্ত্রণ নেই। মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে আজ মুসলিম যুব সমাজের এক শ্রেণী নিজের ঈমান জলাঞ্জলি দিচ্ছে। এক শ্রেণীর নাস্তিক বা সংশয়বাদী তাদের নিজেদের একপাক্ষিক জ্ঞান বা অজ্ঞতার কারণে সর্বজ্ঞ মহাস্রষ্টা, তাঁর দ্বীন ও বিধি-বিধান নিয়ে কটূক্তি করছে এবং বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এর ফলে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে বা বাতিলের দিকে ধাবিত হচ্ছে কিংবা সত্যের ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয়ে নিপতিত হচ্ছে। এই ধারার কুপ্রভাবে জন্ম নিচ্ছে আল্লাহবিমুখ শিক্ষানীতি, ভোগস্বর্বস্ব জড়বাদী চিন্তা-চেতনা, সুদ ভিত্তিক শোষণ-বঞ্চনার অর্থনীতি, বুলিস্বর্বস্ব মানবাধিকার, বল্গাহীন নৈতিকতা, কুরুচিপূর্ণ সংস্কৃতি ও হয়রানিমূলক আইন ও বিচারনীতি। তথাকথিত এ সব মুক্তবুদ্ধির অপচর্চাকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি অপেক্ষা বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, কৌশল, শক্তি ও ক্ষমতা কি অধিক শ্রেষ্ঠ ও ক্রটিমুক্ত নয়? যদি তাই হয় তবে তথাকথিত মুক্তবুদ্ধিপ্রসূত বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বর্জন করে মহান আল্লাহ প্রদত্ত ওহী বা সত্য জ্ঞানই গ্রহণ করাই সকলের উচিত। আর এ সব নাস্তিক বা সংশয়বাদীর কথিত মুক্তবুদ্ধির অপচর্চাকারীর অপকর্মের জবাব এক শ্রেণীর উগ্রপন্থী জ্ঞান ও যুক্তি মাধ্যমে না দিয়ে অস্ত্রের মাধ্যমে দিতে চেষ্টা করছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল নীতি। এতে সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, সংঘাত, হানাহানি ও ফিতনা-ফাসাদ বাড়ছে।

---

[১]. মফিজুর রহমান, *কোরআনের আয়নায় বিস্মিত রাসূল (স.)* (ঢাকা: মদিনা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪),পৃ.৩৫।
[২]. আল-কুরআন,সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ২৮।
[৩].মূল আরবী [اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ, হাদীস নং ২৭২২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৪৬। আরও দেখুন, আল-কুরআন, ২৭:১৪, ৬:৩৩।

❑.জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৈন্যতা ও পশ্চাৎপদতা:

জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৈন্যতা ও পশ্চাৎপদতা যে কোন জাতির অধঃপতনের কারণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৈন্যতা ও পশ্চাৎপদতা মানুষকে কুসংরাচ্ছন্ন ও বিপথগামী করে। এটা মানুষের চিন্তার সংকীর্ণতা, উগ্রতা ও সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। এ কারণে মানুষ শিরক, কুফর ও নিফাকের দিকে ধাবিত হয়। এটা সমাজ ও জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আধুনিক সভ্যতার অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করলেও পৃথিবীর অনেক সমাজ ও জাতি জ্ঞানে পশ্চাৎদপদ। বর্তমান মুসলিম জাতির নৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ এটিই।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য পার্থিব ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে। জ্ঞানের মাধ্যমেই এটা তারা করেছে। এর মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মুসলিম জাতি পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষ স্থানে আরোহণ করেছিল এই জ্ঞানের মাধ্যমেই। পাশ্চাত্যকে যে মুসলিম জাতি উন্নতি শিখিয়েছিল সে মুসলিম জাতি আবার অনুন্নত হয়ে পড়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার জন্য। মূসা আল-খাওয়ারেযমী, ইবন সীনা, ইবনুল হাইছাম, জাবির ইবন হাইয়্যান, ইবন নাফীস, আল-রাযী, আল-ফরাবী, ইবন খালদুন প্রমূখ মুসলিম মনীষীগণ বিশ্বজ্ঞানভাণ্ডারে বড় ধরনের অবদান রাখলেও আজকের মুসলিমরা তা পারছে না। বর্তমান মুসলিম জাতি অতীত জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে গর্বিত, কিন্তু বর্তমান মুসলিদের অস্তিত্ব সংকট চলছে এবং আমাদের ভবিষ্যত অনুজ্জ্বল– সে ব্যাপারে অমনোযোগী, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের নামে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদাসীন, শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং অনেক দেশের শিক্ষার মান অতি নিম্ন। ফলে যুগ সমস্যার সমাধানে যুগপোযোগী জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তারা পশ্চাদপদ। জ্ঞানের এই দৈন্যদশা থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং আমাদের পুণঃপর্যালোচনা করে যুগপোযোগী ও উচ্চতর জ্ঞান চর্চা এবং ভবিষ্যতের জন্য গবেষণায় এগিয়ে আসতে হবে।

❑. বল্গাহীনভাবে বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে নীতিহীনতা :

বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আশির্বাদ, যা মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে এক বিরাট শক্তিকে। কিন্তু বিজ্ঞানের বল্গাহীন ব্যবহার ফলে কিছু ক্ষেত্রে তা আশির্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ পরিণত হয়েছে। কারণ বিজ্ঞানের বিপুল শক্তি এক বল্গাহীন অশ্বের মত। বল্গাহীন অশ্ব পথচারী ও আরোহী সবার জন্য যেমন বিপদজনক, বল্গাহীনভাবে বিজ্ঞানের শক্তির চর্চা ঠিক তেমনি। অশ্ব চালনার জন্য যেমন বল্গার প্রয়োজন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এই মহাশক্তির প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার। কিন্তু মানুষের সেই নৈতিক জ্ঞানের তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কিছু অন্যায় ও অপব্যবহারের ফলে বিশ্বের মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তা আজ হুমকির মূখে। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ যখন ক্ষুধা-দারিদ্রে নিস্পেষিত তখন উন্নত রাষ্ট্রগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে পারমানবিক মারণাস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এসব মারণাস্ত্রের বলে কতিপয় উন্নত শক্তিধর রাষ্ট্রের সামনে বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ জিম্মি ও অসহায়। এতো গেল বিজ্ঞানের অপব্যবহারের একটি দিক। বিভিন্ন যান্ত্রিক জিনিষের অনিয়মতান্ত্রিক ব্যাবহারের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ সহ নানাবিধ বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এছাড়াও স্যাট্যালাইট টি. ভি. চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে অশ্লীলতার সয়লাব, তথ্যসন্ত্রাস ও অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়ে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে চরমভাবে ধ্বংস করছে। মোবাইল ফোন, ফেস বুক ও ইন্টানেটের অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য কলহ, ব্যভিচার, ধর্ষণ, বেড়ে চলছে। এছাড়া এ সব মাধ্যম ব্যবহার করে দুস্কৃতিকারীরা নারী -শিশু পাচার সহ অপরাধী চক্র নিরাপদে নানা ধরনের অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে ক্রমাগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যায় ও অপব্যবহার মানুষের জীবন, জগত, সমাজ, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে মারাত্মক হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পৃথিবী ক্রমে ক্রমে বসবাসের অযোগ্য হয়ে আসছে। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন[১]– ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"

বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির অনিষ্টতা থেকে বাচাঁর জন্য তার ভালো-মন্দ উভয় দিকই জানতে হবে। কারণ ভালোকে চিনতে হয় তা আহরণ করতে আর মন্দকে চিনতে ও তা থেকে বেঁচে থাকতে। জ্ঞানীদের মতে, 'মন্দকে চেনাও জরুরী যেমন চিনতে ও জানতে হয় ভালোকে। কেননা যে ব্যক্তি মন্দ সম্পর্কে জানে না সে তাতে পতিত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।"

টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদন: নৈতিকতাবিহীন বিজ্ঞানের চর্চার ফলে আজকাল স্বামী-স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্ত্রী ভিন্ন অন্য মহিলার জরায়ু ভাড়া করে টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদন করা হচ্ছে। আবার স্বামী বন্ধ্যা হলে শুক্রকীট ব্যাংক থেকে ভিন্ন পুরুষের বীর্য এনে তা স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হচ্ছে। এভাবে নৈতিকতা বিবর্জিত বিজ্ঞান নতুন মাত্রায় ব্যভিচার ছড়িয়ে দিয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মূল্যবোধ বিসর্জনের আরও ন্যক্কারজনক বিষয় হলো, আফ্রিকার জংগলে বসবাসকারী গরিলার বংশবিস্তার কমে যাওয়ায় সৃষ্টির সেরা মানুষের (দরিদ্র, অসহায় মেয়েদের অর্থের বিনিময়ে)

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৪১।

জরায়ুতে গরিলার শুক্র প্রবেশ করিয়ে টেস্টটিউব পদ্ধতিতে প্রজনন শুরু হয়েছে। কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ মানবতা বিধ্বংসী নৈতিকতা বর্জিত এসব পদ্ধতি মেনে নিতে পারে না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার তথা ইসলামের মূল বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হলে ব্যক্তি জীবন থাকে অপূর্ণ। সমাজ জীবনও হয়ে উঠে দ্বন্দ্বমুখর। বিশ্ব পর্যায়ে দেখা দিতে পারে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। সামগ্রিকভাবে মানব জীবন হতে পারে নিরাপত্তাহীন। পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ সমাজে এসব লক্ষণ আজ পরিস্ফুট।

❑. পেশাগত অনৈতিকতা (শিক্ষা, চিকিৎসা):

শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবামূলক কাজ। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে এ দু'টি ক্ষেত্রকে বাণিজ্যিকিকরণ করা হয়েছে। আজ শিক্ষক ও চিকিৎসকদের একটি বড় অংশ এ মহৎ দু'টিকে পেশাটি অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানিয়েছে। এর ফলে দরিদ্র মানুষের জন্য উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসা আজ নাগালের বাইরে চলে গেছে। শিক্ষকরা শ্রেণী যথাযথভাবে পাঠদান না করে প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ঠিকভাবে পড়ালেখা না করে দায় সাড়াভাবে শ্রেণী পাঠদান করছে। অনুরূপভাবে চিকিৎসা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র বা সরকারী হাসপাতাল সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে পরিবর্তে ক্লিনিক গুলোতে মোটা অংকের ফি নিয়ে প্রাইভেট প্রাক্টিস করছে। বিভিন্ন নিম্নমানের ঔষধ কোম্পানীর মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে চিকিৎসা পত্রে ঔষধ লিখছে। সামান্য শারীরিক সমস্যার জন্য লিখে অপ্রয়োজনীয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ক্লিনিক গুলোর সাথে যোগসাযশ করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর নির্ধারিত হারে অর্থগ্রহণ করছে। ক্লিনিকগুলোতে অবাধে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্মত পরীক্ষা না করে নিম্নমানের ক্যেমিকেল পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এভাবে নানা ধরনের অনৈতিক কর্মের সাথে শিক্ষা ও চিকিৎসা পেশার একটি শ্রেণী জড়িত। আইন পেশা আজ অনেকটা অবাধ মিথ্যাচর্চা ও মানুষকে হয়রানির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে পেশাগত এ সব অনাচার মূল্যবোধ বিনষ্ট করছে।

❑.পর্দাহীনতা, নির্লজ্জতা, অশালীন পোষাক এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা:

পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের লজ্জাস্থান আবৃত করণ এবং শীত ও রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এটা মানব দেহের ভূষণ ও সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমও বটে। পোষাক একান্ত ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় হলেও সমাজের কিছু নৈতিক বিষয় এর সাথে জড়িত। কেননা শালীন পোষাক সমাজের নৈতিক মান বজায় রাখার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অশালীন পোষাক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিভিন্ন নৈতিক অপরাধ সৃষ্টির কারণ। বিশেষ করে যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী অশালীন, পাতলা ও আটোসাটো পোষাক আজকের সমাজে ধর্ষণ ও ইভটিজিং সহ নানা অপরাধ ও অনৈতিক কর্ম সংঘটনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। এর ফলে আজ অশ্লীলতার প্রসার ঘটছে এবং চোখ ও অন্তরের ব্যভিচার ব্যাপক মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে বোরখার প্রচলন থাকলেও তা অনেকাংশে ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। গৃহাভ্যন্তরে কি বাইরে সর্বত্রই পর্দাহীনতার সয়লাব চলছে। দুলাভাই-শেলিকা, দেবর-ভাবী, চাচাতো-খালাতো-ফুফাতো ভাই-বোনদের অবাধ মেলামেশা ছাড়াও সহশিক্ষায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের বন্ধুত্বে, নারী-পুরুষের যৌথ কর্মস্থলে, অফিস সহকর্মীদের মাঝে, কাজের ছেলে-মেয়ে, নিজ বাড়ীতে ভাড়াটে ও প্রতিবেশীদের মধ্যে দৃষ্টি সংযত ও পর্দার প্রয়োজনবোধ করা হয় না। এই দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার, পর্দাহীনতা ও নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণের কারণে আজ সমাজে ইভটিজিং, ধর্ষণ, ব্যভিচার, বিবাহ বহির্ভূত যুবক-যুবতী মধ্যে ব্যাপকভাবে অবৈধ প্রেম ও পরকীয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারণে পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহ ছাড়াও নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মত মারাত্মক ঘটনা অহরহ ঘটছে। এভাবে বেহায়াপনা ও পর্দার বিধান অমান্য করার নানা পার্থিব অনিষ্টতা আজ সবার নিকট সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন-[১]

> يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ-
>
> হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না।

আজকাল অনেক সমাজে দেখা যায় যে, সাধারণত পুরুষরা পোষাক দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত রাখে আর নারীরা অশালীন সংক্ষিপ্ত পোষাক পরিধান করে এবং শরীরের অনেকাংশই অনাবৃত রাখে। সেখানে পুরুষের পোষাক নারী পরিধান এবং পুরুষরাও নারীর ভূষণ গ্রহণ করে। পাতলা অশালীন পোষাক পরিধান করে জনসম্মুখে চলাফেরা, পর্দাহীনতা ও নির্লজ্জতার ব্যাপারে সতর্ক করে নাবী সা. বলেন–

> দু'শ্রেণী দোযখের অধিবাসী হবে, যাদের আমি দেখিনি। একশ্রেণী হল, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় দড়ি থাকবে, তা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহর করবে। অন্য শ্রেণী হল, ঐ নারী, যারা পাতলা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ প্রায়, মানুষকে (নিজের দিকে)

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ২৭।

আকৃষ্টকারিণী, নিজেরাও পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের মাথা উটের ঝুঁকে পড়া কুহানের ন্যায় খাড়া ও খানিক হেলে পড়া। এরা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।[১]

দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, দৃষ্টি শয়তানী তীর সমূহের মধ্যে একটি তীর।[২] দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার, কুদৃষ্টি ও পর্দাহীনতার অকল্যাণকারিতা ব্যাপক। কেননা দৃষ্টিই হয় যৌন লালসা উদ্বোধক, বার্তাবাহক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌন অঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সবকিছুর মূল কারণ। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়,আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে,আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে, বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে।বাস্তবে যখন কোন বাধাই থাকে না,তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোন উপায় থাকে না।[৩]

আজকাল সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বৃদ্ধি পেয়েছে। যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, মেয়েদের অশালীন বিজ্ঞাপন, অবৈধ প্রেম ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদিকে আজ অনেক মানুষ হারাম মনে করে না, বরং এ সব আজ অনেকের কাছে ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। আজকাল সমাজে ছেলে-মেয়ের একসাথে একাকী সময় কাটানো, পার্কে বসে আলাপ, প্রেমিকা বা হবু বধুকে নিয়ে নির্জনে চলে যাওয়া ইত্যাদি অহরহ ঘটছে। যুব সমাজের একটি অংশ অনৈতিকভাবে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করছে। সহশিক্ষা ব্যবস্থায় ছেলে-মেয়েদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ছাড়াও অনেক যুবক-যুবতী মানসিক প্রশান্তির জন্য ফেসবুক, ইন্টারনেট ও মোবাইলে এক ধরনের বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করছে ইত্যাদি সবই নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে। এদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ মহান আল্লাহ বলে[৪]ন–وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ "সীমালংঘনকারীগণ যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেত তারই অনুসরণ করত এবং তারা ছিল অপরাধী।"

অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা আজ অমুসলিম ও মুসলিম নির্বিশেষে সকল দেশ ও সমাজকে ভয়ানকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশ ও সমাজে ব্যভিচার, ধর্ষণসহ উদ্বেগজনকভাবে নারী নির্যাতন বেড়ে গেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এসব অনাচার রোধকল্পে ইসলাম সর্বপ্রকার অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَإِذَافَعَلُواْفَاحِشَةً قَالُواْوَجَدْنَاعَلَيْهَاآبَاءنَاوَاللّهُ أَمَرَنَابِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَيَأْمُرُبِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَالاَ تَعْلَمُون "আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপরুষদেরকে এরূপ করতে পেয়েছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'। বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না'?"

এ ধরণের অশ্লীলতার জন্য অভিভাবকরাও অনেকাংশে দায়ী। কেননা পরিবারে সন্তানদের উত্তম নৈতিক শিক্ষা ও পর্দার বিধান দিলে এরূপ অনৈতিকতার বিস্তার ঘটত না। এ ব্যাপারে সতর্ক করে করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৬], 'তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। ক. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, খ. পুরুষের বেশ ধারণকারিণী মহিলা, গ. দাইউস, যে তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতা মেনে নেয় এমন পুরুষ'।

আজকাল নারীরা সৌন্দর্য প্রকাশ করে সুগন্ধি লাগিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তারা সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের হয়ে পরপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাদের মনে কুচিন্তার উদয় করে। তাই নাবী সা. বলেছেন[৭], "যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে মানুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তারা সুঘ্রাণ পায় সে একজন ব্যভিচারিণী।" এ হাদীসে সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় গমনকারিণী নারীকে ব্যভিচারিণী বলা হয়েছে, কেননা সে মানুষের মনে কুকামনা-বাসনা সৃষ্টি করে।

❑. অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন :

অপসাংস্কৃতিক সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে এর ধারণা দিতে গিয়ে চিন্তাবিদ জহুরী বলেন–শৃংখলার বিপরীত যেমন উচ্ছৃংখলতা, আদবের বিপরীত যেমন বে-আদবী, আইনের বিপরীত যেমন বে-আইনী, সুস্থ চিন্তার বিপরীত যেমন বিভ্রান্তি আর সভ্যতার বিপরীত যেমন বর্বরতা, তেমনি সংস্কৃতির বিপরীত যা কিছু আছে, সবই অপসংস্কৃতি। বিভ্রান্ত চিন্তার উদভ্রান্ত খেয়ালের ইবলিসী প্রোগ্রামের বাস্তব অনুশীলনকে উজ্জীবিত করে যে রং রসের তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়, সেই তরঙ্গের বিভিন্নমুখী প্রকাশের অবস্থাকে অপসংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত করা যায়।[৮]

---

১. মূল আরবী [صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাত, হাদীস নং ২১২৮।

২. আবুল কাসেম তাবারানী,*আল-মু'জামুল কাবীর* (ইরাক, আল-মাওসুল:মাতবুআতুল ইলমি ওয়াল হিকমি, ২য় সং.১৪০৪হি.) খ.১০,পৃ.১৭৩, বাবুল 'আইন, হা. নং ১০৩৬২।

৩. দেখুন, ইবনুল কাইয়িম, *আল-জাওয়াবুল কাফী*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫হি.) খ. ০২, পৃ. ১৮৩।

৪. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ১১৬।

৫.আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ২৮।

৬.মূল আরবী [ثلاثة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২৫৬২।

৭.মূল আরবী [أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুয যিনাত, হাদীস নং ৫১২৬।

৮ জহুরী, *অপসাংস্কৃতির বিভীষিকা* (ঢাকা : উত্‌লু প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ.২১।

সংস্কৃতি হল একটি সমাজের নীতিবোধের ও ইতিবাচক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। অপসংস্কৃতি হল তার ঠিক বিপরীত। অপসংস্কৃতির মানুষকে নৈতিক দেউলিয়াপনার দিকে নিয়ে যায়। এর মাধ্যমে সমাজে নেতিবাচক মূল্যবোধ প্রকাশ পায়, যে মূল্যবোধের উৎস হল অশুভ, অসুন্দর এবং অসত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ। যে সমাজে নানা প্রকার স্থূল দৈহিক বা মানসিক সুখভোগের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই অনুরাগ প্রদর্শিত হয় সেই সমাজ যে নৈতিক সংকটে নিমজ্জিত হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি ও বিনোদনের উপাদান এরই প্রমাণ বহন করছে।

বর্তমান পৃথিবীতে বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে–টেলিভিশন, রেডিও, চলচিত্র, সংগীত, নাটক, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি। বিনোদনের এসব মাধ্যম অশ্লীলতায় ভরপুর। ডিস এন্টিনা, স্যাটালইট টি ভি চ্যানেল ও ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহার অশ্লীলতাকে আরও ব্যাপকতর করেছে। বিনোদন নামে যুবক-কিশোরদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা নাটক, গান, সিনেমা, ইউটিউব, ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে যুবসমাজকে ধ্বংসে ডিস এন্টিনা, স্যাটালইট টি ভি চ্যানেল, ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা অত্যধিক। বিনোদনের নামে চলছে স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট ও ফেসবুকের মাধ্যমে অশ্লীল দৃশ্য, অশ্লীল নাচ-গান, যৌন আবেদনময়ী চলচিত্র, অর্ধনগ্ন, নগ্ন নারী দেহের অবাধ প্রদর্শনী, যৌন উত্তেজন বিভিন্ন দৃশ্য, যুগল বন্দীনৃত্য, ওপেন কনসার্ট, উগ্র সংক্ষিপ্ত পোষাক, ফ্যাশান শো, অশালীন বিজ্ঞাপন, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, সমুদ্র সৈকতে উলঙ্গপনা, ভ্যালেন্টাইন ডে থার্টি ফার্স্ট নাইট, নববর্ষ উদযাপন ইত্যাদি জঘন্য রকমের বেহায়াপনা। এ সব বিজাতীয় অশ্লীল সংস্কৃতির অনুসরণ কারণে আমাদের নৈতিক অধঃপতন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এ সব অশ্লীলতা ও মন্দ কর্ম ইসলামে অনুমোদন যোগ্য নয়। কুরআনে বলেছে-وَلاَ تَقْرَبُواْالْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ[১] - "আর অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না– তা প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক।"

যৌন উত্তেজক ও নগ্নতামূলক এই অপসংস্কৃতির ছোবলে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে আমাদের বিশ্বাস, চেতনা, চিন্তা, বুদ্ধি-বিবেক, পরিবার, ঐতিহ্য, জীবন-আচরণ, সমাজ ও সভ্যতা। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিশ এন্টিনার সাহায্যে পাশ্চাত্যের ধর্মবিমুখ, আল্লাহদ্রোহী ও ভোগবাদী জীবনের সকল অনুষঙ্গই আজ মুসলিমদের অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে। মুসলিম সমাজে মূল্যবোধ ধ্বংস করার মানসে পাশ্চাত্য ও অমুসলিমরা অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে এই অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। পারিবারিক বন্ধন আজ শিথিল হয়ে আসছে। বৈবাহিক পবিত্র দাম্পত্য জীবন বন্দী জীবন মনে হচ্ছে। সর্বত্র অবাধ যৌনাচারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের যুবক-যুবতীরা নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত পাশ্চাত্য উগ্র ও নগ্ন সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কোথাও নগ্ন-যৌনতার বিপক্ষে কথা উঠলে তাকে প্রগতি বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী বলে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে। প্রিন্টমিডিয়া, গণমাধ্যম, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, চলচিত্র, সাইবার ক্যাপ, ইন্টারনেট ইত্যাদি এই আগ্রাসনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চরিত্র বিধ্বংসী অপসংস্কৃতির এ ব্যাপকতা নৈতিক সংকটের জন্য দায়ী।

অপসংস্কৃতির মাধ্যমে অশ্লীলতার বিস্তারের ফলে সমাজে ধর্ষণ, ব্যভিচার, পরকীয়া, বহুগামীতা, সমকাম, পতিতাবৃত্তি, বিকৃত যৌনাচার, লিব টুগেদার,বিবাহ বিচ্ছেদ, স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব, এসিড নিক্ষেপ ও নারী-শিশুদের পাষবিক নির্যাতন আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে। এসব বিজাতীয় অপসংস্কৃতি যুবচরিত্রকে ধ্বংস করছে। এগুলোর ব্যাপক অনুপ্রবেশ আমাদের দ্রুত চরম নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করছে। নৈতিক ও সমাজিক মূল্যবোধকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এসব অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি কর্মকাণ্ড মানব জাতিকে আজ পশুত্বের দিকে ধাবিত করছে। এছাড়াও চলচিত্রে অপরাধীদের বহুবিদ অপকৌশল প্রদর্শনীর ফলে খুন, ছিনতাই, অপহরণ, সন্ত্রাস ইত্যাদিও বেড়ে যাচ্ছে। বিধ্বংসী অপসংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি বিষাক্ত কার্বন নির্গমন, মাদক চোরাচালান এবং পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে কম বিপদজনক নয়। এসব অশ্লীলতা সম্পূর্ণ দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে এবং এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[২]– (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوالَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون) যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৩]–"যে কোন জিনিসকে অশ্লীলতা কলুষিত করে আর লজ্জাশীলতা যে কোন জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।" তিনি আরও বলেন[৪], নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা যুল্‌মের অঙ্গ, আর যুল্‌মের (যালিমের) স্থান দোযখে।"

কুরআন মানুষকে অশ্লীল ও কটু কথা বলতে নিষেধ করে, এটা ইসলামী নৈতিকতার বিশেষ দিক। কিন্তু আজকাল চিত্ত বিনোদনের নামে ব্যাপকভাবে যৌন আবেদনময়ী গান-বাজনা প্রচলিত আছে। এসব গান-বাজনা, নৃত্য, মারামারি ও আজগুবি কাহিনীতে ভরপুর। এসব অনুষ্ঠানগুলি শিশু-কিশোর ও যুবকদের চরিত্র বিনষ্ট করছে এবং তাদের ভবিষ্যত জীবনকে ধ্বংস করছে। সমাজ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সিনেমাগুলো আজ অশ্লীলতায় ভরপুর। দর্শকেরা সিনেমার বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী ও গান নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে। এতে করে তাদের ঈমান-বিশ্বাসে বিকৃতি তৈরী হয়,

---

[১] . আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : আয়াত ১৫১।
[২]. আল-কুরআন,সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ১৯।
[৩]. মূল আরবী [ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৭৪|
[৪].মূল আরবী [الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০০৯।

লজ্জা-শরম দূর হয়ে যায় এবং মেধা ও বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয়ে যায়। এই বিকৃত বিনোদন তাদের উপলব্ধি ক্ষমতাও নস্যাৎ করে দিচ্ছে। ফলে বর্তমানে গণমাধ্যম আমাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[১]

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِين- وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ -

আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা আল্লাহ প্রদর্শিত পথকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দু' কানে যেন বধিরতা; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

এখানে 'লাহওয়াল হাদীস' বা বেহুদা কথা বলে গান–বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে বুঝানো হয়েছে। নীতি ও নৈতিকতাহীন যাবতীয় প্রচারণাও এর অন্তর্ভুক্ত। বেশীর ভাগ তাফসীরগণ 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে গানকে বুঝিয়েছেন।

গান-বাজনা শয়তানের হাতিয়ার। গান-বাজনা গায়িকা ও শ্রোতার অন্তরে মদের নেশার মতই এক ধরনের নেশা সৃষ্টি করে, যা গায়ক ও শ্রোতাকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। শ্রুতিমধুর নারী কণ্ঠের আবেদনময়ী গান অন্তরে এমন রোগ সৃষ্টি করে যা নিলর্জ্জতা ও বেহায়াপনায় উৎসাহিত করে। এই গানের সাথে মন-মাতানো সুর বুদ্ধি-বিবেকের বিভ্রম ঘটায়। গান-বাজনা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত, যিকর ও দ্বীনি কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এতে আসক্ত মানুষ শয়তানের হাতের খেলনায় পরিণত হয়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[২]- وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর।" এ আয়াত গানকে শয়তানের কণ্ঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

গান-বাজনা ব্যভিচারের রাস্তা স্বরূপ। কেননা অধিকাংশ গানের মধ্যে অশ্লীলতা থাকে। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে রেডিও, টেলিভিশন বা কোন উৎসবের বেশীর ভাগ গান বিবাহ বহির্ভূত প্রেম, পরকীয়া বা প্রেমিকার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার উপর রচিত, তা গেয়ে থাকে পাপাচারী নির্লজ্জ শিল্পীরা, যা যুবক-যুবতীদের মনে কুকামনা-বাসনাকে জাগিয়ে তোলে, তাদের অশ্লীল কাজ ও ব্যভিচার উদ্বুদ্ধ করে। তাই কনসার্ট বা গানের মজলিসে অনেক অশ্লীল কাজ হতে দেখা যায়। গান-বাজনা গায়িকা, শ্রোতা ও গানের জলসায় গমনকারীর অন্তরকে অসুস্থ করে দেয়, আর রোগগ্রস্ত অন্তরকে তা অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হয়। নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা নির্লজ্জ হয়ে যায়। যার ফলে আশ্লীল কাজ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এজন্য ফুদাইল ইবন ইয়ায (রহ.) বলেন, "গান-বাজনা ব্যভিচারের বাহক"।[৩] ইয়াযিদ ইবন ওয়ালিদ বলেন, "সাবধান ! তোমরা গান বাদ্য থেকে দূরে থাকবে। কেননা, গান মানুষের লজ্জাশীলতা কমিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির কু-তাড়না বাড়িয়ে দেয়, এটা ভদ্রতা বিনষ্ট করে ...নিশ্চয় এটা ব্যভিচারের আহবায়ক।"[৪]

বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা এমন পাপচার, যা অন্তরের নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতাকে নষ্ট করে তাকে কলুষিত করে, আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বাঁধা সৃষ্টি করে, কুরআন শ্রবণ ও উপলব্ধি কঠিন হয়ে পড়ে, সালাতসহ বিভিন্ন ইবাদত ও পূণ্যের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাদ্যযন্ত্র, গান-বাজনা ও সুর ও সঙ্গীত যদি এত ক্ষতিকর হয় তবে অন্যান্য বিষয়গুলো কত ভয়ানক ক্ষতিকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। গান-বাজনার নামে প্রচুর আর্থিক অপব্যয় হয়। এজন্য আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বলেন–'গান, সুরও সঙ্গীত অন্তরে মুনাফিকীর চারা অংকুরিত করে, যেমন পানি তৃণ ও উদ্ভিদ অংকুরিত করে।' গান-বাজনার আরও নানা অপকারিতা রয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৫], এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধ্বস, মানুষের আকৃতি বিকৃতি এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র আযাব অবতীর্ণ হবে। তখন জনৈক মুসলিম বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! সেটা কখন? রাসূল (সা.) বললেন, যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবং মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে'।

আজকের সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও বিনোদনের মূল উপাদান হচ্ছে যৌনতা। এসব সাহিত্যে মিথ্যাচার, অনৈতিক উস্কানি, নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক গড়ার উৎসাহ ও অশ্লীলতা ছড়াছড়ি। এসব নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের মুখ্য উপাদান এবং মানুষকে পশুত্বের দিকে ধাবিত করে। এসব মানব জাতির জন্য বড় ধরণের বিপর্যয় ও অধঃপতনের কারণ। এ ধরণের প্রবৃত্তিপূজারী কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর নিন্দা করে তাদের বর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে[৬]- وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ "আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর নিশ্চয় তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না।"

আজকাল এমন কিছু লোক দেখা যায় যারা ছেলে না মেয়ে বুঝা মুশকিল। অনেক ছেলে হাতে বালা, কানে দুল, হাতে চুড়ি, গলায় চেন দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল রেখে চলে। অপরদিকে মেয়েরা ফতুয়া, গেঞ্জি, টি-শার্ট, প্যান্ট ও স্কার্ট ইত্যাদি

১.আল-কুরআন,সূরা লুক্‌মান ৩১: আয়াত ৬-৭।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা': আয়াত ৬২-৬৪।

৩. মূল আরবী [الغناء رقية الزنى] ইমাম আল-বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ.০৪, পৃ.২৮০, রিওয়ায়েত নং ৫১০৮।

৪. মূল আরবী [إياكم و الغناء فإنه ينقص الحياء و يزيد في الشهوة و يهدم المروءة....إن الغناء داعية الزنى] *প্রাগুক্ত*, খ.০৪, পৃ.২৮০, রিওয়ায়েত নং ৫১০৮।

৫.মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال إذا ظهرت القينات والمعارف وشربت الخمور] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২২১২।

৬. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা ২৬:২২৪-২২৬।

অশালীন জামা-কাপড় পরিধান করে। কৃত্রিমভাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ সব অনৈতিক ও গর্হিত। পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির অন্ধানুসরণ আমাদেরকে এই মূর্খতায় নিমজ্জিত করছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করতে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১] রাসূলুল্লাহ সা. উল্‌কি উৎকীর্ণকারী, উল্‌কি গ্রহণকারী, ভ্রূ উত্তোলনকারী, দাঁত চিকনকারী ও পরচুলা ব্যবহারকারী এবং এই পেশায় নিযুক্তদের উপর লা'নত করেছেন।[২] এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সা. নারীর বেশধারণকারী পুরুষকে এবং পুরুষের বেশধারণকারী নারীকে লা'নত করেছেন।[৩] রাসূল সা. পরচুলা ব্যবহারকারিণী, তা প্রস্তুতকারিণী, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায় তাদের সকলকে লা'নত করেছেন।[৪] আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন–যে সব নারী উল্কি আঁকে আর যারা একে দেয়, সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী এবং চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধনকারীদের আল্লাহ লা'নত করেছেন।[৫]

অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অশ্লীলতার প্রসারের কারণ : ক. মিডিয়ায় অপসংস্কৃতি ও গান-বাজনা ব্যাপকভাবে চর্চা। খ.ডিস এন্টিনা ও ইন্টারনেটের অবাধ অপব্যবহারের সুযোগ। গ.মানুষের ধর্মহীনতা ও নৈতিক অধঃপতন। ঘ.পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সয়লাব।

প্রতিকারে করণীয়: ক. ডিস এন্টিনা ও সর্বব্যাপী ইন্টারনেটের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। খ. তথ্য-প্রযুক্তির অনৈতিক ব্যবহার রোধে আইন। গ.বিশ্বসংবাদ ও গণমাধ্যমের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করা।

❑.বিবাহ বহির্ভূত ছেলে-মেয়ের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া ও লিভ টু গেদার:

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম বা পরকীয়া এক ধরনের মোহ, নেশা, ধোঁকা ও অনৈতিক আবেগ। তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া প্রেম[৬] ও লিভ টুগেদার[৭] ইত্যাদি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এক বিষাক্ত শাখা। এই বিজাতীয় অপসংস্কৃতি বিভিন্ন কারণে আজ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় মুসলিম সমাজের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীর মধ্যে ভয়ানকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এমনকি আজ অনেকে এ ধরনের প্রেম-ভালবাসা পবিত্র বলে থাকেন, অথচ বিবাহের পূর্বে এ ধরনের সম্পর্ক সম্পূর্ণ অনৈতিক। এটা ইসলামী মূল্যবোধ ও পর্দা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে এবং সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ প্রেম-ভালবাসা ব্যভিচারের অংশ বিশেষ।[৮] কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রেম-ভালবাসা চূড়ান্তভাবে নির্লজ্জতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে এবং যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন কোন পুরুষ কোন মহিলার সঙ্গে নিভৃতে মিলিত হয়, তখন তৃতীয়জন হিসাবে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয়'।[৯] আর শয়তান তাদের মনের কু-কামনা-বাসনা জাগ্রত করে দেয়। ফলে তা লজ্জাকর পরিস্থিতি বা অশ্লীলতার উদ্ভব ঘটায়। আজ এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে বর্তমানে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে দৈহিক সম্পর্ক ও ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। এর ফলে অনেকে অবৈধভাবে গর্ভধারণ করে অন্যায়ভাবে গর্ভপাত করছে। এতে তারা নিজের গুনাহগার হয়, তেমনি যে সব অভিভাবক এ ধরনের মেশার সুযোগ দেয়া তারাও দাইয়ুস তথা মহাপাপী গণ্য হবে। এসব অবৈধ সম্পর্ক ও অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন-[১০] وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ "প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না।"

বিবাহ বহির্ভূত প্রেম বা পরকীয়া বিভিন্ন ধরনের অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও অপরাধের জন্ম হয়। বিশেষ করে প্রেমের ব্যর্থতার কারণে হতাশ হয়ে অনেক যুবক-যুবতী লেখা-পড়া, সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট করছে, অনেকে মাদকাসক্ত, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, হত্যা, আত্মহত্যা, চিরকুমারত্ব বরণ, সন্ত্রাস ইত্যাদি নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এটা অনেক ছেলে-মেয়ের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে। অনেক সময় অভিভাবকের অসম্মতির কারণে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে পরিবারের মর্যাদা হানি করে। অসম প্রেমের ক্ষেত্রে জীবন বাস্তবতার মুহূর্তে প্রেমের আবেগ ছুটে গেলে জীবন চরম দুর্বিষহ হয়ে উঠে, এমনকি বিচ্ছেদও ঘটে যায়। আর পরকীয়ার ক্ষেত্রে পারিবারিক অশান্তি, দাম্পত্য কলহ, সাজানো সংসার ভাঙ্গন ছাড়াও অনেক সময় এ কারণে প্রায়ই হত্যাকাণ্ড ঘটতেও দেখা যায়। পরকীয়াকারীর সন্তানেরাও এ কারণে চরম দুর্ভোগের স্বীকার হন। আর লিভ টুগেদার– তো মারাত্মক জঘন্য বিষয়। এতে বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হয়, পাবিরারিক জীবনকে উপেক্ষা করা হয়, সন্তানের বংশ পরিচয়ে কালিমা লেপন করা হয়। তাই এ গর্হিত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-"যে ব্যক্তি ধোঁকা দিয়ে কারো স্ত্রী বা দাসীর চরিত্র নষ্ট করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়।"[১১]

---

[১].মূল আরবী [من تشبه بقوم فهو منهم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৪০৩১।

[২]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৫৫৯৮ও ৫৫৯৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ২১২৪।

[৩].মূল আরবী [لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল লিবাস, হা. ৫৫৪৬, *আবূ দাউদ*, হা. ৪০৯৭।

[৪].মূল আরবী [لعن النبي صلى الله عليه و سلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল লিবাস,হা.নং ৫৬০৩, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস, হা.২১২৪।

[৫].**মূল আরবী** [لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, হা.নং ৪৬০৪, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস, হা.২১২৫।

[৬]. পরকীয়া হল–কোন বিবাহিত নারী বা পুরুষ নিজ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়াও অন্য পুরুষ বা নারীর সাথে অন্তরঙ্গ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে বুঝায়।

[৭]. পারিবারিক জীবনের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে বিবাহ বহির্ভূত অনৈতিকভাবে নারী-পুরুষের অবাধ একত্রে বসবাস ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনই লিভ টুগেদার।

[৮]. রাসূল সা. বলেন– চোখের যিনা হচ্ছে দৃষ্টি। কানের যিনা হচ্ছে-এ সংক্রান্ত শ্রবণ। মুখের যিনা হচ্ছে–এ সংক্রান্ত কথাবার্তা। হাতের যিনা হচ্ছে হস্ত সম্প্রসারণ। পায়ের যিনা হচ্ছে–পদক্ষেপ। মন আকাংখা ও বাসনা করে আর যৌনাংগ তা সত্য কিংবা মিথ্যায় পরিণত করে। (*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কদর, হা.২৬৫৭)

[৯].মূল আরবী[لا يخلون رجلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল রিদা'আ, হা.নং ১১৭১, মুসনাদ আহামাদ, খ.০১, পৃ.২৬, হা.১৭৭।

[১০]. আল-কুরআন,সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫২।

[১১].মূল আরবী [من خبب زوجة امرىء أو مملوكه فليس منا] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫১৭০।

বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়ার কারণ: নারী-পুরুষের সহশিক্ষা, সহকর্মস্থল, পর্দাহীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ যোগাযোগ, মোবাইল ফোন, ইন্টরনেটে বন্ধুত্ব, স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি বা প্রবাস, দাম্পত্য কলহ, বিলম্বে বিবাহ, অপসংস্কৃতির কুপ্রভাব, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নাটক, সিনেমা, গান ও উপন্যাসে এ সম্পর্কে উৎসাহ দান।

প্রতিরোধে করণীয়: ইসলামী শরয়ী পর্দা চালু, অপসংস্কৃতির রোধ, সুস্থ ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিকধারা গড়ে তোলা, ছেলে-মেয়েদের আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের আলাদা কর্মক্ষেত্র, প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের দ্রুত বিবাহ সম্পাদন, স্বামীর দীর্ঘ প্রবাসে না থাকা, স্ত্রীকে সময় দেয়া।

❑. নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতা:

নারী স্বাধীনতা কথাটি ভালো, কিন্তু একশ্রেণীর দূরাচারী অসৎ মতলব সাধনের জন্য স্বাধীনতা ও প্রগতির কথা বলে নারীদের এমন সব লাঞ্ছনাকর কর্মকাণ্ডের দিকে প্রলুব্ধ করছে, যা তাদের জন্য সম্মানজনক নয়। আর নারীদের একটি শ্রেণী না বুঝেই সে পথে পা বাড়িয়েছে। ফলে নারী স্বাধীনতা ও তথাকথিত নারী প্রগতির নামে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশ ও সমাজে নারীরা বিভিন্ন উচ্ছৃঙ্খলতায় জড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য নারীরা স্বাধীনতার নামে আজ নারীরা উলঙ্গপনা, নগ্নতা ও অশ্লীলতায় মেতে উঠেছে। তথাকথিত প্রগতির নামে পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে নারীরা সংক্ষিপ্ত অশালীন পোষাক পরিধান করে দৈহিক রুপ-লাবণ্য ও নগ্নতা প্রদর্শন করছে। নারী-পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার ফলে নৈতিক বন্ধন শিথিল গেছে। পাশ্চত্য-প্রাচ্য সর্বত্র আজ অশ্লীলতার সয়লাবে মানব জাতি নৈতিক অধঃপতনের প্রান্তিক সীমায় পৌঁছেছে। পাশ্চাত্য সমাজ তো বহুপূর্বেই অবাধ যৌনাচারের অনুমোদন দিয়েছে। কথিত এই নারী প্রগতির ফলে সমাজে ব্যাপকভাবে নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। ভবিষ্যত নারীদের এই দুরবস্থা অনুধাবন করতে পেরে পূর্বেই সর্বকালের সেরা দূরদর্শী মহামানব রাসূল সা. বলে গেছেন, *"আমার পরে পুরুষের জন্য নারী অপেক্ষা বড় কোন ফিতনা রেখে গেলাম না।"*[১]

নারীদের এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ইসলামের নিকট আসতে হবে। কেননা অবহেলিত ও বঞ্চিত নারী জাতিকে ইসলামই সর্বপ্রথম সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত সেই সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ। এর বাইরে নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে আজ যা বলা ও করা হচ্ছে– তা নারীদের জন্য অসম্মান ও লাঞ্ছনাই বয়ে আনবে। তবে ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কোন পুরুষ যদি নারীদের প্রতি অন্যায় বা বৈষম্য করে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

সৃষ্টিগত দৈহিক ও মানসিক কারণে অধিকাংশ নারীর পক্ষে পুরুষের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষরা শ্রেষ্ঠ, যা নারীদের পক্ষে অর্জন সম্ভব নয়। সে কারণে নারীদের উচিত সেসব ক্ষেত্রে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া। মহান আল্লাহ বলেন[২] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"

আজকের নারী স্বাধীনতা ও তথাকথিত নারী প্রগতির নামে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল নর-নারী সমাজকে অশ্লীলতা এবং ইসলামের পথ থেকে বিপথগামী করার কাজ করছে। এ ব্যাপারে তাদের বিভ্রান্তি থেকে ফিরে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা উচিত। তাদের মহান আল্লাহ এই বাণী বুঝা উচিত যে,–"আর নিশ্চয় তারাই (শয়তান) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[৩]

অশালীনতা, নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতা কারণ: ক.অপসাংস্কৃতিক ব্যাপক আগ্রাসন এবং তার অনুসরণ, খ.ছেলে-মেয়েদের সহশিক্ষা, নারী-পুরুষের সহকর্মস্থল, গ.পর্দার বিধান উপেক্ষা, ঘ.পাশ্চাত্য ও অমুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির কুপ্রভাব।

প্রতিরোধে করণীয়: ক. দৃষ্টিশক্তি হেফাযত করা। পর্দার বিধান পালন করা। খ. শালীন কাপড়ে মেয়েদের শরীর ভালোভাবে আবৃত করা। গ. অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের গৃহে প্রবেশ করা। ঘ.নারী-পুরুষের আলাদা শিক্ষা ও কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা।

❑. পর্ণোগ্রাফি / নীল ছবি:

সাধারণত পর্ণোগ্রাফি বলতে ঐ সকল সাহিত্যকর্ম, চলচিত্র, পেইন্টিং ও ফটোগ্রাফিকে বুঝায় যেগুলো নোংরা ও অশ্লীল এবং যেগুলো মানুষের মনে প্রবল পাশবিক কামনা বাসনার সৃষ্টি করে।[৪]

পর্ণোগ্রাফি চরম নিকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা জঘন্য ধরনের অশ্লীলতা। পর্ণোগ্রাফি মানুষকে স্বাভাবিক জীবনের পথ থেকে নৈতিক অধঃপতনের চরম পর্যায়ে দিকে ঠেলে দেয়। পর্ণোগ্রাফি মানুষকে ভয়ানক রকমের অভদ্র ও অশালীন করে তুলতে বাধ্য করে। এটা মানব মনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং মানুষকে চরম লজ্জাহীন করে তোলে। আর লজ্জাহীন মানুষ

---

[১].মূল আরবী [ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত নিকাহ, হা.নং ৪৮০৮, *মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ, হা.২৭৪০।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৪।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৩৭।

[৪] এ এস. এম আবদুল খালেক, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা* (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৯,) পৃ.৩৯৩।

যে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে। পর্ণোগ্রাফির উপকরণগুলো মানব জীবনকে দুশ্চরিত্রের অধিকারী পশুরুপী মানুষে রুপান্তরিত করতে উৎসাহিত করে। এটি মানুষের স্বাভাবিক মানবোচিত গুণাবলী ও বিবেককে মারাত্মকভাবে বিকৃত করে মানুষের মনে রুচি বিবর্জিত প্রবল পাশবিক কামনা-বাসনার জাগ্রত করে। সেই পাশবিক চাহিদা পুরণের কুচিন্তা সর্বদা মানুষকে অশ্লীল ও অনৈতিক কর্ম উসকে দেয়। বিশেষ করে কোমলমতি কিশোর-কিশোরীদের সুকুমার বৃত্তি বিকাশের পরিবর্তে তাদের অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেয়। এটা সমাজে ধর্ষণ, ইভটিজিং, ব্যভিচারসহ নানা অপরাধ ও অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম দেয়। অধিকন্তু, এটা মানুষের চরিত্র নষ্টের অতি মারাত্মক অস্ত্র। এই অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয় ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন-[১] قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ -"বল, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা।"

আজকাল ইন্টারনেট, ব্লু-ফিল্ম ও বিভিন্ন সিনেমা-নাটকে এমন সব অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শন করা হয় যা কুরুচিপূর্ণ। এসব দৃশ্য যারা দেখে তাদের অন্তর কলুষিত হয় এবং তাদের চোখ ও অন্তরের ব্যভিচার হয়। অধিকন্তু, এটি একটি অতি গর্হিত কাজ। দৃষ্টিশক্তির এরূপ অপব্যবহার কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে কুরআনে বলা হয়েছে[২] –يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ-"চোখের অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।"

বর্ণিত হয়েছে[৩], 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত তার ভাইয়ের সতর(গোপন অঙ্গ) এর প্রতি তাকাবে তার চল্লিশ রাতের সালাত কবুল হবে না।' কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতরের প্রতি তাকালে যদি এরূপ শক্ত পাপ হয় তবে আজকাল ইন্টারনেটে, ইউটিউবে ঘন্টার পর ঘন্টা যারা পর্ণোগ্রাফি, ব্লু-ফিল্ম ও অশ্লীল ছবি দেখেন তাদের কত ভয়ানক রকমের পাপ হয় এবং কি পরিমান সাওয়াব বা পূণ্য নষ্ট হয় তা একটু চিন্তা করলে সহজেই অনুমান করা যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সা. ভাষণে ইরশাদ করেন[৪] –

> হে মুহাজিরীন[৫] দল, পাঁচটি অভ্যাসের ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই, সেগুলো যেন তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি না হয়। তার একটি হল– অশ্লীলতা। কোন জাতির মধ্যে যখন অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ ও মহামারীর মত এমন নতুন নতুন ব্যাধি চাপিয়ে দেয়া হয়, যা তাদের পূর্বপুরুষরা কখনও শুনেনি। ...

এই হাদীসের সত্যতায় বলা যায় যে, আজ এইডসের মত যে মরণ ব্যাধির জন্ম নিয়েছে তার উৎস অবাধ যৌনাচার ও অশ্লীলতা।

....

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। এই বিষয়াবলী মানুষকে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনৈতিক পথে ধাবিত করছে। তাই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবৈধ ও অনৈতিক উপার্জন ও ভোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষকে উল্লেখিত মন্দ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

৩.২.৬ আকীদাহ-বিশ্বাসগত পদস্খলন এবং ধর্মীয় অনাচার:

আকীদা-বিশ্বাস মানব জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক আকীদা-বিশ্বাস মানব জীবনে যেমন কল্যাণকর তেমনি মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক। আবার ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস যেমন ক্ষতিকর তেমনি নৈতিক অধঃপতনের উপলক্ষ। বিশেষ করে আকীদা-বিশ্বাসগত ত্রুটি থাকলে ব্যক্তির পক্ষে পরিপূর্ণ মূল্যবোধের অধিকারী হওয়া যায় না। অধিকন্তু, এটা মানুষের জীবনকে ধ্বংস ও অনৈতিকতার দিকে নিয়ে যায়। এটা মানুষের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে মানুষ দুনিয়া-আখিরাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিম্নে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ের একটি বর্ণনা তুলে ধরা হলো:

❑.আকীদাহ-বিশ্বাসগত দীনতা ও বিভ্রান্তি এবং দ্বীনি ব্যাপারে গাফিলতি:

আকীদাহ 'আকদ ধাতু থেকে নির্গত। 'আকদ শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ– দৃঢ়করণ, শক্তভাবে বন্ধন করা, নির্ভর করা। আকীদাহ শব্দটি পরবর্তীতে 'ধর্ম বিশ্বাস' অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। আকীদা শব্দটি একবচন, এর বহুবচন আকায়েদ।

---

[১] .আল-কুরআন,সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৩৩।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ১৯।

[৩]. মূল আরবী [من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة] *কানজুল উম্মাল*, খ.০৫,পৃ.৪৮৪, হা. নং ১৩০৭৮।

[৪] .মূল আরবী[يامعشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط . حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৪০১৯।

[৫] . মুহাজিরীন শব্দটি মুহাজির শব্দের বহুবচন, যার অর্থ দেশত্যাগী। রাসূল সা. এর নবুয়্যত লাভের পর মক্কার কাফির কর্তৃক মুসলিমদের উপর নির্যাতন চরমভাবে বৃদ্ধি পেলে যে সব মুসলিম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তারাই মুহাজির।

আকীদা শব্দের পরিভাষিক অর্থ সম্পর্কে আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাইউমী (মৃ.৭৭০ হি.) বলেন–"মানুষ ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে আকীদা বলা হয়।"[১]

আকীদা-বিশ্বাস মানুষের চালিকা শক্তি। এটা মানুষের জীবন ও কর্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি যদি হয় সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় হয় তবে তা মানুষের জন্য মুক্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে, বিশ্বাসের ভিত্তি যদি হয় দুর্বল, নড়বড়ে ও অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে বিশ্বাস মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণ দিতে পারে না। বরং ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বাস মানুষকে শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির দিতে ধাবিত করে। আকীদাগত পদস্খলন ও বিকৃতি মানুষের গোটা জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এটা মানুষের নৈতিক ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। ফলে এ শ্রেণীর মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে সত্যের উপর অটল থাকতে পারে না। পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করলে দ্বীন পালন করে, আর কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তারা বাতিলের দিকে ধাবিত হয়। এদের নৈতিক মান সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২]

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ-)

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; যদি তার কোন কল্যাণ হয় তবে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় আর যদি তার কোন বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্থ হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"

আকীদাগত দৈনতার অনিষ্টতা ও সঠিক আকীদার গুরুত্ব সম্পর্কে মিশরীয় চিন্তাবিদ হাসান আইউব(১৯১৮-২০০৮)বলেন–

আকায়েদের সুদৃঢ় দূর্গ ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরই একজন মুসলিমকে সংশয়বাদ, শিরক, বিদ'আত গোমরাহী ও অভিশপ্ততার চর্তুমুখী আক্রমণ রক্ষা করতে পারে। নবোদ্ভূত অসংখ্য মতবাদ, ভ্রান্ত নৈতিক দর্শন, মুক্ত বুদ্ধির আবর্জনা স্তুপে গজিয়ে উঠা বিভ্রান্তিকর মতবাদের ব্যাঙের ছাতা, মানুষের বুদ্ধিলব্ধ বিকৃত মতবাদ, শিরক ও বিদ'আত হতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলামী আকায়েদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। মূলতঃ বিকৃত ও বিভ্রান্ত মতবাদসমূহকে আঁকড়ে ধরার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসলামী আকায়েদ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের অভাব। যার উপর গভীর বিশ্বাস স্থাপন করাই ছিল অতীব প্রয়োজনীয় সে ইসলামের বুনিয়াদী আরকানসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শনই জীবনের সকল জটিলতা ও সমস্যার জন্য দায়ী।[৩]

আকীদা-বিশ্বাসগত বিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তার উপর মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ অনেকাংশে নির্ভরশীল। আকীদা-বিশ্বাসগত দৈনতা মানুষের বিপথগামীতার কারণ। এ কারণে সুদূর অতীত থেকে অমুসলিমরা মহান স্রষ্টার সাথে শিরক ও কুফরসহ সৃষ্টিপূজা ও নানা কুসংস্কারে লিপ্ত। বর্তমান অমুসলিম জাতির বিশ্বাসগত দৈনতা এর ব্যতিক্রম নয়। সৃষ্টির পূজা ছাড়াও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও সীমাহীন লোভ-লালসা তাদের মাঝে নানা অনৈতিকতা, অনাচার ও অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছে, যা আজ পৃথিবীকে নব্য জাহিলিয়্যাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের মুসলিম জাতিও বিজাতীয়দের সাহচর্যে, তাদের বিকৃত চিন্তাধারা ও অপসংস্কৃতির কুপ্রভাবে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতা ও নাস্তিক্যতাবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এ কালের নামধারী মুসলিমদের বড় অংশ আকীদা-বিশ্বাসগত ত্রুটি ও দৈনতার কারণে তাদের অনেকে আউলিয়া-পীরদের কবর-মাজার পূজা, গাইরুল্লাহর নামে মানত-জবেহ, গাইরুল্লাহর নিকট দু'আ-ফরিয়াদ, পীর-মুরুব্বীদের অন্ধানুসরণসহ অসংখ্য আকীদা-বিশ্বাসগত ব্যাধি দ্বারা ভয়ানকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। আকীদাগত পদস্খলন আজকের মুসলিম জাতির ভ্রষ্টতা, লাঞ্ছনা, পতন ও বিভক্তির অন্যতম প্রধান কারণ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন[৪],

'বানী ইসরাঈলের উপর যেমন অবস্থার এসেছিল আমার উম্মতের উপরেও সে অবস্থার আসবে; এক জোড়া জুতা পরস্পর সমান হওয়ার ন্যায়। এমনকি যদি বানী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন লোক থাকে, যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তাহ'লে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাবে যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। বানী ইসরাঈলরা বিভক্ত হয়েছিল ৭২টি দলে; আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে ৭৩টি দলে। সব দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, একটি দল ব্যতীত। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সে দল কোন্‌টি? তিনি বললেন, আমি ও আমার অনুসারীগণ যার উপরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, এর উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে (তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।

আজকের বিশ্বে যে অস্থিরতা বিরাজ করেছে তা আকীদা-বিশ্বাসগত ও দ্বীনি দেউলিয়াত্বের পরিণাম। ইসলাম যে মহান মূল্যবোধ নিয়ে এসেছিল, দুনিয়ার মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই মূল্যবোধগুলো কি? বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, মনের ঐশ্বর্য, সত্য, ন্যায়, ইনসাফ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। আজকের বিশ্ব পুনরায় এই মূল্যবোধের দিকে ফিরে আসলে দুনিয়ার মানুষ এই নৈরাজ্য ও দেউলিয়াত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। আকীদাগত অধঃপতনের অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে হাসান আইউব বলেন[৫]

বিপুল সংখ্যক এমন নামধারী মুসলিম রয়েছে আদম শুমারীতে। তাদের নাম মুসলিম থাকা সত্ত্বেও তাদের আকীদা, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের সাথে তাওহীদের আদৌ কোন মিল নেই। তারা সচেতন বা অবচেতনভাবে বা অজ্ঞতা

---

[১]. আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফাইউমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল ফিকর,তাবি.) পৃ.৪২১।

[২]. আল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ১১।

[৩]. হাসান আইউব, *তাবসিতুল 'আকায়িদিল ইসলামিয়াহ*, (আল-কাহিরাহ : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ২০০৩), পৃ.১২।

[৪].মূল আরবী[ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ২৬৪১।

[৫]. হাসান আইউব, *তাবসিতুল 'আকায়িদিল ইসলামিয়াহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০২।

বশতঃ তাওহীদের সাথে অসামাঞ্জস্যশীল আকীদা ও ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে। সচেতনভাবে হোক বা অবচেতন ভাবেই হোক তাওহীদের সাথে শিরকের মিশ্রিতকারীদের কোন ওজর-আপত্তিই আদালতে আখিরাতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বীনি ব্যাপারে গাফিলতি: গাফলত একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ অবহেলা, উপেক্ষা, ঔদাসীন্য। সাধারণভাবে গাফলতি একটি মন্দ বিষয়। কিন্তু দ্বীন তথা আল্লাহ ও রাসূল সা. বিধি-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে গাফিলতি একটি আরও ক্ষতিকারক বিষয়। এটা এমন এক ধরনের মন্দ বিষয় যা ব্যক্তিকে তার জন্য উপকারী বিষয় গ্রহণ করতে এবং ক্ষতিকারক বিষয় বর্জন করতে অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিস্পৃহ করে ফেলে।[১] দ্বীনি ক্ষেত্রে গাফিলতি ব্যক্তিকে প্রবৃত্তিপূজারীতে পরিণত করে। এটা তাকওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং ও আত্মসংশোধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এজন্য কুরআন এ মন্দগুণ বর্জনের ব্যাপারে তাকিদ দিয়ে বলা হয়েছে[২] –وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ - “আর তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”

আকীদা-বিশ্বাসগত দৈনতার কারণ: ক.সঠিক আকীদা-বিশ্বাসগত ব্যাপক অজ্ঞতা। খ.বস্তুবাদ, মানব রচিত ভ্রান্ত মতবাদের কুপ্রভাব। গ.বিজাতীয়দের সাহচর্য ও তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির কুপ্রভাব। ঘ.শয়তানের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। ঙ.অন্ধানুসরণ।

পরিত্রানের উপায়: কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস গঠন ও সংশোধন, সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ, মানব রচিত মতবাদ ও দর্শনের অন্ধঅনুসরণ না করা।

❑.মহান আল্লাহকে ভুলে যাওয়া এবং তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা না রাখা:

‘খাও-দাও ফুর্তি কর, জীবনের স্বাদ লুফে নাও’- এই জীবন দর্শনে বিশ্বাসী বর্তমান বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশের মানুষ। এরা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে। এদের কেউ কেউ নামকা ওয়াস্তে আল্লাহে বিশ্বাসী হলেও মূলত তারা বস্তুবাদের পূজারী। বিপদের মুহুর্ত ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করে না। মহান সত্তা আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এই অকাট্য সত্যটি তারা অস্বীকার করে ফলে তারা তাদের নিজের সৃষ্টি এবং এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকে অনর্থক করে তোলে। এমনকি সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে নিরর্থক করে ফেলে। এটা মানব জাতির বড় ধরনের সবচেয়ে বড় অধঃপতন ও নৈতিক স্খলন। এ কারণে আজ মানুষ শিরক ও নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

আজকের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, যুল্‌ম, পাপাচার, সন্ত্রাস ও রাহাজানি বিস্তারের পিছনে সক্রিয় রয়েছে নাস্তিকতাপ্রসূত বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তা-চেতনা। কেননা এই প্রবণতা মানুষকে দায়বদ্ধহীন, ভোগবাদী ও বস্তুবাদী করে তোলে। এর ফলে মানুষ নীতিহীন, ভোগসর্বস্ব, চরম স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত লোভ-লালসার দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ বিভিন্ন অনাচারে জড়িয়ে পড়ে। পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগের জন্য মরিয়া হয়ে যায়। সুখ-সম্ভোগই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এটাই মানুষকে বস্তুবাদের দাসে পরিণত করে। পক্ষান্তরে, বিশ্বাসী মানুষ তার স্রষ্টার নিকট দায়বদ্ধ থাকায় তার মধ্যে একটি নীতিবোধ কাজ করে। আর স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। কিন্তু অবিশ্বাসীর মধ্যে নীতিবোধ লোপ পায়; কারণ সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। আখিরাত অস্বীকার করার কারণে নাস্তিকরা সেচ্ছাচারী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে অন্ধকার জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। এ তো গেল বাহ্যিক ক্ষতি, কিন্তু আত্মিক ক্ষতি আরও মারাত্মক। কারণ কেউ আল্লাহকে ভুলে গেলে তার অনিবার্য পরিণতি হল আল্লাহ তাকে আত্মবিস্মৃত করে দেন। কেউ আত্মবিস্মৃত হলে সে আখিরাত ও পূণ্যের কাজের প্রতি উদাসীন হয় এবং শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে তাকে বশীভূত করে ফেলে। ফলে সে তাগূত ও শয়তানের গোলাম হয়ে পড়ে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৩] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ “তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহ্‌ও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিলেন; আর তারাই হল ফাসিক।” অন্যত্র বলেন-[৪] اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ “শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়াছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। তারা শয়তানের দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।”

মহান আল্লাহর সম্পর্কে কুধারণা: মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, ক্ষমতা ও গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ তার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে বিপথগামিতা হয় এবং আল্লাহর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই কুরআনে বলা হয়েছে[৫]- مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

মহান আল্লাহর সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের নৈতিক অধঃপতনের বড় কারণ। আল্লাহর সম্পর্কে সঠিক ধারণা অভাবে অধিকাংশ মানুষ শিরক, কুফর, নিফাক ও রিয়াসহ বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত। তারা কথা ও কাজে আল্লাহ রহমত থেকে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস : আয়াত ৯২।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ২০৫।
[৩].আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ১৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮: আয়াত ১৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৭৪ ।

নিরাশা ব্যক্ত করে থাকে। আল্লাহর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে বড় বড় গুনাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাতে লিপ্ত হয় এবং নিজ খেয়াল-খুশী মত জীবন যাপন করেও নিজকে দ্বীনদার মনে করে এবং জান্নাতের আশা করে। এ কারণে মানুষ মহান আল্লাহর শাস্তি ও পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয়। এর কারণে ব্যক্তি আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে প্রবৃত্তি পূজারী, উদ্ধত কাফির, শয়তান ও তাগূতের গোলামে পরিণত হয়।[১] ফলে তারা আল্লাহর ক্রোধ ও লানতের পাত্র এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত্য হয়।[২]

❑.শির্ক :

শির্ক আল-কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা। কুরআনে ‘শিরক’(شرك) মূলধাতু থেকে শব্দটি বিভিন্নরূপে ১৬৮বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] শির্ক(الشِّرْك)শব্দটি একবচন, বহুবচনে(شُرَكَاء), যা তাওহীদের বিপরীত; আভিধানে এর অর্থ–অংশ, অংশীবাদ, মিশ্রিত করণ, একত্রিকরণ; অংশীদার করা বা হওয়া, কোন বস্তু দুই বা ততোধিক জনের জন্য সাব্যস্ত করা।[৪] উল্লেখ্য যে, কোন বস্তুতে একাধিক শরীক থাকলে সে বস্তুতে তাদের প্রত্যেকের অংশ সমান হওয়া জরুরী নয়, বরং তাদের একের অংশ অপরের চেয়ে বেশী বা কম হতে পারে।
পরিভাষায় শিরক হল, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, ও ইবাদতে অংশীদার স্থির করা।”

ড. ইবরাহীম আলবারীকান বলেন[৫]–শির্কের পারিভাষিক অর্থ দু’টি ক).সাধারণ(আম) অর্থে : এই শিরক হচ্ছে, আল্লাহর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ তথা ‘রূবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, আসমাউস সিফাত’ এর মধ্যে গায়রুল্লাহকে সমকক্ষ গণ্য করা। এখানে সমকক্ষের অর্থ হল, গায়রুল্লাহকে এমন অংশ দেয়া যে, আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহর অংশের সমান কিংবা আল্লাহর অংশ গায়রুল্লাহর অংশের চেয়ে বেশী হতে পারে। এ সাধারণ অর্থে শির্ক তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা: ক.আল্লাহর রূবুবিয়্যাতে শির্ক, তা হল–সৃষ্টি, প্রতিপালন, রিয্ক দান, বিশ্বপরিচালনা, জীবন ও মৃত্যু দান ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা। খ.আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শির্ক, তা হল–আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইবাদত যেমন নামাজ, রোজা, সিজদাহ, রুকু, ‘জীবিত-মৃত কারও কাছে দু‘আ, আশ্রয় প্রার্থনা করা, মাজারে মানত ও পশু উৎসর্গ করা। গ.আসমাউস্ সিফাতে শির্ক, তা হল, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে তাঁর সমকক্ষ গণ্য করা।
খ.বিশেষ (খাস) অর্থে: শিরক হচ্ছে–আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও আনুগত্যের উপযুক্ত সাব্যস্ত করা।

শির্ক দু’প্রকার- ক. বড় শিরক (আশ-শির্কুল আকবার), খ. ছোট শির্ক (আশ-শির্কুল আসগার):
ক. আশ-শির্কুল আকবার হল–আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোন বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ মনে করা কিংবা আল্লাহর কর্তৃত্বে ও ক্ষমতায় অন্য অংশীরিত্ব থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহর প্রাপ্য কোন ইবাদত তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা। যেমন–আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা।
খ. আশ-শির্কুল আসগার হল–যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছেনি। যেমন–রিয়া (লোক দেখানোর জন্য ইবাদত), আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ ইত্যাদি।[৬]

বড় শিরক (আশ-শির্কুল আকবার) ও ছোট শির্ক (আশ-শির্কুল আসগার) উভয়ই মারাত্মক কবীরা গুনাহ হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন ১. বড় শিরক বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কিন্তু ছোট শির্ক ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। ২. বড় শিরকের ফলে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর ছোট শির্কের ফলে বান্দা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। ৩. বড় শিরক বান্দার ঈমান ও সমস্ত আমল বিনষ্ট করে। ছোট শির্ক সমস্ত আমল বিনষ্ট করে না, বরং যে সব আমলের সাথে তা যুক্ত তা নষ্ট হবে। ৪. বড় শিরক লিপ্ত ব্যক্তির জান-মাল মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যায়। ছোট শির্কে তা হালাল করে না।[৭]

সাধারণভাবে শির্ক বলতে মানুষ মূর্তি, দেব-দেবী, প্রাকৃতিক বস্তু ও মাজার পূজাকে বুঝে থাকেন। কিন্তু শির্ক শুধু এতেই সীমিত নয় বরং এটা একটি ব্যাপক বিষয়। মূর্তি পূজা ছাড়াও শিরকের বিভিন্ন দিক-বিভাগ রয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী-[৮] (فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً) “অতএব, তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।” -এখানে আল্লাহর সমকক্ষ বলতে মিথ্যা উপাসনার পাত্রকে বোঝায়। তা হতে পারে দেবতা, মূর্তি, কুপ্রবৃত্তি, কিংবা কোন সম্মানিত বস্তু যেমন পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দক্ষতা, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মতবাদ যদি তা আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থাপন করা হয়। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী (১৮৭২-১৯৫৩ খৃ.) বলেন–

---

[১]. আল-কুরআন ১৫:৫৬।
[২]. আল-কুরআন, ০৬:১০৮।
[৩] . মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু’জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৬-৪৬৯।
[৪]. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ. ৩৪১-৩৪২; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯৩।
[৫]. দেখুন, ড. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আল-বারীকান, *আল-মাদখালু লি দিরাসাতিল আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যা আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা’য়াত,* (আল-খুবার:দারুস সুন্নাহ লিন নশর ওয়াত তাওযী, ১৯৯২), পৃ. ১২৫-১২৬।
[৬]. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা* (ঝিনাইদহ:আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ-২০০৭), পৃ.৩৭২।
[৭]. ড. সালেহ বিন ফাওযান, *কিতবুত তাওহীদ,* (ম্যনিলা : দারুল হিজরাহ ফাউন্ডেশন ফিলিপিন, তা বি), পৃ.১৩-১৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ২২।

> The false gods may be idols, superstitions, self, or even great or glorious things like Poetry, Arts, or Science, when set up as rivals to God. They may be pride of race, pride of birth, pride of wealth or position, pride of power, pride of learning, or even spiritual pride.[১]

শির্ক মানব জীবনের সকল দিক-বিভাগে কুপ্রভাব বিস্তারকারী মহাব্যাধি তুল্য। এই সর্বগ্রাসী ব্যাধির ছোবল থেকে রক্ষা পেতে হলে এর দিক-বিভাগসমূহ সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক। নিম্নে এর বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরা হল: (ক) *ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক:* মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে উপাসনা করা। ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হল: দেব-দেবী বা কবর-মাজার পূজা; আল্লাহ ছাড়া জীবিত-মৃত কারও কাছে দু'আ বা আশ্রয় প্রার্থনা করা; আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা; ইত্যাদি। (খ).*আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক*: জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর আনুগত্য উপেক্ষা করে বাপ-দাদা, সমাজ, ধর্মগুরু বা নেতা-নেত্রীর নিরঙ্কুশ ও অন্ধানুগত্য করা।'[২] (গ).*আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর আইন পালনে শিরক:* জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহকে বিধানদাতা মনে না করা অথবা তাঁর কোন আইন ও বিধানকে অনুপযোগী মনে করে কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-বিধান আর কিছু ক্ষেত্রে মানব রচিত আইনকে যুগপোযুগী মনে করা।[৩] আল্লাহর আনুগত্যের মত কারো আনুগত্য করা। (ঘ).*তাওক্কুলের ক্ষেত্রে শিরক:* 'বিপদ-আপদ দূর ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো (দেবতা, পীর-বুজুর্গ, জিন্ন বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির) উপর ভরসা করা।'[৪] (ঙ).*ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক*: আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রদর্শনের পরিবর্তে দেব-দেবী, স্ত্রী-সন্তান বা অন্যকিছুর প্রতি তা পোষণ করা।'[৫] (চ). *ভয়-আশা ক্ষেত্রে শিরক*: মহান আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে আল্লাহর মত সর্বোচ্চ ভয় করা। আর যে বিষয়ে কেবল আল্লাহর নিকট আশা করা উচিত সে ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট আশা–ভরসা করা।'[৬] (ছ). *বিশ্বাসগত শিরক:* যাদু, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ভাগ্য গণনা ও বান-টোনা ইত্যাদিতে মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ বিশ্বাস এবং তা প্রয়োগ করা।'[৭] এভাবে শিরকের সর্বগ্রাসী ছোবলে যুগে যুগে মানব সমাজ বিপর্যস্ত হয়েছে। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাসী। তাই মহান আল্লাহ বলেন-[৮] وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُون-"তাদের অধিকাংশ আল্লাহে্ বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর শরীক করে।"

শিরকের অকল্যাণ ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। শির্ক মানব জীবনে গভীরভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে। এটা মানুষের বিশ্বাস, চেতনা ও মূল্যবোধকে বিকৃত করে। এটা সমাজে পাপাচার, অনাচার ও অনৈতিক কর্মকান্ডের জন্ম দেয়। এর ফলে মানুষ হয়ে উঠে বিকৃত চিন্তা-বিশ্বাসের অধিকারী।[৯] এটা মানুষকে তাওহীদ(আল্লাহর একত্ব), রিসালত (নাবী-রাসূল ও আল্লাহর কিতাবে); ও আখিরাত(কিয়ামত, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি) এর বাস্তবতার ব্যাপারে অবিশ্বাসী ও সন্দেহপ্রবণ করে ফেলে।[১০] শির্ক বিশ্বাসগত দৈনতা সৃষ্টি করে মানুষকে সত্যচ্যুত করে; আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে সৃষ্টির গোলামীতে লিপ্ত করে। এর ফলে মানুষ স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি, দেব-দেবী, প্রাকৃতিক বস্তুসহ জিন্ন ও শয়তানদের উপাসনা করে।[১১] অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত করে আসছে।[১২] এ মর্মে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে[১৩]

> أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ- وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ- وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ- إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ- فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ -هُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ-
>
> "তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? আর তারা তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। আর তোমরা যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে আহবান কর বা চুপ থাক, তা তোমাদের নিকট সমান। আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মত বান্দা। তোমরা তাদেরকে আহবান কর, আর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি পা আছে যার দ্বারা তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনে? বল, 'তোমরা যাদের আল্লাহর শরীক করেছ তাদের ডাক। তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'।"

---

[1].Abdullah Yusuf Ali,*The meaning of the Glorious Quran*, v.1, (Cairo:Dar al-kitab al-Masri,/Bairut: Dar al-kitab al-Lubnani) P.21.
[২] .আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৩১, আল-কুরআন ০২:১৭০।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৪০, আল-কুরআন ০৭:৫৪।
[৪] .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ৩: আয়াত ৩৮, আল-কুরআন০৭:১৯৭।
[৫] .আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৬৫।
[৬] . আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৭৫, আল কুরআন ০৯:১৩, ৩৯:৩৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১০২।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ১০৬।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০ : আয়াত ১২।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৪৫, আল-কুরআন ৪০:১২ ।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১০০,আল-কুরআন ৩৪:৪১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত১৪৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৫:১০৪, ১০:৬৭, ১০:৩৬, ২২:৭১, ২৬:৬৯-৭৬, ৩৯ : ০৩, ৫৩:১৯-২০,২৩।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৯১-১৯৫, আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৩৬: ৭৪–৭৫।

শির্ক মানুষের আত্মমর্যাদার পরিপন্থী এবং বড় ধরনের নৈতিক পদস্খলন। কেননা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, পৃথিবীর অন্য কোন সৃষ্টির মর্যাদা মানুষের উপরে নয়–স্বয়ং মহান আল্লাহ মানুষকে এই সম্মান দিয়েছে।[১] শুধু তাই নয়, মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এমন এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেননি।[২] সৃষ্টির সেরা জীব ও আল্লাহর প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে শিরক বা সৃষ্টির গোলামী হওয়া মানুষের জন্য খুবই অপমানজনক। অধিকন্তু, প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে চাকরকে মুনিব বানানো মারাত্মক অবিচার। আর মানুষের আত্মমর্যাদা দাবী হলো–আল্লাহ ছাড়া কারো প্রভুত্ব মানবে না, কারো কাছে মাথা নত করবে না, কারো গোলামী করবে না, কারো মুখাপেক্ষী হবে না। কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন মূর্তি, দেব-দেবী, নানা শক্তির উপাসনা ও কবর-মাজার পূজায় লিপ্ত।[৩] অথচ এ ধরনের কর্ম কোন ইতর প্রাণীকে করতে দেখা যায় না। মানুষের জন্য এর চেয়ে লজ্জাকর আর কি হতে পারে! ইরশাদ হচ্ছে[৪] – وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ তারা আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকার ও করতে পারে না। তারা বলে, এগুলো আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَايَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না।[৫]

শির্ক মহান আল্লাহর প্রতি জঘন্য মিথ্যাচার।[৬] শিরকে অন্যায়ভাবে মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, কতৃত্বে ও ইবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা হয় এমনকি তাঁর সন্তানও আরোপ করা হয়।[৭] এ মিথ্যাচারের মাধ্যমে একদল মূর্খ লোক সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমকক্ষ বানায়–যা চরম অন্যায় ও অনৈতিক। এর প্রতিবাদে মহান আল্লাহ বলেন[৮] - لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ-"যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।"

শির্ক বড় ধরনের যুল্ম।[৯] শির্ক আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্বের উপর মারাত্মক আঘাত। এর মাধ্যমে আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ব, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়। এতে মহান আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও কতৃত্বের অনেক বিষয় তাঁর সৃষ্টির প্রতি আরোপ করে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করানো হয়–যা ভয়ানক অন্যায়। ইরশাদ হচ্ছে[১০]

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا-تَكَادُالسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّالْجِبَالُ هَدًّا-أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا-وَمَايَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا-إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

"তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক বীভৎস বিষয়ের অবতরণা করেছ, যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।"

শির্ক মহাভ্রষ্টতার পথ। মানুষকে সত্য পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য যত মাধ্যম আছে তৎমধ্যে শিরক সবচেয়ে মারাত্মক। এটা মানুষকে ভীষণভাবে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত করে। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে[১১]– وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا-"এবং কেউ আল্লাহর শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনু কাছীর রহ. (মৃ.৭৭৪হি.) বলেন–"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, সে বাতিল পথে চলেছে, সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়েছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে, দুনিয়া ও আখিরাতে নিজেকে মহাক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং সে উভয় জগতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"[১২]

শিরক মানবীয় সদগুণাবলী বিলোপ সাধন করে। এ কারণে মানুষ হয়ে ওঠে প্রবৃত্তিপূজারী; ভোগবাদী; সত্যদ্রোহী ও আল্লাহর পথে বাঁধাদানকারী, হটকরী, সীমালংঘনকারী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক।[১৩] এ মর্মে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-[১৪]

(وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَالَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৭০।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৬৫।
৩. আল-কুরআন, সূরা নূহ৭১: আয়াত ২৩-২৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৫৩:১৯-২০,২৩, ০৬:১০০, ৩৭:১৫৮, ৩৪:৪১, ৪৩:১৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ১৮।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫: আয়াত ০৩, আল-কুরআন ০৬:৬২-৬৩।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্ক্বাফ ৪৬: আয়াত ০৪, আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৫:৪০।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ০৪-০৫।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ২২ ।
৯. আল-কুরআন,সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৩।
১০. আল-কুরআন, সূরা মার্ইয়াম ১৯: আয়াত ৮৮-৯৩।
১১. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ৪: আয়াত ১১৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১৪:৩৫-৩৬।
১২. ইবনু কাছীর(রহ), *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৪১৪।
১৩. আল-কুরআন, ০৫: ৮২, ০৯:০৮- ১০, ৩৯:৪৫; ০৯: ০৮-১০।
১৪. আল কুরআন, সূরা আয-যুমার: আয়াত ৪৫।

"শুধু এক আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উপাস্যগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।"

শিরক মানব জীবনে নানা কুসংস্করের জন্ম দেয়। কুসংস্কার মানুষকে মূর্খতার পথ দেখায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ভালো কে মন্দ, মন্দকে ভালো, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করে এবং সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ রীতির প্রচলন করে। ফলে তাদের নিকট সত্য উপস্থাপন করলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় না। জাহেলী যুগে মক্কার কাফিররা কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে নানা কুপ্রথার উদ্ভব করে সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]–

مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ

"বাহিরা,[২] সাইবা,[৩] ওয়াসীলা[৪] ও হাম[৫] আল্লাহ্‌ স্থির করেন নি ;কিন্তু কাফিররা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।"

শিরক মানুষকে মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে। শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে অনেক মুশরিক তাদের স্বীয় সন্তানকে দেবতার উদ্দেশ্যে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন[৬] – وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ "এই রূপে তাদের দেবতারা বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করেছে তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্মসম্বন্ধে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।"

শির্‌ক স্রষ্টার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞ হতে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অন্য সকলকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য।[৭] এবং মানুষকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে স্বীয় প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এতদসত্ত্বেও সেই স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে কোন সৃষ্টি বা মূর্তির পূজা করা চরম অকৃতজ্ঞতা। এ মর্মে বলা হয়েছে-[৮] وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ - ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ "তোমাদের নিকট যে সব নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহ্‌রই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য দশা তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাকে ব্যাকুলভাবে আহবান কর। আবার যখন আল্লাহ্‌ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরীক করে।"

শিরক মহাপদস্খলন ও ধ্বংসের পথ।[৯] তা মানব জীবনে মূল্যবোধ বিধ্বংসী এক ধরনের ভয়ঙ্কর অপশক্তি। কেউ এতে লিপ্ত হলে তার গুরুতর পদস্খলন ঘটে। তাই শিরক অনিষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলা হয়েছে[১০] – وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ "আর যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল।"

শিরক মানুষের আত্মা ও মন-মানসিকতাকে অপবিত্র ও কলুষাচ্ছন্ন করে ফেলে।[১১] ফলে শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। শিরক মানুষের সুস্থ বিবেক বিলোপ সাধন করে চরম অজ্ঞতা ও মুর্খতায় নিমজ্জিত করে। এটা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় ও হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে আত্মবিস্মৃত করে ফেলে। ফলে শিরকে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা সত্য উপলব্ধি করতে চায় না। যা তাদের ঈমান ও সত্যপথে প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১২] -كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ- "তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়।"

শিরক মানুষকে দুনিয়া পূজারীতে পরিণত হয়। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিরা পরকালে অবিশ্বাস হওয়ায় দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগ তাদের জীবনে মুখ্য পড়ে। এজন্য তারা যে কোন ধরনের অনৈতিক ও অনাচার করতে কোন দ্বিধা করে না। এরশাদ হচ্ছে[১৩] –وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ "আর তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সর্বাধিক লোভী মানুষরূপে। এমনকি তাদের থেকেও যারা শির্‌ক করেছে। তাদের একজন কামনা করে, যদি হাজার বছর তাকে জীবন দেয়া হত! অথচ দীর্ঘজীবী হলেই তা তাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না।"

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১০৩) আরও দেখুন, আল-কুরআন (০৬ : ১৩৮-১৩৯) (০৬ : ১৩৬)।
[২]. বাহীরা বলা হয় এমন উষ্টীকে যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হত। এটিকে আর কেউ দোহনও করে না ।
[৩]. সায়েবা হল- এমন উঠকে যা কাফেররা তাদের দেবতার নামে ছেড়ে দিত। এভাবে ছেড়ে দেয়ার পর এর পিঠে কোন বোঝা বহন করত না।
[৪]. ওয়াসীলা হল-এমন উষ্টীকে যা প্রথম দু'বার পর পর মাদা বচ্চা প্রসব করে । এ ধরনের উষ্টীকে কাফেররা দেবতার নামে ছেড়ে দিতো।
[৫]. হাম বলা হয় এমন উষ্টীকে যা একটা নিদিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়ার পর দেবতার নামে ছেড়ে দেয়ার মানত করা হতো। এরূপ উঠের পিঠে কেউ আরোহন করতো না কিংবা কোন কিছু বহনও করতো না।
[৬].আল-কুরআন,সূরা আল-আন্‌'আম ০৬ : আয়াত ১৩৭)   আরও দেখুন, আল-কুরআন (০৬:১৪০)।
[৭]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ২৯, ৩১:২০।
[৮]. আল-কুরআন,সূরা আন্‌-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৫৩-৫৪; আরও দেখুন,আল-কুরআন(০২:২১-২২) (১০০:০৬)।
[৯]. আল-কুরআন,সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ৩০-৩১।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা হাজ্জ ২২: আয়াত ৩১।
[১১]. আল-কুরআন,সূরা আত্‌-তাওবাহ ০৯: আয়াত ২৮।
[১২]. আল-কুরআন,সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ১৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন (০৯:২৮)।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ০২: আয়াত ৯৬।

শিরক মানুষকে শয়তানের তাবেদারে পরিণত করে। যারা শিরকে লিপ্ত তাদের উপর শয়তান সর্বদা অশুভ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা নানা ধরনের পাপাচারে লিপ্ত থাকে। যেমন বলা হয়েছে[১]– إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ "তার আধিপত্য তো তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে।"
শিরক ব্যক্তিকে সৃষ্টির অধমে পরিণত করে। শিরকে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা শুধু নৈতিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলে না বরং তারা সর্বদিক থেকে চূড়ান্ত অধঃপতনে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[২]–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির অধম।"

শিরক সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ। এ থেকে চূড়ান্তভাবে তাওবা করা ছাড়া কেউ মারা গেলে আল্লাহ্ তাকে কখনই ক্ষমা করবেন না এবং সে চিরকাল মহাশাস্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন-[৩] إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে মহাপাপ করে।"হাদীসে এসেছে[৪]

> এক ব্যক্তি নাবী সা. কে জিজ্ঞেস করলো, কোন পাপ সর্বাধিক মারাত্মক? আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার খাদ্যে অংশগ্রহণের আশংকায় তোমার সন্তান হত্যা করা। সে বললো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনায় লিপ্ত হওয়া।এর সমর্থনে আল্লাহ বলেন–"যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না। যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে করে না এবং যেনা করে না।"(আল-কুরআন ২৫:৬৮)।

শিরক মারাত্মক ক্ষতিকর মহাপাপ, যা মানুষের যাবতীয় সৎকর্মকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল ও বরবাদ করে দেয়। কোন ব্যক্তি যদি সারাজীবন যদি পূণ্যের কাজ করে আর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বড় শিরক করে তবে তার সব পূণ্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে চির জাহান্নামী হবে। এ শাস্তি শুধু মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য[৫] নয়, বরং মানব জাতির সর্বাধিক পূর্ণবান নাবী-রাসূলগণ এতে লিপ্ত হলে একই শাস্তি। এ ব্যাপারে মহাম্মাদ (সা.) সহ সব নাবী-রাসূলকে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন-[৬] وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين "তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

শিরক পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। এটা ঈমান বিনষ্টকারী মহাঅপরাধ। এতে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। তারা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। মহান আল্লাহ বলেন-[৭] مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ "কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"

সর্বপরি, শিরক মহান আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য এবং ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কর্ম।[৮] এটা পার্থিব জীবনে আল্লাহর গজব, বিপদ-আপদ, বিপর্যয় ও শাস্তির কারণ।[৯] এটা সমাজে বিভিন্ন ধরনের পাপাচার, ভ্রান্ত বিশ্বাস, অনৈতিক কর্ম ও ফিতনা-ফাসাদ পাপ ও মন্দের উৎস। কিয়ামতের দিন এ অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না; কিংবা কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না, আর আফসোসও তাদের কোন কাজে আসবে না।[১০]

শিরকের উৎস ও ভিত্তি: কুমন্ত্রণা, অতিভক্তি, পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ, অনুমান, কল্পিত ধ্যান-ধারণা শিরকের মূল উৎস। শিরক ভিত্তিহীন অলীক বিশ্বাস, শয়তানী কুমন্ত্রণা, নানাবিদ কুসংস্কার ও ভয়ানক মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিরকের কারণ : ক.দেব-দেবীর প্রতি অমূলক বিশ্বাস, পূণ্যবান বান্দাদের ব্যাপারে অতিভক্তি এবং তাদের সুপারিশ বিষয়ক বিভ্রান্তি। খ.পূর্বপুরুষ, বিভ্রান্ত ব্যক্তি ও সমাজের রীতি-নীতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ অনুকরণ। গ. অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। মহান আল্লাহ ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। ঘ. শিরকমিশ্রিত বিভিন্ন বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলচিত্রে মাজার-ফকির সম্পর্কে শিরকী ধ্যান-ধারণা। ঙ. কিছু ইবাদতের অর্থ সংক্রান্ত বিভ্রান্ত। চ. শয়তানের প্রতারণা।

মানব সমাজ থেকে শিরক নির্মূল ও প্রতিরোধে করণীয়: ক. মহান আল্লাহ গুণাবলী ও ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা। খ. শিরকমিশ্রিত আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণার বিরূদ্ধে ব্যাপকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ১০০ ।
[২]. আল-কুরআন,সূরা আল-বায়্যিনাহ ৯৮: আয়াত ০৬।
[৩]. আল-কুরআন সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৪৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪:১১৬।
[৪]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল তাফসীর, হাদীস নং ৪৪৮৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮৬।
[৫]. আল-কুরআন,সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১৭।
[৬]. আল-কুরআন,সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৬৫; আরও দেখুন,আল-কুরআন ০৬: ৮৮।
[৭] . আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৭২; আরও দেখুন,আল-কুরআন (১৭:৩৯)।
[৮]. আল-কুরআন,সূরা আল-আন্‘আম ০৬ : আয়াত ১৫১, আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৬:৫৬; ০৭: ৩৩। ।
[৯]. আল-কুরআন,সূরা আর্-রা‘দ ১৩: আয়াত ৩৪।
[১০]. আল-কুরআন,সূরা আশ-শু‘আরা' ২৬: আয়াত ৯২-১০২, আল-কুরআন (১৬:৮৬-৮৮)।

গ.প্রামাণ্য দলীলের ভিত্তিতে আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা। ঘ.পূর্বপুরুষ, বিভ্রান্ত ব্যক্তি ও সমাজের রীতি-নীতির অন্ধ অনুসরণ ও কুসংস্কার পরিহার করা। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য যাচাই-বাচাই করে অবলম্বন করা। ঙ.নাবী-রাসূল,ফিরিশতা, ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা। চ. মাজার, মূর্তি, প্রতিকৃতি, সুদৃশ্য পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা।

❑.কুফর, বস্তুবাদ, সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ (الكفر):

কুফর(اَلْكُفْر) শব্দটি মাসদার, যা ঈমান ও শুকর–এর বিপরীত। কুফর শব্দটি অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া, অমান্য করা, To deny Allah's goodness, to be ungrateful, to reject Faith, ...ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১] তবে এর প্রকৃত আভিধানিক অর্থ (السَّتْر والتَّغطية) 'গোপন করা, ঢেকে ফেলা।'[২] এজন্য অভিধানে 'কাফির' শব্দটি রাত্র, সমুদ্র, বৃহৎ নদী, কালো মেঘ, বর্ম ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত।[৩] 'ঈমানের বিপরীত অবিশ্বাসকে কুফর বলা হয়, কারণ এতে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত সত্য বিষয়াবলীকে আবৃত করা হয়।'[৪] আল-কুরআনে 'কুফর' মূলধাতু থেকে শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৫২২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] পরিভাষায়, 'এমন প্রত্যেক বিষয়কে অস্বীকার করা কুফর বলা হয়, যা রাসূল সা. দাবী করেছিলেন বলে নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।'[৬] যেমন,নবুয়্যত সমাপ্ত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করা।
ড. সা'দী আবূ জাইব বলেন– "দ্বীন ইসলামের প্রমাণিত আবশ্যকীয় বিধানাবলীকে অস্বীকার করাই কুফর।"[৭]

মোটকথা, কুফর হলো আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বা ইসলামে অন্যান্য যে সব বিধি-নিষেধ, হুকুম-আহকাম কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সে সব বা তার যে কোন একটি অস্বীকার করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ্, ফিরিশ্তা, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব, নাবী-রাসূল, তাকদীর, আখিরাত, কিয়ামতে উত্থান, হাশর, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম– এ সবের বা এর কোন একটিতে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাও কুফরী। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করাও কুফরী; কারণ এতে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও একত্বকে অস্বীকার করা হয়। একইভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের যে সব আদেশ-নিষেধ মেনে নেয়া ও পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, সে সব আদেশ-নিষেধের যৌক্তিকতায় অবিশ্বাস করাও কুফরী। যেমন-সালাত কায়িম করা, যাকাত দেয়া, সিয়াম পালন করা ইত্যাদি ইসলামের রুকন হিসেবে ফরয করা হয়েছে। এগুলোর কোন একটির অবশ্য পালনীয় হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা কুফরীর শামিল। এরূপ যে নির্দেশে কোন কাজ হারাম করা হয়েছে, সে সবে কিংবা তার কোন একটির অবশ্য বর্জনীয় হওয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাস পোষণ করা।যেমন–ব্যভিচার, মদ, সুদ ইত্যাদি হালাল মনে করাও কুফরীর পর্যায়ে পড়ে।[৮]

বস্তুবাদ: যে দার্শনিক মতবাদ যাবতীয় আধ্যাত্মিক বিষয়কে অস্বীকার করে এবং শুধুমাত্র বস্তু ও বস্তুর গতিকেই বিশ্বের সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনার নিয়ামক বলে বিবেচনা করে সেই মতবাদকেই বলা হয় বস্তুবাদ।[৯] বস্তুবাদের মূল কথা হল–বস্তুই প্রথম এবং প্রধান এবং বস্তু থেকেই চিন্তার সূত্রপাত। বস্তু জগতের বাইরে অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা করার অবকাশ নেই। বস্তুই শুরু বস্তুই শেষ।[১০] বস্তুবাদীরা আরো মনে করে যে, বস্তু থেকেই ধারণা বা জ্ঞানের উৎপত্তি। বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলেই সে সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা জন্মে। বস্তু জগতের বাইরে কোন জ্ঞান বা দর্শনকে বস্তুবাদীরা অস্বীকার করে।[১১] তাই তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। এদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলা হয়েছে[১২]-(وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ)"তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হব না।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১৩] (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) "তারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুত এই ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।" –উল্লেখিত আয়াতদ্বয়সহ বিভিন্ন আয়াতে কাফিদের পরকালীন অবিশ্বাস ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায় বস্তুবাদ কুফরের অংশ।

সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ: মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, আখিরাত, নাবী-রাসূল ও ওহীর জ্ঞানের প্রতি অবিশ্বাস বা সংশয়-সন্দেহ পোষণ করাই সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ। সংশয়বাদী ও নাস্তিকরা নানা শক্তিতে বিশ্বাসী। এরা মূলত কাফির, মুশরিক, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি পূজারী। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১৪]

---

1. Abdullah Yusuf Ali, , *ibid*, v.1, P.41.
২. ইবনু ফারিস, *মু'জাম মাকায়ীসুল লূগাহ* , তাহক্বীক্ব-আবদুস সালাম হারুন (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩৯৯হি.) খ.০৫, পৃ.১৯১।
৩ .*ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত(ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), খ.০৬, পৃ.৬০৮।
৪. ইবনু ফারিস, *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯১।
৫ . মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭০৯-৭১৫।
৬. মূল আরবী [هو جحد كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إدعاؤه ضرورة] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৬, পৃ.৬০৮।
৭.মূল আরবী [جحد المعلوم من دين الاسلام بالضرورة الشرعية] ড. সা'দী আবূ জাইব, *আল-কামূস আল-ফিকহী* (দামিস্ক :দারুল ফিকর, ২য় সং,১৪০৮হি.) পৃ.৫০৩।
৮ . দেখুন- *স্রষ্টা ও ইসলাম, সংকলন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ.৭৯।
৯ . হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সংস্করণ, ২০০০),পৃ.২৬৫।
১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬৫।
১১. ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১ম সং., ২০০১), পৃ.১৭৫।
১২. আল-কুরআন,সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ২৯।
১৩. আল-কুরআন,সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ২৪।
১৪. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ০২-০৫।

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ- أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ- قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ - بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ

"অতঃপর কাফিররা বলল, 'এতো এক বিস্ময়কর বস্তু'! 'আমরা যখন মারা যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনো কি (আমরা পুনরুত্থিত হব)? এ ফিরে যাওয়া সুদূরপরাহত'। অবশ্যই আমি জানি মাটি তাদের থেকে যতটুকু ক্ষয় করে। আর আমার কাছে আছে অধিক সংরক্ষণকারী কিতাব। বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে। অতএব তারা সংশয়যুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ কুফরের অংশ বিশেষ, যা অতীতেও ছিল। কাফিরদের সাথে এদের কোন পার্থক্য নেই। এ ধরনের কাফিররা ভ্রষ্ট। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১]-يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ-"আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদের।"

সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের যাত্রা অনেক আগেই হলেও তা খুব বেশি সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান সময়ে এর পরিকল্পিত প্রচারণা এবং আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করার মাধ্যমে অনেক সরলপ্রাণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং বিশ্বাসীদের মনে সংশয় সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বড় অংশ এর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

কুফর ও কাফির সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা: কুফর ও কাফির সম্পর্কে বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে কাফির বলতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কাফিরসহ অতীত ও বর্তমান যুগের অবিশ্বাসী বা অমুসলিমদের বুঝে থাকেন। কিন্তু এই ধারণাটি সঠিক নয়। বরং কাফির সেই ব্যক্তি, যে কুফরের মধ্যে গণ্য কোন কর্মের সাথে জড়িত। এমনকি যদি কারো নাম ও পরিচয় ইসলামের হয় অথচ বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড কুফরীর সাক্ষ্য বহন করে, এরূপ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী, মুসলিম নামধারী ও মুসলিম সমাজের সদস্য হিসেবে পরিচিত ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিও কাফির বলে গণ্য হবে। বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেকেই নানাভাবে এই কুফরীর সাথে জড়িত। অথচ তারা নিজেদের কুফরীর ব্যাপারে উদাসীন। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[২] – (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ) "ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তাওবা কখনও কবুল হবে না। তারাই পথভ্রষ্ট।"অন্যত্র এসেছে[৩] (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)"যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, অতঃপর তাদের কুফরী বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না।"

কুফর প্রধানত দু'প্রকার, যথা–ক.বড় কুফর (আল-কুফরুল আকবার), খ.ছোট কুফর (আল-কুফরুল আসগার),
ক. বড় কুফর (আল-কুফরুল আকবার) : যা ব্যক্তিকে দ্বীন (ইসলাম) থেকে বের করে দেয়। এ কুফরের কয়েক প্রকার।[৪]
খ. ছোট কুফর (আল-কুফরুল আসগার) : ঐসব পাপকাজকে বুঝানো হয় যেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা ব্যক্তিকে দ্বীন-ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন–নি'আমতের শোকর আদায় না

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ৩৪। আরও বলেন, আল-কুরআন,সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ২৪-২৫।

[২]. আল কুরআন,সূরা আলে-'ইমরান০৩ : আয়াত ৯০।

[৩]. আল কুরআন,সূরা আন-নিসা০৪': আয়াত ১৩৭।

[৪]. বড় কুফর পাঁচ প্রকার যথা–

ক).আল্লাহ্র অস্তিত্ব অস্বীকার করা কিংবা অন্তরে ও মুখে তাওহীদ অমান্য করার দ্বারা কুফরী। যেমন:আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ, রাসূল সা. এর নবুয়্যত বা কুরআনের কোন বিষয় অস্বীকার করা। এ মর্মে বলা হয়েছে(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়? [আল কুরআন ২৯:৬৮]

খ).সত্যকে জানা সত্ত্বেও কিংবা অন্তরে সত্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অহংকারবশতঃ মুখে অস্বীকার করার দ্বারা কুফরী। যেমন- শয়তান ও ফির'আউনের কুফরী। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) "যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল।" [আল কুরআন ০২: ৩৪] (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) "তারা(ফির'আউন ও তার দল-বল) অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর সেগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল!" [আল কুরআন ২৭: ১৩-১৪]

গ).সন্দেহের দ্বারা কুফরী। যেমন:কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করা। একে ধারণাচ্ছলে কুফরীও বলা হয়। বর্তমানকালের সংশয়বাদীরা এ শ্রেণীভুক্ত কাফির। ইরশাদ হচ্ছে (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَاأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدً-وَمَاأَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًامِّنْهَا مُنقَلَبًا-قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا) "এভাবে নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে, আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হয় তবে আমি তো নিশ্চয়ই তা অপেক্ষা উত্তম স্থান পাব। তদুত্তরে তার বন্ধু তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি পরে বীর্য হতে, তারপর পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দিয়েছেন।" [আল কুরআন ১৮: ৩৫-৩৭]

ঘ). মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কুফরী। যেমন–ইসলাম যা দাবী করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তাতে বিশ্বাস না করা। এ ধরনের কাফির সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– (وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ) "কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [আল কুরআন ৪৬:০৩]

ঙ).মুখে স্বীকার করে কিন্তু অন্তর অস্বীকার করে। মুখের স্বীকৃতির সাথে অন্তরের বিশ্বাসের মিল নেই। যেমন-মুনাফিকদের কুফরী। এ ধরনের কাফির সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ– "এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে; পরিণামে তারা বুঝে না।" [আল কুরআন ৬৫:০২-০৩]

এছাড়াও বড় কুফরের আরও কিছু ধরণ আছে। যেমন:-অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস আছে এবং মুখেও আল্লাহ্কে স্বীকার করে কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ সে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ না করা। বরং ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করা। এ ধরনের কাফিরদের মধ্যে আবূ জাহল অন্যতম। অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস আছে এবং মুখেও আল্লাহ্কে স্বীকার করে কিন্তু বিদ্বেষপ্রসূত নয় বরং অন্য কোন কারণে সে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ না করা। যেমন–রাসূল সা.এর চাচা আবূ তালিব ও রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের কুফরী। -ড. সালেহ বিন ফাওযান, *কিতবুত তাওহীদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬।

করার কুফরী। যেমন বলা হয়েছে[১]–(وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) "যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।"
বড় কুফর ও ছোট কুফর এর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন: (ক).বড় কুফর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং তার যাবতীয় নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। পক্ষান্তরে, ছোট কুফর ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না এবং তার সমুদয় নেক আমলকে নষ্ট করে না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে। (খ).বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। (গ). বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির জান ও মালের নিরাপত্তা বিলীন হয়ে থাকে; কিন্তু ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির জান ও মালের নিরাপত্তা বাকী থাকে। (ঘ). বড় কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির মাঝে ও মু'মিনদের মাঝে শত্রুতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মু'মিনদের জন্য তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বৈধ নয়। যদিও সে নিকট আত্মীয় হয়। কিন্তু ছোট কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে মিলামিশা করা যাবে এবং ভালবাসা যাবে। আর তাদের অবাধ্যতার পরিমাণ অনুসারে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে।[২]

কাফিরদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য: কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত সত্য অস্বীকার করে।[৩] তারা মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা হাশর, বিচার, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বাস্তবতার ব্যাপারে সন্দেহ ও অবিশ্বাস পোষণ করে।[৪] তারা মনে করে মৃত্যুর পর তাদের দেহ পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাবে। পৃথিবীর কর্মের জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না।[৫] তারা আসমানী কিতাবের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্র কিতাব ও দ্বীনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তারা নানা অপচেষ্টায় তৎপর। এজন্য তারা নাবী-রাসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি এবং অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে।[৬] তারা নাবী-রাসূল, আল্লাহ্র কিতাবের বিভিন্ন বিষয় এবং মু'মিনদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে কোনরূপ কুণ্ঠিত হয় না।[৭] ক্রমে তারা হয়ে পড়ে সত্যবিদ্বেষী, অকৃতজ্ঞ, অহংকারী অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সতর্কবাণী উপেক্ষাকারী।[৮] সত্যের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করে তদস্থলে বাতিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা সর্বদা মিথ্যা উদ্ভাবন, মিথ্যা প্রচার এবং মিথ্যাচারে ডুবে থাকে।[৯] এমনকি তারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করতে কোন দ্বিধা করে না।[১০] তারা আল্লাহ্র পথে বাঁধা দেয়, এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়।[১১]

তাদের অধিকাংশই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে যায়। বস্তু জগতের বাইরের জ্ঞানকে তারা অস্বীকার করে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা করাকে নিস্প্রয়োজন মনে করে।[১২] পরকালীন জীবনের প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ায় তারা দুনিয়া পূজারী ও ভোগবাদী হয়ে উঠে।[১৩] পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগ তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।[১৪] আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'আমতকে তারা অস্বীকার করে থাকে। তাদের জীবনে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, প্রতিভা ও প্রাচুর্য ইত্যাদিকে তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় অর্জন মনে করে থাকে।[১৫] তারা সর্বদা কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ্র রহমত লাভের ব্যাপারে নিরাশ থাকে।[১৬] স্বভাব ও প্রকৃতিগত দিক থেকে তারা নির্দয়, পাষাণ, যালিম, হটকরী ও চরম উগ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে।[১৭] সত্যপন্থী মু'মিনদের ব্যাপারে তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ থাকে এবং তাদের কোন কল্যাণ চায় না।[১৮]

সমাজে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা সমাজে অশান্তি, অনৈক্য-বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য সর্বদা অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি উদ্দেশ্যের জন্য তারা বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে।[১৯] তারা সমাজে কল্যাণকর কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে, বৈধ কাজে সীমালংঘন করে ও পাপাচারের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[২০] তাদের অধিকাংশই প্রবৃত্তিপূজারী, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।[২১]
প্রকৃতিগত উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের মত তাদের বিশেষ কিছু আত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে। এ সম্পর্কে অলংকার শাস্ত্রবিদ বলেন–

---

[১]. আল কুরআন,সূরা লুকমান ৩১: আয়াত ১২।
[২]. ড. সালেহ বিন ফাওযান, *প্রাগুক্ত*. পৃ.১৭-১৮।
[৩]. আল কুরআন ১৪: ০৯, ৪০: ১২, ১৮ : ১০৫।
[৪]. আল কুরআন ৪৫: ৩২-৩৩, ২২: ৫৫, ৫০ : ০২-০৩, ৩৭ : ১৬-১৭, ৪০ : ৩৪।
[৫]. আল কুরআন ৩৪: ৭-৮, ২৩: ৩৭, ১৯: ৬৬-৬৭, ২৭: ৩৮, ৬৭; ৩৪ : ০৩।
[৬]. আল কুরআন ২৫: ৭-৮, ৩২, ১৭: ৯৪-৯৫ ৩৪: ৩১, ৪০: ০৪।।
[৭]. আল কুরআন ০২: ২১২, ১৮ : ১০৬; ২৩: ১০৯, ৩৭: ১২-১৪, ৮৩:২৯-৩০।
[৮]. আল কুরআন ১৬: ২২, ৩৪: ৪৩, ১৯ : ৭৭।
[৯]. আল কুরআন ৮৫: ১৯, ৮২:২২।
[১০]. আল কুরআন ০৫ : ১০৩, ০৬: ২১, ৯৩, ৩৪: ০৮।
[১১]. আল কুরআন ১১: ১৯-২২।
[১২]. আল কুরআন ০৬: ২৯, ৪৫: ২৪।
[১৩]. আল কুরআন ১৪: ০২-০৩, ৪১: ২৬।
[১৪]. আল কুরআন ৪৭: ১২।
[১৫]. আল কুরআন ১৬: ৮৩।
[১৬]. আল কুরআন,২৯: ২৩; ১২: ৮৭।
[১৭]. আল কুরআন ১৪: ১৩; ০২: ২৫৪; ৪৮: ২৬।
[১৮]. আল কুরআন ০৪: ৮৯।
[১৯]. আল কুরআন ৩৮: ০২; ১৬: ৮৮।
[২০]. আল কুরআন ৫০: ২৪-২৫।
[২১]. আল কুরআন ০৫ : ১০৩; ২৫: ৪৩-৪৪; ৪৫: ২৩।

> "মহান আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরগুলোকে দশটি মন্দ বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। তা হল, আল-খাতামু (মোহরাঙ্কিত করা)[১], আত-তাবউ(মরিচা)[২], আদ-দায়িকু(সংকীর্ণ)[৩], আল-মারাদু(ব্যাধি)[৪], আর-রায়নু(জং)[৫], আল-মাওতু(মৃত)[৬], আল-কাসওয়াত (কঠোর)[৭], আল-ইনসিরাফু (বিমুখ হওয়া)[৮], আল-হামিইয়্যাতু(জিদ, হটকারিতা)[৯] ও আল-ইনকার(অস্বীকার করা)[১০]।"[১১]

কুফর ব্যক্তির বিশ্বাস ও কর্মের উপর ব্যাপক সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব বিস্তার করে। এটা ব্যক্তির গোটা নৈতিক ও কর্মজীবনকে প্রভাবিত করে। এটা ব্যক্তির মধ্যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করায় ব্যক্তির সমুদয় চিন্তা-ভাবনা গড়ে উঠে পার্থিব জগত কেন্দ্রিক। পার্থিব জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে তারা জগত-জীবনের গুরুরহস্য নিয়ে চিন্তা করে না। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য, চূড়ান্ত পরিণতি, মৃত্যু পরবর্তী জীবন–ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা ভাবতে চায় না। তারা অন্তরদৃষ্টিশূন্য উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় খেল-তামাশায় মত্ত থেকে জীবনকে অতিবাহিত করে। এটা ব্যক্তিকে পার্থিব সফলতায় বিভোর রাখে। এতে মানুষ পার্থিব লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হয়। পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাস অর্জনই জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দেখা দেয়। তাদের ভোগ-বিলাস প্রবণতা সম্পর্কে নাবী সা. বলেন[১২], মুমিন এক পেটে খায় (সে পরিমাণে কম খায়) ও কাফির সাত পেটে খায় (সে বেশী খায়)। এ শ্রেণীর লোকেরা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে এবং নৈতিক বাছ-বিচার গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে তারা অনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচারী জীবনে অভ্যস্ত হয়। স্বীয় স্বার্থ ও সুখ-সম্ভোগের জন্য তারা যে কোন ধরনের অনৈতিক কাজ করতে দ্বিধা করে না। মহান আল্লাহ্ বলেন-[১৩] (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) "যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়।" মহান আল্লাহ্ আরও বলেন[১৪]

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ-الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ

"কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে ভালবাসে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ হতে এবং আল্লাহ্র পথ বক্র করতে চায়; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।"

মানব জীবনে কুফরের অপরিসীম ক্ষতি সম্পর্কে মুহাম্মদ কুতুব (মৃ.২০১৪খ্রি.) বলেন[১৫]–

> পারলৌকিক জীবনকে অস্বীকার করার ফলে মানুষ প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার কাজেই সম্পূর্ণরূপে মশগুল হয়ে যায়। তখন তার যাবতীয় কর্মতৎপরতা লক্ষ্য হয়ে দাড়ায় আরাম-আয়েশের যত উপায়-উপাদান হস্তগত করা তার পক্ষে সম্ভবপর তার সবটুকু সে করবে আর এ ক্ষেত্রে কেউ তার সাথে ভাগ বসাক তা সে কখনো বরদাস্ত করবে না।বস্তুত এখান থেকেই যাবতীয় শত্রুতা ও পাশবিক সংঘর্ষের সূচনা হয়।...পরকাল অস্বীকার করার কারণে মানুষ তার আশা–আকাংখা ও চিন্তা - ভাবনা নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। তার যাবতীয় ধ্যান-ধারণার উৎকর্ষতা ও ক্রমোন্নতি বন্ধ হয়ে যায়- তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। গোটা মানবতাই চিরন্তন গৃহযুদ্ধের এক আখড়ায় পরিণত হয়। এমনি করে তার হাতে এতটুকু সময় থাকে না যে, জীবনের কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।এই নতুন জগতে স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি বা সৌহার্দের কোন স্থান থাকে না; বস্তুগত আরাম–আয়েশ সন্ধান এবং প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার নেশা এ সকল কথা চিন্তা করারই অবকাশ দেয় না এবং দেয় না বলেই জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধ এবং মহত্তসূচক আশা–আকাংখার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না।

কুফরের থেকে সৃষ্ট কুপ্রভাব সম্পর্কে আবুল হাসান আলী নদভী রহ.বলেন[১৬]–

> পরকাল অস্বীকারের স্বাভাবিক প্রভাব এই যে, পার্থিব জীবন এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু ভোগের ও স্বাদ গ্রহণের এক ধরনের পাগলামী সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভোগ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে। আজ পাশ্চাত্যের প্রতিটি কোন থেকে কেবল 'খাও দাও ফুর্তি কর' এই শ্লোগান উত্থিত হচ্ছে। তাদের গোটা জীবনেই এর পিছনে এবং এগুলো অর্জনের প্রতিযোগিতায় ব্যয়িত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা জীবনকে এক এমন একিটি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান বানিয়ে দিয়েছে যার কোন শেষ নেই। জীবনের অন্তহীন পিপাসা রয়েছে, রয়েছে এমন এক রাক্ষুসে ক্ষুধা যা কোনদিন মিটবার নয়। সকলের মুখে কেবল এক কথা-আরো চাই, আরো চাই, কেবল এক চিৎকার আরো দাও, আরো দাও। জীবনের প্রয়োজন প্রতিদিন কেবল বাড়ছে আর বাড়ছে। প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উপকরণ এবং এর ভেতর নিত্য-নতুন আবিষ্কারও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর তা শতবিধ সামাজিক সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করছে। বাণিজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা এতে সাহায্য করছে।

---

[১]. আল কুরআন,সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ০৭।
[২]. আল কুরআন,সূরা মুনাফিকূন: আয়াত ০৩।
[৩]. আল কুরআন,সূরা আল-আন'আম: আয়াত ১২৫।
[৪]. আল কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ১০।
[৫]. আল কুরআন,সূরা আল-মুতাফফিফীন: আয়াত ১৪।
[৬]. আল কুরআন,সূরা আল-আন'আম: আয়াত ৩৬,১২২।
[৭]. আল কুরআন,সূরা আয-যুমার:২২, সূরা আল-বাক্বারা: ৭৪।
[৮]. আল কুরআন,সূরা আত-তাওবা: আয়াত ১২৭।
[৯]. আল কুরআন,সূরা আল-ফাতহ: আয়াত ২৬।
[১০]. আল কুরআন,সূরা আন-নহল: আয়াত ২২।
[১১]. ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৬।
[১২].মূল আরবী[المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আত'য়িমাহ, হা.৫০৭৮; *মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, **হা. ২০৬০**।
[১৩]. আল কুরআন,সূরা আন-নামল: আয়াত ৪; আরও দেখুন, আল কুরআন ৬৭:২০, আল কুরআন ১৫: ০৩।
[১৪]. আল কুরআন,সূরা ইব্‌রাহীম: আয়াত ০২-০৩, আরও দেখুন, আল কুরআন ৪৬: ২০, ৪০:৭০-৭৫।
[১৫]. মুহাম্মাদ কুতুব, *শুবহাত হাওলাল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮-১৯।
[১৬].সীরাতে মুহাম্মদী(সা)-এর পয়গাম, আবুল হাসান আলী নদভী, অনু. আবু সাঈদ ওমর আলী,–*সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম*, সম্পা. নুরুল ইসলাম মানিক(ঢাকা: ই ফা বা, ২০০৫) পৃ.১৩।

> জীবনযাত্রার মান প্রতিদিন উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে, এমনকি প্রত্যেক লোক যখন চোখ তুলে তাকায় মনযিলে মাকসুদ তখন তা দূরে দেখতে পায়। ফল হয় এই যে , তার জীবন এ সবের লাভের আশায় ও চেষ্টা-তদবীরে নিরানন্দ ও বিষাদ হয়ে যায় এবং লোভ-লালসার এক লাগাতর আযাব ও জীবনের অন্তহীন সংগ্রামে মত্ত হয়ে পড়ে। ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি, যা মানসিক প্রশান্তি ও আত্মিক তৃপ্তির সবচেয়ে বড় মাধ্যম, দীর্ঘকাল থেকেই ইউরোপে তা দুস্প্রাপ্য।

কুফর ব্যক্তিকে অহংকারী, উদ্ধত ও দাম্ভিক বানায়। পরকালীন জীবন অস্বীকার করার ফলে কাফিরদের জীবন বল্গাহীন অশ্বের মত নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। নিজের চেয়ে উচ্চতর শক্তি তথা আল্লাহ্ বলতে কিছু আছে বলে সে মনে করে না। ফলে সে হয়ে উঠে অহংকারী ও উদ্ধত। আর অহংকারীরা সত্য প্রত্যাখ্যানে কোন দ্বিধা করে না। ফলে তাদের দ্বারা সমাজে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা ও অনাচার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন[১]– وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ পক্ষান্তরে, যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমুহ পাঠ করা হয়নি। কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।”

ক্রমাগত কুফর ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি এমনভাবে বিলোপ করে দেয় যে, ভালো কাজের পরিবর্তে মন্দ কাজসমূহ ব্যক্তির কাছে মনঃপূত হয়। ফলে তারা মন্দকর্মকে মন্দ মনে করে না এবং তাতে সর্বক্ষণ ডুবে থাকে।[২] কুফর সদগুণাবলী অর্জন ও হিদায়েতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অবিরতভাবে কুফরীতে নিমজ্জিত থাকার কারণে কাফিররা সদুপোদেশ, সদগুণাবলী ও হিদায়েত লাভের অযোগ্য হয়ে যায়। ফলে কোন সদুপোদেশ দিলে তারা অহংকার ও তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করে। মহান আল্লাহ্ বলেন[৩] وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ - وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ- “আর যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তারা তা গ্রহণ করে না। তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে।”

কুফর ব্যক্তির সুবৃত্তিগুলোকে নিঃশেষ করে ব্যক্তিকে বিবেকশূন্য নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে।[৪] বিশেষ করে তারা স্বীয় প্রবৃত্তির লালসা ও ভোগবৃত্তিকে পুরণ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যা তাদের নিকৃষ্ট পশুতে পরিণত করে।[৫] ফলে তাদের দ্বারা নানা ধরনের অন্যায়, বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। কুফরের কুপ্রভাবে আজকের পাশ্চাত্য সমাজে নিকটাত্মীয়দের মধ্যকার অবাধ যৌনাচার(অজাচার) ও সমকামসহ নানা অপকর্মে তারা পশুকেও ছাড়িয়ে গেছে। এজন্য মহান আল্লাহ্ বলেন[৬]–(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُون) “আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।”
-এ আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে–“আল্লাহ্ তা’য়ালা তাদের যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত খানা-পিনা ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে।”[৭]

কুফর মানুষকে বাতিলের অনুসারী, তাগূত ও শয়তানী শক্তির পূজারী বানায়।[৮] এটা ব্যক্তির উত্তম গুণাবলী বিনাশ সাধন করে ক্রমে তাকে শয়তানের সহচর ও কুপ্রবৃত্তির দাসে পরিণত করে। যা তাদের মন্দকাজে প্রেরণা দেয়, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং মন্দ কাজের অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না। মহান আল্লাহ্ বলেন[৯] (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) “তুমি কি দেখনি যে, আমি শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছি কাফিরদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ কবার জন্য।” –ইবনু আব্বাস রা. (মৃ. ৬৮ হি.) বর্ণনা করেন–

> (تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) এর অর্থ–‘তারা (শয়তানরা) তাদের (কাফিরদের) কে চরমভাবে গুমরাহ করে।’ মুজাহিদ র. (মৃ. ১০৩ হি.) এর অর্থে বলেন, ‘যারা চরমভাবে তাদের কামনা-বাসনা বৃদ্ধি করে দেন।’ কাতাদা র.(মৃ.১১৭ হি.) বলেন,‘যারা তাদের পাপাচার ও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়।’ সুফিয়ান সাওরী র.(মৃ.১৬১হি.)বলেন, ‘যারা তাদেরকে উত্তেজিত করে ও অস্থির করে তোলে।’ সুদ্দী র.(মৃ.১২৭ হি.) বলেন, এর অর্থ হল–‘যারা তাদেরকে চরম সীমালংঘনকারী বানায়।’[১০]

কুফর ব্যক্তির মন-মানসিকতা কলুষাচ্ছন্ন ও মন্দপ্রবণ করে ফেলে এবং সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটা ব্যক্তিকে ও সত্যবিমূখ করে ফেলে। ফলে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর কিতাব সম্পর্কে অন্যায় ও অযৌক্তিক বিতর্কে লিপ্ত হয়।[১১] ক্রমাগত সত্য প্রত্যাখ্যান ও ভ্রান্তপথ অনুসরণের কারণে তাদের এই পরিণতি। এ কারণে সত্য যত উত্তম হোক না কেন তা তাদের পছন্দ হয় না। পক্ষান্তরে, ভ্রান্তপথ যত মন্দ হোক না কেন তা ভালো লাগে না। ইরশাদ হচ্ছে[১২]

---

১. আল কুরআন,সূরা আজ-জাছিয়া: আয়াত ৩১, আরও দেখুন, আল কুরআন ৩৭: ৩৫, ১৯: ৭৭।
২. আল কুরআন,সূরা আর-রা‘দ: আয়াত ৩৩।
৩. আল কুরআন,সূরা আস্-সাফ্ফাত : আয়াত ১৩-১৪।
৪. আল কুরআন,সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১৭১।
৫. আল কুরআন,সূরা আন-নাহ্ল: আয়াত ৬০।
৬. আল কুরআন,সূরা আল-আনফাল: আয়াত ৫৫।
৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২৬৪।
৮. আল কুরআন, ৪৭: ০৩, ০২:২৫৭, ০৪ : ৭৬, ০৭:২৭।
৯. আল কুরআন, সূরা মারইয়াম: আয়াত ৮৩।
১০. ইবনু কাছীর(রহ), *তাফসীর কুরআনুল ‘আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ.২৬২।
১১. আল কুরআন ০২: ২৬; ০৬: ২৫।
১২. আল কুরআন,সূরা আল-আন‘আম: আয়াত ১২৫।

(فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ)

"আল্লাহ্ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকেও বিপদগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১]-

(وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا- وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا)

"তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; আর যখন তুমি তোমার রব এক হওয়ার কথা কুরআন হতে উল্লেখ কর তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ে।" অন্যত্র এসেছে[২]- (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُون)- "তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।"

কুফর ব্যক্তিকে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র পথে বাঁধা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে।[৩] ফলে কাফিররা সত্য ও আল্লাহ্‌র পথে বাঁধা ও বক্রতা সৃষ্টিতে সদা তৎপর হয়ে পড়ে। তারা হয়ে যায় সত্যদ্রোহী এবং সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সত্যের বিজয় হোক কিংবা সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক তা তারা কখনই চায় না। বরং তারা সত্যকে পদানত করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বশক্তি নিয়ে সর্বদা প্রচেষ্টা চালায়। সত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তারা কুচক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এজন্য তারা শক্তি ও অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে সত্যকে স্তব্ধ করতে চায়। মহান আল্লাহ্ বলেন[৪]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ- لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"আল্লাহ্‌র পথ হতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। তা এজন্য যে, আল্লাহ্ কুজনকে সুজন হতে পৃথক করবেন এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।" মহান আল্লাহ্ আরও বলেন[৫]-

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

"কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যাদ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সে সবকে তারা বিদ্রুপের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।"

কুফর ব্যক্তিকে মিথ্যাচারে নিমজ্জিত করে।[৬] ক্রমে সে এমন জঘন্য মিথ্যাচারীতে পরিণত করে যে, স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি অন্যায়ভাবে মিথ্যারোপ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। যেমন বলা হয়েছে[৭] إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ "যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।"

কুফর ব্যক্তির মধ্যে উগ্রতা, হটকরিতা, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা প্রচণ্ড হটকরী, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও সত্যদ্বীনের দুশমন হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ বা সত্য দ্বীনের কথা শুনলে ভীষণ অশ্বস্তিবোধ করে। পক্ষান্তরে, তাগুত বা শয়তানী কথাবার্তা আলোচনা হলে তারা প্রফুল্লতা বোধ করে।[৮] তারা আল্লাহ্‌র বাণী সহ্য করতে পারে না। কোথাও আল্লাহ্‌র বাণী চর্চা করা হলে তা তাদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ইরশাদ হচ্ছে[৯]–

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমন্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করবে। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বল, তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? তা আগুন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"

কুফর ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারের পথ। এটা ব্যক্তিকে সত্য ও সরল-সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করে। ফলে কাফিররা চরম উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় জীবন যাপন করে। আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃতি এবং নাবী-রাসূলদের শিক্ষামালার প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতার অনিবার্য ফল হল ভ্রষ্টতা। রাসূল সা. অবির্ভাবকালীন সময়ে আরব সমাজে যে চরম ভ্রষ্টতা, বর্বরতা ও অসভ্যতা বিরাজমান ছিল তার মূল কারণ ছিল কুফর। নানামুখী অবক্ষয়ে দিশাহারা বর্তমান

---

১. আল কুরআন,সূরা বানী ইসরাঈল: আয়াত ৪৫-৪৬।
২. আল কুরআন,সূরা আল-মু'মিনূন: আয়াত ৭০।
৩. আল কুরআন ১৬: ৮৮।
৪. আল কুরআন,সূরা আল-আনফাল: আয়াত ৩৬-৩৭।
৫. আল কুরআন,সূরা আল-কাহফ: আয়াত ৫৬, সূরা আল-মু'মিন: আয়াত ০৫।
৬. আল কুরআন,সূরা আল-বুরূজ: আয়াত ১৯।
৭. আল কুরআন,সূরা আন-নাহল: আয়াত ১০৫।
৮. আল কুরআন, সূরা আয-যুমার: আয়াত ৪৫।
৯. আল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ: আয়াত ৭২, সূরা আল-ক্বালাম: আয়াত ৫১।

পৃথিবীর মানুষের জীবনাচরণে যে অশান্তি, অনাচার ও বিভ্রান্তি তারও নেপথ্যে রয়েছে কুফর। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[১]–(وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا) "আর কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিস্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতকে অস্বীকার করলে সে তো ভীষণ পথভ্রষ্ট হবে।" আরও বলা হয়েছে[২] (وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ) "এবং যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।" আরও ইরশাদ হচ্ছে-[৩] (وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)-"যারা কুফরী করে তাগূত তাদের বন্ধু, তারা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

কুফর মানুষকে সত্য থেকে বের করে ভ্রষ্ট ও মন্দ পথে নিয়ে যায়।[৪] কুফর ব্যক্তিকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা পরিবর্তে শয়তানী শক্তির উপাসনা, শিরক ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত করে।[৫] এভাবে তা মানুষকে মহাধ্বংসে তথা জাহান্নামের পথ নির্দেশ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন[৬] إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً – إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا-"যারা কুফরী করেছে ও সীমালংঘন করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না। এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না। জাহান্নামের পথ ব্যতীত; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।"

কুফর ব্যক্তির নীতিবোধ, কৃষ্টি, জীবন-জীবিকা, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সমগ্র জীবনের সকল কার্যকলাপ বিকৃতির পথে পরিচালিত করে। এটা সমাজে যুল্‌ম ও ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে। সমাজে সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে বাঁধা সৃষ্টি করে। মানব সমাজে সংঘটিত যুলম, সীমালংঘন, ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, অপরের অধিকারহরণ, খুন-খারাবির অধিকাংশই কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তিরা জন্ম দেয়। সত্য ও ন্যায়কে তাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাঁধা হিসেবে দেখে। তারা সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে মূল্যবোধ বিসর্জনে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমতাবস্থায় তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর এরাই সমাজকে দুর্বিষহ করে তোলে। ইরশাদ হচ্ছে[৭]–

(أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ-مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ-الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ)

"আদেশ করা হবে তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে। কল্যাণকর কাজে প্রবল বাঁধা দানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।"

কুফরের কারণে কাফিরদের অন্তর, শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির উপর মোহরাঙ্কিত করা হয়। ফলে সত্যের ব্যাপারে কাফিররা অন্ধ, বধির ও বোবা হয়ে যায়। তাদের অন্তর্দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় এবং অন্তর এমনভাবে নষ্ট হয় যে, তারা সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের শ্রবণশক্তি এমন হয়ে পড়ে যে, তারা সত্য শুনতে পায় না, শুনলেও তা দ্বারা উপকৃত হয় না। তাদের দৃষ্টি এমন হয়ে যায় যে, তারা সত্য দেখতে পায় না। ফলে দ্বীনের সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসে না। ইরশাদ হচ্ছে[৮] –

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ- خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيْمٌ)

"যারা কুফরি করেছে তুমি তাদের সতর্ক কর বা না কর, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কানের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" অন্যত্র এসেছে[৯] (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا)

"নিশ্চয় আমি তাদের অন্তরে উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে সৎপথে প্রতি আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না।"

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখায় ইমাম আল-কুরতূবী রহ.(মৃ.৬৭১হি.) বলেন–

> তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়ার অর্থ–হক্ককে না বুঝা, আল্লাহ্‌র সম্বোধনকে না বুঝা এবং তাঁর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা –ভাবনা না করা। তাদের কানের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়ার অর্থ–যখন তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় অথবা তাদেরকে আল্লাহ্‌র একত্বের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের পক্ষ হতে কুরআন ও এই আহবান না বুঝা। তাদের চোখের উপর আছে আবরণ এর অর্থ–তাঁর সৃষ্টিকুল ও সৃষ্টি রহস্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে হিদায়েতপ্রাপ্ত না হওয়া।[১০]

সর্বপরি, কুফর ব্যক্তিকে মূর্খতা ও অসভ্যতা নিমজ্জিত করে। যুগে যুগে আগত নাবী-রাসূলদের সাথে সমকালীন কাফির গোষ্ঠী চরম মূর্খতাসুলভ আচরণ করে এবং সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।[১১] কুফর সবচেয়ে বড় অকৃজ্ঞতা। এতে

---

১. আল কুরআন,সূরা আন-নিসা: আয়াত ১৩৬, ০৪: ১৬৭, ২৩: ৭৪, ৩৪: ০৮।
২. আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১০৮, ১০: ১১।
৩. আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ২৫৭, আরও দেখুন, আল কুরআন ০৪ : ৭৬।
৪. আল কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৪৯।
৫. আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম: আয়াত ০১। আরও দেখুন, আল কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান: আয়াত ৫৫।
৬. আল কুরআন, সূরা আন-নিসা:আয়াত ১৬৮-১৬৯।
৭. আল কুরআন, সূরা ক্বাফ: আয়াত ২৪-২৬।
৮. আল কুরআন,সূরা আন-নূর: আয়াত ০৬-০৭।
৯. আল-কুরআন,সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৫৭।
১০. ইমাম আল-কুরতূবী *আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.১৮৬।
১১. আল কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ: আয়াত ২৩-২৪; আরও দেখুন আল-কুরআন ০২: ১৭০, ০৫: ১০৪, ১১: ২৯, ৩১: ২১, ৩৯: ৬৪, ৪৬: ২৩।

সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সীমাহীন অনুগ্রহ অস্বীকার করে থাকে।[১] তাঁর বিধান পালনে অবাধ্য হয়, যা অকৃতজ্ঞতা এবং এক ধরনের যুলম ও গুরুতর বিদ্রোহ। এটা মানব জীবনে হতাশা সৃষ্টি করে।

কুফরের পরিণাম অতীব মন্দ। কুফর ব্যক্তির সৎকর্মগুলোকে নিস্ফল করে দেয়।[২] এটা আল্লাহ্‌র ক্রোধ-অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে। এটা মানুষের পার্থিব জীবনকে অভিশপ্তময় করে। এ কারণে পরকালীন শাস্তি ছাড়াও নানা পার্থিব শাস্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। এটা বিভিন্ন সময় মানব সমাজে দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, ভয়-ভীতি, নিরাপত্তাহীতা, নানা অশান্তি ও আল্লাহ্‌র শাস্তির অন্যতম কারণ। এ কারণে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাই কুফর মানবতার জন্য অভিশাপ ও অশুভকর। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৩] وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ "আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত সেজন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।"অন্যত্র এসেছে[৪] (فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ) "যারা কুফরী করেছে আমি তাদের দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।"

কাফিররা তাদের ভালো কাজের বিনিময় পার্থিব জীবনে লাভ করে থাকে। এজন্য পার্থিব জীবনে তাদের ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তির দাপট দেখা গেলেও তা সাময়িক এবং তাদের পতন অনিবার্য।[৫] ক্ষণিকের জন্য কিছু পার্থিব সুখ-সম্ভার অর্জন করলেও তারা চূড়ান্তভাবে কখনও সফলকাম হয় না।[৬] যখন তাদের পতন নেমে আসে তখন কেউ তাদের রক্ষা করতে পারে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ্‌ বলেন[৭]– وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ "যে কেউ কুফরী করবে তাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব, অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।" মহান আল্লাহ্‌ আরও বলেন[৮]– لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ "যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে এটা স্বল্পকালীন ভোগমাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!"

কাফিরদের মৃত্যু হয় চরম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। তাদের প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহ্‌ ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের লা'নত।[৯] ফিরিশতারা অত্যন্ত অপমানজনকভাবে ও কষ্টের প্রদানের সাথে তাদের প্রাণহরণ করেন। যেমন বলা হয়েছে– وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ "তুমি যদি দেখতে পেতে ফিরিশতাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের প্রাণহরণ করছে এবং বলছে, 'তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর।এটা তোমাদের হাত যা পূর্বে পাঠিয়েছিল, আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।"[১০]

কাফিরদের জন্য পরকালে রয়েছে জাহান্নাম, যা নিকৃষ্ট আবাস এবং যার শাস্তি অত্যন্ত মর্মন্তুদ। সেখানে আগুনের শাস্তি হবে অবর্ণনীয় ও সহ্য সীমার বাইরে, যা তাদের উপর ক্রমাগতভাবে চিরকাল চলতে থাকবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন[১১]–

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ- يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُود
-وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ- كُلَّمَاأَرَادُواأَن يَخْرُجُوامِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُواعَذَابَ الْحَرِيقِ

"যারা কুফরী করে তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, ফলে যা তাদের পেটে আছে তা এবং তাদের চমড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুরি। যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে; তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা।" তিনি আরও বলেন[১২] (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًاكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ) "যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করবই; যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে।"

---

১. আল কুরআন, সূরা আন-নামল: আয়াত ৪০।
২. আল কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ: আয়াত ০৮-০৯, আরও দেখুন আল কুরআন ১৪:১৮; ৪৭: ০১, ৩২; ২৪: ৩৯।
৩. আল কুরআন,সূরা আন-নাহ্‌ল: আয়াত ১১২।
৪. আল কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান:আয়াত ৫৬, আরও দেখুন; আল কুরআন ৪৬ : ২৬, ৪০ : ২১-২২, ১৩: ৩১,৩৪।
৫. আল কুরআন, সূরা আর-রা'দ: আয়াত ৩১।
৬. আল কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন: আয়াত ১১৭।
৭. আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১২৬।
৮. আল কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ১৯৬-১৯৭।
৯. আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১৬১, আরও দেখুন;আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ: আয়াত ৩৭।
১০. আল কুরআন, সূরা আল-আনফাল: আয়াত ৫০-৫১।
১১. আল কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ : আয়াত ১৯-২২, আরও দেখুন; আল কুরআন, সূরা আল-মুল্‌ক: আয়াত ৬-১০।
১২. আল কুরআন, সূরা আন-নিসা: আয়াত ৫৬।

কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে আল্লাহ্ কিছুতেই তাদের ক্ষমা করবেন না।[১] পরকালে কোন কিছুর বিনিময়ে মুক্তি পাবে না। এমনকি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়েও তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে কখনও কোন বিরাম বা অব্যাহতি দেয়া হবে না, কিংবা শাস্তি কিছুটা লাঘবও করা হবে না আর না পাবে নিস্কৃতি।[২] মহান আল্লাহ্ বলেন[৩] –

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ -)

"যারা কুফরী করেছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ার যা কিছু আছে, যদি তাদের তার সমস্তই থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাদের নিকট হতে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। তারা আগুন হতে বের হতে চাবে; কিন্তু তারা বের হবে না এবং তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।"

কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ বরণকারী ব্যক্তিরা পরকালে স্বীয় কুফরী ও অন্যায় কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আফসোস করবে। কিন্তু তাদের অনুতাপ কোন কাজে আসবে না।[৪] তারা জান্নাত থেকে চিরবঞ্চিত থাকবে এবং কখনই জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাবে না। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৫]–

(إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ- لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ)

"যারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উঠ প্রবেশ করে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; এভাবে আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিব।"

কুফর–এর কারণ: ক.পূর্বপুরুষ, বিভ্রান্ত নেতা, সমাজপতি, শাসক, ও বিপথগামী বুদ্ধিজীবীদের সাহচর্য এবং তাদের অন্ধ অনুসরণ। খ.কুপ্রবৃত্তি, তাগূত, শয়তান ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজ বা কুপ্রথার অনুসরণ। গ.সত্যের প্রতি বিদ্বেষ, সত্যগ্রহণে হটকরিতা, অবজ্ঞা ও উদাসীনতা প্রদর্শন। ঘ. বস্তুবাদী শিক্ষা ও জ্ঞানের কুপ্রভাব এবং মহান আল্লাহ্, পরকাল ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের ব্যাপক অভাব।

মানব সমাজ থেকে কুফর প্রতিরোধে করণীয়: ক.সর্বাবস্থায় প্রকৃত সত্যের অনুসরণ করা, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য সত্যের বিপরীত কারোই আনুগত্য না করা। খ.যাচাই-বাছাই ছাড়া পূর্বপুরুষ, কোন নেতা, সমাজপতি বা দার্শনিকদের কথার অন্ধ অনুসরণ না করা। গ.বিশুদ্ধ চিত্তে মহান আল্লাহ্, তাঁর সত্য দ্বীন ইসলাম ও কুরআন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন এবং তা মেনে চলা। ঘ.দূর্বৃত্ত ও খারাপ লোকদের সাহচর্য পরিহার করা এবং জ্ঞানী আল্লাহ্ ভীরুদের সাহচর্য অবলম্বন করা। ঙ.কুফরীতে লিপ্ত করতে পারে এমন বিশ্বাস, কথা, কর্ম ও আচরণ থেকে দূরে থাকা।

❑. নিফাক বা কপটতা(النفاق):

নিফাক আল-কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। নিফাক (النفاق) শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে।[৬] আভিধানে শব্দটি অর্থ–নিঃশেষ,হ্রাস, লুকোচুরি, মরীচিকা ইত্যাদি।[৭] এছাড়া ভালোর প্রকাশ ও মন্দ গোপন করা, অপ্রচলিত, উৎসমূখ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার হয়। আল-কুরআনে নিফাক ও মুনাফিক শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট এসেছে ৩৭ বার।[৮]

পরিভাষায়–"অন্তরে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা এবং মুখে ইসলামের স্বীকৃতিকে নিফাক বলে।"[৯]

ড. সালেহ বিন ফাওয়ান বলেন–"প্রকাশ্যে নিজকে মুসলিম ও ইসলামের হিতাকাঙ্খী হিসেবে প্রকাশ করা এবং গোপনে কুফরী ও ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করাকে নিফাক বলা হয়।"[১০]

ইবনু জুরাইজ রহ. বলেন যে,–মুনাফিকের কথা তার কাজের উল্টো, তার গোপনীয়তা তার প্রকাশ্যের বিপরীত। তার আগমন প্রস্থানের উল্টো এবং উপস্থিতি অনুপস্থির বিপরীত হয়ে থাকে।[১১]

ইবনু সা'দ হুযায়ফা রা থেকে বর্ণনা করেন, হুযায়ফা রা কে জিজ্ঞাসা করা হল–"নিফাক কী? তিনি বলেন, নিফাক হল–'মুখে ইসলামের কথা বলা এবং তদানুযায়ী কাজ না করা'।"[১২]

---

[১]. আল কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ: আয়াত ৩৪।
[২]. আল কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা: আয়াত ১৬২, আরও দেখুন; আল কুরআন ০২: ৩৯, ৪১: ২৭-২৮।
[৩]. আল কুরআন, সূরা আল-মায়িদা: আয়াত ৩৬-৩৭, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ৯১।
[৪]. আল কুরআন, সূরা ফাতির: আয়াত ৩৬-৩৭, আরও দেখুন; আল কুরআন, সূরা আল-আন'আম ০৬: আয়াত ২৭-২৮, ৩০।
[৫]. আল কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ: আয়াত ৪০-৪১।
[৬].নিফাক (النفاق) শব্দটি (نا فقاء)শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। জংগলী ইঁদুরের আপন গর্ত হতে বর্হিগমনের সুরঙ্গ পথকে (نا فقاء)বলে। কারণ যখন ইঁদুরকে তার গর্তে সন্ধান করা হয় তখন সে অন্য সুরঙ্গের মধ্যে পালায়ন করে এবং তথা হতে বের হয়ে পড়ে। ভিন্ন মতে– নিফাক (نفاق) শব্দটি (نفق)শব্দ হতে গৃহীত; نفق ঐ গর্ত বা সুরঙ্গ পথকে বলা হয় যার মধ্যে ইঁদুর আত্মগোপন করে থাকে। -ড. সালেহ বিন ফাওযান, *কিতাবুত তাওহীদ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯।
[৭]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭।
[৮]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী,*আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮০৯।
[৯]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮৭।
[১০]. ড. সালেহ বিন ফাওযান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯।
[১১]. ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১ পৃ.১৭৬।
[১২]. ইমাম শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*(কায়রো: দারুল হাদীস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭), খ.০১, পৃ.৫৭।

যারা নিফাকের লালন করে তাদের মুনাফিক (الْمُنَافِق) বলা হয়। মুনাফিকদের এজন্য মুনাফিক নামে আখ্যায়িত করা হয় কারণ, তারা এক দরজা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

নিফাকের শ্রেণীভেদ:নিফাক দু'প্রকার,১.বিশ্বাসজনিত(*আন-নিফাক ফীল ই'তিকাদ*)২.কার্যজনিত(*আন-নিফাক ফীল 'আমাল*)। ক.বিশ্বাসগত নিফাক (*আন-নিফাক ফীল ই'তিকাদ*): অন্তরের মধ্যে কুফর গোপন রেখে মুখে ইসলামের প্রকাশকে নিফাক ই'তিকাদী বলা হয়। বিশ্বাসগত নিফাক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।[১] এটি বড় নিফাক। মূলত এরূপ নিফাক বড় কুফরেরই একটি প্রকার; এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির। এতে ব্যক্তি দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যায় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তার অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[২]– (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ) "তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।"

খ.কর্মের নিফাক (*আন-নিফাক ফীল 'আমাল*): বিশ্বাসই মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাহ্যিক কর্ম মানুষের আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের প্রতিফলন। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু বাইরে বিশ্বাস দাবি করে স্বভাবতই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, যা প্রমাণ করে যে, সে ঈমান ও তাকওয়ার দাবি করলেও বস্তুত তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত। হাদীসে এ জাতীয় কিছু কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস বিদ্যমান থাকবে, সে নিরেট মুনাফিক। আর যার মধ্যে থেকে এর কোন একটি অভ্যাস থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব বিদ্যমান, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। অভ্যাসগুলো হল: যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে খিয়ানত করে, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া বিবাদ করে, তখন গালি-গালাজ করে।[৩]
এ সব কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সব কর্ম 'কুফর' পর্যায়ের নিফাক বলে গণ্য হবে না। বরং কুফর আসগারের ন্যায় নিফাক আমালী (কর্মের নিফাক) বলে গণ্য হবে। এ প্রকার মুনাফিক চিরজাহান্নামী হবে না বরং জঘন্যতম পাপী।

মুনাফিকদের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য: নিফাক একটি নিকৃষ্ট গুণ। নিফাক ব্যক্তির চরিত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই মন্দ বিষয়টি মানুষের সুবৃত্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে চরমভাবে ধ্বংস করে। এটি ব্যক্তিকে ঈমান ও কুফরের মধ্যে দাদুল্যমান রাখে।[৪] এ শ্রেণীর লোক বিশ্বাসগত দিক থেকে কপট, উদ্‌ভ্রান্ত, মানসিক বিকারগ্রস্ত ও সংশয়প্রবণ হয়ে থাকে। তারা মুসলিমের ছদ্মবেশ ধারণ করলেও সন্দেহ-সংশয় ও কুফরের ব্যধিতে আক্রান্ত। তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম কিন্তু গোপনে কাফিদের সাথে আতাতকারী। মূলত তারা মু'মিনদের দুশমন, কাফির ও মুশরিকদের বন্ধু। তারা তাগূতের অনুসারী।[৫] বিশ্বাসগত দিক থেকে তাদের অনেকেই কাফির। সুবিধাজনক ও নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ছাড়া তারা মহান আল্লাহ ও রাসূলের বিধান পালন এবং আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অনীহ।[৬] দুমুখোনীতি এদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কথা ও কাজে তাদের মিল নেই।[৭] তারা স্বভাবগত দিক থেকে কপট, মিথ্যাবাদী, পাপাচারী, প্রতারক, ওয়াদাভঙ্গকারী, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু, সুযোগভোগী, স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, ছদ্মবেশী, বহুরুপী, নির্বোধ, অহঙ্কারী ও নিকৃষ্ট স্বভাবের।[৮] তারা কাজ না করেই প্রশংসা পেতে চায়।[৯] তারা নিজের আচরণ-কর্মকাণ্ডকে অন্ধভাবে ভালো ও সঠিক মনে করা এবং নিজকে অন্যের নিকট ভালো বলে উপস্থাপন করা; নিজের ভালো দিক প্রচার করা এবং খারাপ দিক এড়িয়ে যাওয়া। সুবিধা না পেলে নাখোশ হয়। তারা লোক দেখানোর জন্য ভালো কাজ করে।[১০] তারা সৎকাজে নিরুৎসাহী এবং অসৎ কাজে তৎপর ও উৎসাহী।[১১] তারা ইবাদতে অলসতা করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয়কে জরিমানা মনে করে বিরক্ত সহকারে ব্যয় করে। জিহাদ বা দ্বীনি কাজে মিথ্যা ওযর দেখায়ে কেটে পড়ে।[১২] নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য তারা সমাজে অশান্তি, দুস্কৃতি, নৈরাজ্য ও অপকর্মের জন্ম দেয়। তারা স্বভাবসুলভভাবে ফিতনাবাজ, ঝগড়াটে, মিথ্যাগুজব রটনাকারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী।[১৩] তারা প্রবৃত্তি দাস

---

[১]. বিশ্বাসগত নিফাক কয়েক প্রকার, যেমন- (১) রাসূলুলাহ সা. কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, (১) রাসূলুলাহ সা. এর আনিত সকল শিক্ষা অথবা শিক্ষার কোনো দিক বা কতক বিধানকে মিথ্যা বলে মনে করা, (২) রাসূলুলাহ সা. এর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা (৩) তাঁর কোনো শিক্ষা বা কতক বিধানকে ঘৃণা করা, (৪) তাঁর দীনের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া অথবা (৫) তাঁর দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা অথবা দীনের বিজয়কে খারাপ মনে করা।[১]

[২]. আল কুরআন, সূরা আত-ত্বালাক: আয়াত ০২-০৩।

[৩]. মূল আরবী [أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৪।

[৪]. আল-কুরআন, ০২: ১৪-১৫; ২:১০, ৪:১৪৩।

[৫]. আল-কুরআন, ৪: ৬০-৬১, ১৪৩।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৬১।

[৭]. আল-কুরআন, ৪৮: ১১, ৪:৬২।

[৮]. আল-কুরআন, ০২: ০৮-১৫; ৬৩:২, ৯:৫৭,৬৫,৭৫-৭৭,১০১-১০২, ২:২০৬, ৪:১৪২ ৪৭:২০।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৮৮।

[১০]. আল-কুরআন, ০৪: ১৪২;৩:১৮৮, ৯:৫৮।

[১১]. আল-কুরআন, ০৯: ৬৭।

[১২]. আল-কুরআন, ০৪: ১৪২; ৯:৮, ৯:৮১,৮৬, ২:২০৪।

[১৩]. দেখুন, আল-কুরআন, ০২: ০৮-১৮, ২০৪-২০৬; ০৩:১৬৭, ৬৩:০১-০৫, ০৪:৬২-৬৩, ১৪২-১৪৩, ০৯:৬৭, ৪:৮৩.২৪:১১-১৯।

ও পার্থিব স্বার্থের ভিত্তিতে পূণ্যের কাজকারী।[১] এদের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-[২] (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ)"যা তাদের অন্তরে নেই তারা তা মুখে বলে।"

নিফাক ও বর্তমান মুসলিম জাতি: মুসলিম জাতির মধ্যে সব সময় মুনাফিকদের একটি বড় অংশ ছিল এবং বর্তমান এ সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা মুখে ইসলামের কথা বললেও কিংবা কিছু কর্মের দ্বারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে জাহির করলেও তাদের কর্মকাণ্ড ইসলাম বিরুদ্ধ। এই মুনাফিক বিভিন্ন শ্রেণী বা স্তরের রয়েছে। এদের কিছু আছে ইসলামকে অস্বীকারকারী, কিছু ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বিধা-সংশয়ে দোদুল্যমান, আবার কিছু ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলেও জাহেলিয়াতের আচার-আচরণ, কুসংস্কার এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও ইসলামের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনীহ। আর কিছু ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে ঈমানের ঘোষণাও দিলেও ইসলাম ও সত্যের জন্য কোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে করতে প্রস্তুত হয় না। এদের অধিকাংশই সুবিধাবাদী ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ী থাকলে তাদের থেকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে থাকে এবং আবার ইসলাম বিরোধী বিজয়ী হলে তাদের থেকেও সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এদের কারণেই যুগে যুগে ইসলাম ও মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এরা ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে ইসলামের শত্রুদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে। এরা সর্বদা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, কলহ জিইয়ে রাখতে আমরণ চেষ্টা করে। নিজের স্বার্থ হাসিলে এরা ইসলামের বড় ধরনের ক্ষতি সাধনে দ্বিধা করে না।

নিফাকের কুপ্রভাব: নিফাক এমন একটি মন্দ গুণ, যা ব্যক্তির সুবৃত্তিকে ধ্বংস করে কুবৃত্তির বিকাশ ঘটায়। এটা ব্যক্তিকে কপট, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদীতে পরিণত করে। ফলে মুনাফিকদের চারিত্রে প্রধানত কপটতা, মিথ্যচারিতা ও বিশ্বাসঘতকতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের মনের অবস্থা এক রকম এবং বাইরের অবস্থা আরেক রকম। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৩] إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
"যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসুল। আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয় তুমি তাঁর রাসুল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" অন্যত্র বলেন[৪]-,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِيْنَ -يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ
"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি', অথচ তারা মু'মিন নয়। তারা ধোঁকা দেয় আল্লাহ্ এবং যারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা নিজেদের ব্যতীত (অন্য কাউকে) ধোঁকা দেয় না, আর তা তারা বুঝতে পারে না।"
উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মুনাফিকদের স্বরূপ এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা মিথ্যাচার, কপটতা ও প্রতারণার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

নিফাক ব্যক্তির অন্তঃকরণকে কুফর ও কপটতার ব্যাধিতে আক্রান্ত করে দেয়। ফলে নৈতিকভাবে ব্যক্তির চরম অধঃপতন ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন[৫] فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُون "তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন-পীড়াদায়ক শাস্তি, তাদের মিথ্যাচারের জন্য।" –এখানে তাদের অন্তরের রোগ দ্বারা– মুনাফিকদের অন্তর্নিহিত কুফরী ও কপটতা বুঝানো হয়েছে। জুনায়িদ বাগদাদী(মৃ.২৯৭/২৯৮হি.) বলেন–"যেভাবে অসতকর্তার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়।"[৬]

নিফাক ব্যক্তিকে চরম ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে। ফলে মুনাফিক নিজের দোষকে গুণরূপে এবং অন্যের গুণকে দোষরূপে দেখে। মহান আল্লাহ বলেন[৭] – وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ
"আর যখন তাদের বলা হয়, ঈমান আন যেরূপ লোকেরা (মু'মিনগণ)ঈমান এনেছে'; তারা বলে, 'আমরা কি (সেরূপ)ঈমান আনব যেরূপ ঈমান এনেছে বোকারা'; সাবধান! তারাই বোকা, কিন্তু (কপটতার জন্য) তারা তা বোঝে না।"
এখানে মুনাফিকরা মু'মিনদের ভালো দিক ঈমানকে মন্দ হিসেবে দেখছে,আর নিজেদের কপটতাকে ভালো হিসেবে দেখছে।

নিফাক ব্যক্তিকে দ্বৈতনীতি অবলম্বনে বাধ্য করে। ফলে মুনাফিকরা সত্য অবলম্বনে সামর্থ্য হয় না। ইরশাদ হচ্ছে[৮]–
وَإِذَا لَقُواْالَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْآمَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُون-اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ-أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ
"আর তারা যখন মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি '। আবার যখন তারা একান্তে তাদের শয়তানদের(কাফির নেতাদের) সাথে মিলিত হয় তখন বলে,'অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা তো

---

[১]. দেখুন, আল-কুরআন, ০৯: ৫৮।
[২].আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৬৭।
[৩].আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকূন ৬৩: আয়াত ০১।
[৪].আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ০৮-১০।
[৫].আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১০।
[৬]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.১১৩।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৪-১৬।

কেবল(মু'মিনদের সাথে) তামাশা করছি, আল্লাহ্ই তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তিনি অবকাশ দেন তাদের অবাধ্যতায় নিমজ্জিত থাকতে, (ফলে) তারা(উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) দিশেহারা। এরাই তারা, হিদায়াতের বিনিময়ে যারা ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি,আর তারা সঠিক পথের অনুসারীও ছিল না।"

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[১]–يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ "তারা তাদের মুখের (কথা) দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশ ফাসিক।"

নিফাক সত্য লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এ কারণে ব্যক্তির অন্তরকে এমনভাবে মোহরাঙ্কিত করা হয় যে, সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা ও বিবেকবোধ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। এটা ব্যক্তিকে সত্য উপলব্ধির ব্যাপারে অন্ধ, বধির ও বোবা করে দেয়।[২] ফলে তারা সত্য বলার ব্যাপারে হয় বোবা, সত্য শোনার ব্যাপারে হয় বধির এবং সত্য দেখার ব্যাপারে হয় অন্ধ। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ "(তারা) বধির, বোবা ও অন্ধ ; তাই তারা(সঠিক পথে) ফিরে আসবে না।" আরও বলেন[৪], اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ "তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর তারা আল্লাহ্‌র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ! এটা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে; পরিণামে তারা বুঝে না।" –এখানে নিফাকের মন্দ পরিণাম ও ভয়ানক অনিষ্টতা তুলে ধরা হয়েছে।

নিফাক ব্যক্তিকে বেঈমান ও কাফির-মুশরিকদের দোসরে পরিণত করে।[৫] এটা ব্যক্তির মধ্যে সুবিধাবাদী নীতির জন্ম দেয়।[৬] মুমিন-কাফির যারাই বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হয় এরা তাদের সাথেই বিজয়ের অংশীদারিত্ব পেতে চাটুকরিতায় মেতে উঠে। হক ও বাতিল উভয়পক্ষের সাথে এরা সদা আতাত রাখতে চায়। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-[৭]

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

"যারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতিক্ষায় থাকে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের জয় হলে বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না। আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তারা বলে আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না। আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত হতে রক্ষা করি নি? আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।"

নিফাক সমাজে অশান্তি সৃষ্টির কার্যকারণ। নিফাক ব্যক্তিকে দুস্কৃতি ও পাপাচারে নিমগ্ন রাখে। এজন্যে দেখা যায় যে, সমাজে অশান্তি, ফিতনা-ফাসাদ, অন্যায় ও দুষ্কর্মের মূলহোতা মুনাফিকরা। এরা সমাজে নিজেদের ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষের সাথে ধোকাবাজির আশ্রয় নিয়ে থাকে। এদের নীতি ও স্বরূপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৮]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ-أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ-

"আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ(অশান্তি-বিপর্যয়) করো না', তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'। সাবধান! তারাই ফাসাদকারী, কিন্তু(কপটতার জন্য) তারা তা বোঝে না।" অন্যত্র বলেন[৯]- ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا-أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا "অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তোমার নিকট এসে বলবে, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তারা যাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা বল।"

মুনাফিকরা মানবতা ও সভ্য সমাজের জঘন্য দুশমন। সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, শান্তি ও সৎকাজে বাঁধা সৃষ্টিকারী। অন্যায় ও অসৎ কাজ সংঘটনে ও প্রসারে তৎপর। এরা দুস্কৃতিকারী, মানবতার ভয়ঙ্কর শত্রু এবং মানবরূপী শয়তান। অসৎ কর্মের প্ররোচনা এবং সৎকর্মে বাঁধা প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে তারা একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। মহান আল্লাহ বলেন-[১০]

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَأَيْدِيَهُمْ نَسُواْاللّهَ فَنَسِيَهُمْ

"মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, তারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, তারা হাতবদ্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনি তাদের বিস্মিত হয়েছেন।"

নিফাক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে দূরে সরিয়ে তাগূত ও শয়তানের অনুসারী বানায়।[১] ফলে মুনাফিকরা হয় মহান আল্লাহর বিধানের বিরোধিতাকারী এবং তাগূতী শক্তির পক্ষ অবলম্বনকারী। এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২]

---

[১]. আল-কুরআন,সূরা আত্-তাওবাহ: আয়াত ০৮, আল-কুরআন ০২:২০৪-২০৬।
[২]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৪২-৪৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিক্বূন ৬৩: আয়াত ০২-০৩।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৮৯।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৪৭-৪৯।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪১।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১১-১২।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৬২-৬৩, আরও দেখুন আল-কুরআন (০২:২০৪-২০৬)।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৬৭।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ...يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ- اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে। আর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাঁধা প্রদান করেছে। ... সেদিন আল্লাহ্‌ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকট এমন শপথ করবে যেমন শপথ তোমাদের নিকট করে থাকে এবং তারা মনে করে যে, তারা ভালো কিছুর উপর আছে। জেনে রাখ, নিশ্চয় এরা মিথ্যাবাদী। শয়তান এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শয়তানের দল। জেনে রাখ, নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত।”

নিফাক ব্যক্তির অন্তরে ভণ্ডামী ও রিয়া(প্রদর্শন) প্রবণতা প্রবৃদ্ধি ঘটায়। তাই দেখা যায় মুনাফিকরা হয় ভণ্ড ও রিয়াকার (প্রদর্শনকারী)। তারা ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহী। কোন ভালো কাজ করলে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে করে না, বরং তা মানুষকে দেখানোর জন্য অথবা পার্থিব কোন স্বার্থে করে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৩] –

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً- مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً-

“নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সাথে ধোকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাদেরকে তার শাস্তি দেন আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিলের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তারা অল্পই স্বরণ করে (তারা) দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না তাদের দিকে.....।”

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ-

“তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর যদিও তারা দেয়াল ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সাদৃশ্য; তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদের বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুণ! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে।”[৪]

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ

“তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করে, সালাতে শিথিলের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে ।”[৫]

নিফাক ব্যক্তির মূল্যবোধের ভিত্তিমূলে আঘাতকারী অপশক্তি। এটি মানুষকে আত্মপূজারী বানায়। মহান আল্লাহ বলেন[৬]–

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ ...أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ- سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

“তারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং তা না দিলে বর্জন করিও।....তাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌ বিশুদ্ধ করতে চান না; তাদের জন্য আছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আখিরাতে রয়েছে তাদের মহাশাস্তি। তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত।”

নিফাক ব্যক্তিকে পাপাচারী বানায়।[৭] নিফাক ব্যক্তির মধ্যে সত্য বিরাগ ও অহংকার সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন[৮] – وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ- “আর তাদেরকে যখন বলা হয় এস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, অহঙ্কারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে।”

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে মুনাফিকদের জন্য রয়েছে চরম নিকৃষ্ট পরিণতি। তাদের স্বরূপ উন্মোচন হলে সমাজে তারা মানুষের নিকট ঘৃর্ণিত ও লাঞ্ছিত হয়–এটা তাদের দুনিয়ার শাস্তি। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। তাদের পরকালীন পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৯]– وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ “মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।” আরও বলেন[১০], إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا “মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও সহায় পাবে না।”

নিফাকের কারণ: ক. দুমুখী নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে কাফির ও মুসলিম উভয় দল থেকে সুবিধা হাসিলের আশা। খ.বিশ্বাসগত দৈনতা, সংশয় ও নির্বুদ্ধিতা। গ.কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও অসৎ সঙ্গ। ঘ.আখিরাতের উপর পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৬০।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮: আয়াত ১৬-১৯।
৩. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪২-১৪৩।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩: আয়াত ০৪।
৫. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৫৪।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৪১-৪২।
৭. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৬৭।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩: আয়াত ০৫।
৯. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৬৮।
১০. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ০৪:১৪০; ৫৮: ১৬-১৯।

প্রতিকারে করণীয়:ক.বিশ্বাসগত সব দ্বিধা-সংশয়ের অবসান ঘটানো। খ.তাওবা ও আত্মসংশোধন।গ.দ্বীনি জ্ঞানার্জন ও আমল। ঘ.দুনিয়ার উপর আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান। ঙ.পরকালীণ পরিণতি তুলে ধরে ভীতি প্রদর্শন, পরোক্ষ উপদেশ দান ও সংশোধনের চেষ্টা ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা প্রদান। চ.মন্দ লোকের সঙ্গ পরিহার এবং জ্ঞানী মুত্তাকীদের সাহচর্য অবলম্বন।

❑. রিয়া' তথা প্রদর্শন ইচ্ছা, ভণ্ডামি (الريا):

রিয়া' শব্দটি আরবী শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ–লোক দেখানো কাজ, কপটতা, ভান।[১] পরিভাষায়-রিয়া হল মানুষ তার ইবাদতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি কামনা করা।[২] অর্থাৎ মানুষকে দেখানো, মানুষের প্রশংসা পাওয়ার ইচ্ছায় বা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য কোন ভালো কাজ করা কিংবা মানুষ নিজের সৎকর্ম জানুক, শুনুক–এরূপ আকাঙ্খা করা।

রিয়া এক ভয়ানক আত্মিক ব্যধি। এর কুফল ব্যাপক। এটা মুমিনের নেক কাজ ধ্বংস করার শয়তানি কুমন্ত্রণা। এটা এক ধরনের শিরকও বটে। এর মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মিক কলুষতা ও ভণ্ডামি বৃদ্ধি পায়। রিয়াকারী মানুষের নিকট তার ইবাদত ও পরহেযগারী সম্বন্ধে অবহিত করতে ইচ্ছা করে যাতে এর দ্বারা তাদের থেকে প্রশংসা, সুনাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি বা কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে পারে। এ কারণে এরূপ ব্যক্তির ইবাদত বাতিল হয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে ঘৃর্ণিত ও লাঞ্ছিত হয়। রিয়াকারীর নৈতিক দৃঢ়তা থাকে না। এরা অহঙ্কার, আত্মপ্রীতি, প্রবৃত্তিপূজা ও সমাজ পূজায় লিপ্ত থাকে। এ প্রকার মানুষ কপটে পরিণত হয়। কুরআন মুনাফিকদের যে সব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে এটা তার অন্যতম।[৩] এরা হিদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়। এদের নিন্দায় বলা হয়েছে[৪]– فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ " সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।"

বর্তমান মুসলিম জাতি এই সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। এর ফলে সমাজে লোক দেখানো বা সুনামের অর্জন, পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে দান-সাদাকা, সমাজ সেবা, জনকল্যাণমূলক কাজ, বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ ও ধার্মিকতার নামে বাহ্যিক বেশাভূষা ধারণ করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। এ সম্পর্কে নাবী(সা.) পূর্বেই সতর্ক করে বলেন[৫], "আমি তোমাদের ব্যাপারে সর্বাধিক ভয় করি ছোট শিরকের ব্যাপারে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করল-হে নাবী! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, রিয়া। যেদিন মহান আল্লাহ বান্দাদের তাদের কর্মফল দিবেন সেদিন তাদের বলবেন, দুনিয়াতে তোমরা যাদের প্রদর্শন করতে তাদের নিকট গিয়ে দেখ কোন প্রতিদান পাও কিনা।"

রিয়া একটি গুপ্তঘাতক, যা নেক 'আমলসমূহকে ব্যর্থ ও নিঃশেষ করে দেয়। তা মানুষকে শিরকে লিপ্ত করিয়ে মহান আল্লাহ্‌র অসন্তোষভাজন করে এবং জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[৬]- وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاء قِرِينًا-"এবং যারা মানুষকে দেখাবার জন্য তাদের ধন–সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না। আর শয়তান কারও সংগী হলে সে সংগী কত মন্দ।" অন্যত্র বলা হয়-[৭] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ -হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি।

রিয়ার অপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সা.) কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চরণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

- •আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না যে বিষয়টি আমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? সাহাবাগণ বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'শিরকে খফী' বা গুপ্ত শিরক। [এর দৃষ্টান্ত হলো] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এজন্যই তার নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার নামাজ দেখছে।[৮]
- •যে ব্যক্তি লোককে শোনানোর জন্য ইবাদত করেছে আল্লাহ তা লোকদের শুনিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তি লোকদের দেখানোর জন্য কোন কাজ করেছে তা তিনি লোকদের দেখিয়ে দেবেন।[৯]
- •অনেক রোজাদার রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা-পিপাসা ব্যতীত আর কিছুই পায় না এবং অনেক ইবাদতকারী ইবাদতের বিনিময়ে অনিন্দ্রা-কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই পায় না।[১০]
- •ইবরাহীম আদহাম রহ.(মৃ.১৬৫হি.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কাছে প্রসিদ্ধি কামনা করে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করেনি।"[১১]

---

[১]. মুহাম্মদ 'আলা উদ্দীন আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.১৩৮৭।
[২]. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, *আল-খাত্বায়া ফী নাযরিল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৭৭)পৃ.৫৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'উন ১০৭: আয়াত ০৪-০৬।
[৫]. মূল আরবী [ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز و جل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৫, পৃ.৪২৮; হাদীস নং ২৩৬৮০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৮: ৪৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ ০২: আয়াত ২৬৪।
[৮].মূল আরবী[ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟ قال قلن بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪২০৪; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৩ পৃ.৩০, হাদীস নং ১১২৭০।
[৯]. মূল আরবী [من يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩৮১।
[১০].মূল আরবী[رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع . ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر] ইবন মাজাহ, কিতাবুস সিয়াম, হা.১৬৯০; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০২, পৃ.৩৭৩; হা.৮৮৪৩।
[১১]. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬।

রিয়ার আলামত: রিয়া গোপন বিষয় হলেও এর বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে এর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মানুষের নিট স্বীয় ইবাদত ও নেক কাজ প্রচার করতে পছন্দ করা, নিজ নামের পূর্বে প্রশংসাসূচক শব্দ আলহাজ্ব, দানবীর, সমাজ সেবক, পীরে কামেল ইত্যাদি ব্যবহার করা, দ্বীনদারী প্রকাশের জন্য তসবীহ হাতে নিয়ে জনসম্মুখে যাওয়া। মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও জনকল্যাণ কাজ করে প্রচারের জন্য নামফলক ব্যবহার করা, তবে প্রদর্শন ইচ্ছা ছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে নামফলক ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষের সামনে নিজেকে দোষারোপ করা যাতে মানুষ তার বিনয় দেখে আরও সম্মান ও প্রশংসা করে। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রিয়াকার ব্যক্তির আলামত চারটি যথা- (ক) একাকী থাকা অবস্থায় সে (সৎ আমলে) অলসতা করে (খ) মানুষের সাথে থাকলে সে তৎপর হয় (গ) সে কাজ বেশী করে যখন তার জন্য তাকে প্রশংসা করা হয় (ঘ) আর তা কম করে যখন সেজন্য তাকে নিন্দা করা হয়'।[১]

রিয়ার কারণ: বিভিন্ন কারণে মানুষ রিয়ায় লিপ্ত হয়। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হলো: ক.সঠিক দ্বীনি জ্ঞান ও বুঝের অভাব। খ.পার্থিব সুনাম-সুখ্যাতি ও স্বার্থ হাসিলের বাসনা। গ.শয়তানী কুমন্ত্রণা, প্রবৃত্তির তাড়না ও নিফাকের ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া।

রিয়া থেকে মুক্ত হতে করণীয়: রিয়া অতি গুপ্ত ও সূক্ষ্ম বিষয়। এটা এমন প্রচ্ছন্নভাবে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে, তা রাতের আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিপড়াঁর নিঃশব্দে বিচরণের চেয়েও সূক্ষ্মতর। তাই এ থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন [২]- فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا -"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।" এ ব্যাপারে সতর্ক করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৩]–

> হে লোক সকল, তোমরা এই শিরক বেঁচে থাক। কেননা তা পিপড়াঁর পদচারণার চেয়েও অধিক গুপ্ত ও সূক্ষ্ম। সাহাবীগণ এ থেকে বাচাঁর পন্থা জানতে চাইলে রাসূল সা. বলেন, তোমরা সর্বদা এই দু'আ করবে-[اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم] 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় চাই জ্ঞাতসারে শিরক করা থেকে এবং ক্ষমা চাই অজ্ঞাতসারে করা শিরক থেকে।'

রিয়া বর্জনে করণীয় বিষয়গুলো হলো: ক.রিয়ার কারণসমূহ সনাক্তকরণ এবং তার পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা। খ.নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করে বেশী বেশী তাওবা-ইসতিগফার করা এবং রিয়ার পরকালীন পরিণতি চিন্তা করা। গ.সকল ইবাদতে ইখলাস অবলম্বন এবং রিয়া থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করা। ঘ.ইবাদত বা নেক কাজ যতদূর সম্ভব গোপনে করা এবং তা বলাবলি না করা। ঙ.রিয়ার উদয় হওয়া মাত্রই শাস্তির বিধান করে তা বিতাড়নে সচেষ্ট হওয়া।

❑. বিদা'আত (البدعة):

বিদ'আত শব্দটির আভিধানিক অর্থ–পূর্ব নমুনা ছাড়া নতুনভাবে কোন কিছু উদ্ধাবন করা, নতুন উদ্ভাবন। পারিভাষায় বিদ'আত হল, দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, যা রাসূল সা. এর যুগে ছিল না এবং যা সাহাবা কিরাম ও তাবি'য়ীগণের সময় অনুসৃত হয়নি। কুরআনে বিদ'আ শব্দটি ০১বার ও ক্রিয়ায় ০১বার এসেছে।
রাগিব আল-ইসফাহানী(মৃ.৫০২হি.)বলেন–দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হল, নতুনভাবে কোন মতের প্রবর্তন করা। প্রবর্তনকারী সেক্ষেত্রে শরী'আত প্রবর্তক [তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.], সালাফে সালেহীন (সাহাবা, তাবি'উন ও তাবা' তাব'ঈন) ও শরী'আতের সুদৃঢ় উৎস (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা) সমূহের কোনটিরও অনুসরণ করেনি।[৪]

ইমাম শাতেবী (মৃ.৭৯০হি.)বলেন- প্রকৃতপক্ষে বিদয়াত তাই যার স্বপক্ষে ও সমথর্নে শরীয়াতের কোন দলীলই নেই। না আল্লাহর কিতাব, না রাসূলের হাদীস, না ইজমার কোন দলীল, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায়– যা বিজ্ঞজনের নিকট গ্রহণযোগ্য। না মোটামুটিভাবে, না বিস্তারিত ও খুঁটিনাটিভাবে। এর জন্য নাম দেয়া হয়েছে বিদ'আত। কেননা তা মনগড়া, স্বকল্পিত, শরীয়তে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।[৫]

বিদ'আতীদের চেনার কিছু নিদর্শন রয়েছে যার মাধ্যমে তাদের সনাক্ত করা যেতে পারে। যেমন: ক. তারা কুরআন ও হাদীসের ওপর মনগড়া যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়। খ.রাসূলুল্লাহ সা. এর শিক্ষা ও সুন্নাত সম্পর্কে তারা উদাসীন থাকে। গ.শরী'আতের মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তারা অসচেতন থাকে। ঘ. তারা দ্ব্যর্থবোধক, অস্পষ্ট বিরল ও অতি দুর্বল দলীলসমূহকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। ঙ. তারা নাবী-রাসূল ও বুযর্গ লোকদের সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। চ.তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে। ছ. বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করে। জ. হাদীসের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। ঝ. প্রতিপক্ষকে কথায় কথায় কাফির বলে। ঞ. ক্ষমতাবানদের

---

[১]. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *কিতাবুল কাবায়ের, প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮: আয়াত ১১০।
[৩].*আল-মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা*, খ.০৬, পৃ.৭০ কিতাবুদ দু'আ, রিওয়ায়েত নং ২৯৫৪৭।
[৪]. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৪৯,
[৫]. ইমাম শাতেবী, *আল-ই'তিসাম* (মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াহ আল-কুবরা, তা.বি.), খ.০১, পৃ.২৮৬।

সহযোগিতায় প্রতিপক্ষকে দমনের চেষ্টা করে। ট. তর্ক ও বিবাদ করে। ঠ. উম্মাতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। ড. ইবাদতের মাধ্যমে স্বার্থ কিংবা অর্থকড়ি উপার্জনের চেষ্টা করে।[১]

বিদ‘আতের অকল্যাণ: মানুষকে সত্য থেকে বিভ্রান্তকারী বিষয়সমূহের মধ্যে বিদ‘আত অন্যতম। বিদ‘আতের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন ইসলামে নানা বিকৃতি সাধন, ভ্রান্ত রীতি-নীতি সংযোজন বা বিয়োজন এবং মুসলিম সমাজে ভুল প্রচলনের প্রসার ঘটানো হয়। বিদ‘আত ইসলামের উপর একটি বড় আঘাত। বিদ‘আত দ্বীনে সূক্ষ্ণ বিষ তুল্য। শিরক, কুফর ও নিফাক মানুষকে প্রকাশ্যে বিভ্রান্ত করে, কিন্তু বিদ‘আত মানুষকে এমন সূক্ষ্ণভাবে সত্যচ্যুত করে ফেলে, অথচ ব্যক্তি নিজকে সত্যপন্থী মনে করে। বিদা‘আতের ফলে মূল দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি আসে। বিদা‘আতের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এটা সমাজে অনেক শরীয়ত বিরোধী কাজের প্রচলন ঘটায়, যা মানুষকে ক্রমে ভ্রষ্টতার দিকে ধাবিত করে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিদ‘আতে কিছুটা ভালো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিদ‘আত গোমরাহীর উপলক্ষ। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[২] قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا -الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا "বল, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? তারাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্মই করছে।"
–উদ্ধৃত আয়াতে বিদ‘আতী কর্মের পরিণতি বর্ণনা করে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে।
এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ভাষণে বলেছেন[৩], ‘নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কথা হ’ল আল্লাহ্র কিতাব, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হ’ল মুহাম্মাদ (সা.) এর হিদায়াত। সর্বনিকৃষ্ট কাজ হ’ল (শরী‘আতের মধ্যে) নব আবিষ্কার। আর প্রত্যেক নব আবিষ্কারই বিদ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম’।
তিনি আরও বলেন–"যে লোক এমন কোন কাজ করলো যে বিষয়ে আমাদের কোন অনুমোদন নেই তা বর্জনীয়।"[৪]

বিদ‘আত দ্বারা দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজনের করা হয়–যা চরম ভ্রষ্টতা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় মহান আল্লাহ ইসলামের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। [আল-কুরআন ৫:৩] কাজেই ইসলামে নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজনের জঘন্য অন্যায় ও গর্হিত। এতে রাসূল সা. ও সাহাবাগণের চাইতে নিজেদের উত্তম মনে করা হয়। এতে বিদ‘আতী নিজেকে শরী‘আত প্রবর্তকের স্থলে অভিষিক্ত করে–যা নিজেকে মহান আল্লাহ সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার শামিল। বিদ‘আত সুন্নত নির্মূলকারী, বিদ‘আত প্রচলনের ফলে সুন্নত ক্রমশ কমে যায়। এটা মুসলিম জাতির মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ও বিভক্তি-বিভাজন সৃষ্টি করে এবং মুসলিম ঐক্য- সংহতিতে আঘাত হানে। বিদ‘আত মুসলিম সমাজে আল-কুরআন ও আল-হাদিসের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। বিদ‘আতীরা নিজেদের হীনস্বার্থে দ্বীনকে অপব্যবহার করে। তাছাড়া নিন্দনীয় হওয়ার দিক থেকে বিদ‘আত বিভিন্ন পর্যায়ের–এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা সরাসরি কুফর, কোনটি কুফর পর্যায়ের, কোনটি হারাম, কোনটি কবীরা গুনাহ, কোনটি মাকরুহ। তাই রাসূলুল্লাহ যথার্থই (সা.) বলেছেন[৫], "সাবধান! তোমরা নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ। আর প্রত্যেকটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই হল বিদ‘আত। আর প্রতিটি বিদ‘আত ভ্রান্ত।’ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) যথার্থই বলেছেন,

> পাঁচটি জিনিস থেকে দূরে না থাকা অবধি মানুষের অন্তর নিরাপদে থাকে না। (১) শিরক থেকে, যা তাওহীদের বিরোধী (২) বিদ‘আত, যা সুন্নাহ্র পরিপন্থী (৩) লোভ-লালসা, যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণকারী (৪) অলসতা, যা আল্লাহ্র স্মরণের বিপরীত (৫) প্রবৃত্তি, যা দ্বীনের অনুসরণ এবং খাঁটি মনে ইবাদত করার পরিপন্থী। এই পাঁচটি বিষয় আল্লাহকে পাওয়ার পথে বাধা। এদের প্রত্যেকটির অধীনে আবার অসংখ্য ভাগ রয়েছে। সেজন্য বান্দাকে সর্বদা আল্লাহ্র নিকট সরল-সঠিক পথের দিশা লাভের জন্য অবশ্যই দো‘আ করতে হবে। আল্লাহ্র নিকট বান্দা সরল পথ লাভের জন্য দো‘আ থেকে অন্য কোন কিছুর বেশী মুখাপেক্ষী নয় এবং দো‘আ থেকে অধিক উপকারীও অন্য কিছু নেই।[৬]

কিছু আলিম বিদ‘আতে ভালো ও মন্দ দু’ভাগে ভাগ করেছেন। মূলত তারা যাকে ভালো বিদ‘আত বলেছেন তা দ্বারা আভিধানিক বিদ‘আতেই উদ্দেশ্য। তাই প্রতিটি বিদ‘আতে শার‘ঈ (পারিভাষিক বিদ‘আত) ভ্রষ্টতা বা ভ্রষ্টতার উপলক্ষ। এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন,

> ‘আমাদেরকে (বুঝানোর জন্য) রাসূল (সা.) একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর এর ডানে-বামে আরো কতগুলি রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলোও রাস্তা; তবে এর প্রত্যেক রাস্তার উপর একটি করে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে; সে লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান করে। অতঃপর (এর প্রমাণে কুরআনের এই আয়াতটি) তেলাওয়াত করলেন, ‘এটাই আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এটারই অনুসরণ করবে এবং অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করবে না, করলে এটা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ’তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে’। [সূরা আল-আন‘আম : ১৫৩]।[৭]

---

[১]. দেখুন, ড. আহমদ আলী, *বিদ‘আত* (চট্টগ্রাম: খাকী প্রকাশনী, ১ম সং, ২০১১) খ.০১, পৃ. ১৭৪-১৮৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ১০৩-১০৪।
[৩]. মূল আরবী [إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবু সালাতিল ঈদাঈন, হা. নং ১৫৭৮।
[৪].মূল আরবী [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সুলহ, হা. নং ২৫৫০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আকদিয়াহ, হা. ১৭১৮।
[৫].মূল আরবী [فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জুমু‘আহ, হা.৮৬৭; *ইবন মাজাহ*, হা.৪৬।
[৬]. ইবনুল ক্বাইয়িম, *আল-জাওয়াবুল কাফী (আদ-দাই ওয়াদ দাওয়া)*, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৮৪-৮৫।
[৭]. মূল আরবী[خط لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل قال يزيد متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ { إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله }] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০১, পৃ.৪৩৫; হাদীস নং ৪১৪২।

ইহুদী ও খৃষ্টান জাতি তাদের নিজ নিজ আসমানী ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করার মাধ্যমে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং দীর্ঘকালব্যাপী বিশাল মানব গোষ্ঠীকে সত্যচ্যুত করেছে। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির মত হুবহু বিকৃতি না হলেও মুসলিম জাতির মধ্যে নানা বিদ'আতের উদ্ভব হয়েছে, যা ইসলামকে যথার্থ উপাস্থাপনের পরিবর্তে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত হচ্ছে। এজন্য বিদ'আতের বিষয়ে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[১],

> তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে সে বহু ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে। অতএব সে সময় তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। আর সাবধান! তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে) নতুন কাজ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন কাজই বিদ'আত'।

বিদ'আত মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর বিধানের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। বিদ'আত মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং মানুষের অন্তরকে কলূষিত করে। এটা রাসূল সা.এর আনুগত্য থেকে মানুষকে বের করে দেয়। বিদ'আতদের উপর মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লা'নত বর্ষিত হয়। তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। তাদের তাওবা করার সুযোগ হয় না। এরা যাদের বিভ্রান্ত করবে তাদের পাপভার বহন করবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[২],

> যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতি চালু করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান প্রতিদানও সে পাবে। তবে তাদের প্রতিদান থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে সে তার কাজের পাপ ও তার দেখাদেখি পরবর্তীতে যারা তা করবে তাদের সমান পাপের অধিকারী হবে। তবে তাদের পাপ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না'।

বিদ'আতের পরিণতি অতি মন্দ। বিদ'আতীরা রাসূল সা. এর সুপারিশ পাবে না এবং তাদের হাওযে কাওছার থেকে বিতাড়িত করা হবে। এ সম্পর্কে নাবী(সা.) বলেন-[৩],

> 'আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের (হাউয আল-কাওছার) নিকটে পৌঁছে যাবে। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে, সে হাউযের পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে সে কখনও পিপাসিত হবে না। নিঃসন্দেহে কিছু সম্প্রদায় আমার সামনে (হাউযে) উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। এরপর আমার ও তাদের মাঝে আড়াল করে দেওয়া হবে। আমি তখন বলব, তারাতো আমারই উম্মত। তখন বলা হবে, তুমি জান না তোমার (মৃত্যুর) পরে এরা কি সব নতুন নতুন কথা ও কাজ সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি বলব, দূর হোক, দূর হোক (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে), যারা আমার পরে দ্বীনের ভিতর পরিবর্তন এনেছে'।

বিদা'আতের কারণ: ক.ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা। খ.সুযোগ্য জ্ঞানী আলিমের অভাব এবং হকপন্থী আলিমদের নীরবতা। গ.স্বল্প শিক্ষিত আলিমদের অন্ধ অনুকরণ, গোঁড়ামি ও ভুল প্রচারণা। ঘ.মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক মতদ্বন্দ্ব, সংকীর্ণতা ও হীনস্বার্থপরতা। ঙ.দুর্বল ও জাল হাদীসের উপর নির্ভরতা। চ.বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সংস্কৃতির কুপ্রভাব।

বিদা'আত প্রতিরোধে করণীয়: ক.বিশুদ্ধ সূত্র থেকে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানার্জন করা। খ. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর মোকাবেলায় ভুল ও দুর্বল মতবর্জন। গ.কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী সকল বিশ্বাস ও কর্ম পরিহার করা। ঘ. প্রকৃত সত্যের ব্যাপারে হকপন্থী আলিমদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা। ঙ.বিদ'আতদের সংশোধনে কাজ করা, প্রয়োজনে তাদের বর্জন করা। চ. অন্ধানুকরণ, গোঁড়ামি ও ভুল প্রচারণা পরিহার করা।

❑.ফুসূক, পাপাচার ও অবাধ্যতা এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপরিচ্ছন্নতা(الفسوق):

ফুসূক শব্দটি আরবী 'ফিসক' (فَسَق) শব্দ থেকে নির্গত, যার আভিধানিক অর্থ–বের হয়ে যাওয়া। পরিভাষায়–"ফিসক হল, আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কখনও কখনও কুফরী ও নাফরমানীর দ্বারা বের হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফাসিক ব্যবহৃত হয়।"[৪] কারো কারো মতে, "নাফরমানী, আল্লাহর আদেশ ত্যাগ, সত্যপথ পরিহার করে চলা এবং পাপের দিকে ঝোঁকার নামই হচ্ছে ফুসূক।"[৫] আয-যামাখশারী বলেন, 'কবীরা গুনাহ করার কারণে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের গণ্ডি থেকে বের হয়ে সে ফাসিক।'[৬] আর আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া মহান স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস পোষণের কারণে হতে পারে, আচার-আচরণ ও কর্মগত অবাধ্যতার কারণেও হতে পারে। এজন্য ফাসিক শব্দটি কাফির-এর স্থলেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কুরআনের অধিকাংশ স্থানে ফাসিক শব্দটি কাফির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৭] অবশ্য পাপী

---

[১].মূল আরবী [فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস নং ৪৬০৭।

[২].মূল আরবী[من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ১০১৭।

[৩]. মূল আরবী [إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم)(فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي)] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৬২১২; *সহীহ মুসলিম* কিতাবুল ফাদায়িল, হাদীস নং ২২৯০, ২২৯১।

[৪]. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*,খ.০১, পৃ.২৪৬।

[৫]. আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ* (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) খ.০১ পৃ.১৪৮।

[৬]. আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ* (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), খ. ০১, পৃ.১৪৮।

[৭]. কুরআনে অধিকাংশ স্থানে ফুসূক দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন– وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ-"আর যখন আমি ফিরিশতাদের বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে জিন্নদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।" [আল-কুরআন ১৮:৫০] এখানে ফুসূক দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৯:৬৭; ৩২: ২০।

মু'মিনদেরকেও ফাসিক বলা হয়। ফিকাহশাস্ত্রের পরিভাষায় সাধারণত শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। তাঁদের পরিভাষায় ফাসিক শব্দটি কাফির-এর সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। কাজেই ফাসিক হল, যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তাওবা করে না, বা অবিরাম সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার ফলে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপ ঔদ্ধত্য সহকারে প্রকাশ্যভাবে করতে থাকে তাকে ফাজির বলে।[১] আল-কুরআনে ফাসিকের পরিচয় ও স্বরূপ তুলে ধরে বলা হয়েছে[২] –

الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

"ফাসিক তারাই, যারা আল্লাহ্‌র সংগে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে এবং তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে(ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, বিধি-বিধান ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে), যা আল্লাহ্ অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করে এবং এরাই তারা (যারা) ক্ষতিগ্রস্ত।"

ফিসক(فَسق) মূলধাতু কুরআনে শব্দটি বিভিন্নরূপে ৫৪বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] পাপাচার ও অবাধ্যতার আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে কুরআনে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,খাত্বিয়াহ, যানব, ইসম, সায়্যিআহ বা সু, ইসইয়ান,'উতূ, ইত্যাদি।[৪]

পাপ ও অপরাধ দু'ধরণের। ক.কবীরা গুনাহ বা বড় পাপ, খ. সগীরা গুনাহ বা ছোট পাপ। কবীরা গুনাহ হলো যে সব পাপ যার জন্য কুরআন ও হাদীসে ধমক বা শাস্তি কথা এসেছে এবং যা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। আর সগীরা গুনাহ হলো যে সব পাপ যার জন্য কুরআন ও হাদীসে ধমক বা শাস্তি কথা আসেনি তবে সেগুলোকে মন্দ বা অপরাধ বলা হয়েছে।

মানব জাতির সব অশান্তি ও দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ হলো পাপ। পাপ শুধু আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপাদান নয়, বরং পাপ ব্যক্তির স্বাস্থ্য, তার জ্ঞান ও কার্যাবলীর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং অন্যের ক্ষতি সাধন ও অধিকার নষ্ট করে তাই পাপকে হারাম করা হয়েছে। পাপ ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতিকারক। পাপ, অপরাধ, পাপাচার, সীমালংঘন, অবাধ্যতা মানুষকে নানাপ্রকার দুর্যোগ, দুর্দশা ও উত্তেজনায় জড়িয়ে দেয়। এ কারণে সমাজে ভয়-ভীতি, উদ্বেগ-উৎকন্ঠা ও নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়ে। এতে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে এবং সমাজ কলুষিত হয়। সমাজে পাপাচার ও অনাচার বেড়ে যায়। কোন জাতির মধ্যে পাপকাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে সে জাতির মধ্যে নানা দুর্যোগ নেমে আসে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৫] وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ-"তোমাদের যে বিপদ–আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"

মানব জীবনে পাপ ও অপরাধের অকল্যাণকারিতা সম্পর্কে আফীফ আবদুল ফাততাহ বলেন- পাপ মানব জাতির জন্য ডেকে আনে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি। কোন সময় এ শাস্তি হয় বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে। আবার কোন সময় ফাসাদ, বিপর্যয়, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের রূপে এ শাস্তি নেমে আসে জাতির মধ্যে। যার কারণে অসংখ্য রক্তপাত ঘটে এবং ধ্বংস নেমে আসে।[৬]

পাপ ও অনৈতিকতা ব্যক্তির অন্তরকে কলূষিত ও নষ্ট করে। পাপের কারণে ব্যক্তির সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায় এবং অন্তর থেকে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার অনুভূতি চলে যায়। ক্রমাগত পাপ ও অপরাধ অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কঠোর করে ফেলে। এরূপ পাপীদের অন্তর শক্ত ও সত্যবিমুখ হয়ে পড়ে। তা মানুষকে গোমরাহী, কপটতা, সত্যত্যাগী, দূরাচারী পাপীতে পরিণত করে।[৭] ফলে মানুষের ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিবেকবোধ নষ্ট হয়ে

---

[১]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১ম খণ্ড,(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৩তম সং, ২০০৯) পৃ.১৫৫।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬-২৭।

[৩]. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩০-৬৩১।

[৪]. **খাত্বিয়াহ, যানব, ইসম, সায়্যিআহ বা সূ, ইসইয়ান, 'উতূ, শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ।**

•**খাত্বিয়াহ** অর্থ-ভুল, পাপ, অপরাধ। খাত্বিয়াহ বলা হয় স্বেচ্ছায় বা ভুলে কোন পাপ করাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "হ্যাঁ, যে মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে নিবে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী।"[৪]

•**ইসম** অর্থ-পাপ ও অবৈধ কাজ। ইসম বলা হয় সেই কর্মকে যে কর্মের সাথে জড়িত ব্যক্তি ভর্ৎসনার হকদার হয়।[৪] মহান আল্লাহ বলেন- وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ "তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর, যারা পাপ করে অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে।"[৪]

•**যানব** অর্থ-হল অন্যায়, পাপ ও অবাধ্যতা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ "অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি।"[৪]

•**সায়্যিআহ** বা **সূ** অর্থ-গর্হিত ও মন্দ কাজ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ "তবে কি যারা মন্দকাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ।"[৪]

•**ইসইয়ান** হলো আনুগত্য ও বশ্যতার বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন- وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ "আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে।আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।"[৪]

•**উতূ** হলো ঔদ্ধত্য প্রকাশ সহকারে যে অবাধ্যতা বা সীমালঙ্ঘন করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا "কত জনপদ তাদের প্রতিপালক ও তার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি।"[৪]

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৩০; আরও দেখুন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৪১; সূরা আল-আন্'আম ০৬ : আয়াত ৬৫।

[৬]. আফীফ আবদুল ফাততাহ তাববারা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ১০৪; আল-কুরআন ১৪:২৭, ৫:১৩, ২:২৫৭।

যায়, মানুষ অন্ধ, বধির ও বোবা সাদৃশ্য হয়ে যায়।[১] এতে মানুষের নিজেদের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্য ছিনিয়ে নেয়া হয়। ফলে তারা হিদায়েত লাভের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেছেন-[২],

মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি তওবা করে পাপ কাজ ছেড়ে দেয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তার অন্তর পরিচ্ছন্ন করে দেয়া হয়। যদি সে আরও পাপ করে তবে কালো দাগ বৃদ্ধি পায় এমনকি তার সমগ্র অন্তর কালিমায় ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ) "বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়েছে।[সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন: ১৪]"

পাপ ব্যক্তির অন্তরকে শক্ত ও কঠোর করে ফেলে। রাসূল (সা.) বলেন[৩],"একজন মুমিন তার পাপকে এতই ভয়াবহ মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ের নিচে বসে আছে, আর সে পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়ার ভয় করছে। কিন্তু পাপাচারী ব্যক্তি তার পাপকে তার নাকের উপর বসা মাছির তুল্য মনে করে।"

এক পাপ মানুষকে আরেক পাপের দিকে আকর্ষণ করে। ক্রমাগত পাপ শুধু মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। পাপ মানুষকে আল্লাহর গযব ও অভিশাপ নিপতিত করে। ফুসূক(পাপাচার-অবাধ্যতা) যেহেতু কুফর ও নিফাকের অংশ। তাই যারা ক্রমাগত পাপাচার-অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে তারা কুফর ও নিফাকে নিমজ্জিত হয়ে যায়। বনী ইসরাইলের ক্রমাগত দুষ্কর্ম ও পাপ তাদেরকে মহান আল্লাহ গযব ও অভিশাপে নিক্ষেপ করেছিল, যার ফলে তারা বিভিন্ন দুর্ভোগ ও বিপদে পতিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ-"আর তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গো-বাছুর প্রীতি সিঞ্চিত করা হয়েছিল।" অন্যত্র বলেন[৫]–لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ" কুফুরীর জন্য আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।" এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদীদের এক পাপ তাদের অন্য পাপের দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং ক্রমাগত পাপাচার কারণে তারা অভিশপ্ত ও ধ্বংস হয়েছিল।

পাপ মানুষকে সৌভাগ্য, কল্যাণ ও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে। শুধু তাই নয়,পাপ মানুষকে শাস্তি ও ধ্বংসের সম্মুখীনও করে।ইরশাদ হচ্ছে[৬]-إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"আরও বলেন[৭]

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ- ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

"ফির'আউনের স্বজন ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অভ্যাসের ন্যায় এরা আল্লাহর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর; এটা এজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে যে সম্পদ দান করিয়েছেন, তা পরিবর্তন করবেন; এবং নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। " অন্যত্র আরও বলেন-[৮]

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ-"তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন বিস্মৃত হল, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন অকস্মাৎ তাদের ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল।"

পাপের অকল্যাণ ও কুপ্রভাব সম্পর্কে নাবী সা. বলেন[৯],"পাপাচারের দ্বারা ব্যক্তি রিযক থেকে বঞ্চিত হয়।"

ক্রমাগত পাপ বড়ই মারাত্মক। ইসলাম গ্রহণ ও তাওবা মানুষের অতীতের পাপ মোচন করে দেয় কিন্তু ক্রমাগত পাপ মানুষকে সেই সুফল থেকে বঞ্চিত করে। এ মর্মে রাসূল(সা.) বলেন-[১০]"যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ভালো কাজ করতে থাকবে তবে কুফর বা জাহেলিয়াতে থাকাবস্থায় তার কৃত পাপের জন্য সে পাকড়াও হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও পাপ ও মন্দ কাজ করতে থাকবে তবে তার পূর্বের ও পরের সব পাপের জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে।"

পাপ মানব জীবনে নানা অকল্যাণ বয়ে আনে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আশ-শাফেয়ী (রহ.) বলেন, "আমি ওয়াকী (রহ.) কে আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার ব্যাপারে অনুযোগ করলে তিনি আমাকে পাপ পরিহারের উপদেশ দেন। কেননা *ইলম হচ্ছে আল্লাহর নূর বা আল্লাহর দান, আর আল্লাহর নূর বা আল্লাহর দান কোন পাপীকে প্রদান করা হয় না।*"[১১]

পাপীরা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মানব সমাজে পাপীরা ঘৃর্ণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। হতাশা, হীনতা, ভয়-ভীতি ও গ্লানি পাপীকে দগ্ধ করে। পাপী আল্লাহর রহমত হতে অনেক দূরে সরে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন[১২]–

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ৭, আল-কুরআন ৪৭:২৩, ৯:৭৭।

[২].মূল আরবী[إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله { كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون }] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু তাফসিরীল কুরআন, হাদীস নং ৩৩৩৪; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪২৪৪।

[৩].মূল আরবী [إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুদ দা'ওয়াত, হা. নং ৫৯৪৯।

[৪]. আল-কুরআন, আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৯৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৮, আর দেখুন আল-কুরআন ৪৫:৩১।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিক্বূন ৬৩: আয়াত ০৬।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৫২-৫৩।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ৪৪।

[৯].মূল আরবী [وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه] হাফিজ মুনযিরী, খ.০২, পৃ.৩১৬, কিতাবুয যিকর ও দু'আ, হাদীস নং ২৫৩০।

[১০].মূল আরবী[من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং ১২০; *সহীহ আল-বুখারী*, হা. ৬৫২৩।

[১১]. মূল আরবী [شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى وأخبرنى بأن العلم نور ونور الله لايهدى لعاصى] শিহাবুদ্দীন আলুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৬, পৃ.৯০।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ২৭।

وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ্ হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই; তাদের মুখমন্ডল যেন রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছাদিত ।তারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ...كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

আর যারা পাপকাজ করে, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে'।[১]

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"অতঃপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারো উপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর যুলম করবেন বরং তারা নিজেরা নিজদের ওপর যুল্ম করত।"[২]

ফুসূকের কারণে পাপীরা স্বীয় পাপভার বহন ছাড়াও যাদের বিভ্রান্ত করে পাপের পথে নিয়ে গিয়েছিল তাদের পাপের একটি অংশের শাস্তি তারা বহন করবে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]- لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ "ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট।"

ফুসূকের কারণ: অসৎ সঙ্গ, দরিদ্রতা, অজ্ঞতা-মূর্খতা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, লোভ-লালসা ও রিপুর তাড়না।

ফুসূক থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ: তাওবা ও ইস্তেগফার, মৃত্যু ও পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়, ওহীর জ্ঞানার্জন ও তদানুযায়ী আমল, সৎ সঙ্গ ও কুপ্রবৃত্তির দমন।

❑.ধর্মীয় বিবিধ অনাচার ও কুসংস্কার(মুসলিম সমাজে বিদ্যমান):

ধর্মকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে মানব সমাজে নানা অনাচার, কুসংস্কার[৪] ও কুপ্রথার জন্ম হয়েছে। আজকের পৃথিবী তা থেকে মুক্ত নয়। অবশ্য এজন্য ধর্ম দায়ী নয়। কিছু স্বার্থান্বেষণী মহল, ধর্মান্ধ ও ধর্ম ব্যবসায়ী দায়ী। নিম্নে বর্তমান মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু অনাচার, বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার উপস্থাপন করা হলো–

ভণ্ড আলিম ও পীরদের ধর্ম ব্যবসা, ইসলামের নামে ভিত্তিহীন মনগড়া বক্তব্য: ধর্ম কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনাচারের মধ্যে পীর ব্যবসা ও ভণ্ড 'আলিমদের তাবিজ ব্যবসা, যালিম শাসকের নিকট সত্য গোপন ও তাদের চাটুকারিতার মাধ্যমে স্বীয় স্বার্থ হাসিল অন্যতম। ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির ন্যায় তারা ইসলামকে সংকুচিত করে নির্দিষ্ট কতিপয় আমলে সীমিত করেছে– এটাই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর মনোনীত দ্বীনের ব্যাপারে বিকৃতি। এর মাধ্যমে মানুষ সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হচ্ছে।

ভণ্ড পীরেরা ধর্মের নামে এক ধরনের অসৎ ব্যবসায় লিপ্ত। অর্থ-সম্মান আর্জনের মাধ্যম হিসেবে অনেকেই এই পথ বেছে নিয়েছে। এভাবে অনেক আলিম ও পীরকে দেখা যায় যে, তারা দীনি জ্ঞান দ্বারা দুনিয়া হাসিল করছেন। এরা নিকৃষ্ট ধর্ম ব্যবসায়ী। মালিক ইবন দীনার(মৃ.১২৩হি.) বলেন, আমি হাসান বসরী কে জিজ্ঞাসা করলাম, আলিমের পার্থিব শাস্তি কী? তিনি বলেন, অন্তরের মৃত্যু? আমি বললাম, সেটা আবার কি? তিনি বললেন,'আখিরাতের 'আমল দ্বারা দুনিয়া অর্জন করা'।[৫]

ধর্মের ছদ্মাবরণে তারা নানাবিধ অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত। ইসলামের নামে বিভ্রান্তিকর কথা ও বিভিন্ন রীতি-নীতি চালু করে সাধারণ জনগণকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করছে এবং ইসলামকে কলুষিত করছে। পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের ব্যাপারে তারা মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলে– এ ধরনের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তারা প্রতারণা করে সাধারণ মানুষ থেকে অর্থ-সম্পদ কৌশলে হাতিয়ে নেন। অথচ তারা পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের ব্যাপারে ভক্তদের কোন কাজে আসবে না।[৬] কুরআনে বলা হয়েছে, নাবী নূহ('আ.) নিজ স্ত্রী ও সন্তান এবং লূত('আ.) স্বীয় স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারবে না।[৭] ইবরাহীম('আ.) তাঁর পিতাকে রক্ষা করতে পারবে না।[৮] বস্তুত তারা জাগতিক সামান্য স্বার্থের জন্য কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা, সত্য গোপন ও ক্ষমতাসীনদের চাটুকারিতা করে থাকে। এরা নিকৃষ্ট ধর্মব্যবসায়ী। এদের

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজ্‌দাহ ৩২: আয়াত ২০।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪০।

[৩].আল কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল: আয়াত ২৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৬:১২২-২৪,১৪৬-১৪৭, ৭:৪০-৪১,৮০-৮৪,১৩০-৩৩, ৯:৬৪-৬৬, ১০:১৩,১৭, ১২:১০৯-১০, ১৪: ৪৭-৫১, ১৮:৪৯,৫৩. ২০:১০২-১০৪, ২৭:৬৭-৭২, ৩০:১১-১৩,৪৭,৫৫, ৩২:১১-১৪,২২, ৩৪:২৪-২৫, ৪৩:৭৪-৭৮, ৫৪:৪৭-৪৯, ৫৫:৪০-৪৫, ৭০:১-১৮, ৭৭:১৬-১৯, ৮৩:২৯-৩৩।

[৪]. কুসংস্কার শব্দের আভিধানিক অর্থ–চিরাচরিত ভ্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা বা ধর্মাদি বিষয়ে যুক্তিহীন বিশ্বাস। (*বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পৃ-২৯৭,) কুসংস্কার হল যুক্তি সংগত কারণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রমাণ ছাড়াই কোন বস্তু বা কর্মকে কল্যাণকারী বা অনিষ্টকারী মনে করা। -Stuart A..Vyse, *The Pshychology of Superstition*, Oxford University Press-1997, P.153.

[৫]. ইমাম বাইহাকী, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.২৯৬, রিওয়ায়েত নং ১৮৩৭।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১২৩।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্‌রীম ৬৬: আয়াত ১০।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ ৬০: আয়াত ০৪।

রয়েছে জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।[১] এদের মত পূর্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদের একটি গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের অনাচারে লিপ্ত ছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ "হে মুমিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবন 'উজায়বাহ (মৃ.১২২৪ হি.) বলেন-[৩]

> ইহুদী আলিমদের প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে এই উম্মাতের অসৎ আলিমদের সম্পর্কেও তদানুরূপ বক্তব্য প্রযোজ্য। তারা দুনিয়ার পঁচা-গলা বস্তুর মোহাবিষ্ট এবং লালসার জালে বন্দী হয়ে পড়েছে। এরা শরী'আতের বিভিন্ন বিধান কার্যকর করতে গিয়ে উৎকোচ গ্রহণ করে, প্রসিদ্ধ ও স্পষ্ট বিধান গোপন করে রাখে এবং নিজেদের স্বার্থে ফায়সালা দেয়। এদের প্রতি সকল অভিশাপ প্রদানকারীর অভিশাপ।"

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (মৃ.১৮১হি.) কে কেউ জিজ্ঞেস করল: মানুষ কে? তিনি বললেন, সংসারবিমুখ দরবেশ। প্রশ্ন করা হলো: নীচ কে ? উত্তর হল: "যারা দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রি করে খায়।"[৪] আর মুজাদ্দিদ আলফে ছানী রহ.(১৫৬৪-১৬২৪ খৃ.) বলেন, (মন্দ) 'আলিমরা হচ্ছে দ্বীনের ডাকাত, যদি তাদের লক্ষ্য হয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব লাভ এবং মানুষের কাছে মূল্যায়ন পাওয়া।'[৫]

আজকাল অজ্ঞ ও স্বার্থান্বেষী কিছু লোককে ইসলাম সম্পর্কে মনগড়া বিভিন্ন বক্তব্য দিতে দেখা যায়। যা সমাজের মানুষকে শুধু বিভ্রান্তই করে না বরং বিভিন্ন অনাচারের জন্ম দেয়। তারা কুরআনের আয়াত সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। বিশেষভাবে ভণ্ডপীর, বাউল ফকির, তথাকথিত আলেম নামধারীরা এতে লিপ্ত। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী[৬]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।"

এখানে স্বার্থান্বেষীরা *ওসীলা* বা নৈকট্য লাভের উপায় ব্যাখ্যায় পীর-মুর্শিদ ধরার কথা বলে থাকেন। অথচ তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন। আলুসী বলেন, "অসীলা তা, যার সাহায্যে পৌঁছা যায় এবং আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া যায়, তা হলো ইবাদত বন্দেগীর কাজ করা ও নাফরমানী ত্যাগ করা।"[৭] আল-বায়দাভী বলেন, "সন্ধান কারো সেই জিনিস যার সাহায্যে তোমরা তাঁর সওয়াব এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পার। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং নাফরমানীর কাজ ত্যাগ করা।"[৮]

ভণ্ড পীর ও বাউল ফকিররা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য আয়াতে মুতাশাবিহাতের অপব্যাখ্যা দেন। অথচ আল্লাহ বলেন[৯] –

> فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ
>
> যাদের অন্তরে সত্যলঙ্ঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি বিশ্বাস করি, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

এছাড়া প্রাচ্যবিদ ইহুদী-খৃষ্টানদের বিশেষ গোষ্ঠী ইসলাম চর্চার ছদ্মবরণে ইসলামের অপব্যাখ্যা করেন যেমন-ইহুদী পণ্ডিত গোল্ড যিহার, লিওন বুরূসিয়ার, খৃষ্টান উইলিয়াম মুইর, মার্গালিউথ প্রমূখ উল্লেখযোগ্য এছাড়া পি.কে. হিট্টি, আর. এ. নিকলসন, মান্টোগোমারী, ওয়াট, ক্যারেন আর্মষ্ট্রং সহ অন্যান্যরা সূক্ষ্মভাবে এ ধরনের অপতৎপরতায় জড়িত। এছাড়াও ইহুদী-খৃষ্টানদের মুসলিম নামধারি গুপ্তচররা যেমন: কুখ্যাত ভণ্ড নাবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রাচ্যবিদদের ভাব শিষ্য আবূ রাইয়াহ এই ধরনের অপতৎপরতায় লিপ্ত।

কবর-মাজার ব্যবসা: মুসলিম নামধারী এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত অর্থ উপার্জনের জন্য মাজার ব্যবসা প্রচলন করেছে। মৃত্য ব্যক্তির নামে নানা অলীক কথা এবং তাবিজ বাণিজ্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে অর্থ হাতিয়ে নেয়া এই চক্রের কাজ। ধর্মের ছদ্মাবরণে তারা মাজারগুলোতে শিরক ও অনৈতিক কার্যকলাপের প্রচলন করেছে। এর প্রতিবাদে বলা হয়[১০]

> قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً- أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭৪-১৭৫।
২. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৩৪।
৩. ইবনু 'উজায়বাহ, *আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুরআনিল মাজীদ*, খ. ১, পৃ. ২৬।
৪. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০১, পৃ.০৭।
৫. মুজাদ্দিদ আলফে ছানী রহ., *মাকতুবাত*, খ.০১, পৃ.১৯৪।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ ০৫:আয়াত ৩৫ ।
৭. মূল আরবী [الوسيلة هى فعيلة بمعنى مايتوسل به ويتقرب إلى الله عز و جل من فعل الطاعات وترك المعاصى من وسل إلى كذا] শিহাবুদ্দীন আলুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৬, পৃ.১২৪।
৮. মূল আরবী [ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي] কাযী নাসির উদ্দিন আল-বায়দাভী, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩২১।
৯. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ০৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৫৬-৫৭।

"বল, 'তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না'। তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের আযাব ভীতিকর।"

দুস্কৃতিকারীরা পূণ্যবানদের কবরগুলোকে অনাচারের আখড়ায় পরিণত করছে। অথচ এ সব কবরবাসীরা সে সব অনাচারের (শিরক,বিদায়াত) বিরুদ্ধে আজীবন লড়েছেন। শুধু তাই নয়, এমন অনেক মাজার আছে যা আদৌ কোন ওলীর মাজার নয়। এক শ্রেণীর অসৎ লোক কৃত্রিমভাবে সেসব তৈরী করেছে। যেমন: ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়–কয়লা শাহের মাজার(আজিমপুর), তেলশাহের মাজার(ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ), বাকুশাহের মাজার, গোলাপ শাহের মাজার(গুলিস্থান) ইত্যাদি, ইত্যাদি। একজন ওলী-আল্লাহর নাম কয়লা শাহ, তেলশাহ, ঘোড়াশাহ, গোলাপ শাহ ও বাকু শাহ হতে পারে একথা ভাবতেও বড়ই আশ্চর্য হয়!

ধর্মীয় ফিরকা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি: ত্রুটিপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী হচ্ছে ধর্মীয় ফিরকা। যেমন: খারেজী ও শিয়া গোষ্ঠী। এসব গোষ্ঠী ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি পালনের ক্ষেত্রে নিজ বিশ্বাস ও কর্মনীতিকেই একমাত্র সঠিক এবং অন্যদের বিশ্বাস ও কর্ম ভুল বলে মনে করে। এতে বিবাদমান প্রত্যেক পক্ষই নিজেদেরকে ইসলামের সঠিক পথের অনুসারী দাবী করেন, আর অন্যদের বিভ্রান্ত মনে করেন। তারা প্রকৃত ইসলামের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশেষ আংশিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন ও হাদীসের অপব্যবহার করে থাকেন। প্রত্যেকেই নিজ মতবাদ নিয়ে তুষ্ট। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১] مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون "যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।" অন্যত্র বলা হয়েছে[২] فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ "কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। সুতরাং কিছু কালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও।"

ধর্মীয় ফিরকা মানুষকে বিভিন্ন দল-মতে বিভক্ত করে। সমাজে অনৈক্য-বিভেদ ও কোন্দলের সৃষ্টি করে। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে সমাজে মারামারি ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। এতে সমাজের সংহতি নষ্ট হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ ইসলাম সঠিক রূপ সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মুসলিম সমাজে অতীত থেকে অদ্যাবধি অনেক সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। ছোটখাটো বিষয়ে নিজেদের মতভেদ মতবিরোধ ও হীনস্বার্থ এই অনৈক্য, বিভক্তি ও অধঃতনের মূল কারণ। অথচ এই নিষিদ্ধ কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে[৩]– وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ "তোমরা তাদের মতো হও না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"

বর্তমান মুসলিম জাতি মারাত্মক আত্মকলহে জর্জরিত। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ ও মতানৈক্যের কারণে তাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। সামান্য পার্থিব হীনস্বার্থের কারণে তারা বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে একেকজন নেতা সেজে নামে-বেনামে বিভিন্ন দল গড়ে তুলছে। একক নেতৃত্বের অধীনে কাজ করার মানসিকতা তাদের মধ্যে নেই। প্রত্যেকেই নিজ নেতৃত্বে কাজ করতে পছন্দ করে। ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করার শক্তি-সার্মথ্য বা যোগ্যতা তাদের অবশিষ্ট নেই। অবস্থা আজ এতই নাজুক যে, ইসলামের উপর গুরুতর আঘাত বা কোন জাতীয় কঠিন ফিতনা দেখা দিলেও প্রতিকূল পরিস্থিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিভেদ ভুলে গিয়ে একত্রিত হয়ে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। পার্থিব স্বার্থে তারা দ্বীন ও ঈমানকে বিক্রি করতে কোন কুণ্ঠা বোধ করে না। তাদের এই নড়বড়ে ঈমান ও অনৈক্যের সুযোগ নেয় ইসলাম বিরোধীরা। ফলে মুসলিমদের নাস্তানাবুদ করতে তাদের তেমন কোন বেগ পেতে হয় না। এভাবে মুসলিমদের অনৈক্যের সুযোগে ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে চলছে এবং মুসলিম জাতির ঐক্য ধ্বংস হতে চলেছে। নিজেরা এ অবস্থার পরিবর্তন না করলে এর পরিবর্তন হবেনা। এজন্য বলা হয়েছে[৪]– ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "তা এ জন্য যে, আল্লাহ্ কোন নি'আমতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোন কওমকে দিয়েছেন,যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজদের মধ্যে যা আছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" আরও বলা হয়েছে[৫]– وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ– "আর তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৩২।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ৫৩-৫৪।
৩. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৫।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ৮: আয়াত ৫৩।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৪৬।

রাসূল সা. বলেন–"তোমরা পরস্পরে আত্মকলহে করো না। আত্মকলহের কারণে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।[১]

ইসলামী দলসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণাঙ্গতা ও অনৈক্য: ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন দল ও সংগঠনের তৈরী হয়েছে। এ সব ইসলামী দল ও সংগঠনগুলো ইসলাম প্রচারের কাজ করে থাকে। কিন্তু বর্তমান কালের ইসলামী সংগঠনগুলোর অধিকাংশই ইসলামের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরতে অনেকাংশই ব্যর্থ। তারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশেষ আংশিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তাদের জীবনাদর্শে ইসলামের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ অনুপস্থিত। অথচ প্রত্যেক দলই মনে করেন তারাই সঠিক পথে আছেন, আর বাকীরা ভুলে পথে আছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল। তাদের এরূপ অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[২] – قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً "বল, প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।"
উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের কথায় আসা যাক। এখানে অনেকে মনে করেন, ইসলামের প্রকৃত কাজ ও অনুসরণ করছে- তাবলীগ জামাত, কারো মতে, পীর সাহেবরা। কারো ধারণা, জামা'আতে ইসলাম। কারো মতে–কাওমী আলেমরা। কেউ কেউ মনে করেন– আহলে হাদীস ইত্যাদি। উল্লেখিত ইসলামী সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে– প্রত্যেকেই ইসলামের বিশেষ কিছু দিকের উপর কাজ করছে, তবে কারোই মধ্যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা যায় না। অবশ্য তাদের মধ্যে দুই-একটি গোষ্ঠী ইসলামের নামে হীন স্বার্থসিদ্ধির কাজ করছে। এ সব ইসলামী সংগঠনের একটি ত্রুটি হল –তারা ইসলামকে ইসলামের মত করে উপস্থাপনের পরিবর্তে নিজ সংগঠনের নীতিমালার আলোকে মানুষের নিকট তুলে ধরেন। রাসূল সা. ও সাহাবীগণ যেভাবে মানুষের নিকট ইসলামের মূল ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তুলে ধরেছেন তারা সেভাবে ইসলাম তুলে ধরতে পারছে না। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে তারা ইসলামের বৃহৎ স্বার্থ অপেক্ষা নিজ দলীয় স্বার্থ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। দুঃখজনক বিষয় হল, তাদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান, আখলাক, তাকওয়া, পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বড়ই অভাব। একে অপরের বিরুদ্ধে লাগামহীন বিরূপ মন্তব্য করছে। গঠনমূলক সমালোচনা ও সংশোধনের পরিবর্তে পরস্পরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। –এতে করে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের ক্ষতি হচ্ছে।

ধর্মহীনতা: ধর্মের ব্যাপারে উগ্রপন্থা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি ধর্মহীনতা নিন্দনীয়। বর্তমানকালে মুসলিম সমাজে এমন অনেক নামধারী মুসলিম পাওয়া যায় যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিতে হীনমন্যতায় ভোগেন এমনকি নিজেকে উদার প্রমাণ করতে গিয়ে ইসলামের অপরিহার্য বিধানাবলী ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেন না। তাদের নিকট ধর্মের যে দুই-একটি বিষয় ভালো মনে হয় তারা তা পালন করে, বাদ-বাকী বিধি-নিষেধ পালন নিষ্প্রয়োজন ও বর্তমান যুগে অনুপোযোগী মনে করেন। তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাগূত ও অমুসলিমদের সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে বেশী তৎপর। এরা বিভ্রান্ত, প্রবৃত্তি ও তাগূতের পূজারী, মুসলিম নামধারী মুনাফিক ও কাফির। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[৩]– الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ "যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল, সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল।"

মুসলিম জাতির ধর্মীয় অবক্ষয়ের কারণ: ক. পার্থিব হীন স্বার্থ ও অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসা। খ.কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ অমান্যকরণ। গ.মুসলিমদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ ও মতানৈক্য। ঘ. অজ্ঞতা, নৈতিক অবক্ষয় ও প্রবৃত্তি পূজা।

প্রতিকারে করণীয়: ক.আল-কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন, তা অনুধাবন, তদানুযায়ী 'আমল এবং তার ব্যাপক প্রচার-প্রসার। খ.পার্থিব জীবনের উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দান। গ.মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা। ঘ.ধর্মব্যবসায়ী, ধর্মান্ধ, বিদ'আতী ও ধর্মীয় স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

....

আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়গুলো আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো। এই বিষয়াবলী মানুষকে আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনৈতিক পথে ধাবিত করেছে। তাই আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবৈধ ও অনৈতিক উপার্জন ও ভোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষকে উল্লেখিত মন্দ বিষয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

৩.৪ আল-কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির মধ্যকার নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়:

---

[১].মূল আরবী [لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল খুসুমাত , হাদীস নং ২২৭৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৮৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৫১।

পৃথিবীতে মানব জাতির আগমনের পর পরই নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সুচনা হয়। প্রথম মানুষ আল্লাহর নাবী আদম ('আ.) এর প্রথম সন্তান কাবীল তার ভ্রাতা হাবীলকে হত্যার মাধ্যমে অবক্ষয়ের সূচনা করেন। উল্লেখ্য যে, আদম আ. এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া ('আ.) এর প্রতিবার যমজ সন্তান জন্ম হত যার একজন পুত্র ও অন্যজন কন্যা। আদম ('আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এক জোড়ার পুত্রের অন্যজোড়ের কন্যার বিবাহ দিতেন। এই বিবাহজনিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাবীল ও হাবীলের মধ্যে বিবাদ বেধেঁ যায় এবং একপর্যায়ে কাবীল তার ভ্রাতা হাবীলকে হত্যা করেন। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড ও অনৈতিকতার সূত্রপাত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১] –

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ -لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ- فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ-فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ)

আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্যজনের কবুল হল না। সে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলিল, 'অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না; আমিতো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর অগ্নিবাসী হও এটিই আমি চাই এবং এটা যালিমদের কর্মফল। অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করল। ফলে সে তাকে হত্যা করল; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, 'হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব'। ফলে সে লজ্জিত হল।

নূহ ('আ.) এর যুগে: আদম ('আ.) পর প্রথম বাসূল হিসেবে নূহ ('আ.) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর সময়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন পাপচার, অনাচার ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর জাতি শিরক, কুফর ও নানাবিদ ধর্মীয় অবক্ষয়ে নিমজ্জিত ছিল। তারা ইয়াগুছ, ইয়া'উক, নসর ও সুওয়া নামক মূর্তির পূজা করতো।চিন্তা–বিশ্বাসের অবক্ষয়ের সাথে সাথে তাদের মধ্যে এমন সব অনাচার প্রবিষ্ট হয়েছিল যে কারণে তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়েছিল। সামাজিকভাবে তাদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য বিস্তার লাভ করে মক্কার কুরাইশদের ন্যায় তারা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে বৈঠকে অনীহ ছিল। যেমন–

(قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ- وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ- وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ-وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ)

"আর(নূহ ('আ.) বলেন) হে আমার সম্প্রদায়! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহ্‌র নিকট। যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয় তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ জাতি'। হে আমার সম্প্রদায়! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'? ... তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হীন, তাদের সম্পর্কে আমি বলছি না যে, ' আল্লাহ তাদেরকে কখনো কোন কল্যাণ দান করবেন না'। তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত। (যদি এরূপ করি) তাহলে নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব'।"[২]

বাইবেলেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (Genesis, ৬খণ্ড, ১১-১৪)

হুদ('আ.) এর যুগে আদ জাতিতে: হুদ('আ.) এর জাতি হল আদ। আদ ছিল নূহ('আ.) চতুর্থ অধস্তন পুরুষ(আদ ইবন আউস ইবন ইরাম ইবন সাম ইবনে নূহ)। তার বংশধর আদ জাতি হিসেবে পরিচিত। ওমান, হাদরামাওত ও ইয়ামেনে এরা প্রায় দু'শো বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। নিজেদের বিপুল সমৃদ্ধির কারণে এরা অহংকারী, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্য হয়ে উঠে। তারা সুউচ্চ মজবুত প্রাসাদ, স্মৃতি স্তম্ভ, নির্মাণ করে নিজেদের চিরস্থায়ী মনে করেছিল। কুরআন বলা হয়েছে– فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ "আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে তারা পৃথিবীতে অযাথা দম্ভ করত এবং বলত, আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি লক্ষ্য করে নি যে, আল্লাহ্ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করত।"[৩]

---

[১].আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ২৭-২৯।

[২].আল-কুরআন,সূরা হূদ ১১: আয়াত ২৯-৩১।

[৩]. আল-কুরআন,সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১: আয়াত ১৫।

এছাড়াও তারা বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ে নিপতিত হয়েছিল। তারা সাকীয়া(বৃষ্টিদায়িনী), হাফীযা (বিপদ তাড়িনী), রাযিকা (অন্নদায়িনী) ও সালীমা (স্বাস্থ্যদায়িনী) নামক চার দেবতার পূজা করত।[১]

সালিহ (‘আ.) যুগে সামূদ জাতিতে: সামুদ ছিল আদের চাচাতো ভাই। তার বংশধর সামুদ জাতি হিসেবে পরিচিত। আদ জাতির দু'শোো বছর পর এরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা দক্ষিণ সিরিয়া থেকে উত্তর ভূভাগের অধিকর্তা ছিল। আদ জাতির মত এরাও দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিল। পানি ও চারণ ভূমিতে তারা সাধারণ মানুষের অধিকার সমভাবে স্বীকার করত না।[২] সমাজে তারা বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় ও ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি করে। যেমন কুরআন বলা হয়েছে[৩] –

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ- قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ- وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ- قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ- وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ- فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ- فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)-

আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম এই আদেশসহ: তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর; কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেছ না, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার? তারা বলল, তোমাকে ও তোমার সংগে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমংগলের কারণ মনে করি। সালিহ বলল, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না। তারা বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব; অতঃপর তর অভিভাবককে নিশ্চয়ই বলব, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে-আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো তাদের ঘর-বাড়ি সীমালংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

সালেহ (‘আ.) তাদের ন্যায় সত্যের প্রতি আহবান করলে তারা তা অমান্য করে হটকরিতামূলক আচরণ করে। তাদের পরীক্ষা করার জন্য সালিহ (‘আ.) মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে একটি উষ্ট্রী দেয়া হয় । সেটিকে স্বাধীনভাবে চরে খেতে দেয়া এবং তাকে কষ্ট না দেয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু তারা তা অমান্য করে সেটিকে হত্যা করে। ফলে গযব দিয়ে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন।

লুত (‘আ.) এর যুগে তাঁর জাতিতে: লুত (‘আ.) ছিলেন ইবরাহীম (‘আ.) এর সমসাময়িক ও তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র। তিনি বর্তমান জর্ডানের ডেড সী (মৃত সাগর) এর নিকটবতী এলাকায় সাদূম জাতির প্রতি প্রেরিত হয়ে তাদের সংশোধনের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়।কিন্তু এই জাতি ছিল চরম ভ্রষ্ট, নির্লজ্জ ও দুস্কৃতিকারী যার নৈতিক অধঃপতনের শেষসীমায় পৌছে গিয়েছিল। তারা প্রকাশ্যে জঘন্য পাপাচার বিকৃত যৌনাচার সমকামিতা ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়েছিল। তারাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমকামিতার মত জঘন্য পাপচারের পথে ধাবিত হয়েছিল। তারা এই অসৎকর্মে এভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, সংশোধনের সামান্যতম প্রচেষ্টা ছিল তাদের সহ্যের বাইরে। লুত (‘আ.) তাদেরকে এই ঘৃণ্য অপকর্ম পরিহার করে সত্যের পথে আহবান জানান। কিন্তু তারা লুত (‘আ.) কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে তাকে উৎখাতের চেষ্টা করে। এ মর্মে কুরআন বলা হয়[৪] –

(وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ-إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ-وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)

আর (প্রেরণ করেছিলাম) লূতকে। সে তার যখন সম্প্রদায়কে বলল, ‘তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি’? ‘তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’ উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘এদেরকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় এরা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়’।

এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য লুত(‘আ.) নিকট ফিরিশতা প্রেরণ করেন, যারা সুদর্শন মানবরূপ ধারণ করে লুত (‘আ.) এর মেহমান হিসেবে তাঁর গৃহে অবস্থান করে। তাঁর জাতির লোকেরা এই নোংরা কাজে এমনভাবে বেপরওয়া হয়ে পড়ে যে, তারা লুত (‘আ.) এর নিকট তাঁর মেহমানদের সাথে দুষ্কর্মের অভিপ্রায় ব্যাক্ত করে তাদের দাবী করে। তাদের এই জঘন্য অনাচারে ফলে আল্লাহ তাদের প্রস্তর বর্ষণ করে পুরা জনপদকে উল্টিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

---

[১]. ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুর'আন পরিচিতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা.১৮।
[২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা আন্-নামল ২৭: আয়াত ৪৫-৫২।
[৪] .আল-কুরআন,সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৮০-৮২।

এ ব্যাপারে সূরা হুদ এর ৭৭-৮৩, সূরা হিজর এর ৬৮-৭৫, সূরা নমলএর ৫৪-৫৮, সূরা আরাফ এর ৮০-৮৪ ও সূরা আনকাবুত এর ২৮-২৯, আয়াতসমূহে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

শু'আয়েব ('আ.) এর যুগে তার জাতিতে: শু'আয়েব ('আ.) ছিলেন ইবরাহীম ('আ.) ৫ম অধস্ত পুরুষ। তিনি পূর্ব লোহিত সাগরের অববাহিকায় মাদায়েন অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন। তার জাতির লোকেরা শিরক, কুফর সত্যের প্রতি অবজ্ঞা, একগুয়েমী ও অহংকার-ঔদ্ধত্য ব্যবসায়িক লেন-দেনে অসাধুতা সহ নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। শু'আয়েব ('আ.) তার জাতিকে দুরাচার পরিহার করে সত্যের দিকে আহবান করে বলেন–যা আল-কুরআন এভাবে এসেছে[১] –

(قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ وَلاَ تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ -يَا قَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ)

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কোন তোমাদের কোন ইলাহ নেই, মাপে ও ওজনে কম করিও না; আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখছি , কিন্তু তোমাদের জন্য আশঙ্কা করছি সর্বগ্রাসী শাস্তির।হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায় সংগতভাবে মাপিও ও ওজন করিও লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু থেকে কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াও না।

শু'আয়েব ('আ.)এর জাতি তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করে সৎপথের পরিবর্তে বাতিল পথকে বেছে নেয়। ফলে এই জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন।

মূসা ('আ.) এর সময় এবং তাঁর পরবর্তীতে : মূসা('আ.) সম্মানিত পাঁচজন রাসূলের একজন। তিনি মিশরে প্রেরিত হন। তাঁর সময়কার মিশরের শাসক ছিলেন ফিরআউন হিসেবে পরিচিত, যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় সীমা অতিক্রম করেছিল। সে চরম যুলুম-নির্যাতনের মাধ্যমে রাজ্য শাসন করেছিল, প্রজাদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। সে একটি শ্রেণীকে দুর্বল করেছিল, সে তাদের পুত্রসন্তান হত্যা করত আর কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখত।[২] নানাভাবে তাদের কষ্ট দিত। তাদের ইজ্জত-সম্মান ছিনিয়ে নিত এবং ভালো বিষয় থেকে তাদের বঞ্চিত করত। এভাবে সে স্বৈরশাসন ও রাষ্ট্রীয় অনাচার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে ছিল দুর্বৃত্ত, অহংকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়[৩]– إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ "ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রগণকে সে হত্যা করত এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"

ফিরআউন অহংকার নিজেকে খোদা দাবী করে নিজ প্রজাদের আনুগত্য দাবী করেছিল। এভাবে সে সমাজ ও দেশে ভয়ানকভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। এ ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যালিমদের পরিণতি ভালো হয় না।এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ- وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ- فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ)

ফির'আউন বলল, 'হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও তারপর আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রসাদ তৈরী কর; যাতে আমি এতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। আর ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কি কেমন হয়েছিল?

মূসা('আ.) ও হারুন ('আ.)তাকে অনেকবার সত্যের পথে আহবান জানান। কিন্ত সে তা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্রমাগত অহংকার ও হটকারিতা প্রদর্শন করে। অবশেষে মুসা নির্যাতিত গোষ্ঠী বনী ইসরাইলের মুক্তির জন্য ফিরআউনের নিকট জানান কিন্তু ফিরআউন তাতেও সম্মত হয়নি। সর্বশেষে আল্লাহর নির্দেশে মূসা('আ.) নির্যতিত বনী ইসরাইলকে নিয়ে রাতের আঁধারে মিশর ত্যাগের জন্য বের হন তাতে ফিরআউন তাদের পশ্চাদ্ধবন করেন। লোহিত সাগরে উপনীত বনী ইসরাইল পশ্চাতে ফিরআউনের বিরাট বাহিনী দেখে বিব্রত হন। আল্লাহর অনুগ্রহে লোহিত সাগরে রাস্তা হয়ে যায় এবং মূসা('আ.) বনী ইসরাইলকে নিয়ে নীলনদ পার হন। ফিরআউন লোহিত সাগরের সেই রাস্তার মাঝ পথে পৌছলে পানি এসে তাকে ও তার বাহিনীকে ডুবিয়ে দেন। এভাবে আল্লাহ দল-বলসহ তাকে ধ্বংস করে দেন।[৫] বনী ইসরাইল তথা ইহুদীরা ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের পর কুফর, শিরকসহ বিভিন্ন অবাধ্যতা, পাপাচার ও অনাচার জড়িয়ে

---

[১] .আল-কুরআন,সূরা হূদ ১১: আয়াত ৮৪-৮৫।
[২] .আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪৯।
[৩] .আল-কুরআন,সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৪।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৩৮-৪০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৯০-৯২।

পড়ে।[১] ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি লাভের পর পরই তারা গোবৎস পূজার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]–(وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ)"যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারণ করেছিলাম,তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; আর তোমরা তো যালিম।"

ইহুদীরা মূসা ('আ.) মৃত্যুর পরবর্তীকালে সত্যপথ থেকে সরে পড়ে নানাবিদ অপকর্ম, অনাচার ও পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে। সীমালংঘন, অবাধ্যতা, অবৈধ উপার্জন, সুদীকরবার, যুলম, হিংসা, অহংকার, হটকরিতা, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ, তাগূতের অনুসরণ, দূরাচার ইত্যাদি কুৎসিত বিষয় তাদের জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্টে পরিণত হয়।[৩] তারা অনেক নাবীকে হত্যা করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–(أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ) "যখনই, কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত হয়নি তখনই তোমরা অহংকার করেছ আর কতককে অস্বীকার করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ।"তাদের অন্য অপকর্ম তাওরাত বিকৃতি। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়[৫]– وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ"তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা নিজদের জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা সেটা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ সেটি কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে, 'এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে',অথচ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে, অথচ তারা জানে।" তারা ওযায়ির ('আ.)কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে।[৬] তারা মূল তাওরাত–এর মধ্যে ব্যাপক বিকৃতি সাধন, হারামকে হালাল, হালালকে হারাম করে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করেছে।[৭] সত্য গোপন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার ও মনগড়া ধর্মীয় নানা অপব্যাখ্যা করেছে।[৮] আল্লাহর বিধান অস্বীকার, বিভিন্ন নাবীর অবাধ্যতা, বিশেষ করে শেষ নাবী মুহাম্মাদ সা. কে অস্বীকার ও তাঁর বিরুদ্ধচারণ করেছে।[৯] তারা বারংবার সীমালংঘন ও কুফরীর কারণে ঘৃণিত বানর ও শুকরে পরিণত হয়েছে।[১০] তারা পুরহিততন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, সুদ ব্যবসা, ঘুষ বা হারাম উপার্জন, মদ-জুয়া, অশ্লীলতার প্রসারসহ নানাবিধ পাপাচারে সদা তৎপর।[১১] তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১২]– وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ "আর তুমি তাদের মধ্য থেকে অনেককে দেখতে পাবে যে, তারা পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি করছে। তারা যা করছে, নিশ্চয় তা কতইনা মন্দ!"

ঈসা ('আ.) এর জাতিতে: ঈসা ('আ.) এর তিরোধানের পর ইহুদীদের মত খৃষ্টান জাতিও বিভিন্ন ভ্রষ্টতা, অনাচার ও দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে। ত্রিত্ববাদ, সত্যবিচ্যুতি, ধর্মের নামে অনাচার ও নৈতিক পদস্খলন তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন- اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ইবাদতের জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র।"[১৩]

খৃষ্টানরা 'ইসা ('আ.) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেছে।[১৪] মূল ইঞ্জিল–এর মধ্যে ব্যাপক বিকৃতি সাধন, মনগড়া ধর্মীয় ব্যাখ্যা, হারাম কাজকে হালাল ঘোষণা করে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।[১৫] ধর্মের ব্যাপারে বিভিন্ন মনগড়া বিদআত যেমন, সন্ন্যাসবাদ-বৈরাগ্যবাদ ও যাজকতন্ত্র চালু করেছে।"[১৬] পাদ্রী-পুরহিতরা ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করেছে। ধর্মান্ধতা, ধর্মযুদ্ধের নামে রক্তপাত, অশ্লীলতা-ব্যভিচার, সুদ, মদ, জুয়াসহ বিভিন্ন পাপাচারের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। (খ্রীষ্টানদের) গীর্জাগুলোতে গোসল করার ব্যাপারেও আপত্তি ছিল। ...নোংরাদেহের প্রশংসা করা হতো। উকুনকে মনে করা হতো ঈশ্বরের মুক্তো। আর দেহে উকুনে আচ্ছন্ন হলে তা গণ্য করা হত পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে।[১৭] বিবাহ বর্জন করায় যাজকরা বৈরাগ্যের আড়ালে ব্যাপকভাবে ব্যভিচার ও সমকামে লিপ্ত হয়।

---

[১]. আল-কুরআন ০২:৫৫-৫৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৫১।
[৩]. আল-কুরআন, ০৩:৭০-৭২,৭৫, ৭৮, ৮৩, ৯৮-১০০,১১৯-১২০,১৮৭; ০৪:৪৬-৪৭,৫১-৫৪, ১৫৩-৫৭, ১৬০,১৭১; ০৯: ৩৪-৩৫;।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৭।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৭৮।
[৬]. আল- কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৫১, আল কুরআন (০৯: ৩০)।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৭৯, আল কুরআন ৩:৭৮।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ২৪, আল-কুরআন (০২:১১১)।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ২১।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৬৫-৬৬।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৬২-৬৩।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৬২।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৩০-৩১।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৭২-৭৩,৭৫।
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৭১।
[১৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭: আয়াত ২৭।
[১৭]. বার্ট্রাণ্ড রাসেল, *বিবাহ ও নৈতিকতা*, অনু. আরশাদ আজিজ (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) পৃ.১৯।

ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির সবচেয়ে বড় অনাচার হলো, তারা নিজ নিজ আসমানী ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করার মাধ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী বিশাল মানব গোষ্ঠীকে সত্যচ্যুত করেছে। আজও সে ধারা অব্যাহত আছে। যদি তারা নিজ নিজ আসমানী ধর্মগ্রন্থ বিকৃত না করত তবে হয়ত এত ব্যাপকভাবে মানুষ বিভ্রান্ত হত না। বরং অনেক মানুষ সত্যের অনুগামী হত।

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্যান্য জাতিতে: হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুশরিকরা ব্যাপকভাবে শিরক, ভ্রান্তবিশ্বাস, কুসংস্কার ও বিভিন্ন অনাচারে নিমজ্জিত। হিন্দু ধর্মে একেশ্বরবাদের কথা বলা হলেও বাস্তবে তাদের কর্ম এর বিপরীত। প্রাক-ইসলামী যুগের আরব মুশরিকদের মত মূর্তিপূজাসহ তারা অসংখ্য দেবতা, কুসংস্কার, মনগড়া আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী। অবতারবাদ ও পূণর্জন্মবাদ মত ভ্রান্তবিশ্বাস তাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।বর্ণপ্রথা তাদের মধ্যে বৈষম্যসৃষ্টিকারী অন্যতম অনাচার। পুরহিত শ্রেণী বিবাহ না করলেও মন্দিরে মন্দিরে লোক চক্ষুর আড়ালে ব্যভিচার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড চলে। আর বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধকে পূজাসহ নানা শিরকে লিপ্ত এবং আল্লাহর সম্পর্কে নীরব। তারাও অবতারবাদ ও পূর্ণজন্মবাদে বিশ্বাসী। প্রামাণ্য আসমানী ধর্মগ্রন্থের অনুপস্থিতি, সামাজিক ক্ষেত্রে মদ-নেশা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, সুদ ও জুয়াসহ বিভিন্ন অনাচারে জড়িত। ধর্মের নামে তাদের মধ্যে নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কার বিদ্যমান। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১] وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ "এবং তারা ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

এছাড়া যে সব আরও যত অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যেও নানা ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মনগড়া ধর্মীয় রীতি-নীতি বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু, তাদের মধ্যে নেই কোন প্রামাণ্য আসমানী ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগুরুরাই ইচ্ছামত তাদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় রীতি-নীতি চালু করেন। ফলে তারা অধিকতর ধর্মীয় কুসংস্কার, বিভ্রান্তি ও অবক্ষয়ে জর্জরিত।

অমুসলিমদের ধর্মীয় অধঃপতন ও অবক্ষয়ের কারণ: ক.তাদের মধ্যে আসমানী ধর্মগ্রন্থের অনুপস্থিতি এবং অবিকৃত আসমানী গ্রন্থ কুরআনের পরিবর্তে মনগড়া ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন। খ.ধর্মীয় নেতা ও পুরহিতদের পার্থিব হীনস্বার্থ, সম্মান-সম্পদের লালসা, সত্যবিমূখতা, পুরহিতদের অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি পূজা।

প্রতিকারে করণীয়: ক.অবিকৃত ও প্রকৃত আসমানী গ্রন্থের অনুসরণ। খ. পুরহিতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্য অবলম্বনে সৎসাহস ও ত্যাগ।

......

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের প্রতিবন্ধক ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী উল্লেখিত বিষয়সমূহ শুধু কুরআনের দৃষ্টিতে বর্জনীয় ও নিন্দনীয় নয় বরং এর অধিকাংশ বিষয়ই প্রায় সকল ধর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিবেকের দৃষ্টিতে গর্হিত। এ সব বিষয় অন্যায়, অনৈকতা ও অবক্ষয়ের উপাদান। এ সবই মানুষের জন্য অকল্যাণকর। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে অনাচার, অনৈতিকতা ও অবক্ষয়ের অবসান এবং মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হলে এসব বিষয় বর্জন ও প্রতিহত করতে হবে।

মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অশুভ পরিণাম:

মূল্যবোধের অবক্ষয় মানব জাতিকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজে মানুষ অন্যায় ও অনৈতিকতাকে মন্দ ও অপজনক মনে করা হয় না। ফলে সমাজে সব ধরনের অন্যায়, অনাচার ও অকল্যাণের ব্যাপক প্রসার ঘটে। জনগণের জীবনে শান্তি-নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অত্যাচার-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, পাপাচার ও অনাচার সমাজ জীবনকে সর্বদিক থেকে গ্রাস করে ফেলে। সমাজে অসৎ, দূরাচারী ও দুস্কৃতিকারী লোকের প্রাধান্য বেড়ে যায়। অনিয়ম, দুর্নীতি, ও নীতিহীনতা সমাজে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। সমাজে ব্যক্তির পক্ষে সৎ ও নীতিবান থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে। সমাজে ভালো-সৎ লোক মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকে না। মানুষের পরস্পারিক মায়া-মমতা, ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। এরূপ সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্য, শ্রেণী বিভাজন, বর্ণবাদ ইত্যাদি প্রকট হয়ে উঠে। এক অপরের অধিকার হরণ করা হয়। ধনীরা দরিদ্রের উপর, সবলেরা দূর্বলের উপর, উচু শ্রেণী নীচু শ্রেণীর উপর প্রভূত্ব ও শোষণ করতে থাকে। ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, উচু-নীচু, শ্রেণীর মধ্যে মনস্তাত্বিক দূরত্ব ও সংঘাত বাড়তে থাকে। দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণী শোষণ ও নিস্পষণ থেকে বাঁচার জন্য বৈধ-অবৈধ পন্থায় ধনী হওয়ার পথ বেচে নেয়। ফলে সমাজে দুনীর্তি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানাবিদ কুসংস্কার, ভ্রষ্টতা ও অনাচার গ্রাস করে ফেলে। ধর্মের নার্মে অধর্ম, সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি সর্বত্র প্রসার ঘটে। অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজে মানুষের মন-মানস বিকৃত হয়ে যায়। মানুষ সৎ চিন্তা ও সৎ জীবন যাপনের শক্তি-সাহস হারিয়ে ফেলে। তরুণ প্রজন্মের মেধা ও মননে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ সমাজে নবপ্রজন্মের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা, চেতনা, চরিত্র, সংস্কৃতি স্বাভাবিক পন্থায় বিকশিত হয় না। ফলে ভবিষৎ নেতৃত্বের মধ্যে যোগ্যতা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও দূরদর্শিতায় যেমন অপূর্ণতা দৃষ্ট হয় তেমনি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবকল্যাণ প্রভৃতিতেও ঐকান্তিকতাবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় প্রকটভাবে। এরূপ সমাজ যে জনশক্তি

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৭১।

জন্ম দেয় সে জনশক্তি পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও পেশাগত জীবনে দুস্কৃতি ও অপরাধকে প্রসারিত করে অবিরাম গতিতে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পার্থিব উল্লেখিত ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী মহাক্ষতি ছাড়াও তা মানব জাতির নানা দুর্ভোগ ও অকল্যাণের কারণ। এ কারণে নানা পার্থিব শাস্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। এ কারণে অতীতে পৃথিবীতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।[১] সমাজে দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ, বিপর্যয়, নিরাপত্তাহীতা, ভয়-ভীতি ও নানা অশান্তি আপতিত হতে দেখা গেছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[২]– وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ "আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত। অতঃপর তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত সেজন্য আল্লাহ্ তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।"
অনৈতিকতা, অবক্ষয় ও পাপের সৃষ্ট মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূল (সা.) বলেন-[৩]:

> যখন শাসক গোষ্ঠী রা জণগণকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করবে, যাকাত আদায় করাকে বোঝা মনে করবে, আমানত দ্রব্যকে গনীমত মনে করে ভক্ষণ করতে থাকবে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ হবে, ছেলে সন্তানগণ পিতা-মাতার নাফরমানী করবে এবং দুষ্কৃতিকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, দ্বীনি শিক্ষা দুনিয়া হাসিলের নিয়ত হবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোত্রের নেতৃত্ব এমন লোকদের উপর অর্পিত হবে, যে তাদের মাঝে সবচেয়ে লোভী ও চরিত্রহীন, দেশ ও জাতির শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এমন লোকদের উপর ন্যস্ত হবে, যে দুশ্চরিত্র, লোভী ও অভদ্র, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্কৃতি কারীদের সম্মান করা হবে, মদ্যপান রেশমী কাপড় পরিধান ও দেহ ব্যবসা প্রকাশ্যে চলতে থাকবে, এই যামনার লেকেরা পূর্ব যামনার লেকেদের গালিগালাজ ও অভিশাপ দিতে থাকবে, তখন তোমরা লাল রংয়ের ঘুর্ণিঝড় ও অন্যান্য আযাবের জন্য অপেক্ষা করবে যেমন-মাটি ধ্বসে যাওয়া বা আকাশ হতে পাথর বর্ষিত হওয়া বা চেহারা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া।

কুরআনে বহু জাতির কথা উল্লেখ করেছে যারা প্রবৃত্তির গোলামী ও পাপাচারের কারণে হিংস্র পশুর মত হয়ে গিয়েছিল ফলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। ইরশাদ হচ্ছে-[৪] فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ অতঃপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারো উপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। আলণ্ঢাহ এমন নন যে, তাদের উপর যুলম করবেন বরং তারা নিজেরা নিজদের ওপর যুল্ম করত।

গ্রীক, রোমান সভ্যতাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত সভ্যতার পতন হয়েছে এই অবক্ষয়ের কারণে। এসব সভ্যতা পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মানব জাতির উন্নতি-অগ্রগতিতে বড় ধরনের অবদান রেখেছে। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে পাপচার, অনাচার, অনৈক্য, বিভক্তি, দুস্কৃতি,অবক্ষয়ের ব্যাপক প্রসার তখন তাদের মধ্যে পতন অনিবার্য হয়ে উঠে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতা পতনও অবশ্যম্ভাবী যদি সততা ও নৈতিকতা অবলম্বন না করে। এ মর্মে কুরআনের হুশিয়ারী[৫]-

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ- أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ- أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ

"যারা মন্দের ষড়যন্ত্র করে তারা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তাদেরসহ মাটিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না। অথবা তাদের উপর এমন দিক থেকে আযাব আসবে না, যা তাদের ধারণাতীত? অথবা তিনি তাদের চলাফেরায় তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। কিংবা তিনি তাদের ভীত-নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পাকড়াও করবেন না?"

অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজে উল্লেখিত পার্থিব অশান্তি ও বিপর্যয় ছাড়াও তাদের পরকালীন জীবনের পরিণতি অতি ভয়ানক। কোন অপরাধী ও পাপী তারা যদি মনে করে তারা পরকালে এমনিতেই পার পেয়ে যাবে তবে সেটা মারাত্মক ভুল। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন-[৬] أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ "যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে এ সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের বিচার কতইনা মন্দ!"

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

"যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আমি কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব?"[৭]

---

[১].আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ৭৭-৮৩, ৮৪-৯৫, ৯৬-১০২; আল-কুরআন ১৫:৫৮-৭৫, ১৮:৩২-৪৩, ৪১:১৫-১৬, ৬৮:১৭-৩৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল১৬: আয়াত ১১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৪:১৫-১৭।
[৩].মূল আরবী, إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته و عق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القنيات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا - *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২২১০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল্-আনকাবূত : আয়াত ৪০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৪৫-৪৭।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫:২১।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা সাদ ৩৮: আয়াত ২৮।

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ- مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

"তবে কি আমি অনুগতদেরকে অবাধ্যদের মতই গণ্য করব? তোমাদের কী হল, তোমরা কিভাবে ফয়সালা করছ?"[১]

বস্তুত মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী অপরাধী কাফির, মুশরিক ও পাপীদেরকে আল্লাহ ঘৃর্ণা ও অপছন্দ করেন।[২] তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি।[৩] তিনি তাদের পরাস্ত, ধ্বংস ও পাকড়াও করবেন।[৪] পরকালে তারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিয়ামতের দিনটি হবে তাদের জন্য বড়ই তিক্ত ও অনাকাঙ্খিত। তারা সেখানে চরম লাঞ্ছিত, বিতাড়িত ও নিন্দিত হবে, সেখানে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না। তারা সেখানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও অবনত মস্তকে থাকবে। তাদের চেহারা হবে মলিন, উদাস ও ভীত-চিন্তাযুক্ত। সেদিন তাদের কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেকে স্বীয় পাপের বোঝা বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপও। তারা সেখানে মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে ভয়ানক আগুন, অতি উত্তপ্ত পানি, গলিত পূঁজ ছাড়া তাদের কোন খাদ্য-পানীয় থাকবে না, যা তাদের ক্ষুধা-পিপাসা নিবৃত্ত করবে না বরং কষ্টের উপর কষ্ট বৃদ্ধি করবে। জাহান্নামের সংকীর্ণ আগুনের কুঠিরে তারা শিকল ও বেড়ী পরিহিত অবস্থায় বন্দী অবস্থায় নানারকম জিনিস দ্বারা ভয়ঙ্কর শাস্তি দেয়া হবে। আগুনই হবে তাদের আবাসন, বিছানা ও আচ্ছাদন। আগুন তাদের চেহারা ও শরীরকে ঝলসে দিতে থাকবে আবার নতুনভাবে চামড়া তৈরী হতে থাকবে। এভাবে অবিরাম শাস্তির পর শাস্তি চলতে থাকবে। তারা সেখানে মৃত্যুবরণ করবে না এবং একমুহূর্তের জন্য শাস্তি থেকে নিস্কৃতিও পাবে না। সেখানে অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ের ফিরিশতারা শাস্তির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। বিশেষ করে সেখানে কাফির ও মুশরিকদের জন্য কোন কল্যাণের অংশ থাকবে না, তাদের কোন নেক আমল গৃহীত হবে না, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। তাদের ক্ষমা করা হবে না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকানো হবে না, তাদেরকে পাপ থেকে পবিত্র করা হবে না, কোন কিছুর বিনিময়ে তারা কখনও মুক্তি পাবে না। তাদের অপরাধ ও পাপের জন্য অবর্ণনীয় মহাশাস্তির জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। সেখানে তাদেরকে অগণিত শাস্তির উপকরণের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে। কুরআনে তাদের যে ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা এসেছে তা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল। মহান আল্লাহ বলেন-[৫]

وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

"যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, এবং তাদের চেহারাকে অপমান আচ্ছন্ন করবে; আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই; তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আধাঁর রাতের টুকরো দিয়ে। এরা অগুনের অধিবাসী, এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।"

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى- وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

"যে তার রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।"[৬]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ- وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ- يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ- مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ- هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ- خُذُوهُ فَغُلُّوهُ- ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ- ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ- إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ- وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ- فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ- وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ

"কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেয়া না হতো আমার আমলনামা। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফিরিশতাদেরকে বলা হবে 'ধর একে' এর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। সে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল না। এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। অতএব এই দিন এখানে তার কোনো সুহৃয় বন্ধু থাকবে না। এবং কোনো খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত পূঁজ ব্যতীত। যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না।"[৭]

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ-وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ-وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ-وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ يُنجِيهِ-كَلَّا إِنَّهَا لَظَى- نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى-تَدْعُومَنْ أَدْبَرَوَتَوَلَّى-وَجَمَعَ فَأَوْعَى

"অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান–সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি–গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তার মুক্তি দেয়। না কখনই নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি, যা গা হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রর্দশন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল।"[৮]

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বালাম ৬৮: আয়াত ৩৫-৩৬।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১৯০, ২০৫; আল কুরআন ৩:৫৭; ৬:১৪১; ৮:৫৮,১৬:২৩, ৩:৩২, ৪:৩৬,২:২৭৬, ৪:১০৭, ৩৯:৭।

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ৮৮; আল কুরআন ৩:২৮,৮৬; ৪:৯৩; ৮:১৬; ১৩:২৫; ২৪:২৩।

৪. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ৩: আয়াত ১২; আল কুরআন ৮:৩৬; ৯:০২; ৪৭:১১, ৫৪:৪৫; ৫৯:০৫।

৫ . আল-কুরআন,সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ২৭।

৬. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৭৪-৭৫।

৭. আল-কুরআন,সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯: আয়াত ২৫-৩৭।

৮.আল-কুরআন,সূরা আল-মা'আরিজ ৭০: আয়াত ১১–১৮।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

"আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে (সেদিন তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা তো পার্থিব জীবনেই তোমাদের সুখ–সম্ভার নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো উপভোগ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অপমানজনক শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং পাপাচার করতে'।"[১]

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ- وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ- وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ- وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ- حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ-

"তোমাদেরকে কিসে প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার্য দিতাম না। আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সাথে বিভ্রান্তিমূখর আলোচনায় মগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম।"[২]

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ- يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ - وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ- كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

"যারা কুফরী করে তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, ফলে যা তাদের পেটে আছে তা এবং তাদের চমড়া গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুরি। যখনই তারা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে; তাদেরকে বলা হবে, আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা।"[৩]

وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ-يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

"তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং পান করানো হবে গলিত পুঁজ; যা সে অতি কষ্টে একে ঢোক করে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় সহজ হবে না। সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে কিন্তু সে মরবে না; এরপর কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।"[৪]

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ- تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ -

"এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়।"[৫]

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ- فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ -وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ- لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ- إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ- وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ- وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ- أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ- لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ- ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ- لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ- فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ- فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ - فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ- هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

"বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে প্রখর বাষ্পে ও উত্তপ্ত পানিতে, কালোবর্ণ ধূম্রকুঞ্জের ছায়ায়; যা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে। তারা বলত, আমরা কি মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও পুনরুত্থিত হব? এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? বল, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ, সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, এবং তাদ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে, পরে তোমরা পান করবে উহার উপর উত্তপ্ত পানি; পান করবে পিপাসিত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।"[৬]

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ- طَعَامُ الْأَثِيمِ- كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ- كَغَلْيِ الْحَمِيمِ- خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ- ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ- ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ- إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ-

"নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তামার মত, তাদের পেটে ফুটতে থাকবে। যেমন ফুটন্ত পানি। একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে! অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও। আর বলা হবে স্বাদ গ্রহণ কর তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটা তো তাই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।"[৭]

-وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ- سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ-

"সেদিন তুমি অপরাধিকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল।"[৮]

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ- لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ- وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ-وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ- لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

"নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে; তাদের থেকে আযাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে। আর আমি তাদের উপর যুলম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল যালিম। তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে

---

[১] .আল-কুরআন,সূরা আল-আহ্কাফ ৪৬: আয়াত ২০।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ৭৪: আয়াত ৪২-৪৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ১৯-২২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম ১৪: আয়াত ১৬-১৭।
[৫] . আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : আয়াত ১০৩-১০৪।
[৬] . আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ ৫৬: আয়াত ৪১-৫৬।
[৭] . আল-কুরআন, সূরা আদ্-দুখান ৪৪: আয়াত ৪৩-৫০।
[৮] . আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম ১৪: আয়াত ৪৯-৫১।

শেষ করে দেন'। সে বলবে,'নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী'। 'অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি সত্য নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী। "[১]

- لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ -"তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন।"[২]

রাসূল সা. বলেন–কিয়ামতের দিন দোযখবাসীদের মধ্যে থেকে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে যে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে সুখী ছিল। অতঃপর তাকে দোযখের মধ্যে একবার ফেলে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও সুখ-শান্তি দেখেছিল? তোমার কাছে কি কখনও কোন নিয়ামত বা শান্তির উপকরণ পৌঁছেছিল ? তখন সে প্রতি উত্তরে বলবে– না, আল্লাহর কসম। এর বিপরীত বেহেশতবাসীদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে যে দুনিয়াতে সবচেয়ে সংকটময় ও কষ্টকর জীবন যাপন করেছিল। তাকে বেহেশতের অফুরন্ত সুখ-সম্ভোগ দান করে অবশেষে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনও কষ্ট দেখেছিল? তোমার প্রতি কি কখনও অশান্তি পৌঁছেছিল। তখন সে প্রতি উত্তরে বলবে–না, আল্লাহর কসম। হে আমার প্রতিপালক! আমার উপর কখনও কোন কষ্ট পৌঁছেনি আর আমি কখনও কোন কষ্ট দেখিনি।[৩]

......

মূল্যবোধ মানব জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর বিষয়। অজ্ঞতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, অহংকার, খামখেয়ালীপনা, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ইত্যাদি নানা কারণে মানব জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকেই সূত্রপাত হয় অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি, অত্যাচার-অবিচার, ফিতনা-ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, পাপাচার ও অনাচার। বিঘ্নিত হয় সমাজের শান্তি-নিরাপত্তা। এটা পার্থিব জীবনে বয়ে আনে নানা বিপর্যয় আর এজন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। কাজেই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে মূল্যবোধের অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা জরুরী।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ ৪৩ : আয়াত ৭৪-৭৮।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার ৩৯ : আয়াত ১৬ ।

[৩]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন, হাদীস নং ২৮০৭।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআন আলোকে মানব জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ

- ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে
- পারিবারিক জীবনে
- সামাজিক পর্যায়ে
- রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে
- অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট
- আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে ঐতিহাসিক মদীনা রাষ্ট্রে আল-কুরআনের ভূমিকা

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা-দৃষ্টিভঙ্গি

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের কল্যাণ ও শুভ পরিণাম

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ (করণীয়) আল-কুরআনের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিবরণঃ

মহান আল্লাহ্ মানুষ ও বিশ্বজগতকে অনর্থক ও নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেননি।[১] খেল-তামাশা জীবন পার করে দেয়ার মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত নয়। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাণী এবং পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্র প্রতিনিধি। তাই তার প্রতিটি কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হবে। শেষবিচারের দিন মানুষের ভালো-মন্দ কাজের বিচার করে তদানুযায়ী কর্মফল দেয়া হবে। তাই মানুষের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য মহান আল্লাহ মানব জীবন সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য আল-কুরআনে ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কতগুলো নৈতিক নীতিমালা দিয়েছেন সেগুলোর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে মানব জীবনে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং অবক্ষয়রোধে সম্ভব। কুরআন প্রদত্ত এই নীতিমালাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–ক. ব্যক্তি জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ, খ. পারিবারিক জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ, গ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে করণীয় বিষয়সমূহ, ঘ. অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহ, ঙ. শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ব্যক্তিগতভাবে করণীয়/ ব্যক্তি জীবনে অর্জনীয় বিষয়সমূহঃ

পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সুন্দর সমাজের। সমাজকে সুন্দর করতে হলে দরকার সমাজস্থ মানুষের ভালো আচার-আচরণ ও উত্তম চরিত্র। ব্যক্তিগত পর্যায়ে নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের জন্য কিছু করণীয় রয়েছে। আর এই করণীয় বিষয়গুলো দু'ধরনের হতে পারে। ক. ব্যক্তিগত আখলাক (চরিত্র) সংক্রান্ত, খ. আকীদা (বিশ্বাস) ও ইবাদত সংক্রান্ত। তবে আকীদা (বিশ্বাস) ও ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচনা করায় এখানে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে আখলাক (চরিত্র) সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোকপাত করা হলো।

❑. সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন (الصدق) :

সততা ও সত্যবাদিতা উৎকৃষ্ট মানবীয় গুণ। সততা হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড ও কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখা। সততা কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও লেন-দেনসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সত্যবাদিতা হলো কোন বিষয় বাস্তবতা অনুরূপ হওয়া, মিথ্যার বিপরীত। সত্যবাদি ব্যক্তিকে বলা হয় সাদিক। আর যে ব্যক্তি কথা-কাজে ও আচার-আচরণে প্রকাশ্য-গোপনে সর্বত্রই পরম সৎ ও ন্যায়পরায়ন তিনিই সিদ্দীক (পরম সত্যবাদি)। সততা ও সত্যবাদিতা এ দু'টি গুণ হক বা সত্যের অংশ বিশেষ।

সততা ও সত্যবাদিতা একটি শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ, যা মানুষের জীবনকে পবিত্র করে তোলে।[২] আল্লাহ এ সব লোকদের সৎপথ প্রর্দশন করেন এবং কর্ম সংশোধন করে দেন।[৩] তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার বিবেকবোধ দান করে।[৪] এই গুণ ব্যক্তির মধ্যে সৎ পথে চলার প্রেরণা দেয় এবং হিদায়েত ও তাকওয়ার সঞ্চার করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫] – وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا "এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের অধিক হিদায়ত দান করেন; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার রবের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবে ও শ্রেষ্ঠ।" এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৬]– "তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে। কারণ সত্য মানুষকে পূণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পূণ্য মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যের অন্বেষণ করে, আল্লাহর দরবারে তাকে *সিদ্দীক* (মহাসত্যবাদী) হিসেবে লিখা হয়।"

সততা ও সত্যবাদিতা নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মূল্যবান উপাদান ও মূল অনুষঙ্গ। এই গুণ মানুষের আচরণ ও কর্মকাণ্ড সংশোধন করে, সুবৃত্তির বিকাশ ঘটায় এবং আত্মিক পরিশুদ্ধ অর্জনে সহায়তা করে। সততা-সত্যবাদিতা মহান আল্লাহর পছন্দনীয় একটি গুণ।[৭] যা নাবী-রাসূল ও সৎকর্মশীলদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৮] নাবী-রাসূলগণের সবাই ছিলেন এই মহান গুণের অধিকারী। জীবনের কঠিন মুহুর্তেও তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এজন্য কুরআনে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে বলেছে। মহান আল্লাহ বলেন[৯]-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী(রহ.) বলেন[১০]–"যদি তুমি সত্যবাদীদের সাথে শামিল হতে চাও, তবে দুনিয়া থেকে উদাসীন থাকো এবং সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা কম কর।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ১১; আল কুরআন ২১:১৬; ৪৪:৩৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৯৭।
[৩]. আল-কুরআন, ২৯: ৬৯, ৩৩:৭১, ৬৪:১১, ২১:৭৬।
[৪]. আল-কুরআন, ০৮: ২৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা মার্ইয়াম ১৯ : আয়াত ৭৬, আল-কুরআন ৩৯:৩৩।
[৬].মুল আরবী[إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হা. নং ৫৭৪৩, *মুসলিম* হা.নং ২৬০৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৮৭।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা মার্ইয়াম ১৯: আয়াত ৪১,৫৪,৫৬।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১১৯।
[১০].মূল আরবী [إن أردت أن تكون مع الصادقين، فعليك بالزهد في الدنيا، والكف عن أهل الملة.] ইবনু কাছীর,*তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৪, পৃ.২৩৪।

সততা ও সত্যবাদিতা ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়। ইসলাম অবির্ভাবকালে তৎকালীন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় গমনকারী মক্কার নেতা আবূ সুফিয়ানকে রাসূল সা. সম্পর্কে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল-তিনি (মুহাম্মাদ সা.) তোমাদের কী নির্দেশ দেন? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলেন-[১] "*তিনি আমাদের এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে, সালাত আদায়, যাকাত প্রদান, সত্য বলতে, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করতে নির্দেশ দেন* ।"

মানব জীবনে সততা ও সত্যবাদিতা গুরুত্ব অপরিসীম। সততা ব্যক্তির অন্তর-আত্মকে আলোকিত, পরিশুদ্ধ ও প্রশান্তিময় করে।[২] এই মহৎ গুণ মানুষের নৈতিক মনোবল বাড়িয়ে দেয়; মানুষকে সৎ সাহসী ও মহৎ করে তোলে। এটা ব্যক্তিকে কখনও অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করতে দেয় না। এর দ্বারা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। এটা ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলতে তা বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাই রাসূল (সা.) বলেন,"যার মধ্যে চার গুণ আছে দুনিয়ার তার অন্য সব কিছু ছুটে গেলেও সে সফল। ক. আমানত সংরক্ষণ, খ.সত্য বলা, গ.সৎ চরিত্র, ঘ.হালাল খাবার।[৩] এ সম্পর্কে ভাষাবিদ আছমাঈ রহ. বলেন[৪],

> আমি ইমাম শাফেঈ রহ. কে বলতে শুনেছি, 'জ্ঞানার্জনের মূল বিষয় হ'ল নিশ্চিত হওয়া এবং তার ফলাফল হ'ল নিরাপত্তা। ধার্মিকতার মূল বিষয় হ'ল অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং তার ফলাফল হ'ল প্রশান্তি। সবরের মূল বিষয় দৃঢ়তা এবং তার ফলাফল হ'ল বিজয়। সৎকর্মের মূল বিষয় তাওফীক এবং তার ফলাফল হ'ল মুক্তি ও সফলতা। আর সব কিছুর মূল লক্ষ্য হ'ল সততা-সত্যবাদিতা'।

সততা ও সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে এবং মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে। তাবুক অভিযানে অনেক মুনাফিকের সাথে তিনজন সাহাবীও অলসতাবশত অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। এই অভিযানের পর মুনাফিকরা রাসূল সা. এর নিকট মিথ্যা ওজর পেশ করলেও উক্ত তিনজন সাহাবী নিজের দোষ স্বীকার করে সত্য বলেন। এই সত্য বলার কারণে তারা পার্থিব কিছু কষ্ট পেলেও পরকালীন শাস্তি থেকে স্থায়ীভাবে নাজাত লাভ করেন।[৫] এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৬] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا-يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ "হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।" এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, সত্য বলার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। রাসূল(সা.)ও বলেন[৭],"তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী। ক. প্রকাশ্য-গোপনে আল্লাহর ভয়, খ.ধনী-দরিদ্র্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। গ.সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় সত্য বলা।"

উন্নত মূল্যবোধ ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান সততা ও সত্যবাদিতা। এই চারিত্রিক ভূষণ ছাড়া কেউ মুত্তাকী হতে পারে না। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৮]– وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই মুত্তাকী।" এই গুণ অর্জনের গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাসূল সা. বলেন-[৯] "সৎভাবে চলা, উত্তম চরিত্র ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন চলা–নবুয়্যাতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।"

'সৎ কাজ সম্পাদন করা এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা' মূল্যবোধ বিকাশের জন্য একটি মৌলিক উপাদান। আর এটা অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণ সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে সহল আত-তাস্তরী বলেন-[১০]

> আল্লাহর আনুগত্যশীল প্রত্যেক সৎকাজ সম্পাদনকারীই আল্লাহর প্রিয়ভাজন নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধকর্ম তথা পাপাচার থেকে দূরে অবস্থানকারীরাই আল্লাহর প্রিয়ভাজন। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সিদ্দীক (বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণ সত্যবাদী) ছাড়া কেউ পাপ কাজ ছাড়তে পারে না। আর সৎকাজসমূহ তো পূণ্যবান-পাপী নির্বিশেষে সবাই করে থাকে।

সততা ও সত্যবাদিতা আখিরাতে সৌভাগ্য ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে। এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পূণ্যের পথে চলার সম্বল।[১১] সততা ও সত্যবাদিতা মানুষের জন্য কল্যাণকর হলেও সর্বদা সত্যকে সত্য বলা, সত্যের ওপর অটল থাকা, সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাই প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সত্য বলা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সত্য বলা অপেক্ষা অধিক পূণ্যের কাজ। তাই কিয়ামত দিবসে সত্যবাদীরা সত্যবাদীতার দ্বারা উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ বলেন[১২]– يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

---

[১].মুল আরবী[اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওহী, হা. নং ০৭।
[২]. আল-কুরআন, ০২: ২৫৭; ৫৭:২৮, ৪৮:৪।
[৩].মুল আরবী[أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০২, পৃ.২৭৭, হা. নং ৬৬৫২।
[৪]. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক* (বৈরুত: দারুল ফিকর, http://www.ahlalhdeeth.com.) খ.৫১, পৃ.৪০৮।
[৫]. আল-কুরআন, ০৯:১১৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩ : আয়াত ৭০-৭১।
[৭].মুল আরবী [ثلاث منجيات: خشية الله من السر و العلانية و القصد في الغنى و الفقر و كلمة الحق في الرضا و الغضب] বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ.০১, পৃ.৪৭১, হা.নং ৭৪৫।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আয্‌-যুমার ৩৯: আয়াত ৩৩।
[৯]. মূল আরবী [إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৪৭৭৬।
[১০]. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৯হি.) খ.০৪, পৃ.৬৪।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আন্‌-নিসা' ০৪: আয়াত ৬৯, আল-কুরআন ৩৩:৭১, ১০৩:১-৩।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১১৯।

"সেদিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদ দেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে;আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন তারাও তাঁর প্রতি প্রসন্ন।"

সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বনে করণীয়: ক. সত্যবাদিতা ও সততা অবলম্বনে শৈশব থেকে পারিবারিক পর্যায়ে থেকে এর অনুশীলন করানো। খ. সর্বাবস্থায় নৈতিক দৃঢ়তা অবলম্বন। গ. মহৎ ব্যক্তিদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ। ঘ. সৎসঙ্গ।

❑. সাহসিকতা, নৈতিক দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অবিচলতা (الشجاعة) এবং সংকল্পে দৃঢ়তা :

দুঃখবোধের ভীতিকে দমন করার ক্ষমতাই হল সাহসিকতা।[১] ভিন্ন কথায় বীরত্ব ও সাহসিকতা হলো বিপদ-আপদে ও শক্রর মোকাবিলায় ভীত না হয়ে দৃঢ়চিত্ত থাকা। এর আরবী প্রতিশব্দ الشجاعة, বীরত্ব ও সাহসিকতা একটি প্রশংসনীয় নৈতিক গুণ। এর বিপরীত হলো ভীরুতা ও হীনবল হওয়া মুমিনের চরিত্রে একেবারেই নিন্দনীয়।

সৎ সাহস ও দৃঢ়তা মানুষকে সত্য, ন্যায়, ঈমান ও দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে সাহায্য করে।[২] এটা ব্যক্তিকে শয়তানী শক্তি ও কুপ্রবৃত্তিসহ সব ধরনের প্রতিকূলতা মুকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী হওয়ার জন্য এই গুণ অপরিহার্য। কেননা নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা ছাড়া সত্য, ন্যায় ও দ্বীনের উপর অটল থাকা যায় না। যাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার ঘাটতি রয়েছে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্য ও দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ে।[৩] তাছাড়া কর্তব্য সম্পাদন করার পথে মানুষকে নানা বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্টের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এ বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট মোকাবিলার জন্য সাহসিকতার একান্ত প্রয়োজন। এই গুণ ছাড়া সত্য-ন্যায় প্রচার-প্রতিষ্ঠা এবং সফল নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয়। এজন্য কুরআন এই উন্নত গুণ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেছে[৪] فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ– "সুতরাং তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" অন্যত্র বলেন[৫], أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ "তোমাদের ইলাহ্ কেবল এক ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও'।"

নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সত্যপন্থীদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সব যুগের নাবী-রাসূল ও সত্যপন্থীরা এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ন্যায়, সত্য ও আল্লাহ বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হাজার প্রতিকূলতার পরও তারা বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। সত্য-ন্যায় প্রচার-প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নির্যাতন, নিপীড়ন ও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে শক্রর সাথে যুদ্ধ করে তাদের জীবন দিতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সত্যের পথ ছেড়ে দেননি। এক্ষেত্রে ইবরাহীম ('আ.) ও নমরুদ, মূসা('আ.) ও তাঁর অনুসারী এবং ফিরআউন ও তাঁর দলের কথা তো সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সত্যপন্থীরা কঠিন পরিস্থিতিতেও আদর্শচ্যুত কিংবা বাতিলের কাছে মাথা নত করেননি, প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন[৬]

> وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ - وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
>
> আর কত নাবী ছিল, তাদের সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তাতে তারা হতোদ্যম হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, তারা বলেছিল, 'হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পা-সমূহকে, আর কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন'।

মক্কার কাফিররা মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর অনুসারীদের ব্যাপক নির্যাতনের মাধ্যমে যখন সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারছিল না তখন আবূ জাহল ও মক্কার কাফির নেতৃবৃন্দ রাসূল সা. কে তাঁর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে আরবের বাদশাহ, সবচেয়ে ধনী বানানো ও সেরা সুন্দরী নারীর সাথে বিবাহ প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করে সত্য প্রচার থেকে ফিরাতে চেয়েছিল। কিন্তু রাসূল সা. তাদের সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, *'যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয়া হয় তবুও আমি সত্য প্রচার থেকে বিরত হব না যতক্ষণ না আল্লাহ বিজয়ী করবেন অথবা এ পথে আমি ধ্বংস হয়ে যাই'*।[৭] এভাবে চরম কঠিন পরিস্থিতিতেও রাসূলুল্লাহ সা. নৈতিক দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

---

[১]. অর্জুনবিকাশ চৌধুরী, *নীতি-বিজ্ঞান* (কলিকাতা:মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪), পৃ.১০৫।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০২, আল-কুরআন ১৬:৫০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ১০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ১৫, আল-কুরআন ১১:১১২।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা হা মীম আস-সাজ্দা/ফুস্সিলাত ৪১ঃ আয়াত ০৬।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪৬-১৪৮।
[৭].মূল 'আরাবী [لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في بلغ الأمر] ইবন ইসহাক, *আস-সীরাহ আন-নবুবিয়্যাহ* (http:www.alwarraq.com)খ.০১, পৃ.৫০; আবুল হাসান আলী আন-নদভী, *আস-সীরাতুন নবুবিয়্যাহ* (জেদ্দা: দারুশ শুরূক,১৯৮৯), পৃ.১২৩।

অতীতেও সত্যপন্থীদের বিভিন্ন দল যে কোন মূল্যে সত্য, ন্যায় ও দ্বীনের উপর অটল-অবিচল ছিলেন এবং বাতিলকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিলেন। এ ব্যাপারে কুরআনে অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত আসহাবুল কাহফ[১] যারা ঈমান ও সত্যের জন্য স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়েছিলেন।[২] আসহাবুল উখদূদ[৩] ঈমান ও সত্যের জন্য নির্মমভাবে জীবন দিয়েছেন, কিন্তু সত্য এক বিন্দু সরে যাননি।[৪] মূসা ('আ.) নবুয়্যত লাভের পর ফিরআউনকে ঈমানের দাওয়াত দেন এবং কিছু অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এতে ফিরআউন তাকে যাদুকর হিসেবে আখ্যায়িত করে। এরপর ফিরআউন মিশরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহ করে মূসা ('আ.) এর মুকাবিলা করার ঘোষণা দেন। মূসা('আ.) এর নিকট যাদুকররা পরাজিত হয়ে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে ঈমান আনলে ফিরআউন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন। কিন্তু তারা কঠিন পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর অটল থেকেই প্রাণ বিলিয়ে দেন, কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করেননি।[৫] ফিরআউন পত্নী, যিনি সত্যের জন্য শুধু রাজকীয় বিলাস-বৈভব ত্যাগ করেননি বরং অবর্ণনীয় নির্যাতন কষ্ট-সহ্য করে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে-[৬]

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফির'আউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফির'আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন, আর আমাকে নাজাত দিন যালিম সম্প্রদায় হতে।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী বলেন–

মু'মিন লোকদের প্রকৃত অবস্থা কি হতে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরঊনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ়তা দেখানো, দ্বীন ইসলামকে সর্বাবস্থায় আকড়ে ধরে থাকার এবং কঠোর দুর্বিষহ অবস্থায়ও ধৈর্যধারণ করার উৎসাহ দান করা হয়েছে–এ উপমা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পরন্তু দেখানো হয়েছে যে, কুফরী শক্তির যতই দাপট ও প্রতাপ হোক, তা ঈমানদার লোকদের একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না, যেমন ফিরঊনের মত একজন বড় কাফিরের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারে নি, বরং তিনি আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ঈমান সহকারেই নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে চলে যেতে পেরেছেন।[৭]

সত্যের প্রতি অটল-অবিচলতা, সৎ সাহস ও নৈতিক দৃঢ়তা সর্বযুগের মু'মিনদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তারা সত্য থেকে ছিটকে পড়ে না। আল্লাহ ছাড়া বাতিলের কাছে তারা কখনও মাথা নত করে না। এই গুণসম্পন্ন মু'মিনদের প্রশংসায় কুরআনে বলা হয়েছে-[৮] وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا-এবং তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। আরও কুরআনে বলা হয়েছে–[৯] (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ) "আল্লাহ্র রাস্তায় তারা জিহাদ করে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করে না।"

এ সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কা'বার ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন আমরা তাঁর কাছে (কাফিরদের অত্যাচারের) অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আমাদের জন্য কি সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দু'আ করবেন না?

তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল, যাকে ধরে আনা হত। তারপর তার জন্য গর্ত খনন করা হত এবং তাকে তাতে নামিয়ে করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দু'ভাগ করে ফেলা হত। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড্ডি খসানো হত। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহ্র কসম! এ দীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে সান'আ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত (আরবের উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত) ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। অথচ সে আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং তার মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে বাঘ ব্যতীত অন্য কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।[১০]

সত্যের পথে প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হয়। জেনে নেয়া হয় কে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? কে আল্লাহকে ভয় করে আর কে জাগতিক শক্তিকে ভয় করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[১১] - أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ - "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের

---

[১]. আসহাবুল কাহফ (গুহার অধিবাসী): সূরা আল-কাহফে বর্ণিত কতিপয় দৃঢ়চেতা যুবক মুমিন, যারা ঈমানের কারণে সুখময় জীবন ও স্বজাতিকে বিসর্জন দিয়েছিল।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৯-২০।

[৩]. আসহাবুল উখদূদ(গর্তের অধিবাসী) হলেন, সূরা আল-বুরূজ বর্ণিত নির্যাতিত মুমিন দল। ঈমানের কারণে যাদের জীবিত আগুনে ফেলে পুড়ে হত্যা করা হয়।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বুরূজ ৮৫: আয়াত ০৪-০৯।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা' ২৬ : আয়াত ৪১-৫১।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্রীম ৬৬: আয়াত ১১।

[৭]. ইমাম শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (কায়রো: দারুল ফিকর, তা.বি), খ.০৫, পৃ. ২৫৬।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩ : আয়াত ৩৯। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৯:১৮।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৫৪।

[১০].মূল আরবী[كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه . ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون]*সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুল মানাকিব, হা. ৩৪১৬।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ০২-০৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৩:২২।

পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।"
এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. ভবিষ্যত বাণী করেন, তিনি বলেন, "এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষের জন্য দীনের উপর সবর করে স্থির থাকা ঠিক তদ্রূপ কঠিন হবে যেমন আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধারণ করা কঠিন।"[১]

সৎ সাহস, বীরত্ব ও নৈতিক দৃঢ়তার পার্থিব ও পরকালীন বিবিধ কল্যাণ রয়েছে। এটা মানুষকে সকল ধরনের প্রতিকূলতা মুকাবিলায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। পার্থিব জীবনে এটা মানুষের জীবনে অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূর করে এবং নানা কল্যাণ বয়ে আনে। এই উত্তম গুণ মানুষকে দীন, সততা ও তাকওয়া চলতে শক্তি যোগায়। এটা ব্যক্তিকে সম্মানিত করে। এ গুণের অধিকারীদের আল্লাহ্ ভালবাসেন। এজন্য পরকালে রয়েছে সীমাহীন মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন-[২]

> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
>
> "যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হও না, চিন্তিত হও না, এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে।"

সংকল্পে দৃঢ়তা অবলম্বন : নৈতিক দৃঢ়তার জন্য প্রবৃত্তির তাড়নাসমূহকে প্রতিহত করতে হয়, স্বীয় ইচ্ছা-সংকল্পকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে হয় এবং নিজ মনকে মন্দ থেকে ভালোর দিকে পরিচালিত করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় এই ইচ্ছা-সংকল্প শক্তিও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইচ্ছা-সংকল্পে শৈথিল্য ও জড়তা এসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তখন ব্যক্তি একটি কাজকে মন্দ জানার পরও এবং তার বিপরীত ভালো ও প্রয়োজনীয় জানা সত্ত্বেও ইচ্ছার দুর্বলতার ফলে তা করতে পারে না। কখনও ভালোর বিপরীতে মন্দ চিন্তাও এক ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো সব ইচ্ছা শক্তির ব্যাধি। ইচ্ছা শক্তি এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে দুর্বল পড়লে ধৈর্য সহকারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার সাহায্যে তাকে সুস্থ ও শক্তিশালী করে তুলতে হয়।

সৎ সাহস ও নৈতিক দৃঢ়তা অর্জনে করণীয় হলো: ক. কুরআন অধ্যয়ন, খ.নাবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের জীবনী অধ্যয়ন, গ. আল্লাহর প্রতি ভরসা ও তাকদীরে আস্থা, ঘ. মুত্তাকীদের সাহচর্য, ঙ. আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা, দু'আ ও যিক্র।

❑.হক (সত্য-ন্যায়) অবলম্বন এবং বাতিলকে বর্জন:

হক(সত্য) ও বাতিল(অসত্য) আল-কুরআনের বহুল প্রচলিত দু'টি পরিভাষা। হকের বিপরীত শব্দ বাতিল। হক শব্দের অর্থ– সত্য, যর্থার্থ, ন্যায্য, বাস্তব, কুরআন, মহান আল্লাহর দ্বীন ইসলাম, ইত্যাদি। রাগিব ইস্পাহানী বলেন–'হক হল তা যা প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।'[৩] আহলুল মা'আনীদের (অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ) পরিভাষায়–'হক হল কোন বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি তার অনুরূপ হুকুম প্রদান করা তা হতে পারে কথা, বিশ্বাস, ধর্ম ও মতাদর্শ ইত্যাদির ক্ষেত্রে।'[৪]
ইবনু কাছীর বলেন, হক বা সত্য হলো এমন বিষয় যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, কোন সংশয় ও বৈপরিত্য নেই বরং যার সবটুকুই সত্য। যার এক অংশ অন্য অংশের সত্যায়ন করে, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।[৫]

হক দ্বারা উদ্দেশ্য/কুরআনে হক দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে:

কুরআনে হক (حَقٌّ)শব্দটি বিভিন্নরূপে ২৮৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে হক শব্দটি সত্য, যথার্থ, বাস্তব বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে সাধারণভাবে হক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আল-কুরআন বা ইসলাম অথবা আসমানী গ্রন্থ কিংবা মহান আল্লাহ।[৬] তবে হক দ্বারা কুরআনে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর ওহী (আল-কুরআন ও হাদীস), যা নাবী সা. এর নিকট তাঁর রবের পক্ষ থেকে এসেছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে-[৭] قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا "বলুন, হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসে গেছে। সুতরাং যে সৎপথ অবলম্বন করবে, সে নিজের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে,সে নিজের ক্ষতির জন্য পথভ্রষ্ট হবে।" আরও ইরশাদ হয়েছে[৮] يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ "হে মানব, রাসুল তোমাদের রবের নিকট হতে সত্য এসেছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং তোমরা অস্বীকার করলে জেনে রাখ, আসমান ও যমীনে

---

[১]. মূল আরবী [يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ২২৬০।
[২]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১: আয়াত ৩০-৩১।
[৩]. রাগিব ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.১৬৫।
[৪].মূল আরবী [هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الاقوال، والعقائد، والاديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك] আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২০।
[৫]. ইবনু কাছীর, *তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৭৭ [সূরা আল-বাক্বারাহ: ৯৫ আয়াতের তাফসীর]।
[৬].আল-কুরআন ১৭:৮১; ০৬:০৪; ৪৭:০২; ৩৪:৪৩;
[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : আয়াত ১০৮। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:১৪৭; ০৩:৬০; ১০:৭৬; ১১:১৭; ১৩:০১;১৮:২৯;৩২:৩; ৩৫:৩১; ৪৩:৩০;৪৭:২।
[৮].আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা ০৪ : ১৭০।

যা কিছু আছে সব আল্লাহরই।" অন্যত্র এসেছে[১]-الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- 'সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'

হাদীসেও এর সমর্থন মিলে। বুখারীতে এসেছে,'*অবশেষে হক আসল যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন*'।[২] বস্তুত চূড়ান্ত সত্য ও সকল সত্যের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। আল-কুরআন, ইসলাম বা অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ ইত্যাদি সব সত্যই তাঁর থেকে উদ্‌গত। নাবী সা. এর কণ্ঠে এটাই ব্যক্ত হয়েছে, *হে আল্লাহ তুমি সত্য, তোমার কথা সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নাবীগণ সত্য, কিয়ামত সত্য, মুহাম্মাদ সত্য*।[৩]

আল-কুরআন সত্যের চূড়ান্ত উৎস ও সত্যের ধারক-বাহক। সত্যই হচ্ছে, এর আদর্শ, এর বিষয়বস্তু, এর উদ্দেশ্য, এর উপাদান এবং এর বিবেচ্য বিষয়। সমগ্র কুরআনই সত্যের আলোকবর্তিকা ও সত্যের সন্ধানদাতা। তাই প্রকৃত সত্য লাভ এবং সত্যধারণ করতে হলে কুরআনের সংস্পর্শে আসতে হবে। মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন এবং তাঁর অভিমুখী থাকতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য যে বিপথগামী হয় সে তা বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।"

সত্যের বাহক হিসেবে কুরআন অনুসরণেই রয়েছে মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি। এ মর্মে আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ(রা.) বলেন[৫]-

> আল্লাহর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, কুরআনের সঙ্গে চলতে থাক, যে দিকেই সে চলুক না কেন। সত্য যে-ই তোমার কাছে উপস্থাপন করুক তুমি তা গ্রহণ কর, সে হোক ছোট কিংবা বড়, এমনকি সে তোমার ঘৃণিত ও দূর সম্পর্কীয় হলেও। আর অসত্য যে-ই তোমার কাছে যেই নিয়ে আসুক হয় তুমি তা তার উপর ছুঁড়ে মার, যদিও সে প্রিয় ও নিকটজন হয়।

সত্য চিরকল্যাণকর, চিরসমুন্নত, সুদৃঢ়, শাশ্বত ও চিরবিজয়ী।[৬] মূসা আ. ও ফিরআউনের ঘটনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে কেউ সত্য অবলম্বন করলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে মহাকল্যাণের অধিকারী হয়। সত্য কণ্টকাকীর্ণ ও তিক্ত হলেও এর ফল সুমিষ্ট। এ পথ চূড়ান্ত সফলতার পথ। সত্য অবলম্বনের দ্বারাই যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ সম্মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব, রাজত্ব লাভ করেছিলেন। মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সাহাবীগণ এর মাধ্যমেই বিপুল মর্যাদা লাভ করেন। সত্য অবলম্বনের দ্বারাই মানুষ হিদায়েত প্রাপ্ত হয়। এটা মানুষকে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে। সত্য তার অনুসারীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে এর অনুসারীরা হয়ে উঠে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী, সৎ, বিশ্বস্ত, দানশীল, মানুষের কল্যাণ সাধনকারী, প্রতিশ্রুতি পূরণকারী, ধৈর্যশীল, অন্যায়ে বিরুদ্ধে সোচ্চার, সৎসাহসী, ন্যায় ও সত্যের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারকারী।[৭] এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে[৮]– مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না।"

সত্য অবলম্বনের দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। সত্য অবলম্বনের দ্বারা কেউ কখনও বঞ্চিত হয় না। ইবরাহীম('আ.) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সত্যের জন্য অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করায় প্রতিদানে আল্লাহর নিকট উচু মর্যাদা এবং ইসমাইল('আ.) ও ইসহাক('আ.) এর মত নেক সন্তান লাভ করেন। মহান আল্লাহ বলেন-[৯]

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا- وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

"অতঃপর যখন সে তাদেরকে (স্বীয় পিতা, পরিজন ও স্বজাতি) এবং আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তারা ইবাদাত করত তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং তাদের প্রত্যেককে নাবী করলাম। আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের সুনাম-সুখ্যাতিকে সমুচ্চ করলাম।"

সত্য অবলম্বন ও সত্যপন্থী হওয়ার শর্ত ও কর্মনীতি: সত্য অবলম্বন ও সত্যপন্থী হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন

•সত্য অবলম্বনের প্রধান শর্ত হলো প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা। ইবরাহীম('আ.) জীবন থেকে তাঁরই শিক্ষা পাই, তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে সত্য খুঁজে বের করে তা অবলম্বন করেন।[১০] এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–'*তোমরা সত্য সন্ধানে*

১.আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ ০২:১৪৭।

২. মূল আরবী [حتى جاءه الحق وهو في غار حراء] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওহী, হাদীস নং ০৩।

৩. মূল আরবী [قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং ৬৯৫০।

৪. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯ : আয়াত ৪১ ।

৫. ইবনুল কাইয়িম, *আল-ফাওয়ায়েদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪) খ.০২, পৃ. ১৯৬।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ১৮, আল-কুরআন ৪২ : ২৪।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১৭৭; আরও দেখুন,আল-কুরআন ৪৯:১৫, ৪৩:৮৬, ৫৯:০৮।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭ : আয়াত ১৫।

৯. আল-কুরআন, সূরা মার্‌ইয়াম ১৯: আয়াত ৪৯-৫০; আরও দেখুন,আল-কুরআন ২১:৭২-৭৩।

১০.আর এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখাই এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর যখন রাত তার উপর আচ্ছন্ন হল, সে তারকা দেখল, বলল, 'এ আমার রব'। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, সে বলল, 'যারা ডুবে যায় আমি তাদের ভালবাসি না'। অতঃপর যখন সে দীপ্তিমান চাঁদ দেখল, বলল, 'এ আমার রব'। পরে যখন তা ডুবে গেল, বলল, 'যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয় আমি পথহারা কওমের অন্তর্ভুক্ত হব'। অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, 'এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়'। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক কর, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত'। 'নিশ্চয় আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।- সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ৭৫-৭৯।

প্রবৃত্ত হও যদিও দেখ যে, তাতে অনেকে ধ্বংস হয়েছে। কেননা তাতেই আছে প্রকৃত মুক্তি।[১] সত্যকে জানা ও চিনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলী রা. উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-"*লোকদের দেখে সত্যকে চিনবার ও জানবার চেষ্টা কর না। সত্যকে সত্য হিসেবেই জানতে ও চিনতে চেষ্টা কর এবং তারই ভিত্তিতে সন্ধান কর সত্যের ধারক-বাহকদের।*"[২] বিচক্ষণতা সহকারে সত্য আবিষ্কার না করলে বিপথগামী ব্যক্তিরা ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যেতে পারে।[৩]
উল্লেখ্য যে, সংখ্যার দ্বারা কখনও হক(সত্য) ও বাতিল(মিথ্যা) নির্ণয় করা যায় না। কেননা অধিকাংশ সময়ই সত্যের অনুসারী ছিল কম। এ মর্মে নাবী সা. বলেন, "*নাবীদের উম্মাতদের আমার সামনে উপস্থিত করা হলো। আমি এমন নাবী দেখেছি যার উম্মাত ছিল ছোট একটি দল। এবং এমন নাবী দেখেছি যার উম্মাত ছিল একজন বা দু'জন লোক। আবার এমন নাবীও দেখেছি যার উম্মাত হিসেবে কেউ ছিল না।*"[৪] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কোন নাবীর যুগে সত্যের অনুসারী ছিল এক বা দু'জন লোক, আর কোন কোন যুগে নাবী ছাড়া সত্যের কোনই অনুসারী ছিল না। তাই কোন দলের অনুসারী বেশী হলে তারা সত্যপন্থী–এটা সত্যের মাপকাঠি নয়। আবার কোন বিষয়ে অধিক সংখ্যক লোক যে পক্ষ বা মত অবলম্বন করে আল্লাহ সে পক্ষে– প্রচলিত এ কথাটিও সঠিক নয়।

•প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর তা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা। সত্য আবিষ্কারের পর তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন দ্বিধা-সংকোচ পরিহার করে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করা। তা না হলে সত্যগ্রহণ সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এ কারণে মক্কার কাফিররা সত্য গ্রহণ করতে পারেনি। ইরশাদ হচ্ছে[৫] وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ "আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্,যদি এটি সত্য হয় আপনার পক্ষ থেকে তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিয়ে আসুন'।"

•সত্য ব্যাপারে সুদৃঢ় থাকা। স্বীয় জীবনাচারণ ও কর্মের মাধ্যমে সত্যের জীবন্ত সাক্ষী হওয়া। সত্য নিজ মন ও স্বার্থের অনুকূলে হোক বা প্রতিকূল হোক, কষ্টকর হোক বা সহজসাধ্য হোক সর্বাবস্থাই সত্য অবলম্বন জন্য সচেষ্টা থাকা। এক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া না করা। মহান আল্লাহ বলেন[৬] (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ)"যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তিদান করেন।"

• সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। কেননা সত্যের পথ বড়ই বন্ধুর। সত্য পথে চলতে গেলে বিপদ আসবে। সুফিয়ান সওরী (রহ.) বলেন: "যখন তুমি কোন আলেমের অনেক বন্ধু দেখ, তখন বুঝে নাও সে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে কেবল সত্য কথা বললে অধিকাংশ মানুষ তার শত্রু হত।"[৭] যুগে যুগে অগণিত মু'মিন অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সত্যের খাতিরে অনেকে জীবন দিয়েছেন, অনেকে অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন, আবার অনেকে নিজ মাতৃভূমি ও সহায়-সম্পদ বিসর্জন দিয়েছেন। এজন্য সত্যের পথে আসা বিপদাপদে অবিচল থাকা। মহান আল্লাহ বলেন[৮]– فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ "অতএব, তুমি সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্র ওয়াদা হক। আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে।"

•বাতিলের দাপটে ভীত না হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন[৯]- إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "এরাই শয়তান, তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়, সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করও না, আমাকেই ভয় কর।"

•সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। সত্যপন্থী যত দুর্বলই হোক না কেন তার প্রতি সমর্থন অটুট রাখা। ফিরাউনের রাজকর্মচারী জনৈক মু'মিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসা('আ.) এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছিলেন।[১০] সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর জনপদে আগত রাসূলদের পক্ষ অবলম্বন করে সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ মর্মে বলা হয়েছে[১১]- وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ - اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ-"আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, 'হে আমার কওম! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর। 'তোমরা তাদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না আর তারা সৎপথপ্রাপ্ত'।"

•সত্যের উপর অটল থাকতে একে অপরকে উপদেশ প্রদান করা। মহান আল্লাহ বলেন[১২]
وَالْعَصْرِ •إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ •إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ–

---

[১]. ইবনু আবীদ দুনিয়া, *মাকারিমুল আখলাক* (কায়রো : মাকতাবাতুল কুরআন, ১৪১১হি.) হা. নং ১৩৭, পৃ.৫১।
[২]. ইবনুল জাওযী, *তালবীসু ইবলীস, প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৪।
[৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৩৮।
[৪].মূল আরবী[عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং২২০; *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তিব, হা.৫৪২০;
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ৮: আয়াত ৩২।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : আয়াত ১৭, আল-কুরআন ১৯:৭৬, ০৯:১২৩।
[৭]. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০১, পৃ.৩৮।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৬০; আরও দেখুন,আল-কুরআন ২৬ :৪১-৫১, ২০:৭২-৭৪, ৮৫:৪-৯।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৭৫।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ২৮।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন ৩৬: আয়াত ২০-২১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আস্র ১০৩ : আয়াত ০১-০৩, আল-কুরআন ৯০:১৭-১৮।

"মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"

•সত্যের উপর অটল থাকতে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা এবং নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহান আল্লাহ বলেন[১] – رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ "হে আমাদের রব! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘন প্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদের করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।"

•বাতিলের যত পথ ও মত আছে তা সর্বাত্মকভাবে বর্জন করা এবং বাতিলের প্রতি আপোষহীন থাকা।[২] হকের ব্যাপারে বাতিলপন্থীদের সাথে কোন ধরনের সমাঝোতা না করা।[৩] মহান আল্লাহ বলেন– فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।"[৪]

•জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় সত্য অবলম্বন করা। আংশিক নয় বরং সত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী হওয়া।[৫] মানুষের নিকট সত্যকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা এবং সত্যের কোন অংশ গোপন না করা।[৬] রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "সর্বোত্তম জিহাদ হলো ন্যায় ও সত্য কথা অত্যাচারী সম্রাটের সামনে ব্যক্ত করা।"[৭]

•কুরআন তিলাওয়াত, নাবী-রাসূল জীবনী অধ্যয়ন ও পূর্ববর্তী সত্যপন্থী কর্মনীতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

সত্য অবলম্বন ও বাতিল বর্জন নৈতিক জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নানা কল্যাণ। এজন্য সত্যপন্থীদের জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতসহ বিরাট পুরস্কার । এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৮]–

قَالَ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

আল্লাহ্ বলবেন, এই সেদিন যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটা মহাসফলতা।"
সত্য অবলম্বন ও সত্যের পথে আহবানকারীর জন্য রয়েছে বিপুল কল্যাণ ও সাওয়াব। এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন[৯]–

> যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহবান করে তার জন্যে পরবর্তী সকল অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব নির্ধারিত হবে। এ অতিরিক্ত পূণ্য অনুসারীদের পূণ্যকে মোটেই হ্রাস করবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রান্ত পথের দিকে আহবান করে তার উপর পরবর্তী সকল অনুসারীদের সমপরিমাণ পাপ আবর্তিত হবে। এ অতিরিক্ত পাপ অনুসারীদের পাপকে মোটেই হ্রাস করবে না।

❑.মধ্যপন্থা ও স্থির-চিত্ততা :

মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সকল কাজে উগ্রতা ও উদাসীনতা পরিহার করে উভয়ের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বনই হচ্ছে মধ্যপন্থা।
মধ্যপন্থা ও স্থির-চিত্ততা মানব জীবনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি উত্তম গুণ। চরমপন্থা ও উদাসীনতা কোনটি মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর নয়। এ দু'টিই মানব জীবনে অকল্যাণ বয়ে আনে। তাই জীবন এবং সমাজকে সুন্দর করার জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল কর্ম ও আচরণে মধ্যপন্থাই গ্রহণযোগ্য পন্থা। মধ্যপন্থা শুধু ব্যক্তির চারিত্রিক উন্নয়ন ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে না, বরং তা পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নেও এর অবদান রাখে। এটা মানব জীবনে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। এটা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায়পরায়নতা, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ববহ। এটা মানুষের মাঝে উঁচু মানের ও সুস্থ নৈতিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই সকলের উচিত ইবাদত, আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, চাল-চলন, লেন-দেন, সমাজনীতি, রাজনীতি, আইন-আদালত, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) যথার্থই বলেছেন, "উত্তম আচরণ, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ধীর-স্থিরতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন হচ্ছে নবুয়াতের চব্বিশ ভাগের একভাগ।"[১০]

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ভারসাম্যতা, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় মধ্যপন্থার গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যপন্থা জ্ঞানী ও মু'মিনদের মৌলিক নীতি। এটা ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বিধান করে। এ কারণে ব্যক্তি মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে, কোন উস্কানিতে উগ্র হয় না, বিপদে-আনন্দে সীমালংঘন করে না এবং ইসলামের মূলনীতিকে ঠিক রেখে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ০৮; এছাড়া দেখুন,আল কুরআন ০২:১২৮, ১৭:৮০, ১৭:৯৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ ৬০: আয়াত ০১-০২; আরও দেখুন,আল-কুরআন ০৯:২৩, ০৩:১১৮, ০৪:১৪৪, ০৫:৫১, ৫৮:২২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩: আয়াত ০১-০৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ৫২; এছাড়া দেখুন,আল-কুরআন ১০৯:০১-০৬, ৪৭:০৩, ৩৩:৪৮।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্‌ফ ৬১: আয়াত ০৯, আল-কুরআন ০২:১৫৯-৬০,১৭৪।
[৭]. মূল আরবী [أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল মুলাহিম, হাদীস নং ৪৩৪৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১১৯।
[৯]. মূল আরবী [من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ২৬৭৪।
[১০]. **মূল আরবী** [السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০১০।

পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ বিধি অনুসরণ করে। তাই এই গুণ ধারণ করার জন্য কুরআনে একটি মধ্যপন্থী, সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান দেয়া হয়েছে। এই গুণটি মানব জীবনে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা অনুশীলনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানব জীবনে এর প্রয়োগের কিছু দিক ও ক্ষেত্র নিম্নে তুলে ধরা হল:

•*ইবাদত-বন্দেগীতে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা:* ইসলাম মানব জীবনে ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীসে এসেছে[১]–"দৃঢ়-অবিচল হও ও তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী হও। শুধু আমল বা কাজের দ্বারা তোমাদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমানে কম হয়।" কুরআনেও এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে[২]– وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً "তোমরা সালাতে স্বর উচ্চ কর না এবং অতিশয় ক্ষীণও কর না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।"

আনাস ইবন মালিক রা.বর্ণিত একটি হাদীসে ইবাদতে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে।যা নিম্নে-

> তিন জন সাহাবী নাবী সা. ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রীদের নিকট আগমন করেন। তারা রাসূল সা. ইবাদত সম্পর্কে অবগত হয়ে তা অল্প জ্ঞান করল। তারা বলল, আমরা কি তাঁর মত হতে পারি! তাঁর তো পূর্ব-পর সবকিছুই আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বলল,'আমি সারা রাত নামাজে কাটাব।' অন্যজন বলল,'আমি সারা বছর রোজা রাখব।' অপরজন বলল,'আমি স্ত্রীর সংস্পর্ষে থেকে দূরে থাকব, কখনও বিবাহ করব না।' নাবী সা. এসব কথা শুনে তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–তোমরা কি এসব কথা বলেছো? ...এরপর বললেন, *আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি, তা সত্ত্বেও আমি রোজা রাখি, আবার ভাঙ্গি। আমি নামাজ পড়ি আবার ঘুমাই। আমি বিবাহ করি, ঘর-সংসার করি।এ হচ্ছে আমার আদর্শ। আর যে আমার আদর্শ অনুসরণ করবে না তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।*[৩]

এ হাদীসের মুমিনের জীবনে মধ্যপন্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে রাসূল সা. উম্মতের জন্য নিজ জীবনে উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন।

মুমিনদের কর্তব্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই চরিত্র বজায় রাখা। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ তথা দা'ওয়াতী কাজে ব্যস্ত হতে গিয়ে নিজের শরীর ও পরিবার-পরিজনের দায়িত্বের কথা ভুলে না যাওয়া, আয়-উপার্জনসহ ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া, শরীরের যত্ন নেয়া, পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন ও প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেয়া। রাসূল সা. বলেন[৪]-"দ্বীন সহজ। যে কেউ দ্বীনের কাজে কড়াকড়ি করে, তাকে দ্বীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং দ্বীনের কাছাকাছি হও, আর হাসিমুখে থাক। সকালে, বিকালে ও রাতের কিছু অংশ(ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।"

• *চিন্তা-বিশ্বাসে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা:* চিন্তা-বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মে উগ্রতা ও উদাসীনতার পরিহার করে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা অবলম্বন করা একজন মুসলিমের ধর্মীয় নৈতিকতার বিশেষ দিক। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৫] وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর।"

• *অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা:* একজন মুসলিম ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণ হবে না, আবার অপচয়-অপব্যয় করবে না। এ মর্মে বলা হয়েছে[৬]–"وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا"তুমি তোমার হাতকে তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না,তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"

ইসলাম দান-সাদাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করলেও নিজের পরিবার-পরিজনকে বঞ্চিত করে সবকিছু খরচ করতে বলেনি। এই কারণে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেউ যদি এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করে তবে তার উত্তরাধিকারীদের ইখতিয়ার থাকবে পূরণ করা বা না করার।[৭]

•*বন্ধুত্ব-শত্রুতায় মধ্যপন্থা:* বন্ধুত্ব-শত্রুতার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা একটি নিরাপদ ও বাঞ্ছনীয় পন্থা। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন[৮], "নিজের বন্ধুর সাথে ভালবাসার আতিশয্য দেখাবে না। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। আবার তোমার শত্রুর সাথেও পরাকাষ্ঠা দেখাবে না। অসম্ভব নয় যে, সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।"

•*বক্তৃতা, শিক্ষা ও নসিহতে মধ্যপন্থা:* আবূ ওয়ায়েল শাকীক রা. বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. লোকদের প্রতি বৃহস্পতিবার নসিহত করতেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ আবদুর রাহমান! আপনি প্রতিদিন আমাদের নসিহত করলে

১.মুল আরবী[سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, হা. নং ৬০৯৯; মুসলিম, হা.২৮১৮।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭ : আয়াত ১১০।

৩.মূল আরবী[أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হা.৪৭৭৬, *মুসলিম*, হা.১৪০১।

৪. মুল আরবী [إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৯।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৪৩।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭ : আয়াত ২৯।

৭. হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তির ছয়জন দাস ছিল। এছাড়া তার আর কোন সম্পদ ছিল না। সে মৃত্যুর আগে সব দাসকেই মুক্ত করে দেয়। এরপর তাদের ডাকলেন, এরপর তিনি লটারি করে ছয়জন দাস থেকে দু'জনকে মুক্ত করে দেন। আর বাকি চারজনকে উত্তারাধিকারীদের কাছে ফেরত দেন।" রাসূল সা. বললেন–"আমি যদি জানতাম তবে তার নামাজ পড়তাম না। -*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, হাদীস নং ১৬৬৮।

৮.**মূল আরবী**[أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.নং ১৯৯৭।

ভাল হত। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে এ বিষয়টা বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের ক্লান্ত করা পছন্দ করি না। *নাবী সা. আমাদের ক্লান্তির ভয়ে যেমন বিরতি দিতেন, আমিও তেমনি তোমাদের নসিহত করার ব্যাপারে বিরতি দিয়ে থাকি।*[১]

•*সুখ-দুঃখে মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যতা:* নৈতিকতার দাবী হলো সুখের আতিশয্যে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন উচিত নয়, তেমনি দুঃখ-কষ্টের বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়াও সমীচীন নয়। বরং হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ধনী-দরিদ্র সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থাই গ্রহণযোগ্য পন্থা। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[২]– لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ "তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য উৎফুল্ল না হও।"

মোটকথা, মধ্যপন্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি উত্তম কর্মনীতি। এতে জীবন সহজসাধ্য ও সুন্দর হয়। এটা সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের উপাদান। এটা মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। এর দ্বারা মানুষ চরমপন্থা ও উগ্রতার কুফল থেকে রক্ষা পায়। এটা সফলতা ও কল্যাণ লাভের মাধ্যম। এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন–"তোমাদের কেউ তার কাজের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বলল, আপনিও পাবেন না? তিনি বললেন, না, আমিও না। তবে আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছেন। সুতরাং সঠিক ও কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, সকাল-বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর ইবাদত করো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবে।"[৩]

স্থির-চিত্ততা অবলম্বন: মানুষের অন্যতম স্বভাব হলো তাড়াহুড়া করা। কিন্তু মানুষ তার পদক্ষেপের পরিণামের জানে না। তাই কুরআন মানুষকে ধীর-স্থিরতার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা তাড়াহুড়া অনেক ক্ষেত্রে অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে।[৪] ত্বরাপ্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করে কুরআনে বলা হয়েছে-[৫]وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا-"আর মানুষ অকল্যাণের দোআ করে, যেমন তার দোআ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ।" তাই দুনিয়াবী ও পরকালীন সব কাজে ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। কেননা শয়তান মানুষের মধ্যে ত্বরাপ্রবণতা সৃষ্টি করে বিভ্রান্ত করে মানুষকে দিয়ে অন্যায় কথা বা কাজ করায়। এজন্য নাবী সা. বলেন, 'ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তড়াহুড়া তথা চিন্তা-ভাবনা না করে কথা বলা বা কাজ করা শয়তানের প্রভাব থেকে হয়।"[৬] তিনি আরও বলেন, "যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে আসবে, তোমাদের উচিত ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর যা ছুটে যায় তা পূরা করে নিবে।"[৭]
ধৈর্য অবলম্বন, মন স্থির ও শান্ত রাখা, মধ্যপন্থা এবং সময়ানুবর্তিতার মাধ্যমে এই গুণ অর্জন করা যায়।

❑. ধৈর্য (الصبر) ও সহনশীলতা (الحلم) :

সবর অর্থ-বিরত রাখা, বাঁধা দেয়া, ধৈর্য, প্রবৃত্তিকে তার আসক্তি ও যথেচ্ছাচারিতা হতে বিরত রাখা। উদ্বেগহীনভাবে হৃষ্টচিত্তে সহ্য করা; অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কারণে উদ্বেগ না করে ধৈর্য ধারণ করা, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের হারানোর দরুন ব্যথিত না হয়ে ধৈর্য ধরা।[৮] এছাড়াও সবর বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে–স্বীয় আবেগ সংযত রাখা, রাগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ না করা, বিপদ ঘাবড়ে না যাওয়া, কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে বিলম্ব দেখে অস্থির না হওয়া, অশোভন আচরণে উত্তেজিত না হওয়া, ত্বরা-প্রবণতা পরিহার করা, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বীয় কর্তব্যে অবিচল থাকা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করা। পরিভাষায়–মহান আল্লাহর কর্তৃক পরীক্ষা, তাঁর আনুগত্য ও বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি যাবতীয় মুসীবতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক থাকা এবং সুখ-আনন্দে আত্মহারা না হয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করা নামই সবর। আল-কুরআনে সবর বিভিন্নরূপে ১০২বার এসেছে।
আর রাগের সময় নিজেকে শান্ত রাখাই সহনশীলতা (হিলম)। সহনশীলতা ধৈর্যের একটি দিক বিশেষ।

সবর তিন প্রকার, যেমন- ক. *সবর 'আলা-ত্বআ'ত*; খ. *সবর 'আনিল মা'য়াসী*; গ. *সবর 'আলাল মাসায়িব*।
ক. *সবর আ'লা-ত্বআ'ত :* মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে সব কাজের হুকুম দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। খ. *সবর 'আনিল মা'য়াসী :* যে সব বিষয় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের কাছে যত অকর্ষণীয় ও যত স্বাদের হোক না কেন, তা থেকে নিজকে বিরত রাখা। গ. *সবর 'আলাল মাসায়িব:* বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের সময় অধৈর্য না হয়ে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করে মনকে তার উপর স্থির রাখা। সবরের উল্লেখিত তিনটি শাখার মধ্যে সাধারণ মানুষ তৃতীয় শাখাটিকেই সবর গণ্য করে থাকে, অন্য দু'টির প্রতি লক্ষ্য করে না। কিন্তু এ তিনটি শাখা মিলেই সবর। তবে প্রথম দু'টি শাখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১].মূল আরবী[كان النبي صلى الله عليه و سلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল'ইলম, হা. নং ৭০, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন, হা. ২৮২১।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : আয়াত ২৩।
[৩].মূল আরবী[لن ينجي أحدا منكم عمله.قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة والقصد القصد تبلغوا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, হা. নং ৬০৯৮।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৬।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭ : আয়াত ১১।
[৬].মূল আরবী [الأناة من الله والعجلة من الشيطان] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০১২।
[৭].**মূল আরবী** [إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আযান, হা. ৬১০; *মুসলিম*, হা.৬০২।
[৮]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০।

ধৈর্য একটি উন্নত নৈতিক গুণ, যা সকল চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তি। একে ঈমানের অর্ধাংশ বলা হয়ে থাকে। এটা এমন এক শক্তি, যা দ্বারা মহান আল্লাহর আনুগত্য, সকল ইবাদত ও সৎকর্মে সাহায্য নেয়া হয়। মানব জীবনে বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক ইত্যাদি নিত্য সহচর। জীবন চলার পথে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হয়। এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্যই ধারণ এবং তাকওয়া অবলম্বন না করলে নৈতিক স্খলনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এসব পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সত্যের উপর অটল থাকার প্রধান অবলম্বন ধৈর্য। এটা কুপ্রবৃত্তির হতে দূরে থাকার মাধ্যম। বর্তমান পাপ-পংকিলময় সমাজে সততা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য ধৈর্যের বিকল্প নেই। এর মাধ্যমে অনেক অন্যায়, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজেই সম্ভব। তাই এই মহৎ গুণ অর্জনের নির্দেশ প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন[১] –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ- وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ- أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আমি তোমাদেরকে ভয় ,ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অব্যশই পরীক্ষা করব। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে। যারা বিপদে পতিত হলে বলে আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের রবের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।" আরও বলেন[২]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্য প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহ্কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মুমিনদেরকে বিপদ, পরীক্ষা, আনুগত্যে ও পাপ থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যের মহান গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ হয়েছে। বিশেষ করে একে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ থেকে মুক্তি ও সফলতা লাভের উপায় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য আলী রা. বলেন, "শরীরের সাথে মাথার অবস্থান যেরূপ ধৈর্যের অবস্থানও ঈমানের সাথে সেরূপ।"[৩]

ধৈর্যই মহৎ ব্যক্তিদের কর্মনীতি।[৪] পৃথিবীর সব নাবী-রাসূলকে বিভিন্ন কঠিন বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। ধৈর্যের মাধ্যমে তাঁরা সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুরআনে বেশ কয়েকজন নাবীর ধৈর্যকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে ইবরাহীম('আ.), ইয়াকুব('আ.), ইউসুফ('আ.), আইউব('আ.) ও মুহাম্মাদ (সা.) উল্লেখযোগ্য। ইবরাহীম('আ.) আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, ইয়াকুব('আ.) তাঁর প্রিয়পুত্র ইউসুফ('আ.)এর হারানোর পর ভীষণ মনঃকষ্টে পেয়েছিলেন, ইউসুফ('আ.) নিজ ভাইদের হিংসার কারণে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। আইউব 'আ. কে দীর্ঘকাল কঠিন বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া আ. কে হত্যা করা হয় এবং মুহাম্মাদ (সা.) কে কাফিররা শারীরিক ও মানসিক নানা উপায়ে কষ্ট দিয়েছিল। কিন্তু তারা ধৈর্যহারা, অস্থির বা বিচলিত না হয়ে, পূর্ণ ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিলেন। এ কারণে আল্লাহ তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং উচু মর্যাদা দান করেন। এক্ষেত্রে নাবী-রাসূলগণকে মানব জাতির জন্য ধৈর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ।" আরও বলেন[৬]– وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ "তোমার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে। আল্লাহ্র আদেশ কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে।"

ধৈর্য মু'মিনদের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ। সত্য ও ন্যায়-নীতির পথ দুঃখ-কষ্ট-যাতনায় ভরপুর। ধৈর্যই এ পথের একমাত্র অবলম্বন। ধৈর্য ছাড়া সত্যের উপর অটল থাকা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা সব যুগের মু'মিনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছেন।[৭] এজন্য তাদের উপর বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও জান-মালের ক্ষতি আপতিত করেন। এর উদ্দেশ্য হল–আল্লাহর প্রতি কে কতটুকু অনুগত, কতটুকু ধৈর্যশীল? এ সব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট মোকাবিলার প্রধান অবলম্বন ধৈর্যই ও তাকওয়া। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৮]

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববতীদের অবস্থা আসেনি। তাদের স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও কষ্ট-দুর্দশা এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১৫৩-১৫৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ২০০।
[৩]. **মূল আরবী** [الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد] ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৩৭২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ৭৫।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্ক্বাফ ৪৬: আয়াত ৩৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬ : আয়াত ৩৪, আল-কুরআন ০৩:১৪৬-১৪৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ০৭।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ২১৪, আল-কুরআন ০৩ : ১৪২, ২৯: ০২-০৩; ৩৩:২২, ৪৭:৩১।

সাথে ঈমান আনায়নকারীগণ বলছিল,'কখন আল্লাহর সাহায্য(আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।"

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

"তোমাদেরকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট হতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। *যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।*"[১]

উল্লেখিত আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মানুষকে স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা, বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তি দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। মানুষের কর্তব্য হলো অস্বচ্ছলতা-দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করা এবং সুখ-স্বচ্ছলতার সময় শোকর আদায় করা।

ধৈয ও সহনশীলতা মহান আল্লাহর গুণ। ধৈর্য ও সহনশীলতার সৎকর্মশীল মুমিনদের চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আদম('আ.) এর পুত্র হাবীল ও কাবীলকে কুরবানী নির্দেশ দেয়া হয়। সেখানে হাবীলের কুরবানী কবুল হলেও কাবিলের কবুল হয়নি। এতে কাবিল হাবিলকে হত্যার হুমকি দেয়। কাবিলের হুমকিতে হাবিল প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের চিন্তা না ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতার পরিচয় দেন।[২] তাই একজন মু'মিন দুঃখ-কষ্টের আতিশয্যে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অন্যায় ও অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হবে না বরং ভারসাম্যপূর্ণ কর্মপন্থা অবলম্বন করবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৩] وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً "এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।"

হাসান আল-বাসরী (মৃ.১১০হি.)বলেন, "মু'মিন ধৈর্যশীল, সে মূর্খতাসুলভ আচরণ করে না, যদি তার উপর মূর্খতাসুলভ আচরণ করা হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। আর যদি তার উপর যুলম করা হয় তবে সে ক্ষমা করে এবং যদি তাকে বঞ্চিত করা হয় তবে সে ধৈর্য ধারণ করে।"[৪]

ধৈর্য সফলতার চাবিকাঠি। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ও বিজয় লাভ করা যায়। এ মহৎ গুণ মানুষের সম্মান, মর্যাদা, সফলতা ও সৌভাগ্য বয়ে আনে। এর মাধ্যমেই মানুষ নেতৃত্ব লাভ করে। বনী ইসরাঈলদের দুশমনদের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এ গুণের বিনিময়ে তা পুরা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ "বনী ইসরাঈলের উপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হল। কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে দিলাম যা কিছু তৈরি করেছিল ফির'আউন ও তার কওম এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল।" মহান আল্লাহ আরও ঘোষণা করেন-[৬] وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ "আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈযর্ধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।"

ধৈর্য ও সহনশীলতার একটি কষ্টকর বিষয়। কিন্তু এর ফলাফল অতি মধুর। সফলতা এর চূড়ান্ত পরিণতি। এর মাধ্যমেই উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায়। কুরআনে বর্ণিত ইউসূফ('আ.) এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইউসুফ ('আ.)এর প্রতি তাঁর ভাইরা চরম অন্যায় করেছিল তিনি তাদের আচরণে সবর অলম্বন করেন। পরিণতিতে আল্লাহ তাকে মিশরের রাজত্ব ও বিরাট মর্যাদা দান করেন।[৭] ইরশাদ হচ্ছে[৮] قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে ধৈর্য, উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শনই মহৎ চরিত্রের পরিচায়ক ও দৃঢ় সংকল্পের কাজ। কুরআন এটাকেই উত্তম ঘোষণা করে এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইরশাদ হচ্ছে[৯] وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِين "যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ কর ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই তো উত্তম। অন্যত্র এসেছে[১০] وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "আর যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৮৬।

[২]. আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হল, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না। সে বলল,'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব'। অন্যজন বলল,'আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন'। '*যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না।* নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহকে ভয় করি'। **-আল-কুরআন ৫:২৭-২৮।**

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ২২।

[৪].মূল আরবী [إن المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه حليم وإن ظلم غفر وإن حرم صبر] ইমাম বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ. ৩১৩, রিওয়ায়েত নং ৬৭৭০(খ)।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৩৭।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদা ৩২ঃ আয়াত ২৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৫৬-৫৭।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ৮৯-৯২।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ১২৬; আরও দেখুন,আল-কুরআন ৩১:১৮, ০৩:১৮৬।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৪৩।

ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে মানুষ অনেক কঠিন বিষয় সহজ করে ফেলে। এর সাহায্যে মানুষ অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।[১] ধৈর্য ও সহনশীলতা দুশমনের অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য ঢাল।[২] এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৩]- وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ-"আর তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং সবর কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন। আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।"
ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল বানিয়ে দেন। আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও অধিক সুপ্রশস্ত কল্যাণ কাউকে দেয়া হয়নি।"[৪]

ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। এর ইহকালীন প্রতিফল যেমন মধুর, তেমনি পরকালীন পুরস্কার অফুরন্ত। ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায়।[৫] আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।"[৬] ধৈর্যশীলদের অপরিমিত পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِير "কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ন তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" অন্যত্র বলেন[৮]- إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ "কেবল ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই।" অন্যত্র আরও বলেন-[৯]-أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا - خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا, "তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট।"
রাসূল(সা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন[১০],"আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে ধৈর্য ধারণ করে , আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান নেই।" অন্যত্র বলেন[১১] "মুসলিম বান্দার বিপদ দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এমনকি সেই কাঁটা যা তার পায়ে বিঁধে তার কারণেও।" অন্য বর্ণনায় এসেছে-[১২] "মুমিন ব্যক্তি যে সব দুঃখ-কষ্ট, রোগ-কষ্ট পেয়ে থাকে এমনকি যে সব চিন্তা-ভাবনা তাকে চিন্তিত করে এর বিনিময়ে তার গুনাহ হ্রাস পেতে থাকে।"

ধৈর্য অর্জনের পন্থা: ক.সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক থাকা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন। খ.অধৈর্যের কুফল চিন্তা করে নিজকে নিবৃত্ত করা। গ.তাকদীরে আস্থাশীল হওয়া। ঘ.পরবর্তী করণীয় স্থির করে কাজ করা।

❑. বিনয়-নম্রতা (الخشوع- التواضع) :

বিনয়–নম্রতা শব্দের আরবী প্রতিশব্দ–(التواضع-الخشوع)। বিনয়–নম্রতা বিপরীত দম্ভ-অহংকার। বিনয় মূলত অক্ষমতা ও অপরাগজনিত সেই মানসিক অবস্থা, যা মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্ট। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে বিনয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন- ইমাম আল-কুরতুবী (মৃ.৬৭১হি.)বলেন[১৩] বিনয় অন্তরের মধ্যের এমন এক প্রকৃতিকে বলা হয় যেখান থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্তব্ধতা, নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ পায়।
•ফুযায়ল রহ. (মৃ.১৮৭হি.) বলেন[১৪]–"বিনয় হচ্ছে সত্যের সামনে বিনম্র ও অনুগত হওয়া যদিও সেই সত্য বালক বা মূর্খের নিকট প্রকাশ পায়।"
•সুফিয়ান আস-সাওরী রহ.(মৃ.১৬১হি.)বলেন[১৫], "অমসৃণ খাবার গ্রহণ, মোটা কাপড় পরিধান ও মাথা নীচু করে চলা–বিনয় নয়। বরং বিনয় হল- হক বা অধিকারের ব্যাপারে উচু-নীচু নির্বিশেষে সবার সাথে সমান ব্যবহার করা। আর আল্লাহর তোমার উপর যা ফরয করেছেন, তা পালনের ক্ষেত্রে অন্তরকে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করা।"
•আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.(মৃ.১৮১হি.) বলেন[১৬], "তোমার অপেক্ষা কম সম্পদশালী ব্যক্তির কাছে বিনয়ী হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত বিনয়। যাতে করে তুমি অনুভব করতে পার যে, তার উপর তোমার দুনিয়াদারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পক্ষান্তরে, তোমার চাইতে ধনী ব্যক্তির কাছে তুমি উন্নত শির হও, যাতে তুমি অনুভব করতে পার যে, তোমার উপর তার দুনিয়াদারীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৪৯, আল-কুরআন ১৬:১২৭।
২. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১২০।
৩. আল-কুরআন, সূরা ইউনুছ ১০: আয়াত ১০৯।
৪.মূল আরবী[ومن يتصبر يصبره الله وماأعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুল যাকাত,হা.নং ১৪০০;*সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল যাকাত,হা.১০৫৩।
৫. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪৬।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৪৬।
৭. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ৯-১১।
৮. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার ৩৯ঃ আয়াত ১০)।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান ২৫ : আয়াত ৭৫-৭৬।
১০.মূল আরবী [يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হা.নং ৬০৬০।
১১. মূল আরবী [ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মারদা, হাদীস নং ৫৩১৭, *সহীহ মুসলিম*, হা. নং ২৫৭২।
১২. মূল আরবী[ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, হা. নং ২৫৭৩।
১৩. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৩৭৪।
১৪. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, প্রাগুক্ত, খ.০৩, পৃ.৩৪২।
১৫. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ.৩৭৫।
১৬. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.৩৪২।

•হাসান বসরী রহ. (মৃ.১১০হি.)বলেন[১]–“বিনয় হল গৃহ থেকে বের হওয়ার পর পথিমধ্যে যে মুসলমানের সাথে দেখা হয়, তাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করা।”

•কুরআনে বিনয়ীদের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে[২]–

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ- الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে– যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তা হতে ব্যয় করে।” আরও বলেন[৩], -الْخَاشِعِينَ- الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ “তারাই বিনীত, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাতকার ঘটবে এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে।”

বিনয়-নম্রতার স্থল হচ্ছে অন্তর। বাহ্যিকভাবে মাথা নত করে ধীরে চলার নাম বিনয় নয়। উমর (রা.) এক যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে মাথা নত করে হাটছে। তিনি তাকে বললেন, এই যুবক! তোমার মাথা উঠাও, কেননা এভাবে অন্তরের বিনয় প্রকাশ পায় না। ...বস্তুত প্রশংসনীয় বিনয় ব্যক্তির অন্তরে এমনভাবে গেঁথে যায়, যার ফলে ব্যক্তি আপনা থেকেই শিষ্টাচারের অধিকারী হয়ে যায়।... নিন্দনীয় খুশু হচ্ছে অযথা কষ্ট সহ্য করা, কাঁদার ভান করা, মস্তক অবনত করা যেমনটি জাহেল ব্যক্তিরা করে থাকে, অনুগত ও সম্মান প্রদর্শন করছে বুঝানোর জন্য। এটি শয়তানী ধোঁকা এবং মানুষের অন্তরে শয়তানী ভ্রষ্টতা।[৪]

বিনয়-নম্রতার কতগুলো নিদর্শন রয়েছে। যেমন–যাবতীয় পূণ্য ও ভালো কাজ সম্পন্ন করা এবং মন্দ কাজ থেকে বাঁচার কৃতিত্ব মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা। আত্মপূজা ও আত্মপ্রশংসা না করা।[৫] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৬]– وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء“আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন।” অন্যত্র বলেন[৭]-فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى- “অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।” আরও বলেন [৮]- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى-“নিশ্চয় তোমার রবই সবচেয়ে ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন তার সম্পর্কে, যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।” অন্যত্র আরও বলেন[৯]- إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ-“নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহ্‌ই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভালো জানেন।” -উদ্ধৃত আয়াতসমূহে আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রসাদ ও আত্মপূজা নিষেধ করা হয়েছে। স্বীয় ভালো দিক মহান আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

রাসূল সা. এর পূর্ব-পর সব পাপ মাফ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। একটি হাদীস এসেছে– রাসূল সা. বলেছেন,

> তোমরা সঠিক পথে কায়েম থাক অথবা কমপক্ষে তার কাছাকাছি থাক এবং নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের কেউ তার আমল দ্বারা(আযাব থেকে) রেহাই পাবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লালাহ! আপনিও না ? উত্তরে তিনি বললেন, আমিও না। হাঁ এতটুকু আশা যেন, মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ঢেকে রাখেন।[১০]

বিনয়–নম্রতা একটি উন্নত নৈতিক গুণ। এই মহৎ গুণ ব্যক্তির মধ্যে ধীর-স্থিরতা, সুবিবেচনা ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে। চঞ্চলতা, অস্থির চিত্ততা ও অবিবেচক সুলভ আচরণ দূর করে এবং মানুষকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সহায়তা করে। এটা মানুষকে সমাজে সম্মানিত করে। মহান আল্লাহ বলেন[১১] – وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا “রাহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বধোন করে, তখন তারা বলে, সালাম।”

লুকমান (‘আ.) তাঁর পুত্রকে যেসব মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন তার মধ্যে বিনয় ছিল অন্যতম। কুরআন বলা হয়েছে[১২]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

---

[১]. *প্রাগুক্ত*, খ.০৩ পৃ.৩৪২।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৩৪-৩৫।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪৫-৪৬।

[৪]. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ.৩৭৫।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩: আয়াত ৩২।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২১।

[৭]. আল-কুরআন,সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩ : আয়াত ৩২।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩: আয়াত ৩০; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ১৭:৮৪।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৫৬।

[১০]. **মূল আরবী**[لن ينجي أحد منكم عمله قال رجل ولا إياك؟يا رسول الله قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন, হা. ২৮১৬।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫ : আয়াত ৬৩।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা লুক্‌মান ৩১: আয়াত ১৮-১৯।

> "অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করিও ; নিশ্চয়ই সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"

মানুষ জ্ঞান, সম্পদ, ক্ষমতা ও দ্বীন নিয়ে বড়াই করে থাকে। অথচ জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী,[১] সম্পদশালীর উপর সম্পদশালী, ক্ষমতাবানের উপর ক্ষমতাবান ও ধার্মিকের উপর ধার্মিক রয়েছে। আর জ্ঞান, সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি আল্লাহর দান। ধার্মিকতা, ভালো কাজ সম্পন্ন করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভবপর নয়। তাই কোন মানুষের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে বিনয়-নম্রতা প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা। রাসূল (সা.) বলেন[২], 'কোন বস্তুতে নম্রতা থাকলে সেটি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তা প্রত্যাহার করা হ'লে সেটি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে'।এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বিনয় ও আনুগত্য মানুষকে উঁচু ও সম্মানিত করে। পক্ষান্তরে অহংকার ও আত্মগর্ব মানুষকে নীচু ও লাঞ্ছিত করে।

বিনয়-নম্রতা নাবী-রাসূল, মুত্তাকী ও মহৎ ব্যক্তিদের চারিত্রিক ভূষণ। ইবরাহীম ('আ.) নিজ পুত্র ইসমাইল ('আ.) কে সঙ্গে নিয়ে অনেক কষ্টে কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। নির্মাণ শেষে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন না করে তা কবুলের জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানান। যা কুরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে[৩]- وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবার ভিতগুলো উঠাচ্ছিল (এবং বলছিল) 'হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী'।"

সুলায়মান('আ.) ছিলেন একজন বিখ্যাত নাবী ও প্রতাপশালী বাদশাহ। সৃষ্টিকুলের বড় অংশ তার অনুগত ছিল। তিনি এ সবকিছু লাভের পরেও অত্যন্ত বিনয়ী, মহান আল্লাহ অনুগত ও কৃতজ্ঞভাজন ছিলেন।[৪] তাঁর সভাসদেও বিনয়ী ও জ্ঞানীদের সমাহার ঘটেছিল। রাণী বিলকিসের সিংহাসন সাবা থেকে উঠিয়ে স্বীয় রাজধানীতে প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে সুলায়মান('আ.) জিন্নদের সহায়তা চাইলে তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি দ্রুত তা সম্পন্ন করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি স্বীয় কৃতিত্ব প্রকাশ না করে অত্যন্ত বিনয়ের পরিচয় দেন, যা আমাদের জন্য শিক্ষাণীয়। এ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যটি হচ্ছে[৫]-

> قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ
>
> "যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, 'আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব'। অতঃপর যখন সুলাইমান তার সামনে তা স্থির দেখতে পেল, তখন সে বলল, 'এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা'।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিনয়ের উজ্জ্বল প্রতীক ছিলেন। তিনি মদীনার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও আল্লাহর রাসূল ইত্যাদি বিভিন্ন সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকা এবং সর্বগুণের আধার সত্ত্বেও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র আহমিকা ছিল না। কাউকে কখনও হেয়প্রতিপন্ন করেননি। মসজিদে নববী নির্মাণের সময়, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি নিজে মাটি কেটেছেন ও পাথর বহন করেছেন। বিভিন্ন সফরে তিনি সাহাবীদের সঙ্গে কাজে অংশ নিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা.) বলেন, *"রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জুতা নিজে পরিষ্কার করতেন, কাপড় সেলাই করতেন ও বাড়িতে বিভিন্ন কাজ করতেন, যেমন তোমরা করে থাক।"* তিনি আরও বলেন[৬], *"রাসূল (সা.) অন্যান্য মানুষের ন্যায় একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাপড়ের উকুন বাছতেন, ছাগী দোহন করতেন এবং নিজের অন্যান্য কাজ করতেন।"*

বিনয়-নম্রতা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ এবং আমল গৃহীত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।[৭] তা দ্বারা কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।[৮] এতে প্রভূত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন[৯]-*"যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"* তিনি আরও বলেন[১০]-*"দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করেন আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নত করেন।"*

বিনয় অর্জনের উপায় ও করণীয়: বিনয় অর্জনের জন্য কিছু পন্থা আছে, যা অবলম্বনের দ্বারা মানুষ বিনয়ী হতে পারে। যেমন: ক.নিজেকে জানা, নিজের সৃষ্টি ও সর্বদিক দিয়ে নিজের অপূর্ণতা-সীমাবদ্ধতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। খ. নিজের চেয়ে ধনী, ক্ষমতাবান উপরস্থদের প্রতি না তাকিয়ে নিম্নস্থ লোকদের প্রতি তাকানো। গ. সর্বদা আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয়

---

১. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৭৬,আল-কুরআন ২৬:২১৫।

২. **মূল আরবী** [إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ২৫৯৪।

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১২৭।

৪. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ১৬-১৯।

৫. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ৪০।

৬.মূল আরবী [سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلى ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه] *মুসনাদ আহমাদ*, খ.০৬, পৃ.২৫৬, হা.২৬২৩৭।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৩২।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ৪২-৪৪।

৯. মূল আরবী [من يحرم الرفق يحرم الخير] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব,হাদীস নং২৫৯২।

১০.মূল আরবী [ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২৫৮৮, *তিরমিযী*, হা. ২০২৯।

লালন করা এবং স্বীয় সৎকর্মগুলি আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হচ্ছে কি-না সেই ভয়ে ভীত থাকা। নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্‌র দাস মনে করা এবং মৃত্যুর কথা সর্বদা স্মরণ করা। ঘ.গরীব ও ইয়াতীমদের সাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করা এবং রোগীর সেবা করা। ঙ.দারিদ্র, অর্থসংকট, দুঃখ-ক্লেশ ও বিপদাপদ মানুষকে বিনয় অর্জনে সহায়তা করে।[আল-কুরআন ০৬:৪২] কাজেই বিনয়ী হওয়ার জন্য দুঃখী-দরিদ্র, অসহায় ও বিপন্ন মানুষের জীবন থেকে শিক্ষা নেয়া। চ. গৃহস্থলীর বিভিন্ন ছোটখাট কাজে স্বতঃফূর্তভাবে করা। যেমন–টয়লেট পরিষ্কার করা, ঘর ঝাড়ু দেয়া। এসবের মাধ্যমে অহংকার দূর হয় এবং বিনয় পয়দা হয়।

-যে সব কর্মকাণ্ড অহংকার সৃষ্টি করে তা এড়িয়ে চলা কিংবা তার বিপরীত কাজ করা। যেমন: স্বীয় নামে প্রশংসাসূচক বিশেষণ ব্যবহার, লোকেদের সম্মুখ প্রশংসা শুনতে পছন্দ করা, নিজকে মানুষের সামনে বড় হিসেবে উপস্থাপন করা ইত্যাদি পরিহার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) একবার তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর পিছনে কিছু লোক তাকে অনুসরণ চলছিল। তিনি অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, *'আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহ'লে দু'জন লোকও আমার পিছনে হাঁটত না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গোনাহসমূহ মাফ করুন'*।[১] এভাবে তিনি এই ফিতনা থেকে নিজকে হিফাযত করেছিলেন।

একবার উবাই ইবন কা'ব (রা.) এর পিছনে পিছনে একদল লোককে চলতে দেখে খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। এতে চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি আমীরুল মুমেনীন! জবাবে খলীফা বললেন, *'এটা অনুসরণকারীর জন্য লাঞ্ছনাকর এবং অনুসৃত ব্যক্তিকে ফিৎনায় নিক্ষেপকারী'*।[২] এখানে 'ফিৎনা' অর্থ অহংকার। অথচ উবাই ইবন কা'ব (রা.)-এর ন্যায় বিখ্যাত ছাহাবীর জন্য এরূপ ফিৎনায় পড়ার কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু খলীফা উমর (রা.) চেয়েছিলেন উবাইয়ের মনের মধ্যে যেন কণা পরিমাণ অহংকারের উদয় না হয়।

বিনয়ীদের পুরস্কার: বিনয়ী ব্যক্তিরা সমাজে সবার ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। পরকালীন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ "পরকালের ঐ গৃহ আমি তৈরী করেছি ঐসব লোকদের জন্য, যারা এ দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না।" আরও বলেন[৪]– إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং বিনীত হয়েছে তাদের রবের প্রতি, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"

❑.কোমলতা ও মানবিকতা:

কোমলতা হল শান্ত-ভদ্র মেজাজের অধিকারী হওয়া। এটি নৈতিক গুণগুলোর মধ্যে অন্যতম। উন্নত মূল্যবোধ বিকোষিত করার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ গুণ অর্জনের মধ্য দিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এটি এমন মহৎ গুণ, যা সমাজের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলে এবং মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি করে দেয়। সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক লেন-দেন ও আচরণে কোমলতা ও মানবিকতা হৃদ্যতা সুদৃঢ় হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। কোমল স্বভাবের মানুষ সকলের নিকট সহজেই ভালবাসা অর্জন করে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৫] وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ "এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত কর।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বগুণের আধার। বলেন[৬], 'কোমলতা যে কোন জিনিসেকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। যে জিনিস থেকে কোমলতা কেড়ে নেয়া হয় সেটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।' তিনি আরও বলেন[৭]–তিন ধরনের লোক জান্নাতের অধিকারী হবে। (১) ন্যায়পরায়ণ-সত্যবাদী শাসক, যাকে সামর্থ্য দান করা হয়েছে (নেক ও জনকল্যাণ সাধনের), (২) দয়ার্দ্র হৃদয় ও কোমল মনের লোক যার মন অত্যন্ত কোমল ও নরম প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি, এবং (৩) শরীর ও অন্তরের দিক থেকে যে লোক পূতপবিত্র, যাঞ্চাকারী নয়, কলুষতামুক্ত চরিত্রের অধিকারী ও পরিবার বেষ্টিত।

কোমলতা মহান আল্লাহর অন্যতম গুণ। এটা নাবী-রাসূলদের বিশেষ গুণ।[৮] এ গুণের ব্যাপকতা হবে মানুষসহ সমস্ত সৃষ্টির প্রতি। তাই প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে কোমল ও সদয় হওয়া উচিত। বিশেষ করে অধীনস্থ ও দুর্বল শ্রেণীর প্রতি কোমল আচরণ জরুরী। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[৯]– وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ " আর তুমি প্রার্থীকে ধমক দিও না।" রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"নিশ্চয় মহান আল্লাহ হলেন সদয় ও

---

[১].মূল আরবী [لوتعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان و لحثيتم على رأسي التراب و لوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي] *আল-মুস্তাদরাক*, কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা, হা. ৫৩৮২।

[২]. মূল আরবী [إنما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع] *আল-মুছান্নাফ ইবন আবী শায়বা*, কিতাবুল হাদীস বিল-কারারীস, রিওয়ায়েত নং ২৬৩১৫।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাছাছ ২৮: আয়াত ৮৩।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ২৩, আল-কুরআন ৫০:৩৩-৩৪।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হিজ্‌র ১৫: আয়াত ৮৮, আল-কুরআন ২৬:২১৫-২১৬।

[৬]. **মূল আরবী** [إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ২৫৯৪।

[৭].**মূল আরবী**[وأهل الجنة ثلاثة ذوسلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذوعيال]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাতি নি'অমাতিহা, হা.২৮৬৫

[৮]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ৭৫।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দুহা ৯৩: আয়াত ০৯-১০।

কোমল। তিনি সকল বিষয়ে কোমলতা ও নরম ব্যবহার পছন্দ করেন। আর তিনি সদয় ও কোমল ব্যবহারকারীকে এমন জিনিস দান করেন, কঠোর ব্যবহারকারীকে তা দেন না।”[১]

কোমলতা মহান আল্লাহ ও মানুষের নিকট পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে, রূঢ়তা ও কঠোরতা কেউই পছন্দ করে না। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেন[২]–فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ “আল্লাহ্‌র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-সুহৃদয় হয়েছিল; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশ-পাশ হতে সরে পড়ত।”

নাবী কারীম সা. এর কোমলতা ও মানবিকতা সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রা.) বলেন,

> ‘একদল ইহুদী নাবী কারীম (সা.) এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল এবং বলল *আস-সামু ‘আলাইকা* (তোমার মৃত্যু হোক)। তখন আমি বললাম, তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা‘নত আপতিত হোক। নাবী সা. বললেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ হলেন কোমল। তিনি সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কি বলেছে? তিনি বললেন, আমিও তো বলেছি, *ওয়া-‘আলাইকুম*(তোমাদের উপরও)।’[৩] আয়েশা (রা.) আরও বলেন-‘নাবী সা. কঠোর ভাষী ছিলেন না, এমনকি তিনি প্রয়োজনেও কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না। প্রতিশোধ প্রবণতা তাঁর মধ্যে আদৌ ছিল না। মন্দের প্রতিকার তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং তিনি মন্দের বিপরীতে উত্তম আচরণ করতেন।’

কোমলতা আচরণ মানুষ পছন্দ করে। এই আচরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় সহজে জয় করা যায়। এজন্য রাসূল (সা.) বলেন[৪],‘তোমরা নরম ব্যবহার করো, কঠোর হয়ো না এবং মানুষকে শান্তি দাও, মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।’

দায়ী(আল্লাহর পথে আহবানকারী)দের বিশেষভাবে কোমল গুণের অধিকারী হওয়া উচিত। এজন্য মহান আল্লাহ তার রাসূল মূসা ও হারূন (‘আ.) কে ফিরআউনের মত কাফিরের সাথে কোমলভাবে কথা বলার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন[৫] اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى “তোমরা দু’জন ফির‘আউনের নিকট যাও, কেননা সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।”

কোমলতা ও মানবিকতা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, আবূ হুরাইরা রা. বলেন-[৬],

> জনৈক বেদুইন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করায় লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে উঠল। তখন নাবী সা. লোকদের বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা আল্লাহ তা’য়ালা তোমাদের মানুষের সাথে কোমল ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।

কোমলতা ও মানবিকতা মুসলিমদের চরিত্রের মৌলিক ভূষণ। এর একটি দৃষ্টান্ত: খলীফা আলী রা. এর হত্যাকারী আব্দুর রহমান মুলজিমকে মুগিরাহ ইবন নওফেল রা. বন্দী করেন। তাঁকে খলীফার সামনে নিয়ে আসা হয়। আহত খলীফা লক্ষ্য করেন রশির বাঁধনে ঘাতকের হাতের মাংস কেটে গেছে। নিজের শরীরের গভীর ব্যাথা বিস্মৃত হয়ে তিনি আব্দুর রহমানের ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে উঠলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে, আব্দুর রহমান তাঁর ঘাতক। তাকে তিনি দেখলেন ঘাতক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে। উপস্থিত জনতাকে বললেন, “আব্দুর রহমানের হাতের বন্ধন হালকা করে দাও। মানুষের সঙ্গে আরো কোমল ব্যবহার কর।” সে দিন মৃত্যু পথযাত্রী খলীফার মহানুভবতা, সহৃদয়তা ও দুশমনের প্রতি দরদ নিষ্ঠুর আব্দুর রহমানেরও মর্ম স্পর্শ করে। অনুতপ্ত ঘাতক ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকে। আব্দুর রহমানের হৃদয়গ্রাহী করুণ বিলাপ এবং অনুতাপ লক্ষ্য করে আহত খলীফার মুখে স্মীত হাসির আভা ফুটে উঠে। অনুতপ্ত আততায়ীকে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ভর্ৎসনা করে খলীফা বলেন, “বড় বিলম্বে অনুতাপ করছ ভাই! তুমি তোমার কাজ সমাধা করেছ। আমি কি অযোগ্য কঠোর শাসক ছিলাম? [৭]

❑.সরলতা, অকপটতা ও প্রশস্তমনা:

আল-কুরআন তথা ইসলামের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এর সরলতা। এর শিক্ষার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা রহস্যময়তা নেই। এর মধ্যে কোন অযৌক্তিক ও অবাস্তব কিছু নেই। আল-কুরআন একজন বিশ্বাসীকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে সরল ও অকপট হওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে।[৮] কপটতা, কুটিলতা, কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা ইত্যাদি কুরআনের দৃষ্টিতে ঘৃণিত বস্তু।[৯] সরলতা ও অকপটতাকে মু’মিনদের চরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরা হয়েছে।[১০] ইসলামের নাবী মুহাম্মাদ সা. অনেক মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজ-সরল ছিলেন। তিনি নিজেকে মানুষের নিকট অত্যন্ত সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনের ভাষায় তিনি নিজ পরিচয় সম্পর্কে বলেন[১১] قُلْ

---

[১]. **মূল আরবী**[إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه مالايعطي على العنف]*সুনান আবূ দাউদ*,কিতাবুল আদাব, হা.৪৮০৭; *মুসলিম*,কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২৫৯৩।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ ১৭: আয়াত ৩৭।

[৩]. **মূল আরবী** [يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫৭৭৪।

[৪]. **মূল আরবী**[أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا السام عليك فلعنتهم فقال ما لك.قلت أولم تسمع ما قالوا ؟ قال فلم تسمعي ماقلت وعليكم]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হা. ২৭৭৭।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৪৩-৪৪।

[৬].মূল আরবী[قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم (دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল অযু, হাদীস নং ২১৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৮৪।

[৭]. শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩ ।

[৮]. আল-কুরআন ৪৯:১৫।

[৯]. আল-কুরআন ০৪: ১৪২-১৪৩; ৫৮: ১৬-১৯; ৬৩:০২-০৪; ০৫: ৪১-৪২; ০৯: ৫৪; ০২: ১০-১৬।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৫১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৩:০৭; ২৫:৬৩; ৪৯:১৫।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ ৪১: আয়াত ০৬।

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ "বল, 'আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ কেবলমাত্র এক ইলাহ্।" বাস্তব জীবনাচরণেও নাবী সা. ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদা। আয়েশা(রা.) বলেন[১], *রাসূল(সা.) নিজেই জুতা সেলাই করতেন ও পট্টি লাগাতেন নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সাংসারিক দায়িত্ব নিজে পালন করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন।'*

কুরআনে মুমিনদের সরলতা ও অকপটতার অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[২] فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- "সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছো সেভাবে তুমি ও তোমার সাথী যারা তাওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছ নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা।" এই আয়াতে কৃত্রিমতা ও আত্মগরিমা পরিহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রশস্ত বা উদার মনের অধিকারী হওয়া মানুষের উন্নত স্বভাব গুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা মহৎ ব্যক্তিদের বিশেষ গুণ। এ মহৎ গুণ ব্যক্তিকে হিংসা-বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা, কৃপণতা, লোভ-লালসা ও অহঙ্কার প্রভৃতি নিকৃষ্ট গুণ থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন, 'বাহ্যিক ঐশ্বর্যে যে ধনী মূলতঃ সে ধনী নয়। কেবল মনের ধনীই বড় ধনী।' আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তিনি তার অন্তর অভাবমুক্ত করে দেন এবং তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি দান করেন। আর যখন আল্লাহ কোন বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তিনি তার দু'চোখের মাঝে দারিদ্র্য স্থাপন করেন'।[৩]

❑. লজ্জাশীলতা (الحياء) :

লজ্জাশীলতার আরবী প্রতিশব্দ الحياء (আল-হায়া), বিশেষজ্ঞ আলিমগণ লজ্জাশীলতা সংজ্ঞায় বলেন–"এটি এমন একটি গুণ যা ঘৃণিত ও বর্জনীয় জিনিস ত্যাগ করতে মানুষকে উৎসাহী করে এবং প্রাপকের প্রাপ্য ঠিকমতো পৌঁছে দিতে বাধ্য করে।" আবুল কাসিম জুনাইদ রহ. বলেন–"লজ্জাশীলতা হলো, প্রথমত মানুষ আল্লাহর অপরিসীম দয়া, অনুগ্রহ ও ইহসানের প্রতি লক্ষ্য করবে, অতঃপর নিজের দোষ ও অক্ষমতা সমন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করবে। এ উভয় দিক চিন্তার ফলে মনে যে ভাবের জন্ম নেয়, তাকেই বলা হয় লজ্জাশীলতা।"[৪]

লজ্জা মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ, যার দ্বারা বহুবিদ নৈতিক গুণের বিস্তৃতি ঘটে। লজ্জার মাধ্যমে চারিত্রিক স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে দূরে থাকা যায়। লজ্জাহীনতা হচ্ছে তার ঈমানের স্বল্পতা। নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় লজ্জাশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআনে লজ্জাকে ভালা গুণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[৫] وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ রাসূল সা. এর গৃহে খাবার শেষ কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নাবীকে কষ্ট দেয়, তিনি তোমাদের (চলে যাও-বলতে) লজ্জা করেন। এই আয়াতে রাসূল সা. এর লজ্জাশীলতাকে প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে লজ্জা উপকারী বিষয় হলেও সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে লজ্জা করা উচিত নয়। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৬] وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ "আল্লাহ্ সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না।"

লজ্জা এমন একটি উত্তম মানবীয় গুণ, যার দ্বারা সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়। এর সবটুকুই কল্যাণকর। এতে কোন অকল্যাণ নেই। লজ্জা মানুষকে মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, মন্দ কথা, অকথ্য গালাগালি, ঝগড়া-বিবাদ, খারাপ কাজ ও পাপাচার থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে, লজ্জাহীনতা এমন একটি মন্দ গুণ, এটা মানুষের ভদ্রতাকে বিনষ্ট করে এবং মানুষকে নির্বিঘ্নে অশ্লীলতা, ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম, পরকীয়া, প্রকাশ্যে পাপাচার, গান-বাজনা ইত্যাদি বিভিন্ন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করে। লজ্জাহীন ব্যক্তির দ্বারা যে কোন অন্যায় বা মন্দ কাজ করা সম্ভব। কোনকিছুই তাকে মন্দ কাজ থেকে নিবৃত করতে পারে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৭] "পূর্ববর্তী নাবীদের যে কথা লোকেদের স্মরণে আছে, তা হলো–'যখন তোমার লজ্জা না থাকে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার'।" রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ ব্যতীত কোন কিছুই বয়ে আনে না।' বুশায়র ইবন্ কাব (রা.) বলেন[৮], হিকমতের পুস্তকে লিখা আছে যে, কোন কোন লজ্জাশীলতা ধৈর্যশীলতা বয়ে আনে। আর কোন কোন লজ্জাশীলতা এনে দেয় শান্তি ও সুখ। উমর (রা.) বলেন[৯]–"যার লজ্জা কম হয় তার তাকওয়া কম হয়। আর যার তাকওয়া কম হয়, তার অন্তর মরে যায়।"

---

[১].মূল আরবী[كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته وقالت : كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه] *মিশকাত*, কিতাবুল ফাদায়িল ওয়াশ শামায়িল, হা. নং ৫৮২২; *সহীহ ইবন হিব্বান*, কিতাবুল হাযরি ওয়াল ইবাহাত, হা. নং ৫৬৭৫।

[২]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ১১২।

[৩].মূল আরবী[ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه وإذا أراد الله بعبد شراجعل فقره بين عينيه] *সহীহ ইবন হিব্বান*, খ.১৪,পৃ.১০০, হা. ৬২১৭।

[৪]. মুহী উদ্দীন আন-নাবুবী, *রিয়াদুস সালিহীন*, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদাব, বাবুল হায়া (ঢাকা:হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১১) পৃ.২৬৫।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৫৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৮:২৫।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৫৩।

[৭]. মূল আরবী [إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২৯৬।

[৮]. মূল আরবী [قال النبي صلى الله عليه و سلم (الحياء لا يأتي إلا بخير) . فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة] *সহীহ আল-বুখারী*, (তা'লীক) কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ বাবুল হায়া', হাদীস নং ৫৭৬৬।

[৯].মূল আরবী[ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه لايروى] *তাবরাণী, মু'জামুল আওসাত* (কায়রো : দারুল হারামাইন,১৪১৫হি.), খ.০২,পৃ.৩৭০, হা.২২৫৯।

লজ্জাশীলতা শুধু উত্তম মানবীয় গুণই নয়, বরং তা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূল সা. বলেছেন[১], "ঈমানের সত্তর কিংবা বলেছেন ষাটের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। (তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হ'ল এই ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। আর সর্বনিম্ন শাখা হ'ল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।) আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।" লজ্জাহীনতা দুর্বল ঈমান ও নৈতিকতার পরিচায়ক। নাবী সা. বলেন[২], "লজ্জা-সম্ভ্রম ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের(ঈমানদারের) স্থান বেহেশতে। নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা যুল্‌মের অঙ্গ, আর যুল্‌মের(যালিমের) স্থান দোযখে।"

মহান আল্লাহকে লজ্জা করে অন্যায় কর্ম ত্যাগ করাই হ'ল সবচেয়ে বড় লজ্জাশীলতা। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৩]

তোমরা যথার্থভাবে মহান আল্লাহকে লজ্জা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আল-হামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো আল্লাহকে লজ্জা করি! রাসূল সা. বললেন, বিষয়টা এমন নয়। বরং আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জা করার যথার্থ অর্থ হলো মস্তিষ্ক ও মেধা-মননকে যাবতীয় অন্যায় চিন্তা-চেতনা থেকে হিফাযত করা। পেটকে যাবতীয় হারাম খাদ্য থেকে হিফাযত করা। আর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থাকে স্মরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি আখিরাত কামনা করে সে পার্থিব চাকচিক্য পরিহার করে চলে। আর যে এ কাজগুলো করবে সে-ই বস্তুত আল্লাহর ব্যাপারে যথার্থ লজ্জাশীলতা অবলম্বনকারী।

❑.ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা:

আত্মমর্যাদাবোধ ও ভাব-গাম্ভীর্য কাছাকাছি বিষয়, যা উত্তম চরিত্রের উপাদান। নিজের সম্মান ও মর্যাদা নিজে রক্ষা করে চলার নামই আত্মমর্যাদাবোধ। অহঙ্কার, আত্মতুষ্টি এবং আত্মমর্যাদাবোধ এক নয়। আত্মমর্যাদাবোধ হলো জ্ঞান, ঈমান ও তাকওয়ার ফলশ্রুতি। আর ভাব-গাম্ভীর্য স্বীয় চিত্তকে স্থির রাখা এবং কোন ধরনের অস্থিরতা প্রদর্শন না করা। ধীরস্থির অঙ্গভঙ্গি, বিনম্র চলাফেরা, সংযত কণ্ঠস্বর, অবনমিত দৃষ্টিশক্তি, রাস্তায় চলার সময় এদিক-সেদিন না তাকানো ইত্যাদি ভাব-গাম্ভীর্যের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন এই গুণসম্পন্ন মানুষের কতগুলো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৪]

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا- وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا - وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا...وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا- وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا... وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا- وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'। যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। ... আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না, বরং উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যার হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।...আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে আত্মমর্যাদাশীল মুমিনের নৈতিক ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের দিকসমূহ ফুটে উঠেছে। এ সব গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমেই যে কোন ব্যক্তিই আত্মমর্যাদাবান হতে পারে। বস্তুত এই প্রশংসনীয় গুণ মানুষের আচরণ মার্জিত করে, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্যকে শাণিত করে, ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং মানুষকে অন্যায়, অশ্লীলতা, মন্দ, লাঞ্ছনাকর ও হীন কাজ বিরত রাখে এবং ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তি বা পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করে।

আত্মমর্যাদাবোধ জ্ঞানীদের ভূষণ। অভাব ও জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে এই গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা ধৈর্যশীল ও তাকদীরে আস্থাশীল থাকে। মানুষের কাছে নিজের দুরবস্থা বর্ণনা করে সাহায্যের জন্য হাত পাতে না। বরং তারা পরিশ্রমের মাধ্যমে যা উপার্জন করে তাতেই তুষ্ট থাকে। তারা এমন কোন কথা বলে না বা কাজ করে না–যা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একদা আতা ইবন আবূ রাবাহ (রহ.) উমাইয়্যা খলীফা আব্দুল মলিক ইবন মারওয়ানের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে কিছু উপদেশ দেন। ...এরপর আব্দুল মালিক তাকে বললেন, ঠিক আছে তা আমি করব। ...এখন বলুন আপনার প্রয়োজন কি? তখন তিনি বললেন, কোন মাখলুকের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই, এ কথা বলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তখন আব্দুল মালিক বললেন, একেই বলে আভিজাত্য ও শরাফাত।[৫]

আত্মমর্যাদাবোধ একটি উন্নত নৈতিক গুণ। এই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা ওয়াদা, অঙ্গীকার, চুক্তি রক্ষা ও সামাজিক লেন-দেনে যত্নবান হয়ে থাকেন। এই গুণ মানুষকে অনার্থক কথাবার্তা, কর্মকাণ্ড এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ থেকে নিজেকে সংযত রাখে।

---

[১].মূল আরবী [الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং০৯, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং ৩৫।

[২]. মূল আরবী [الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২০০৯।

[৩].মূল আরবী[استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাহ, হা.২৪৫৮, *ইবন মাজাহ*, হা.৪১৮৪;

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ৬৩-৭৩।

[৫]. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহ্‌ইয়ায়ু উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩৪৫।

এজন্য ইয়াহইয়া ইবনু মুয়ায রহ. বলেন, তিনটি বিষয়ের চর্চার দ্বারা মানুষের তাকওয়া ও দ্বীনদারী অর্জিত হয়। আত্মমর্যাদাবোধ, বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা ও মৃত্যুর ভয়।[১]

আত্মমর্যাদাবোধ এমন একটি গুণ, যা মানুষকে আল্লাহ অভিমুখী করে। এই গুণসম্পন্ন লোকেরা আল্লাহর কাছে সম্মান চায়, মানুষের নিকট নয়।[২] এই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করেন। যে ব্যক্তি (অপরের কাছ চাওয়া থেকে) সংযমী হতে চায় আল্লাহ তাকে সংযমী করেন।..."[৩]

❑·লজ্জাস্থান হিফাযত ও কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ:

লজ্জাস্থানের হিফাযত, পেটের লালসা এবং কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের উপর উন্নত নৈতিক চরিত্র নির্ভরশীল। এ সবের নিয়ন্ত্রণ চারিত্রিক শুদ্ধতা ও দৃঢ়তার নিয়ামকশক্তি। কেননা লজ্জাস্থান, পেট ও কুকামনা-বাসনা মানুষের নৈতিক পদস্খলন ঘটানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ মানুষ এ সবের শিকার হয়ে বিপথগামী ও মন্দ কাজে লিপ্ত হন। লজ্জাস্থানের চাহিদা মেটাতে মানুষ ব্যভিচার, সমকাম ও যৌনাচারে লিপ্ত হয়; আর পেটের চাহিদা পূরণে মানুষ অবৈধ উপার্জন, হারাম ভক্ষণ ও ভোগ-বিলাসের দিকে ধাবিত হয়। কুরআনেও এ সবের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে[৪]

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون-وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"

হাদীসেও এ সব মন্দ বিষয়ের অনিষ্টতা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন জিনিস মানুষকে বেশী পরিমাণে জাহান্নামে প্রবেশ করায়? তিনি বললেন–'মুখ ও লজ্জাস্থান'।[৫]

কুপ্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে যেহেতু কুচিন্তা, কুকামনা, আত্মপূজা ও কুকর্মের প্ররোচনা দেয়। তাই বলা হয়েছে-[৬] وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ-"তুমি খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"

হাদীসেও লজ্জাস্থান হিফাযতের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো-[৭]

"যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থান (যবান-মুখ) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী স্থান (যৌনাঙ্গ) এর জামিন হতে পারবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো।" অন্যত্র বলেছেন[৮]–

"তোমরা ছ'টি জিনিসের দায়িত্ব নিলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব। ছ'টি জিনিস হলো, ১. কথা বলার সময় সত্য বলে। ২. আমানাত আদায় করো। ৩. ওয়াদা রক্ষা করো। ৪. নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করো। ৫. দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখো। ৬. হাতকে (অন্যায় থেকে) বাঁচিয়ে রাখো।"

লজ্জাস্থানের হিফাযত মু'মিনদের একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৯] এ ব্যাপারে কোন মু'মিন অসতর্ক থাকতে পারে না। কেননা নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তার উপর তাকওয়ার দৃঢ়তা অনেকখানি নির্ভরশীল। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[১০]–

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ......وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ-إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ-فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ-

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে। যারা অসার কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকে।...যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা নিন্দিত হবে না। আর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।"

লজ্জাস্থান হিফাযতের জন্য ইসলাম বৈধভাবে বিবাহের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই তাদের অবৈধ যৌনাচারের সুযোগ ইসলামে নেই। এক্ষেত্রে নিজেদের জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য কুরআনে রোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[১১], وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَايَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ "যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"

---

১. আবূ নু'আইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ.১০, পৃ.৬৮।
২. আল-কুরআন, সূরা ফাতির ৩৫: আয়াত ১০।
৩. মূল আরবী [ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০২৪।
৪.আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩০-৩১।
৫. মূল আরবী [سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২০০৪।
৬. আল-কুরআন,সূরা সাদ : আয়াত ২৬।
৭.মূল আরবী [من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস ৬১০৯।
৮.মূল আরবী [اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৫, পৃ.৩২৩, হাদীস নং২২৮০৯, *সহীহ ইবন হিব্বান*, খ.১, পৃ.৫০৬, কিতাবুল বির্রি ওয়াল ইহসান, হাদীস নং ২৭১।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫ : আয়াত ৬৮, আল-কুরআন ৪২:৩৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ১–৭।
১১. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩৩।

উন্নত নৈতিক চরিত্র ও লজ্জাস্থান হিফাযত সর্বযুগের মু'মিনের প্রশংসা গুণ। কুরআন এক্ষেত্রে মু'মিনদের জন্য ইউসুফ আ. ও মারয়াম আ. দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। যারা ছিলেন পবিত্র চরিত্রের জ্বলন্ত প্রতীক। মারয়াম প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন[১]

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ...وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ...وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

"আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ্ উদাহরণ পেশ করেন... ইমরান কন্যা মারয়াম-এর, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ... এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।" –এখানে মহান আল্লাহ মারয়ামকে সতীত্ব রক্ষা ও আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে উত্তম উদাহরণ পেশ করেন, যা থেকে মানব জীবনে লজ্জাস্থান হিফাযতের গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

উমার রা. জনৈক যুবককে লক্ষ্য করে বলেন, "হে যুবক, যদি তুমি তিনটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাও তবে তুমি যৌবনের সব অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। ক.জিহ্বার অনিষ্ট, খ. লজ্জাস্থানের অনিষ্ট, গ.পেটের অনিষ্ট।"[২]

অনেকে ব্যভিচার, সমকাম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকলেও অন্যান্য যৌন নৈতিক বিধান লক্ষ্য করেন না। যেমন-ঋতুবতী স্ত্রী সাথে সংগম এবং স্ত্রীর পশ্চাদ্বার ব্যবহার করে থাকে–যা সম্পূর্ণ হারাম ও অনৈতিক। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে[৩]-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।" স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সঙ্গম অত্যন্ত গর্হিত কাজ। নাবী সা. বলেন[৪],"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত।"

লজ্জাস্থান, পেট ও কুপ্রবৃত্তির সব কামনা-বাসনা ও মন্দ স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে শুধু উন্নত নৈতিক চরিত্র হাসিল হয় না, বরং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা যায়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৫] وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى -"পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে। জান্নাতই হবে তার আবাস।" –এই আয়াতসমূহে কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও মন্দ স্বভাব নিয়ন্ত্রণ এবং তাকওয়াকে জান্নাত লাভের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

❑. যবান সংযত, নীরবতা এবং উত্তম ভাষী হওয়াঃ

জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যা মানুষের অসংখ্য ভুল-ত্রুটি ও নৈতিক বিচ্যুতি মাধ্যম।[৬] মানুষ তার মুখের দ্বারা যত পাপ করে, সম্ভাবত অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে এত পাপ করে না। মুখের মাধ্যমে মানুষ দায়িত্বহীন কথাবার্তা, গালাগাল, ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অভিশাপ, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা অপবাদ, চোগলখুরী, অশ্লীল ও অনর্থক কথা বলে থাকে। এ সব মন্দকর্ম জিহ্বা সংযত না করার ফসল, যা শুধু মূল্যবোধ অবক্ষয় সৃষ্টি করে না বরং মানুষকে পাপ লিপ্ত করে। তাই জবানের হিফাযত ও নীরবতা একটি উত্তম গুণ। হাদীসে নীরবতাকে প্রজ্ঞা বলা হয়েছে।

মানুষের অর্থহীন আচরণ কথা ও কাজ উভয় ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। অধিকাংশ মানুষই এ বিষয়ে অসতর্ক। তারা তাদের কথাবার্তাকে কর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না এবং তাতে লিপ্ত হন। অথচ এ সব অনৈতিক কথার দ্বারা নানা ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণে কুরআন গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যাচার, মিথ্যা অপবাদসহ অনর্থক কথা ও কাজ নিষিদ্ধ করেছে এবং যবানের হিফাযতের ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছে। এ মর্মে সতর্ক করতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে[৭]-يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তারা যা করত, সে ব্যাপারে।" এ প্রসংঙ্গে নাবী সা. বলেছেন[৮], "মানুষের জিহবার আবর্জনা তথা অনর্থক কথা-ই তাদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।"

অসার ও অনর্থক কথা নানা ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। এ সব ক্ষতির মধ্যে রয়েছেঃ রিজিক বিলম্বকরণ, আল্লাহর নিকট নিরর্থক কথাবার্তার রেকর্ড প্রেরণ, জান্নাতে থেকে বাধা প্রদান, হিসাব, ভর্ৎসনা, তিরস্কার এবং আল্লাহর থেকে লজ্জা পাওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়েছে[৯]- إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ-مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিখে রাখে; মানুষ যে কথাই উচ্চরণ করে তার জন্য তৎপর

---

১. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্রীম ৬৬: আয়াত ১১-১২।
২. আবূ লাইছ সমরকান্দী, *তানবীহুল গাফিলীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৬।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২২। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২: ১৮৭ ।
৪. মূল আরবী [ملعون من أتى امرأته في دبرها] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ২১৬২।
৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নাযি'আত ৭৯ : আয়াত ৪০-৪১।
৬. আল-কুরআন ৪৮:১১; ১৬:৬২।
৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২৪।
৮.মূল আরবী [وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم]*সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৬১৬।
৯. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ১৮।

প্রহরী তার নিকটই রয়েছে।” তাই মানুষের উচিত হলো এই যে, হয় সে ভালো কথা বলবে নতুবা চুপ থাকবে। এজন্য রাসূল সা. বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।”[১]

সমাজে অনেক লোক আছে যারা হারাম খাদ্য, যুল্‌ম, ব্যভিচার, চুরি, মদ্য পান এবং নিষিদ্ধ দৃষ্টিদান ইত্যাদি বিষয় থেকে বেঁচে থাকেন। কিন্তু তাদের অনেকের পক্ষে অসার ও অনর্থক কথা থেকে নিবৃত্ত থাকা সম্ভবপর হয় না। এমনও দেখা যায় যে, লোকজন যার কাছে দ্বীন ও ইবাদত সম্পর্কে পরামর্শ করে থাকে। অথচ ঐ ব্যক্তি এমন সব কথা বলে যা তাকে নির্ঘাত আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত করে। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে অনেক সতর্ক অথচ নিজেরা জীবিত-মৃত সবার ব্যাপারেই নির্বিচারে মন্তব্য করার ব্যাপারে কোন সতর্কতা অবলম্বন করছে না। এজন্য

> রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[২] – মানুষ কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে অথচ সে ধারণা করতে পারে না তা কোথায় পৌঁছাবে, যার ফলে আল্লাহ তার জন্য কেয়ামতের সাক্ষাৎ দিবসে আপন সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে রাখেন। আর মানুষ কথা বলতে গিয়ে আল্লাহর অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে অথচ সে ধারণাও করতে পারে না তার পরিণাম কী হবে, যার ফলে আল্লাহ কেয়ামত দিবসের পর্যন্ত তার প্রতি অসন্তুষ্টি লিখে রাখেন’।

অসার ও অনর্থক কর্মকাণ্ড[৩] মানুষকে অনৈতিক পথে উৎসাহিত করে। অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা-কাজ গুনাহের দরজাসমূহের অন্যতম। তা দ্বীন বা দুনিয়ার কোন উপকারে আসে না। প্রত্যেকে তা পরিহার করা উচিত। এতে ব্যক্তি যেমন নিরাপদ হবে তেমনি অন্যকেও নিরাপদ রাখবে। একজন মুমিন এ ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪] وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ “তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না।” অন্যত্র বলেন[৫], وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “আর আল্লাহ্‌কে তোমরা তোমাদের শপথ পূরণে প্রতিবন্ধক বানিয়ো না যে, তোমরা (আল্লাহ্‌র নামে এই বলে শপথ করবে যে) ভালো কাজ করবে না, তাকওয়া অবলম্বন করবে না এবং মানুষের মধ্যে সংশোধন করবে না। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, আমি রাসূলূল্লাহ(সা.) কে বলতে শুনেছি :“অসৎ সংসর্গে থাকার চাইতে নির্জনবাস শ্রেয়, নির্জনবাসে থাকার চাইতে সৎসঙ্গ শ্রেয়, ভালো কথা বলা নীরবতা অপেক্ষা উত্তম, আর মন্দ কথা বলার চাইতে নীরবতা অধিক উত্তম’।”[৬]

নিরর্থক কথা জিহ্বাকে সংযত রাখা ও অর্থহীন কাজ থেকে বেঁচে থাকা মু’মিনের একটি উত্তম নৈতিক গুণ। মু’মিনরা অনর্থক, অন্যায় ও পাপচারপূর্ণ মন্দ বিষয়ে কথা বলে না এবং যবানের দ্বারা কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না। এ মর্মে বলা হয়েছে[৭]-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ “যারা অসার কথা ও কাজ হতে বিরত থাকে।” হাদীসেও এর সমর্থন মেলে আবূ মূসা রা.বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? তিনি বললেন, ‘যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ সে-ই সর্বোত্তম মুসলিম।’[৮]

পক্ষান্তরে, অনর্থক কথায় মগ্ন থাকা ও আড্ডাবাজি করা কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন[৯],“মু’মিন কম কথা বলে, আমল করে বেশী। আর মুনাফিক বেশী কথা বলে, আমল করে কম।” এর সত্যতা আমরা কুরআনে দেখতে পাই[১০]-قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ- مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ- “আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে অবশ্যই তিলাওয়াত করা হত, তারপর তোমরা তোমাদের পেছন ফিরে চলে যেতে, এর উপর অহঙ্কারবশে, রাত জেগে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে।”

অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকা ও নীরবতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। এর দ্বারা মানুষ কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আবূ দারদা রা. বলেছেন[১১], “মানুষের বুদ্ধিমত্তার অংশ বিশেষ হল নিরর্থক বিষয়ে কথার স্বল্পতা।” কথিত আছে, লোকমানকে

---

[১].মূল আরবী[ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫৬৭২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ৪৭।

[২]. মূল আরবী [إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله لها بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩১৯।

[৩]. অসার ও অনর্থক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। নিরর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অর্থপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরঞ্জন করা। তবে এটা আপেক্ষিক বিষয়। যেমন নিত্য দিনের ঘটনা, খাদ্য-পোশাক ইত্যাদির সম্পর্কে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, অশ্লীল ও অর্থহীন সিনেমা, নাটক, গান দেখা। অপকারী বইপত্র ও ম্যাগাজিন পড়া যেমন কাল্পনিক গল্প ও রহস্য। এ সব কাল্পনিক বর্ণনার মাধ্যমে মনের স্থূল আনন্দ ছাড়া এগুলোতে অর্থবহ কিছু নেই। এমনিভাবে উপকার শূন্য আরো বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন ক্রীড়া ও সিনেমা সংবাদ, নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিদান ইত্যাদি।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৫৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৩:১–৩, ২৫:৭২।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৪।

[৬].মূল আরবী[الوحدة خير من جليس السوء و الجليس الصالح خير من الوحدة و املاء الخير خير من السكوت و السكوت خير من املاء الشر]ইমাম বাইহাকী, *শু‘আবুল ঈমান*, খ.০৪, পৃ. ২৫৬, হা.৪৯৯৩;

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু’মিনূন ২৩: আয়াত ৩।

[৮].মূল আরবী[يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং১১, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.৪২।

[৯]. মূল আরবী [المؤمن يقل الكلام يكثر العمل.و المنافق يكثر الكلام يقل العمل.]আবূ লাইছ সমরকান্দী, *তানবীহুল গাফিলীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৩।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা মুমিনূন ২৩: আয়াত ৬৬-৬৭।।

[১১]. ইবন আবদুল বার, *আদাবুল মুজালিসাহ* (তানতা: দারুস সাহাবা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯) পৃ. ৭৬।

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কীভাবে তার মর্যাদা-সম্মানের আসন লাভ করেছেন। তিনি বলেন[১], “সত্যবাদিতা, আমানতদারি ও নিরর্থক বিষয় পরিহার তথা নীরবতা পালন।”

নিরর্থক কাজ বর্জন করা মানুষের ইসলামের পরিপূর্ণতা ও তার ঈমান বৃদ্ধির পরিচায়ক। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন– “মানুষের সর্বোত্তম ইসলাম হল নিরর্থক বিষয় (অনর্থক কথা ও কাজ) পরিত্যাগ করা।”[২] তিনি আরও বলেছেন,“মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পাপাচারী সে ব্যক্তি যে নিরর্থক বিষয় নিয়ে বেশী কথা বলে।”[৩]
ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, ‘আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হ’ল চারটি। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি অর্থাৎ নাবী (সা.) ক.মন্দ থেকে বেঁচে থাক, খ.দুনিয়া ত্যাগী হও, গ.অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং ঘ.সংকল্পের সাথে কাজ কর’।[৪]

অসার ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার মধ্যে দুনিয়া-আখিরাতের মুক্তি নিহিত। উকবাহ ইবনু ‘আমির রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! মুক্তির উপায় কি? তিনি বললেন, ‘নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখ, আর তোমার ঘর যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় অর্থাৎ নিজ বাড়ীতে অবস্থান কর এবং নিজ পাপের জন্য কান্নাকাটি কর’।[৫]

যবানের হিফাযত করণীয়: জিহ্বাকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা। পার্থিব ক্ষেত্রে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে পুরস্কারের আশা করা যায় এমন সব বিষয়ে কথা বলা। কথা বলার পূর্বে এই চিন্তা করা যে, তাতে কোন লাভ আছে কিনা? যদি কোন লাভ না থাকে নিজেকে সংযত রাখা। আর যদি তাতে কোন লাভ থাকে, তবে প্রয়োজন অনুপাতে কথা বলা।

ভালো কথা বলা ও উত্তম ভাষী হওয়া: মন্দ কথা যুলুম ও নিফাকের অন্তর্ভুক্ত; অন্যদিকে ভালো কথা বলা সাদাকা স্বরূপ। ভালো কথা কল্যাণের পথ নির্দেশ করে এবং মানুষের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন[৬]– قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ “যে দান করে ক্লেশ দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা ও ক্ষমা উত্তম।” নাবী সা. বলেছেন–“উত্তম কথাও একটি সাদাকা বা দান বিশেষ।[৭] মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[৮]– وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ “আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর।” আর রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৯] –“জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও যে তাতেও সক্ষম নয় সে যেন উত্তম কথা মাধ্যমে নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে।”

মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতে উত্তমভাবে কথা বলা এবং অশ্রাব্য কথাবার্তা ও আচরণ বর্জন করা। কথাবার্তার সময় প্রফুল্লচিত্ত থাকা এবং হাস্যজ্জ্বল চেহারায় মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলা সৌজন্যতার অন্যতম দিক। ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে এই কাঙ্ক্ষিত আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১০]– وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً “এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে।” অন্যত্র বলেন[১১], وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ-“আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর,তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ’।”

মহান আল্লাহ মূসা ও হারূন(‘আ.) কে ফিরআউনের মত উদ্ধত কাফিরের বিনম্র ও সৌজন্যতা রক্ষা করে কথা বলতে নির্দেশ দেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১২]–فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى-“তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।” এ প্রসঙ্গে নাবী সা. কে আদর্শ অনুসরণ করা। আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রা. বলেন[১৩],“রাসূল সা. এর মধ্যে অশালীন কোন অভ্যাস ছিল না। তিনি কখনও অশালীন কথা বলতেন না।”

❑.উত্তম চরিত্র অর্জন(حسن الخلق) চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখা ও নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার(العفة):

উত্তম চরিত্র বলতে বুঝায় সুন্দর ব্যবহার প্রদর্শন, লজ্জাশীলতা-শালীনতা রক্ষা, ভালো কথা বলা ও কাজ করা, রাগ দমন, চেহারা হাসি-খুশী রাখা, অন্যকে কোন কষ্ট না দেয়া, নিজে কষ্ট সহ্য করা এবং সত্য-ন্যায়কে অবলম্বন করা। মন্দ কথা, কাজ ও স্বভাব পরিহার করা। মহৎ চরিত্রের একটি পরিচয় সম্পর্কে নাবী(সা.) বলেন[১৪],“যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার

---

১. আবূ লাইছ সমরকান্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬২।
২. মূল আরবী [من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩১৭; ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৩৯৭৬।
৩. মূল আরবী [أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه]হাফিয আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ.০৩, পৃ.৩৪৫, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৩৬৯।
৪. *মিরক্বাত*, ভূমিকা অংশ পৃ.২৪।
৫.মূল আরবী [قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وآبك على خطيئتك] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৪০৬।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৩।
৭. মূল আরবী [والكلمة الطيبة صدق]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৮২৭, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০০৯।
৮. আল কুরআন, সূরা আল-ইসরা’১৭ : আয়াত ৫৩।
৯.মূল আরবী[من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হা. নং ১০১৬; *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হা.১৩৪৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৩।
১১. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৯।
১২. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৪৪।
১৩.মূল আরবী [لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحشا ولا متفحشا] *সহীহ আল-বুখারী*,*প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৮৮।
১৪. মূল আরবী [صل من قطعك و اعط من حرمك و اعف عمن ظلمك] ইমাম বাইহাকী, *শু‘আবুল ঈমান*, খ.০৬, পৃ. ২৬১, রিওয়ায়েত নং ৮০৮১।

সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। যে তোমার উপর যুলম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও।” আর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা হলো অশ্লীলতা ও সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে নিজেকে হিফাযত করা।

মহৎ চরিত্রের কিছু নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, লজ্জাশীল, কৃতজ্ঞ, সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হওয়া, কথা কম বলা, অনর্থক কথা না বলা, স্বল্পতুষ্ট থাকা, কোমল ও স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী হওয়া, হাসি মুখে থাকা। মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা। অসভ্য, অশ্লীল, চোগলখোর, গীবতকারী, অন্যের দোষ অন্বেষণকারী, হিংসুক, লোভী ও কৃপণ না হওয়া। ফীরূযাআবাদী(মৃ.৮১৭হি.) বলেন[১],“চারটি ভিত্তির উপর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত। যথা: সবর (ধৈর্য), ইফফাত(চারিত্রিক নির্মলতা), শুজাআত(বীরত্ব) এবং আদল(সুবিচার)।এই চারটি গুণ থেকে সব উন্নত চরিত্রের উদ্ভব ঘটে।”

ব্যক্তি ও সমাজে জীবনে নৈতিক চরিত্র অর্জন ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে নৈতিক আদর্শ রক্ষা এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডরোধের ক্ষেত্রে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়া আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব নয়। কেননা ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তি নিজে চরিত্রবান না হলে তার দ্বারা সমাজ থেকে অনৈতিক কার্যক্রম রোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য রাসূল সা. ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। এর একটি চিত্র দেখতে পাই জা'ফর ইবন আবূ তালিব রা. এর বক্তব্যে যা তিনি আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর দরবারে প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–[২]

> মহারাজ! আমরা ছিলাম জাহেলী যুগের মানুষ, মূর্তিপূজা করতাম, মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করতাম, বিভিন্ন অশ্লীল ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের মধ্যে যারা সবল তারা দুর্বলদের অধিকারহরণ করতাম। যখন আমরা এ অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আল্লাহ আমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যার বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে আমরা আগে থেকে জানতাম। যিনি আমাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে এবং কেবল তাঁরই ইবাদত করতে আহবান জানিয়েছেন, আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করতে, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করতে, অন্যায় কর্মকাণ্ড না করতে ও অন্যায়ভাবে খুন-খারাবী থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের ব্যভিচার, অশ্লীল কাজ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, ইয়াতীমদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে, সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতে নিষেধ করেছেন। আর কেবল আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সাথে শরীক না করতে, সালাত আদায়, যাকাত দিতে ও সাওম পালনে আদেশ করেছেন।

মানব জীবনে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র মূল্যবোধ বিকাশের প্রধান উপায়। উত্তম চরিত্র মানুষের সর্বোত্তম ভূষণ। এ ভূষণের অধিকারী ব্যাক্তিরাই সত্যিকার মনুষ্যত্বের অধিকারী। এই উত্তম চরিত্র শিক্ষা প্রদানের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব নাযিল করেন।[৩] এই উন্নত চরিত্র নৈতিকতা অর্জন এবং নৈতিক উন্নয়নের বাহক। এর মাধ্যমে মানুষ পদস্খলন ও বিপথগামীতা থেকে রক্ষা পায়। এ মহান গুণ অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ সত্যিকার উৎকৃষ্ট মানুষে ও পরিপূর্ণ মু'মিনে রুপান্তরিত হতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলমান হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি’।[৪] রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেন[৫]–“সুন্দর স্বভাব ও সৎ চরিত্র দ্বারা মু'মিন ব্যক্তি আবশ্যই দিনে রোযা পালনকারী এবং রাত্রি জেগে ইবাদতকারীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারে।”

ভালো ও আদর্শ মানুষ তৈরীতে যেমন সৎ চরিত্র একটি অপরিহার্য বিষয় তেমনি পরকালীন সফলতার জন্য সৎ চরিত্র অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসংঙ্গে রাসূল সা. বলেন–‘তোমাদের মধ্যে চরিত্রিক দিক থেকে যারা সবচেয়ে উত্তম, তারা আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়, কিয়ামাতের দিন তারা আমার সবচেয়ে নিকটতম হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বাচাল, দুর্বোধ্য ভাষায় ও অহংকারের সাথে কথা বলে তারা আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত। কিয়ামাতের দিন তারা আমার নিকট থেকে অনেক দূরে অবস্থান করবে।’[৬] তিনি আরও বলেন–‘তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে উন্নত, সে ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।’[৭] অন্য হাদীসে এসেছে[৮]-রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন জিনিস মানুষকে বেশী পরিমাণে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন–‘তাকওয়া ও সচ্চরিত্র’।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী র. (মৃ.১৭৭৬ খৃ.)উত্তম নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন–

> জেনে রেখো, মানুষের কিছু বৈশিষ্ট এমন যে, তার মানুষ হিসেবে সে প্রকৃতিগত ভাবেই পেয়ে থাকে। তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য তার বৈষয়িক , যা তার পারিপাশ্বিকতা ও দূরবর্তী কোন প্রভাব থেকে অর্জিত হয়। মানবিক সচ্চরিত্রতা ও বিবেক যে ব্যাপারটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয় ও লক্ষবস্তু হিসেবে নেয় তা হলো মানবিক পরিপূর্ণতা বা পূর্ণাঙ্গ মানবতা। কারণ কখনও

---

১. ফীরূযাআবাদী, *বাসায়িরু যাবিত তাময়ীয* (بصائر ذوى التمييز), http://www.almeshkat.net/ খ.০৩, পৃ.৩৪।
২. আবুল হাসান আলী আন-নদভী, *আস-সীরাতুন নবুবিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২-১৩৩।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৫১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২:১২৯, ৩:১৬৪, ৬২:২।
৪. মূল আরবী [أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুর রিদা‘, হাদীস নং ১১৬২।’
৫. [إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৭৯৮।
৬. মূল আরবী [إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০১৮।
৭. মূল আরবী [إن خياركم أحاسنكم أخلاقا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৮৮।
৮. মূল আরবী [سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২০০৪।

কারও এমন কিছু নিয়ে প্রশংসা করা হয়, যা তার প্রকৃতিগত অবায়বের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন তার দৈহিক উচ্চতা কিংবা দেহের বিশালত্বের প্রশংসা। সেটাকে যদি কৃতিত্ব বলা হয়, তাহলে সে কৃতিত্বের পূর্ণতা দেখতে পাবে সুউচ্চ ও সুবিশাল পাহাড়-পর্বতে।...কখনও কাউকে এমন কিছুর জন্য প্রশংসা করা হয় যা জীব-জন্তুর ভেতরেও পাওয়া যায়। যেমন দৈহিক শক্তি, যথেষ্ট খাওয়া, শক্ত হাতে পাঞ্জা লড়া ইত্যাদি। যদি সেটাকে কৃতিত্ব বলা হয় গাধাকে সেক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার বলতে হয়। হ্যা কখনও কাউকে এমন কিছুর জন্য প্রশংসা করা হয়, যা শুধু মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন, মার্জিত চরিত্র, উত্তম কর্মধারা, উন্নতমানের গুণাবলী, উচ্চাংগের শিল্প-নৈপুণ্য ও সুউচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি। মূলত এগুলোকেই বলা হয় মানবিক যোগ্যতা ও কৃতিত্ব। প্রত্যেক জাতির জ্ঞানী মনীষীগণ এগুলোকেই লক্ষ্য বানিয়ে নেন এবং এসব ছাড়া অন্য যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, তারা সেগুলোকে আদৌ কোন পছন্দনীয় গুণ বলে মনে করেন না।[১]

উত্তম চরিত্র রক্ষা বা অর্জনে করণীয়: উত্তম চরিত্রে অর্জনে ব্যক্তির জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় কর্তব্য আছে। যা সম্পাদনের দ্বারা ব্যক্তি সহজে তা অর্জন করতে পারে। যথা:

ক).উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা। স্বীয় জিহ্বা, লজ্জাস্থান, চক্ষু, হাত, কান, অন্তর ও কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। মহান আল্লাহ বলেন[২]–وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ "যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তিদান করেন।"

খ).উন্নত নৈতিক চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ হিসেবে রাসূল সা. এর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্বরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লার মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" রাসূল সা. ছাড়াও অন্য নাবী-রাসূল ও পূণ্যবানগণের জীবন-কর্মে উন্নত চরিত্রের উপাদান রয়েছে। তাদের জীবন ও কর্মের সে সব শিক্ষণীয় দিক গ্রহণ করা। এজন্য ইবরাহীম('আ.) ও তাঁর অনুসারী দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন-[৪]

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি; আর তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ স্থায়ীভাবে থাকবে।

গ).উন্নত চরিত্র অর্জন ও নৈতিকতা বজায় রাখার জন্য দৃঢ়চেতা হওয়া জরুরী। এজন্য প্রয়োজনে কষ্টবরণ করতেও দ্বিধা না করা। আর কেউ নৈতিকভাবে সৎ থাকতে চাইলে এবং সে ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন ও যথাযথ প্রচেষ্টা করলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।[৫] ইউসুফ('আ.) এর ঘটনায় এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তিনি মিশরের রাজ পরিবারে আরাম-আয়েশেই ছিলেন। রাজপরিবারে সদস্য জুলেখার কুপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণতি যে শুভ হবে না তা তিনি জানতেন তবুও অনৈতিকতা সাথে আপোষ করেননি। বরং জেলখানার কষ্টের জীবন বেছে নেন।[৬] এক্ষেত্রে ইউসুফ('আ.) চারিত্রিক দৃঢ়তা অবলম্বন করার কারণে আল্লাহর রহমতে তিনি অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী জুলেখার সব অপচেষ্টা থেকে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭] وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ-"সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সে তা হতে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলল, এস। সে বলল আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি, তিনি আমার প্রভু; তিনি আমার থাকবার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।"

ঘ).মহান আল্লাহ ভালো-মন্দের স্রষ্টা, সকল মহৎ গুণের অধিকারী এবং যাবতীয় মন্দত্ব থেকে পবিত্র। কুরআনে তিনি যে সব গুণকে ভালো বলেছেন সে সব গুণ অর্জন করা এবং যেসব মন্দ বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা। বস্তুত এর মাধ্যমে একজন মানুষ মহামানবে রূপান্তরিত হতে পারে। এ কারণে কুরআন মহান আল্লাহর গুণে মানুষকে গুণান্বিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। ইরশাদ হচ্ছে[৮]–صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ "(বল) আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করলাম। আর রংয়ের দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী।"

এ আয়াত মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ হলো:তোমরা দয়া, করুণা, ক্ষমা, দান, ইনসাফ, প্রেম, পবিত্র ও পরিশুদ্ধ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হও। আল্লাহ তা'য়ালা সকল গুণ ও মূল্যের অধিকারী। মানুষের পক্ষে তাঁর গুণাবলী অর্জন অসম্ভব, তবে তাঁর কিছু গুণের আংশিক রূপায়ন সম্ভব। বস্তুত মানব জীবনে আল্লাহর এ সব গুণাবলী বাস্তবায়নেই সূচিত করে সফল জীবন।

---

[১]. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২-১৬৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : আয়াত ১৭, আল-কুরআন ১৯: ৭৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ২১।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনাহ ৬০: আয়াত ০৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৬০:০৬।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ২৪-২৯।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ৩২- ৩৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২ : আয়াত ২৩।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩৮।

ঙ). পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর ও যুবক-যুবতীদের উত্তম চরিত্র ও আচরণ শিক্ষা প্রদান করা।

চ). মন্দ ও নিন্দনীয় আচরণ ও কর্মকাণ্ড পরিহার।

ছ).যুবক-যুবতীদের অবিলম্বে বিবাহের ব্যবস্থা এবং পর্দার বিধান পালন করা।

❑. বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা / বিবেক ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করা এবং নিবুদ্ধিতা পরিহার :

বুদ্ধি-বিবেক মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নি'আমত। এটাই অন্য সব সৃষ্টিজীবের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ কারণ। জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে মানুষ সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও কল্যাণ-অকল্যাণ পার্থক্য করতে পারে। এর সদ্ব্যবহারের দ্বারা মানুষ নিজেকে সত্য, ভালো, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে এবং অন্যায়, অসত্য, অকল্যাণ ও মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।[১] পক্ষান্তরে, বিবেক-বুদ্ধি অপপ্রয়োগ মানুষকে পশুর স্তরে নেমে যায়।[২] তাই কুরআনে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনে প্রায় ৪৯ বার উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে,তবওু কি তোমরা বুঝবে না?" অন্যত্র বলা হয়েছে[৪]– قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ "বল, 'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না'?" আরও বলা হয়েছে[৫]– وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ "আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি; আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।"

এভাবে কুরআনের অনেক স্থানে أَفَلَا تَعْقِلُونَ তোমরা কি বুঝবে না? أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ তোমরা কি চিন্তা করবে না'? أَفَلاَ يَنظُرُونَ তোমরা কি লক্ষ্য করবে না'? ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করে মহান আল্লাহ মানুষকে বাস্তব জীবন ও কর্মে বুদ্ধি-বিবেকের যথাযথ প্রয়োগ করার ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে। মানুষকে অন্ধ অনুসরণ, ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও আন্দাজ-অনুমানের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে। কেননা এ সব বিষয় মানুষকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে।[৬]

সুস্থ বিবেক এমন এক শক্তি যা সৎপথপ্রদর্শনকরী, ন্যায়ের আদেশদাতা ও অন্যায়ের নিষেধকর্তা। এ শক্তি মানুষকে খারাপ পরিণতির জন্য সতর্ক করে, ভালো পরিণতিমূলক কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ না করে কাজ করলে মানুষ সত্যভ্রষ্ট হয়। বুদ্ধিহীনতা, অবিচক্ষণতা ও অদূরদর্শীতা মানুষের নৈতিক বিপর্যয় নিয়ে আসে এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত করে।[৭] মানুষকে এ কারণে মানুষের অন্তরে কলুষতা চাপিয়ে দেয়া হয়। এমনকি তা মানুষকে শিরক ও কুফরে লিপ্ত করে। বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ না করে কাজ করার অকল্যাণকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৮]- وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ -"আর যারা বুঝে না তিনি তাদের উপর কলুষতা চাপিয়ে দেবেন।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[৯]-

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ- أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তিনি (ইবরাহীম) বললেন, 'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না'? 'ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে! 'তবুও কি তোমরা বুঝবে না'? –উদ্ধৃত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে কাজ করায় মানুষ শুধু সত্যভ্রষ্টই হয়নি, বরং শিরকের মত ভয়ানক মহাপাপে লিপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধি-বিবেকের অপরিসীম গুরুত্ব এবং মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার সমূহ অকল্যাণ তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[১০],

> মূর্খতার চেয়ে মারাত্মক দারিদ্র্য আর কিছু নেই। বুদ্ধির চেয়ে অধিক উপকারী সম্পদ আর কিছু নেই। আত্মম্ভরিতার চেয়ে ভয়াবহ সঙ্গীহীনতা আর কিছু নেই। পরামর্শের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা আর কিছু নেই। কুশলতার ন্যায় কোন বুদ্ধিমত্তা নেই; সুন্দর চরিত্রের ন্যায় কোন আভিজাত্য নেই; (হাত-পায়ের পাপ হতে) বিরত থাকার চেয়ে সংযম আর কিছু নেই। সৎ চিন্তার ন্যায় ইবাদত আর কিছু নেই। লজ্জাশীলতা ও সবরের ন্যায় ঈমান নেই।

বিবেক-বুদ্ধি মানুষের সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। এটা মানুষকে কল্যাণের পথের দিশা দেয় এবং সদগুণাবলী সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যখন বিবেক-বুদ্ধির পরিবর্তে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে শুরু করে তখন সে নিজেকে শয়তানের কাছে সমর্পণ করে। তাই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বিবেক-বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-[১১]

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৬০।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৭৯, আল-কুরআন ১০:৭-৮, ৭:১৪৬।

৩.আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত১০; আরওদেখুন,আল-কুরআন২:৪৪,৩:৬৫,৪:৮২,৬:৩২,৭:১৬৯,১০:৩,১৬,১১:২৪,৩০,৫১,১২:১০৯,২৩:৮০,২৬:২৮, ৩৯:৬৭, ৫৭:১৮।

৪. আল-কুরআন,সূরা আল-আন্‘আম ০৬: আয়াত ৫০।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৩।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৩।

৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৯৪, আল-কুরআন ৪৯:০৬, ১২।

৮. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ১০০।

৯. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ৬৬-৬৭।

১০. আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর, প্রাগুক্ত* , বাবুল হা', খ.০৩, পৃ. ৬৮, হাদীস নং ২৬৮৮।

১১. আল-কুরআন,সূরা আল-আহ্ক্বাফ: আয়াত ২৬।

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

"আর আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের কান, চোখ ও হৃদয়সমূহ তাদের কোন উপকারে আসেনি কেননা তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমুহ অস্বীকার করেছিল। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।"

জন্মের পর মানুষ ভালো ও নিষ্পাপ থাকে। কিন্তু পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ বিভ্রান্তি ও মন্দের দিকে ধাবিত হয়। নৈতিক আদর্শ ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া মানুষের পক্ষে নৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই বিভ্রান্তি ও মন্দ থেকে রক্ষা এবং সততা, নৈতিকতা ও ব্যক্তিত্ববোধ সৃষ্টি করতে হলে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধির সঠিক প্রয়োগ এবং নির্বোধ সুলভ কর্ম-আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে। প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি দুনিয়ার অনেক জ্ঞান রাখলেও আখিরাত ও দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন। এ সব লোক সত্যিকার জ্ঞানী নয়। এক্ষেত্রে ওহীর জ্ঞান দ্বারা স্বীয় কর্ম-আচরণ সংশোধন জরুরী। *এক্ষেত্রে করণীয় হলো:* চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা বা কথা বলা, বন্ধু-শত্রু পার্থক্য করা, সামান্য ব্যাপারে কারো সাথে প্রতিক্রিয়া না দেখানো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত না নেয়া, স্বীয় কর্মকাণ্ড কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার করা।

❑.অল্পেতুষ্টি, অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং আখিরাতকে অগ্রাধিকার দান(القناعة/الزهد):

অল্পেতুষ্টির আরবী শব্দ الزهد,যার আভিধানিক অর্থ–তপস্যা, সংসারত্যাগ, সন্ন্যাস।[১] কোন আকর্ষণীয় বস্তু হতে মুখ ফিরান; ধর্মের পথে উৎসর্গীত।[২] এর পরিভাষিক কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। আবূ মূসা আদ-দিবালী বলেন[৩],"যুহদ হল নিজের কোন কিছু ধ্বংস হলে বা হারিয়ে গেলে তাতে হতাশ না হওয়া এবং কোন কিছু লাভ করলে তাতে আনন্দিত না হওয়া।"

•আবূ সুলাইমান আদ-দারানী (মৃ.২১৫হি.) বলেন[৪], "যাহিদ হল দুনিয়ার নিন্দা না করা, তার প্রশংসা না করা এবং তার প্রতি লক্ষ্যও না করা, তার কোন কিছুর আগমনে আনন্দিত না হওয়া এবং তার কোন কিছুর প্রস্থানে চিন্তিত না হওয়া।"

•মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন[৫],"হাকীকতপন্থীদের মতে, যুহদ হল দুনিয়া থেকে বিমুখ ও বিরাগ হওয়া। তাই যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু হারালে আনন্দিত হলো এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসকে অপছন্দ করল সে যাহিদরূপে গণ্য হলো।"

মানুষের কাছে অর্থ-সম্পদ না থাকা যুহদ বা অল্পেতুষ্টি নয়; বরং অর্থ-সম্পদের প্রতি অন্তরের বেপরওয়া ভাবকেই বলা হয় যুহদ।'[৬] কুরআনে যাহিদ বা অল্পেতুষ্ট লোকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা অভাবী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের কাছে হাত পাতে না। ইরশাদ হচ্ছে-[৭] وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ "*যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না* এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও।" এ আয়তের الْقَانِعَ শব্দের অর্থ অল্পেতুষ্ট ও অর্থ-সম্পদের প্রতি নির্লিপ্ত, যারা অভাব সত্ত্বেও মানুষের নিকট সাহায্য চায় না। উল্লেখ্য যে, ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গল বা নির্জনে বসে শুধু ইবাদত করাও যুহদ নয়। সুলায়মান ('আ.) বিশাল সাম্রাজের অধিকারী হয়েও সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন।[৮] এখানে যুহদ দ্বারা সুফীবাদী বিশেষ আদর্শ বুঝানো হয়নি। কেননা সুফীবাদে দুনিয়াবিমুখতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। তাতে যুহদের নামে যে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে তা অনেকটা স্বভাবিক জীবন যাপনের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু কুরআন সুফীবাদীদের মত একেবারেই দুনিয়া পরিত্যাগ করতে বলেনি, বরং বলা হয়েছে[৯] رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন আর আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।"

কুরআনের এ শিক্ষা ধারণ করেছিলেন আবূ বকর রা., উমার রা. উসমান রা. আলী রা. উমার ইবন আবদুল আজিজ রহ. সহ ইসলামের প্রথম যুগের মুসলিমদের বড় অংশ। তারা ছিলেন যাহিদ, পরম আল্লাহভীরু, অল্পেতুষ্টি ও আত্মত্যাগী। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও বিলাসিতা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তারা 'মৃত্যুর পূর্বেই মৃত' এর মতো সংযমী জীবন নির্বাহ করতেন, কিন্তু তারা কোনদিনই নিজেদেরকে সংসারত্যাগী যোগী-সন্ন্যাসী হিসেবে উপস্থাপিত করেন নি।

উল্লেখ্য যে, ইসলামে যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা ও কৃচ্ছতা সাধনে উৎসাহিত করা হয়েছে এটা আর দারিদ্র্য এক নয়। মূলত যুহদে দুনিয়ার পূজা ও তার প্রতি অনুরক্ত হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আর কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে বিলাসী জীবন বর্জন ও অপচয়রোধে উৎসাহিত করা হয়েছে।

যুহদ বা অল্পেতুষ্টি উন্নত নৈতিক গুণ, যা মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা, অহঙ্কার, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ভোগ-বিলাস, অপচয়-অপব্যয় ইত্যাদি নানা পাপাচার-অনাচার থেকে মুক্ত রাখে। হায়াতে তাইয়্যেবা তথা পবিত্র জীবনের অনুষঙ্গ হচ্ছে অল্পে

---

[১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪৭।
[২]. মুহাম্মদ 'আলা উদ্দীন আযহারী, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.১৪১৪।
[৩]. ইমাম বাইহাকী (৪৫৮হি.), *আয-যুহদুল কাবীর*, (http://www.alsunnah.com), খ. ১, পৃ. ৪; আবূ নুআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৮, পৃ. ১৪০।
[৪]. আবূ নুআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৬৬; ইমাম বাইহাকী (৪৫৮হি.), *আয-যুহদুল কাবীর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।
[৫]. মুফতী মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, *কাওয়ায়েদুল ফিকহ*,(ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬১) পৃ.৩১৫।
[৬]. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.২৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২ : আয়াত ৩৬।
[৮]. আল-কুরআন, ৩৮ : ৩১-৩৩।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২০১।

তুষ্টি’। এটা মানুষকে সৎপথে চলতে সহায়তা করে। এটা পার্থিব জীবনের ধোঁকা এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচার উত্তম পাথেয়। এটা দুর্নীতির প্রতিরোধকারী। কেননা বিলাসী বাড়ী-গাড়ী, আসবাবপত্র, খাদ্যসামগ্রী ও পোষাক-পরিচ্ছদ মানুষের মধ্যে অহঙ্কার, লোভ-লালসা ও ভোগবাদী মানসিকতা সৃষ্টি করে। উচ্চাভিলাষ, অর্থলিপ্সা ও ভোগবিলাস মানুষকে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজের দিকে ধাবিত করে। এটা মানুষকে পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি এবং আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীন করে ফেলে। এ সব কারণে কুরআন মুমিনদের এই গুণ অর্জনের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছে[১]– وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم "আর এমন কত জীব–জন্তু রয়েছে, যারা নিজদের রিয্‌ক নিজেরা সঞ্চয় করে না, আল্লাহ্ই তাদের রিয্‌ক দেন এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। ”

হাদীসেও যুহদকে নৈতিক উন্নয়নের বিশেষ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[২]

> তোমরা হারামসমূহ হতে বেঁচে থাক, তাহলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী বলে গণ্য হবে; আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তবে তুমি হবে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী বা ধনবান গণ্য হবে। তোমরা প্রতিবেশীর সংগে সদাচরণ কর তুমি (প্রকৃত) মুমিন গণ্য হবে; মানুষের জন্য তা পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর তুমি হতে পারবে (প্রকৃত) মুসলিম ; অধিক হাসাহাসি করবে না, কেননা হাসির আধিক্য হৃদয়কে মৃত করে দেয়।

যুহদ তথা বিলাসিতা বর্জন করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং আল্লাহ যা দিয়েছে তাতে তুষ্ট থাকা ঈমানের অন্যতম দিক। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৩]–"অনাড়ম্বর বা সাদাসিধে জীবন যাপন ঈমানের অংশ।" ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী প্রত্যেক মুসলিমের জীবন প্রণালী হবে অনাড়ম্বর বা সাদাসিধে। প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা এই মহৎ গুণের অধিকারী ছিল। এটা তাদের উচু নৈতিকতা দান করেছিল। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[৪]–"এই উম্মাতের সুস্থতা ও পবিত্রতার ভিত্তিমূল ছিল যুহদ(দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) ও (ইয়াকীন) দৃঢ়বিশ্বাস। আর তার শেষাংশে ধ্বংস হবে কার্পণ্য ও উচ্চাভিলাষের কারণে।" ইতিহাস এই সাক্ষ্যই প্রদান করে। এ সম্পর্কিত খলীফা উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. এর গৃহের খাবারে টেবিলের একটি চিত্র: "কেবল পেঁয়াজ, পেঁয়াজ! প্রত্যেক দিনই শুধু রুটি পেঁয়াজ। এ আর খেত পারব না।" বিরক্তিভরা কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ভৃত্য আবূ উমাইয়া। বাবা! এ ছাড়া আর যে কিছুই নেই। এই তো খলীফার খাদ্য।" স্নেহ কণ্ঠে বলে সিন্ধু থেকে মরক্কো ও স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের মহান খলীফা দ্বিতীয় উমরের পত্নী ফাতিমা।[৫]

যুহদ কল্যাণ, সৌভাগ্য ও উচু মর্যাদা লাভের উপকরণ। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৬]–"যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখবে দুনিয়াবিমূখ ও স্বল্পভাষী তোমরা তাঁর সান্নিধ্যে লাভ কর। কারণ তাঁকে হিকমত(প্রজ্ঞা) প্রদান করা হয়।" এই লক্ষ্য অর্জনে কুরআনে মু'মিনদেরকে যাহিদদের সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে[৭] -وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে তাদের সংসর্গে রাখ যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে ডাকে, এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দৃষ্টি তাদের থেকে ফিরায়ে নিও না।" অন্যত্র এসেছে[৮] -وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى "তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তাদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"

যুহদ ব্যক্তির মধ্যে আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করে। ফলে এই মহৎ গুণের অধিকারীরা মানুষের নিকট চাওয়ার লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৯] "মহান আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাকে দুনিয়ার মোহ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। কারণ তিনি তাকে ভালবাসেন। ঠিক তোমরা যেমন তোমাদের রুগ্ন ব্যক্তিকে ক্ষতিকারক খাবার ও পানীয় থেকে বিরত রাখে।" ফুদাইল ইবন ইয়ায রহ. (মৃ.১৮৭হি.) বলেন[১০],"পাঁচটি বিষয় সৌভাগ্যের কারণ। অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস, তাকওয়া, দুনিয়া বিমূখতা, লজ্জাশীলতা ও জ্ঞান।"

যাহিদ বা অল্পেতুষ্টি ব্যক্তিরাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। সত্যিকার বুদ্ধিমান মুমিন ছাড়া কেউ এই গুণ অর্জন করতে পারে না। কেননা পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা ও চাকচিক্য থেকে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। অধিকাংশ মানুষ এতে নিমজ্জিত। আর সতর্ক বুদ্ধিমান মু'মিনরা সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের উপর চিরস্থায়ী আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়। কেননা তারা

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯ : আয়াত ৬০।

[২]. মূল আরবী [اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب] *সুনান* আত-তিরমিযী, কিতবুয যুহদ, হা.নং২৩০৫; *মুসনাদ আহমাদ*, খ.০২, পৃ. ৩১০, হা. ৮০৮১; *ইবন মাজাহ*, কিতবুয যুহদ, হা.৪২১৭।

[৩].মূল আরবী [إن البذاذة من الإيمان] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুত তারাজ্জুল, হাদীস নং ৪১৬১, *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হা.৪১১৮।

[৪]. মূল আরবী [أول صلاح هذه الأمة باليقين و الزهد و أول فسادها بالبخل و الأمل] ইমাম বাইহাকী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৭, পৃ.৪২৭, হাদীস নং ১০৮৪৪।

[৫]. শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র* , *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪।

[৬]. [إذا رأيتم العبد يعطي زهدا في الدنيا و قلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة] ইমাম বাইহাকী, খ. ০৪, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ৪৯৮৫।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮:আয়াত ২৮।

[৮].আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০ : আয়াত ১৩১।

[৯].মূল আরবী [ان الله عز و جل ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৫, পৃ.৪২৭; হা.নং ২৩৬৭১।

[১০]. মূল আরবী [خمسة من السعادة اليقين في القلب والورع في الدين والزهد في الدنيا والحياء والعلم] আবূ নুদআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১০, পৃ.২১৬।

দুনিয়ার স্বরূপ ও বাস্তবতা সম্পর্ক এটা জানে যে,[১]- وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ "পার্থিব জীবনতো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়।" উল্লেখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতে পার্থিব জীবনের বাস্তবতা ও অসরতা তুলে ধরে মানুষকে যুহদে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকৃত বুদ্ধিমান মুমিনরাই কেবল এ সব আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এজন্যই ইমাম শাফেঈ রহ. (মৃ.২০৪হি.) বলেছেন-'সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সে-ই যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার পূর্বেই। কবরকে আলোকিত করে কবরে বসবাস করার পূর্বেই। স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্বেই। জামা'আতে ছালাত আদায় করে তার উপর জামা'আতে ছালাত (জানাযা) পঠিত হবার পূর্বেই। নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে হিসাব দিবসে তার হিসাব গ্রহণ করার পূর্বেই'। -[ইগাছাতুল লাহফান]।

অল্পেতুষ্টি ব্যক্তির মানসিক প্রাচুর্য ও প্রশান্তি আনে। এটা মানুষকে জীবনে সুখী হতে সহায়তা করে। এ ধরনের ব্যক্তিই প্রকৃত বিত্তশালী। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"ধনী হওয়ার অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যই নয়, বরং প্রকৃত সম্পদশালী সে-ই যার অন্তর সম্পদশালী।"[২] এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস যা আবূ হুরায়রা(রা.) রাসূল(সা.) হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন-[৩]

> মূসা ('আ.) ছয়টি গুণ সম্পর্কে তাঁর রবকে (আল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন। আর তিনি মনে করতেন যে, এগুলো কেবল তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তবে সপ্তমটি তিনি পসন্দ করতেন না। ১. তিনি (মূসা 'আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার কোন বান্দা অধিক মুত্তাকী? তিনি (আল্লাহ) বললেন, যে (আমাকে) স্মরণ করে, ভুলে যায় না। ২. তিনি বললেন, তোমার কোন বান্দা সুপথপ্রাপ্ত? তিনি বললেন, যে হেদায়াতের অনুসরণ করে। ৩. তোমার কোন বান্দা সর্বোত্তম বিচারক? তিনি বললেন, যে অন্যের জন্য এমন ফায়সালা করে, যা নিজের জন্যও করে। ৪. তোমার কোন বান্দা অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, যে (অল্পে) জ্ঞান অর্জন করে তৃপ্ত হয় না, বরং মানুষের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে, (জ্ঞান বৃদ্ধি করে)। ৫. তোমার কোন বান্দা অধিক মর্যাদাবান? তিনি বললেন, যে ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। ৬. তোমার কোন বান্দা অধিক বিত্তশালী? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি, তাকে যা দেয়া হয়, তাতেই সে সন্তুষ্ট হয় (অল্পেতুষ্ট)। ৭. তোমার কোন বান্দা অতি দরিদ্র? তিনি বললেন, ত্রুটিপূর্ণ (কৃপণ) মনের অধিকারী।

অল্পেতুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখিরাতের সফলতা ও চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের মাধ্যম। আর অল্পেতুষ্টি ব্যক্তিরা দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের প্রতি নিরাসক্ত থেকে আখিরাতে সফলতার জন্য কাজ করে। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[৪]- وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا "যারা মু'মিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।"

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৫] –"যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ তার উপর অল্প আমলে সন্তুষ্ট থাকবেন।" আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. তার সাথীদের বলেন, 'তোমরা মুহাম্মাদ সা. এর সাথীদের থেকে বেশী সালাত ও সিয়াম আদায় করো, কিন্তু তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। তারা জিজ্ঞাসা করল, তা কেন? তিনি উত্তরে বললেন, *তারা তোমাদের চেয়ে ব্যাপারে অনেক বেশী দুনিয়াবিমূখ এবং আখিরাতের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন।*[৬]

এই গুণ অর্জনে করণীয়: আশা-আকাঙ্খার নিয়ন্ত্রণ করা। উপরস্থ লোকদের প্রতি না তাকিয়ে নিম্নস্থ লোকদের প্রতি তাকানো। দুনিয়াদার সম্পদশালী ব্যক্তিদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা। পূণ্যবান অল্পেতুষ্টি ব্যক্তিদের সাথে চলাফেরা করা। মৃত্যুর কথা বারংবার স্বরণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–"তোমাদের মধ্যে কারো দৃষ্টি যদি এমন লোকের উপর পড়ে, যে তার চেয়ে ধন-সম্পদ এবং স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যে উপরে, তখন তার উচিত তার চেয়ে নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকানো।"[৭] আবদুল্লাহ ইবন উমর রা বলেন, রাসূল (সা.) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, পৃথিবীতে আগন্তুকের ন্যায় জীবন যাপন কর। ইবন উমার রা. প্রায়ই বলতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেচেঁ) থাকলে সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না, আর সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না।[৮]

❑.বদান্যতা, আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা:

বদান্যতা হচ্ছে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিস অভাবগ্রস্তকে অথবা অভাবগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তিকে স্বত্ব ত্যাগ করে প্রদান করা। আর আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালো বা পূণ্যের কাজে নিজের জীবন, সম্পদ ও সময় বিসর্জন দেয়া, নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অপরকে দান করা। নিজের স্বার্থের উপর অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। আত্মত্যাগ দানশীলতার স্তর সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর। আত্মত্যাগী ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন ও অভাবের উপর অন্যের প্রয়োজন ও অভাবকে অগ্রাধিকার দেয়। আত্মত্যাগের বিপরীত হলো স্বার্থপরতা।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬ : আয়াত ৩২।

[২].মূল আরবী[ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, হা. নং ৬০৮১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হা.১০৫১।

[৩]. *সহীহ ইবন হিব্বান*, *প্রাগুক্ত*, খ.১৪, পৃ.১০০, কিতাবুত তারীখ, হাদীস নং ৬২১৭।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭ : আয়াত ১৯।

[৫]. মূল আরবী [من رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل] ইমাম বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, খ.০৭, পৃ.২০৪, রিওয়ায়েত নং ১০০০৩।

[৬]. মূল আরবী [هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة] আবূ নু'আইম, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.১৩৬।

[৭].মূল আরবী[إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হা.৬১২৫, *মুসলিম*, কিতাবুয যুহদ, হা.২৯৬৩।

[৮]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস নং ৬০৫৩।

আজকাল এ গুণের বড়ই অভাব। তাই দেখা যায়, অন্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের জন্য ভালো খাবার ও আরামের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দান করে; যানবাহনের আসনে বয়োজ্যেষ্ঠ, দুর্বল নারী-শিশুকে বসতে না দিয়ে নিজেই বসে পড়ে।

আত্মত্যাগ বা পরার্থপরতা হল সকল নৈতিক গুণের উৎস। নৈতিক উৎকর্ষ লাভ এবং ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণে আত্মত্যাগের ভূমিকা অপরিসীম। কুরআনে বিভিন্ন ঘটনা, কিছু ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগের মানুষকে মহান শিক্ষা প্রদান করে। নাবী-রাসূলগণ তাদের বাস্তব কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে ত্যাগের মহিমা দেখিয়েছেন। মহানাবী সা. ও তাঁর সাহাবীগণ রা. ছিলেন ত্যাগের উজ্জ্বল নমুনা। সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[১]– وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ "এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। " আরও ইরশাদ হয়েছে[২]- وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا- "খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি, তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, এবং কোন কৃতজ্ঞতাও নয়।"-উদ্ধৃত আয়াতে মহান আল্লাহ আত্মত্যাগী বা পরার্থপর মানুষের প্রশংসা করে সকল মানুষকে এই মহৎ গুণ অর্জনে উৎসাহিত করেছেন।

রাসূল সা. ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেন। মদীনায় তিনি অতি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করেছেন। মদীনার রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে দিনে দু'বার তৃপ্তি সহকারে খাবার খাননি, আরামে ঘুমানোর জন্য উন্নত গৃহ ও বিছানা ব্যবহার করেননি। দরিদ্র ও অভাবী সাধারণ মানুষকে তিনি নিজের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অথচ মদীনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি চাইলে উন্নত জীবন যাপন করতে পারতেন। প্রাপ্ত উপঢৌকন ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এরূপ সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর জন্য সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি দরিদ্র ও অভাবী মুসলিমদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন আর নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, "মুহাম্মাদ সা.এর পরিবার মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিন দিন গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। একদিনে দু'বেলা খানা খেলে একবেলা শুধু শুকনো খেজুর খেয়েছেন।"[৩] তিনি আরও বলেন,"মাস অতিবাহিত হয়ে হত আমরা এর মধ্যে ঘরে (রান্নার জন্য) আগুন প্রজ্বলিত করতাম না। একমাত্র শুকনো খেজুর ও পানি দিয়ে চলত। তবে (কখনও) যৎসামান্য গোশত আমাদের নিকট আসত।"[৪]

আত্মত্যাগ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই মহৎ গুণ মুসলিমদের অন্যতম চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম যুগের মুসলিমদের মধ্যে এটা উচু মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- আবদুর রহমান ইবন আউফ রা. বলেন, আমরা মদীনায় (হিজরত করে) আসলে রাসূল সা. সা'দ ইবন রবী' রা. এর সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। সা'দ ইবন রবী' রা. আমাকে বললেন, '*আমি আনসারদের মধ্যে সম্পদশালী, আমি আমার সম্পদের অর্ধেক তোমাকে দিচ্ছি এবং আমার স্ত্রী-দ্বয়ের যাকে দেখে তোমার পছন্দ হয় তাকে আমি পরিত্যাগ করব (ইদ্দত শেষে) তুমি তাকে বিবাহ করবে।*' আবদুর রহমান রা. বলেন, আমি বললাম: আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্পদ ও পরিবারে বরকত দান করুন। এ সবে আমার প্রয়োজন নেই। আমাকে বরং বাজার দেখিয়ে দিন যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারি।...[৫]
এভাবে নাবী সা. ও সাহাবাগণ অগণিত আত্মত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীময় ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজকের পৃথিবীতে শান্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আত্মত্যাগের বড়ই প্রয়োজন। সমাজের দুঃস্থ-দুঃখী, নিঃস্ব, দরিদ্র, বিপদগ্রস্ত ও অসহায় মানুষের কল্যাণে আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

আত্মত্যাগের দ্বারা মানুষের ভালবাসা লাভ করা যায়। এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এজন্যে কুরআনে বলা হয়েছে[৬] لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ- "তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্‌ অবশ্যই সে সম্বন্ধে অবহিত।"

এই গুণ অর্জনে করণীয়:– সর্বদা নিজের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দানের মানসিকতা, সৎসাহস, বড় মন, ধৈর্য, দৃঢ়সংকল্প ও দানশীলতা। এক্ষেত্রে নাবী-রাসূল ও পূর্ববতী পূণ্যবানদের জীবনী এবং সমাজসেবীদের সাহচর্য আমাদের প্রেরণার উৎস।

❑.সময় ও সুস্বাস্থ্যের সদ্ব্যবহার :

মানব জীবনে সময় একটি পবিত্র আমানত। কেননা মানুষের জীবনকাল সময়ের কিছু সমষ্টি। সময়ের প্রতিটি মুহুর্ত ব্যয়ের মাধ্যমে মানুষ মৃত্যুর নিকটবর্তী হচ্ছে। কিন্তু এই মূল্যবান আমানতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। অধিকাংশ মানুষ উদাসীন অনর্থক কর্মকাণ্ড ও আড্ডা ও অলসতায় সময় নষ্ট করে। এ ধরনের বৃথা সময় নষ্টকারী ও সময়ের উদাসীন

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্‌র/আল-ইন্‌সান ৭৬: আয়াত ৭-৯।
[৩].মূল আরবী [ما أكل آل محمد صلى الله عليه و سلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر] [ما شبع آل محمد صلى الله عليه و سلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস নং ৬০৮৯ ও ৬০৯০।
[৪].মূল আরবী [كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস নং ৬০৯৩।
[৫].মূল আরবী [إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা.নং ১৯৪৩।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৯২।

ব্যক্তিরা দ্বীন, নৈতিকতা ও দুনিয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ সম্পর্কে সতর্ক করতে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-[১]– فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ "দুর্ভোগ সেইদিন সত্য অস্বীকারকারীদের, যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।" উল্লেখিত আয়াতসমূহে যারা মিথ্যাচারে লিপ্ত থেকে অনর্থক সময় নষ্ট করে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[২]–'স্বাস্থ্য ও অবসর এ দু'টি নিয়ামতের (ব্যবহারের) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।'

সময় এমন মহামূল্যবান সম্পদ, যা একবার চলে গেলে কোনভাবেই তাকে আর ফিরে আনা যায় না। তাই এই মহামূল্যবান সম্পদের ব্যাপারে প্রত্যেকে যত্নবান ও সচেতন থাকা জরুরী। বস্তুত সময়ের সদ্ব্যবহার মাধ্যমেই মহাক্ষতি নিজকে রক্ষা করে সৌভাগ্যের সোপানে উপনীত করা সম্ভব। এজন্য কারো জন্য উচিত নয়- সময়ের একটি মুহূর্ত অনর্থক নষ্ট করা। ইসলামে প্রতিটি মুহূর্ত ভালো কাজে লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ সা. (জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে) বলেন–"পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, কর্মব্যস্ততার পূর্বেই অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।"[৩]

মানব জীবনে উত্তম সময় যৌবন, আল্লাহ প্রদত্ত যৌবনের এই মহামূল্যবান সময়কে অনর্থক বা অন্যায় পথে ব্যয় না করে যুবকদের উচিত ভালো কাজ ও ইসলাম প্রচার-প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা। কেননা এ ব্যাপারে ক্বিয়ামত দিবসে হিসাব দিতে হবে। ইবরাহীম ('আ.) সহীফার মধ্যে এ কথা ছিল যে, "জ্ঞানীরা তাদের সময়কে কয়েকভাগে ভাগ করে নেবে। এক অংশ আল্লাহর নিকট মুনাজাত ও দু'আ অতিবাহিত করবে; এক অংশ নিজের আত্মসমালোচনায় কাটাবে; এক অংশ আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করবে; আর আরেক অংশ নিজ পছন্দনীয় খাদ্য-পানীয় (জীবিকা) এর জন্য ব্যয় করবে।"[৪]

সময়ের কাজ অসময়ে গ্রহণযোগ্য হয় না। সময় থাকতে এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। এর একটি দৃষ্টান্ত ফিরআউন ঈমান আনায়ন। মৃত্যুর আসন্ন দেখে ফিরআউন ঈমান আনলে তা গৃহীত হয়নি। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]

حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

"পরিশেষে যখন নিমজ্জমান হল তখন বলল, আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাইল যাতে বিশ্বাস করে নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আত্মসমার্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"

অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পূণ্যের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে হবে নতুবা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

সময়ের যথাযথ ব্যবহারে করণীয়: সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী: ক). প্রতি মুহূর্ত সময়ের সুশৃঙ্খল ব্যবহার। খ).সময় থেকে উপকৃত হওয়ার সদা সচেষ্ট থাকা। গ.)অবসরকে ভালো কাজে নিয়োজিত করা। ঘ). নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং নিজের উচ্চতর সংকল্পের জন্য প্রস্তুত করা। ঙ).সময় কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কাজ করা। চ).মৃত্যু কথা স্মরণ করে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হওয়া। এ কথা মনে করা যে, আজই আপনার জীবনের শেষ দিন। ছ).নিজের দৈনিক ব্যয়িত সময়ের হিসাব নেয়া। জ).অলস ও কর্মবিমূখ থেকে দূরে থাকা। কেননা যারা কর্মবিমূখ থাকে তারা অর্থহীন গল্প-গুজব, আড্ডাবাজি, পরচর্চা ও পরনিন্দা ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকে অনর্থক সময় নষ্ট করে। ঝ). সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য মহৎ ব্যক্তিদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

সময় বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ: ক).জ্ঞানার্জন ও বিতরণ করা। বিশেষ করে কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন তথা দ্বীনি জ্ঞানার্জন ও অন্যকে তা শিখানো। খ). মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করা, সৎ কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। গ).সর্বদা যিকির, দু'আ, বেশী বেশী নফল ইবাদতে নিজকে নিয়োজিত রাখা। ঘ).জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা; ঙ.)অনাথ ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং চ).আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাত করা।

সুস্বাস্থ্য: মানব জীবন দয়াময় আল্লাহর সীমাহীন নি'আমত ও অনুগ্রহে আচ্ছদিত। ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, সৌন্দর্য, মেধা-মনন, সময় ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়েই আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমত। এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নি'আমত। সুস্বাস্থ্য মানুষের অমুল্য সম্পদ। স্বাস্থ্য সব সুখের মূল। এর উপরই মানুষের চরিত্র, জ্ঞান, দ্বীনদারী, স্বনির্ভরতা ও উপার্জন অনেকাংশে নির্ভরশীল। কেননা রুগ্ন-ভগ্ন লোকের জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়, কর্মে উদ্যমহীন থাকে ও স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে সামর্থ্য হয় না। তাই সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ্যতা ছাড়া স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সঠিকভাবে পালন এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করা সম্ভব হয় না। শরীর সুস্থ না থাকলে ধর্মীয় কাজেও মন বসে না। এজন্য

[১]. আল-কুরআন, সূরা আত-তূর ৫২: আয়াত ১১-১২; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ১০৩ : ০১-০৩; আল-কুরআন ৫১: ১০-১১।।

[২]. *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৬০৪৯।

[৩].মূল আরবী [اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و فراغك قبل شغلك و حياتك قبل موتك] *আল-মুস্তাদরাক 'আলা সহীহাইন*, কিতাবুর রিকাক, খ.৪, পৃ.৩৪১ হাদীস নং ৭৮৪৬; হাফিজ মুনযিরী, ,খ.৪, পৃ.১২৫, কিতাবুত তাওবা ওয়ায যুহদ, হা. নং ৫০৮১।

[৪]. *সহীহ ইবন হিব্বান*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৭৬, কিতাবুল বির্রি ওয়াল ইহসান, হাদীস নং ৩৬১।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৯১।

প্রত্যেককে স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা এবং স্বাস্থ্যের অপব্যবহার এক ধরনের অকৃজ্ঞতা। এ সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[১]– ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ আর সেদিন অবশ্যই তোমরা নি'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুস্বাস্থ্য মানব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি নি'আমত, যা দ্বারা শুধু পার্থিব কল্যাণই অর্জিত হয় না বরং তা আল্লাহর ভালবাসা লাভের বিশেষ মাধ্যম। দৈহিক, মানসিক ও ঈমানী দিক থেকে যে বান্দা অধিক শক্তিশালী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী আল্লাহ তাকে অধিক ভালবাসেন।[২] রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিকতর কল্যাণময় এবং আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়, তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।"[৩]

সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রে সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তাই ইসলাম মানুষের শরীরের মূল্যের স্বীকৃতি দেয়। শরীরের হক আদায়ের তাকীদ দেয়। শরীরের হক হলো পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা, সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম করা। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও হাসি-খুশী থাকা, দুশ্চিন্তা না করা সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম না করা, প্রয়োজনীয় নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণ করা। খাবার গ্রহণের পূর্বে ও পরে হাত ধৌত করা। রাসূলুলাহ সা. বলেন,"নিশ্চয় তোমার উপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে।"[৪] আর এ অধিকার হল, সে ক্ষুধার্ত হলে আহার করবে, ক্লান্ত হলে বিশ্রাম নেবে, শরীরে ময়লা লাগলে পরিষ্কার করবে, সে অসুস্থ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করবে। আর এ কারণেই আত্মার উন্নতিকল্পে ইসলাম দেহের খাবার কম দেয়ার বৈরাগ্যবাদী প্রাচীন ধ্যান-ধারণার বিলোপ সাধন করেছে। কেননা শরীর ও আত্মার সমন্বয়েই মানুষের অস্তিত্ব।[৫]

❑.হালাল খাদ্য-পানীয় ভক্ষণ এবং হারাম খাদ্য-পানীয় বর্জন :

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য-পানীয় অপরিহার্য। ইসলামী বিধি-নিষেধের মধ্যে পানাহারের কোন দোষ নেই, কারণ পানাহারের মধ্যে মানুষ শরীর-মনকে সতেজ রাখে তথা আল্লাহর নির্দেশিত পথে শক্তি ও উৎসাহের সাথে চলা সম্ভব হয়। ইসলাম বস্তু ও আত্মার সুষম উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট। তাই দৈহিক ক্ষুধা নিবারণের সাথে সাথে মানুষের যাতে আধ্যাত্মিক প্রশান্তিও লাভ করে। সেজন্য মহান আল্লাহ মানুষের দেহ ও আত্মার কল্যাণ বিবেচনা করে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন খাদ্য ও পানীয়কে হালাল করেছেন। এ সব খাদ্য ও পানীয় মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং তা মানুষের আত্মিক চরিত্রের উপর কোন ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে না। তাই প্রত্যেক মুসলিম কেবল খাদ্যের আপাত বা সাময়িক উদ্দেশ্যই নয় বরং মৌলিক উদ্দেশ্য তথা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতিও দৃষ্টি রাখবে। অন্যদিকে, মানুষের দেহ ও আত্মার অকল্যাণ বিবেচনা করে যাবতীয় ক্ষতিকর, অপবিত্র ও নোংরা বস্তুসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা সেগুলো মানব স্বাস্থ্যের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি তা মানুষের আত্মা ও চরিত্রের জন্য অনিষ্টকর। তাই মানুষের জন্য হারাম খাদ্য ও পানীয় বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন[৬] يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ "তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বল,তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভালো বস্তু।" আরও বলেন[৭]

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ -إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
>
> "হে মুমিনগণ, আহার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং তা যা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে। তবে যে নিরূপায় হয়ে পড়ে, অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

উপরোক্ত আয়াতে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহকৃত ইত্যাদি বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হালাল ও হারাম নির্ধারণে কুরআনে কোন স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ জারি করা হয়নি। বরং নিষিদ্ধ খাদ্য শরীরের পক্ষে অনেক ক্ষতিকর। আর যা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তা অবশ্যই আত্মার পক্ষেও ক্ষতিকর। নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে, তা নৈতিকতা বিরোধী, আল্লাহর নির্দেশের পরিপন্থী ও মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক। তবে খাদ্যের অভাবে মরণাপন্ন অবস্থায় জীবন বাঁচানোর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ খাদ্যও খাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে বিশেষ নীতিগুলো হচ্ছে সংযম ও মধ্যম নীতি অবলম্বন করা। অর্দ্ধহার, অনাহারকে যেমন শরীরের জন্য ক্ষতিকর তেমনি অতি ভোজনও দোষণীয়। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ বা ব্যয় পরিহার করা। এ মর্মে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাকাছুর ১০২: আয়াত ০৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৪৭।
[৩]. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল কদর, হাদীস নং ২৬৬৪; *সুনান ইবন মাজাহ*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪১৬৮।
[৪].মূল আরবী[فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস নং ১৮৭৪, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সিয়াম, হা.নং ১১৫৯।
[৫]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আর-রাসূল ওয়াল 'ইলম*, (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি.) পৃ. ৩৭।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ০৫: আয়াত ০৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭২-৭৪; হারাম খাদ্যের ব্যাপারে জানতে আরও দেখুন, আল-কুরআন, ২:১৬৮; ৫:৩-৫, ৯০।

মহান আল্লাহ বলেন[১]- وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"
উল্লেখিত আয়াতে অপচয় ও অতি ভোজন নিষিদ্ধ। কৃপণতাও ইসলামে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে সব উপকরণ অহঙ্কার সৃষ্টি করে তাও নিষিদ্ধ। নাবী(সা.)বলেন[২],"তোমরা সোনা ও রূপার পাত্রে পান করবে না। মোটা-পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করবে না, কেননা এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য ভোগ্যবস্তু। আর তোমাদের জন্য তা আখিরাতের ভোগ্যবস্তু।"

খাদ্য অবশ্যই খাওয়ার উপযোগী ও স্বাস্থ্য সম্মত হতে হবে। নষ্ট, পচা, অপরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাবার কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কাজেই অনুমতিপ্রাপ্ত সব বস্তু সর্বদা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এর মধ্যে যা পরিচ্ছন্ন ও সুখাদ্য কেবল তাই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার্য। অখাদ্য, কুখাদ্য ও হারাম বস্তু বর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন[৩]- وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ - এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে।

খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধোয়া। রাসূল (সা.) বলেন[৪], "খাবারে আল্লাহর রহমত হচ্ছে খাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত ধোয়া।" স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে খাবার-পানীয় সম্পর্কে সতর্ক করতে রাসূল (সা.) বলেন[৫], 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পান করবে সে যেন পান পাত্রে শ্বাস না ফেলে।' অন্যত্র বলেন[৬],'কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করবে।' এছাড়া মুসলিমরা আল্লাহর নামে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং খাদ্য গ্রহণের পর আল্লাহর শুক্র আদায় করবে।

❑.মার্জিত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার:

পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার মানব জাতির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। লজ্জাস্থান আবৃত, শীত ও তাপ থেকে রক্ষা এবং সৌন্দর্য লাভের উপকরণ হিসেবে এটা আল্লাহর বিশেষ নি'আমত।[৭] পোষাক-পরিচ্ছদের সাথে নৈতিকতা জড়িত। তাই কুরআন পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন পোষাকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে[৮]– يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ "হে নাবী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভুষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্ওয়ার পরিচ্ছদ, এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

> এখানে 'তাকওয়ার পরিচ্ছদ' বলে কি বুঝানো হয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ দেখা যায়। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, (রহ.) বলেন, তাকওয়ার লিবাস হলো: ঈমান। মা'বাদ আলজুহানী এর মতে, তা দ্বারা লজ্জাশীলতা ও শালীনতা উদ্দেশ্য। কেননা এগুলোই মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বাধ্য করে। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, তা হলো: সৎকর্ম। হাসান বাসরী (রহ) বলেন, উসমান ইবনু আফফান (রা.) এর মতে, তা হলো উন্নত চরিত্র বা নৈতিক পবিত্রতা।[৯]

অনেকে ভালো পোষাক পরিধানকে তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করে। এ কারণে তারা অতি সাধারণ পোষাক পরিধান করে থাকে। কিন্তু এটা ঠিক নয়, বরং আল-কুরআন মার্জিত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম পোষাক পরিধানে উৎসাহিত করেছে। ভালো পোষাক পরিধানকে তাকওয়ার পরিপন্থী মনে করা অনুচিত। তাদের প্রতিবাদে মহান আল্লাহ বলেছেন[১০]–
(يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ-قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ)
হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পছন্দ করেন না। বল, 'কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা: কালের পরিবর্তন, আবহওয়া ও পরিবেশগত পার্থক্যের কারণে অঞ্চল ভেদে পোশাক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এজন্য ইসলাম নির্দিষ্ট কোন পোশাক পরিধান করতে বাধ্য করেনি। তবে সমাজে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ রক্ষায় ইসলাম পোশাকের কিছু উদ্দেশ্য ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন,
ক. সতর[১১] ঢাকা, অর্থাৎ এমন শালীন পোশাক পরিধান করা, যা লজ্জাস্থান ভালোভাবে আবৃত করা যাবে; যা মানুষকে ভদ্র দেখাবে এবং অশোভন দেখাবে না। নারীদের পর্দা রক্ষাকারী পোষাক পরিধান করা; এ সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তীতে করা হয়েছে।
খ.আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার সাথে সংগতি রেখে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে পোষাক পরিধান করা। এক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতা বর্জন করা। নাবী সা.বলেছেন[১] "তোমরা খাও, পান কর, দান কর,পরিধান কর তবে অপচয় ও অহঙ্কার পরিহার কর।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ৩১, আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৫:৮৭; (০৬:১৪১)।
২. মূল আরবী [لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আশরিবাহ, হা. নং ৫৩১০।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ১৫৭
৪. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আতইমাহ, হাদীস নং ১৮৪৬।
৫.মূল আরবী[إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ১৫২, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল তাহারাত, হাদীস নং ২৬৭।
৬. মূল আরবী [إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ১৭০, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল তাহারাত, হা.নং ২৭৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৮১।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ২৬।
৯. ইবন জারীর তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.১২, পৃ. ৩৬৬-৬৮।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ৩১।
১১.সতর-পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের জন্য দু' হাতের কবজি, মুখমণ্ডল ও দু'পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা সতর। **এ অংশ ঢাকা ফরয।**

গ. পোষাক-পরিচ্ছদ অহংকার বিবর্জিত হওয়া। গৌরব ও অহংকার জ্ঞাপক খুব বেশি দামী পোশাক না পরা এবং যে ধরনের ও যে আকারের পোশাক পরলে অহংকারের প্রদর্শনী হয় তা পরা থেকে বিরত থাকা। পুরুষদের টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান না করা। ইচ্ছাকৃত পায়ের গোড়ালীর গিটা তথা টাখনুর নিচে পোষাক পরিধান অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তাতে সহজেই কাপড় নোংরা ও অপবিত্র হয়। তাই তা হারাম। এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[২] –"টাখনুদ্বয়ের নিচে ইযারের (প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি) যে অংশ থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।"
ঘ.দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পোষাক পরিধান না করে। যেমন, নিজেকে দরবেশ প্রকাশের জন্য ছেড়া তালিযুক্ত পোষাক লম্বা পোষাক,চট বা মোটা কাপড়ের পোষাক পরিধান করা অথবা নিজেকে পদস্থ ব্যক্তি বা অভিজাত হিসেবে জাহির করার জন্য অত্যন্ত দামী পোষাক বা অপ্রচলিত ডিজাইনের পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি। কেননা রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,"যে ব্যক্তি খ্যাতির পোষাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে অনুরূপ পোষাক পরাবেন এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেবেন।"[৩]
ঙ. নারী-পুরুষ পরস্পর একে অপরের বেশ-ভূষা গ্রহণ না করা। এতে বিভিন্ন ফিত্না সৃষ্টির আশংকা থাকে।
চ.অমুসলিমদের পরিচয় জ্ঞাপক বিশেষ কোন পোশাক পরিধান না করা। যেমন, হিন্দুদের ধুতি ও খৃষ্টানদের ক্রুশ চিহ্নযুক্ত পোষাক।যে পোশাকে স্পষ্টরূপে অন্য কোন ধর্মের চিহ্ন বহন করে ইসলাম মুসলিমদের সে ধরনের পোশাক পরার অনুমতি দেয় না।

এছাড়া অশালীন পোষাক, পাতলা, আটোসাটো ও নির্লজ্জভাবে পোষাক পরিধান করা যা দ্বারা সতর ঢাকে না, যে পোষাকে আহমিকা ও প্রদর্শনেচ্ছা জাগিয়ে তুলতে পারে, জীব-জন্তুর ছবি সম্বলিত পোষাক, হিংস্র প্রাণীর চামড়া এবং পুরুষদের রেশমী পোষাক ও স্বর্ণের জিনিস ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে [উল্লেখ্য যে, নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার বৈধ]।এছাড়া যেসব পোষাক নৈতিক চরিত্রকে দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে তাও অবৈধ। এ প্রসঙ্গে বারাআ (রা.) বলেন-[৪]

> রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন।...তিনি নিষেধ করেছেন: সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রূপার পাত্রে পান করতে, রেশমী পোষাক পরিধান করতে, দীবাজ তথা রেশম দিয়ে বুনন করা কাপড়ের পোশাক পরিধান করতে, কাস্সী (কেস্ রেশম/রেশমের বাহারী কাপড়), ইসতিবরাক (তসর জাতীয় রেশম / মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করতে, মিয়সারা তথা নরম লালরঙের বাহারী রেশমী কাপড়ের তৈরী গদি ব্যবহার করতে।

❑. পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকা, বাড়ী ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা:

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা মানব জীবন ও পরিবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা মানুষের মন-মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শরীর সুস্থ রাখে, রোগ-ব্যাধি মুক্ত রাখে, মানসিক প্রশান্তি ও সজীবতা আনে, পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা করে। এজন্য ইসলাম দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছে। হাদীসে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের শর্ত[৫] অথবা ঈমানের অর্ধেক[৬] বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন[৭] – فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ "সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।" হাদীসে ঈমানের ষাটের অধিক শাখার কথা এসেছে। তন্মধ্যে 'ঈমানের সর্বোত্তম শাখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সর্বনিম্ন শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু ফেলে দেওয়া'।[৮] এখানে মুমিন হওয়ার জন্য পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে শর্তারোপ করা হয়েছে। তাই মুমিনের জন্য এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলাম শরীর, পোষাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, পানি, খাদ্যবস্তু, বিশ্রামস্থল ও বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। নাবী সা. বদ্ধ পানিতে মল-মুত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।[৯] দৈহিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ব্যাপারে অজু, গোসল, তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছে, যা সুস্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শরীর ও পোশাক পবিত্র রাখার জন্য মল-মুত্র ত্যাগের পর উত্তমভাবে পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছে। মুখের দুর্গন্ধ যাতে অন্যের কষ্ট না হয় সেজন্য মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়েছেন।[১০] তামাক, বিড়ি-সিগারেট ও ধুমপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছে। জুমা ও ঈদের দিন অর্থাৎ সমবেত জনতার মধ্যে অবস্থানের সময় সুগন্ধি ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। পোষাক-পরিচ্ছদকে অপবিত্রতা থেকে রক্ষা এবং প্রস্রাবের ছিটাফোটা থেকে বাঁচার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। নৈতিক ও শারীরিক অশুচিতা থেকে রক্ষা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[১১] وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ- "আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর, আর

---

[১].মূল'আরবী[كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسرافأومخيلة] *সুনান ইবন মাজাহ*,কিতাবুল লিবাস, হা.নং৩৬০৫; *সহীহ আল-বুখারী*,(তা'লীক) অনুচ্ছেদ ২৩৩০।
[২]. মূল আরবী[ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৫৪৫০।
[৩].মূল আরবী [من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৪০২৯।
[৪].মূল আরবী[أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع...ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإستبرق] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হা.১১৮২।
[৫]. মূল আরবী[الطهور شطر الإيمان] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২২৩।
[৬]. মূল আরবী [والطهور نصف الإيمان] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুদ দু'আত, হাদীস নং ৩৫১৯।..
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ৯: আয়াত ১০৮, আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:২২২, ০৫:০৬।
[৮].মূল আরবী[الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৩৫।
[৯].মূল আরবী[لا يبولن أحدكم في الماء الادائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২৩৬; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত তাহারাত, হা. নং২৮২।
[১০]. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২২।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ৭৪: আয়াত ০৪-০৫।

অপবিত্রতা বর্জন কর।” পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে দাঁত ও মুখ পরিষ্কার, নখ কাটা, বগল ও নাভীর নীচের চুল কাটা, গোঁফ ছোট রাখার ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-[১],

> দশটি কর্ম ‘ফিতরাত’ বা মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত কর্ম। ১.গোঁফ কর্তন করা, ২.দাড়ি বড় করা, ৩. মিসওয়াক(দাঁত ও মুখ পরিষ্কার), ৪.নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, ৫.নখ কর্তন করা, ৬.দেহের অঙ্গসন্ধিগুলি ধৌত করা, ৭.বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করা, ৮.নাভির নীচের চুল মুণ্ডন করা, ৯.পানি ব্যবহার করে শৌচকার্য করা... এবং ১০.কুলি করা।”

বর্তমান মানব সমাজ পরিবেশ দূষণে ভয়ানকভাবে আক্রান্ত। পানি দূষণ, ভূমি দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, কার্বণ নির্গমন, রাসায়নিক ও মেডিক্যাল বর্জ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে ও পারমানবিক চুল্লিতে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করছে। এমতাবস্থায় নিজে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকার সাথে সাথে নিজ বাসস্থান ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে প্রত্যেকের কাজ করা জরুরী। বাসস্থান এবং এর পার্শ্ববর্তী রাস্তা-ঘাট, নর্দমা, পুকুর, নদী-নালা ও শহর-নগরের পরিবেশ যাতে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা না হয় সেজন্য সকলের উচিত সতর্ক থাকা।এ মর্মে নাবী(সা.)বলেন-[২]

> নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্র, পবিত্রতা ভালবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। তিনি দয়ালু, দয়া পছন্দ করেন। তিনি দানশীল, দানশীলতা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থকবে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় বলেছেন, তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা ও আশপাশের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখ।

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে ছায়া ও ফলদানকারী বৃক্ষের নীচে, মানুষের চলাচলের পথে, মানুষের বসার স্থলে, আবদ্ধ পানিতে ময়লা-পেশাব, উন্মুক্ত স্থানে মল-মুত্র ত্যাগ ও দুর্গন্ধ ছড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন–[৩]

> তোমরা অভিশাপ আনায়নকারী দু'টি বিষয় থেকে দূরে থাকো। সাহাবীগণ প্রশ্ন করল–অভিশাপ আনায়নকারী বিষয় দু'টি কি? তিনি বললেন–যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের রাস্তা অথবা (রাস্তার গাছের) ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করে। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে-[৪], তোমরা অভিশাপ আনায়নকারী তিনটি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। তা হলো পানির ঘাটে, ছায়ায় ও চলাচলের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা অপ্রয়োজনে বৃক্ষনিধন বিশেষ করে যে সব বৃক্ষের ছায়ায় পথিক, মানুষ, পশু-পাখি আশ্রয় ও বিশ্রাম নেয় তা কর্তন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নাবী সা.বলেন,”যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে গাছ কাটবে আল্লাহ তার মাথা আগুনে নিক্ষেপ করবেন।”[৫] পক্ষান্তরে,“যে ব্যক্তি কোন বৃক্ষরোপন করে এবং ফলবান হওয়া পর্যন্ত তার দেখাশুনা করে এবং তা সংরক্ষণে ধৈর্যধারণ করে তবে তার প্রত্যেক ফলের বিনিময়ে সে আল্লাহর নিকট সাদাকার সাওয়াব পাবেন।”[৬]

পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখার জন্য করণীয় হলো: বৃক্ষরোপন, কার্বণ নির্গমন হ্রাস, শিল্প-কারখানা, রাসায়নিক ও মেডিক্যাল বর্জ্য নির্ধারিত স্থানে গর্ত করে ফেলা, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও পরিবেশ রক্ষা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।

❑.আত্মহিসাব-আত্মসমালোচনা (المحاسب) :

আত্মহিসাব বা আত্মসমালোচনা অর্থ স্বীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ, নিজে নিজের দোষ পর্যালোচনা করা। এর আরবী প্রতিশব্দ মুহাসাবা(المحاسب)। আত্মহিসাব বা আত্মসমালোচনা বলতে বোঝায়–ব্যক্তি নিজে নিজের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের হিসাব গ্রহণ, নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে নিজেকে সংশোধনে তৎপর থাকা। নিজের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ করা। প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌র হক্ব ও বান্দার হকসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এবং সেগুলো যথাযথভাবে আদায়ের জন্য লক্ষ্য রাখা। যদি তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক কাজ হয়, তবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করা। আর যদি তা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টিমূলক কাজ হয় তবে তা থেকে বিরত থাকা। অতঃপর অবশ্য কতর্ব্য বা ফরযসমূহ আদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকা, নিষিদ্ধ বা হারাম বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করার উপর সুদৃঢ় থাকা এবং নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক কাজে নিয়োজিত রাখা।

আত্মসমালোচনার মাধ্যমে মানুষ স্বীয় ভুল-ত্রুটি জানতে এবং সংশোধন করতে পারে। এটা অন্যের ত্রুটি ধরার পূর্বে নিজের ত্রুটি ধরতে শিক্ষা দেয়। অন্যের নিন্দা করার পূর্বে নিজের মধ্যে বিদ্যমান মন্দ দূর করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর দ্বারা মানুষ নিজের সাথে সাথে অন্যের মাঝে বিদ্যমান ত্রুটি ভালবাসা ও স্নেহের সাথে সংশোধন করতে পারে। এটা করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সাহায্য করে। এটা জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে তোলার কাজে সর্বদা প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করে। এটা মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত ও শাণিত করে মানুষকে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। এর মাধমে মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে পারে। এটা মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি এবং ভালো কাজের দিকে আকৃষ্ট করে। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরকালীন জওয়াবদিহিতার

১.মূল আরবী[عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল তাহারাত, হা. ২৬১।

২. মূল আরবী[إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ২৭৯৯।

৩.মূল আরবী [اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৬৯।

৪. মূল আরবী [اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ৩২৮।

৫.মূল আরবী [من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫২৩৯।

৬.মূল আরবী [من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز و جل] *মুসনাদ আহমাদ, খ.৪*, পৃ.৬১. হাদীস নং ১৬৬৩৬।

উপলব্ধি বৃদ্ধি হয়। এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র মুত্তাকী ও মুখলিছ বান্দা হতে সাহায্য করে। সর্বদা এটা জীবনের লক্ষ্যকে স্মরণ করে দেয় এবং মানুষকে মৃত্য পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বাণী[১]–

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا-اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব পড়, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"

আত্মহিসাব বা আত্মসমালোচনা সম্পর্কে ওমর (রা.) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন[২], "তোমরা (কিয়ামতের দিন) চূড়ান্ত হিসাব প্রদানের পূর্বেই নিজেদের হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর। আর তোমরা মহাসমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। আর দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নেয়, কিয়ামত দিবসের তার জন্য হিসাব সহজ হবে।" আর মাইমূন ইবন মিহরান বলেন[৩], 'কোন ব্যক্তি খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ না সে আত্মহিসাব গ্রহণ করবে' তেমনিভাবে যেমন কোন ব্যক্তি অংশীদারের কাছ থেকে শক্ত করে হিসাব করে'।

শয়তানী শক্তি ও কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ অন্যায়, অপরাধ ও ভুল-ভ্রান্তি করতে পারে। শুধু আইন প্রনয়ন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কিংবা শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজ থেকে এ সব অন্যায়, অপরাধ ও অনাচার দূর করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অপরাধ থেকে দূরে থাকে তবেই সমাজ থেকে তা দূর হবে। এটা করতে হলে সমাজস্থ মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন অপরিহার্য। আর নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষতা অর্জনের পন্থা হল আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসমালোচনা। ব্যক্তি যদি নিজের পাপ ও ভুলকে স্মরণ করে যদি নিজেকে ভর্ৎসনা করেন। পাপের স্মৃতি যদি ব্যক্তিকে তীব্র পীড়া ও অনুশোচনায় দগ্ধ করে তাহলে সে নিজে কৃত অপরাধের স্বীকাররোক্তি করে শাস্তির জন্য নিজকে পেশ করবে। আর কৃত অপরাধ ছোট-খাট ও নগণ্য পর্যায়ের হয় এবং ব্যক্তি এর জন্য সাথে সাথে তাওবা করে নিজকে সংশোধন করে নেয়। তাহলে সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে অপরাধ দূর হবে। এজন্য ইসলাম আত্মসমালোচনার নির্দেশ দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ– "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; প্রত্যেকেই যেন ভেবে দেখে আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠিয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।"

এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুমিনের জন্য আত্মহিসাবকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের অবশ্যই চিন্তা উচিত যে, আগামী দিনের জন্য তুমি কী প্রেরণ করেছ ? তা তোমার জান্নাতের পথ সুগম করছে, না-কি তোমাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?[৫] বস্তুত আত্মহিসাব বা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়। মালিক ইবন দীনার রহ. (মৃ.১২৩হি.) বলেন-[৬], "আল্লাহ্‌র রহম ঐ বান্দার প্রতি যে তার নফসকে (কোন মন্দ কাজের পর) বলে, তুমি কি এর সাথী নও? তুমি কি এর সঙ্গী নও? অতঃপর তাকে নিন্দা করে, অতঃপর তার লাগাম টেনে ধরে, অতঃপর আল্লাহর কিতাবের উপরে তাকে আটকে রাখে তখন সে হয় তার পরিচালক।"

আত্মসমালোচনা বা মুহাসাবা পরিত্যাগ করার ফলে দ্বীনের প্রতি ব্যক্তির শিথিলতা চলে আসে, যা ব্যক্তিকে নিশ্চিতভাবেই পার্থিব ও পরকালীন জীবনে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। এটা ব্যক্তিকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী বানায়। প্রবৃত্তিপূজারী, অহঙ্কারী ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিই মুহাসাবা পরিত্যাগ করে থাকে। কারণ সে কোন কিছুর পরিণাম চিন্তা করে না। সব ধরনের পাপ তার কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। কোন সময় পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে তা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কখনো যদি সে সৎপথের সন্ধান পায়ও, তবুও সে তার অন্যায় অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে এরূপ ব্যক্তি ক্রমে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়।

মুহাসাবা (আত্মহিসাব-আত্মসমালোচনা) এর ধরন ও পদ্ধতি: আত্মহিসাব-আত্মসমালোচনা দু'ভাবে করা যায়। **এক.** কাজ করার পূর্বে চিন্তা করা। অর্থাৎ কোন কাজ শুরু করার পূর্বেই ভালোভাবে এই চিন্তা-ভাবনা করা যে, কাজটি হারাম না হালাল? উত্তম না ক্ষতিকর? কাজটিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্ট হবেন না অসন্তুষ্টি হবেন? এরপর কাজটি উত্তম হলে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা; আর কাজটি খারাপ হলে তা থেকে বিরত থাকা। **দুই.** কাজ শেষে/দিন শেষে আত্মহিসাব গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ আদায়ের ব্যাপারে আত্মহিসাব নেয়া। নিজেকে এই জিজ্ঞেস করা যে, নিজের উপর আরোপিত দায়িত্ব-কর্তব্য(ফরয-ওয়াজিব)গুলো আদায় হয়েছে কিনা? না করে হলে আদায় করা। আর করে থাকলে তা কি সঠিকভাবে আদায় হয়েছে নাকি এতে কোন ত্রুটি বা গাফলতি আছে? ফরযে কোন ত্রুটি থাকলে নফল দ্বারা তা পূরণ করা। ভবিষ্যতে যেন ত্রুটি না হয় সেজন্য সংকল্প করা।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ১৩-১৪।

[২].মূল আরবী[حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يوم القيامة على حاسب نفسه في الدنيا] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, হা.২৪৫৯।

[৩]. মূল আরবী [لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه] *প্রাগুক্ত(সুনান আত-তিরমিযী)*, হাদীস নং ২৪৫৯।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ১৮।

[৫]. ইবনুল ক্বাইয়িম, *মাদারিজুস সালিকীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.১৭০।

[৬]. ইবনুল কাইয়িম, *ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান*, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ.৭৯।

এরপর হারাম ও অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ ব্যাপারে আত্মহিসাব গ্রহণ করা। পাপ ও হারাম কোন কাজ নিজের দ্বারা হয়েছে কিনা নিবিড়ভাবে চিন্তা স্বীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গের আচরণের পর্যালোচনা করা। জিহবা কি ধরনের কথা বলে বা বলতে আগ্রহী হয়? দৃষ্টি কোন জিনিষের ফেলা হয়, কান দিয়ে কি শোনা হয়? হাত দিয়ে কি করা হয়? পা কোন পথে চলে? অন্তর দিয়ে কি চিন্তা ও কামনা করা হয়? এসব দ্বারা ভালো কিছু করা হয় নাকি পাপ ও মন্দ কিছু করা হয়? সময় অযাথা নষ্ট হয় কিনা–এ সব বিষয়ে সতর্ক থাকা। প্রতিটি মুহূর্ত ভালো কাজে আত্মনিয়োগের চেষ্টা করা।

পূর্ণ সতর্কতার পরও যদি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন অন্যায় বা পাপ হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করা এবং সৎ কর্মের দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করা। বিশেষ ক্ষেত্রে সাওম বা নফসের জন্য কষ্টকর নেক কাজ করা। নিজের মধ্যে শৈথল্য থাকলে তা দূর করা। সর্বদা আল্লাহর যিকর ও দু'আ পাঠ করা। যে কাজ হারাম কিংবা ধর্মীয় দৃষ্টিতে ক্ষতিকর বা অনুত্তম তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কোন কাজ অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় হলে তা থেকেও নিজেকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করা। এর পার্থিব ও পরকালীন অকল্যাণ চিন্তা করা।

মুহাসাবা করতে সহায়ক কর্মকাণ্ড: আত্মসমালোচনা-আত্মহিসাব করার জন্য কিছু পদ্ধতি ও উপায় রয়েছে। যেমন-ক). আত্মসমালোচনাকারী ও আত্মসংশোধনকারীদের সঙ্গ লাভ করা এবং খারাপ লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করা। খ). খেল-তামাশার স্থান যা মানুষকে আখিরাত বিমুখ করে তা দূরে থাকা এবং নিয়মিত কবর যিয়ারত করা। গ). কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী জ্ঞানচর্চার মজলিসে ও ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ, পূণ্যবানদের জীবনী পাঠ করা। ঘ). দু'আ, যিকরুল্লাহ, তাহাজ্জুদ সালাত আদায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়ক অন্যান্য নেক আমল করা। ঙ).আত্মসংশোধনে নিজের দোষ-ত্রুটি ও পাপের জন্য নিজেকে ভর্ৎসনা বা শাস্তি প্রদান করা। শরীয়াতে শাস্তি নির্ধারিত নেই এমন পাপের জন্য কেবল নিজেকে শাস্তি দান। আর তা হতে পারে নফল সাওম, সালাত, সাদাকা, যিকর, ইস্তেগফার ইত্যাদি।

❑.পাপাচারপূর্ণ মন্দ পরিবেশ থেকে ভালো পরিবেশে স্থানান্তর (الهجرة):

মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব ব্যাপক। উন্নত পরিবেশ যেমন মানুষের নৈতিক অগ্রগতি সাধন করে, মন্দ পরিবেশ তেমনি নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। কারণ সমাজের নানা আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই এমন পরিবেশে থাকতে হবে কিংবা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যা নৈতিক অগ্রগতিকে সাহায্য করে। বিশেষ করে পাপাচারপূর্ণ খারাপ পরিবেশ থেকে দ্বীন পালনের উপযোগী ভালো পরিবেশে স্থানান্তর হওয়া নৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এজন্যই ইসলাম কাফিরদের সমাজ বা দেশ তথা মন্দ পরিবেশ ত্যাগ করে ইসলামী সমাজ বা দেশে তথা ভালো পরিবেশ হিজরতের নির্দেশ দিয়েছে। ইবরাহীম ('আ.) ব্যাবিলনে তৎকালীন যালিম শাসক নামরুদ কর্তৃক দ্বীন ও নৈতিকতা চর্চায় বাঁধাগ্রস্থ হলে সেখান থেকে সিরিয়ায় হিজরত করেন। কুরআনে তাঁর ভাষ্য এভাবে এসেছে[১]– وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -"আর ইবরাহীম বলল, 'আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রমশালী,প্রজ্ঞাময়'।"

দ্বীন ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের উদ্দেশ্যে হিজরতকারীর প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[২]–"মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও যাবান থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে।"

যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতার কারণে কেউ হিজরত করতে সক্ষম না হয়, তবে পাপাচার বর্জন করে হিজরতের নিয়ত রেখে সেখানে অবস্থান করা উচিত এবং সর্বদা দোয়া করা উচিত-[৩] رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا "হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।"

যে জনপদে শিরক, কুফর ও পাপাচারের আধিক্য এবং দ্বীন ও নৈতিকতা চর্চার পরিবেশ বিরাজমান নেই, সেখানে কেউ বসবাস করলে যদি তার দ্বীনী ও নৈতিকতা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার উচিত দ্বীন ও নৈতিকতা চর্চার অনুকূল পরিবেশে হিজরত করা। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত বাধ্যতামূলক ছিল। এই হিজরতের ব্যাপারে যারা উদাসীন ছিল তাদের তিরস্কার করা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে–[৪]

> إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا
>
> "নিশ্চয় যারা নিজদের প্রতি যুলমকারী, ফিরিশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম'। ফিরিশতারা বলে, 'আল্লাহ্‌র যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ২৬।
[২]. মূল আরবী[المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৯৭।

উল্লেখিত আয়াতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব দুর্বল মুসলিম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেনি তাদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। তাই সামার্থ্য থাকার পরও পাপাচারপূর্ণ মন্দ পরিবেশ থেকে ভালো পরিবেশে হিজরত না করা পরোক্ষভাবে সেই মন্দ পরিবেশের প্রতি সন্তুষ্টির নামান্তর। তাই এখনও কেউ যদি ধর্মীয় কারণে দেশ ত্যাগ করে তবে তা হিজরতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সা. এর উক্তি-'মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই।'[১] এখানে রাসূল সা. বুঝাতে চেয়েছেন মক্কা বিজয়ের পর মক্কা-মদীনা উভয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই এখন আর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দরকার নেই। কারণ পূর্বে মক্কা কাফিরদের দখলে ছিল, সেখানে শিরক, কুফর ও পাপাচারের আধিক্য ছিল এবং ইসলাম পালনের মারাত্মক প্রতিকূল পরিবেশ ছিল। তখন মদীনা ছিল একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র তাই মুসলিমদের সেখান থেকে হিজরত বাধ্যতামূলক ছিল। তবে এখনও কেউ কোথাও দ্বীন পালন বাঁধাগ্রস্ত হলে দ্বীন পালনের অনুকূল স্থানে হিজরত করবে। রাসূল সা. বলেন[২], "আমি ঐ সব মুসলিমের প্রতি অসন্তুষ্ট যারা মুশরিকদের মধ্যে(তাদের হয়ে) বাস করে।"
হিজরতে পার্থিব ও পরকালীণ নানাবিধ বরকত ও কল্যাণকারিতা রয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ্ বলেন–[৩]

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আর যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহ্‌র উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[৪]–

وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

"আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব। আর আখিরাতের প্রতিদান তো বিশাল, যদি তারা জানত।"

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে হিজরতের পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে। এতে মহান আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে ব্যক্তি দ্বীনি উদ্দেশ্যে হিজরত করে আল্লাহ তার জন্য দুনিয়ায় অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়ায় উত্তম অবস্থান লাভ করবে। আর পরকালের পুরস্কার তো কল্পনাতীত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইবরাহীম ('আ.) ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করলে, ইউসুফ আ. পিতা ও ভাইয়েরা কিনান থেকে মিশরে আসলে, মূসা ('আ.) ও বনী ইসরাইল মিশর ত্যাগ করলে এবং মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর অনুসারীগণ মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করলে শান্তি-নিরাপত্তা, হালাল রিযক ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, উত্তম গৃহ, সুখ-স্বচ্ছন্দ্য, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাধান্য, রাজত্ব ও বিপুল সম্মান-মর্যাদা লাভ করেন ।
অসৎসঙ্গ বর্জনে হিজরত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ও বড় পূণ্যের কাজ। আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন[৫],

জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা. এর নিকট এসে প্রশ্ন করলো,'কোন লোক সবচেয়ে উত্তম'। তিনি ইরশাদ করলেন–'সেই মু'মিন ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে।' প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? জবাবে তিনি বললেন,'এমন মু'মিন ব্যক্তি যে কোন পর্বতের গুহায় নির্জনে বসে আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে।'

❑.নাবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের জীবনচরিত অধ্যয়ন:

নাবী-রাসূল ও পূণ্যবান ব্যক্তিরা অতি উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। তাদের জীবন-চরিতে নানা উপদেশ ও নৈতিক দিক নির্দেশনায় পরিপূর্ণ। তাই নৈতিক উন্নয়নে তাদের জীবন ধারণের পদ্ধতি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা দরকার। এজন্য বিশেষ করে কুরআনে বর্ণিত আদম ('আ.), নূহ ('আ.), হূদ('আ.), সালিহ ('আ.), ইব্রাহীম ('আ.), লূত ('আ.), ইসমাঈল ('আ.), ইসহাক ('আ.), ইয়াকুব ('আ.), ইউসুফ('আ.), আইয়ুব('আ.), মুসা('আ.), খিজির ('আ.) লুকমান('আ.), দাউদ('আ.), সুলাইমান('আ.), ইউনুস ('আ.),যাকারিয়া('আ.), মরিয়ম('আ.), ইয়াহিয়া ('আ.), 'ইসা('আ.)ও মুহাম্মাদ সা. প্রমূখ নাবী-রাসূল ও পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গ এবং মহানাবী (সা.) এর সাহাবী, তাবেয়ী, এবং পরবর্তী বিভিন্ন যুগের পূণ্যবান মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী বিশেষভাবে পড়া উচিত। এটা উন্নত নৈতিকতা ও মানবীয় গুণাবলী অর্জন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কেননা তাদের জীবন ও কর্মে সততা, সৎসাহস, বিনয়, ত্যাগ, ধৈর্য, উদারতা, মানব কল্যাণ, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত অগণিত উপদেশ ও শিক্ষাণীয় ঘটনা রয়েছে। এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে কুরআনে বলা হয়েছে[৬]– لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ "তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।" অন্যত্র এসেছে[৭]- وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ

---

[১].মূল আরবী [لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬৩১; মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং ১৩৫৩।
[২].মূল আরবী [أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬৪৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৪১।
[৫].মূল আরবী[قيل يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا ثم من ؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬৩৪, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হা. নং ১৮৮৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ১১১, আল-কুরআন ২৪:৩৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ১২০।

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ "আর রাসূলদের এ সকল সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমার মনকে স্থির করি আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ।"

কুরআন মাজীদে নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত ও উপদেশপূর্ণ বহু ঘটনা ও কাহিনী আছে যা ইসলামের নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এসব ঘটনা ও কাহিনী মানুষের সামনে এমন উদাহরণ পেশ করে থাকে, যা তাদের মন-মানসে উত্তম মূল্যবোধ প্রোথিত করার ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল-কুরআনের কাহিনীগুলো এদিক হতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, তা একই সাথে পাঠক ও শ্রোতা উভয়কে ইসলামী মূল্যবোধের দিকে ধাবিত করে। মানুষকে ন্যায় ও সততা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দকে ঘৃণা করতে শিখায়। যেমন এ সব ঘটনা ও কাহিনীর মধ্যে-
ইবরাহীম ('আ.) ঘটনা থেকে সত্যের জন্য ত্যাগের বিরল শিক্ষা পাওয়া যায়। তিনি ঈমান ও সত্যের জন্য আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, নিজ জন্মভূমি ও পিতা-পরিজনকে বর্জন করেছিলেন।[১] মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একমাত্র পুত্র কুরবানী করেছিলেন।[২] মূসা ('আ.) ও ফির'আউনের সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে সত্যের বিজয় ও মিথ্যার ধ্বংস প্রমাণিত হয়েছে।[৩]

সূরা ইউসূফে বর্ণিত ইউসুফ ('আ.) এর ঘটনা বিভিন্নভাবে শিক্ষামণ্ডিত। সেখানে উন্নত চরিত্র, ধৈর্য, ক্ষমা, সততা ও আল্লাহর প্রতি ভরসার সফলতা এবং চক্রান্ত ও হিংসা-বিদ্বেষের মন্দ পরিণতি ফুটে উঠেছে। এ সম্পর্কে P.Q. Hitti বলেন–

> All these narratives are used didactically, not for the object of telling a story but to preach a moral, to teach that God in former times has always rewarded the the righteous and punished wicked. The story of Joseph (yusuf. a.s.) is told in most interesting and realistic way.[8]

আইউব (আ.) এর ঘটনায়[৫] সবর, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও স্থিরতার অনেক অনুপম দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিপদ ও কষ্টের পরীক্ষায় তিনি ধৈর্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আল-কুরআন তা অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছে। তাঁর ঘটনা হতে এই শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কোন অবস্থাতেই আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়।
সূরা আল-বুরূজে বর্ণিত আসহাবুল উখদূদ(গর্তের অধিবাসী) ঈমানের জন্য আগুনের শাস্তির পরওয়া না করে অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন[৬]- وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল।" এভাবে নাবী-রাসূল ও পূণ্যবানদের জীবনী পাঠের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> নাবী, রাসূল, শহীদ ও সালেহীন এবং অন্যান্য আল্লাহর আউলিয়াদের ঘটনা অন্তরকে স্থির রাখে এবং অন্তরকে সত্য ও সৎকর্মশীলদের উত্তারাধিকারী বানিয়ে দেয়। তাই যে ব্যক্তি দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দিয়ে বিভিন্ন জাতির জীবন বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণ করবে আল্লাহ তার অন্তরে নতুন জীবন দান করবেন এবং তার গোপন বিষয় সংশোধন করবেন। বিশেষ করে মুহাম্মাদ সা. জীবনী ঈমান বৃদ্ধি এবং আত্মশুদ্ধির বড় মাধ্যম।[৭]

তাছাড়া বিভিন্ন উপদেশপূর্ণ ঘটনা ও কাহিনী জানার মাধ্যমে উত্তম নৈতিক শিক্ষা লাভ করা যায়।

❑. ইতিহাস তথা পূর্ববর্তীদের ভুল-ত্রুটি ও পাপাচারের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ:

পূর্ববর্তী মানব গোষ্ঠীর ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মূল্যবোধ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাদের ভুল-ত্রুটির প্রকৃত কারণসমূহ উদঘাটন করে তা থেকে বিরত থাকা। নতুন প্রজন্মকে সেই ভুল-ত্রুটি থেকে সর্তক করা। সেই সব ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে মানুষের মধ্যে না হয় সেজন্য তা থেকে পরিত্রাণের সকল উপায়-উপকরণ ও কৌশল নির্ধারণ করা। আর কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করে তা অনুধাবন করে মানুষকে ভুল থেকে বেঁচে থাকার এবং সঠিক পথে চলার শিক্ষা দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নির্দেশ–[৮] قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ "বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[৯] أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي النُّهَى "এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখাল না যে, আমি এদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে ? অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে নিদর্শন।" আরও বলেন-[১০]

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

---

১. আল-কুরআন ২১: ৫১-৭০; ৩৭:৯৭-৯৯, ২৯:১৬-২৫,।
২. আল-কুরআন ৩৭:১০০-১১০।
৩. আল-কুরআন ০৭:১০৩-১৪৩ ১০:৭৫-৯৫।
4. P.Q. Hitti, *ibid*, p.125.
৫. দেখুন, আল-কুরআন. সূরা আল-আম্বিয়া ২১ : ৮৩-৮৪।
৬. আল-কুরআন. সূরা আল-বুরূজ ৮৫: আয়াত ০৮
৭. খালেদ বিন আবদুল্লাহ আল-মুসলেহ, *আত্মশুদ্ধি (সালাহুল কুলূব)*,অনু.আব্দুর নূর (রিয়াদ: ইসলামী দাওয়াত...ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪২৯হি.)পৃ.৬০।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১১।
৯. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১২৮। আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩২: ২৬
১০. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ০৯।

তারা কি যমীনে ভ্রমন করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা শক্তিতে তাদের চেয়েও প্রবল ছিল। আর তারা জমি চাষ করত এবং তারা এদের আবাদ করার চেয়েও বেশী আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুল্‌ম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি যুলম করত। অন্যত্র বলেন[১],

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ- فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون)

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি তাহলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিলেন, তখন তারা নিজেদের লব্ধ জ্ঞানের জন্য অহঙ্কার করেছিল। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।" আরও বলেন[২]-

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ- ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"এরা কি যমীনে বিচরণ করে না? তাহলে দেখত, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? তারা এদের তুলনায় যমীনে শক্তিমত্তা ও প্রভাব বিস্তারে প্রবলতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করলেন তাদের পাপাচারের কারণে। আর তাদের জন্য ছিল না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন রক্ষাকারী। এটি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসত, কিন্তু তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করত। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিমান, আযাবদানে কঠোর।" আরও এসেছে-[৩]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির শক্তি, সম্পদ ও লব্ধ জ্ঞানের অহঙ্কার, শিরক, কুফর, সত্যের বিরুদ্ধাচারণ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি নানা পাপাচার ও মন্দ কাজের পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে পরবর্তী মানব গোষ্ঠীকে তা থেকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে।

পূর্ববর্তীদের ভুল-ত্রুটি থেকে মানুষ যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে সেজন্য মহান আল্লাহ পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রেখেছেন। এসব নিদর্শনের মধ্যে একটি হল- ফিরাউনের অক্ষত মৃতদেহ। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে মিশরের রাজা ফিরআউন(দ্বিতীয় রামেসিস) মহান আল্লাহকে অস্বীকার করে নিজকে খোদা দাবী করে এবং সত্যপন্থী তথা মূসা ('আ.) ও তাঁর জাতি বনী ইসরাইলদের অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অবিচার করে। মুসা ('আ.) তাকে বারবার সত্যের প্রতি আহবান জানালেও সে অহংকার বশে তা প্রত্যাখান করে এবং ক্রমাগত সীমালংঘন ও আল্লাহদ্রোহিতার উপর অটল-অবিচল থাকে। ফলে মহান আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। মৃত্যুকালীন মুহূর্তে এই পাপিষ্ঠ মহান আল্লাহ প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু সারাজীবন সে চরম অবাধ্যতা উপর অটল থাকার কারণে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করে পাকড়াও করেন। সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম কি হতে পারে কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী মানুষ যাতে তা থেকে শিক্ষা নেয় সেজন্য তিনি ফিরাউনের মৃত্যদেহ অক্ষত রাখেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]-

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ-

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম। আর ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন সহকারে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, 'আমি ঈমান আনলাম যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর আমি আত্মসমার্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। এখন! অথচ ইতঃপূর্বে তুমি নাফরমানী করেছ, আর তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। 'সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফিল'।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট অনেক শিক্ষণীয় ঘটনাবলী রয়েছে।[৫] কুরআনে বর্ণিত এসব ঘটনা থেকে মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। সূরা আল-বাক্বারায় গরু যবেহ করা সংক্রান্ত ঘটনাটির[৬] নীতি শিক্ষাটি সুস্পষ্ট। সেখানে মূসা ('আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের একটি গোত্রকে গরু কোরবানি করার নির্দেশ দিলে তারা তা নিয়ে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্ন ও অজুহাত পেশ করে। তাদের এই বক্র মানসিকতার কারণে তারা জটিলতায় পড়ে। যেখান একটি সাধারণ গরু

---

১. আল-কুরআন,সূরা আল-মু'মিন : আয়াত ৮২-৮৩।
২. আল-কুরআন,সূরা আল-মু'মিন : আয়াত ২১-২২।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ২২ঃ আয়াত ৪৬।
৪. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৯০-৯২।
৫. কুরআনের প্রায় ৯২ স্থানে মানুষকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দেখুন, কুরআন সূরা আলে-'ইমরান ০৩: ১১, ১৩, ৩৩, ৩৫-৫০, ৬৭, ৮১, ৯০-৯৬, ১২১-১২৮, ১৩৭-১৩৮, ১৫২-১৫৫, ১৬৬-১৬৭ ; আল-মা'য়িদাহ ০৫: ১২, ২০, ৩১, ১১১-১১৪ ; আল-আন্'আম ০৬ : ১২, ৭৪-৮৭ ; আল-আ'রাফ ০৭ : ১১-২৫, ১৪২-১৬৪ ; আল-আনফাল ০৮ : ৫-৯, ৪২-৪৮ ; আত্-তাওবাহ ০৯ : ৬৫, ৭৩ ; আর-রূম ৩০ : ৯ ; আল-ফাজ্‌র ৮৯ : ৬-৯।
৬. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ: আয়াত ৬৭-৭১।

যবেহ করলেই যথেষ্ট হত সেখানে তাদের অবান্তর নানা প্রশ্নের কারণে একটি বিশেষ গরু চড়া মূল্যে কিনে যবেহ করতে হয়। সমাজে অনেক মানুষের মধ্যে এ ধরনের বক্র মানসিকতা, অবান্তর তর্কবিতর্ক এবং অনর্থক বাড়াবাড়ি দেখা যায়, যা নানা জটিলতা ও ফিতনা-ফাসাদের জন্ম দেয়। তাই ইতিহাসে মর্যাদাপূর্ণ আসন করে নিতে হলে পূর্ববর্তীদের ভুল-ত্রুটি থেকে আত্মরক্ষা করে আমাদের নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে। ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী এ সম্পর্কে বলেন[১],

> আল্লাহ এমন কোন জাতির উপর মানব জাতি নেতৃত্ব অর্পণ করেন না, যারা নৈতিকতার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট এবং যারা নিজেদের মধ্যে অথবা অপরের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি বজায় রাখতে পারে না। এর কারণ হল ইতিহাসের গতিধারা নৈতিকতামুখী বা ইহা এমন কোন দলকে ক্ষমতার মর্যাদায় বা উচ্চাসনে উপবিষ্ট করে না, যারা অপরের সহিত ন্যায়বিচার, সদাচার, এবং সততার মতো নৈতিকতার নিম্নতম মানও রক্ষা করে চলে না।

......

ব্যক্তি পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশে করণীয় ও অর্জনীয় গুণাবলীর বর্ণনা এখানে শেষ করা হলো। ব্যক্তি জীবনে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ ঘটাতে হলে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে এ সব বিষয় পালনের দ্বারা ব্যক্তি উন্নত নৈতিকতা অধিকারী হতে পারবে এবং নৈতিক অবক্ষয়রোধে সামর্থ্য হবে। আর উন্নত নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ ব্যক্তির দ্বারাই আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন সম্ভব হবে।

[১]. ড. মাযহার উদ্দীন সিদ্দীকী, *কুরআনের ইতিহাস দর্শন*, অনু.সিরাজ মান্নান (ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং.২০০৮) পৃ.০৮।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তব্য বিষয়সমূহ

পরিবার হলো সমাজের মূলভিত্তি। সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত সুষ্ঠু পরিবার ও পারিবারিক জীবন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মূল্যবোধ বিকাশ করতে হলে পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ চর্চা জরুরী। বিবাহের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করে। আর পরিবার হল সমাজের মৌলিক ভিত্তি। এটা শুধু সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং একটি পবিত্র সংস্থা। বংশ বৃদ্ধি, সন্তানের প্রতিপালন ও সমাজে সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য পরিবার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক জীবনে একজন শিশু মানবিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা লাভ করে। পরিবারস্থ ছেলে-মেয়ের পক্ষে পিতা-মাতা, ভাই-বোনের শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ করা সহজে সম্ভব হয় না। নিম্নে পারিবারিক পর্যায়ে মূল্যবোধ বিকাশে করণীয় বিষয়গুলো বর্ণনা তুলে ধরা হল।

❑.প্রাপ্ত বয়সে অবিলম্বে বিবাহ সম্পন্নকরণ (النكاح):

বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন। নৈতিক চরিত্রের সুরক্ষা, বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ, পরিবার গঠন ও মানুষের বংশধারা সংরক্ষণের একমাত্র বৈধ উপায় হচ্ছে বিবাহ। লজ্জাস্থান হিফাযত, কাম-প্রবৃত্তিকে সংহত ও মানসিক প্রশান্তি লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এজন্য ইসলামে বিবাহ প্রথাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। এর প্রতি উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে-[১] فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً "বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।"

বিবাহ সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় পারিবারিক জীবনের সূচনা করে। এটা নারী-পুরুষের জীবনকে প্রশান্তিময় করে তোলে। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষ মানসিক তৃপ্তি ও সুখ ভোগ করে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদের যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন।" বিবাহ মানুষের জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ করে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন[৩]–"সুন্দর বিবাহিত জীবনের মূল কথা হলো একে অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা গভীর হলে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সম্পর্ক সুনিবিড় হলে যে সুফল পাওয়া যায় জীবনের অন্য ক্ষেত্রে তা মেলে না।"

প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের যৌন চাহিদা একটি স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা। বৈধভাবে এই চাহিদা পুরণের জন্য দেয়া হয়েছে বিবাহের বিধান। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষের মর্যাদার কারণে জীব-জন্তুর মত যথেচ্ছা এই চাহিদা পূরণের সুযোগ রাখা হয়নি। অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ যেমন জঘন্য অন্যায়, তেমনি বৈধ পন্থায় যৌন চাহিদাপূরণ পূণ্যের কাজ। এ মর্মে নাবী(সা.) বলেন-[৪], "তোমাদের স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন রয়েছে সাদাকা তুল্য সাওয়াব। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কি তার জৈবিক চাহিদা মেটাবে এবং এজন্য সে নেকী লাভ করবে? তিনি বললেন, তোমাদের কি মনে হয়, যদি সে ঐ চাহিদা হারাম উপায়ে মেটাতো তবে তার কোন গুনাহ হ'ত না? (অবশ্যই হ'ত) অতএব সে যখন তা হালাল উপায়ে মেটায়, তার জন্য নেকী লেখা হয়।"

নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা ছাড়াও বিবাহ মানুষের জীবনে প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনে। এ কারণে মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি দান করেন। কেউ বিবাহ করতে চাইলে সংসার নির্বাহ, সন্তানধারণ ও প্রতিপালন করতে হয়-যা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এজন্য ইসলাম প্রাপ্ত বয়সে বিবাহের ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ "তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়িম' তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ্তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" উদ্ধৃত আয়াতে যারা আর্থিক সচ্ছলতা বা দরিদ্রতার অজুহাতে বিবাহ বিলম্ব করে তাদের তালবাহানা খণ্ডন করা হয়েছে। নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার জন্য কেউ বিবাহ করলে তার উপর রহমত নাযিল হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৬]

'তিন শ্রেণীর লোকের উপর আল্লাহর সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ক. যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। খ. যে লোক বিবাহ করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। গ.যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদে যেতে চায়'।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৩।

২. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ২১, আল-কুরআন ০৭:১৮৯।

৩. বার্ট্রান্ড রাসেল, *বিবাহ ও নৈতিকতা*, অনুবাদ আরশাদ আজিজ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল-১৯৯৮, পৃষ্ঠা.১২৭।

৪. মূল আরবী [وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০০৬; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৫, পৃ.১৬৭, হাদীস নং ২১৫১১।

৫. আল- কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩২।

৬.মূল আরবী [ثلاثة حق على الله عز و جل عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং ৩২১৮।

বস্তুত যারা বিবাহের পূর্বে আরামপ্রিয়, স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন, অলস ও অকর্মণ্য জীবনে অভ্যস্ত থাকে বিয়ের পর তাদের অধিকাংশের মধ্যে সুশৃঙ্খল, কর্মঠ ও মিতব্যয়ী জীবনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। ফলে বিবাহ তাদের জীবনে সমৃদ্ধি আনে।

বিবাহ মুহাম্মাদ (সা.) সহ নাবী-রাসূলদের চিরন্তন সুন্নত। ইসলাম বিশ্বস্ত স্বামী বা স্ত্রী, স্নেহশীল পিতা ও কর্তব্যপরায়ন সন্তান হওয়াকে সুন্দর গুণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ইসলাম বিবাহকে নৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজ বলে গণ্য করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً "তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।" বিবাহের প্রতি অনাগ্রহীদের সতর্ক করতে রাসূল সা. বলেন[২]–"বিবাহ আমার সুন্নত, যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নত পালন করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

বিবাহ ও নৈতিকতা: নৈতিক চরিত্র রক্ষা ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষায় বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। বিবাহ মানুষের দৃষ্টিকে সংযত করা ও যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। একে নৈতিক চরিত্রের রক্ষাকবচও বলা যেতে পারে। কেননা ব্যভিচার-সমকাম সহ অবৈধ যৌনাচার ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে মানুষ রক্ষা পায়। বিবাহের মাধ্যমে মানুষ বৈধভাবে তার জৈবিক চাহিদা মিটাতে পারে। এতে তাদের মন-মস্তিষ্ক বাজে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকে এবং চরিত্র উন্নত হয়। বিবাহের মাধ্যমে বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়। বিবাহের ব্যবস্থা না থাকলে বংশীয় ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিবাহপ্রথা না থাকলে মানুষের পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে, একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া কমে যাবে, পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং মানব সভ্যতা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বিবাহের নৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে মহানাবী সা. বলেন[৩]–"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে যাদের বিয়ে করার সামর্থ আছে তাদের বিয়ে করা উচিত। কারণ এটি দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে। কেননা তা তার প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম।" রাসূল (সা.) আরও বলেন[৪], 'যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করল, তখন যেন সে দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল'।

উল্লেখ্য যে, বিবাহ নৈতিক চরিত্র রক্ষার মুখ্য মাধ্যম হলেও বিবাহের মাধ্যমে যেহেতু পুরুষকে আর্থিক ব্যয়ভার বহনসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় সেহেতু অসামর্থ্যবান পুরুষদের সামার্থ্য অর্জন করা পর্যন্ত অপেক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ "যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" –তাই যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই তারা সংযম অবলম্বন করবে। এ ব্যাপারে উপরের এক হাদীসে রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে গুরুত্ব দিলেও কতিপয় ব্যক্তির জন্য বিবাহের অনুমতি দেয়নি। যেমন- পুরুষত্বহীন, পাগল, প্রমূখ।

বিবাহের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা: বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলাম নৈতিক বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে মানুষ সাধারণত রূপ-সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ ও যোগ্যতা মুখ্য বিষয় গণ্য করে। কিন্তু ইসলামে পাত্র-পাত্রীর উন্নত নৈতিকতা, ঈমান ও দ্বীনিয়াত সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা সন্তান তার পিতা-মাতার স্বভাব-চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ ইত্যাদি উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন, '*মেয়েদের চারটি গুণ বিবেচনা করে লোকেরা বিবাহ করে থাকে; তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। কিন্তু তুমি দ্বীনদার মহিলাকেই প্রাধান্য দাও, তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে*'।[৬] আল-কুরআন চরিত্রবান মু'মিন পুরুষ ও নারীদের চরিত্রবান মু'মিন নারী ও পুরুষদেরকে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে;[৭] এবং দুশ্চরিত্রা বা ব্যভিচারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৮]– الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ "ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।" আরও বলা হয়েছে[৯] الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ "দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য।"

উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী, চরিত্রহীন পুরুষ বা নারী চরিত্রবান পুরুষ বা নারীর যোগ্য হতে পারে না। তাই বিবাহের ক্ষেত্রে বর-কনের দ্বীনদারি ও চরিত্রের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ৩৮।

২. মূল আরবী [النكاح من سنتي . فمن لم يعمل بسنتي فليس مني]*সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৮৪৬।

৩. **মূল আরবী**[يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হা.নং ৪৭৭৮; *সহীহ মুসলিম*, হা.১৪০০।

৪. মূল আরবী [إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي] *মিশকাত*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৩০৯৬।

৫. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩৩।

৬. মূল আরবী [تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হা.নং ৪৮০২; *সহীহ মুসলিম*, হা. ১৪৬৬।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ২২১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৪:২৪-২৫, ০৫:০৫।

৮. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০৩; আরও দেখুন,আল-কুরআন ০৪:২৫।

৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২৬; আরও দেখুন,আল-কুরআন ৩২:১৮।

ভালো স্ত্রী সুস্থ ও আদর্শ সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। সুসন্তান লাভ ও সন্তানের বংশীয় পবিত্রতার ব্যাপারে দীনদার স্ত্রীর গুরুত্ব অপরিসীম। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১], "কোথায় তোমার বীর্য স্থাপন করবে তা চিন্তা করে স্থির করে নিও। আর সমতা বজায় রেখে বিবাহ করবে। আর বিয়ে দিতেও এর প্রতি লক্ষ্য করবে।" তিনি আরও বলেন[২], "তোমাদের সকলে যেন সঞ্চয় করে কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহর স্বরণকারী জিহ্বা ও মু'মিন স্ত্রী, যে তাকে আখিরাতের কাজে সহায়তা করবে।" অন্যত্র বলেন-[৩]"শুধু রুপ-লাবন্য দেখেই কোন মেয়েকে বিয়ে করো না। কেননা সৌন্দর্য তার পতনের কারণ হবে। শুধু সম্পদ দেখে কোন নারীকে বিয়ে করো না। কেননা সম্পদের প্রাচুর্যতা অবাধ্য স্বভাব সৃষ্টি করতে পারে। বরং তোমরা মেয়ের দীনদারী দেখেই বিয়ে করো।"

কুরআন বিবাহের ক্ষেত্রে নৈতিক সীমারেখা ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এজন্য মুশরিক ও ধর্মত্যাগী পাত্র-পাত্রী জাগতিক দিক থেকে যদি অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুদর্শন হয় তবুও তাকে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ কর না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, মু'মিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অনুরূপভাবে কুরআন মুসলিমদের নারীদের সাথে কাফির পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-[৫]

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ

তারা (মু'মিন মহিলা) কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহ্‌র বিধান।

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ধার্মিক ও চরিত্রবান এমন পাত্রের সন্ধানে তাকিদ দেয়া হয়েছে যেন যথার্থ দায়িত্বশীলতার সাথে স্ত্রী-সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং সঠিকভাবে পরিবার তত্ত্বাবধায়ন করতে পারে। যদি তা না করা হয় তবে পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে বিপর্যয় ও নৈতিক অধঃপতন সৃষ্টি হবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-[৬] "যদি তোমাদের নিকট এমন কোনো পাত্রের প্রস্তাব আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্র পসন্দ কর, তাহলে তোমরা তার সাথে তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দেবে। অন্যথা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"

অকল্যাণ থেকে রক্ষা এবং বিবিধ কল্যাণ বিবেচনা করে কুরআন কিছু নারী সাথে বৈবাহিক বন্ধন চিরতরে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনের ভাষায় যারা মাহরাম। এরা হলেন মা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়, দুধ-মা, দুধ-ভগ্নী, শাশুরী, গর্ভজাত কন্যা, ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী, দুই বোনকে একত্র করা এবং অন্যের বিবাহিত স্ত্রী নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭] – وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً "আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হল)। নিশ্চয় তা হল অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ।" আরও বলেন[৮],

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, শাশুরী ও তোমরা যে সব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে...এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্র করা। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।...আর(হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে(অন্যের বিবাহিত স্ত্রী)।

---

[১]. মূল আরবী [تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم] ইবন মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৯৬৮।

[২].মূল আরবী [ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة] ইবন মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৮৫৬।

[৩]. মূল আরবী [لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين] ইবন মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৮৫৯।

[৪].আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ২২১।

[৫].আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০: আয়াত ১০।

[৬].মূল আরবী[إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض] ইবন মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ, হা.১৯৬৭, *তিরমিযী*, কিতাবুন নিকাহ, হা.১০৮৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ২২।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ২৩-২৪।

উল্লেখিত নারীরা ছাড়া মুমিন পুরুষদের জন্য অন্য সব মুমিন চরিত্রবান স্বাধীন নারী কিংবা দাসীকে বিবাহ করা বৈধ।[১] এছাড়া আহলে কিতাব(ইহুদী-খৃষ্টান) এর মধ্যে এক আল্লাহ, রাসূল সা. ও পরকালে বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীদের বিবাহ করা বৈধ।[২] তবে বর্তমানকালের আহলে কিতাব হিসেবে পরিচিত ইহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই প্রকাশ্য বড় শিরক (যেমন-ঈসা ('আ.) কে আল্লাহর পুত্র) এবং বড় কুফরীতে (যেমন-মুহাম্মাদ সা. এর রিসালত অস্বীকার, মদ ও শুকরের মাংসকে বৈধ মনে করা ইত্যাদি) নিমজ্জিত, তাই মুমিনদের জন্য এসব নারীদেরকে বিবাহের কোন সুযোগ নেই।

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে নৈতিক বিধান: আল-কুরআন বিশেষ প্রয়োজন ও পরিস্থিতিতে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ইনসাফের শর্তে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমোদন দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً .... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ "বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন, অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে।"

তবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রত্যেকের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, আল-কুরআন পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করলেও এক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারেই পরামর্শ দিয়েছে। কেননা একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই স্ত্রীদের পরস্পরের মাঝে পূর্ণ ইনসাফ করা সম্ভবপর হয় না। তাই একান্তই প্রয়োজন না হলে, এক স্ত্রীর গ্রহণই শ্রেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]- وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا "তোমরা যতই ইচ্ছ কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

❑.স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার রক্ষা (حقوق الزوجين):

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সফল করে তুলতে পারস্পরিক সমঝোতা, শ্রদ্ধা ও প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন-[৫] هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ-"তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ।" এজন্য কুরআন দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বেশ কিছু অধিকার ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। পারস্পরিক এই অধিকার ও কর্তব্যসমূহ আদায়ের মাধ্যমেই সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠে। এ সব অধিকারের মধ্যে কিছু রয়েছে স্বামীর এবং কিছু রয়েছে স্ত্রীর।

স্ত্রীর অধিকার/স্বামীর কর্তব্য: • বিবাহের পরপরই স্বামীর প্রথম কর্তব্য হলো স্ত্রীর নির্ধারিত মাহ্‌র পুরোপুরি পরিশোধ করে দেয়া।[৬] এটা ফরয, এ ব্যাপারে গরিমসির কোন সুযোগ নেই। স্বামীরা নিজ দায়িত্বে স্ত্রীকে তা প্রদান করবে। ছলচাতুরীর অনেকে মোহর মাফ করিয়ে এতে মাহ্‌র আদায় হয় না। তবে মাহ্‌র প্রদানের পর স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীকে কিছু দিলে তা গ্রহণ করা অন্যায় হবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহর বলেন-[৭] وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে খাও।"

• স্বামীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব মৌলিক উপকরণগুলো তার সামার্থ্য অনুযায়ী প্রদান করা। মহান আল্লাহ বলেন[৮]– الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।"

এ প্রসংঙ্গে হাদীসে এসেছে[৯], জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা. কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর উপর স্ত্রীর কি কি অধিকার রয়েছে? রাসূল সা. বলেন–"তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে। তাকে কাপড় পরাবে যখন তুমি পরবে। তার মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। তাকে অশ্লীল গালি দেবে না। নিজ গৃহ ছাড়া তার থেকে পৃথক থাকবে না।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ২৪-২৫।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ০৫।
৩. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৩।
৪ .আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১২৯।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮৭।
৬. বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জনবাস করার পূর্বে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে সেক্ষেত্রে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যাদের মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জনবাস হয়নি এরূপ নারীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্ষতিপূরণ বা সম্পদ দিতে হবে। [আল-কুরআন ২: ২৩৬-২৩৭]
৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪:২৪, ৫:৫।
৮. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৪।
৯.মূল আরবী[أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হা.২১৪২; *ইবন মাজাহ*, হা.১৮৫০।

• দাম্পত্য জীবনে স্বামীর বড় কর্তব্য হলো- স্ত্রীর সাথে সদাচারণ করা। তার সাথে হাসি-খুশী থাকা এবং খোলামেলা আচরণ করা। স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের মাধ্যমে একত্রে বসবাস করা, যাতে স্ত্রীরা অবাধ্য কিংবা মন্দ চরিত্রের দিকে ধাবিত না হয়। স্ত্রীর জন্য কষ্টের বা মর্যাদাহানিকর এমন কোন আচরণ তার সাথে না করা। স্ত্রী ভুল-ত্রুটি করলে করলে ক্ষমা করা। শুধু স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি না খুঁজে তার ভালো গুণাবলীর প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[১] وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।"
এই আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর বলেন[২],"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর, তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলবে এবং উত্তম আচরণ করবে। সাধ্যানুযায়ী নিজের অবস্থা ভালো রাখবে। তোমরা যেমন চাও তোমাদের স্ত্রীরা সুন্দর-সজ্জিত থাকুক তেমনি তোমরা তাদের মনতুষ্টির জন্য নিজেদের সুন্দর-সজ্জিত রাখ।"

মোদ্দাকথা, তাদের হকসমূহ রীতিমত আদায় করা এবং কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন। আর তাদের কোন খারাপ স্বভাবের কারণে অপছন্দনীয় হলে ধৈর্যধারণ করা, তাদের বিচ্ছিন্ন না করা, তাদের কষ্ট না দেয়া, তাদের কোন ক্ষতি না করা। এ দিয়ে লক্ষ্য করে রাসূল সা. বলেন-[৩] "তোমাদের সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।"

• একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সাথে ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন[৪]- فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ "তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে যেও না এবং অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখও না।" এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৫]–"কারো দু'জন স্ত্রী থাকা অবস্থায় সে যদি তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় না রাখে তাহলে সে কিয়ামত দিবসে উত্থিত হবে দেহের অর্ধাংশ অচল(অর্ধাঙ্গ) অবস্থায়।"

• স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করবে। স্ত্রীর কোন কিছুই স্বামীর নিকট গোপন থাকে না, তাই অন্যের কাছে স্ত্রীর কোন গোপন বিষয় বলা অনৈতিক। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন[৬]–"কিয়ামতের নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে সে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, তারপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয়।" অন্য বর্ণনায় এসেছে-[৭] 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় আমানতের খিয়ানত হলো, কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে মিলিত হয়, এরপর সে (পুরুষ) তার গোপনীয়তা অন্যের নিকট প্রকাশ করে দেয়।'

•এছাড়া ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান যেমন- ওযু-গোসল, হায়েয-নিফাসকালীন বিধান, নামাজ, রোযা, পর্দা ও সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয় সঠিক জ্ঞান না থাকলে তা প্রদান করা। স্ত্রী অবাধ্য হলে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া। **[আল-কুরআন, ০৪:৩৪]**

স্বামীর অধিকার/স্ত্রীর কর্তব্য: স্বামী-স্ত্রীর মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম পার্থক্য করেনি। নারীদের উপর পুরুষদের যেমন অধিকার রয়েছে আছে তেমনি পুরুষদের উপর নারীদের অধিকার রয়েছে। তবে বিভিন্ন কারণে ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর উপর মর্যাদা ও কর্তৃত্বের আসন দিয়েছে। তাই স্ত্রী স্বামীর কতৃত্ব মেনে নেবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৮] الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ "পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। "
উল্লেখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী (মৃ.৫৪৩হি.) বলেন যে-[৯], "নারীদের উপর পুরুষদের প্রাধান্যের কারণ এই যে, তারা স্ত্রীদেরকে মহর দান করে, তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তাদেরকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্যে আদেশ করে, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং নামাজ ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্য তাগিদ করে থাকে।"

•বিবাহের যাবতীয় শর্তাবলী পূর্ণ হলে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর নিকট সমার্পণ করবে। যাতে স্বামী তাকে উপভোগ করতে পারে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[১০] (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা গমন কর তোমাদের শস্যক্ষেত্রে, যেভাবে চাও।"

•স্ত্রীর কর্তব্য হলো-স্বামীর আনুগত্য করা, তার অবাধ্য না হওয়া। স্বামীর সাথে বিনম্র ও সহনশীল আচরণ করা। স্বামীর সেবা-যত্ন করা এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। মহান আল্লাহ বলেন[১১]– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৯।
২. ইবনু কাছীর, *তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.২৪২।
[৩].মূল আরবী [خيارکم خيارکم لنسائهم]*সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৯৭৮, *তিরমিযী*, কিতাবুন রিদা', হা ১১৬২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪:১২৯।
[৫]. মূল আরবী [من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং ২১৩৩, *ইবন মাজাহ*, হা. ১৯৬৯; তিরমিযী ,হা. ১১৪১।
[৬]. মূল আরবী [إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها]*সহীহ মুসলিম* , কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৪৩৭।
[৭]. মূল আরবী [إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৭০।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৪।
[৯]. ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল কুরআন*, (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২য় সং. http://www.al-islam.com) খ.০২, পৃ.৩৩৪।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ২২৩।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৮।

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ "আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা।"

•স্বামীর অনুপস্থিতে নিজ সতীত্বের হিফাযত করা, শালীনতা রক্ষা করা। স্বামীর অপছন্দনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা এবং স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি না দেয়া। স্বামীর সম্পদ হিফাযত, স্বামীর গোপনীয়তা রক্ষা এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার গৃহ ত্যাগ না করা। মহান আল্লাহ বলেন[১]– فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ "সুতরাং পূণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিণী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ্ হিফাযত করেছেন।" একজন আদর্শ মুসলিম স্ত্রীর কী কী ধরনের গুণের অধিকারী হবে তার একটি বর্ণনা কুরআনে এভাবে প্রদান করা হয়েছে[২]– مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا -"যারা হবেন মুসলিমা, মু'মিনা, অনুগত, তাওবাকারী, 'ইবাদতকারী, সিয়ামপালনকারী, অকুমারী ও কুমারী।"

•স্ত্রীর বিশেষ কর্তব্য সাজগোজ করে স্বামীর সামনে নিজের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা এবং উত্তমভাবে স্বামীর নিকট নিজেকে পেশ। স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা না করা। স্ত্রীর একটি কর্তব্য স্বামীর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা। স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে নাবী সা.বলেন[৩],"যদি কোন ব্যক্তিকে সিজদার নির্দেশ দিতাম তাহলে নারীদেরকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদার করতে।" কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী সত্যিকার মুসলিম স্বামীর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি স্ত্রীর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জনৈক নারীকে উপদেশ দিতে গিয়ে নাবী সা.বলেন[৪],"তোমার স্বামী তোমার জান্নাত ও তোমার জাহান্নাম।" অর্থাৎ স্বামীর আনুগত্য ও সন্তুষ্টিতে স্ত্রীর জান্নাত, আর অবাধ্যতায় জাহান্নাম।

•এছাড়া স্ত্রী আরও কর্তব্য হলো- স্বামীর সম্পদ রক্ষা ও সন্তান লালন-পালনে যত্নবান হওয়া। স্ত্রীর সাংসারিক কাজ-কর্ম যেমন রান্না-বান্না করা ও গৃহস্থলীর কাজের ব্যাপারে ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, এ সব কাজ করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। আবার কারো মতে, ওয়াজিব নয়। তবে এক্ষেত্রে স্ত্রীর মাধ্যম ধরনের সেবা দেয়াই উচিত। একজন উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৫],

> তাকওয়া পর মু'মিন ব্যক্তি পূণ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কোন নিয়ামত লাভ করে না। স্বামী যদি তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে সে তা আন্তরিকভাবে পালন করে। আর যদি তার প্রতি দৃষ্টি দেয় তবে সে (স্ত্রী) তাকে সন্তুষ্ট করে এবং স্বামী যদি তাকে শপথ দিয়ে কিছু বলে তবে সে তা পূরণ করে, আর স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে তবে সে নিজের সম্ভ্রম হিফাযত করে এবং স্বামীর ধন–সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

❑.দাম্পত্য কলহ নিরসনের উত্তম পন্থা ও তালাকের নৈতিক বিধান:

ইসলাম চায় দাম্পত্য সম্পর্ক যেন স্থায়ী হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ যেন না ঘটে। তাই পুরুষদের তাকিদ দেয়া হয়েছে তারা যেন সামান্য দোষ-ক্রটির জন্য স্ত্রীকে তালাক না দেয় এবং স্ত্রীর কেবল খারাপ দিকটা না দেখে তার ভালো দিকসমূহ বিবেচনা করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৬]–فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا "আর যদি তোমরা তাদের(স্ত্রী) কে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।" এ প্রসংঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৭]–"যদি তার কোন আচরণ অপছন্দ হয় তবে তার অন্য গুণের কথা স্বরণ করে সন্তুষ্ট হবে।"

নারীদের সৃষ্টিগতভাবে কিছু দুর্বল দিক রয়েছে তা খেয়াল করে স্বামীদের উচিত স্ত্রীদের এমন কোমল ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা যাতে সংসার ভেঙ্গে না যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৮],

> "নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে। সে কখনো তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির থাকবে না। সুতরাং তুমি যদি তাকে দিয়ে উপকৃত হতে চাও তবে তার বক্রতা অবশিষ্ট রেখেই তাকে দিয়ে উপকৃত হতে হবে। আর তাকে সোজা করতে গেলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে–আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা অর্থ হল তাকে তালাক দেয়া।"

তালাকের ব্যাপারে কোন স্বামী যেন তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত না নেয় সেজন্য ইসলামে বলা হয়েছে যে, যদি স্বামী স্ত্রীর থেকে অবাধ্যতার আশঙ্কা করে তবে প্রথমে স্ত্রীকে সদুপদেশ দেবে। এতে সংশোধন না হলে বিছানায় আলাদা করবে, তাতেও সংশোধন না হলে (মৃদু) প্রহার কর। আর যদি সে সংশোধন হয়ে যায় তবে তার প্রতি আর কোন মন্দ আচরণ

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৪।
২. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্রীম ৬৬: আয়াত ০৫।
৩. মূল আরবী [لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুর রিদা', হাদীস নং ১১৫৯।
৪. মূল আরবী [فإنه جنتك ونارك] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৬, পৃ.৪১৯, হাদীস নং ২৭৩৯২।
৫. মূল আরবী [ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة . إن أمرها أطاعته . وإن نظر إليها سرته . وإن أقسم عليها أبرته . وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله] *ইবন মাজাহ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৮৫৭; আবুল কাসেম তাবারানী,*আল-মু'জামুল কাবীর*, খ.০৮, পৃ.২২২, বাবুস সাদ,হা.নং ৭৮৮১।
৬. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৯।
৭. মূল আরবী [لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুর রিদা'আ, হা.নং ১৪৬৯; *মুসনাদ আহমাদ*, খ.২, পৃ.৩২৯, হা.৮৩৪৫।
৮. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুর রিদা'আ, হাদীস নং ১৪৬৪।

করা যাবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমুন্নত মহান।"

স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক যদি ক্রমাগত অবনতি হয় এবং উল্লেখিত সংশোধন পদ্ধতি কাজে না আসে তবে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য উভয় পরিবারের বিচারক নিযুক্ত করে পারিবারিক সালিসের মাধ্যমে সংশোধন ও সমাঝোতার ব্যবস্থা করা। وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا "আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত।"[২]

তালাক আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অপছন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন[৩], "তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না। কেননা যে সব পুরুষ ও নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটায় পুনঃপুনঃ বিয়ে করে এবং যৌনতৃপ্তির বৈচিত্র্য তালাশ করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।" তিনি আরও বলেন[৪], "যে মেয়ে লোক কোন দুর্বিষহ কারণ ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।"

তালাক ইসলামের নিকৃষ্ট হালাল কাজ। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থায়ীভাবে চরম তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তালাক ছাড়া বিকল্প না থাতে তবে উত্তমভাবে তালাকের ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য যে, তালাক সর্বোচ্চ তিন বার দেয়া যায়। তাই প্রথম বা দ্বিতীয় তালাকের পর *ইদ্দত*[৫] শেষ সীমায় স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে ভালোভাবে রাখা নতুবা উত্তমভাবে বিদায় করে দেওয়া।[৬] তাদের ইদ্দত অনুসারে (ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের পর স্ত্রীর সাথে মিলিত না হয়ে) তালাক দেয়া এবং 'ইদ্দতের হিসাব রাখা।[৭] তিন তালাকের পর উক্ত স্বামীর জন্য সেই স্ত্রী অবৈধ হয়ে যাবে। তবে সেই স্ত্রীর যদি অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সেই স্বামী মারা যায় কিংবা কোন কারণে বিচ্ছেদ ঘটে তখন প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বৈধ হবে।[৮]

তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য।[৯] তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সম্পদে হস্তক্ষেপ বা জবর দখল না করা এবং তাকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে কোন কিছুই ফেরৎ না নেয়া।[১০] তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়া কিংবা উত্যক্ত না করা। তার অন্যত্র বিবাহে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা।[১১] তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের ইদ্দত পালনকালীন সময়ের মধ্যে কোন অবস্থায় কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়া।[১২]

ইসলাম স্বামীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের কর্তৃত্ব দিলেও একান্ত প্রয়োজন ও উপযুক্ত কারণে নারীকে স্বামী থেকে মুক্তির জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধানও দিয়েছে। যেমনঃ ভরণ-পোষণ দানে অক্ষম, স্বামীর যৌন অক্ষমতা, অনাকাঙ্ক্ষিত দোষ অর্থাৎ স্বামী পাগল হওয়া বা দুরারোগ্য স্থায়ী ব্যাধিতে স্বামী আক্রান্ত হওয়া, এক বছর বা ততোধিককাল নিখোঁজ থাকা ইত্যাদি। স্ত্রী কর্তৃক এই বিবাহ-বিচ্ছেদকে পরিভাষায় *খোলা তালাক* বলা হয়। এ মর্মে বলা হয়েছে, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তারা উভয়ে কোন মীমাংসা ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, এটা দোষের ব্যাপার নয়।[১৩] তবে যদি স্ত্রী আশঙ্কা করে যে, স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহর সীমারেখায় অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই।[১৪]

ইসলামের এই পদক্ষেপ ইনসাফভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ Asghar Ali বলেন[১৫] "Islam is probably the first religion in the world to have recognized such a right. It is called *khula,* which literally means to disown or to repudiate, for a woman can repudiate her marriage." "ইসলামই সম্ভবত বিশ্বের প্রথম

---

[১].আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৪।
[২]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৫।
[৩]. মূল আরবী [تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين] *কানজুল উম্মাল*, কিতাবুন নিকাহ, খ.০৯, পৃ. ১১৬১, হাদীস নং ২৭৮৭৩।
[৪]. মূল আরবী [أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ২২২৬।
[৫]. তালাকের <u>ইদ্দত</u> তিন কুরূ'।'কুরূ' দ্বারা হয়েয(ঋতুস্রাব) বা তুহূর(পবিত্রাবস্থাকে বুঝানো হয়েছে)। স্বামী মারা গেলে ইদ্দত চার মাস দশ দিন, এবং গর্ভবতীদের জন্য সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত; আর যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছে কিংবা যাদের ঋতুস্রাব হয়নি তাদের ইদ্দত তিন মাস।. উল্লেখ্য যে, স্বামীর সাথে নির্জনবাস করা নারীর জন্যই ইদ্দত পালন বাধ্যতামূলক।[আল-কুরআন ২:২২৮,২৩৪; ৬৫:৪,] তাই যাদের সাথে বিবাহের পর নির্জনবাস হয়নি তাদের কোন ইদ্দত নেই। [আল-কুরআন ৩৩:৪৯]
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৯; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৩১; ৬৫:০২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ০১।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩০।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৯,২৩৬, ২৩৭, ২৪১; আল-কুরআন ৬৫:০৭।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৯; আল-কুরআন০৪: ১৯-২০।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩১-২৩২, আল-কুরআন ৬৫:০৬।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৮।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ১২৮।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৯।
[১৫].Engineer,Asghar Ali, *The Right of women in Islam* (London : C.Hursts company,2nd Imp.1996), P.136.

ধর্ম যেখানে নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত। একে খোলা তালাক বলে। যার পারিভাষিক অর্থ অস্বীকার করা বা ত্যাজ্য করা। মহিলা ইচ্ছা করলে তার বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারে। ”

❑.সন্তানের অধিকার প্রদান (حقوق الاولاد):

সন্তান হলো মানব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, চোখের প্রশান্তি ও সৌভাগ্যের উপকরণ।[১] দাম্পত্য জীবনের একটি বড় উদ্দেশ্য সন্তান জন্ম দান। আর সন্তানের জন্ম দানের সাথে সাথে পিতা-মাতার ওপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যও বর্তায়। যেমন, সন্তানের জন্মগত বৈধতা রক্ষা, সুন্দর নাম রাখা, আকীকা[২] করা, খাৎনা করা, উত্তমভাবে প্রতিপালন, দ্বীন শিক্ষা দেয়া, সমাজের সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ দেয়া ইত্যাদি।
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রথম কর্তব্য হলো, গর্ভধারণের জন্য পূণ্যবতী মাতা নির্বাচন। উমর রা কে তাঁর কোন এক ছেলে প্রশ্ন করেছেন, ছেলের প্রতি পিতার কি দায়িত্ব রয়েছে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, পিতার দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি যেন সন্তানের মাতা নির্বাচনে ভুল না করেন,তার সুন্দর নাম রাখেন এবং তাকে কুরআন শিক্ষা দেন।[৩]

সন্তান গর্ভে আসার পর তার জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কুরআন সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে তাকিদ দিয়েছে। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা কিংবা অন্যায়ভাবে গর্ভপাত না করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا “দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিয্ক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।”
কেউ অন্যায়ভাবে সন্তান হত্যা ও গর্ভপাত করলে সে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে এবং এক্ষেত্রে সে পরকালে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৫] এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৬] -وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ-بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ- “যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।”

পুত্র সন্তানের জন্মগ্রহণে খুশী হওয়া আর কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণে মুখ মলিন করা শুধু ইসলামী শিক্ষা বিরোধী নয়, বরং তা মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য।[৭] ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে বৈষম্য করা অন্যায়। পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে স্বাগত জানানো ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। আনাস (রা.) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন[৮], ‘কোন ব্যক্তি যদি প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত দু’টি কন্যার লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে আমি ও সেই ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্রে থাকব’। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে ধরলেন।

শিশুর অধিকার অন্যতম অধিকার মায়ের দুধ পান করা। সন্তানের জন্মের পর থেকে সাধারণভাবে দু’বছর পর্যন্ত দুধ পান করানো মাতার ওপর কর্তব্য। শিশু দুর্বল হলে সর্বোচ্চ আড়াই বছর দুধ পান করানো যেতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৯]– وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ “আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করার সময় পূর্ণ করতে চায়।”
এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, শিশুকে স্তন্যদান মাতার উপর ওয়াজিব। কোন অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে গোনাহ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব।...স্তন্য দানের পূর্ণ সময় দু’বছর, যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে বন্ধ করার প্রয়োজন না হয়, তবে তা বাচ্চার অধিকার।... স্তন্য দানের সময়সীমা দু’বছর ঠিক করা হয়েছে। এরপর মাতৃস্তনের দুধ পান করানো চলবে না। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত এবং হাদীসের আলোকে ইমাম আবূ হানিফা (র.) শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর পর্যন্ত এ সময়সীমাকে বর্ধিত করেছেন। আড়াই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃস্তন্যের দুধপান করানো সকলের ঐক্যমতে হারাম।[১০]

পিতার দায়িত্ব হলো স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা। সন্তান প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়ে কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত এ দায়িত্ব পিতার ওপর বর্তায়। মহান আল্লাহ বলেন-[১১] وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا “আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না।” এ আয়াতের ব্যাখায় আল্লামা শাওকানী বলেন,“সন্তান ও

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৪৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৫:৭৪, ১৯:০৭।
[২]. আকীকা: নিয়তের সাথে নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে সন্তান জন্ম লাভের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যে পশু জবেহ করা হয় তাকে আকীকা বলে।–*আল-মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ*, বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৩) খ.০২, পৃ.২৯।
[৩]. ড.আল-হুসাইনী হাশিম, ড. সা‘দ যাল্লাম ও অন্যান্য, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা, প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ ১৭: আয়াত ৩১, আল-কুরআন ৬:১৫১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬: আয়াত ১৪০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাক্ভীর ৮১: আয়াত ০৮-০৯।
[৭]. আল-কুরআন ১৬: ৫৮, ৪৩:১৭।
[৮].মূল আরবী [من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৬৩১।
[৯]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.৫৪৭-৫৪৮।.
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩৩; আড়াই বছর দুধ পান করানো বিধান দেখুন, আল-কুরআন ৪৬:১৫।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩৩।

স্ত্রীর ব্যয়ভার ও খোরপোষের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর ওয়াজিব, তবে তা হবে লোকের সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী। এ ব্যাপারে পিতাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের এমন বোঝা চাপানো যাবে না, যা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।"[১] তালাকপ্রাপ্তা জননীদের খোরাক ও পোষাকের দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর অর্পিত। এ ব্যাপারে অমিতব্যয়ী হবে না, আবার কৃপণতাও করবে না। বরং ন্যায়-নীতি অনুসারে মধ্যমপন্থা অবললম্বন করবে। যেন সে মহিলা সুস্থ ও সবল হয়ে যথাযথভাবে সন্তানের সেবা-যত্ন করতে সক্ষম হয়।[২]

নিজের ব্যাপারে বা নিজ পরিবার ব্যাপারে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য না করা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন-[৩]

> তুমি নিজেকে দিয়ে শুরু করো। নিজেকে দান করো। যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা নিজ পরিবারের জন্য রাখো। তোমার পরিবারের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা তোমার আত্মীয়দের জন্য। তোমার আত্মীয়দের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা পর্যায়ক্রমে প্রতিবেশীদের মধ্যে যে যত নিকটের তার জন্য।

পরিবার ও সন্তানের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের অর্থব্যয় একটি উত্তম সাদাকা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[৪]

> এক দীনার যা তুমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেছো, আরেকটি দীনার যা তুমি কোন গোলামকে আযাদ করতে ব্যয় করেছো, আরেকটি দীনার যা তুমি ভিক্ষুককে দান করেছো এবং আরেকটি দীনার যা তুমি পরিবারের লোকদের জন্যে ব্যয় করেছো, এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক পুরস্কার ও সওয়াবের অধিকারী ঐ দীনার যা তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্যে ব্যয় করেছো।

সন্তানের প্রতি সদয় হওয়া ও কোমল আচরণ করা। সন্তানের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, এক ভিখারিণী দু'টি কন্যা সংগে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু'ভাগ করে কন্যা দু'টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নাবী (সা.) আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেন, যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোন পরীক্ষা করা হয় তবে সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে।[৫]

একাধিক সন্তানের মধ্যে সমতা বিধান করা। এ সমতা হবে খাবার, পোষাক, অর্থ-সম্পদ, আদর-ভালবাবাসা ইত্যাদি সবক্ষেত্রে। একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে সমতা প্রসংঙ্গে নু'মান ইবন বাশীর রা. বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু সম্পদ দান করেন। কিন্তু আমার মা বললেন, আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না, যতক্ষণ না আপনি রাসূল সা. কে সাক্ষী রাখেন। এরপর আমার পিতা আমাকে নিয়ে নাবী সা. এর কাছে গেলেন, আমার দানের উপর তাঁকে সাক্ষী রাখার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি তোমার সকল সন্তানের সাথে কি এরূপ করেছ? তিনি বললেন, না। তখন তিনি সা. বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। তখন আমার পিতা চলে আসেন এবং সে দান ফিরিয়ে নেন।[৬]

সন্তানদের ধন-সম্পদ ও উত্তারাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করা। সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রা. তাঁর সমুদয় সম্পদ ওসীয়তের মাধ্যমে দান করতে চাইলে রাসূল সা. তা থেকে তাঁকে বিরত রাখেন এবং বলেন–"তোমার ওয়ারিছকে তোমার মৃত্যুর পর অপরের কাছে হাত পাতার অবস্থায় রেখে যাওয়া অপেক্ষা স্বচ্ছল করে রেখে যাওয়া তোমার জন্য উত্তম।"[৭]

উপযুক্ত বয়সে ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। কিন্তু আজকাল পিতা-মাতার উচ্চ শিক্ষার নামে এ বিষয়টি উপেক্ষা করেন। ফলে যুবক ছেলে-মেয়েরা অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এজন্য পিতা দায়ী হবে। নাবী(সা.) বলেন,-[৮] কারো কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব শিক্ষা দেয়। অতঃপর যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয় যেন বিবাহ দেয়। যদি সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার বিবাহ না দেয় তবে সে কোন পাপ করলে সেই পাপ পিতার উপর বর্তাবে।

❑.সন্তানদের নৈতিক চরিত্র গঠন, সুশিক্ষা ও সদুপোদেশ প্রদান (تعليم الاولاد):

শিশু-কিশোররাই পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির আগামী দিনের কর্ণধার। তাদের সঠিকভাবে চরিত্র গঠন না করতে পারলে সুন্দর সমাজ গঠন সম্ভব নয়। তারা বিপথগামী হলে তা পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সবার জন্যই ক্ষতি বয়ে আনবে। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো নিজ সন্তানদের উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনে সুশিক্ষা ও সদুপোদেশ প্রদান করা। তাদের মধ্যে সততা-সত্যবাদিতা, বিনয়-নম্রতা, কোমলতা, মানবিকতা, ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মান, লজ্জাশীলতা, সরলতা-

---

[১]. ইমাম শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (বৈরুত:দারুল ফিকর, তা.বি.), খ.০১, পৃ.২৪৫।

[২]. মুহাম্মদ 'আলী সাবুনী, *সাফওয়াতুত্ তাফাসীর*, http://www.almeshkat.net খ.১, পৃ.৯৩।

[৩].মূল আরবী[ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ২৫৪৬।

[৪].মূল আরবী[دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হা. ৯৯৫।

[৫]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৫২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২৬২৯।

[৬].মূল আরবী[إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجعه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হিবাত, হা. নং ১৬২৩।

[৭].মূল আরবী[إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, হা. নং ২৫৯১।

[৮].মূল আরবী "من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه" *মিশকাত*, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং ৩১৩৮।

অকপটতা, মধ্যপন্থা, ধৈর্য-সহনশীলতা, লজ্জাস্থান হিফাযত, নৈতিক দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ, দানশীলতা ইত্যাদি মহৎ চরিত্র সৃষ্টি করা। তাদের মধ্যে অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, মিথ্যাচার, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, গীবত, মিথ্যা অপবাদ, চোগলখুরী, অকৃজ্ঞতা, ওয়াদাভঙ্গ, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা, প্রতারণা, ভোগ-বিলাস, অপচয়-অপব্যয়, কৃপণতা ইত্যাদি মন্দ চরিত্রের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা। তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা যে, তারা যেন ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠে, শিরক, কুফর, নিফাক, রিয়া, বিদ'আত থেকে মুক্তি লাভ করতে সচেষ্ট হয়। তাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা। কুরআন এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে কুরআন লোকমান আ.কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে উপদেশ একটি মডেল হিসেবে তুলে ধরেছে। ইরশাদ হচ্ছে[১]

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .... يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ- يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ- وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ- وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'হে বৎস, আল্লাহর সাথে শির্ক করো না; নিশ্চয় শির্ক বড় যুল্ম'।... 'হে বৎস, নিশ্চয় কোন কিছু যদি সরিষা দানার পরিমাণ হয়, আর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আকাশে বা ভূগর্ভে থাকে, আল্লাহ তাও হাজির আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ'। 'হে বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় এটা তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। 'আর তুমি অহংকারবশে মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না'। 'আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করবে; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট স্বর হল গাধার কণ্ঠস্বর '।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে এ শিক্ষা পাই যে, প্রত্যেক পিতার উচিত নিজ সন্তানকে তাওহীদ, ঈমান, সালাত, তাকওয়া, ধৈর্য, সততা, ভদ্রতা-নম্রতা, সৎ সাহস ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা প্রদান করা এবং শিরক, কুফর, অহঙ্কার, দম্ভ, অভদ্রতাসহ সব ধরণের মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন[২], "কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চেয়ে অধিক উত্তম কোন জিনিস দিতে পারে না।"

সন্তান জন্ম দিয়ে ভরণ-পোষণ দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। বরং ভালো পরিবেশে সন্তানের উন্নত নৈতিক চরিত্র, অভ্যাস, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আচার-আচরণ, ভদ্রতা-নম্রতা, মন-মানসিকতা, জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পিতা-মাতার। উমর ইবন আবূ সালমা (রা.) বলেন, "আমি শৈশবে রাসূল (সা.)-এর গৃহে ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে যাচ্ছিল। তখন রাসূল (সা.) আমাকে বললেন[৩], 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হ'তে খাও।" তিনি আরো বলেন[৪], "পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তাদের জন্য শিষ্টাচার।"

সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে উত্তম চরিত্র অর্জন এবং মন্দ চরিত্র বর্জনের সুশিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পিতা-মাতার।[৫] পিতা-মাতা সন্তানকে যে শিক্ষা দেবে এবং যেভাবে গড়ে তুলবে সন্তান সে অনুযায়ী গড়ে উঠবে। সাধারণত পিতা-মাতার স্বভাব-চরিত্রের উপর সন্তানের স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে। এজন্য পিতা-মাতাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হ'তে হবে। বস্তুত প্রতিটি শিশুর মধ্যে উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। পিতামাতা এ ব্যাপারে যত্নবান হলে এবং পরিবেশ অনুকূল থাকলে শিশুর মধ্যে উত্তম চরিত্রের বিকাশ ঘটে। পিতামাতা এ ব্যাপারে যত্নবান না হলে এবং পরিবেশ অনুকূল না থাকলে শিশুর চরিত্র ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়। আর এ দিকে ইঙ্গিত করে নাবী সা. বলেছেন-[৬] "প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিতরাত তথা ভালো, নিষ্পাপ ও ইসলামের স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।"

সন্তানদের প্রচলিত শিক্ষার সাথে আকীদা-বিশ্বাস ও দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান পিতা-মাতার বিশেষ কর্তব্য। সন্তানকে দ্বীন পালনের অনুশীলন করানো, সততা, সত্য ও ন্যায় অবলম্বন এবং অন্যায়, অসত্য ও বিপথ থেকে ফিরিয়ে রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন[৭]–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে।"

–এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে[৮]–"স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও দাস-দাসীকে ফরযকাজসমূহ এবং হালাল-হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ

---

১. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৩,১৬-১৯।
২.মূল আরবী [ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৫২।
৩.মূল আরবী[يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুল আতয়িমাহ, হা.নং ৫০৬১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আশরিবাহ, হা. ২০২২।
৪.মূল আরবী [ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৫,পৃ.২৩৮, হাদীস নং ২২১২৮।
৫. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৮-১৯, আল-কুরআন ৩৩:৫৯, ৬৬:০৬।
৬.মূল আরবী [كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراه أو يمجسانه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১৩১৯; ***মুসলিম*, হা. ২৬৫৮**।
৭. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্রীম ৬৬: আয়াত ০৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩১:১৭।
৮. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ২৮, পৃ.১৫৬।

সা. বলেন–"তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে পদার্পণ করলে তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও। তারা দশ বছরে পদার্পণ করলে নামায পড়ার তাদেরকে শাসন করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[১]

কাজেই প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কর্তব্য হল, স্বীয় সন্তান-সন্তুতি ও পরিবার-পরিজনকে দ্বীনের শিক্ষা দান করা এবং পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করা। এটা মহান আল্লাহর নির্দেশ। নাবী-রাসূলগণ স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এরূপ নির্দেশ দিতেন। এটা মূল্যবোধ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। মহান আল্লাহ বলেন[২]–وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا-"আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক।"

সন্তানদের কথায় কথায় তিরস্কার, বদ দু'আ ও গালমন্দ না করা। তাদের ভুল-ত্রুটিসমূহ উত্তম পন্থায় সংশোধন করা। সন্তানেরা যাতে বিপথগামী না হন সেজন্য তাদের প্রতি পিতামাতার সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা করা। সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি পিতা-মাতার উচিত সন্তানের কল্যাণের জন্য দু'আ করা। কুরআন এই শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছে-[৩] رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ–"হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো'আ কবূল করুন'।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৪], رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।"

সন্তানদের নৈতিক চরিত্র গঠন করণীয়: ক.সদগুণাবলীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও উৎসাহ প্রদান এবং অসদগুণাবলীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি ও প্রয়োজনে শাসন করা। খ.অপসংস্কৃতি ও মন্দ পরিবেশ দূরে রাখা এবং এর মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নৈতিক শিক্ষা দান। গ.উত্তম আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার শিখানো। ঘ. আত্মত্যাগ, পরিশ্রমী ও কর্মঠরূপে গড়ে তোলা। ঙ. নাবী-রাসূল ও পুণ্যবানদের জীবনী চর্চা, ছ. তাদের হাত দিয়ে দান করানো ইত্যাদি।

❑. পিতা-মাতার অধিকার আদায় (حقوق الولدين):

পিতা-মাতা সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম এবং সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। জন্ম থেকে যৌবনে পদার্পণ পর্যন্ত পিতা-মাতা সন্তানের জন্য অপরিসীম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করেন। মহান আল্লাহর পরে পৃথিবীতে মানুষের প্রতি তাদের অনুগ্রহ সর্বাধিক। তাই ইসলাম পিতা-মাতার অধিকারের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআনে মহান আল্লাহর ইবাদতের পরই পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫]-

> وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاًكَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
>
> "আর তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও।" অন্যত্র বলেন[৬]- وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদচারণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তাকে দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসর বয়সে। সুতরাং আমরা প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌র হকের সাথে পিতা-মাতার হক পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে পিতা-মাতার মর্যাদা অনুমান করা যায়। প্রথম আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি ইহসান আর দ্বিতীয়টিতে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত ইহসান ও শুকর ব্যাপক বিষয়। এতে শামিল পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, তাদের সেবা-যত্ন করা, আনুগত্য করা, সম্মান প্রদান করা, তাদের প্রতি সদয় হওয়া। তাদের সাথে অসম্মানসূচক আচরণ না করা এবং এমন ভাষায় কোন কথা না বলা কিংবা এমন কোন আচরণ না করা যা তাদের মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে। তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং প্রয়োজনে ভরণ-পোষণ প্রদান করা। মোটকথা, তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সব পন্থা অবলম্বন করা।

পিতা-মাতার আনুগত্য করা এবং আদেশ-নিষেধ পালন করা। কখনই তাদের অবাধ্য না হওয়া কিংবা অসদাচরণ না করা। তবে তারা যদি ইসলাম বিরোধী নির্দেশ দেয় তা পালন করা যাবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে-[৭]

> وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

---

[১].মূল আরবী [مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুস সালাত, হা.নং ৪৯৫।

[২]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১৩২; আরও দেখুন,আল-কুরআন ১৯:৫৪-৫৫, ২৬:২১৪।

[৩]. আল-কুরআন (১৪:৪০)

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ৭৪।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৩-২৪; আরও দেখুন,আল-কুরআন ৪:৩৬; ৪৬:১৫, ২:৮৩; ৬:১৫১।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা লুক্‌মান ৩১: আয়াত ১৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা লুক্‌মান ৩১: আয়াত ১৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৯:০৮।

“আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শির্ক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। আর অনুসরণ কর তার পথ,যে আমার অভিমুখী হয়।”

পিতা-মাতা কাফির-মুশরিক হলেও তাদের সাথে কোন অবস্থায় অসম্মানসূচক আচরণ না করা যাবে না। এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম(‘আ.)। যিনি স্বীয় মুশরিক পিতার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যতার পরিচয় দেন।[১] হাদীসেও অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে।[২] পিতামাতা অবিচার করলেও সন্তানের জন্য তাদের সাথে অসদাচরণ করার কোনই অবকাশ নেই। মু’আয ইবন জাবাল(রা.) কে রাসূল (সা.) গুরুত্বপূর্ণ দশটি বিষয়ের উপদেশ দেন, তন্মধ্যে এই বিষয়টি অন্যতম। মু’আয(রা.) কে উদ্দেশ্য করে রাসূল(সা.) বলেন[৩]–

> ক.আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এমনকি যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। *খ.কখনো নিজ পিতামাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে পরিবার-পরিজন থেকে বের হয়ে চলে যাওয়ার এবং ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ দেয়।* গ.কখনো ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায ছেড়ে দেবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক কোন ফরয নামায ত্যাগ করে তার উপর থেকে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দায়িত্ব উঠিয়ে নেয়া হয়। ঘ. কখনো মদ পান করবে না। কারণ এটা যাবতীয় অশ্লীলতার মূল। ঙ.সাবধান! সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা গুনাহের সাথে সংযুক্তি আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত হওয়ার কারণ। চ. সাবধান! রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবে না। যদিও সব লোক মরে সাফ হয়ে যায়। ছ. যখন লোকেরা মহামারীতে আক্রান্ত হয় আর তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাক তখন সেখানে অবিচল থাকবে। জ. নিজ সামর্থ্য অনুসারে পরিবার পরিজনের জন্য মুক্তভাবে ব্যয় করবে। ঝ. পরিবারস্থ লোকজনকে আদব শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাসনদণ্ড তাদের থেকে কখনো সরাবে না। ঞ. এবং সর্বদা তাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন অব্যাহত রাখবে।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, তাদের কৃত ওয়াদা ও ওসীয়ত পালন করা, ঋণ আদায় করা, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচারণ করা, তাদের জন্য দু’আ করা। ইরশাদ হচ্ছে[৪]- وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيرًا “এবং বল ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।”

> জ্ঞানীদের মতে, পিতা-মাতার হক দশটি। ক.তাদের কারো খাদ্যের প্রয়োজন হলে তাকে খাদ্য দান করা। খ.পোষাকের প্রয়োজন হলে সামর্থ্য থাকলে তাদের পোষাক দান করা। গ.ডাকলে ডাকে সারা দেয়া ও উপস্থিত হওয়া। ঘ. গুনাহ ব্যতীত তারা কোন আদেশ করলে তা পালন করা। ঙ.তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা, রূঢ় ভাষায় কথা না বলা। চ. তাদের নাম ধরে না ডাকা। ছ. তাদের পিছনে চলা। জ. নিজের জন্য যা পছন্দ করা তাদের জন্যও তা পছন্দ করা, নিজের জন্য যা অপছন্দ করা তাদের জন্যও তা অপছন্দ করা। ঞ. নিজের জন্য যখন দু‘আ করা তাদের জন্যও তখন দু‘আ করা। ট. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু‘আ ও ইস্তিগফার করা। ঠ. তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ড. তাদের ঋণ পরিশোধ করা এবং অঙ্গীকার কার্যকর করা।[৫]

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের গুরুত্ব অপরিসীম। পিতা-মাতার সন্তুষ্টি দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। তাদের অসন্তুষ্টিতে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এটা জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর মাধ্যমে নানাবিধ পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা যায়। এর দ্বারা পার্থিব রুজি-রোজগারে বরকত আসে এবং অকল্যাণ দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৬], “পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ আয়ুকে বৃদ্ধি করে দেয়।”পিতা-মাতার সেবা করা অনেক পূণ্যের কাজ। এ মর্মে হাদীসে এসেছে[৭]- ‘জনৈক ব্যক্তি জিহাদে(ফরযে কিফায়া অবস্থার জিহাদ) যাওয়ার অনুমতি চাইলে রাসূল (সা.) তাকে স্বীয় মায়ের সেবা করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, জান্নাত তার দু’পায়ের নীচে।’

❑.পর্দার বিধান পালন (الحجاب) :

‘পর্দা’ শব্দটি ফার্সী শব্দ, এর আরবী প্রতিশব্দ হিজাব। সাধারণতভাবে একজন প্রাপ্ত বয়স্কা নারী কর্তৃক তার সমস্ত শরীরকে শালীন কাপড়ে আবৃত করা পর্দা মনে করা হয়। কিন্তু পর্দা শুধু শালীন কাপড় বা বোরকা দ্বারা শরীর আবৃত করার নাম নয়, বরং বিষয়টি আরও ব্যাপক। সমস্ত শরীর আবৃত ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি সংযত রাখা, পরপুরুষের সামনে না যাওয়া, অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে নীতিমালা রক্ষা করা–ইত্যাদি সবই পর্দার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা মার্‌ইয়াম ১৯: আয়াত ৪১-৪৭।

[২].আসমা বিনত আবূবকর রা. বলেন যে, তার মা মুশরিক অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাত করতে মদীনায় আসেন, তখন তিনি নাবী সা. কে জিজ্ঞাসা করেন ‘আমি কি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখব। নাবী সা. বললেন, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো। –*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল হিবাহ, হা. নং২৪৭৭; *সহীহ মুসলিম*, হা.১০০৩।

[৩]. মূল আরবী [أوصاني رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز و جل وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৩৮, হাদীস নং ২২১২৮।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ ১৭: আয়াত ২৪; আরও দেখুন ,আল-কুরআন ১৪:৪১, ৭১:২৮।

[৫] . আবূ লাইছ সমরকান্দী, *তানবীহুল গাফিলীন* (আল-কাহিরাহ : মাকতাবাতুল ঈমান বিল মানসুরিয়াহ, ইমাম জামিআতুল আযহার, ১ম প্রকাশ,১৯৯৪)।

[৬] .মূল আরবী [بر الوالدين يزيد في العمر] হাফিজ মুনযিরী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.৩৬৯, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৪৬২।

[৭] . *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং৩১০৪।

পর্দা ইসলামী মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক নিদর্শন। পর্দা ব্যক্তিগত জীবনের সীমিত কিংবা বাসগৃহের সাথে সম্পর্কিত কোন কৃষ্টি নয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিমণ্ডলে এর ব্যাপ্তি রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, অফিস-আদালত, হাট-বাজার ও যানবাহনে সর্বত্র এটা আবশ্যক। একজন নারীদের জন্য মাহরাম পুরুষ, মুসলিম নারী ও ছেলে শিশু ছাড়া অন্য সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে পর্দা রক্ষা করা ফরজ। অনুরূপভাবে একজন পুরুষদের জন্য মাহরাম নারী, ক্রীতদাসী ও মেয়ে শিশু ছাড়া অন্য সকল প্রাপ্তবয়স্কা নারীর সাথে পর্দা রক্ষা করা জরুরী।

নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ সহজাত। উভয়ের দৈহিক গঠনগত ভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কাঠামো অধিক আকর্ষণীয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় দৃষ্টিশক্তি অপব্যবহার ও মন কলুষিত হয়। এতে সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, নারীর লজ্জাশীলতা বিলোপ হয়, পুরুষেরা ফিতনায় পতিত হয়। সমাজে ব্যভিচার, নারী-পুরুষের বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক, পরকীয়া ইত্যাদি অনৈতিক কর্ম বৃদ্ধি করে। এ কারণে সমাজ থেকে অশ্লীলতারোধে কুরআন নৈতিক পবিত্রতার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সমাজ থেকে অশ্লীলতার অনুপ্রবেশরোধ, শালীনতা রক্ষা, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে পর্দার বিধান দিয়েছে। ব্যক্তি ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষায় পর্দার বিধান একটি যুগান্তকারী পরীক্ষিত বিধান। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

পর্দার ক্ষেত্র ও নৈতিক নীতিমালা: কুরআন পর্দার ক্ষেত্র নির্ধারণসহ এ সম্পর্কিত সুষ্ঠু নীতিমালা প্রদান করেছে। যা নিম্নে-
ক.শালীন কাপড়ে সতর(শরীর) আবৃত করা: প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের জরুরী বিষয় হলো শালীন কাপড়ে মার্জিতভাবে সতর[১] (সম্পূর্ণ শরীর) ভালোভাবে আবৃত করা। পাতলা, অশালীন ও আটোসাট পোষাক পর্দার ক্ষেত্রে অন্তরায়। গৃহের বাইরে নারীদের এ ধরনের পোষাক সমাজে অনৈতিকতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের বিস্তার ঘটায়। এজন্য কুরআন একজন নারীর গৃহের বাইরে বের হওয়ার পূর্বে শালীন পোষাকে পর্দার সাথে বের হতে নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
"হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়াদংশ নিজের উপর টেনে দেয়। তাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।" এ প্রসঙ্গে আয়েশা রা. বলেন3–একদা আসমা বিনত আবূ বকর রা. পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল সা. এর নিকট আসলেন। তখন রাসূল সা. অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন–'হে আসমা! মেয়েরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়। তবে কেবল এ ছাড়া, এই বলে তিনি মুখ ও হাতের কব্জিদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন।'

খ.দৃষ্টিশক্তি সংযত ও অন্তরের পবিত্রতা : দৃষ্টিশক্তির হিফাযত ও অন্তরের পবিত্রতা পর্দার বিশেষ দিক। মানুষ কোনভাবেই দৃষ্টিশক্তি থেকে অমুখাপেক্ষী নয়। এর দ্বারা মানুষ তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সহায়তা নেয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার মানুষকে অনৈতিকতার দিকে ধাবিত করে। যে সব গুনাহ অন্তরকে নষ্ট করে দেয় এবং অন্তরের আলোকে মিটিয়ে দেয় তন্মধ্যে নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত অন্যতম। এ কারণে মহান আল্লাহ বলেন-[৪] قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... . وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ "মু'মিনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ...আর মু'মিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।" এজন্য হাদীসে দৃষ্টিকে শয়তানের তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ স্থানে পতিত হওয়া থেকে হিফাযত করবে মহান আল্লাহ তার দৃষ্টিকে কার্যকর এবং অন্তরকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করবেন। তার অন্তরকে পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য শক্তিশালী করে দেবেন। রাসূল সা. বলেছেন[৫]– "দৃষ্টি শয়তানী তীর সমূহের মধ্যে একটি তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখে, আল্লাহ তার অন্তরে এমন ঈমানের জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন যে, সে তার স্বাদ অনুভাব করে থাকে।"

দৃষ্টিশক্তির অপব্যবহার রোধে রাসূল সা. তাঁর সাহাবাগণকে রাস্তায় বসতে নিষেধ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৬]

> তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলল্লাহ্ ! রাস্তার উপর বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই কেননা সেখানে আমরা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলি। তিনি বললেন, একান্তই যদি তোমাদের তা করতে হয়, তবে রাস্তাকে তার প্রাপ্য হক দিবে। তাঁরা বললেন, এর হক কি ? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।

উল্লেখিত হাদীসের শিক্ষা হল, দৃষ্টিকে নিরর্থক বিষয়ে নিবন্ধ করা উচিত নয়; যদিও তা মুবাহ হোক বা না হোক। এবং নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে যদিও তা যতই কঠিন হোক না কেন। কখনও পথ চলতে গিয়ে

---

[১]. **সতর :** প্রাপ্ত বয়স্ক নারী বা পুরুষের শরীরের যতটুকু অংশ আবৃত করা ফরয তাই সতর। নারীর সতর: যাদের সাথে বিবাহ বৈধ এমন পুরুষের সামনে নারীর সমস্ত দেহই সতর অর্থাৎ এক্ষেত্রে শালীন কাপড়ে সম্পূর্ণ শরীর ভালোভাবে আবৃত করা ফরয। আর যাদের সাথে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ এমন (১৪ প্রকার)পুরুষের সামনে নারীর সতর হলো-মুখমণ্ডল, মাথা, চুল, গলা ঘাড়, বাহু ও পা ছাড়া দেহের বাকি অংশ। আর পুরুষের সতর হলো নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত করা।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩ : আয়াত ৫৯।
[৩]. মূল আরবী[يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৪১০৪।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩০-৩১।
[৫]. মূল আরবী[إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه] তাবারানী,*আল-মু'জামুল কাবীর*, খ.১০,পৃ.১৭৩, বাবুল 'আইন, হা. ১০৩৬২।
[৬]. মূল আরবী [إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق ؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩৩৩, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ২১২১।

কোন নারী সামনে পড়লে সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন-[১] "(অনিচ্ছাকৃত পরনারীতে দৃষ্টি পড়লে) তুমি প্রথম দৃষ্টির পর (দ্বিতীয়বার) আর দৃষ্টি দেবে না। কেননা তোমার জন্য (প্রথম দৃষ্টির ব্যাপারে ক্ষমার) অবকাশ আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির নয় (দ্বিতীয়বার দৃষ্টিতে পাপ ও অপরাধ হবে)।"

কোন নারী পরপুরুষের সাথে কোমল ও রসালো কণ্ঠে কথা না বলা। এতে করে শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২], إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا- "যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী বলেন–[৩]

> মানুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কোমল ও নরম করে বলো না, যেমন সন্দেহপূর্ণ মন্দ চরিত্রের মেয়েরা করে থাকে। কেননা এ ধরনের কথা বলাই অনেক সময় বড় ধরনের নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে। তারা বলবে সাধারণভাবে লোকদের কাছে পরিচিতি ও প্রচলিত কথা, যার মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র থাকবে না এবং যা হবে শরীয়াতের রীতিনীতি অনুযায়ী, যে কথা শুনে শ্রোতা অপছন্দও কিছু করবে না এবং পাপী ও চরিত্রহীন লোকেরা অবৈধ সম্পর্কের লোভে লালায়িতও হবে না।

পরপুরুষের সামনে না যাওয়া। মহিলাদের সাথে কোন সমগ্রী লেন-দেনের সময় পর্দার আড়াল থেকে করা। মহান আল্লাহ বলেন[৪]–وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "আর যখন নাবীপত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।"

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টি হিফাযত করাএবং অকারণে অন্যের সামনে না যাওয়া। এ মর্মে উম্মে সালামা রা.বলেন,

> একদিন আমি ও মায়মূনা রা. রাসূল সা. এর নিকট ছিলাম। তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইবন উম্মু মাখতুম রা. আসেন। আর এটা ছিল পর্দার বিধান নাযিলের পর। তখন তিনি বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর। তখন আমরা বলি, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। তখন রাসূল সা.বলেন, তোমরাও কি অন্ধ, তোমরা কি তাকে দেখছো না?[৫]

গ.অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা: ইসলামী সমাজে প্রতিটি গৃহ একটি সংরক্ষিত দুর্গ সাদৃশ্য। তাই ইসলামের বিধান হলো অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা। অনুমতি পাওয়া সাপেক্ষে সেই গৃহে প্রবেশ করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৬]–يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করও না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

অনুমতি প্রার্থনার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৭], 'অনুমতি প্রার্থনার সময় দরজার একপাশে দাঁড়াবে, যেন গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি না পড়ে।' তিনি আরও বলেন, (অনুমতিপ্রার্থী) ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল-হামদুল্লিাহ বলবে এবং গলা খাঁকর দিবে এবং এভাবে বাড়ীওয়ালাকে তার উপস্থিতি জানিয়ে দেবে।[৮]

এছাড়া কলিং বেল চাপ দিয়ে, গেট বা দরজা নক করেও অনুমতি প্রার্থনা করা যেতে পারে।

অনুমতি ছাড়া কারো গৃহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি না দেয়া। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৯], "যে ব্যক্তি অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহের অভ্যন্তরে তাকায় তবে গৃহবাসীর জন্য দৃষ্টিনিক্ষেপকারীর চক্ষুদ্বয় ফুটা করা বৈধ" (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় এসেছে "এরূপ দৃষ্টিদানকারী ব্যক্তির প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে চোখ উপড়ে ফেললে, কোন অপরাধ হবে না" (বুখারী)।

গৃহকর্তার অনুপস্থিতি বা তিনবার কড়া নাড়ার পরও বাসার ভিতর থেকে অনুমতি না পেলে অন্যের গৃহে প্রবেশ না করা। কারো বাস গৃহে প্রবেশের বিধান সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছেন–"অনুমতি প্রার্থনা করবে তিন বার। যদি অনুমতি দেয় হয় তবে গৃহে প্রবেশ করবে তা না হলে ফিরে যাবে।"[১০] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১১]–فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তা হলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে

---

[১]. মূল আরবী [لا تتبع النظرة النظرة فإنض لك الأولى وليست لك الآخرة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হা. নং ২১৪৯; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আদব, হা. ২৭৭৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩ : আয়াত ৩২।
[৩]. আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (বৈরুত:দারুল ফিকর, তা.বি.), খ.০৪, পৃ.২৭৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩: আয়াত ৫৩।
[৫].মূল আরবী[كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب [فدخل علينا] فقال النبي صلى الله عليه و سلم " احتجبا منه " فقلنا يارسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم " أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ "] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, হা. নং ৪১১২; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আদব, হা.নং ২৭৭৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ২৭।
[৭].দেখুন, *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫১৭৪ ও ৫১৭৭।
[৮]. মূল আরবী [يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৩৭০৭।
[৯].মূল আরবী [من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عين] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ২১৫৮; *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত দিয়াত, হা.৬৫০৬।
[১০].মূল আরবী [إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইস্তেযান, হাদীস নং ৫৮৯১, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ২১৫৩।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ২৮।

তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" তবে জনবসত বিহীন গৃহে প্রবেশে ক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই।

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

"যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশ কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।"[১]

অযাথা অন্য কারো গৃহে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২] –

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নাবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নাবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না।"

ঘ. গৃহের অভ্যন্তরে পর্দা: নিজ গৃহের অভ্যন্তরে শালীনভাবে শরীর আবৃত রাখা। পাশ্চাত্য সমাজে স্বগৃহে মেয়েরা প্রায় অর্ধনগ্ন থাকে। ফলে তাদের মধ্যে অজাচার তথা ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়ের মধ্যে যৌনাচার ছড়িয়ে পড়েছে। এজন্য ইসলামের গৃহের অভ্যন্তরে পর্দার বিধান পালন বাস্তবসম্মত। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরের বিশ্রামের সময় ও 'ইশার সালাতের পর –এই তিন সময় গৃহের নির্জন কক্ষে দাস-দাসী, খাদেম, ছেলে-মেয়েরাও অনুমতি প্রার্থনা করবে। কেননা এ সময়গুলোতে মানুষ অসতর্ক অবস্থায় থাকতে পারে কিংবা স্বামী-স্ত্রী একান্তভাবে থাকতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে অবশ্যই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ, এবং 'ইশার সালাতের পর; এই তিনটি তোমাদের [গোপনীয়তার] সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি চায় যেমনিভাবে তাদের বায়োজ্যেষ্ঠগণ অনুমতি চাইত।

এ মর্মে হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার মায়ের কাছে প্রবেশ করতে অনুমতি চাইবো? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন হ্যাঁ। লোকটি বলল, উনি তো আমার সাথে ঘরে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার কাছে প্রবেশ করতে অনুমতি নিবে। আবার লোকটি বলল, আমি তো তার খাদিম। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার কাছে অনুমতি চাইবে। তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে? সে বলল, না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার কাছে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইবে।[৪]

ঙ.স্ব-গৃহে অবস্থান, প্রয়োজনে বাইরে বের হলে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা এবং পরনারী-পুরুষের সাথে নির্জনে অবস্থান না করা: মেয়েরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে, প্রয়োজন ছাড়া গৃহের বাইরে যাবে না। প্রয়োজনে যদি ঘর থেকে বের হতে হয় তবে তারা সাজগোজ করে নিজেদের রুপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মত *তাবাররুজ*[৬] সহকারে তথা নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।"

এখানে 'মেয়েরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে' এর ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী বলেন–[৭] 'তারা সাধারণত ও বেশীর ভাগ সময় নিজ গৃহে অবস্থান করবে, এবং তারা খুব বেশী বাইরে গমনকারিণী, লোকজনের ভীরে প্রবেশকারিণী ও পথে-ঘটে, হাটে-বাজারে ও লোকেদের ঘরে ঘরে যাতায়াতকারিণী হবে না।' তবে তিনি এ কথাও বলেন যে-[৮], "ঘরের অবস্থান করার নির্দেশ এবং বাইরে যাওয়ার নিষেধ শর্তহীন নয়। তা যদি হত, তাহলে রাসূল (সা.) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৫৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৫৮-৫৯।
[৪].মূল আরবী [أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال استأذن على أمي؟ فقال : نعم فقال الرجل : إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : استأذن عليها فقال الرجل : إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استأذن عليها أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا. قال: فاستأذن عليها *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, বাবুল ইস্তিযান, হা. নং ১৭২৯; *মিশকাত*, কিতাবুল আদাব, হা. ৪৬৭৪।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩ : আয়াত ৩৩।
[৬]. তাবাররুজ অর্থ– হাস্যলাস্য ও লালায়িত ভঙ্গিতে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শন করা, ভিন্ন পুরুষের মনে যৌনস্পৃহা জাগিয়ে তোলা, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরিধান–যা মেয়েদের শরীর আবৃত করে না, গলদেশ, কণ্ঠহার ও কানের দুল-বালার চাকচিক্য জাহির করা এবং এ ধরনেরই অন্যান্য কাজ। আয়াতে এ সবকেই নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এর ফলে আসে নৈতিক বিপর্যয় ও কবীরা গুনাহের দিকে পদক্ষেপ। -জামালুদ্দীন কাসেমী, *মাহাসিনুত তা'বীল* (*তাফসীর কাসেমী*) ।
[৭]. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, ২২ খণ্ড, পৃ.০৯।
[৮]. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ.২২, পৃ.০৯।

মহিলাদের নিশ্চয় হজ্জ ও উমরাহ্‌র জন্যে ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না, তাদেরকে জিহাদে সঙ্গে নিয়ে যেতেন না। আর মা-বাবার জন্যে সাক্ষাতের জন্য, রোগী দেখার জন্য এবং আত্মীয়দের শোকে শরীক হওয়ার জন্য তাদেরকে বাইরে যাওয়া উৎসাহিত করতেন না।"

ইমাম আল-কুরতূবী বলেন-[১], এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল, পূর্বতন জহেলী যুগের মেয়েরা যে গায়ের মুহাররাম পুরুষের (পর পুরুষ) সামনে হাস্য-লাস্য ও অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে চলাফেরা করত এবং নিজেদের সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রকাশ করে বেড়াতো যা শরীয়তে নাজায়েয তার বিরোধিতা করা। অতএব তারা ঘরেই অবস্থান করবে। তবে ঘরে বাইরে যাওয়ার সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিলে শরীর সম্পূর্ণভাবে ঢেকে বের হবে।

পরপুরুষের সামনে কোন মেয়ের রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ না করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[২]

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواعَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাদীন দাসী, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো নিকট নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে।

এখানে যে জীনাত বা সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে তা দু'ধরনের। একটি হচ্ছে সৃষ্টিগত, আর অপরটি উপার্জিত। সৃষ্টিগত সৌন্দর্য বলতে বোঝায় মুখমণ্ডল কেননা এটাই হচ্ছে নারীর সমস্ত রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস। নারী জীবনের মাহাত্ম, মাধুর্য এখানেই নিহিত। আর দ্বিতীয় উপার্জিত সৌন্দর্য হচ্ছে, যা মেয়েরা তাদের সৃষ্টিগত রূপ-সৌন্দর্যকে অধিকতর সুন্দর করে তোলবার জন্য কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করে যেমন- কাপড়, অলংকারাদি, সুরমা মাখা, চোখ, রং, খেজাব, মেহেদি। এ দু'রকমের জিনাতকেই পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করতে আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩]

বর্তমান সমাজের অধিকাংশ যুবতী মেয়েরা পর্দা করেন না, বরং নিজের সৌন্দর্য পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করে থাকেন। যখন সৌন্দর্য শেষ হয়ে মেয়েরা বৃদ্ধা হন তখন তারা কিছুটা পর্দা পালন করেন। অথচ কুরআন উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, যুবতীরা কোনভাবেই নিজের সৌন্দর্য পর পুরুষের সামনে প্রদর্শন করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বরং বৃদ্ধাদের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় আছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৪] وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে না,তাদের জন্য কোন দোষ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের কিছু পোশাক খুলে রাখে এবং এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।"

অনিষ্টরোধে ঘরের বাহিরে মেয়েরা মাথা ও বক্ষ চাদর দিয়ে ঢাকবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৫] –
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
"হে নাবী ! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টেনে দেয়। তাতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" এখানে "জিলবাব এমন একটা কাপড় যা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকা হয়।" "কেউ কেউ বলেন, ঐ সব আচ্ছাদন যা মেয়েরা পরিধেয় বস্ত্রের উপর পরে থাকে।"[৬]
অন্যত্র বলেন[৭]–وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ "তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"

• কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হবে না কিংবা নির্জনে অবস্থান করবে না:
এটা পর্দার একটি বিশেষ দিক। কেননা কোন পুরুষ নির্জনে কোন মহিলার সাথে একত্রিত হলে শয়তান সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাদের কু-কামনা-বাসনা জাগ্রত করে দেয়। ফলে তাদের মধ্যে নৈতিক পদস্খলন ঘটে। এজন্য নাবী (সা.) বলেন[৮] 'কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে মাহরাম সঙ্গী ছাড়া, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন

---

[১]. ইমাম আল-কুরতূবী, *প্রাগুক্ত*, খ.১৪, পৃ.১৭৯
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩১।
[৩]. ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল কুরআন* (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ , http://www.al-islam.com) খ.০৬, পৃ. ৬৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৬০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩ : আয়াত ৫৯।
[৬]. শিহাবুদ্দীন আলুসী, *রুহুল মা'আনী*, *প্রাগুক্ত*, খ.২২, পৃ.৮৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩১।
[৮]. মূল আরবী[لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৯৩৫।

মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে[১]- সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হলে সেখানে অবশ্যই শয়তান তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত হয় (পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)।

পর্দাহীনতার প্রধান কুফল: ক).অশ্লীলতার প্রসার ঘটে। খ).অহরহ চোখের যিনা ও পাপাচার। গ). অবৈধ ও পরকীয়া প্রেম সংঘটিত হয়। ঘ).ব্যভিচার, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। ঙ).অন্তর কলুষিত ও শক্ত হয়। চ). মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

পর্দা রক্ষায় করণীয়: ক).শালীন কাপড়ে ভালোভাবে সমস্ত শরীর ঢাকা, খ). নারী–পুরুষ নির্বিশেষে দৃষ্টি সংযত রাখা, গ).অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে পর্দার বিধান পালন করা। ঘ).সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে অশালীন পোষাকে চলাফেরা না করা। ঙ)নারী-পুরুষের ভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং আলাদাভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। চ) উন্মুক্ত স্থান, পুকুর বা নদীর ঘাট ও খোলা বাথরুমে নারী-পুরুষ একত্রে গোসল না করা। ছ).পরপুরুষের সাথে আকর্ষণীয়ভাবে কথা না বলা এবং সংক্ষেপে কথা বলা।

....

পরিরার মানুষের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এটা মানুষের নৈতিকতা চর্চার সুরক্ষিত দুর্গস্বরূপ। পারিবারিক জীবনে প্রেম-ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সহজেই উন্নত মূল্যবোধ উজ্জীবিত করা সম্ভব। পাশ্চাত্য সভ্যাতায় পরিবার ও পারিবারিক জীবন ব্যাপক ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের কুপ্রভাব দেখা দিলেও এখনো মুসলিমদের বেশীর ভাগ পরিবার শান্তির কেন্দ্রবিন্দু এবং একটি সুরক্ষিত দূর্গ। কুরআনের আংশিক মূল্যবোধ পালনেই এর মূল রহস্য।

---

[১]. মূল আরবী[ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হা.নং২১৬৫।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সমাজ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের প্রত্যেকেই একে অপরের সহায়ক। সমাজ কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না। ইসলাম মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছে। সালাত, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ 'আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার' প্রভৃতি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানই সমাজ-সমষ্টির মধ্য দিয়েই পালন করা হয়। এই সবের ফলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ছাড়াও সমাজে সার্বিক কল্যাণময় হয়ে থাকে। ইসলামে বৈরাগ্য বা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের অনুমতি দেয়নি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"*যে মুসলমান সমাজে বাস করে ও তার সাথে যে সব অন্যায় আচরণ করা হয় তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করে-সে ঐ সংসারত্যাগীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যার সাথে কোনো অন্যায় ব্যবহার করা হলে তা সে সহ্য করে না।*"[১] সমাজে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোক বাস করে। এদের সকলকে নিয়ে সমাজ গঠিত। কুরআন সমাজের মানুষের পরস্পরের মাঝে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য স্থির করেছে এবং পারস্পরিক কাঙ্ক্ষিত আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে ইসলাম যে সব মূলনীতি ও দায়িত্ব-কর্তব্য স্থির করেছে, তাছাড়া সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব নয়। মূলবোধ বিকাশ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে ইসলামের সেই দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ নিম্নে :

ইসলামী সমাজের নৈতিক ভিত্তি: কুরআনের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে সব মানুষ সমান। পৃথিবীর সব মানুষ আদম ও হাওয়া ('আ.) এর সন্তান।[২] আর আদম সন্তান হিসেবে সবাই পরস্পরে ভাই ভাই। তাদের প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা সমান। ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠলেও ইসলাম মানুষ হিসেবে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। সমাজের একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেয়। ইসলাম মুসলিমদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সুসম্পর্ক রক্ষার তাকিদ দেয়। হাদীসে এসেছে-[৩], একদা নাবী সা. কাছ দিয়ে জনৈক ইহুদীর শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি তা দেখে দাঁড়িয়ে যান। তাঁকে বলা হলো, এ তো এক ইহুদীর লাশ। তিনি বললেন, ইহুদী কি মানুষ নয়?

তবে ইসলাম ঈমান এবং কুফরের ভিত্তিতে মু'মিন-কাফির ও মুসলিম-অমুসলিম হিসেবে দু'টি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে পেশ করেছে।[৪] সমগ্র মানব জাতির ঐক্য ঘোষণার পর মানুষের এই বিভক্তির কারণ হল, ইসলামী বিধান অনুসারে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হয়। তাই যারা এই আর্দশ গ্রহণ করবে না তারা এই সমাজে শামিল হতে পারবে না। আর যারা এই আর্দশ গ্রহণ করবে তারা হবে এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রত্যেকের অধিকার ও মর্যাদা সমান। এক্ষেত্রে ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যের কোন কোন স্থান নেই। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -"নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন[৬] –'মুসলিমরা ভাই ভাই। একের ওপর অন্যের কোন মর্যাদা নেই তাকওয়ার বিচার ছাড়া'।

উল্লেখিত ভিত্তির আলোকে ইসলামী সমাজের নৈতিক নীতিমালা এবং মূল্যবোধ বিকাশে করণীয়সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো

❑. ভ্রাতৃত্ব, সদ্ভাব, সৌহার্দ (الاخواة):

ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক আদর্শ সমাজ নির্মাণ ও মূল্যবোধ বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ এমন প্রশংসনীয় গুণাবলী যা সমাজ জীবনকে শান্তিময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। কুরআন শুধু এ বিষয়ে গুরুত্বই দেয়নি, বরং ইসলামী সমাজে তার পূর্ণ বাস্তবায়নও ঘটিয়েছিলেন। পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে শিক্ষণীয় রয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]- وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا "আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনায় বসবাস করছিল(আনসারগণ) এবং ঈমান এনেছিল তারা তাদেরকে (মুহাজিরদের) ভালবাসে। এবং তাদেরকে যা দেয়া করা হয়েছে সেজন্য তারা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না।" উল্লেখিত আয়াতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কা থেকে আগত নির্যাতিত ও নিঃস্ব মুহাজির (দেশত্যাগী) মুসলিমদের আশ্রয়দানকারী মদীনায় স্থায়ী বাসিন্দা আনসার (সাহায্যকারী) মুসলিমদের এক অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বের প্রশংসা করা হয়েছে। আনসাররা নিজেদের অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও সর্বদাই মুহাজিরদের অগ্রাধিকার দিত। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণেই তারা এরূপ নজিরবিহীন উন্নত মূল্যবোধ সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দিতে পেরেছিল।

---

[১].মূল আরবী [المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم] *সুনান আত-তিরমিযী*, সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার রাকায়িক, হা. নং২৫০৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ০১।
[৩].মূল আরবী [إن النبي صلى الله عليه و سلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال ألست نفسا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয,হা.নং১২৫০; *মুসলিম*, **হা.৯৬১**।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫৭।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১০।
[৬]. মূল আরবী [المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى] আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, বাবুল হা',খ.০৪, পৃ.২৫, হা. নং ৩৫৪৭।
[৭]. আল-কুরআন , ৫৯: আয়াত ০৯।

ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ভালবাসা, সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক ইসলামী মূল্যবোধের অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষকে পরস্পরের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করতে কুরআনে পাঁচবার يا بني ادم বলে সম্মোধন করা হয়েছে।[১] ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সুসম্পর্ক রক্ষার জোর তাকিদ দিয়েছে। কোন মুসলিম যেন তার ভাইয়ের সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন না করে সেজন্য রাসূল(সা.) বলেন[২],"কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে সাক্ষাত হলে একজন এদিকে আর অপরজন সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি যে প্রথম সালামের সূচনা করবে।" অন্যত্র বলেন[৩]– "কোন মুসলিমের জন্য তার কোন ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। যে লোক তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে মারা গেল, সে জাহান্নামে যাবে।"

ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ মাধ্যমে সমাজ সুন্দর হয়; সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্‌র রহমত হয়। পক্ষান্তরে, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ইসলাম সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধার নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا "তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে যাও।"

ইসলাম সমাজের সকল সদস্যের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের নিরাপত্তার বিধান দিয়েছে। এ সমাজে নিরপরাধ কোন ব্যক্তির অন্যায়ভাবে রক্তপাত, একে অপরের ইজ্জত ও সম্পদহরণ নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৫], "প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা হরণ করা হারাম।"

ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ বৃদ্ধির জন্য মুসলিমদের জামাতে সালাত, জুমু'আ, ঈদের সালাত, বিবাহ সংঘটিতকরণ, বিয়ে বা জন্মের ন্যায় খুশীর দিনে শরীক হওয়া সহ বিভিন্ন আয়োজন উপলক্ষে পারষ্পারিক দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মনস্তাত্তিক কুফল থেকে রক্ষা পায়। এভাবে সমাজ পরিণত হবে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এক শান্তিপূর্ণ সমাজ। এজন্য পরস্পরে সাক্ষাতকালে সালাত, কুশল বিনিময়ের রীতি, সমাজের লোকদের সাথে উপহার বিনিময় ও বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওলীমা বা খাবার খাওয়ানোর রীতি চালু করেছে।[৬]

ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ ইসলাম অনৈতিক ঘোষণা করেছে। এজন্য যে সব বিষয় সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, শত্রুতা, অনৈক্য, বিভেদ, বিদ্বেষ, তিক্ততা ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে, সামাজিক ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট করে এবং মানুষের চিন্তা-চেতনা কলুষাচ্ছন্ন করে যেমন, মদ, জুয়া, হিংসা, পরনিন্দা, উপহাস, বিদ্রুপ, কুধারণা ইত্যাদি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। [আল-কুরআন ৫:৯০, ৪৯:১০-১২]

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক শুধু সামাজিক শান্তি আনায়ন করে না, বরং এর দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করা যায়। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। এ সম্পর্কে নাবী কারীম (সা.) বলেন-[৭]

> এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলম করতে পারে না এবং তাকে অসহায় ছেড়ে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের একটি অসুবিধা দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অসুবিধাসমূহের একটি অসুবিধা দূর করে দেবেন।

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় করণীয় হলো: ব্যাপকভাবে সালামের প্রচলন, বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো, খানা খাওয়ানো, উপহার প্রদান, লেন-দেনে স্বচ্ছতা, ওয়াদা-চুক্তি রক্ষা, বিনয় প্রদর্শন ও অপরকে সম্মান দেখানো।

❑.পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবেদনা-সহমর্মিতা (التعاون و الشفقة):

কারো প্রয়োজনে তার পাশে দাঁড়ানো এবং তাকে সাহায্য করার নামই সহযোগিতা। আর একের দুঃখ-বেদনায় অন্যে দুঃখী-ব্যথিত হওয়াই সমবেদনা-সহমর্মিতা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা একটি আদর্শ সমাজ গঠনের মূল উপাদান ও উন্নত নৈতিক গুণ। ইসলাম সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য সাময়িক ঋণদান, কারজে হাসানা, ও সাধারণ ব্যবহার্য জিনিষপত্র অপরকে সহযোগিতার করার নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার পরিচয় দানকারীদের

---

[১]. আল-কুরআন (০৭ : ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫); (৩৬:৬০)।

[২]. মূল আরবী[لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫৭২৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২৫৬০।

[৩].মূল আরবী[لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯১৪।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪৯:১০, ৪৮:২৯, ০৫:৫৪।

[৫]. মূল আরবী [كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ হাদীস নং ২৫৬৪।

[৬]. আল-কুরআন ২৪:৬১, ৪:৮৬।

[৭].মূল আরবী[المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩১০;*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ,হা.নং ২৫৮০।

নিন্দা করা হয়েছে।[১] জীবন সমস্যা সমাধানে একে অন্যকে সম্ভব্য সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-[২] وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-"আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির কথা ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" এই আয়াতে মুসলিম সমাজের প্রত্যেকেই একে অন্যের সাথে সদ্ভাব ও সহযোগিতা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ ধরনের মহৎ কাজের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। নাবী কারীম (সা.) বলেন-[৩] "আল্লাহ তার ঐ বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার (মুমিন) ভাইয়ের সাহায্য করে।"

পারস্পরিক সহযোগিতা ইসলামী সামাজিক আদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ ছাড়া ইসলামী সমাজের আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এজন্য কুরআন মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজে ভালো কাজের প্রচলন এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধের নির্দেশ দেয়। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[৪]– وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমার পরস্পর সাহায্য করবে। আর মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।" এ আয়াত মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য একটি ভিত্তি রচনা করে। এখানে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার চেতনাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর এই পারস্পরিক সহযোগিতা হবে শুধু ভালো ও সৎকর্মের ব্যাপারে এবং অত্যাচার, সীমালংঘন, পাপ ও মন্দ কর্মের ক্ষেত্রে কারো সহযোগিতা করা যাবে না।

পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন[৫], "এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য একটি গৃহের ন্যায়। যার একাংশ অপরাংশকে মযবূত করে'। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করলেন।" এখানে মুমিনকে একটি দেহের সাথে তুলনা করে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী সামাজিক মূল্যবোধের একটি বিশেষ দিক পরস্পরের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা। এজন্য ইসলাম সামাজিক ক্ষেত্রে এমন বিধান দিয়েছে যেখানে থাকবে না, কোন স্বার্থপরতা, বঞ্চনা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও কৃত্রিমতা। এখানে ধনী দরিদ্রকে সবল দুর্বলকে এবং শাসক শাসিতকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না কিংবা কোন কষ্ট দেবে না। এখানে কেউ কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না। বরং এ সমাজের সবাই পারস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মি হবে। এ মর্মে নাবী করীম(সা.) বলেন[৬], "পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মু'মিনের উদাহরণ হলো ও অখণ্ডিত দেহ। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্য বিনিন্দ্রা ও ব্যাথায় আক্রান্ত হয়।" -এখানে সকল মুমিনকে একটি দেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাই এই দেহের কোন অংশ তথা কোন মু'মিনের ব্যথিত হলে অন্য সব মুমিনও তার ব্যাথায় ব্যাথিত হবে এবং অন্য ভাইয়ের সুখ ও আনন্দে সে আনন্দিত হবে।–এটাই মুসলিম সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ইসলাম একের প্রতি অপরের কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য স্থির করেছে। এ সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, পারস্পরিক বন্ধন এবং সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এসব কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে- বিপদগ্রস্ত, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের বিপদ-আপদে একে অপরের পাশে থাকা, যালিমকে অপরাধ থেকে বিরত রাখা, বিবাদমান দু'পক্ষের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা, সমাজের দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত ও সমস্যা পীড়িত মানুষের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ, রোগীদের দেখতে যাওয়া, অসুস্থের সেবা করা, বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়া, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করা, জানাযায় শরীক হওয়া, শোকাহত পরিবারকে শান্ত্বনা দেওয়া, তাদের খাদ্য সরবারহ করা, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৭] وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- "আর যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ রয়েছে। আর সদাকা করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"এ সম্পর্কে রাসূল(সা.) বলেন[৮],

> একজন মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের ছয়টি হক আছে। বলা হ'ল সেগুলি কি হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, ক.তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিবে; খ.আহবান করলে সাড়া দেবে; গ.পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবে; ঘ.হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; চ.অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে ; ছ. মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে'।

---

[১]. আল-কুরআন ১০৭:১-৩,৭।

[২]. আল-কুরআন , সূরা আল-বাক্বারাহ ০২:: আয়াত ২৩৭।

[৩].মূল আরবী [والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দু'আ, হা. নং ২৬৯৯।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০২।

[৫].মূল আরবী [إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا] *সহীহ আল-বুখারী*, আবওয়াবুল মাসাজিদ, হা.নং ৪৬৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রিওয়াস সিলাহ, হা. ২৫৮৫।

[৬].মূল আরবী[ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫৬৬৫, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৮৬।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ২৮০।

[৮]. মূল আরবী [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن ؟ يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল সালাম, হাদীস নং ২১৬২।

অন্য হাদীসে এসেছে– বারাআ (রা.) বলেন[১], রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: ক. জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, খ. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-যত্ন করতে, গ. আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিতে, ঘ. মাযলুমকে সহায়তা করতে, ঙ. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, চ. সালামের প্রচলন করতে, ছ. হাঁচি দাতার জবাব দিতে।[২]

এছাড়াও অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া ও সেবা-যত্ন করা ইসলামে অত্যন্ত পূণ্যের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই গুণ অর্জনে করণীয় হলো: মানুষের দুঃখ-কষ্টে দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন। দুঃস্থ, দুর্বল, অসহায় মানুষের খোঁজ-খবর রাখা, সাহায্যে এগিয়ে আসা, সর্বদা তাদের পাশে থাকা, বিনয়ী হওয়া, অনাথ-ইয়াতীমদের সাথে উঠা-বসা করা।

❑.অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ও হিতাকাঙ্খা:

শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ ও পারস্পারিক সৌহার্দ্যে স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো- অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা, নিজের জন্য যা পছন্দ করা অন্যের জন্যও তা পছন্দ করা এবং অন্যের জন্য তা অপছন্দ করা যা নিজের পছন্দনীয়। এটা এমন একটি শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণ, যা মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়নতা ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। এজন্য ইসলাম এটাকে মু'মিনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছে। কুরআন মু'মিনদের এরই বাস্তব শিক্ষা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[৩]–

وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[৪]

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

"হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দো'আ কবূল করুন'।'হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন'।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রত্যেক মুসলিমকে এটা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সে নিজের কল্যাণ কামনার সাথে সাথে অন্য মুসলিমের জন্যও কল্যাণ কামনা করা। মানসিক সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সবার কল্যাণ সাধনে কাজ করা।
ইসলামী নীতিশাস্ত্র যে সব সামাজিক মূল্যবোধের ওপর জোর দিয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রত্যেক মুসলিম নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই অপছন্দ করবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ নিজের সবচেয়ে ভাল জিনিষটি পছন্দ করে কিন্তু অপরের জন্য তা করতে পারে না। এটা ইসলামী নৈতিকতা পরিপন্থী। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[৫], 'তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে'। তিনি বলেন[৬], 'যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত হতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, যে আচরণ সে অন্যের নিকট নিজের জন্য আশা করে।'

একজন মুসলিম শুধু অন্য মুসলিমের হিতাকাঙ্খী হবে না বরং সব মানুষের হিতাকাঙ্খী ও কল্যাণকামী হবে। সে কারো অকল্যাণ বা ক্ষতি কামনা করবে না এবং কথা বা কাজে কাউকে কষ্ট দেবে না। এটাই কুরআনের শিক্ষা। সূরা ইয়াসিনের ১৩ থেকে ২৭ নং আয়াতে তাঁরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, নাবী বা নাবীর একটি প্রতিনিধি দল এক সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে সত্যের আহবান জানালে, তারা নাবীদের আহবান কবুল না করে তাদের অপমান করল এবং পাথর মেরে হত্যার হুমকি দিল। এ সময় ঐ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি নাবীদের কথায় ঈমান এনে স্বজাতিকে নাবীদের আহবান সাড়া দিতে সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু তাঁর জাতি তাঁর কথা না বুঝে তাঁকে নির্মম কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তেও সেই ব্যক্তি স্বজাতির বদ দোয়া না করে তাদের কল্যাণ কামনা করেন। ইরশাদ হচ্ছে[৭]– (قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ- بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) সে বলল,'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত'। 'আমার রব আমাকে কিসের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'।

---

[১]. দেখুন, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৬৭।

[২].মূল আরবী[أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১১৮২।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ১০।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ৪০-৪১।

[৫].মূল আরবী[لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৫।

[৬].মূল আরবী[فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الي يحب أن يؤتى إليه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৪৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইয়াছিন ৩৬ : আয়াত ২৬-২৭।

এখানে মু'মিন ব্যক্তিটি নিষ্ঠুর নির্যাতনে মৃত্যুর মুহূর্তেও স্বজাতির প্রতি হিতাকাঙ্খী ছিল। হাদীসেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে রাসূল সা. বলেন[১]–"দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন) আমরা জিজ্ঞাস করলাম, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য মুসলিম নেতার জন্য এবং তাদের সর্বসাধারণের জন্য।" জারীর ইবন আবদুল্লাহ রা. বলেন[২], নাবী সা. এর হাতে আমি বাই'আত করেছিলাম নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করা।

বস্তুত নিজের জন্য যা কামনা করা অন্যের জন্যও তা কামনা করা–সমাজ জীবনের একটি সর্বজনীন মূলনীতি। বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে এরই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। '*প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম* ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছু উক্তি সংকলন করা হয়েছে। যেমন, 'যা তুমি নিজের জন্য চাও না, তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য চেয়ো না।' –সমগ্র তাওরাত এ নীতির সাথে সম্পৃক্ত। (ইহুদী হিল্লোল, যিনি 'ইসা('আ.) সামসাময়িক) 'আমি নিজে যা করতে চাই না, তা অন্যের জন্য করি না'। (কনফুসিয়াস, চীনা দার্শনিক) অন্যের জন্য যা কিছুকে সমালোচনা কর নিজে সেটা করা থেকে দূরে থাক। (সিসেরো, রোমান দার্শনিক) [৩]

❑. কথা ও কাজে অন্যকে কষ্ট না দেয়া কিংবা ক্ষতি সাধন না করা:

সৌজন্য ও সহনশীল সামাজিক আচরণ ইসলামী মূল্যবোধের বিশেষ দিক। এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে ইসলাম অসৌজন্য, উগ্র, অসহিষ্ণু ও মন্দ আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামের সামাজিক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- কারো কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড যেন অন্যের জন্য সামান্য কষ্ট, অসুবিধা, বিরক্তি ও অস্বস্তি কারণ না হয়। এ নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً "তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষের সাথে সদালাপ করবে।" অন্যত্র বলেন[৫], وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا "রাহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বধোন করে, তখন তারা বলে, সালাম।"

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৬] "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" অন্য বর্ণনা মতে[৭], "মু'মিন সে যাকে মানুষেরা তাদের মাল ও জানের ব্যাপারে নিরাপদ মনে করে।" এ হাদীস দু'টির নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডে লক্ষ্য রাখবে যে, তার আচরণের দ্বারা যেন কোন মুসলিমের দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক কোন কষ্ট বা ক্ষতি না হয়। এবং কেউ যেন কোন ধরনের যুলমের স্বীকার না হয়। এছাড়া এখানে মুসলিম কথা বলা হলেও এখানে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম বা চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম এর মধ্যে শামিল, তাই তাদের কষ্ট দেয়াও হারাম। কারণ মুসলিম নাগরিকের মত তাদেরও সমান সামাজিক অধিকার রয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন-[৮] "যে ব্যক্তি অন্য কারো ক্ষতি সাধন করে, আল্লাহ তা দিয়ে তার ক্ষতি সাধন করেন। আর যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন।" অন্য বর্ণনায় এসেছে "সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে কোন মুমিনের ক্ষতি করে অথবা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে।"

ইসলামে সামাজিক জীবনে উত্তম আচরণ নফল ইবাদত থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসংঙ্গে হাদীসে এসেছে, আচরণগত ত্রুটি ও অন্যকে কষ্ট দেয়ার কারণে অধিক ইবাদত সত্ত্বেও এক মহিলা জাহান্নামী হন, অন্যদিকে শুধু ফরজ ইবাদত পালনের পর উত্তম আচরণের বদৌলতে এক মহিলা জান্নাত লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলা হয় যে, এক মহিলা বেশী বেশী (নফল) নামাজ পড়ে, দান-সাদাকা করে ও রোজা রাখে, কিন্তু তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল সা. বললেন, সে জাহান্নামী। আর অন্য এক মহিলা(নফল) নামাজ-রোজা কম করে, সামান্য দান-সাদাকা করে কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল সা. বললেন- সে জান্নাতী।[৯]

অন্যের জন্য কষ্টকর, অসুবিধা বা বিরক্তি সৃষ্টিকারী বিষয়বলী ইসলামে নিষিদ্ধ। এজন্য কারো বাসগৃহে বা নির্জন কক্ষে অনুমতিবিহীন অবস্থায় প্রবেশ ইসলাম নিষেধ করেছে, কারণ এটা হয়ত গৃহবাসীর নিকট তা অছন্দনীয় ও বিব্রতকর

---

১. মূল আরবী [الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماهم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৫।

২. মূল আরবী [بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, **হা.নং ৫৭; *মুসলিম,* হা.৫৬।**

৩. ড. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, *প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম*, বাংলা অনু. ইফতেখার ইকবাল (ঢাকা : আমান পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ.৬২।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৩।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫ : আয়াত ৬৩।

৬. মূল আরবী [المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ১০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ৪০।

৭. মূল আরবী[المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৩৯৩৪।

৮. মূল আরবী [(من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه)(ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به)] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ১৯৪০ও ১৯৪১।

৯. হাসান আইয়ুব, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯১।

ব্যাপার হতে পারে। এজন্য কুরআন বলেছে[১]–لَاتَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا "তোমরা নিজের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না।"

অন্যের জন্য কষ্ট হতে পারে এজন্য দান করে খোঁটা দেয়া শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং এতে দান বিফলে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[২] এর মূল দর্শন হলো, এ ধরনের খোঁটা অন্যের মনে কষ্টের সৃষ্টি করে। আর দান গ্রহণের কারণে কেউ কারো গোলাম হয়ে যায় না। এভাবে ছোট-বড় অন্যের জন্য যা-ই কষ্টকর ইসলাম তা বর্জনের নির্দেশ দেয়। এজন্য অন্যের সামান্য কষ্ট হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে হাদীসে কাঁচা রসুন-পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।[৩] শরীরের সৃষ্টি ঘামের দুর্গন্ধ যাতে অন্যের কষ্টের কারণ না হয় সেজন্য জুম'আর দিনে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪] প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের অনেক ফজীলত, এটা নফল। কিন্তু মানুষকে কষ্ট না দিয়ে তা করতে হবে, কারণ কষ্ট না দেয়া ওয়াজিব। এজন্য জুম'আর খুৎবা চলাকালে মানুষ ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে মানুষকে কষ্ট দেয়া হয়। মানুষের কষ্ট ও বিরক্তি সৃষ্টি না হয় সেজন্য নাবী সা. সালাত দীর্ঘ করতে নিষেধ করেছেন, কেননা সালাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও হাজতমন্দ লোক থাকে।[৫] হজ্জের সময় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার অনেক ফযীলত, কিন্তু মানুষকে কষ্ট দিয়ে তা করা যাবে না। মোটকথা- ইসলামের সামাজিক শিক্ষার মূল কথা হল, সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরকে কষ্ট না দেয়া কিংবা কারো কষ্টের কারণ না হওয়া। বিশেষ করে অন্যায়ভাবে কোন মু'মিনকে শারীরিক ও মানসিক কিংবা অন্য যে কোন ধরনের কষ্ট দেয়া হারাম। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন[৬] – وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا "আর যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় যা তারা করেনি, নিশ্চয় তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ।"

❑. সৎ ও পূণ্যবান ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন এবং অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ বর্জন :

পরিবেশ ও বন্ধু মানুষকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। সঙ্গী যদি ভালো হয় তবে সে ভালো পথে ধাবিত হয়, আর যদি সঙ্গী খারাপ হয় তবে সে খারাপ পথে ধাবিত হয়। কুরআনে দেখা যায় যে, আসহাবুল কাহফের (গুহায় আশ্রয়গ্রহণকারী পূণ্যবান মু'মিন যুবকদের) সাথে একটি কুকুর কিছুকাল অবস্থান করে সে ইতরপ্রাণী থেকে মর্যাদাশীল হয়ে যায়।[৭] কাজেই এটা সত্য যে, পূণ্যবানদের সাহচর্য ব্যক্তিকে পূণ্যবান বানিয়ে দেয়; পক্ষান্তরে, বদকারদের সংসর্গ ব্যক্তিকে বদকার বানিয়ে দেয়। এজন্য কুরআনে সৎ ও সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে-[৮], يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. বলেন[৯]-مَعَ الصَّادِقِينَ এর অর্থ হচ্ছে 'মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে থাকো।' আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন-[১০] '*সাদেকীন*' বলতে বুঝায় সে সব লোককে, যারা ঈমান এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে করা আনুগত্যের ওয়াদা পূরণে সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে'। অন্যত্র আরও বলা হয়েছে[১১]–وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ "এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর।" এখানে মুত্তাকীদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য সাহস করে পা বাড়াতে হয়। পথ চলতে গিয়ে বাঁধা-বিঘ্নে সম্মুখীন হলে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়। পূণ্যবান ও সৎ ব্যক্তির সাহচর্য এটাকে সহজসাধ্য করে দেয়। পক্ষান্তরে, অসৎ সঙ্গ ব্যক্তিকে মন্দ ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[১২]– وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا "তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে তাদের সংসর্গে রাখ যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দৃষ্টি তাদের থেকে ফিরায়ে নিও না।" এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-[১৩] "মু'মিন ছাড়া কারো সঙ্গ গ্রহণ করো না; তোমার খাদ্য যেন মুত্তাকী ছাড়া কেউ না খায়।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ২৭।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৪।
৩. মূল আরবী [من أكل من هذه الشجرة – يعني الثوم – فلا يقربن مسجدنا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু সিফাতিস সালাত, হাদীস নং ৮১৫।
৪. দেখুন, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জুমু'আ, হাদীস নং ৮৬০, ৮৪৩।
৫. মূল আরবী [يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জামা'আত ওয়াল ইমামাত, হাদীস নং ৬৭২।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৫৮।
৭. দেখুন, আল-কুরআন ১৮: ১০-২২।
৮. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১১৯।
৯. ইবনু কাছীর, *তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ.২৩৪।
১০. মূল আরবী [المراد بالصادقين الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله تعالى ورسوله الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة] শিহাবুদ্দীন আলুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.৭, পৃ.৩৯৯।
১১. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৫।
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ২৮।
১৩. মূল আরবী [لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৩২; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হা.২৩৯৫।

সমাজ জীবনে মানুষ বন্ধু বা সাথী ছাড়া চলতে পারে না। একসাথে চলতে গিয়ে মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাই মানব জীবনে বন্ধু নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এজন্য রাসূল সা. বলেন-[১]"মানুষ তার বন্ধুর ধ্যান-ধারণা ও স্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই তোমাদের খেয়াল করা উচিত কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।" সৎবন্ধু যেমন মানুষকে ভালো পথে চলতে সহায়তা করে তেমনি খারাপ বন্ধু মন্দ চরিত্র ও বিপথে নিয়ে যায়। নিজকে উন্নত নৈতিক গুণে সমৃদ্ধ করতে হলে সৎসঙ্গ গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা আবশ্যক। এজন্য রাসূল (সা.) বলেছেন-[২]

> সৎ-সঙ্গী ও অসৎ-সঙ্গীর উদাহরণ হলো মিশক(সুগন্ধি) বহনকাকারী ও কয়লা বহনকারীর ন্যায়। মিশক বিক্রতা হয়তো এমনিতেই তোমাকে কিছু দিয়ে দিবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নিবে কিংবা তুমি তার কাছ থেকে সুঘ্রাণ অবশ্যই পাবে। আর কামারের হাপরের ফুলকি তোমার পোশাক পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট থেকে দুর্গন্ধ অবশ্যই পাবে।

উদ্ধৃত হাদীসে সৎসঙ্গীকে ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর আর অসৎ সঙ্গীকে ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুনিয়াতে জীবন চলার পথে এবং বিপদ-আপদে সৎসঙ্গী ও ভালো বন্ধু গ্রহণের যেমন উপকার আছে, তেমনি পরকালীন জীবনে এর কল্যাণ আছে। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন মা-সন্তান থেকে, পিতা-পুত্র থেকে, ভাই-ভাই থেকে কেটে পড়বে এবং সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন শুধু মুত্তাকীদের পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক অটুট থাকবে। কাজেই কার সাথে বন্ধুত্ব করা হবে এবং কাকে বর্জন করতে হবে তার প্রতি খেয়াল করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ-"বন্ধুরা সে দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, মুত্তাকীরা ব্যতীত।"

অসৎ সঙ্গ দুনিয়া ও আখিরাতে নানাবিধ অকল্যাণ, ভ্রষ্টতা ও সর্বনাশের কারণ হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৪]

> وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا - يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا- لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي
>
> "সেদিন যালিম ব্যক্তি নিজ হস্তদ্বয় দংশন করে বলবে,'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছে আমার নিকট উপদেশ আসার পর।"

উল্লেখিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ অসৎ সঙ্গী প্রভাবে সত্যচ্যুত হয়ে কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করে অপূরণীয় মহাক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নৈতিক মূলনীতি: ইসলাম বন্ধুত-শত্রুতার কিছু নীতিমালা পেশ করেছে। •ভদ্র-নম্র, সৎ চরিত্রবান মুমিন ব্যক্তির বন্ধুত্ব হবে অনুরূপ চরিত্রবান ব্যক্তি।[৫] নীতিবোধসম্পন্ন কেউ কখনও কাফির, মুশরিক, মুনাফিক বা কোন দুর্বৃত্তের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। এই নীতি উপেক্ষা করে কোন মুমিন ব্যক্তি কোন কাফির বা মুনাফিকের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছে-[৬] لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে(তবে ভিন্ন কথা)।

কোন ব্যক্তি যাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি/দল/গোষ্ঠীকে ভালবাসবে ঐ ব্যক্তি/দল যদি কিয়ামত দিবসে জান্নাতে যায় তবে সে তার বা তাদের সাথে জান্নাতে যাবে। আর যদি তারা জাহান্নামে যায় তবে সে তার বা তাদের সাথে জাহান্নামে থাকবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৭]–"মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসবে (কিয়ামত দিবসে) সে তারই সঙ্গী হবে।"

সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে ব্যক্তির বন্ধুত্ব-শত্রুতা, অনুরাগ-বিরাগ, যুদ্ধ-সন্ধি, দেওয়া-না দেওয়া, সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ ইত্যাদি হবে মহান আল্লাহর জন্য, তাঁর বিধানের ভিত্তিতে, জাগতিক কোন স্বার্থে নয়। বস্তুত নীতিবোধসম্পন্ন প্রকৃত মু'মিনগণই এই গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম হলে ব্যক্তির নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৮]–"*যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে আল্লাহর জন্য, কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর জন্য, কাউকে কিছু দান করে আল্লাহর জন্য, কাউকে দিতে বিরত থাকে আল্লাহর জন্য, সে তার ঈমানের পূর্ণতা অর্জন করল।*"

❑. সামাজিক শিষ্টাচার, ভদ্রতা, সৌজন্য ও প্রফুল্লচিত্ততা:

সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের সবার সাথে চলতে হয়। কিন্তু ছোট-বড়, জ্ঞানী-মূর্খ, সম্মানিত ও সাধারণ সবার সাথে সমান আচরণ প্রযোজ্য নয়। ব্যক্তি, অবস্থা ও পরিবেশভেদে সবার সাথে সৌজন্যতা বজায় রাখতে হয়–এটাই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার। সর্বস্তরের মানুষের সাথে এটা জড়িত। এর মাধ্যমে সমাজের পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এই

---

[১].মূল আরবী [الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৩৩; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হা.২৩৭৮।

[২].মূল আরবী[مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং ১৯৯৫, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৬২৮।

[৩].আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৬৭।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫: আয়াত ২৭-২৯।

[৫] .আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ : আয়াত ৭১, আরও দেখুন, আল-কুরআন (০৩:১১৮)।

[৬] .আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩: আয়াত ২৮। আরও দেখুন, আল-কুরআন (০৪:১৪৪) (০৫:৫১) (০৬:৬৮) (৩৭:)

[৭].**মূল আরবী** [المرء مع من أحب] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৮১৬, ৫৮১৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা ২৬৪০।

[৮].**মূল আরবী** [من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুস সুন্নাহ, হা.নং৪৬৮১, *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতবুল আদাব, হা.২৩৭৮।

উত্তম মানবীয় গুণ, মু'মিনদের চারিত্রের মৌলিক দিক।[১] রাসূলুল্লাহ(সা.) ইরশাদ করেন,[২]"মুমিন ব্যক্তি চিন্তাশীল, গম্ভীর ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক, ধোঁকাবাজ, কৃপণ, নীচ ও অসভ্য হয়ে থাকে।" বস্তুত শিষ্টাচারবিহীন মানুষ অসম্পূর্ণ মানুষ। এজন্য আলী(রা.) বলেছেন[৩], "যার পিতা মারা গেছে সে প্রকৃত ইয়াতীম নয়। বরং জ্ঞান ও শিষ্টাচারে দৈন্য ব্যক্তিই প্রকৃত ইয়াতীম।" নিম্নে ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচারের বিশেষ দিকসমূহ তুলে ধরা হল।

•বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন। এটা ইসলামের সামাজিক শিষ্টাচারের গুরুত্বপূর্ণ দিক। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম শিক্ষা হলো: সমাজের সম্মানিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শন করা। বিশেষ করে সমাজের সত্যপন্থী আলিম, পূণ্যবান ব্যক্তি, বৃদ্ধ মুসলিম, ন্যায়বান শাসক, সৎ মানুষ ও ভালো শিক্ষক প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখানো এবং তাদের উপেক্ষা না করা কিংবা তাদের অগ্রণী না হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীর রূহুল বায়ানে' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবূ দারাদা রা. বলেন[৫], "একদা রাসূল সা. আমাকে আবূ বকর রা. সামনে চলতে দেখে বললেন, তুমি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার চেয়ে উত্তম।"
অনুরূপভাবে সকলের নৈতিক কর্তব্য হলো, যারা বয়সে ছোট তারা সহ শিশু-কিশোরদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করা। কিন্তু আজকাল যানবাহন, রাস্তাঘাট ও অফিস-আদালতসহ সমাজের সর্বত্র এর উল্টো চিত্র দেখা যায়। আমাদের অনেকেই তাদের প্রতি সৌজন্যতা দেখাতে ভুলে যাই। অথচ এ সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[৬] –"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের যথার্থ সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

•উন্নত চরিত্রের একটি দিক হলো: লোকজনের সাথে সাক্ষাৎকালে প্রফুল্লচিত্ত ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বিনম্রভাবে সাক্ষাত করা ও কথা বলা। সাক্ষাতের সময় পরস্পর পরস্পরের প্রতি সালাম বিনিময় করা ও সম্ভাষণা জানানো। এটা উত্তম ও জান্নাতী অভিবাদন। সালাম বিনিময়ে পরস্পরের প্রতি শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত পারস্পরিক ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক শত্রুরাও বন্ধুতে পরিণত হয়। এতে ব্যক্তি থেকে গর্ব, অহঙ্কার ও হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ- আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম'। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[৮],(تبسمك في وجه أخيك لك صدقة)"হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদাকা।" রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন– "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আন আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের তা বাতলে দেব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসার সৃষ্টি হবে ? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় করবে।"[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ইরশাদ করেন, তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে আর্বিভূত হওয়া তোমার জন্য সাদাকা স্বরূপ। সৎকাজের জন্য তোমার আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তোমার নির্দেশ তোমার জন্য সাদাকা স্বরূপ। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড় সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য সাদাকা স্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদাকা স্বরূপ।[১০]

•কারো গৃহে বা নিজ গৃহে প্রবেশকালে গৃহের অধিবাসীদের সালাম প্রদান করা, এটা বরকতপূর্ণ।[১১] অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালাম দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা। এটা শিষ্টাচারের অংশ। বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ কিংবা গৃহের অভ্যান্তরে তাকানো অভদ্রতা এবং ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১২] يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫ : আয়াত ৬৩।
২.মূল আরবী[المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৪৭৯০; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা.১৯৬৪।
৩.**মূল আরবী**[ليس اليتيم الذي قد مات والده إِنَّ اليَتِيمَ يَتِيمُ العِلْمِ والأَدَب]*জামীউ দাওয়াবীনিশ শি'রিল আরাবী*, খ.১১,(আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ,২য় সং.) কাসীদা নং ১৫৪৯৭, পৃ.১৭০;
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত০১। আরও দেখুন, আল-কুরআন,৪৯:০২,
৫. ইসমাঈল হাক্কী, *তাফসীর রূহুল বায়ান*, খ. ৯, (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) পৃ. ৫২।
৬.মূল আরবী[من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হা. নং৪৯৪৩; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা. ১৯১৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম ০৬: আয়াত ৫৪, আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৪:২৭, ৬১, আল-কুরআন ০৪:৮৬।।
৮.*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা. ১৯৫৬।
৯. মূল আরবী [لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৪।
১০. মূল আরবী [تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৫৬।
১১. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৬১।
১২. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ২৭, আল-কুরআন ২৪:৫৮-৫৯।

•শোরগোল পরিহার করা এবং শান্ত অবস্থা বজায় রাখা ইসলামী মূল্যবোধের অন্যতম নিদর্শন। তাই কারো সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখা, চিৎকার করে বা কর্কষ ভাষায় কথা না বলা।[১] অন্যের সাথে আলোচনায় প্রীতিকর চাহনি দেয়া। কারো প্রতি বক্রভাবে না তাকানো। বিশেষ করে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের সাথে কথা বলার সময় সৌজন্যতা বজায় রাখা। সম্মানিত কোন ব্যক্তিকে দূর থেকে নাম ধরে উঁচু স্বরে না ডাকা। এ মর্মে বলা হয়েছে[২]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নাবীর কণ্ঠের উপর তোমাদের কণ্ঠ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না।"

•সর্বসাধারণের সাথে উত্তম ভাষায় নম্রতা সহকারে কথা বলা। কথা বলার সময় সুস্পষ্ট বলা যাতে করে সংশ্লিষ্ট লোকজন শুনতে ও বুঝতে পায়, তবে উচ্চকণ্ঠে নয়। অশালীন, অশ্রব্য, অসৌজন্য, মিথ্যা, মন্দ কথা ও আপত্তিকর ভাষা পরিহার করা। উচ্চ ও শ্রুতিকটুভাবে কথাবার্তাকে কুরআনে গাধার স্বরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী সুন্দরভাবে কথা বলা। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً "এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে।" প্রয়োজনীয় হক ও পরিমিত কথা বলা। অপ্রয়োজনীয় কথা ও বাচালতা পরিহার করা।[৪] কেননা বেশী কথা বললে বেশী ভুলের সম্ভবনা থাকে। বেশী কথা বক্তার বক্তব্যের ওজস্বীতা, গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বিনষ্ট করে। এতে শ্রোতার বিরক্তির উদ্রেক হয়। এজন্য রাসূল(সা.) বলেন[৫], 'লজ্জা-সম্ভ্রম ও স্বল্পবাক ঈমানের দুইটি শাখা'। অশ্লীলতা ও বাকপটুতা নিফাকের দু'টি শাখা।

• খুশীর বিষয়ে মুছকি হাসি বা নির্মল হাসি হাসা। অট্টহাসি অথবা অপ্রীতিকর শব্দ না করা। কাঁদার সময় সংযত থাকা, চিৎকার করে বা বুক চাপড়িয়ে না কাঁদা। আয়েশা রা. বলেন[৬],'রাসূল সা. কে কখনো আমি অট্টহাসি দিতে দেখিনি যাতে তাঁর মুখগহ্বর প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ তিনি মুচকি হাসি দিতেন'।

•অন্যের শিষ্টাচার পরিপন্থী মন্দ আচরণ ও কথাবার্তা সংযতভাবে এড়িয়ে যাওয়া। কথাবার্তা ও আচার-আচরণে কাউকে বিরক্ত না করা বা বিড়ম্বনায় না ফেলা। কারো আত্মমর্যাদায় আঘাত না করা। মানুষকে তার অবস্থান অনুযায়ী সম্মান-মর্যাদা প্রদান করা। ক্রোধ সংবরণ করা এবং অন্যের সমালোচনায় সীমা অতিক্রম না করা। ইরশাদ হচ্ছে[৭]- وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا "আর তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল।"

•অন্যের জন্য কষ্ট বা বিরক্তিকর হতে পারে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা।[৮] যেমন, দুর্গন্ধযুক্ত পোষাক, জুতা-মোজা, কারো বিশ্রাম বা রাতে ঘুমের সময় শোরগোল বা উঁচু শব্দে কোন কিছু না করা। আজকাল বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে অহরহ উচ্চশব্দে গান-বাজনা ও কোলাহল করতে দেখা যায়, এতে প্রতিবেশী অসুবিধার কথা চিন্তা করা হয় না। এটা সামাজিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী ও মূর্খতাসুলভ কাজ। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৯]– إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ- "নিশ্চয় যারা তোমাকে ঘরের পিছন থেকে উঁচুস্বরে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

•সভায় সালাম দিয়ে যেখানে স্থান পাওয়া যায় সেখানে বসে পড়া। কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে না বসা। অন্যের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেয়া। মজলিসে কথা বলতে হলে অনুমতি নিয়ে বলা। সর্বসাধারণের মাঝে অবস্থান কালে কিংবা সভা ও সামষ্টিক বৈঠকে বসা কিংবা যানবাহনে অবস্থানের ব্যাপারে অন্যের প্রতি খেয়াল রাখা, সাধ্যমত অন্যকে বসার ব্যবস্থা করা।[১০] আলাপরত দুই ব্যক্তির মাঝে অনুমতি ছাড়া না বসা।[১১] তিনজনের উপস্থিতিতে (তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে) দু'জনে একান্তে কথা না বলা।[১২] সমষ্টিগত কাজে বা সভা-সমিতি থেকে চলে যাওয়ার প্রয়োজন হলে নেতার অনুমতি প্রার্থনা করা।[১৩] সভায় বা সামষ্টিক বৈঠকে আলোচনার শিষ্টাচারপূর্ণ, যথোচিত ও যুক্তিসম্মত বিষয়ে কথা বলা। কারো কথার মাঝে কথা না বলা। মহান আল্লাহ বলেন[১৪] -وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَن "আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল।"

•নম্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করা, চলাফেরায় ভদ্রতা ও গাম্ভীর্যতা বজায় রাখা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বা দম্ভ পরিহার করা। ক্রোধ সংবরণ করা, সৌজন্যের সীমা অতিক্রম না করা।[১৫] চলাফেরায় ভদ্রতা রক্ষায় দৌড়ে নামাজের জামাতে শরীক

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৩।
[৪]. আল-কুরআন, ৫০: ১৬-১৮, ৮২:১০-১২।
[৫].মূল আরবী [الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق] *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০২৭।
[৬]. মূল আরবী [ما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫৭৪১।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩: আয়াত ১০।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৪।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৪।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮: আয়াত ১১।
[১১].মূল আরবী [بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا] *সুনান আবূ দাঊদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৪৫।
[১২].মূল আরবী[إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইস্তিযান, হাদীস নং ৫৯৩০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, হা.২১৮৩।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৬২।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৫৩, আল-কুরআন ৫৮:০৯।
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩: আয়াত ১০।

হওয়ার জন্য আসাকেও নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[১], 'যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর ছুটে যায় তা পূরা করে নিবে'।

এছাড়াও, ভদ্রতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে–পানাহারের সময় ভদ্র পরিবেশ বজায় রাখা। হাঁচি বা হাই আসলে হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নেয়া, হাঁচির আসলে আল-হামদুলিল্লাহ বলা, আর জবাবে ইয়াহামুকাল্লাহ বলা। ভালো কাজ ডান দিক থেকে বা ডান হতে সম্পন্ন করা যেমন খাবার গ্রহণ, আর হীন কাজ বাম হাতে সম্পন্ন করা যেমন, ইস্তেজা করা। এছাড়াও উগ্রপন্থা, বাড়াবাড়ি, খামখেয়ালীপনা, অস্থিরচিত্ততা, জটিলতা ও অস্বাভাবিক আচরণ পরিহার করা।

❑.আমানত প্রত্যর্পণ :

আমানত শব্দটি খিয়ানত শব্দের বিপরীত, যার আভিধানিক অর্থ-গচ্ছিত রাখা, নিরাপদ রাখা। সাধারণভাবে আমানত বলতে বুঝে থাকি কারো অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখা বা বস্তু সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

আমানত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যৌথ শরীকদার, এতীমের মাল, ওয়াকফ সম্পত্তি, ঋণ, নারীদের মোহর ইত্যাদিও আমানত। অনুরূপভাবে ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যেসব দায়িত্ব থাকে সেগুলো আদায় করা আমানত। প্রত্যেক মানুষের জীবনকাল, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, স্ত্রী-সন্তান ও মেধা-যোগ্যতা ইত্যাদি সবই আমানত। পিতা-মাতার কাছে সন্তান আমানত। শ্রমিকের নিকট মালিকের সম্পদ আমানত। রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট রাষ্ট্রের সম্পদ ও জনগণের অধিকার আমানত। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব রক্ষা, জনগণের জানমালের হিফাযত ও তাদের মৌলিক চাহিদা পুরণ রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গদের জন্য আমানত। প্রতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় গোপনীয় বিষয়াদি বিষয়গুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করা আমানত। যোগ্য ও সৎ শাসক নির্বাচিত করা জনগণের উপর অর্পিত আমানত। এভাবে আমানত মানুষের সমগ্র জীবনের সাথে জড়িত বিষয়। ইসলামের গোটা আর্থ-সামাজিক দর্শনের মূলে রয়েছে আমানত। হাদীস ও তাফসীর থেকেও আমানতের ব্যাপকতা সম্পর্কে জানা যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[২] , "কোন ব্যক্তি কোন কথা বলার পর এদিক-সেদিক তাকালে তার উক্ত কথা (শ্রবণকারীর জন্য) আমানত হিসেবে গণ্য।" তিনি আরও বলেন[৩] –"যার থেকে পরামর্শ নেয়া হয়, সে একজন আমানতদারের মত।"
আবুল আলিয়া রহ. (মৃ. ৯০হি.) বলেন–(আল্লাহর পক্ষ থেকে) যে সব জিনিসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যা নিষেধ করা হয়েছে ঐসবগুলোই আমানত। উবাই ইবন কাব (রা.) বলেন- নারীর নিকট তার লজ্জাস্থান একটি আমানত। বরী ইবন আনাস (রা.) বলেন–"তোমার ও অপরের মধ্যে যে লেন-দেন হয়ে থাকে ঐ সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত।"[৪]

বস্তুত জীবন ও সম্পদসহ মানব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত সব নি'আমতই আমানত। মহান আল্লাহ বলেছেন[৫] إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন।" কোন জিনিস বিক্রির পর বিক্রেতা ঐ জিনিস ক্রেতাকে ব্যবহারের অনুমতি দিলে তা এক ধরনের আমানত। তাই এই আমানত নিজ স্বাধীন ইচ্ছা ও বল্গাহীন ইখতিয়ারের দ্বারা নয় বরং প্রকৃত মালিক আল্লাহর মর্জি এবং তাঁর দেয়া পথনির্দেশ মাফিক তা ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৬]– ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ "তারপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নি'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" -উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দাকে প্রদত্ত প্রতিটি জিনিস পবিত্র আমানত। কাজেই কেউ যদি তাকে প্রদত্ত নি'আমতের অপব্যবহার করে তবে সে আমানতের খেয়ানত করবে এবং এ ব্যাপারে তার প্রভুর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

আমানত একটি গুরুভার। সততা, ইনসাফ, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও যথাস্থানে আমানত প্রত্যর্পণের মাধ্যমে এ সব আমানত রক্ষা করা সম্ভব। যথার্থভাবে আমানত রক্ষা না করা এক প্রকার যুল্‌ম ও অনাচার। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا-"আমি তো আসমান,যমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম, তারা তা তাতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ তা বহন করল; সে অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।" -উল্লেখিত আয়াতে আমানত হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, দীন ও দুনিয়ার মর্যাদার ব্যাপারে আস্থাশীল থাকা। শরীঅতের পুরোপুরি অনুসরণই হচ্ছে আমানত। এটা হচ্ছে সাধারণের মতামত। ...আর সম্মানিত সৃষ্টিকুলের উপর এই আমানত আরোপের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী মেনে চলা। যদি সে ভালো কাজ করে তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর সে যদি মন্দ কাজ করে, তাহলে তাকে শাস্তি

---

[১].মূল আরবী[إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আযান, হা.৬১০;*মুসলিম*, হা.৬০২।
[২]. মূল আরবী [إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৪৮৬৮; *সুনান আত-তিরমিযী*, হা.নং১৯৫৯।
[৩]. মূল আরবী [المستشار مؤتمن] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫১২৮।
[৪]. ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.২৩৮।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১১১।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা,আত-তাকাসূর : আয়াত ৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩ : আয়াত ৭২।

প্রদান করা হবে। আসমান যমীন ও পর্বতমালা এই আমানত বহন করতে অস্বীকার করে, কিন্তু মানুষ তার দুর্বলচিত্ত ও শক্তিহীনতা থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করতে স্বীকার করে।[১]

আমানত মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সামাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শৃঙ্খলা-ভারসাম্য রক্ষার চালিকাশক্তি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি। প্রত্যেকের অর্পিত আমানত রক্ষা কিংবা যথার্থ অধিকারীর হাতে তার প্রাপ্য আমানত প্রত্যর্পণ না করলে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এবং তা বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হবে। তাই যথাস্থানে আমানত প্রত্যর্পণ করা প্রত্যেকের উপর নৈতিক কর্তব্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]- إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَاحَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়ের সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কতই না উত্তম! নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" আরও বলেন-[৩]- فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ- "সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে।আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করে, অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা আমল কর, আল্লাহ্ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহের নির্দেশনার ভিত্তিতে ধন-সম্পদের আমানত, দায়িত্ব-পদমর্যাদার আমানত, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পরামর্শের আমানতসহ সর্বপ্রকার আমানত এর অন্তর্ভুক্ত। সব আমানতকে তার হকদারের নিকট প্রত্যর্পণ করা আবশ্যক। কিন্তু যে আমানত প্রত্যর্পণের ক্ষেত্র অস্পষ্ট। সেসব ক্ষেত্রে কে আমানতের অধিকারী? এবং কাকে আমানত দেওয়া উচিত?–তা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ, যাচাই-বাছাই ও পরামর্শের ভিত্তিতে আমানতের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করতে হবে।

আমানতদারি হচ্ছে তাকওয়া নির্ভর একটি উন্নত নৈতিক গুণ। আমানতদারি ঈমানের বিশেষ উপাদান ও অঙ্গ। পক্ষান্তরে, খিয়ানত নিফাকের অনুসঙ্গ ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য।[৪] আমানত উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচায়ক। এটা ফিরিশতা, মুত্তাকী ও নৈতিক চরিত্রবান মু'মিনদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[৫] তারা সব ধরণের আমানত বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ আমানদার মু'মিনদের প্রশংসায় বলেন[৬]- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। ...যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"হাদীসেও এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আনাস রা. বলেন[৭], রাসূলুল্লাহ সা. এর এমন কোন খুতবা ছিল না যেখানে তিনি এ কথা বলেননি– "যার মধ্যে আমানতদারি নেই তার মধ্যে ঈমান নেই, এবং যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না তার মধ্যে দীন নেই।" তিনি আরও বলেন, 'তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে, তুমি তাকে তা দিয়ে দাও। তোমার সাথে খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা করলো তুমি তার সাথে খিয়ানত করো না।'[৮] অন্যত্র আরও বলেছেন, "হে লোকসকল! তোমাদের যে কেউই আমাদের কোন কাজে নিয়োজিত থাকে এবং সে আদায়কৃত জিনিষ থেকে সুঁচ পরিমাণ জিনিসও গোপন করে, তবে তা আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তা নিয়ে হাযির হবে।..."[৯]

সত্যিকার মুসলিম হবেন আমানতদারির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই কুরআন মুসলিম ব্যক্তিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমানত রক্ষার নির্দেশ দিয়ে বলেছে[১০]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ কর না এবং তোমরা পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভংগ কর না।"
আর মুসলিমরা যুগে যুগে আমানতদারির পরিচয় দেন। এ সম্পর্কিত হাজারো দৃষ্টান্তের একটি এরূপ: আত-তাবারী বর্ণনা করেন, মুসলিম বাহিনী যখন ইরানের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছল এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল তখন এক ব্যক্তি তার সংগৃহীত ধনরত্ন নিয়ে এল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট সোপর্দ করল। লোকেরা বলল, এমন মূল্যবান সম্পদ তো আমরা কখনো দেখিনি। আমরা যা সংগ্রহ করেছি এর তুলনায় সেগুলোর কোন মূল্যই নেই। এরপর লোকে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এর থেকে কিছু রেখে আসনি তো? লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! ব্যাপারটা যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না হতো তা হলে তোমরা এ সবের কিছুই জানতে পারতে না। লোকেরা বুঝতে পারলে যে, তিনি মর্যাদাবান লোক। তারা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। লোকটি জানাল, আমি বলবো না এজন্য যে, 'তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ প্রশংসা

---

[১]. আবূ হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৭, পৃ. ২৪৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৫৮।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮২-২৮৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৭৫।
[৫]. আল-কুরআন, ৮১:১৯-২১; ৭:৬৫-৬৮, ১২:৫৪, ২৬:১০৫-০৭;১২৩-১২৫;১৬১-৬২;১৭৬-৭৮; ২৮:২৬; ৪৪:১৭-১৮; ২৭:৩৮-৩৯; ০৩:৭৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ১–৯।
[৭]. মূল আরবী [لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৩, পৃ.১৩৫, হাদীস নং ১২৪০৬।
[৮]. মূল আরবী [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল ইজারাহ, হাদীস নং ৩৫৩৪।
[৯]. মূল আরবী [يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আকদিয়াহ, হাদীস নং ৩৫৮১।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২৭।

কেবল আল্লাহর প্রাপ্য।' তিনি এ কাজের জন্য যদি কোন সওয়াব দিতে চান আমি কেবল তাতেই রাজী। তিনি চলে গেলে তাঁর পরিচয় জানার জন্য তাঁর পিছনে একজন লোক পাঠানো হয়। জানা গেল, তাঁর নাম 'আমের ইবন আবদিল কায়ছ।[১]

আমানত প্রত্যর্পণ বড় ধরনের পূণ্যের কাজ। এর দ্বারা মানুষের ভালবাসা ও পরকালে জান্নাত লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[২], তোমরা ছ'টি জিনিসের দায়িত্ব নিলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিব। ছ'টি জিনিস হলো ক. কথা বলার সময় মিথ্যা বলো না। খ. ওয়াদা ভঙ্গ করো না। গ.আমানতের খিয়ানত করো না। ঘ. দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখবে। ঙ. নিজেদের লজ্জস্থানের হিফাজত করবে। চ. স্বীয় হাতকে যুলুম (অন্যায়) থেকে বাচিয়ে রাখবে।

❑.অঙ্গীকার, চুক্তি (العهد) প্রতিশ্রুতি (الوعد) ও শপথ পুরণ এবং গোপনীয়তা রক্ষা:

অঙ্গীকার, চুক্তি, শপথ, ইত্যাদির আরবী প্রতিশব্দ 'আহদ, 'আকদ (عقد-عهد)। কুরআনে 'আহদ অর্থে মীছাক(مِيثَاق) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত দুই পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্যবাধকতায় একমত হওয়াকেই 'আহদ বলা হয়।[৩] ভিন্ন মতে, কোন বিষয়ে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে 'আহদ বলা হয়। এ অঙ্গীকার বা চুক্তিকে যখন শপথের মাধ্যমে অধিকতর দৃঢ় করা হয়, তখন তাকে বলা হয় মীসাক। আর ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি হল–কোন ব্যক্তি কর্তৃক সাধারণ অঙ্গীকার যা এক পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ওয়াদা ও আহদ কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ।

'অঙ্গীকার ও চুক্তি কয়েক ধরনের হতে পারে। এক.আল্লাহর সাথে কৃত মানুষের অঙ্গীকার। তা হল, ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। দুই. নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন: শপথ ও মানতের মাধ্যমে কোন কাজ নিজের জন্য জরুরী করে নেয়া অঙ্গীকার। তিন.মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পাদিত চুক্তি বা অঙ্গীকার। যেমন:বিবাহ, ক্রয়-বিক্রয়, দুই ব্যক্তি, দুই দল, দুইপক্ষ, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদি।[৪] কুরআনে আহ্দ শব্দটি ২৯বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৭বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] এবং মীছাক(مِيثَاق) শব্দটি ২৫বার, মাওছিক০৩ বার এবং উছকা ০২বার এসেছে। আর ওয়াদা শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে ৪৯বার বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ৭৬ বার এসেছে।

মানুষ সমাজ ছাড়া চলতে পারে না। সমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর করতে কতগুলো মূলনীতি মেনে চলতে হবে। এসবের মধ্যে অঙ্গীকার, ওয়াদা, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা অন্যতম। এসব যথাযথ রক্ষার উপর নির্ভর করে সামাজিক সমৃদ্ধি, শান্তি-শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সুসম্পর্ক। এর মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন শান্তিময় হয়ে উঠে। এগুলো সুশৃঙ্খল সমাজ বির্নিমাণের অপরিহার্য শর্ত। তাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি পালনে সকলকে আন্তরিক ও যত্নবান হওয়া জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন[৬], يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود "হে মু'মিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে।" উল্লেখিত আয়াতে 'আকদ এর মধ্যে সব ধরণের অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত। চাই তা আল্লাহর সাথে মানুষের কৃত অঙ্গীকার হোক, অথবা নিজের সাথে কৃত অঙ্গীকার হোক, কিংবা মানুষের পারস্পরিক মধ্যে সম্পাদিত অঙ্গীকার ও চুক্তি হোক। এ সব অঙ্গীকার ও চুক্তি মধ্যে যে সকল শর্ত ও বিষয় স্থির হয় তা পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যতয় ঘটলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, আস্থা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হয়। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। তাই কুরআনে অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নিষিদ্ধ করেছে। এজন্য কেউ স্বেচ্ছায় তা ভঙ্গ করলে সে নিন্দিত ও অপরাধী বলে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]–وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "তোমরা আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ করিও যখন পরষ্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্কে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভংগ কর না। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন।" আরও বলেন[৮]–

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

আর তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার পাকানো সূতো শক্ত করে পাকানোর পর টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা পরষ্পরকে প্রতারণা করার জন্য নিজেদের শপথকে ব্যবহার করে থাক (এই উদ্দেশ্যে) যাতে, একদল অপর দলের চেয়ে অধিক লাভবান হও। আল্লাহ তো এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিনে স্পষ্ট করে দেবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।

---

[১]. ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.) খ.২, পৃ.৪৬৫।

[২].মূল আরবী[كفلوا لي بست أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا أؤتمن فلا يخن وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم] আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, খ.০৮, পৃ.২৬২, বাবুস সাদ, হাদীস নং ৮০১৮।

[৩]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ. ১১।

[৪]. *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ. ১১-১২। [সংক্ষেপিত]

[৫]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ,৫৫।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০১।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৯১; আরও দেখুন,আল-কুরআন০৫:৮৯, ১৬ : ৯৪।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৯২।

প্রতিটি অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি একটি করে গুরুত্বপূর্ণ আমানত। ওয়াদা পালন করা মু'মিন ও মুত্তাকী লোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং তাকওয়ার পরিচায়ক। ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মশীলদের বিশেষ গুণ। মহান আল্লাহ বলেন[১]- الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ "যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।" অন্যত্র বলেন[২]- بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে,তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।" পক্ষান্তরে, অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা গুরুতর অনৈতিক কাজ। এটা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য।[৩] চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর কেহ বিশ্বাসঘতকতা করলে তাদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। তাদের নাগালে পেলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]-

> الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ- فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ-وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ
> যাদের থেকে তুমি অঙ্গীকার নিয়েছ, অতঃপর তারা প্রতিবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তারা ভয় করে না। সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাদের নাগালে পাও, তবে এদের মাধ্যমে এদের পেছনে যারা রয়েছে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দাও, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায় থেকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের দিকে সোজা নিক্ষেপ কর, নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

কঠিন বিপদের মুহূর্তেও ইসলাম মুসলিমদের ওয়াদা রক্ষার জোর তাকিদ দেয়। এমনকি সেই অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি যদি অমুসলিমদের সাথেও হয় তা পালন করাও জরুরী। এ মর্মে একটি বর্ণনা তুলে ধরা হলো–[৫]

> হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) বলেন, আমি ও আমার পিতা বদরের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাচ্ছিলাম। পথে কুরাইশ কাফিররা আমাদের ধরে ফেলে।...তখন আমরা উভয়ে জানালাম যে, শুধু মদীনায় যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্যে। তখন কাফিররা আমাদের থেকে আল্লাহর নামে এ মর্মে ওয়াদা নেয় যে, আমরা শুধু মদীনায় যাব, কিন্তু রাসূল (সা.) এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করব না। আমরা রাসূল (সা.) এর কাছে এসে তাঁকে এ সব কথা জানালাম। তিনি বললেন–'*তোমরা ফিরে যাও; আমরা তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব।*'

অমুসলিমদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষার তাকিদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৬], "যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দুরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।"

ওয়াদা ঋণ তুল্য। ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অঙ্গীকার পূরণ আল্লাহর নির্দেশ। এটা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ।[৭] অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ।এর মধ্যেই মানুষের ইহ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। রুহের জগতে আল্লাহ মানুষের নিকট এ ব্যাপারে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। সেই অঙ্গীকারের মূল কথা হচ্ছে–আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলা এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা। মহান আল্লাহ বলেন[৮]-وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ- এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। আরও বলেন-[৯] وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَنًاقَلِيلاً "তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় কর না।" অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কিংবা এ ব্যাপারে কুটকৌশল অবলম্বন করা বড় ধরনের অনৈতিক কাজ ও মহাপাপ। এ ব্যাপারে প্রত্যেককে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[১০]– وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ-إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً "এবং তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" আরও বলেন[১১], لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন।" অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নানাভাবে পার্থিব লাঞ্ছনা ও বিপর্যস্ত হয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[১২]–

> 'কোন জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের ওপর শত্রু চাপিয়ে দেন।' তিনি আরও বলেন[১৩], "যে জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের উপর গণহত্যা নেমে আসে। আর যে জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তাদের উপর অপমৃত্যু চাপিয়ে দেয়া হয়।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ২০, আল-কুরআন ০২ : ১৭৭, ২৩:০৮, ৭০:৩২।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৭৬।
[৩]. রাসূল সা. বলেছেন– মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে, তা ভংগ করে, (৩) এবং যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, সে তার খিয়ানত করে।-*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং৩৩, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮ : আয়াত ৫৬-৫৮।
[৫]. মূল আরবী [انصرفا نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৮৭।
[৬].মূল আরবী[من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, আবওয়াবুল জিজিয়া, হা.নং ২৯৯৫
[৭]. আল-কুরআন, ৫:১, ১৭:৩৪, ০৩: ৭৬।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫২।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৯৫।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩৪।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৮৯; আরও দেখুন,আল-কুরআন ০২:২২৫।
[১২]. মূল আরবী [ما ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৯৬৭।
[১৩].মূল আরবী [ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم و لا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر] *আল-মুস্তাদরাক 'আলা সহীহাইন* খ.২, পৃ. ১৩৬, কিতাবুল জিহাদ, হা. নং ২৫৭৭।

অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ধর্মহীনতার পরিচায়ক, যা মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃর্ণিত কাজ।[১] এতে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়, অন্তর কঠোর ও কলুষযুক্ত হয়ে পড়ে। এ অপরাধ কারো অভ্যাসে পরিণত হলে সে আল্লাহর শাস্তিযোগ্য হন। এ কারণে মহান আল্লাহ বলেন[২]- فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ -"সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত দিয়েছি।" আরও বলেন[৩]- الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ "যারা আল্লাহ্‌র সংগে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে এবং তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে (ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, বিধি-বিধান ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে), যা আল্লাহ্ অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করে এবং এরাই তারা(যারা) ক্ষতিগ্রস্ত।"

অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আখিরাতে লাঞ্ছনা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-[৪] إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَيُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَيُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।" পার্থিব জীবনেও এর আপদ কম নয়। রাসূল সা. বলেন-[৫] "যখন কোন জাতি আল্লাহ্ ও রাসূল সা এর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর অজ্ঞাত শত্রু চাপিয়ে দেন, সে তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়।"

উল্লেখ্য যে, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অনৈতিক হলেও কিছু ক্ষেত্রে তা অপরাধের মধ্যে গণ্য নয়। যেমনঃ ক).কৃত ওয়াদা ভুলে গেলে। খ). হঠাৎ করে কোন বিপদাপদে নিপতিত হলে, গ). নিরুপায় হলে/যুক্তিসঙ্গত কারণে অপরাগ হলে। এছাড়া যদি প্রতিপক্ষ অঙ্গীকার, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করে সেক্ষেত্রে তাদের জানিয়ে দিয়ে চুক্তির কার্যকারিতা বাতিল করা যাবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৬]– وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ "যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি ভংগকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথায় কথায় শপথ করা অনুচিত। কখনও শপথ করতে হলে শুধু আল্লাহর নামে করতে হবে। আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা যাবে না। আল্লাহর নামে কৃত শপথ পুরণ করা জরুরী। কোন কারণে শপথ ভঙ্গ হলে একাধারে তিনটি রোজা রাখতে হবে অথবা দশজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। [আল-কুরআন, ০৫: ৮৯]

গোপনীয়তা রক্ষাঃ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের কিছু গোপন কথা ও কর্ম রয়েছে যেগুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মানুষ শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ, বিভিন্ন অনিষ্ট থেকে রক্ষা, পারস্পরিক আস্থা ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রজায় রাখতে পারে। এ ধরনের তথ্য ফাঁস শুধু অনৈতিকই নয়, বরং তা অনেক সময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বড় ধরনের ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। গোপনীয়তা রক্ষার শিক্ষা দিতে কুরআনে বলা হয়েছে-[৭] يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا –(ইয়াকুব আ.স্বীয় পুত্র ইউসুফ আ.কে উপদেশস্বরূপ বলেন)"হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে।" গোপনীয়তা রক্ষা করা এক ধরনের আমানত। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি, অফিস বা রাষ্ট্রের গোপন বিষয় রক্ষা করা আবশ্যকীয় আমানত। রাসূল সা. ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের বিভিন্ন কর্ম ও আচরণে গোপনীয়তা রক্ষা করেছেন। গোপনীয়তা রক্ষা করার উপকারিতা অনেক। এ সম্পর্কে ইমাম আশ-শাফেয়ী রহ. বলেন, "নেতৃত্বের হাতিয়ার হলো পাঁচটি। ক. সত্য বলা, খ. গোপনীয়তা রক্ষা করা, গ.চুক্তি পালন করা, ঘ. উপদেশ প্রদান করা, ঙ.আমানত রক্ষা করা।"[৮]

❑.সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر):

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের একটি মহান স্তম্ভ। আল-কুরআনের পরিভাষায় একে *আমর বিল মা'রূফ* ও *নাহী 'আনিল মুনকার* বলা হয়। সাধারণত যে কোন ভালো কাজের আদেশ, তার প্রসার, তাতে উৎসাহ দান, সত্য, ন্যায় ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ, উৎপীড়িতের সাহায্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা ইত্যাদি সবই *আমর বিল মা'রূফ* বা সৎ কাজের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর যে কোন ধরনের অন্যায়, মন্দ ও অকল্যাণকর কাজের নিষেধ করা, শিরক, কুফর, নিফাকসহ সব ধরনের পাপাচার ও অপরাধের মূলৎপাটনের জন্য কাজ করাই *নাহী 'আনিল মুনকার* বা অসৎ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি ব্যাপক বিষয়। এই কাজের পরিধি যেমন অনেক বিস্তৃত তেমনি এর ক্ষেত্রও বিস্তৃত। এটা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

---

[১]. আল-কুরআন, ৬১:২-৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ২৭, আল-কুরআন ১৩ : ২৫।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৭৭।
[৫].মূল আরবী[ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا منء غيرهم] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল ফিতান, হাদীস নং ৪০১৯।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮ : আয়াত ৫৮, আল-কুরআন০৯ : ১২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ০৫।
[৮].মূল আরবী[آلات الرياسة خمس:صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الامانة]শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, *প্রাগুক্ত*,খ.১৯, পৃ.৩০।

হতে পারে। এ কাজে মুসলিমদের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১]- وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-"আর তোমাদের মধ্য থেকে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, আদেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর এরাই সফলকাম।"

উল্লেখিত আয়াতে মুসলিম জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, শুধু নিজেকে পাপাচার ও মন্দ থেকে রক্ষা করা করলেই চলবে না, বরং সমাজ সংশোধনে এবং পাপে নিমজ্জিত মানুষকে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করতে হবে। এজন্য মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে হবে। এর মধ্যে গোটা সমাজের কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি নিজে নীতিবান হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সমাজে ন্যায়নীতি চালু ও অন্যায়-অনৈতিক কাজ বন্ধ করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। এজন্যই রাসূল সা. বলেন-[২] *"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে তাহলে সে যেন তা হাত (শক্তি) দিয়ে পরিবর্তন করে; যদি তা না পারে তবে যেন জবান দিয়ে (প্রতিবাদের দ্বারা) পরিবর্তন করে; যদি তাও না পারে তবে যেন অন্তর দিয়ে (ঘৃণা করে তা) পরিবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করে।"*

ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের বিকাশ এবং অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরের বিনাশ সাধন করা কুরআন বা ইসলামী নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর উপরই সমাজের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। এর মাধ্যমে মানব কল্যাণ এবং সমাজে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাই কুরআনে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ ও সমাজ সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটা সমাজকে আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার উপর টিকে থাকতে সাহায্য করে। এজন্য কুরআনে এটাকে মুসলিম উম্মাহর জন্য সার্বক্ষণিক বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে ন্যস্ত করেছে। মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য সত্যের পক্ষ অবলম্বন, ভালো ও কল্যাণকর কাজের প্রসার ঘটানো এবং তাতে পরস্পরকে সহায়তা করা। আর সমাজ থেকে অন্যায় ও অপরাধ উৎখাত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। মহান আল্লাহ বলেন-[৩] كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের অবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎকার্যে নিষেধ করবে এবং আল্লাহে বিশ্বাস করবে।"

উল্লেখিত আয়াতে সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করা মুসলিম জাতির দায়িত্ব হিসেবে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সমাজের একদল লোকের উপর তা পালন করা ফরয। প্রত্যেক সমাজের কিছু লোক এ কাজ আঞ্জাম দিলে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হবে। কিন্তু সমাজের কেউই এই দায়িত্ব পালন না করলে সবাই পাপী ও অপরাধী বলে গণ্য হবেন।

> এ কারণে রাসূল (সা.) বলেন[৪], "তোমাদের কেউ কোথাও আল্লাহর জন্য কথা বলার প্রয়োজন বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কথা না বলে নীরব থাকাকে হালকাভাবে দেখবে না। কারণ, আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বল নি? তখন সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি মানুষকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমি তো ভয় পাওয়ার অধিক হকদার ছিলাম।"

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সর্বকালের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজ। এই কাজের মিশন দিয়ে মহান আল্লাহ সকল নাবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন। যুগে যুগে নাবী-রাসূল ও পূণ্যবান ব্যক্তিরা এ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন।[৫] রাসূল সা. এর জীবনীতে দেখা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূল সা. ইন্তিকালের পূর্বে শেষ যে কথাটি বলেছিলেন, *তা ছিল 'সালাত ও অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া সংক্রান্ত'*–যা ছিল মূলত সৎকাজের আদেশ সম্বলিত। নাবী-রাসূলগণের অবর্তমানে এ কাজ না করা হলে নবুওয়্যতের মিশন স্তব্ধ ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। এই কাজ চালু না থাকলে সমাজের মানুষ দ্বীনবিমূখ হয়ে পড়বে, মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা ও গোমরাহির বিস্তার ঘটবে, সমাজে ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, মানুষ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হবে। অন্যায় ও পাপাচার বিস্তৃতি লাভ করে এবং দুর্বৃত্তদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান মুসলিম জাতি এ ব্যাপারে উদাসীন হওয়ায় মুসলিম সমাজে অন্যায়-অনাচার, অপরাধ, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আজ প্রত্যেককে নিজ নিজ পরিবার, সমাজ ও জাতির মধ্যে এই মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ কাজে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে[৬]– وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ- "আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।" অন্যত্র আরও বলা হয়েছে–[৭]

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا -وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

"আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রাসূল, নাবী। আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।"

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার এবং মূল্যবোধের বিকাশ সাধিত হয়। এ কারণে সকল নাবী-রাসূলের এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নাবী-রাসূলগণ আত্মসংশোধনের সাথে সাথে সমাজ সংস্কারে নিজেদের

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৫:০২, ৩৩:৭০,০৩:১৩৫।

[২].মূল আরবী[من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা নং৪৯; *সুনান আবূ দাউদ*, হা.১১৪০।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১১০।

[৪]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৩, পৃ.৩০, হা. নং ১১২৭৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১১৩-১১৫; আরও দেখুন,আল-কুরআন ০৯:১১২।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা' ২৬: আয়াত ২১৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা মার্‌ইয়াম ১৯: আয়াত ৫৪-৫৫; আরও দেখুন,আল-কুরআন ২০:১৩২।

উৎসর্গ করতেন। এ কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করায় তাঁদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন[১]- وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ-"আর আমি তাঁদেরকে (নাবী-রাসূল) নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।"

সুন্দর সমাজ গঠনে শুধু সৎ কাজের আদেশই যথেষ্ট নয়, বরং অসৎ কাজের নিষেধ করাও জরুরী। সমাজে অনাচার যাতে মাথচারা দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য সৎ কাজের আদেশের সাথে সমান গুরুত্ব দিয়ে অসৎ কাজের নিষেধ অব্যাহত রাখতে হবে। অসৎ কাজের নিষেধও ফরয। এ ব্যাপারে অবহেলা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও আযাবের কারণ। এ কারণে আল্লাহ অনেক জাতিকে ধ্বংস করেন। এ কাজ না করার কারণে নাবী-রাসূলগণ বিভিন্ন জাতিকে বদদোয়া ও অভিশাপ দিয়েছেন। এ মর্মে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে[২]– لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার কর্তৃক লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং তারা সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ!"

অসৎ কাজের নিষেধের ব্যাপারে হাদীসেও তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৩]–

> "মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারীকে হাত ধরে বাঁধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং তাকে ন্যায় ও সত্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।" অন্যত্র আরও বলেন[৪] –"কোনো সমাজের মধ্যে যদি এমন লোক থাকে যে সেখানে অন্যায়-পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং সেই সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পরিবর্তন না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।"

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কাজে তৎপর থাকা মু'মিনদের অন্যতম কর্তব্য।[৫] সাহাবী ও প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক সক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির উপর বিশেষ কর্তব্য। সক্ষম জ্ঞানী এ কাজে উদাসীন হলে তারা ভর্ৎসনার যোগ্য হবে। এ কাজ না করার কারণে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের আল্লাহ ভর্ৎসনা করেন। মহান আল্লাহ বলেন[৬]لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ– "রাব্বানীগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা অতি নিকৃষ্ট।"

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধের দ্বারা বান্দা কল্যাণ লাভ করে এবং পাপ থেকে দায়মুক্ত হয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৭]"যখন পৃথিবীর উপরে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তাহলে সেই ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপমুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে অংশগ্রহণের পাপে পাপী হবে।"

পক্ষান্তরে, এ কাজে উদাসীনতা পরিণাম মন্দ। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা: বিশিষ্ট নাবী ইউশা ইবন নূন('আ.) প্রতি ওহী আসে যে, তাঁর জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। তাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎলোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। তিনি নিবেদন করলেন, হে প্রভু!(অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই আছে) সৎ লোকদের ধ্বংস করা হচ্ছে কেন? উত্তর এল, এ সৎ লোকগুলো অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও উঠাবসা করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্ন ফুটে ওঠেনি।[৮]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন ব্যক্তির উপর বিশেষ কর্তব্য। ক্ষমতাসীনরা এ কাজে উদাসীন হলে পরকালে তিরস্কৃত ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন-[৯] الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে, আর সব কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"

এই আয়াতটিতে ছালাত আদায় ও যাকাত প্রদান করার পাশাপাশি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার কথা বলা হয়েছে। আর এখানে সৎ কাজের আদেশ বলতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং অসৎ কাজের নিষেধ বলতে শিরকের

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ৭৩।
[২] . আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৭৮-৭৯।
[৩]. *সুনান আবূ দাঊদ*, কিতাবুল মালাহিম, হাদীস নং ৪৩৩৮ ও ৪৩৩৭।
[৪].মূল আরবী[ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا]*সুনান আবূ দাঊদ*, কিতাবুল মালাহিম, হা. নং ৪৩৩৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ : আয়াত ৭১।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৬৩।
৭.মূল আরবী[إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها]*সুনান আবূ দাঊদ*, কিতাবুল মালাহিম, হা.৪৩৪৫।
[৮]. আবূ হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.৫৩৩।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৪১।

উচ্ছেদ বুঝানো হয়েছে।[১] এটা করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। তাই ক্ষমতাসীনদের উপর এর আঞ্জাম দেয়া একান্ত কর্তব্য।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কুরআনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও বড় পূণ্যের কাজ। এ কাজে গরিমসি বা বিলম্ব করা সমীচীন নয়। দ্বিতীয় খলীফা উমার রা. শহীদ হওয়ার পূর্বে মারাত্মকভাবে যখম হয়ে যখন মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন তখন এক যুবক তাকে দেখতে এলো। যুবকটির পরিধেয় কাপড় টাখনুর নীচে ঝুলতে ছিল। এমতবস্থায় উমর রা. যুবকটি কাপড় টাখনুর উপরে পরিধান করার নির্দেশ দিলেন। কারণ রাসূল সা. বলেছেন[২], *'টাখনু নীচে কাপড় পরিধানকারী জাহান্নামী'* ।তাই কোথাও অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখলে প্রত্যেকের উচিত তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার ও অন্যায়কারীকে বর্জন করা নতুবা এর নেতিবাচক কুপ্রভাব নিজের উপর ও সমাজের উপর পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا-

"কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে ,আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যান হয়েছে এবং সেটাকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বস না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে।"

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের নৈতিক নীতিমালা ও শিষ্টাচার:

•সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ঈমানদার এবং দ্বীন ও সমসাময়িক জীবন-জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]- فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "মু'মিনদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।"

•এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি উন্নত নৈতিক চরিত্র, মুত্তাকী ও ইখলাসসম্পন্ন হবেন। মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি ও দ্বীনের রক্ষায় এ কাজ করা। বিশেষ করে এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির উচিত সৎকর্মের জীবন্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া। অন্যকে সৎকাজের আদেশ প্রদানের সাথে নিজেকে তা করতে হবে, নতুবা সমাজ সংশোধনে সফলতা আসবে না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে[৫] أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ– "তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দাও আর তোমরা ভুলে যাও নিজেদের(বেলায়)? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর, তবে কি তোমরা অনুধাবন করো না?" –তবে উদ্ধৃত আয়াত এটা প্রমাণ করে না, যে কাজ নিজে করে না অন্যকে সে কাজের নির্দেশ দেয়া যাবে না। বরং অন্যকে উপদেশ দানের পূর্বে নিজে করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এ কাজ শাসক-শাসিত, জ্ঞানী-সাধারণ, আদিল(ন্যায়পরায়ন) ও ফাসিক সবাই করবে। যদিও ফাসিকের কথা মানুষের ওপর কম প্রভাব বিস্তার করে।

•এ কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে ধৈর্যশীল, বিনয়ী, কোমল, সুভাষী, প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, ক্রোধ দমন, ক্ষমা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হতে হবে এবং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী উত্তম কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৬] –ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।"

এখানে হিকমত হচ্ছে–এমন সব দলিল–প্রমাণ যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে এবং সংশয় দূরীভূত করবে। আর সদুপদেশ বলতে বুঝানো হয়েছে, লাভজনক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলীএবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য।প্রথম পর্যায়ে দাওয়াত দিতে হবে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দিতে হবে সাধারণ গণমানুষকে। এরপর বিষয়টি যদি বিতর্কের ময়দানে চলে যায় তাহলে বিতর্ক হতে হবে সুন্দর শালীন ও সুস্থভাবে অর্থাৎ কথাবার্তায় মাধুর্য ও নমনীয়তা সৃষ্টি করতে হবে ফলে ভিন্নপক্ষের উচ্ছৃংখল আচরণকে সংযত করতে এবং তাদের ক্রোধের আগুনে পানি ঢেলে দিতে সক্ষম হবে।[৭]

•মানুষ গ্রহণ করুক বা না করুক অবিরামভাবে সৎকাজের আদেশ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রথমত ব্যক্তিগতভাবে নসিহত করবে, তাতে ফল না পাওয়া গেলে সামষ্টিকভাবে আদেশ করবে এবং সৎ লোকের সাহায্য নেবে। এ ব্যাপারে সৎকর্মীকে কোন ধরণের হতাশ হওয়া চলবে না। সদপোদেশ কেউ গ্রহণ না করলেও অন্তত এটুকু কল্যাণ তো রয়েছে যে, সদপোদেশ দানকারীর দায়িত্ব পালন হবে এবং নিজে আল্লাহর শাস্তি রক্ষা পাবে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮]–

وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ- فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

"স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, 'তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদের আল্লাহ্‌ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন'? তারা বলল, 'তোমাদের রবের নিকট ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায় তারা সাবধান

---

১. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*,খ. ১৭, পৃ.১৬৪।

২.মূল আরবী[ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৫৪৫০।

৩. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪০।

৪. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১২২।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ৪৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৬১: ০২-০৩।

৬. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ১২৫।

৭. ড.আব্দুল্লাহ আল-মুসলিহ ও অন্যান্য,*মুসলমানকে যা জানতেই হবে*, অনু. আ.মান্নান তালিব ও অন্যান্য(জামেয়া কাসেমিয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯৯), পৃ.৩৬৩।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৬৪-১৬৫।

> হবে'। অতঃপর যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করে। আর যারা যুলম করেছে তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচার করত।"

• এ ব্যাপারে কারো সমালোচনা ও নিন্দার তোয়াক্কা না করা। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–[১] (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ) "আল্লাহ্‌র রাস্তায় তারা জিহাদ করে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করে না।"

•এ কাজে ক্ষেত্রে কোনরূপ শিথিলতা প্রদর্শন করা কিংবা ছাড় দেয়া যাবে না। তবে বিপদে তা সহ্য করার মত যোগ্যতা থাকতে হবে। সুফিয়ার আস-সাওরী রহ. বলেন[২], "যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি (আলিম/দা'য়ী) প্রতিবেশীর নিকট প্রিয়ভাজন এবং বন্ধুদের নিকট প্রশংসিত তিনি শিথিলতা অবলম্বনকারী, ধোঁকাবাজ।"

•অসৎ কাজের নিষেধের পরও যদি অন্যায়কারীর সংশোধন না হয় তবে তার সাথে কোন সুসম্পর্ক রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে দুস্কৃতিকারী, পাপাচারী ও অপরাধী নিকটজন হলেও তাকে পরিত্যাগ ও সর্বাত্মকভাবে বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ কর না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।"

•কবীরা-সগীরা উভয় পাপের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা। এ ক্ষেত্রে প্রথমে শিরক, কুফর, বিদ'আত এরপর অন্যান্য কবীরাগুনাহ তারপর সগীরা গুনাহে বাধা দান। পাপ বা অন্যায়টি বিদ্যমান থাকা, গোয়েন্দাগিরি ছাড়া তা প্রকাশমান হওয়া। বিষয়টি মতভেদপূর্ণ বা সুন্নত পর্যায়ের হলে বুঝিয়ে বলা।

•সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ মূলভিত্তি হবে আল-কুরআন। অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা ও মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই কুরআন প্রদর্শিত পন্থায় মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দের নিষেধ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]–فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ-"সুতরাং যে আমার ধমককে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।"

সর্বপরি, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা করা জরুরী [আল-কুরআন, ০৯:৭১]। উল্লেখ্য যে, এ কাজ হাত তথা শক্তির দ্বারা, মুখ তথা বক্তব্য, লেখনী ভাষার মাধ্যমে এবং অন্তর তথা সংকল্পের দ্বারা করা গেলেও পরিবারিক পর্যায়ে শক্তি ব্যবহার করা গেলেও বর্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ কাজে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ সশস্ত্র কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না।

•সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ যখন জরুরী নয়: সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আবশ্যকতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু নির্দেশ রয়েছে। এ আবশ্যকতার ব্যাপারে সমস্ত ইমাম ও আলেম একমত পোষণ করেছেন। তবে যদি কখনও কারো ভয়-ভীতি আশঙ্কা মারাত্মক হয় তবে তার জন্য পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকার অবকাশ আছে। মহান আল্লাহ বলেন[৫]–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ - "হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে থাক তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" এ আয়াতের ব্যাপারে রাসূলুলাহ (সা.) বলেছেন :

> তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাক। এরপর যখন দেখবে মানুষের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালো লাগা মন্দ লাগার আনুগত্য, দুনিয়ার প্রাধান্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেককে তার নিজ মতকেই উত্তম মনে করছে তখন তোমরা সাধারণের বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, নিজেকে রক্ষা কর, নিজের চিন্তা কর এবং সাধারণ মানুষকে ত্যাগ কর।[৬]

এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, 'যতক্ষণ তোমাদের কথা গ্রহণ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে থাক। আর যখন প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন নিজের চিন্তা নিজে কর, (অন্যের সংশোধনের চিন্তা বাদ দাও)'। ...মাকহূল (রহ.) বলেন-'যখন উপদেশ দাতা অত্যাচারিত হওয়ার ভয় করে, যাদের প্রতি উপদেশ দেয়া হয়েছে তারা উপদেশকে অবজ্ঞা করে, তখন নিজের চিন্তা নিজে কর, যদি তুমি সৎপথে থাক তবে অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'[৭]

সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধের প্রতিদান: সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ করা একটি শ্রেষ্ঠ পূণ্যের কাজ। এর পার্থিব ও পরকালীন পরিণাম প্রতিফল উত্তম। এতে মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ঘটে, অন্যায় ও খারাপ কাজ বন্ধ হয় এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। এটা ব্যক্তির পরকালীন মুক্তি, কল্যাণ, পূণ্য ও

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৫৪।

২. মূল আরবী [اذا كان الرجل محببا في جيرانه محمودا عند اخوانه فاعلم أنه مداهن] আয-যামাখশারী, *আল-কাশ্‌শাফ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ০১, পৃ.৪২৬।

৩. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ২৩।

৪. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ৪৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৩:১৩৮, ২১:৫০, ২১:১০, ৮১:২৭-২৮।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১০৫।

৬. মূল আরবী[إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, হা. নং ৩০৫৮।

৭ .আবূ বকর আল- জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি.) পৃ.১৫৭-১৫৮।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বড় মাধ্যম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১], مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ "যে সৎকাজ নিয়ে এসেছে, তার জন্য হবে তার দশ গুণ। আর যে অসৎকাজ নিয়ে এসেছে, তাকে অনুরূপই প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদেরকে যুল্‌ম করা হবে না।" অন্যত্র বলেন[২] – مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا "কেউ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে।"
এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন[৩], "যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে "নাবী সা. মিম্বরে ওয়াযরত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, সর্বোত্তম লোক কে? তিনি বললেন, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, যে সবচেয়ে মুত্তাকী, যে সবচেয়ে বেশী সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং যে সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করে।"[৪]

❑.সৎ ও কল্যাণকর কাজের প্রসার এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা:

সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ও মূল্যবোধ বিকাশে সৎ কাজের প্রসার ও প্রতিযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ও উপাদান। সৎকর্মের ব্যাপারে সহযোগিতা মানুষকে সত্যের পথে চলতে এবং অসত্য ও মন্দ পথ থেকে ফিরে আসতে সহায়তা করে। এতে ব্যক্তির নৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়। এটা মানুষের নৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এতে মানুষ ভালো কাজে আগ্রহী এবং মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত হয়। তাই সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সমাজের সদস্যদের উচিত ভালো কাজের প্রসার ঘটানো। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৫], فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ "সুতরাং তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর।" অন্যত্র বলেন[৬] وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"

> রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৭], প্রত্যেক মুসলিমের সাদকা করা উচিত। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্! কেউ যদি সাদকা দেয়ার মত কিছু না পায় ? (তিনি উত্তরে) বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সাদকাও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি এরও সামর্থ্য না থাকে ? তিনি বললেন, কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তাঁরা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা তার জন্য সাদকা বলে গণ্য হবে।

ইসলামী নৈতিকতার একটি বিশেষ দিক মানুষের মধ্যে ভালো কথা ও কাজের প্রসার ঘটানো। মানুষকে ভালো কথা ও কাজের প্রসারের আহবান জানানো। কেননা ভালো কথা ও কাজ মানুষের ভালোর দিকে পরিচালিত করে। পক্ষান্তরে, খারাপ কথা ও কাজ মানুষের খারাপের দিকে ধাবিত করে। এজন্য কুরআন ভালো ও উত্তম কথাকে বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট ফলদানকারী সুদৃঢ় উৎকৃষ্ট বৃক্ষের সাথে আর মন্দ কথা নিকৃষ্ট বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে।[৮] তাই প্রত্যেকের উচিত সর্বাবস্থায় ভালো কথা বলা, ভালোর অনুসরণ করা এবং ভালোর প্রসার ঘটানো। মহান আল্লাহ বলেন[৯] (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) "আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল।"

❑.প্রামাণিক স্বাক্ষ্য-বিবৃতি প্রদান:

সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা একটি উত্তম নৈতিক গুণ। প্রামাণিক কোন বিবৃতি বা সাক্ষ্য প্রকাশের ব্যাপারে কোন ধরনের সংকোচ বা ভীরুতা প্রদর্শন এক ধরনের নৈতিক দুর্বলতা। প্রামাণিক সাক্ষ্য গোপন অন্যায়কে এক ধরনের আশ্রয়-প্রশয় দানের শামিল। এর মাধ্যমে এক দিক থেকে অপরাধকে লালন করার যেমন সুযোগ দেয়া হয় অন্যদিক থেকে তেমনি অপরাধীকে রক্ষা করা হয়। এর ফলে সমাজে অপরাধীরা সাহসী হয় ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। সমাজে ইনসাফের পরিবর্তে যুলুমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[১০]– وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ "আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে।" এজন্য সাক্ষ্য গোপনকে অপরাধ গণ্য করে মহান আল্লাহ বলেন[১১] – وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। তোমরা

---

১ . আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬: আয়াত ১৬০; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৪ : ১৩৫।
২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ০৪ : আয়াত ৮৫।
৩.**মূল আরবী** [من دل على خير فله مثل أجر فاعله] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৯৩।
৪.**মূল আরবী** [خير الناس أقرؤهم واتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৬, পৃ.৪৩২, হাদীস নং ২৭৪৭৪।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৪৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৫:৪৮, ০৩:১৩৩।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-‘আস্‌র ১০৩ : আয়াত ০১-০৩, আল-কুরআন ৯০ :১৭-১৮।
৭.মূল আরবী [على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل ؟ قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل ؟ قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫৬৭৬, *সহীহ মুসলিম*,কিতাবুয যাকাত, হা. ১০০৮।
৮. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ২৪-২৬।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ ১৭: আয়াত ৫৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৯:৫৫, ২২:২৪।
১০ .আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ০২।
১১ .আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮৩।

যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[১]–وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى-"যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও।"

মহান আল্লাহ প্রদত্ত আল-কুরআনের প্রামাণিক সত্য বিবৃতি গোপন করা সবচেয়ে অন্যায়। এতে মানুষ সত্যচ্যুত হয়ে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতিল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[২] وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "আর তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য রয়েছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে গাফিল নন।"

মু'মিনরা সৎ সাহসী হয়। এটা তাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা সত্য স্বাক্ষ্য বা বিবৃতি প্রদান করতে ভয় পায় না কিংবা কোন দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ-"আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল।"

❑. পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসা ও সংশোধন:

পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসা ও সংশোধন একটি মহৎ কাজ। এটা সামাজিক সম্প্রীতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং মূল্যবোধ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতে সমাজে শান্তি ও কল্যাণের বিস্তার ঘটে। এজন্য কুরআন মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ দূর করে আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-"নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।" আরও বলেন[৫], فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ -"সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও।"

উল্লেখিত আয়াতে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। মুসলিম জনগণের মধ্যে শান্তি সংরক্ষণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সকল সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যবহার করার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ প্রদান করে। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় হাদীসে বলা হয়েছে-[৬], "যে ব্যক্তি দুই বিবাদমান দলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য মিথ্যা কথা বলে সে মিথ্যুক নয়।"

কুরআন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। মুসলিমদের শান্তি বিনষ্টকারী ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত কিংবা শান্তি ও আপোষ-মীমাংসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করারও নির্দেশ দেয়। এ মর্মে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-[৭] وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।"

মানুষের পরস্পরের মাঝে বিবাদমান বিষয় মীমাংসা করে দিলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু, এতে বিপুল ছওয়াব পাওয়া যায়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৮]– وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ "সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমার পরস্পর সাহায্য করবে। আর মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।" এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, ছালাত ও সাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, 'বিবাদমান বিষয়ে মীমাংসা করা'। কেননা এটা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি সৃষ্টিকারী।[৯] তিনি আরও বলেন, 'তোমার দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়সালা করা সাদাক্বা'।[১০]

পরস্পারিক সংশোধন এমন একটি কাজ, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়। এ কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। এ কাজ পরিত্যাগের মধ্যে সমূহ ক্ষতি রয়েছে তাই প্রত্যেকের উচিত এই কর্তব্য পালন করা।

لاَّخَيْرَفِي كَثِيرٍمِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّمَنْ أَمَرَبِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْإِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬: আয়াত ১৫২।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৪০।

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মা‘আরিজ ৭০: আয়াত ৩৩।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১০।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ০১।

৬. **মূল আরবী** [ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুস সুলহ,হা.নং ২৫৪৬; *সহীহ মুসলিম*, হা. নং ২৬০৫।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৯।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০২।

৯. **মূল আরবী** [ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ " قالوا بلى يارسول الله قال " إصلاح ذات البين وفساد ذات البيت الحالقة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯১৯, *সুনান তিরমিজী*, আবওয়াবুল ফিতান, হাদীস নং ২৫০৯।

১০. **মূল আরবী**[كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সুলহ, হা.নং ২৫৬০; *মুসলিম*, হা.১০০৯।

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খায়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব।"[১]

রাসূল সা. ও সাহাবীগণের জীবনীতে দেখা যায় যে, তারা এরূপ দায়িত্ব পালন করতেন।.যেমন মারুর ইবন সুয়াইদ রা. বলেন, এক সময় আমি আবূ যার রা. কে দেখলাম যে, তাঁর গায়ে যে চাদর, অনুরূপ চাদর তার খাদেমের পরনেও। আমি তাঁকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একদা তিনি রাসূল সা. এর সময় এক (ক্রীতদাস) ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলেন এবং তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলেন। অতঃপর সে লোকটি নাবী সা. এর নিকট এসে ঘটনাটি বললেন, তখন নাবী সা. আবূ যারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি তো এমন ব্যক্তি যার মধ্যে মূর্খতা রয়েছে'...।[২] এভাবে রাসূল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভদ্র কথা ও আচরণের মাধ্যমে মানুষকে সংশোধন করতেন। এ ধরনের অসংখ্য নজির আছে। সাহাবাগণও এ ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বন্ধব, প্রতিবেশী, অধীনস্থ ও সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য যা ক্ষতিকর, পাপ, অন্যায়, অনুচিত তা থেকে তাদের বুদ্ধিমত্তা, ভালবাসা দিয়ে ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে সতর্ক করা। যে সব বিষয় তাদের জন্য কল্যাণ ও উপকারী সে সব বিষয়ে বিশেষভাবে উপদেশ দেয়া, গুরুত্ব তুলে ধরা, এবং তাতে উৎসাহিত করা। সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বিশেষ করে শাসক, জ্ঞানী শ্রেণীকে বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাদের লজ্জিত না করে তাদের বিবেক ও উপলব্ধিবোধ জাগ্রত করা। কাজের পরিণতি তুলে ধরে সতর্ক করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন-[৩], 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের আয়না স্বরূপ। আবার এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাইও। কাজেই একজনের উচিত অপরজনকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এবং তার অনুপস্থিতিতে তার জন-মাল রক্ষা করা'। অন্য বর্ণনায় এসেছে-[৪] 'তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের (মুসলিম) ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। অতএব সে যদি তার মধ্যে কোন দোষ লক্ষ্য করে, তবে তা যেন দূর করে দেয়।'

❑.পারস্পরিক দয়া, স্নেহ ও ভালবাসা:

দয়া, স্নেহ ও ভালবাসা উত্তম মানবীয় গুণ। এটা মহান আল্লাহ একটি উল্লেখযোগ্য গুণ, যা তিনি নিজের জন্য স্থির করে নিয়েছেন।[৫] প্রত্যেক নাবী-রাসূল ও মহৎ ব্যক্তিরা এই বিশেষ গুণের অধিকারী।[৬] সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, অশান্তি, বৈরীতা রোধে পারস্পরিক দয়া ও ভালবাসার বিকল্প নেই। আদর্শ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি মূল্যবান উপাদান। এতে উৎসাহ দিতে বলা হয়েছে[৭]– ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ- أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ -"অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের, আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় দয়া–অনুগ্রহের। তারাই সৌভাগ্যবান।" এ আয়াত দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্য সমাজের সকলের মধ্যে ধৈর্য ও দয়ার ব্যাপক চর্চা করা, যাতে তা সামাজিক রূপ নেয়। ফলে সমাজ শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। এর গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না।"[৮]

পারস্পরিক দয়া ও ভালবাসা মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা পরস্পরে রহমদিল এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতি বজ্রকঠিন। এ মর্মে কুরআনে এসেছে[৯]– وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ "এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর;পরস্পরের প্রতি সদয়। " অন্যত্র এসেছে[১০]-أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ -"তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে।"

দয়া ও ভালবাসা বিপরীত নিষ্ঠুরতা ও রূঢ়তা, যা অমানবিক গুণ। আচরণের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা ও রূঢ়তা মানুষকে কষ্ট দেয়। নিষ্ঠুর ও রূঢ় ব্যক্তিকে কোন মানুষ পছন্দ করেন না। এটা মহান আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ লাভের পথে অন্তরায়। এ মর্মে উমার রা. বলেন–"যে লোক অন্যের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে না। যে লোক অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে না, তার অপরাধও ক্ষমা করা হবে না। যে ব্যক্তি অন্যের অনুশোচনা কবূল করে না, তার অনুশোচনাও কবূল করা হবে না। যে ব্যক্তি নিজে সতর্ক হয় না, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করা হবে না।"[১১]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১১৪।
[২].মূল আরবী [إنك امرؤ فيك جاهلية] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব, হা.নং ৫৭০৩; *মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, হা.১৬৬১।
[৩]. মূল আরবী [المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯১৮।
[৪]. মূল আরবী [إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯২৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১২, ৫৪,১৩৩, ১৪৮; আল-কুরআন ২:৩৭; ৫৪, ১৮:৫৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭: আয়াত ২৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বালাদ ৯০: আয়াত ১৭-১৮।
[৮]. মূল আরবী [لا يرحم الله من لا يرحم الناس] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং ৬৯৪১।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা ৪৮: আয়াত ২৯।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা ০৫: আয়াত ৫৪।
[১১]. মূল আরবী [من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لا يتوب لا يتاب عليه ومن لا يتق لا يوقه] *কানজুল উম্মাল*, খ.১৬, পৃ.১৮২, হাদীস নং ৪৪১৮৬।

❑. ক্ষমা, উদারতা ও ক্রোধ সংবরণ (العفو, السماحة):

প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ প্রদত্ত অন্যায় আচরণ ও কষ্ট মাফ করে দেয়ার নামই ক্ষমা ও উদারতা। শাস্তিযোগ্য অপরাধ করার পরও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষমা ও উদারতা প্রশংসনীয় মহৎ গুণ। এটা মানুষকে মহানুভব করে তোলে। এই গুণ মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সৌন্দর্য ও উৎকর্ষতা আনায়ন করে। পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করে। সমাজে শান্তি-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় এই গুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পক্ষান্তরে, ক্রোধ ও মনের সংকীর্ণতা থেকে প্রতিহিংসা, অন্যের ক্ষতি, পরশ্রীকাতরতা ও জীঘাংসা মনোবৃত্তির জন্ম নেয়। তাই কুরআন মু'মিনদের মন্দ আচরণ ক্ষমা করার এবং মনের সংকীর্ণতা পরিহার নির্দেশ দেয়। ঘৃণা ও শত্রুতার পরিবর্তে ক্ষমা অবলম্বন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১]– خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ "তুমি ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চল।"
উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূল সা. এর মর্ম বুঝতে জিবরাইল আ. জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "হে মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ আপনার উপর যুলম করলে আপনি ক্ষমা করুন। কেউ আপনাকে বঞ্চিত করলে আপনি দান করুন। কেউ (আত্মীয়তা) সম্পর্ক ছিন্ন করলে আপনি (আত্মীয়তা) সম্পর্ক রক্ষা করুন।"[২]

ক্ষমা ও উদারতা মহামানবদের গুণ। কুরআনে বর্ণিত ইউসূফ ('আ.) এর কথা এ প্রসংঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইউসুফ ('আ.) এর সাথে তাঁর ভাইয়েরা চরম অন্যায় করেন। তাঁর ভাইয়েরা প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে তাঁকে কুয়ায় ফেলে দেয়। এরূপ চরম অমানবিক আচরণ সত্ত্বেও পরবর্তীতে তিনি মিশরে ক্ষমতাসীন হলে তাঁর ভাইরা তাঁর নিকট সাহায্যের জন্য আসলে তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। যা কুরআনে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে[৩]–قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "তিনি (ইউসুফ) বলল, 'আজ তোমাদের উপর কোন ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু'।" এ মর্মে নাবী সা.বলেন-[৪] "কোন মুসলিম কোন ভুল করে অনুতপ্ত হয়ে অপর মুসলিমের কাছে ওজর পেশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করলে অপর মুসলিম যদি তার ওজর কবুল না করে এবং তাকে ক্ষমা না করে তবে সে যালিম ট্যাক্স আদায়কারীর ন্যায় অপরাধী হবে।"

মুহাম্মাদ সা. ক্ষমা ও উদারতার মূর্তপ্রতীক। তিনি নিজ জীবন ও কর্মে ক্ষমা ও উদারতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এ প্রসংগে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা হচ্ছে: গাজওয়াতুস্ সায়িক[৫] এর অব্যাহতির পর মুহাম্মদ সা. তাঁর তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছের তলায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন; একটি কর্কশ শব্দ শুনে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলো। তিনি দেখলেন যে, একজন দুশমন যোদ্ধা মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে চিৎকার করে বলল, হে মুহাম্মদ! কে এখন তোমাকে সাহায্য করবে? রাসূল সা. উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ', দুরন্ত বেদুইন সহসা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল ও তার হাত থেকে তরবারী খসে পড়ল। রাসূল সা. তৎক্ষণাৎ তরবারীখানা নিজ হস্তে ধারণপূর্বক ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্চস্বরে বললেন, উহে দুরসুর তোমাকে কে এখন রক্ষা করবে? সৈনিক উত্তর দিল, হায় কেউ নেই। রাসূল সা. বললেন –তবে আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও কিভাবে দয়ালু হতে হয়। এই বলে তিনি সৈনিককে তরবারী ফেরত দিলেন। আরববাসীটির হৃদয় বিজিত হলো; পরবর্তীকালে তিনি রাসূল সা. এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবিচল শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন।[৬]
বর্ণিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা. আক্রমণকারী লোকটিকে কোনো ধরনের শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন। অথচ শাস্তি প্রদানে কোনো বাঁধাও ছিল না। আমরা সেই রাসূলের উম্মত হয়ে শত্রুদের ক্ষমা করা তো দূরের কথা নিজ মুসলিম ভাইকেই ক্ষমা করতে পারি না। আমরা যদি নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলোতে একে অপরের প্রতি ক্ষমার নীতি অনুসরণ করতাম, তাহলে আমাদের সমাজ অন্য রকম হতে পারত।

রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের ক্ষমাপরায়ন ও উদার হতে শিক্ষা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের ঘটনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য– মক্কাবাসী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সা. ও মুসলিমগণ চরম অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেন। এক পর্যায়ে তারা মদীনায় হিজরত করেন, সেখানেও মক্কাবাসী তাদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ সা. নের্তৃত্বে মুসলিমগণ যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তারা মক্কাবাসীর প্রতি অপূর্ব ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক P.Q. Hitti, বলেন–'বিজয়ী মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশের সময় যেরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাচীন ইতিহাসে তার নজির দেখা যায় না।'[৭]

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৯৯।
[২] .মূল আরবী [إن الله يأمرك أن تعفوَ عمن ظلمك، وتعطيَ من حرمك، وتصل من قطعك] ইবন জারীর তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*,*প্রাগুক্ত*, খ.১৩, পৃ.৩৩০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৯২।
[৪] .মূল 'আরবী " من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره أو لم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب المكس " মিশকাত, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৫০৫২ (সনদ দুর্বল)।
[৫]. বদর যুদ্ধের পরপরই মক্কার কাফিররা তাদের পরাজয়ের ক্ষোভ মিটাতে মদীনার অভ্যান্তরে অতর্কিতভাবে হামলা করে লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড চালায় ও কিছু খেজুরের বাগান ধ্বংস করে। মুসলমানরা এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হলে কাফিররা পলায়ন করে চলে যায় ইতিহাসে এটাই গাজওয়াতুস্ সায়িক।
[৬]. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, অনু. রশীদুল আলম, (ঢাকা: আয়েশা কিতাব ঘর, ১ম সং ২০০২),পৃ. ১৩০।
[7]. P.Q. Hitti, *Op.cit.*, p.118.

ক্রোধ সংবরণ: ক্রোধ সংবরণ একটি উত্তম গুণ। সকল নাবী-রাসূল ও মহানুভব ব্যক্তি এই উত্তম গুণের অধিকারী ছিলেন। এটা মু'মিনদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ গুণ মানুষকে মহৎ করে তোলে। এর মাধ্যমে সমাজে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ "এবং তারা (মু'মিনরা) ক্রোধাবিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়।" অন্যত্র ইরশাদ করেন-[২], وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। ক্রোধের সময় যারা নিজের সংযত রাখতে পারে তারা উন্নত নৈতিকতার অধিকারী। তাদের প্রশংসায় বলা হয়েছে-[৩] "সে ব্যক্তি প্রকৃত বীর নয়, যে কুস্তি লড়ে অপরকে পরাজিত করে। বরং প্রকৃত বীর সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজকে সংযত রাখে।" অর্থাৎ রাগ করে এমন কোন কথা বলে না বা কাজ করে না যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অপছন্দ করেন।

ক্রোধ সংবরণ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় গুণ। এই গুণের অধিকারীদের তিনি ভালবাসেন।[৪] এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, করুণা ও রহমত লাভ করা যায়। এটা মহৎ গুণের উপর অটল থাকার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৫] –

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-

"আর তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন শপথ না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, অভাবগ্রস্তদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

ক্রোধ সংবরণের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল(সা.) বলেন-[৬],"প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্রোধ দমন করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এনে সে যে হুরকে গ্রহণ করতে চায় তাকে তা গ্রহণের এখতিয়ার দেবেন।"

প্রয়োজনে যুলম-অন্যায়ের প্রতিরোধ: কুরআন ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শনকে প্রতিশোধ স্পৃহার ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। বিশেষ করে ব্যক্তিগত আঘাত বা ত্রুটিকে ইসলাম ক্ষমার ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহিত করেছে। ইসলাম সেই ব্যক্তিকে বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছে যে প্রতিশোধের পূর্ণ ক্ষমতা থাকার পরও ক্ষমা করে দেয়। বস্তুত এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নততর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শান্তি-সংহতি বৃদ্ধি পায়।[৭] কিন্তু যে ক্ষমা অন্যায়কারীকে অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে এবং মন্দ পরিণতি বয়ে আনতে পারে সেখানে প্রতিশোধই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, এরূপ ক্ষেত্রে কুরআন প্রতিশোধের অনুমতি দেয়। 'কেউ এক গালে চড় দিলে অপর গাল এগিয়ে দাও'–ইসলাম এই অপমান বা অন্যায়কে গ্রহণ করতে বলে না। কারণ এতে মানব মর্যাদার অবমাননা করা হয় এবং অন্যায়ের কাছে দুর্বলতা দেখানো হয়। এ ধরনের দুর্বলদের ক্ষমা অন্যায়কারীর নিকট গুরুত্বহীন। তাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিশোধ অন্যায় নয়। তবে প্রতিশোধের প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে আইনের সীমা যাতে অতিক্রম না করা, সেজন্য বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৮]–

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ-وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ-وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ-إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ-وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

আর তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হলে তারা তার প্রতিবিধান করে। আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিস্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিমদের পছন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর যুলম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয় দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

উল্লেখিত আয়াতসহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ক্ষমা ব্যাপারে উৎসাহিত করা হলেও যে ক্ষমা যালিমকে অন্যায় কাজে উৎসাহিত করে সেক্ষেত্রে যালিমের যুলমের প্রতিবিধান নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে অন্যায় হ্রাস পাবে। দুস্কৃতিকারীর অন্যায় দাপট দূর হবে।

❑.ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবেলা :

মানুষ সর্বদা অন্যের উপর বিজয়ী হতে চায়। তাই প্রতিপক্ষ থেকে পাওয়া মন্দের জবাব আরও মন্দভাবে দেয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে সমাজে মন্দের বিস্তার ঘটে। পক্ষান্তরে, মন্দের জওয়াব ভালো দ্বারা দেয়া হলে প্রতিপক্ষ আর অগ্রসর হবে না, প্রতিপক্ষের মনের ক্ষোভ উদ্বেলিত হওয়ার কোন উস্কানি থাকবে না, ফলে তার মন শান্ত হবে, শান্ত মনে নিজের

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা ৪২: আয়াত ৩৭।
[২] .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৩৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪২:৪৩, ৬৪:১৪।
[৩]. মূল আরবী [ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদব,হা.নং ৫৭৬৩, *মুসলিম*, হা.২৬০৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৩৩-১৩৪।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ২২।
[৬]. মূল আরবী [من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيرضه من أي الحور شاء] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৭৭৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১: আয়াত ৩৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৩৯-৪৩।

আচরণ সম্পর্কে সে চিন্তা করতে পারবে এবং নিজের ভুল বুঝতে পারবে ও প্রতিপক্ষের আচরণের উৎকর্ষে সে মুগ্ধ হবে। এভাবে একজন বৈরী শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে স্পৃহার উচ্ছাসে যারা ভেসে যায় তারা মনস্তাত্ত্বিক এই প্রক্রিয়ায় শত্রুকে জয় করতে পারে না।

ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধের সৌন্দর্যতম দিক হলো– 'ভালোর দ্বারা মন্দের এবং ন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করা'। কেননা ভালো জন্ম দেয় ভালোর; আর মন্দ মন্দের জন্ম দেয়। ভালোর মাধ্যমে মন্দ দূর করতে পারলে সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে মন্দ দূর হয়। এতে শুধু সমাজ থেকে অন্যায় নির্মূলই হয় না বরং শত্রু অকৃত্রিম বন্ধুতে রুপান্তরিত হয় এবং এর মাধ্যমে অসাধ্য সাধন করা যায়। অন্যায়কারী অন্যায় থেকে স্বেচ্ছায় সরে এসে ভালো হয়ে যায়। এই মহৎ গুণ অর্জনের মাধ্যমে আমরা সমাজ ও জাতীয় জীবন থেকে উত্তমভাবে অন্যায়কে প্রতিহত করতে পরি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[১]

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ-وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ-

> ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর ভালোর দ্বারা ; তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা মহাভাগ্যবান।

ভালোর দ্বারা মন্দ প্রতিহত করা মহামানবীয় গুণ। উদ্ধৃত আয়াতে এই মহান গুণের অধিকারীর প্রশংসা করে এ গুণ অর্জনে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূল সা. মু'মিনদের এই গুণ অর্জনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। এবং তিনি নিজ কর্মের দ্বারা এ ব্যাপারে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য ঘটনার একটি হলোঃ একবার জনৈক বেদুইন নাবী সা. চাদর ধরে সজোরে টান দিয়ে তাঁর কাছে যাকাত থেকে কিছু চাইল যার ফলে তাঁর শরীরে দাগ পড়ে যায় তিনি (রাগ না করে) তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিয়ে তাকে যাকাতের মাল থেকে কিছু দিতে নির্দেশ দিলেন।[২]

অসৌজন্য ও মন্দ আচরণের পরিবর্তে ভালো আচরণ উন্নত নৈতিক গুণ। নাবী-রাসূল এবং ও পূণ্যবান মু'মিনগণ এই গুণের অধিকারী। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ- "এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম।" এখানে ভালো দ্বারা মন্দ দূরকারী মু'মিনদের প্রশংসা করে তাদের শুভ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

সুবিধাবাদী কিংবা ভালোর বিনিময়ে ভালো করা এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন[৪],

> তোমরা অনুকরণ প্রিয় বা সুবিধাবাদী হয়ো না যে, তোমরা এরূপ বলবে, লোকেরা যদি আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তবে আমরাও ভালো ব্যবহার করব। যদি তারা আমাদের উপর যুল্ম করে তবে আমরাও যুল্ম করব। বরং তোমরা নিজেদের হৃদয়ে এ কথা বদ্ধমূল করে নাও যে, লোকেরা তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে। তারা তোমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করলেও তোমরা যুল্মের পথ বেছে নিবে না।

❑.অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন (كتمان الستر) এবং অন্যের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ (حسن الظن) :

কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন অন্যায়-অপরাধ করলে তার দোষ-ত্রুটি প্রচার না করা একটি উন্নত নৈতিক গুণ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বড়ই পূণ্যের কাজ। সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–"যে ব্যক্তি কারো দোষ-ত্রুটি দেখার পর তা গোপন রাখে, সে যেন জীবন্ত কবর দেয়া কন্যাকে জীবন দান করে।"[৫] যারা এ গুণের অধিকারী হবেন মহান আল্লাহ তাদের দোষ গোপন করবেন এবং তারা মানুষের নিকট প্রিয়ভাজন হবে। এ বিষয়ে রাসূল সা. বলেন-[৬], "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।" তিনি আরও বলেন[৭], "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের ওপর আক্রমণ প্রতিরোধ করে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন।"

দোষী ব্যক্তিকে সংশোধনের প্রয়োজন হলে দোষ গোপনের সাথে সাথে ব্যক্তির নাম প্রকাশ না করে বিশেষ পন্থায় সতর্ক করা। হাদীসে এরূপ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। এ মর্মে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) কোন কিছু অপছন্দ করলে তা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠত। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) কখনো কারো অপছন্দনীয় আচরণের জন্য

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১: আয়াত ৩৪-৩৫। আরও দেখুন, আল-কুরআন, ২৩: ৯৬।

[২]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হা. নং ১০৫৭।

[৩] . আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ২২।

[৪].**মূল আরবী**[لاتكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسناوإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلاتظلموا] ***সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২০০৭।**

[৫]. মূল আরবী [من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءدة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৪৮৯১।

[৬]. মূল আরবী [ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর, হাদীস নং ২৬৯৯, *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হা. নং ৪৯৪৪।

[৭]. মূল আরবী [من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ১৯৩১।

এরূপ বলেননি, অমুকের কি হয়েছে যে, সে এমন বলে? বরং তিনি বলতেন, লোকদের কি হলো যে, তারা এমন করে অথবা এমন বলে। তিনি এরূপ আচরণ করতে বারণ করতেন বটে কিন্তু আচরণকারীর নাম উল্লেখ করতেন না।[১]

আজকাল সমাজের মানুষের মধ্যে এই গুণের বড়ই অভাব। বর্তমান সমাজে মানুষের এতই নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে যে, অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করার পরিবর্তে খুঁজে খুঁজে দোষ বের করে থাকে। অনেকে অন্যের দোষ বর্ণনায় তিলকে তালে পরিণত করে। এটা অত্যন্ত মন্দ প্রবণতা এবং হীন চরিত্রের পরিচায়ক। এ ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা.বলেন-[২]

> ওহে লোকসকল! যারা মুখে ইসলাম কবুল করেছ কিন্তু এখনো যাদের অন্তরে ঈমান আসেনি (মযবুত হয়নি) তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় আল্লাহর তার গোপন দোষ প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ যে ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করে দেবেন তাকে আপমানিত করে ছাড়বেন। যদিও সে তার উঠের হাওদার মধ্যে [অন্য বর্ণনা মতে বাড়ীতে] থাকে।" ইমাম তিরমিযী বলেন বর্ণনাকারী নাফি‘ রহ. বলেন, ইবন উমার রা.‘একবার কাবার দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘তুমি কতই না সম্মানিত, কতই না মর্যাদাবান! কিন্তু তোমার চেয়ে মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট অনেক বেশী।'

এই হাদীস মোতাবেক মু'মিনের সম্মান-মর্যাদা আল্লাহর নিকট কাবার চেয়ে অনেক বেশী। তাহলে তার দোষ বর্ণনা কত মারাত্মক।

অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করার সাথে সাথে নিজ পাপ ও অপরাধের কথা মানুষের নিকট প্রচার না করা এবং স্বীয় পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। কেননা পাপ করে প্রচার করলে অন্যেরা মন্দ কাজে উৎসাহিত হবে। এজন্য রাসূল সা.বলেন-[৩] "আমার প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা করা হবে তবে ঐ সব লোক ছাড়া যারা গোপনে পাপ করে অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়।"

মানুষের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট বড়ই অপছন্দনীয় হলেও কেউ যদি যুলম করে কিংবা কারো অধিকার হরণ করে অথবা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তার অপরাধ যদি সমাজ ও জাতির জন্য ক্ষতিকারক হয় তবে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তার দোষ গোপন করা যাবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৪] لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ-"মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তবে কারো উপর যুলম করা হলে ভিন্ন কথা।"

অন্যের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ: মানুষের প্রতি সুধারণা পোষণ করা উন্নত মানসিকতা ও উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। এতে আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জিত হয়, ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ হয়, পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শান্তিময় হয়। পক্ষান্তরে, কুধারণা পোষণ অনৈতিক গুণ। তাই কুরআনে মুমিনদেরকে পরস্পরের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করার ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা রাসূল সা. এর স্ত্রী আয়িশা রা. এর প্রতি কুধারণা পোষণ করে মিথ্যা অপবাদ ছড়ায়। এতে মুমিনরাও দ্বিধা-সংশয়ে যান তখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি ভর্ৎসনা করে ইরশাদ করেন-[৫] لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا-"যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না।" তাই প্রত্যেকের উচিত অন্যের ব্যাপারে বেশী বেশী কুধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকা।

❑.আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রদান এবং তাদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন(حقوق الاقربين):

জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে মানুষ কিছু সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়তা সম্পর্ক এরূপ এক ধরণের সম্পর্ক। পিতা-মাতার পরেই ইসলাম আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আত্মীয়-স্বজনের অধিকার রক্ষা করার অর্থ হলো, তাদের সাথে সদাচারণ করা, খোঁজ-খবর নেয়া, সাক্ষাত করা, আদর-আপ্যায়ন করা, উপঢৌকন প্রদান করা, আর্থিক সহযোগিতা করা, প্রাপ্য উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা, তাদেরকে কোন কষ্ট না দেয়া, প্রয়োজন ও বিপদ-আপদে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, কোন প্রয়োজনে আহবান করলে সাড়া দেওয়া, অসুস্থতায় সেবা-যত্ন করা এবং একে অপরের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করা। তাদের ব্যাপারে কোন ওসীয়ত থাকলে তা পালন করা।[৬] যদি কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন, বঞ্চিত বা মন্দ আচরণ করে তবে ধৈর্য ধারণ করে তাকে ক্ষমা করে সম্পর্ক বজায় রাখা, কেউ বঞ্চিত করলে দান করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-"অতএব আত্মীয়–স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।"

---

[১].মূল আরবী [كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول ؟ ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ؟] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হা. নং ৪৭৮৮।

[২]. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২০৩২; *সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হা. নং ৪৮৮০।

[৩]. মূল আরবী [كل أمتي معافى إلا المجاهرين] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫৭২১।

[৪]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা’ ০৪ : আয়াত ১৪৮।

[৫]. আল-কুরআন,সূরা আন্-নিসা’ ০৪ : আয়াত ১৪৮।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮০।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৩৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৪:০৮; ১৭: ২৬; ০৮:৭৫; ২৭:৯০; ৩০:৩৮।

উপরোক্ত আয়াতসহ যে সব আয়াতে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা অথবা তাদের হক আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ফরয। আর আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে, মা-বাবা, ভাই-বোন, খালা এরপর অন্যান্য আত্মীয়। এ মর্মে নাবী(সা.) বলেন[১],*‘সদাচরণ কর তোমার মা- বাবা, তোমার বোন, তোমার ভাই এবং পর্যায়ক্রমে নিকটতম অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে।’*

আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার স্বত্ব দ্রুত প্রদান করা। এ ব্যাপারে গরিমসি না করা। মহান আল্লাহ বলেন[২]–

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ– তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে।

-এখানে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদ তাদের মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে অবিলম্বে প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যু অনেক বছর পর ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ দেয়া হয় না, ফলে আত্মীয়তা সম্পর্ক নষ্ট হয়।

এছাড়াও অক্ষম, প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ, বেকার ও অসচ্ছল আত্মীয়দের পাশে দাড়ানো এবং তাদের ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা স্বচ্ছল আত্মীয়দের দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
“বল,যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা,আত্মীয়-স্বজন,ইয়াতীম,মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।”

কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা। এ ব্যাপারে রাসূল (সা,) বলেছেন[৪], “যে ব্যক্তি সম্পর্ক রক্ষা করার বদলে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে মূলত সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা যায় না। সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো সে যে ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে।”

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একটি বিশেষ কর্তব্য হলো-তাদের সৎপথপ্রদর্শন ও পরকালীন অকল্যাণ থেকে রক্ষার চেষ্টা করা। এ প্রসংগে আবূ হুরাইরা রা বলেন[৫], যখন “وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ”[আল-কুরআন ২৬:২১৪] আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূল সা.কুরাইশদের ডাকলেন। এতে তাদের বিশেষ ও সাধারণ ব্যক্তি নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

হে কুরাইশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁতে পারব না। হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সফিয়া ! আল্লাহর শাস্তি থেকে আপনাকে আমি বাচাঁতে পারব না। হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা তুমি চেয়ে নাও। আমি কিন্তু তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাচাঁতে পারব না।

আত্মীয়-স্বজন ভুল করার পর কৈফিয়ত পেশ করলে তাদের সে কৈফিয়ত গ্রহণ করা এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া। যেমন ইউসুফ (‘আ.) স্বীয় ভাইদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন।[৬]

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচার উন্নত নৈতিকতার পরিচায়ক। এর মাধ্যমে মানুষ পার্থিব সুখ-শান্তি, সম্পদ বৃদ্ধি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নানা কল্যাণ লাভ করতে পারে। রাসূল (সা,) বলেন-[৭], “যে তার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে।” এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় দু'ধরনের পার্থিব উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত তা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের কার্যকারণ, দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে দীর্ঘ জীবন লাভের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম সম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় রাখলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুখী ও শান্তিময় হয়। কেননা পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও সহানুভুতির মাধ্যমে এক আনন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠে। এতে রুজি-রোজগারে বরকত হয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় এবং উন্নতির পথ সুগম হয়।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচারণ বড় পূণ্যের কাজ। রাসূল সা. বলেন–“মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা একটি সাদাকা। আর আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করা দু'টি সাদাকা। কারণ একদিকে এটি দান, আর অপরদিকে রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করা।”[৮]
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। আবূ আইয়্যুব রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী কারীম সা. কে বললেন আমাকে এমন কাজের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।... নাবী কারীম সা. বললেন, তুমি কেবল আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং *আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে*।[৯]

---

১. মূল আরবী [بر أمك و أباك و أختك و أخاك ثم أدناك أدناك و منها] হাকিম নাইসাপূরী, *আল-মুস্তাদরাক*, *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ.৩৪১, কিতাবুর রিক্বাক, হা. নং ৭২৪৫।

২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৭; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪:১২, ১৭৬।

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৫।

৪. মূল আরবী [ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৪৫।

৫. [قام رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أنزل الله عز و جل { وأنذر عشيرتك الأقربين }قال (يا معشر قريش – أو كلمة نحوها – اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا)] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদীস নং ২৬০২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২০৪।

৬. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৯১-৯২।

৭.**মূল আরবী** [من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ‘, হা. নং ১৯৬১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ২৫৫৭।

৮. মূল আরবী [الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ৬৫৮।

৯.মূল আরবী[أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল যাকাত, হা.১৩৩২।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের অধিকার আদায় যেমন অত্যন্ত পূণ্যের কাজ তেমনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের অসৌজন আচরণ করা, তাদের হক ও প্রাপ্য না প্রদান করা–অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এতে পার্থিব শান্তি-সৌহাদ্য বিনষ্ট হয়। এর পরকালীন পরিণাম অতি মন্দ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১] -

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآأَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

"আর যারা আল্লাহ্র সংগে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে এবং তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে(ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, বিধি-বিধান ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে), যা আল্লাহ্ অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ করে, তাদের জন্যই লা'নত আর তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের মন্দ আবাস ।"

আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা না করা কিংবা তাদের অধিকার নষ্ট করা জান্নাত লাভের অন্তরায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[২]

❑.অতিথেয়তা, হৃদ্যতাপোষণ, বন্ধুসুলভ আচরণ ও উপহার বিনিময়:

অতিথেয়তা, হৃদ্যতাপোষণ ও বন্ধুসুলভ আচরণ সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের একটি কাঙ্ক্ষিত উপাদান। এটা পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহাদ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। বিবাহ, আকীকা, কুরবানী ইত্যাদি বিভিন্ন সময় লোকদেরকে ভোজে দাওয়াত দান, তাদের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার ফলে সামাজিক সৌহার্দ সৃষ্টি ও জোরদার হয়। এজন্য খাবারের দাওয়াত গ্রহণ করাকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং বিয়ের ওয়ালিমায় যাওয়াকে বিশেষ কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সুদূর অতীত থেকে চলে আসা মানব সমাজের স্বীকৃত বিষয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]-

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ- إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ- فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ- فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

"তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? যখন তারা তার কাছে আসল এবং বলল, 'সালাম', উত্তরে সেও বলল,'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর সে দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারের কাছে গেল এবং একটি মোটা গো-বাছুর(ভাজা) নিয়ে আসল। অতঃপর সে তা তাদের সামনে পেশ করল এবং বলল,'তোমরা কি খাবে না?"

অন্যত্র বলেন[৪], قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ-وَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ -তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তারা আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে অপমানিত করো না'। 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না'।

উল্লেখিত আয়াসমূহে মেহমানদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মূল্যবান শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা রয়েছে। মেহমানদের হাস্যজ্জ্বল চেহারায় সালাম ও সম্ভাষণা জানানো। এরপর মেহমানের বসার বা বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য উত্তম আহারের ব্যবস্থা করা। মেহমানের সাথে খাওয়া, ভালোভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা এবং তাদের কোন কষ্ট যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। মেহমানের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা, কেউ তার সম্মানে আঘাত করতে চাইলে সাধ্যমত তা প্রতিহত করা।

অতিথেয়তা, আপ্যায়ন, হৃদতাপোষণ ও বন্ধুসুলভ আচরণ ব্যাপারে ইসলাম তাকিদ দেয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৫], "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখে।"

মেহমানদারি সময়সীমা তিনদিন পর্যন্ত। তাই মেহমানের উচিত হবে না মেজবানকে কষ্টে ফেলা। এ মর্মে নাবী সা. বলেন[৬]

কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের নিকট সে পরিমাণ সময় (মেহমান হিসেবে) থাকা বৈধ নয়, যা তাকে গুনাহগার বানিয়ে দেয়। সাহাবীগণ বলেন, কিভাবে তাকে সে গুনাহগার বানাবে? রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, তার কাছে সে অবস্থান করতে থাকবে। অথচ তার কাছে এমন কোন জিনিস নেই যা দিয়ে সে মেহমানদারি করবে।

আর মেহমানের উচিত মেজবানের মর্যাদা অনুযায়ী কিছু হাদিয়া নেয়া। মেজবানের কর্মব্যস্ততার প্রতিলক্ষ্য রাখা।

উপহার বিনিময়: কোন রকম সাহায্য-সহানুভূতির শর্ত ব্যতীত কাউকে কিছু প্রদান করা হয় তা-ই উপহার। উপহার হচ্ছে শুভেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ এবং এর ফলে অপরের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। সুসম্পর্ক স্থাপন, হৃদতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধিতে এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ দূরীকরণে উপহারের গুরুত্ব অপরিসীম।[৭] এজন্য আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর মধ্যে এ ধরনের উপহার বিনিময়ের ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৮]– وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا "আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩ : আয়াত ২৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২ : ২৭।

২. মূল আরবী [لا يدخل الجنة قاطع] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৩৮; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং২৫৫৬।

৩. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত ৫১: আয়াত ২৪-২৭।

৪. আল-কুরআন, ১৫:৬৮-৬৯; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১১:৭৮।

৫. মূল আরবী [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلكرم ضيفه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৭২, *মুসলিম*,হা.৪৭।

৬.মূল আরবী[الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ قال يقيم عنده ولا شيء يقريه به] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লুকতা, হা.৪৮

৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ৩৫-৩৬।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৮:৭৫, ২৭:৯০, ৩০:৩৮।

উপহার প্রদানের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করা যায়। একজন ঘোর শত্রুকেও উপহার দিলে তার মনের শত্রুতা, কালিমা দূর হয়। ইসলামী আচরণ নীতিতে শুধু উপহার গ্রহণ নয় বরং উপহার প্রদানকারীকেও উপহার দেয়ার নীতি রাখা হয়েছে, যাতে উভয় পক্ষেরই মনে ভালবাসার বৃদ্ধি ঘটে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১],"তোমরা পরস্পরে হাদীয়া আদান-প্রদান কর। কেননা তা হৃদয়ের কলুষতা ও বিদ্বেষ দূর করে।" অন্য হাদীছে ইরশাদ হয়েছে-[২] "তোমরা পরস্পর হাদিয়া বিনিময় কর, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং শত্রুতা ও কালিমা দূর হবে।"

উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু উদ্দেশ্য থাকে সম্প্রীতি বিস্তার। তাই যাকে উপহার দেয়া হবে তার প্রয়োজন, মনের পছন্দ, রুচি ইত্যাদি লক্ষ্য রেখেই দেয়া উচিত। যদি তা না হয় তাহলে উপহারের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই ব্যাহত হবে। উপহার প্রাপ্তির পর এমন কিছু বলা উচিত নয় যার কারণে উপহার প্রদানকারীর মনে গ্রহণকারীর সন্তুষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। যেমন: এ রকম জিনিস আমার কাছে রয়েছে বা এটা তেমন উত্তম বস্তু নয় ইত্যাদি। এগুলো উপহার প্রদানকারীকে মানসিকভাবে আহতও করতে পারে।

❑.প্রতিবেশী ও সহকর্মীর অধিকার আদায় (حقوق الجار):

'প্রতিবেশী হলো যে ব্যক্তি কারো পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী।[৩]

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা : কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে হাসান আল-বসরী (রহ.) বলেন, নিজের ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)।[৪] কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি আযান/ডাক শুনতে পায়(মাইক ছাড়া) সে প্রতিবেশী। কেউ বলেন, যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়।[৫]

প্রতিবেশীর প্রকার: দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার-১.নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২.দূরবর্তী প্রতিবেশী। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী তিনপ্রকার।যথা:১.মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী,২.মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩.অমুসলিম প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে গণ্য বিষয়গুলো হল, মুসলিম-অমুসলিম ও আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সবার সাথে উত্তম আচরণ করা, সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো, অসুস্থ হলে সেবা করা, সুপরামর্শ দেওয়া, কোন কথা ও কাজে তাদের কষ্ট না দেয়া, তাদের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার না করা, তারা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, তাদের সম্মান করা ইত্যাদি। প্রতিবেশীর জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হিফাযত করা, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, তাদের গোপন বিষয় না জানার চেষ্টা করা, অন্যায় করলে ক্ষমা করা, এবং বিবাদ হলে ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৬] –

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا-

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"

এই আয়াতে আল্লাহর হক, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ মানুষের হকের পর প্রতিবেশীর হক বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এখানে দু'রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। এক. নিকট প্রতিবেশী,–তা হতে পারে প্রতিবেশী হওয়ার সাথে আত্মীয় কিংবা মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিবেশী। দুই. দূর-প্রতিবেশী,–তা হতে পারে প্রতিবেশী হওয়ার সাথে অনাত্মীয় মুসলিম বা অমুসলিম প্রতিবেশী। যা হোক, এখানে প্রতিবেশী নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক–সাধ্যনুযায়ী সবার সাথে সদাচারণ করা কর্তব্য। তাদের জন্য কষ্টকর হয় এমন কোন আচরণ করা যাবে না। তা যত ছোট হোক,যেমন- বিড়ির ধোঁয়া ছাড়া, চিৎকার করে কথা বলা।

আর এখানে الصَّاحِبِ بِالجَنبِ তথা সংগী-সাথী বা সহকর্মীর সাথেও সদাচারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সংগী-সাথী বা সহকর্মী হতে পারে অফিসের সহকর্মী, ভ্রমণ পথের সঙ্গী, যানবাহনে কিংবা কোন সভায় পাশে বসা ব্যক্তি।

আল্লামা আলূসী বলেন, এমন প্রতিটি ব্যক্তিই সাহিব-বিল জান্‌ব এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজ, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার এবং যে আপনার পার্শ্বে অবস্থান করে; তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোক, শিল্প

---

১. মূল আরবী [تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ওলায়ি ওয়াল হিবাহ, হাদীস নং ২১৩০; আহামাদ, হা ৯২৩৯।

২. মূল আরবী [تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء] *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, কিতাবু হুসনুল খুলক, হা. নং ১৬১৭।

৩ . মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, *আত-তাক্বছীর ফী হুকূকিল জার*, www.toislam.net পৃ.০২।

৪ .শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ.২৯।

৫.মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.০২।

৬. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৬।

প্রতিষ্ঠানে হোক অথবা কোন অফিস-আদালতের চাকরিতে হোক কিংবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক; আর তা মসজিদে বা কোন বৈঠকে স্বল্প সময়ের জন্য হোক না কেন।[১]

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণ ও কর্তব্যগুলোর অন্যতম হলো: দরিদ্র প্রতিবেশীর অভাব-অনটন খোঁজ-খবর নেওয়া। প্রতিবেশীর প্রতি দয়া করা এবং প্রয়োজনে কর্যে হাসানা প্রদান করা। প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন[২], "ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।" প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণ ঈমানের অন্যতম দাবী। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,[৩] "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"...

প্রতিবেশীর সাথে সদাচারণ অন্যতম দিক হল বাড়ীতে ভালো কোন খাদ্য রান্না হ'লে তাতে প্রতিবেশীকে শরীক করা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ। তিনি আবূ যর (রা.)-কে বলেন, 'হে আবূ যর! যখন কোন তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল দাও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও'।[৪]
বিভিন্ন সময় তাদের হাদিয়া দেওয়া এবং দাওয়াত কবুল করা। কেননা উপহার আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। নাবী করীম (সা.) বলেন[৫], 'পরস্পরকে উপহার দাও। এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।

প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে তার পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা ও সান্তনা প্রদান করা, অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া ও সেবা করা এবং মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৬],

> যে কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে গেলেই তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা দো'আ করতে থাকে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা দো'আ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়।

প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা। রাসূল (সা.) বলেছেন[৭], "এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে।"

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারণ সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর উপর সামাজিক শান্তি ও শৃংখল অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার একটি নৈতিক কর্তব্য। নিজেকে নিয়ে যে সদা ব্যস্ত থাকে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত যে অন্য কিছুই ভাবে না, প্রতিবেশীর বিপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদের কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া কিংবা নির্যাতন করা নৈতিকতা পরিপন্থী বড় গোনাহের কাজ। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন[৮]- আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়! আল্লাহর শপথ, সে মু'মিন নয়! জিজ্ঞাস করা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অন্যায় ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।"

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ পার্থিব উপকারের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও অশেষ কল্যাণ লাভ করা যায়। প্রতিবেশীর হক আদায় ঈমানের শাখা এবং তা নফল নামাজ, রোজা ও সাদাকা থেকেও উত্তম। এ মর্মে হাদীসে এসেছে-[৯],

> এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক স্ত্রীলোক বেশী বেশী (নফল) নামাজ পড়ে, দান-সাদাকা করে ও রোজা রাখে কিন্তু তার প্রতিবেশী তার মুখ থেকে নিরাপদ নয়। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সে জাহান্নামী। তারপর লোকটি বলল, অমুক স্ত্রীলোক (নফল) নামাজ ও রোজা কম করে, সামান্য পনির টুকরা দান-সাদাকা করে কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন- সে জান্নাতী।

❑.ইয়াতীমদের সাথে সদাচারণ এবং তাদের অধিকার প্রদান (حقوق اليتيم):

'ইয়াতীম' শব্দটি আরবী। এর অর্থ একক, একাকী, নিঃসঙ্গ ইত্যাদি। পরিভাষায় (মানুষের ক্ষেত্রে) ইয়াতীম বলা হয় সেই ছেলে বা মেয়েকে প্রাপ্ত বয়স্কে উপনীত হওয়ার পূর্বে যার পিতা মৃত্যুবরণ করেছে। আর জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে যাদের মা মারা যায় তাদের ইয়াতীম বলা হয়।[১০] তবে যার পিতা ও মাতা উভয়ে মারা গেছে সে বড় ইয়াতীম। উল্লেখ্য যে, মানুষের ক্ষেত্রে মাতা মৃত্যুবরণ করলে সন্তান ইয়াতীম হিসাবে গণ্য হবে না কারণ পিতা তার ব্যয়ভার বহন করে। আর জীব-জন্তুর

---

[১]. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, ৫ম খণ্ড, পৃ.২৯।
[২]. মূল আরবী [ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع] *আদাবুল মুফরাদ*, কিতাবুল জার, হাদীস নং ১১২।
[৩].মূল আরবী [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৭২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৪৭।
[৪]. মূল আরবী [قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৬২৫।
[৫]. মূল আরবী [تهادوا تحابوا] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ*, কিতাবুল মারিদ, হাদীস নং ৫৯৪।
[৬].মূল আরবী[ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسى وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ৯৬৯।
[৭]. মূল আরবী [لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস নং ২৩৩১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হা. নং ১৬০৯।
[৮].মূল আরবী[والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله ؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৭০।
[৯]. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত: দারুল বাশায়িরিল ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ ১৪০৯হি.) কিতাবুল জার, হাদীস নং ১১৯।
[১০]. ইমাম আল-কুরতূবী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ.১৪, রাগিব ইস্পাহানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ.৭১৫।

ক্ষেত্রে মাতাই যেহেতু খাদ্য ও প্রতিপালনের কাজ করে তাই পিতার মৃত্যুতে তারা ইয়াতীম গণ্য হবে না। ইয়াতীমের বয়সসীমা হচ্ছে বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত। যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে কেউ আর ইয়াতীম থাকে না।
কুরআনে ইয়াতীম শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ২৩ বার এসেছে।

সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষায় ইসলাম বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মত ইয়াতীমদেরও অধিকার দিয়েছেন। ইয়াতীমের অধিকারগুলো হল– তাদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের যথাযথভাবে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান, তাদের কোন সম্পদ অত্মসাৎ বা অপচয় না করা, প্রাপ্ত বয়স্কে উপনীত হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ পুরোপুরিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, ভালো জিনিস নিজেদের জন্য রেখে মন্দ জিনিস তাদের না দেয়া এবং কোন ভাবেই তারা যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তাদের সম্পত্তি থেকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় দেখাশুনা ও সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন[১] – وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا- "আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা ভালো বস্তুকে মন্দ বস্তু দ্বারা বদল করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে গ্রাস করো না; নিশ্চয়ই তা মহাপাপ।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[২]

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًاوَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ

আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধনসম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদের আহার দাও, তাদের পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল। আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্কতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদের দিয়ে দাও। আর তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না অপচয় করে এবং তারা বড় হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করে। আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে, আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে ইয়াতীমদের অভিভাবকে তাদের সম্পদ কোনভাবে অত্মসাৎ কিংবা অপচয় না করার আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত বয়স্কে উপনীত হওয়ার পর তাদের নিকট তাদের সম্পত্তি হস্তান্তর করা এবং তাদের কোন অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যাপারে পরোপুরি সচেতন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইয়াতীমদের কল্যাণ সাধনে ত্রুটি না করা।[৩] তাদেরকে আদর-যত্ন করা। তারা কোন আবদার করলে সাধ্যমত তা পূরণের চেষ্টা করা, তাদের সাথে কোন ধরনের মন্দ বা রূঢ় আচরণ না করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৪] فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ "সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবে না।" মহান আল্লাহ বলেন-[৫] كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا "কখনোই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর'।"
উল্লেখিত প্রথম আয়াতে ইয়াতীমদের সাথে অসৌজন্য আচরণ কিংবা অসম্মান করাকে আল্লাহ মানুষের মন্দ স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের 'সম্মান করা' কথাটি বলার মাধ্যমে ইয়াতীমের যথাযথ হক আদায় ও তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের অভিভাবক ও সমাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইয়াতীমদের প্রতিপালনের নানা উপকারিতা রয়েছে। এ কারণে মানুষের অন্তরে দয়া-মমতা, কোমলতা, সহমর্মিতাসহ বিভিন্ন উন্নত মানবিক গুণাবলী তৈরী হয় এবং স্বার্থপরতা, নির্দয়তা ও অহঙ্কারসহ নানা মন্দ গুণের অবসান ঘটে। এর মাধ্যমে অসহায়-দুর্বলদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালন হয়। এটা ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদা ও বৃদ্ধি করে। এতে আল্লাহর রহমত-বরকত নাযিল হয়। এটা জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। জনৈক ব্যক্তি রাসূল(সা.) কে তার অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ পেশ করলে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান কর।[৬]

ইয়াতীম প্রতিপালনে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাই এই মহৎ কাজের পুরস্কারও অনেক বড় ও মর্যাদাপূর্ণ। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ সা.বলেছেন-[৭] 'আমি ও ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারীগণ জান্নাতে একসাথে থাকবো।' (বর্ণনাকারী বলেন)–এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা এই দুই আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলেন'। রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন[৮]–"যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে থেকে কোন ইয়াতীমকে নিজ খাবার ও পানীয়ের প্রতি টেনে আনে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যদি না সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুনাহ করে।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০২,০৬।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৫-০৬, আল-কুরআন ০৪:৩, ০৬:১৫২, ১৭:৩৪, ০২:২২০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দুহা ৯৩: আয়াত ০৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা ফাজর ৮৯: আয়াত ১৭-১৮।
[৬]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ. ৩৮৭, হাদীস নং ৯০০৬; *মিশকাত*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫০০১।
[৭].মূল আরবী[أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاوأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তালাক,হা.নং৪৯৯৮; *মুসলিম*,কিতাবুয যুহদ,হা.২৯৮৩।
[৮].মূল আরবী [من قبض يتيما بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له] *সুনান আত-তিরমিজী*, আবওয়াবু বিররি ওয়াস সিলাহ, হা. নং১৯১৭।

ইয়াতীমের অধিকারহরণ ও সম্পদ অত্মসাৎ জঘন্য অনৈতিক কাজ। এ ব্যাপারে কুরআন কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন-[১]إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا-"যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তো তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে; তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"

❑.শ্রমিক, কর্মজীবী ও অধীন ব্যক্তিদের সাথে সদাচারণ এবং তাদের অধিকার প্রদান :

মানুষের জীবনধারণ ও মৌলিক জীবনপোকরণ অর্জনের প্রধান উপায় শ্রম। শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা ও জীবনপোকরণ উপার্জনের অধিকার ইসলামে শুধু স্বীকৃতই নয়, বরং শ্রমের মাধ্যমে উপার্জনকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন[২]-وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى- ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى-"আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে। তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে।"

শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা আল-কুরআনের অন্যতম অবদান। ইসলাম শ্রমকে উৎসাহিত করার সাথে সাথে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামে বিলাল, আম্বার, খাব্বাব, শোহা'ইব, যায়িদ, উসামা (রা.) প্রমূখ আযাদকৃত দাস-শ্রমিককে এমন সামাজিক মর্যাদা যা অনেকের চেয়েও উপরে। মুসলিমদের কাছে তাঁরা কতটুকু সম্মানের অধিকারী তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বর্তমান সমাজে এটা দেখা যায় না, বরং সাধারণত মালিক-শ্রমিক প্রসঙ্গ উঠলেই মালিকের যুলমের চিত্র বেশী দেখা যায়। কুরআন এক্ষেত্রে উত্তম ও আদর্শ মালিকের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। মালিক হিসেবে শু'আয়েব ('আ.) ও মূসা ('আ.) কে নিজ শ্রমিক নিযুক্তকালে বলেছিলেন[৩]–وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ "আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশা-আল্লাহ্ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত পাবে'।"

•শ্রমিকদের শোষণের হাত রক্ষার জন্য ইসলাম শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে কিছু নীতিমালা প্রদান করেছেন। যা নিম্নে-

মালিকের নৈতিক কর্তব্য: ইসলাম শ্রমিকের বেশকিছু মৌলিক অধিকার দিয়েছে। এসব অধিকারের মধ্যে প্রধান হলো:

•অধীন চাকর-চাকরানী, কর্মচারী-শ্রমিকদের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখা ও সদাচারণ করা। তাদের মারধর না করা, অন্যায়ভাবে দোষারোপ না করা, গালি বা মিথ্যা অপবাদ না দেয়া। অধীনস্থদের প্রতি সদাচারণ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ(সা.) জীবনের শেষ কথাটির মধ্যে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর সেই উক্তিটি ছিল,"*সালাতের(নামায) ব্যাপারে যত্নবান হও, সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও। আর তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।*"[৪] অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহার ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, '*অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না*।'[৫]

• শ্রমিক বা অধীনস্থদের সাধ্যাতীত কাজের বোঝা না চাপানো। বিশেষ করে চাকর বা গৃহপরিচায়িকাকে নিজে যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দেয়া। নিজে যেমন পোষাক পড়বে তেমনি তাদেরকেও পোষাক দেবে। চাকর বা গৃহপরিচায়িকাকে বাসি-পচা খাবার দেওয়া, তাদের জন্য নীরস খাবার ও নিম্নমানের পোষাক দেওয়া, পর্যাপ্ত খাবার না দেয়া, পরিত্যক্ত ঘরে বা বারান্দায় নেংরা পরিবেশে থাকতে দেওয়া শীত-গ্রীষ্মের পোষাক না দেওয়া ইসলামের নীতি পরিপন্থী। বাসায় বিশেষ খাবার তৈরী হলে কাজের লোককে খাবার থেকে বঞ্চিত না করা। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[৬],

> তোমাদের চাকররা তোমাদের ভাই এবং তোমাদের কাজের লোক। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরিধান করে তাকেও যেন তা খাওয়ায় ও ও পরিধান করায়। আর তাদের শক্তি বাইরে তাদেরকে যেন বেশি কষ্টকর কাজ করতে দেয়া না হয়। যদি কোন কারণে এরূপ কাজ করতে দিতে হয়, তখন তাকে সাহায্য কর। রাসূল সা. আরও বলেন[৭]-তোমাদের কারো চাকর যখন তার জন্যে খানা প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, অথচ সে চাকরটাই পাকঘরে আগুনের উত্তাপ, ধোঁয়া এবং খানা তৈরির সমুদয় কার্য বরদাশত করেছে। তখন উচিত তাকেও নিজের সাথে খাওয়ায় বসিয়ে নেয়া। তবে যদি খানা এতো সামান্য হয় যে, লোকদের তুলনায় খাদ্য কম, তখন তার হতে অন্তত: দু' এক লোকমা অবশ্যই দিয়ে দাও।

• শ্রমিকদের কাজে নিয়োগের পূর্বে কাজের ধরন জানিয়ে সে অনুপাতে নায্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা। অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী নির্ধারণ করা। তাদের প্রতি কোন প্রকার শোষণ-যুলুম না করা। শ্রমিকদের ন্যার্য মজুরী প্রদান না, বরং নানাভাবে বঞ্চিত করা– এটা বড় ধরনের যুলম ও অনৈতিক। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন–"যখন তুমি কাউকে মজুর নিয়োগ করবে তবে প্রথমে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করবে।"[৮]

• কাজ শেষেই পারিশ্রমিক প্রদান করা, এক্ষেত্রে কোনরূপ বিলম্ব না করা। রাসূল সা. বলেন–"মজুরের শরীর থেকে ঘাম শুকানোর আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[৯]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজ্ম ৫৩: আয়াত ৩৯-৪১।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ২৭।
[৪]. মূল আরবী[الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫১৫৬।
[৫]. মূল আরবী [لا يدخل الجنة سيء الملكة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং১৯৪৬; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল আদাব, হা. ৩৬৯১।
[৬]. **মূল আরবী** [هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, হা.১৬৬১; *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হা.৩০, তিরমিযী, হা.১৯৪৫, *সুনান ইবন মাজাহ*, হা. ৩৬৯০।
[৭]. **মূল আরবী**[إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقفد ولى حره ودخانه فلقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আইমান, হা.১৬৬৩।
[৮]. **মূল আরবী** [إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره]*সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুল মুযারা'আহ, হাদীস নং ৩৮৫৭।
[৯]. **মূল আরবী** [أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুর রুহূন, হাদীস নং ২৪৪৩।

• শ্রমিক বা বা অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং কোন ভুল-ত্রুটি করলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। 'এক ব্যক্তি রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন দাস/শ্রমিককে কতবার ক্ষমা করবো'? তিনি বলেন, 'দৈনিক সত্তর বার'।[১]

• তাদের মন্দ নামে না ডাকা, হেয়জ্ঞান না করা, তাদের প্রয়োজনীয় বিশ্রামের ব্যবস্থা করা ও অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা।

শ্রমিকের কর্তব্য: ক. শ্রমিককে তার স্বীয় কাজের ব্যাপারে শারীরিক ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে কার্যক্ষম ও দক্ষ হওয়া।[২]
খ. শ্রমিককে তার স্বীয় কাজের ব্যাপারে সৎ, আমানতদার ও বিশ্বস্ত হওয়া।দুর্নীতি না করা কিংবা কাজে ফাঁকি না দেয়া।[৩]
গ.কাজ যেভাবে করা উচিত ঠিক সেভাবে করা। পারিশ্রমিক পুরোপুরি নিয়ে কাজে গাফলতি প্রদর্শন না করা।
ঘ. মালিক ও শ্রমিককে সহানুভূতির সম্পর্ক থাকা।[৪] ঙ.মালিকের সাথে কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকার পালন করা।[৫]
চ.মালিকের সম্পদ নষ্ট বা অপচয় না করা।

❑.দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের অধিকার আদায় এবং তাদের প্রতি দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন:

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য মানুষকে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জ্ঞানী-নির্বোধ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। এদের এক শ্রেণীকে সম্পদ, শক্তি, পদ ও জ্ঞান দ্বারা এবং অন্য শ্রেণীকে দরিদ্রতা, দুর্বলতা, রোগ-শোক ও নির্বুদ্ধতা দ্বারা পরীক্ষা করছেন। তাই সমাজের জ্ঞানী, শক্তিমান ও সম্পদশালী দের উচিত নয় দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের প্রতি কোন ধরনের অবজ্ঞা-অবহেলা করা। বরং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা; তাদের সাহায্য-সহযোগিতার করা, বিপদ-আপদে ও দুঃখ-কষ্টে তাদের পাশে দাঁড়ানো; তাদের সাথে ভালোভাবে কথা বলা ইত্যাদি জ্ঞানী, শক্তিমান ও ধনীদের কর্তব্য। এটা বড় পূণ্যের কাজ ও হাক্কুল ইবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দুঃস্থ-অসহায় ও প্রতিবন্ধীরা পরিবার ও সমাজের অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ায় অনেকে তাদের বোঝা মনে করে থাকে। সমাজের অনেকে তাদের সাথে সদাচার করতে চান না, বিশেষ করে সবলরা দুর্বলদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। এ ধরনের আচরণ অনৈতিক ও নিন্দনীয়। এই মন্দ আচরণ পরিহার করে প্রত্যেকে তাদের প্রদত্ত অধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৬]

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ...وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا

"আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। ...আর যদি তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকতেই চাও তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমতের প্রত্যাশায় যা তুমি চাচ্ছ, তাহলে তাদের সাথে নম্র কথা বলবে।"
কুরআনে তাদের সাথে অসৌজন্য আচরণ না করার এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার খর্ব না করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৭]– فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ "সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ো না। এবং তুমি প্রার্থীকে (ফকির/মিসকীন) ধমক দিও না।"

বিধবা, ইয়াতীম, আশ্রয়হীন, দুঃস্থ ও অসহায়দের ভরণপোষণে সহায়তা করা বড় রকমের পূণ্যের কাজ। এটা উন্নত নৈতিকতার পরিচায়ক। এজন্য রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন[৮]-"বিধবা ও মিসকীনের খেদমতকারী আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি একথাও বলেছেন, সে ব্যক্তি ঐ নামাজীর মত যে সর্বদা নামাজ পড়ে এবং সর্বদা রোজা রাখে।" অসহায়দের আরেক শ্রেণী তালাকপ্রাপ্তা কন্যা বা বোন। এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৯]–"আমি তোমাদের জানাবো কি যে, উত্তম সদকা কোনটি সেটি হল, তোমার ঐ কন্যা, যাকে স্বামী-গৃহ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুমি ব্যতিরেকে যার কোন উপার্জনকারী নেই।"

কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ–দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যেমন-বোন, কন্যা, ইয়াতীমকে ইনসাফ সহকারে তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকার সম্পদ প্রদান করা এবং তাদের কোনভাবে না ঠকানো।[১০] উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী বিধান ও নীতিমালা মানব সমাজের জন্য সর্বাধিক ন্যায়ানুগ। সঠিকভাবে তা কার্যকর মাধ্যমে সমাজে ন্যায়পরায়নতা, সাম্য ও সবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু তার সঠিক বাস্তবায়ন না থাকায় বর্তমান সমাজে ইয়াতীম, অসহায় ও দুর্বলদের ব্যাপকভাবে ঠকানো ও বঞ্চিত করা হচ্ছে। এতে সমাজে বৈষম্য ও অনৈতিকতার প্রসার ঘটছে। এজন্য পরকালে রয়েছে মন্দ পরিণতি। এ মর্মে রাসুল সা. বলেন[১১]–"*কোন পুরুষ বা নারী ষাট বছর যাবত আল্লাহর ইবাদত করে। অতঃপর তাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তারা যদি অসিয়ত দ্বারা ওয়ারিশদের ক্ষতিগ্রস্থ করে তবে তাদের জন্য জাহান্নাম অবশ্যক হয়ে যায়।*"

---

[১].**মূল আরবী** [يارسول الله كم نعفو عن الخادم ؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হা. নং ৫১৬৪।
[২]. আল-কুরআন ০২:২৪৭, ১২:৫৫।
[৩]. আল-কুরআন ২৮:২৬।
[৪]. আল-কুরআন ২৮: ২৭।
[৫]. আল-কুরআন ০৫:০১।
[৬].আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৬,২৮।
[৭].আল-কুরআন, সূরা আদ-দুহা ৯৩: আয়াত ০৯-১০।
[৮].মুল আরবী[الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নাফাকাত, হা. নং ৫০৩৮; *মুসলিম*, হা.২৯৮২।
[৯].মুল আরবী[ألا أدلكم على أفضل الصدقة ؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৩৬৬৭।
[১০].আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ০৭।
[১১].মুল আরবী [إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, হাদীস নং ২১১৭।

দুঃস্থ, দুর্বল ও অসহায়দের প্রাপ্য অধিকার প্রদান ছাড়াও তাদের প্রতি দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন এবং কর্মক্ষম, পঙ্গু, দুঃস্থ-অসহায় ও মুসাফিরদের সহায়তা করা। -ইসলামের নৈতিক শিক্ষা। এদের জন্য ব্যয়ের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১]

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ভালো কাজ এটা নয় যে, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে শুধু তোমাদের মুখ ফিরাবে; কিন্তুভালো কাজ হল যে আল্লাহ্ ও পরকাল, ফিরিশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।

মহান আল্লাহ আরও বলেন[২]– يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ "লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজের জন্য যা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্ তো সে সম্বন্ধে অবহিত।"

দুর্বল ও অসহায়দের সাথে সদাচরণের জন্য হাদীসেও তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েক হাদীস নিম্নে -

- তোমরা তো রিযক ও সাহায্য পাচ্ছ একমাত্র তোমাদের দুর্বলদের মাধ্যমে" অর্থাৎ আল্লাহ বহু মানুষকে রিযিক দিয়ে থাকেন তার অধীনস্থ দুর্বল, অসহায় মানুষের কারণে।[৩]
- আমি কি তোমাদের জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল দুর্বল এবং যাদের লোকেরা দুর্বল মনে করে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহ্‌র নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন।...[৪]
- জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন ইসলামে কোন কাজ উত্তম। নাবী সা. বলেন, (অভুক্তকে) আহার করানো এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম প্রদান করা।"[৫]

কাজেই যে সব অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষকে আমরা লালন-পালন করে থাকি তাদেরকে নিজেদের উপর বোঝা মনে করা মোটেই উচিত নয়। তাদেরকে বোঝা মনে না করে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের একটি মাধ্যম মনে করাই শ্রেয়। এটা এ সব হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

ইসলাম দাস প্রথা চালু কিংবা মানুষের মধ্যে দাস-প্রভু ও অভিজাত-নিম্নজাত সম্পর্কে বিশ্বাসী নয়।[৬] যদিও প্রাচীন রোম সমাজে, গ্রীক সমাজে, আরব সমাজে, ইউরোপে এমনকি উনবিংশ সমাজে আমরিকান সমাজে ব্যাপকভাবে দাসপ্রথা চালু ছিল। ইসলাম দাস-দাসীদের আদম সন্তান ও ভাই গণ্য করেছে। তাদের সাথে মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের মর্যাদা ও সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। দাসমুক্তিতে উৎসাহ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে-[৭]

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ-وَمَا أَدْرَاكَ مَاالْعَقَبَةُ- فَكُّ رَقَبَةٍ-أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ-يَتِيمًا ذَامَقْرَبَةٍ -أَوْمِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

আর সে দুর্গম পথটি (কুফর) অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়নি। আর তুমি কি জান, সেই দুর্গম পথটি (অতিক্রমের পন্থা) কি? তা হচ্ছে,(ঈমান আনা ও) দাস মুক্তকরণ, অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা, ইয়াতীম, আত্মীয়-স্বজনকে বা ধূলিমলিন মিসকীনকে। –উল্লেখিত আয়াতে কুরআন মানুষকে ঈমান আনার সাথে সাথে দাস মুক্ত করা, দুর্ভিক্ষের সময় অভাবীদের খাদ্য দান করাকে সামাজিক কর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষা হবে।

দুঃস্থ-অসহায় মানুষের একটি শ্রেণী দাস। ইসলাম দাসপ্রথা উচ্ছেদে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আল-কুরআনে হত্যার কাফ্ফারা, রোযা ভঙ্গের কাফ্ফারা, কসম ভঙ্গের কাফ্ফারাসহ বিভিন্ন অপরাধ কাফ্ফারায় দাসমুক্তির বিধান দেয়া হয়েছে। এছাড়াও দাসমুক্তির ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৮]- وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ "আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও।"

রাসূল(সা.) দাসপ্রথা উচ্ছেদে করে তাদের সামাজিক মর্যাদা দিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তিনি নিজে যুদ্ধবন্দী দাসী সফিয়া(রা.) ও জুয়াইরিয়া (রা.) এবং অন্য এক দাসী মারিয়া (রা.) কে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বীয় ফুফাত বোন জয়নব (রা.) কে মুক্তদাস যায়েদ (রা.) এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। দাস বিলাল (রা.) সালমান (রা.)

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ :আয়াত ১৭৭।
২.আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৫, আল-কুরআন ০৪:৩৬।
৩.মুল আরবী [هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৭৩৯।
৪.মুল আরবী[ألا أخبركم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাফসীর, হা.৪৬৩৪; *মুসলিম*, হা.২৮৫৩।
৫.মুল আরবী[أي الإسلام خير ؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ১২; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ৩৯।
৬. আল-কুরআন, ০৪:০১; ১৭:৭০।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বালাদ ৯০: আয়াত ১১-১৬।
৮. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩৩। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:১৭৭, ০৪:৯২; ৫৮:০৪; ৯০:১২-১৩।

ও আম্মার(রা.) প্রমূখ মদীনা রাষ্ট্রের গভর্ণরের দায়িত্ব পালন করেন। উমার(রা.) শহীদ হওয়ার পূর্বে তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছিলেন, *'যদি হুযাইফার রা. মুক্তদাস সলিম রা. থাকত আমি তাঁকে খলীফা মনোনীত করতাম।'*

❑.নারী ও শিশুকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান:

নারী অধিকার: নারী-পুরুষ মিলেই মানব সমাজ। আর মানব সমাজের অর্ধেকই নারী। তাই কুরআন নারীদের যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে যদিও কিছু কিছু ধর্ম ও সভ্যতা নারীদের অশুভ বলে চিহ্নিত করছে।[১] কুরআন নারী-পুরুষ উভয়কে একই উৎস থেকে সৃষ্ট উল্লেখ করে নারীর মৌলিক মানবিক ও ধর্মীয় কর্তব্যে সমমর্যাদা দিয়েছে।[২] কুরআন জানিয়েছে তারা উভয়ে সৃষ্টিকর্তা ও সমাজের কাছে সমানধিকারসম্পন্ন, উভয়ের জন্য আইন সমান।
আদম ('আ.) ভুলের জন্য তাওরাতে নারীকে দোষারোপ করা হলেও কুরআনে আদম ('আ.) কেই দোষী চিহ্নিত করেছে।[৩] ইসলাম বলেছে, গর্ভধারণ, স্তন্যদান, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি কাজে নারীদের জন্য পূণ্য রয়েছে। কুরআন নারীদের সম্মানিত করতে 'আন-নিসা' নামে একটি সূরার নামকরণ করেছে, সেখান নারীর অধিকার ও পারিবারিক ভূমিকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কুরআনে ফির'আউনের স্ত্রী ও ইমরান তনয় মরিয়ামকে মু'মিনদের উত্তম আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছে।[৪] মহীয়সী মরিয়ামের নামে কুরআনের **১৯**নং সূরার নাম করেছে। কুরআনে ইমরানের স্ত্রীর তাকওয়ার প্রশংসা করা হয়েছে।[৫] সাবার রানীর বিলকিসের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীকে ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।[৬] মূসা('আ.) এর মা-বোন এবং মাদায়েনে মূসা আ. কথপোকথনকারী নারীর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা কথা তুলে ধরা হয়েছে।[৭]

জাহেলী আবর সমাজে যখন নারীদের কোন অধিকার ও সম্মান ছিল না তখন ইসলাম নারীদের পুরুষের মতই অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। কুরআনে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য ও বৈষম্য করা হয়নি। ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার ছাড়াও পিতা, স্বামী ও সন্তানের সম্পদে উত্তারাধিকার, সম্পত্তির মালিকানা ও সাক্ষ্য দানের বিশেষ অধিকার দিয়েছে। বিবাহে নারীকে মোহর প্রদানের বিধানের মাধ্যমে বিশেষ সম্মান দিয়েছে।[৮] বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও সম্মতির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।[৯] নারীকে বিশেষ প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারও দিয়েছে।[১০] তালাকপ্রাপ্ত নারীকে অন্যত্র বিবাহে বাধা দান নিষিদ্ধ করেছে।[১১] সতী-সাধ্বী নারীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের জন্য অপবাদদাতাকে আশি বেত্রাঘাতের বিধান দিয়েছে।[১২] মানব জাতির কল্যাণে কুরআন পুরুষের মত নারীরও দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আল-কুরআন নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে।[১৩] ভালো ও মন্দ কাজের জন্য নারী-পুরুষের উভয়ের জন্য সমান পুরস্কার ও শাস্তি ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে[১৪] (أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) "নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা নারী আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ।" এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা দেন[১৫]– وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا-পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণ ও যুলুম করা হবে না।"
কুরআন সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পরকে পরস্পরের পরিপূরক বলে গণ্য করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[১৬]

---

[১]. ইহুদী ধর্মে ও প্রচলিত ওল্ড টেস্টামেন্টে আদম ও হাওয়া (আ.) কে জান্নাত থেকে বহিস্কার ও পাপের জন্য নারী তথা হাওয়াকে দায়ী করা হয়। [দেখুন, আদি পুস্তক, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক-১১]। খৃষ্টান ধর্মে নারীকে হৃদয়হীন প্রাণী, পাপের উৎস ও শয়তানের প্রবেশস্থল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। খৃষ্টান যাজকদের মতে, নারী হলো নরকের ফটক, সকল কুকর্ম তাদের দ্বারাই সাধিত হয়।[W.E.H.Lecky*, History of European Morals*, v.2, pp.357-8] হিন্দু ধর্মেও নারীদের অশুভ প্রাণী গণ্য করা হয়েছে। নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা; তাই তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে। [মহাভারত, অনুশাসন পর্ব:৩৮] এ ধর্মে নারীকে উত্তারাধিকার স্বত্ব সহ নানা অধিকার দেয়া হয়নি, এতে বিধবা বিবাহের অধিকার ছিল না এবং সতীদাহের চরম অমানবিক প্রথা(স্বামীর মৃত্যুতে জীবিত স্ত্রীকে একই চিতায় আত্মহুতি দিতে হত) চালু ছিল। বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ, বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষের পরিপন্থী ও অমঙ্গলের প্রতীক গণ্য করা হয়েছে। গ্রীক সভ্যতায় নারীদের কোন নৈতিক মর্যাদা ছিল না, বরং তাদের বিশৃঙ্খলার উৎস ও শয়তানী কর্মের সহায়ক বলে মনে করা হত। রোমান সভ্যতায় নারী ছিল অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনার পাত্রী। সেখানে নারীদের চরিত্র রক্ষার নামে পুরুষরা নারীদের যৌনাঙ্গে এক ধরনের কষ্টকর লোহার বর্ম পরিয়ে তালা বন্ধ করে রাখত। আর প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে নারীর কোনই মর্যাদা ছিল না; বরং কন্যা সন্তানের জন্ম হলে লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য তাকে জীবিত কবর দিত। -দেখুন, আবদুল খালেক, *নারী ও সমাজ*(ঢাকা:ইফাবা, ২০০৪),পৃ০১-১৮; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ,*নারী নির্যাতনের রকমফের*, (ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি,২০০২) পৃ.১১-৬৪।

[২]. আল-কুরআন, ০৪ : ০১, ৩৩-৩৬, ১২৪; ০৯:৭১; ০৩:১৯৫, ৩৩:৩৫।

[৩]. আল-কুরআন, ২০: ১১৫, ১২১-১২২।

[৪]. আল-কুরআন, ৬৬:১১।

[৫]. আল-কুরআন, ০৩ : ৩৫-৩৬।

[৬]. আল-কুরআন, ২৭: ২০-২৬, ৩৪-৪৪।

[৭]. আল-কুরআন, ২৮: ০৭-১৩, ২৬।

[৮]. আল-কুরআন ০৪:০৪, ২০-২১।

[৯]. জনৈক কুমারী মেয়ে রাসূল সা. নিকট এসে অভিযোগ করেন যে, তার পিতা তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছে, যাকে তার অপছন্দ। তখন নাবী সা. তাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্থাৎ বিবাহ বহাল রাখা বা ভেঙ্গে ফেলার এখতিয়ার দেন। *-সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ২০৯৬।

[১০]. আল-কুরআন০২:২২৯।

[১১]. আল-কুরআন০৪:১৯;০২:২৩২।

[১২]. আল-কুরআন ২৪:২৩।

[১৩]. আল-কুরআন ১৬:৯৭, ০৩:১৯৫, ৪:৭, ৩২; ৯:৭১, ২৪:২, ৫;৩৮, ২৪:৩০-৩১, ৩৩:৩৫।

[১৪]. আল-কুরআন সূরা আন-নিসা ৪: আয়াত ৩২।

[১৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১২৪। আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ৯৭।

[১৬].আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯ : আয়াত ৭১।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ্ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইসলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের চেয়েও উচু মর্যাদা দিয়েছে। যেমন: এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তা'য়ালার পর আমার উপর কার হক সর্বাধিক? তিনি বলেন, তোমার মাতার। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কার? তিনি বলেন, তোমার মাতার। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কার? তিনি বলেন, তোমার মাতার। সে ব্যক্তি আবারও জিজ্ঞাসা করেন, তারপর কার? রাসূল (সা.) বলেন, তোমার পিতার।[১]

ইসলাম পুরুষের মত নারীদেরকেও শিক্ষার সমান অধিকার দিয়েছে। ১৪০০ বছর পূর্বে মানব সমাজে যখন শিক্ষার কোন গুরুত্ব ছিল না তখন ইসলাম নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করেছে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[২], "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের(নর-নারীর) উপর ফরয।" পুত্র সন্তানের মত কন্যাদের প্রতি সমান ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছে। কন্যা সন্তানের জন্মের কারণে মনঃকষ্টকে নিন্দা করা হয়েছে [আল-কুরআন ১৬:৫৮-৫৯]।

ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীদের গৃহে বন্দী থাকুক এরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি। বরং তারা ঈদ, জুম্মা নামাজের শামিল হওয়ার বিধান রেখেছে। জ্ঞান, জীবিকা ও পারিবারিক প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এমনকি প্রয়োজনে তারা যুদ্ধেও শরীক হতে পারে। ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা যুদ্ধাহতদের সেবা করত, অনেকে জীবিকার তাকিদে কৃষি, ব্যবসা, কুটির শিল্পে ও কারুশিল্পে গৃহে ও মাঠে-ময়দানে কাজ করত। নারীদের সম্মোধন করে নাবী সা. বলেন[৩],"প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।"
কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের মতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নারী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হতে বা চাকুরী করতে পারেন। ক. স্বীয় জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং সম্পত্তি ও ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য। খ.সামাজিক প্রয়োজনে মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাতৃসদন, ক্লিনিক, শিশু হাসপাতাল, শিল্পসদন ও ইয়াতীম খানায় চাকুরী করতে পারেন, তবে এসবস্থানে নারীর সাথে পুরুষদের চাকুরী ইসলাম সমর্থন করে না। গ. কোন মহিলার স্বামী বা ভরণপোষণ দাতা না থাকলে, অথবা স্বামীর আয় সংসারের ব্যয়ের তুলনায় খুব কম হলে চাকুরী বা জীবিকার জন্য বাইরে বের হতে পারেন। ঘ.যে পরিবারে শুধু কন্যা আছে বা কন্যার সাথে পুত্র আছে, কিন্তু পুত্র শিশু ও কন্যা বয়স্ক এবং পিতা উপার্জন করতে পারে না, এমন পরিবারের বয়স্কা মেয়ে চাকুরী বা জীবিকার জন্য বাইরে বের হতে পারেন।[৪]

শিশুর অধিকার: শিশুরা দাম্পত্য জীবনের ফসল, বংশের প্রদীপ, পার্থিব জীবনের শোভা ও জান্নাতের পুষ্প স্বরূপ। শিশু মানব প্রজন্ম রক্ষার মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন[৫]–الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-"সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-"ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ রক্ষার উপায়, আর সন্তান হচ্ছে বংশ রক্ষার মাধ্যম।[৬]

শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। তাদের সুস্থ বিকাশের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নতি নিহিত। তাদের ক্ষতি দেশ ও জাতির ক্ষতি। তাই তাদের উত্তমভাবে প্রতিপালনসহ তাদের অধিকারসমূহের ব্যাপারে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। শিশুদের দুর্বল মনে করে তাদের হত্যা করা কিংবা তাদের অধিকার হরণ করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[৭] শিশুদের রক্ষায় কুরআন মৌলিক অধিকার দিয়েছে। সেগুলো হল : ক. বেঁচে থাকার অধিকার। শিশুর এ অধিকার রক্ষায় কুরআন ভ্রূণ হত্যা ও গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব পিতার ওপর ন্যস্ত করেছে।[৮] খ. বংশগত ও জন্মগত পবিত্রতার অধিকার। গ. মাতৃদুগ্ধ পান, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, আশ্রয়, প্রতিপালন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তার অধিকার। এ অধিকার রক্ষায় শিশুর দুই বছর থেকে ত্রিশ মাস পর্যন্ত মাতৃ দুধপানের অধিকার কুরআন নিশ্চিত করেছে। প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পর কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত শিশুর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব পিতার উপর ন্যাস্ত করেছে।[৯] ঘ. শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের অধিকার। ইসলাম শিশুর সুষ্ঠু লালন-পালন, উত্তমভাবে গড়ে তোলা এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ লাভের ব্যাপারে পিতামাতা উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। শিশুকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত করতে নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন লুকমান ('আ.) কে

[১].*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬২৬, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ৫৬২৬।
[২]. মুল আরবী [طلب العلم فريضة على كل مسلم] *সুনান ইবন মাজাহ*, (আল-মুকাদ্দমাহ), হাদীস নং ২২৪ ।
[৩]. মুল আরবী [قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৪৯৩৯।
[৪] .দেখুন, ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ.৩১৫।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৪৬।
[৬]. শিহাবুদ্দীন আলুসী, *প্রাগুক্ত*, খ.১৫, পৃ.২৮৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫১,আল-কুরআন(১৭:৩১)।
[৮]. আল-কুরআন ১৭:৩১; ৬:১৫১, ০২:২৩৩।
[৯]. আল-কুরআন ০২:২৩৩; ৪৬:১৫।

আদর্শ পিতা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১] ঙ. স্নেহ-মমতা, দয়া ও ভালবাসা লাভের অধিকার। চ. ভবিষ্যত নিরাপত্তার অধিকার, খেলাধুলা, বিনোদন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শরীর চর্চা ও আত্মরক্ষার অধিকার। ছ.লিঙ্গভেদে সমব্যবহারের অধিকার।

ড. আবদুর রহিম উমরান বলেন, শিশুদের মৌলিক অধিকার ১০টি। ১.বংশগত ও জন্মগত পবিত্রতা এবং সুস্থতার অধিকার। ২.বেঁচে থাকার অধিকার। ৩. জন্মগত বৈধতা ও ভালো নাম রাখার অধিকার। ৪.মাতৃদুগ্ধপান, আশ্রয়, প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি প্রাপ্তির অধিকার। ৫.পৃথক শয্যায় নিদ্রার যাওয়ার অধিকার। ৬.ভবিষ্যত নিরাপত্তার অধিকার, ৭.নৈতিক চরিত্র গঠন ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের অধিকার। ৮. শিক্ষার অধিকার এবং খেলাধুলা ও আত্মরক্ষার অধিকার। ৯.লিঙ্গভেদে সমব্যবহারের অধিকার। ১০.বৈধ আয় থেকে প্রতিপালিত হবার অধিকার।[২]

শিশুর জীবন ও অধিকার রক্ষায় ইসলাম শুধু নীতিবাণী দেয়নি, বরং বাস্তব ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গামেদীয় গোত্রের জনৈক মহিলা ব্যভিচারে গর্ভবতী হলে উক্ত সন্তানপ্রসব এবং অন্য খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ পানের জন্য রাসূল(সা.) শাস্তিই স্থগিত করেছিলেন।শাস্তি কার্যকরের পূর্বে শিশুটিকে এক ব্যক্তির নিকট ন্যস্ত করা হয়।[৩]

❑.পরমত সহিষ্ণুতা (الحلم):

পরমত সহিষ্ণুতা কুরআনের অন্যতম শিক্ষা এবং উন্নত মূল্যবোধের বাহক। কুরআন এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন বিশুদ্ধ তাওহীদের ধারক। তাওহীদ বিরোধী কোন কাজের সাথে কুরআনের কোন সম্পর্ক নেই। মুর্তিপূজা কুরআনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কোন দেব-দেবীর উপাসনা-আরাধনা তো দূরের কথা, সেসবের কোন অস্তিত্ব কুরআন স্বীকার করে না। অথচ কুরআন অন্য ধর্মের উপাস্য বা দেব-দেবীকে গালাগাল বা নিন্দা করতে এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য না করার বিষয়ে নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন-[৪]

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহ্‌কে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত।"

মহানাবী সা. ছিলেন পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একদিন নাযরান থেকে খ্রীষ্টানদের একটি দল মদীনায় রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করতে এলে তিনি তাদের সবাইকে মসজিদ-ই-নববীর ভিতরে অবস্থান করতে দেন। সন্ধার সময়ে তারা তাদের রীতিতে মসজিদের ভিতর ধর্মীয় প্রার্থনার জন্য দাঁড়ালে কয়েকজন সাহাবী আপত্তি উত্থাপন করেন। তখন রাসূল সা. সাহাবীদের থামিয়ে দেন এবং তাদেরকে প্রার্থনার অনুমতি প্রদান করেন। ফলে সেখানে তারা পূর্বমুখী (জেরুজালেম) হয়ে তাদের প্রার্থনা সম্পন্ন করেন ।[৫]

পরমত সহিষ্ণুতা সামাজিক সম্প্রীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ তৈরীর অন্যতম উপাদান। ইসলাম বরাবরই অন্য মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে। ইসলামে চার মাযহাব অনুসারীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি পরমত সহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শুধু তাই নয়, ইসলাম পূববর্তী সকল নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি যথাযথ সম্মান, ও গুরুত্ব দিয়েছে, যা পরমত সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৬]–

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমার্পণকারী।

ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কঠোর ও সুস্পষ্ট। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতকে স্পেনে মুসলিমদের পতনের পর সেখানকার মুসলিমদের ইসলাম পরিত্যাগ করতে এবং খৃষ্টান হতে বাধ্য করা হয়। যে সব মুসলিম তাতে অসম্মতি জানিয়েছিল তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। অথচ মুসলিম জাতি ৭১১-১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন শাসন করেছে সেখানকার খৃষ্টান, ইহুদীসহ কোন অমুসলিমকে মুসলিমরা জোর করে ধর্মান্তর তো দূরের কথা তাদের প্রতি কোন অসহিষ্ণু আচরণ করেনি। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে মুসলিম জাতি দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত শাসন করেছে– সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধসহ কোন অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম জাতি কোন বৈষম্য ও অসহিষ্ণু আচরণ করেনি। আজও বিভিন্ন মুসলিম দেশে অনেক অমুসলিম সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বাস করছে। খৃস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি করে বা ছলে বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন। ক্রুসেডের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা ইউরোপের চরম বর্বর ও অসভ্য আচরণ

---

[১]. আল-কুরআন ৩১:১৩-১৯।

[২]. ড. আবদেল রহিম উমরান, *ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা*, অনু. শামসুল আলম, (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৫) পৃ.৫০।

[৩]. দেখুন, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ১৬৯৫।

[৪]. আল-কুরআন, ০৬:১০৮।

[৫]. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম প্রকাশ, ১৯৯৪), খ.০৩, পৃ.৬২৯।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩৫-১৩৬।

দেখতে পাই। আজকের কথিত সভ্য ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইসরাইল, আমরিকা, ভারত, বার্মা চীনসহ বিভিন্ন অমুসলিম দেশে মুসলিমদের প্রতি ব্যাপক বৈষম্য ও অসহিষ্ণু আচরণের চিত্র অহরহ লক্ষ্য করা যায়। তাই কথায় নয়, বরং বাস্তব কর্ম ও আচরণে সহিষ্ণুতা দেখানোর নামই পরমত সহিষ্ণুতা।

❑. ইহসান তথা সদাচার, সৌন্দর্যবোধ (الإحسان):

ইহসান (الإِحْسَانِ) শব্দটি 'حسن' থেকে নির্গত, যার অর্থ–সুন্দর, উত্তম, শোভন ও কাঙ্ক্ষিত কাজ করা। আর ইহসান অর্থ–সুন্দর ব্যবহার, উত্তম আচরণ, ভালো ও কল্যাণকর কাজ করা। ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হলে ইহসান অর্থ–উত্তম আনুগত্য করা। শরীয়তের পরিভাষায়–'ইহসান হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে সব দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সেগুলো সর্বোত্তমরূপে সম্পাদন করা।' কুরআনে ইহসান শব্দটি ১২ বার, মুহসিন ০৪ বার, মুহসিনূন ০১বার, মুহসিনীন ৩৩ বার ও মুহসিনাত শব্দ ০১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

ইহসান দু'প্রকার: ক). স্রষ্টার প্রতি ইহসান, খ). সৃষ্টির প্রতি ইহসান,
ক). *স্রষ্টার প্রতি ইহসান*–তা হল, আল্লাহর নিকট নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমার্পণ করে উত্তমভাবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা। আল্লাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও সকল সৎকর্ম পূর্ণ ইখলাসের সাথে উত্তমভাবে সম্পন্ন করা, যেন সে আল্লাহকে দেখছেন। এটা ইহসানের সর্বোচ্চ স্তর। যদি এই স্তরে কেউ পৌঁছতে না পারে তবে সে এই ইয়াকীন রাখবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন, আমার সব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন। স্রষ্টার প্রতি ইহসান সম্পর্কে নাবী সা. বলেন[১]-"*তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে(অনুভব করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন।*"
খ). *সৃষ্টির প্রতি ইহসান*–তা হল, সমগ্র সৃষ্টির প্রতি উত্তম আচরণ এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা। অন্যের সাথে এমন উত্তম আচরণ করা যা অন্যকে উপকৃত করবে অথচ তা ইহসানকারীর জন্য আবশ্যক নয়।

ইহসানের পরিধি অনেক ব্যাপক। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে জুড়ে ইহসানের ক্ষেত্র।[২] ব্যক্তি ইহসান তথা সদ্ব্যবহার করবে তার নিজের সাথে[৩] যেমন: নিজ শরীরের হক আদায়, স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত, আত্মসংশোধন এবং অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত না হওয়ার মাধ্যমে, ইত্যাদি। পারিবারিক ও সামাজিক ইহসান করবে স্বীয় পিতা-মাতার সাথে, নিজ স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজনের সাথে, অধীনস্থ লোকদের সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, প্রতিবেশীর সাথে, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের সাথে; শত্রুর সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে, প্রতিশোধ গ্রহণে, ক্ষমার ব্যাপারে, মন্দ আচরণের প্রতিদানে, বিতর্ক ও পরমতের ব্যাপারে, পশু-পাখি,জীব-জন্তু ও গাছ-পালাসহ সব সৃষ্টির সাথে করা। রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে ইহসান করবে রাজনৈতিক ব্যাপারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আর অর্থনৈতিক লেন-দেনে ও মানব কল্যাণে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-[৪]

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا-

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"

ইহসান অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতির নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে,[৫]

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।"

ইহসান একটি অতি উন্নত নৈতিক গুণ। এটা মহান আল্লাহর গুণ[৬] এবং নাবী-রাসূল ও সৎকর্মশীল মু'মিনদের গুণ[৭]। ইহসান দু'প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার ইহসান ইবাদতের উচু স্তর, ঈমানের সারবস্তু, ঈমানের প্রাণ ও পূর্ণতা দানকারী। ঈমানের সবগুলো স্তর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। ইহসানের এই স্তর মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে এই ধারণা ও বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করছেন। ফলে ব্যক্তি সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে এতে ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক উন্নতি ও সমদ্ধির বিকাশ সাধন হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার ইহসানের গুরুত্বও অপরিসীম। এটি আদর্শ সমাজের একটি মৌলিক উপাদান। এটি মানুষের মধ্যে দয়া, সহমর্মিতা ও পরোপকারের

---

[১].মুল আরবী[أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৫০।
[২]. দেখুন, আল-কুরআন, ১১: ১১৫; ২:২৩৬, ২:১৭৮, ২:১৯৫, ৩:১৩৪, ১৪৭-১৪৮, ৪১:৩৪, ৬:১৫২, ৪:৮৬, ১৮:৮৬-৮৮, ২৯:৪৬, ২৮:৭৭।
[৩].আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৬; আল-কুরআন ২:৮৩, ৫:১৩, ১৬:১২৫, ১৭:০৭, ৪১:৩৪।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৩।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩৮; আল-কুরআন ৪:৭৮-৭৯,৫:৫০, ৭:১৩৭, ১২:১০০, ৩২:৭, ৩৭:১২৫, ৪০:২৪, ৬৪:২-৩।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩৬; আল-কুরআন ৪:১২৫, ১২:৩৬, ১০০, ৩১:১-৩, ২২, ৩৭:১১৩।

মনোভাব সৃষ্টি করে এবং মনের কলুষতা ও সংকীর্ণতা দূর করে।এর মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য, হৃদ্যতা ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, আগ্রগতি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় তা অগ্রণী ভুমিকা পালন করে এবং সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে। ইহসানের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে মহান আল্লাহর তা অর্জনের জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন[১]– إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।-এই আয়াতে করণীয় ও বর্জনীয় ছয়টি নির্দেশ রয়েছে, যা পালনের দ্বারা মানব জীবনের পূর্ণ সফলতা রয়েছে।

ইসলাম সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও ইহসানের জন্য তাকিদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[২],-وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- "তোমরা ইহসান কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইহসানকারীদের ভালবাসেন।" আরও বলেন[৩], وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ -"তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৪]–"যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, তার প্রতিও (আল্লাহর পক্ষ হতে) দয়া করা হয় না।" মানুষের কষ্ট দূর করাকে পূণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে[৫], "একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। (এক জায়গায় গিয়ে) সে দেখতে পেল কাটাযুক্ত একটা ডাল রাস্তায় পড়ে আছে। সে ডালটি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তার কাজের মর্যাদা দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।"

কারো উপকার করে খোঁটা দান, কিছু দিয়ে প্রতিদান চাওয়া, কাউকে কষ্ট প্রদান যেমন: কোন ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দেওয়া, কোন জীব-জন্তুর কান কেটে দেয়া, মুখে দাগ দেয়া, মুখের উপর মারা কিংবা কষ্ট দিয়ে হত্যা করা ইত্যাদি নির্মম আচরণ ইহসান পরিপন্থী। এসব ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে যে জীব-জন্তুর মুখে দাগ দেয়া কিংবা মুখের উপর মারে।[৬] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন পশুকে নির্মমভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।[৭] জীব-জন্তুর যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে যবেহ্ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ মর্মে

> রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৮] প্রত্যেক জিনিসের প্রতি আল্লাহ দয়া-মায়াপূর্ণ ব্যবহার আবশ্যক করেছেন। অতএব কোন প্রাণীকে তোমরা হত্যা করলে, ভালোভাবে হত্যা করবে এবং কোন পশুকে যবেহ্ করলে ভালোভাবে যবেহ্ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই তার ছুরিকে যেন ধারালো করে নেয় এবং যবেহ্ করার প্রাণীকে স্বস্তি দেয়।
>
> আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) একদিন একজন আনসারী লোকের বাগানে প্রবেশ করলে, সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, একটি উট রাসূল (সা.) কে দেখে ছটপট করছে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তারপর উটটি রাসূল (সা.) এর কাছে আসলে তিনি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। তারপর উটটি চুপ হয়ে গেল। তখন রাসূল (সা.) বললেন, এ উট কার? এ কথা শুনে একজন আনসার যুবক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! উটটি আমার। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে চতুষ্পদ জন্তুর মালিক বানিয়েছে, তাদের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না। কারণ এ উট আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে ঠিকমত খাওয়ার দাও না এবং তাকে অনেক কষ্ট দাও।[৯]

ইহসান এমন উত্তম কাজ, যা শুধু কল্যাণ বয়ে আনে। এজন্য কুরআনে ইহসানের অনেক সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এটা মহান আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি, ভালবাসা, নৈকট্য ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। এর মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। মুহসিন বান্দাদের জন্য পার্থিব রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি-নিরাপত্তা ও বিরাট মর্যাদা। যুগে যুগে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ভাজন হয়েছেন।[১০] তারা সর্বদা আল্লাহর রহমত নিকটবর্তী।[১১] এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী[১২]-وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ "আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়নদের সঙ্গে থাকেন।" আরও বলা হয়[১৩]-إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ-"নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" অন্যত্র এসেছে[১৪] - لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ "যারা এই দুনিয়ায় উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয় আখিরাতের আবাস উত্তম এবং মুত্তাকীদের আবাস কতইনা উত্তম!"আরও বলা হয়েছে[১৫]-وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ-"আর আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৯০।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৭৭; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২:৮৩,১৭৮,২২৯, ৪:৩৬,৮৬, ৬:১৫১-৫২,১৭:৩৩,৫৩, ২৯:৪৬।
[৪].মুল আরবী[من لا يرحم لا يرحم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৫১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ফাদাইল, হাদীস নং২৩১৮।
[৫].মুল আরবী[بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জামা'আত, হা. নং৬২৪; *সহীহ মুসলিম*, হা. নং১৯১৪।
[৬].মুল আরবী[أن النبي صلى الله عليه و سلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها ؟فنهى عن ذلك]*সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, হা.২৫৬৪।
[৭]. মুল আরবী [نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تصبر البهائم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাবায়িহ,হাদীস নং ৫১৯৪; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সাইদ, হা. নং ১৯৫৬।
[৮].মুল আরবী[إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সাইদ, হা. নং ১৯৫৫।
[৯]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০১, পৃ. ২০৪, হা. নং ১৭৪৫।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আস্-সাফ্ফাত ৩৭: আয়াত ১০৫,১১০,১২১,১৩১।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৫৬; আরও দেখুন. আল-কুরআন ২:৫৮, ১১২, ৩:১৩৬, ১৪৮, ৫:৮৫,৯৩, ৬:৮৪, ৭:১৬১, ১০:২৬, ১১:১১৫ ১২:২২,৫৬,৯০, ১৬:১২৮, ১৮:৩০, ২৯:৬৯, ৩৯:৩৪-৩৫,৫১:১৫-১৬, ৫৫:৬০।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৬৯।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১২০।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ৩০, আল-কুরআন ৩৯:১০।
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪৮।

সর্বপরি, কেউ কারো প্রতি ইহসান করলে তার বিনিময়ে তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে ইহসান। মহান আল্লাহ বলেন, هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ "উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে।"[আল-কুরআন ৫৫:৬০]

ইহসানের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানাবী সা. বলেন[১]–"তোমাদের কেউ যখন তার ইসলামকে সুন্দর করে তোলে, তখন সে যে ভালো কাজ করে তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। কিন্তু সে যে মন্দ কাজ করে তার বিনিময়ে তার জন্য (কেবল) ততটুকুই লেখা হয়।" অন্যত্র বলেন[২]–"সমস্ত সৃষ্টি জগত আল্লাহর পরিবার স্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টি জগতের মধ্যে সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সাথে অধিক সদ্ব্যবহার করে।"

ইহসানের ক্ষেত্র ও উপায়: ক. পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের সাথে সদাচারণ। খ. অনাথ, বিধবা ও অভাবীদের দুঃখ-কষ্ট ও অভাব দূরীকরণ। গ. অসুস্থের সেবা। ঘ.বিপদগ্রস্থদের সাহায্য। ঙ.ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান। চ.বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান। ছ. অধীনস্থদের ও দাসদাসীর উপর সাধ্যতীত কাজের বোঝা না চাপানো। জ. পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও গাছ-পাল কে কষ্ট না দেয়া ও অকারণে হত্যা না করা তাদের সাথে সদাচারণ। ঝ. মানুষকে ক্ষমা।

❑. সৃষ্টির সেবা ও মানব কল্যাণ (خدمة الخلق):

বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি। এই বিশাল সৃষ্টি পরিবারের মধ্যে মানুষই সেরা সৃষ্টি বা আশরাফুল মাকলূকাত। পরিবারের প্রধানের যেমন পরিবারের প্রতি অনেক দায়িত্ব থাকে, তেমনি সেরা সৃষ্টি হিসেবে অন্য সৃষ্টিকূলের প্রতি মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এই কর্তব্য পালন করাকে বলে খিদমতে খাল্‌ক বা সৃষ্টির সেবা। এটা একটি বড় পূণ্যের কাজ। এর দ্বারা সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ...وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ...

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্ ও পরকাল, ঈমান আনয়ন করলে... এবং আল্লাহ্ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে।" মহান আল্লাহ আরও বলেন[৪]–

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ....وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ- এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, প্রতিবেশী...মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্তদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"

সৃষ্টির সেবা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক কর্ম ও পূণ্যের কাজ। এটা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের মাধ্যম। এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, পিপাসায় মৃতপ্রায় একটি কুকুর একটা কূপের চারপাশে চক্কর দিচ্ছিল। বনী ইসরাইলের এক পতিতা মহিলা কুকুরটিকে এ অবস্থায় দেখতে পেল। সে তার মোজা খুলে ফেলল এবং তা দিয়ে কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পান করালো। এ কাজের কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।[৫] ফলে সে জান্নাতবাসী হয়। এর বিপরীতে আরেকজন মহিলা একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে না খেতে দিয়ে কষ্ট দিলে সে মারা যায়। এর ফলে ঐ মহিলা জাহান্নামী হয়।[৬] তিনি আরও বলেন, 'যে কোন জীবিত প্রাণীর সেবা-যত্নে সওয়াব হয়ে থাকে'।[৭] শুধু তাই নয়, সৃষ্টির সেবায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা সাদাকা তুল্য পূণ্যের কাজ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"কোন মুসলিম যদি গাছ রোপন করে অথবা কোন ফসল আবাদ করে তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ কিংবা চতুস্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদাকারূপে গণ্য হবে।"[৮]

সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা, তাই সৃষ্টির মধ্যে মানব সেবা সবচেয়ে বড় মহৎ কাজ। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, মহান আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[৯]

তিনি আরও বলেছেন, "তোমরা বন্দীদের মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও এবং অসুস্থকে সেবা করো।"[১০]

---

[১].মূল আরবী[إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং৪২; *মুসলিম*, হা.১২৯।

[২].মুল আরবী [الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عيال] *মিশকাত*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯৯৯।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ :আয়াত ১৭৭।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩৬।

[৫].মূল আরবী[غفر لأمرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু বাদইল খালক, হাদীস নং ৩১৪৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, হাদীস নং ২২৪৫।

[৬].মূল আরবী[عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النا] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুল মুসাকাত, হা.নং২২৩৬;*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, হা.২২৪২।

[৭].মূল আরবী[في كل كبد رطبة أجر] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৬৩; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুস সালাম, হাদীস নং ২২৪৪।

[৮]. মূল আরবী [ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৬৬৬।

[৯]. মূল আরবী [من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর, হাদীস নং ২৬৯৯; *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৪৯৪৬।

[১০]. মূল আরবী [فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৮৮১।

সাধারণ সৃষ্টির সেবা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজ সেখানে সৃষ্টিকূলের মানুষের সেবা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এর মাধ্যমে স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর সেবা করা হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[১]–

> কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। সে বলবে, হে আমার রব! তুমি তো বিশ্বজগতের প্রভু, আমি কি করে তোমার সেবা করতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি মনে নেই যে, আমার অমুক বান্দাহ রোগাক্রান্ত ছিলো। তখন তুমি তার খোঁজ-খবর নেওনি। যদি তুমি তার সেবা করতে তাহলে সেখানে আমাকে পেতে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি তো সারা জাহানের মালিক,আমি কিভাবে তোমার খাওয়াতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি স্মরণে নেই যে, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি। তোমার কি একথা জানা ছিল না যে, তুমি যদি তাকে খেতে দিতে তাহলে এর প্রতিদান আমার কাছে পেতে। অতঃপর তিনি (অরেকজনকে)বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে পান করাও নি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি তোমাকে কিভাবে পান করাতে পারি? তুমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দাহ তোমার কাছে পানি চেয়েছিল তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে এখন তার প্রতিদান আমার কাছে পেতে।

মানব কল্যাণের কোন কাজকে ছোট মনে করা উচিত নয়। রাসূল সা. বলেন[২]–"এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় একটি কাটাযুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তাঁর এ কাজকে কবুল করে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"

মানুষের কল্যাণ সাধনকারীকে হাদীসে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৩],

> আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশি মানুষের উপকার করে। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো কোন মুসলিমের অন্তরে পবিত্র আনন্দ দান করা অথবা কষ্ট দূর করা অথবা তার ঋণ পরিশোধ করা অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আমি যদি আমার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণের জন্য যাই, তাহলে এটা আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববী) একমাস এতেকাফ করার থেকে উত্তম।

সৃষ্টির সেবা ও মানব কল্যাণে কৃত প্রতিটি ছোট-বড় ভালো কাজ বিনিময়ে রয়েছে সাওয়াব। এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেন-[৪] "পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদাকা। দৃষ্টিহীনকে পথ দেখানো তোমার জন্য সাদাকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদাকা। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে তোমার জন্য সাদাকা।"

খিদমতে খাল্‌কের ক্ষেত্রসমূহ : আর্ত-পীড়িতদের সেবা, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান, অতিথি সেবা-যত্ন, জীব-জন্তু, পশু-পাখি সহ সকল প্রাণীর সদ্ব্যবহার করা।

....

সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে করণীয় বিষয়াবলীর বর্ণনা এখানেই শেষ করা হলো। সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে বসবাসকারী মানুষের জন্য ইসলাম উল্লেখিত যে সব বিধান ও নীতিমালা দিয়েছে তা বাস্তবায়ন এবং পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়ে একটি কাঙ্ক্ষিত শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন সম্ভবপর হবে। বস্তুত এ সব বিধান পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে। কিন্তু অনেক লোক ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিয়েছে। তারা সামাজিক আচার-আচরণকে ইসলামের বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক অধিকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। তারা এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলে গ্রহণ করতে চায় না। তাই এসব জানতে যেমন তাদের আগ্রহ নেই, তেমনি এগুলো পালনের ব্যাপারেও তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তথাকথিত দীনদারদের মধ্যে এই ত্রুটি বেশির ভাগ দেখা যায়। ফলে আজ কাঙ্ক্ষিত ইসলামী সমাজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

---

১. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ২৫৬৯।

২.মূল আরবী[بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله فغفر له] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুল মাযালিম, হা.নং ২৩৪০;***সহীহ মুসলিম*, হা. ১৯১৪**।

৩. আবুল কাসেম আত-তাবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, *প্রাগুক্ত*, খ.১২, পৃ.৪৫৩, বাবুল 'আইন, হাদীস নং ১৩৬৪৬।

৪. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. ১৯৫৬।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সরকার ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহ

সমাজের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা, সুবিচার ও উন্নয়নের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে রাষ্ট্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন কাল থেকে অপরাধ দমন, সমাজ সংশোধন ও মানুষের কল্যাণে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইসলামও কখনো রাষ্ট্রের গুরুত্ব খাঁটো করে দেখেনি। বরং কুরআন থেকে জানা যায়, নাবী-রাসূলদের অনেকেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার করেছেন। এক্ষেত্রে ইউসুফ ('আ.), দাউদ ('আ.), সুলাইমান ('আ.) ও মুহাম্মাদ সা. নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরআন সমাজ সংস্কার, সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়-অসত্যের মুলৎপাটন করে যে উন্নত সমাজের রূপরেখা দিয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। এটা শুধু দাওয়াত-তাবলীগ ও ওয়ায-নসীহত দ্বারা সম্ভব নয়। এ কারণে রাসূল সা. রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য দু'আ করেছিলেন, আর এই দু'আ আল্লাহই তাঁকে শিক্ষা দেন [আল-কুরআন ১৭ : ৮০]। শুধু তাই নয়, মদীনায় হিজরতের পর পরই রাষ্ট্র গঠন করে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর চার খলীফাও ইসলামের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। কাজেই ইসলাম ও রাষ্ট্র একে অপরের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। ইসলামে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করার কোনই সুযোগ নেই। বরং রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করলে ইসলাম খণ্ডিত হয়ে পড়ে। আর খণ্ডিত ইসলাম পালনের দ্বারা পার্থিব শান্তি-সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তি অসম্ভব। [আল-কুরআন ০২ : ৮৫]। তাই আল-কুরআন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কিছু নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে। এর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারের এবং আর কিছু রয়েছে নাগরিকের।

আল-কুরআন প্রদত্ত রাষ্ট্র পরিচালনার নৈতিক নীতিমালাঃ

❑.সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং অবিচার ও বৈষম্য নির্মূল(العدل والإنصاف):

আদল শব্দটি আরবী শব্দ, যা যুলমের বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ-কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে সমান সমান করা, ভারসাম্য রক্ষা করা, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করা। আদলের সমর্থক শব্দ ইনসাফ। পরিভাষায় আদল হল– 'কোন বস্তুকে সমান অংশের অধিকারীদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা, যাতে কার অংশ বিন্দু পরিমাণও কম বেশী না হয়।' ভিন্ন কথায়–'যার যা প্রাপ্য, তাকে তা প্রদানের করার নাম আদল।' কারো কারো মতে–'যাবতীয় কর্মকাণ্ড কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী যথার্থভাবে সম্পন্ন করা।' বস্তুত প্রত্যেক হকদারকে তাঁর প্রাপ্য হক যথাযথভাবে প্রদান করাই আদল। আমীর-ফকির, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, শত্রু-মিত্র, আপন-পর, সাদা-কলো আরব-অনারব ইত্যাদি নির্বিশেষে সব মানুষকে তার প্রাপ্য নায্য অধিকার প্রদান করাই আদল-ইনসাফের মূলকথা। কুরআনে 'আদল' শব্দটি ১৪ বার বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ১৪ বার এসেছে। উল্লেখ্য যে, আদলের সমার্থক শব্দ 'কিস্ত'; কুরআনে কিস্ত ১৫বার এবং ক্রিয়াপদে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

আদল-ইনসাফ একটি ব্যাপক বিষয়। এটা শুধু বিচারালয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় নয়, বরং তা সমগ্র মানব জীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এজন্য কুরআন মানুষকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়সহ জীবনের সব দিক ও বিভাগে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার তাকিদ দেয়। যেমন-

কুরআন মানুষকে তার ব্যক্তিগত জীবনের যাবতীয় কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড আদল-ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]–وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى-"যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫২।

অনুরূপভাবে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। পারিবারিক জীবনে একাধিক স্ত্রী কিংবা সন্তানের ক্ষেত্রে আদল-ইনসাফ ভিত্তিতে আচরণ জরুরী। যেমন একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে[1]- وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا "তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখও না, যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

একইভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আদল প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের নির্দেশ মতে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্রই যাবতীয় বিচার-ফায়সালা ও সমস্যা সমাধান করতে হবে আদল-ইনসাফের ভিত্তিতে। মহান আল্লাহ বলেন[2]– وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" কারো প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত অবিচার ও বেইনসাফি কুরআনের দৃষ্টিতে নীতি বিবর্জিত। তাই ব্যক্তিগত বা জাতিগত শত্রুতা যাতে ন্যায়বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য বলা হয়েছে[3], وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ "কোন জাতির প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ন্যায় কুরআনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও লেনে-দেনের আদল-ইনসাফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[4] এভাবে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তা যেন ব্যাহত না হয় সেজন্য এ ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[5]– قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ "বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।"

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুসলিম-অমুসলিম ও কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সব মানুষের সাথে কুরআন আদল-ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[6] لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি–ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণকারীদেরকে ভালবাসেন।"

আদল-ইনসাফ কুরআনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। কুরআন নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্য এটা। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ আদলকে ইসলামের লক্ষ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ড. আবদুল্লাহ দারায বলেন-[7] "আল-কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের আত্মাকে আলোকিত করতে, তার নীতিবোধ বিশোধন করতে, তার সমাজকে সংহত করতে এবং মানব সমাজে শক্তিমানের অধিপত্যের পরিবর্তে ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ব কায়েম করতে।"

সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে ক'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রয়োজন তন্মধ্যে আদল-ইনসাফ অন্যতম। এটা সামাজিক শান্তি-নিরাপত্তা, সাম্য, ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও মূল্যবোধ বিকাশের অপরিহার্য শর্ত। এর মাধ্যমে সমাজ থেকে যুল্ম, অন্যায় ও বৈষম্য রোধ এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব। এটা সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি বড় মাধ্যম। এর উপর নির্ভর করে সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় শান্তি-শৃঙ্খলা। এছাড়া ভারসাম্যপূর্ণ, স্থিতিশীল, শান্তিময় ও সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। কোন সমাজ থেকে যতটুকু পরিমাণ আদল ও ইনসাফ উঠে যাবে, সে সমাজে যুল্ম ও অন্যায় ততটুকু পরিমাণ স্থান দখল করে নেবে। তাই কুরআন সকলের প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[8]–(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ)"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ন্যায় সাক্ষদানে তোমরা অবিচল থাকবে।" অন্যত্র বলেন[9] (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ)"আর যদি তুমি ফয়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর ন্যায়ভিত্তিক।" অন্যত্র আরও বলেন[10] (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا)"তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর।" –উল্লেখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা এবং বিচার-মীমাংসা কার্যে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় তাকিদ দিয়েছেন।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১২৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৫৮।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদাহ : আয়াত ০৮।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮২।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ২৯।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ ৬০: আয়াত ০৮।
৭.কেনেথ ডাব্লিউ মর্গান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৫।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০৮।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৪২।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৯; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৪:১০৫, ৪২:৪০।

এজন্য ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (মৃ. ১৩২৮ খৃ.) ন্যায়বিচারকে তৌহিদে বিশ্বাসের অনিবার্য ফলাফল হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, ' ভালো সবকিছুই ন্যায়বিচারের অংশ এবং খারাপ সবকিছুই যুল্মের অংশ।'[১]

আদল-ইনসাফ মানব জীবনে সব বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে, জীবনকে চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে সকলে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করতে পারে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরী। এজন্য মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সা. কে আদল সুপ্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[২] وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ "আর আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে। আদল-ইনসাফ মহান আল্লাহ চিরন্তন রীতি। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র তা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-[৩]

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ- أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ- وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ- -

"আর তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন। যাতে তোমরা দাঁড়িপাল্লায় সীমালঙ্ঘন না কর। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওজনকৃত বস্তু কম দিও না।"
ইবন খালদুন(মৃ.১৪০৬ খৃ.) মতে, 'ন্যায়পরায়নতা(আদল-ইনসাফ) ব্যতীত কোন দেশ উন্নতি লাভ করতে পারে না।'[৪]
আদল ও ইনসাফ মহান আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।[৫] এটা সামাজিক ভারসাম্যের সার্বজনীন মূলনীতি। সর্বকালের সকল সমাজ ব্যবস্থায় এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীতে যুগে যুগে নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, আল্লাহর হক (তাওহীদ) ও বান্দার অধিকার ইনসাফ সহকারে প্রতিষ্ঠা। সকল নাবী-রাসূল এটা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলেন। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৬]

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্য সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[৭]

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, রয়েছে তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিদ কল্যাণ। আর এটা এজন্য যে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর,পরাক্রমশালী।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর কিতাবের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেউ যদি তা প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয় কিংবা তা উপেক্ষা করে ভিন্ন মতাদর্শ ও নীতির অনুসরণ করে তবে তার প্রতিরোধে প্রয়োজনে লৌহ নির্মিত অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা হলেও তাকে অন্যায় পথ থেকে ন্যায়ের পথে ফিরাতে হবে।

ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়ন ঘটে। কেননা সততা, ন্যায়পরায়নতা, দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সতর্কতা, সৎসাহস ও দৃঢ়তা ছাড়া ন্যায়বিচার করা সম্ভবপর নয়। আর এ সব সদগুণাবলী মুত্তাকীর ভূষণ ও তাকওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি বিষয়। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৮] – اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - "সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।"

ইসলাম ন্যায় ও সাম্যের প্রতীক। ইসলাম শুধু সাম্য ও ন্যায়বিচারের ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মানব সমাজে এর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত: আয়েশা (রা). বলেন, মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করেছিল। তা কুরাইশদের অস্থির করে তুলেছিল। তারা বললো, কে রাসূল (সা.) এর নিকট এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে? উসামা ইবন যায়িদ (রা.) ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে নির্ভীকতা প্রদর্শন করবে? কারণ সে রাসূল (সা.) এর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। অতঃপর সে রাসূল (সা.) এর নিকট (এ ব্যাপারে) আলোচনা করল। রাসূল (সা.) (ক্ষুব্ধ হয়ে) বললেন, তুমি কি আল্লাহর দণ্ডবিধিসমূহ থেকে এক দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিয়ে বললেন-[৯],

---

[১]. ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমু' ল ফাতাওয়া*, (আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২য় সং.) খ.১৮, পৃ.১৬৬।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২ : আয়াত ১৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান ৫৫: আয়াত ০৭-০৯।
[৪]. ইবনু খালদূন, *মুকাদ্দিমাহ* (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.) খ.০১, পৃ.২৮৭।
[৫]. মহান আল্লাহ বলেন - إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ-"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচারণের নির্দেশ দেন।" সূরা আন্-নাহ্ল ১৬ : আয়াত ৯০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা সাদ ৩৮ : আয়াত ২৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : আয়াত ২৫।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০৮।
[৯].মূল আরবী [إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها] -*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২৮৮; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ১৬৮৮।

'হে লোকেরা! (জেনে নাও) তোমাদের পূর্বকার লোকদের নীতি ছিল যে, কোন সম্ভ্রান্ত চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো। আর তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর দণ্ডপ্রয়োগ করতো। এটা তাদের নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের সা. কন্যা ফাতিমাও চুরি করে, তবে মুহাম্মাদ সা. নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দেবে।'

ইসলামের অবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মুসলিমগণ কর্তৃক পারস্য অভিযানের প্রাক্কালে পারস্য সেনাপতি রুস্তম এর সাথে মুসলিম সেনা প্রতিনিধি রবি' ইবন আমর রা.কথপোকথনে তাই ফুটে উঠে। এ ব্যাপারে সেনাপতি রুস্তম মুসলিম প্রতিনিধি রবি' রা. কে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কেন যুদ্ধ করতে এসেছ? উত্তরে তিনি বলেন-[১],

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন, তিনি (মানুষের মধ্যে) যাদের চান তাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে কেবল তাঁর (এক আল্লাহর) দাসত্ব ও আনুগত্যের দিকে, দুনিয়ার বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে আখিরাতের বিশালতা ও প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়পরায়নতা দিকে নিয়ে আসার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে।"

পৃথিবীতে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা টিকে ছিল, ততদিন ইসলাম সমাজে শক্তিশালী-দুর্বল নির্বিশেষে সবার ওপর ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এতে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল ও আমীর-ফকীর ভেদে বিচারে বৈষম্যের কোন প্রশয় দেয়নি। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা: একবার হজ্জ উপলক্ষে উমর (রা.) সমস্ত গভর্নরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলেন: এদের বিরুদ্ধে কারোর ওপর কোন অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো নির্দ্বিধায়। গোটা সমাবেশ থেকে মাত্র একজন লোক উঠে আমর ইবনুল আস- এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন: তিনি অন্যায়ভাবে আমাকে একশ দোররা মেরেছেন। উমর (রা.) বলেন: ওঠ এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। আমর রা. প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি গভর্নরদের বিরুদ্ধে এ পথ উন্মুক্ত করবেন না। কিন্তু তিনি বলেন: "আমি আল্লাহর রাসূলকে নিজের থেকে প্রতিশোধ নিতে দেখেছি। হে অভিযোগকারী, এসো তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" শেষ পর্যন্ত আমর ইবনুল আস (রা.) কে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দু'আশরাফী দিয়ে আপন পিঠ রক্ষা করতে হয়।[২]

আদল-ইনসাফ তথা সুবিচার-সাম্য প্রতিষ্ঠা একটি কঠিন কাজ। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শক্তি ও ক্ষমতার। তাই এই কাজটি বিশেষভাবে সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের উপর ন্যাস্ত। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–" সুলতান হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া, প্রতিটি অত্যাচারিত নিপীড়িত ব্যক্তি তার নিকট আশ্রয় পাবে।"[৩]

আদল ও ন্যায়বিচার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। কাজেই যারা ইনসাফকারী ও ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।ইরশাদ হচ্ছে[৪] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।" ন্যায়বিচারের পার্থিব গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. (মৃ.১৮২হি.) বলেন[৫], "নিপীড়িতকে ন্যায়বিচার প্রদান করে ও অবিচার দূর করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায়, দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করা যায় এবং কল্যাণ হাসিল ছাড়াও পরকালীন পুরস্কার নিশ্চিত করা যায়। আর অন্যায়ভাবে রাজস্ব কর আদায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবনতি ঘটে।"

•বিচার কার্যে আদলের গুরুত্ব ও ন্যায়বিচারকের মর্যাদা এবং অন্যায় বিচারের মন্দ পরিণাম:
ইসলামে ন্যায়বিচার করা ফরজ। আর পক্ষপাতমূলত বিচার হারাম। তাই ইসলামে ন্যায় বিচারকের যেমন মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি অন্যায় বিচারের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন[৬]–

আল্লাহর ছায়া ছাড়া যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'য়ালা সাত শ্রেণীর লোককে স্বীয় রহমতের ছায়াতলে স্থান দেবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) ইবাদতগুযার যুবক, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হবার পরও পুনরায় মসজিদে যাওয়ার ভাবনায় মগ্ন থাকে। (৪) সেই দুই ব্যক্তি যাদের বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে, ঐ বন্ধুত্বের ভিত্তিতেই তারা মিলিত হয় এবং বিচ্ছিন্ন হলেও ঐ কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো অভিজাত সুন্দরী নারী (প্রেম বা যৌনাচারের) আহ্বান জানায় আর সে এই বলে জবাব দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান-খয়রাত করে যে, ডান হাতে খরচ করলে তার বাম হাত জানে না। (৭) যে ব্যক্তি একান্ত নির্জনে মানুষের অগোচরে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং এবং (পাপের জন্য) স্বীয় চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত করে।

পার্থিব স্বার্থের বশীবর্তী হয়ে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থাকা বা ন্যায়বিচারে শৈথল্য প্রদর্শন করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কেউ যদি এরূপ করে সে অপরাধী হবে। এই অপরাধের পরিণাম অতি ভয়াবহ। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন-[৭]

---

[১].মূল আরবী الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام فارسلنا بدينه الى خلقه لتدعوهم اليه–ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.) খ.২, পৃ.৪০১; ইবনু কাছীর রহ. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ.০৭ পৃ.৩৯।

[২]. ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১৬ ।

[৩]. মূল আরবী [إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده]মিশকাত, কিতাবুল ইমারাহ ওয়াল কাদা, হাদীস নং ৩৭১৮।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৪২, আল-কুরআন ৪৯:০৯।

[৫]. ইমাম আবূ ইউসুফ রহ., *কিতাবুল খারাজ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১১১.।

[৬].মূল আরবী [سبعة يظلهم الله في ضله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه -*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জামা'আত, হা. নং ৬২৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হা. নং ১০৩১(মুসলিমের ভাষ্য)।

[৭]. মূল আরবী [القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار]*সুনান আবূ দাঊদ*, কিতাবুল আক্বদিয়াহ, হাদীস নং ৩৫৭৩।

বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতে যাবে। আর দু'শ্রেণীর বিচারক যাবে জাহান্নামে। যে বিচারক প্রকৃত সত্যটি যথার্থ উপলব্ধি করেন এবং সে অনুযায়ী বিচার করেন, তিনি জান্নাতী। পক্ষান্তরে, যে বিচারক প্রকৃত সত্যটি যথার্থ উপলব্ধি করেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় রায় প্রদান করে সে জাহান্নামী। আর যে বিচারক প্রকৃত সত্যটি যথার্থ উপলব্ধি করে না, খামখেয়ালিভাবে রায় দেয় সে জাহান্নামী।

রাসূল সা. আরও বলেন[১]–"কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে ন্যায়পরায়ন শাসক। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও সবচেয়ে দূরে অবস্থানকারী হবে স্বৈরাচারী শাসক।"

• *আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা*: মানব সমাজে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিকটজনদের প্রতি ভালবাসা, তাদের সুপারিশ, শত্রুর প্রতি ক্ষোভ, ধনীর প্রতি আগ্রহ, দরিদ্রের প্রতি অবহেলা ইত্যাদি মানুষের সহজাত দুর্বলতা। এ সব মানুষকে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। তাই ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, শত্রু-বন্ধু, সাদা-কালো নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[২]-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্‌ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তার সম্যক খবর রাখেন।"

উল্লেখিত আয়াতে সর্বপ্রকার দুর্বলতা, পক্ষপাতিত্ব বা স্বজনপ্রীতি উর্ধ্বে উঠে ধনী-দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত-দুর্বল, আত্মীয়-অনাত্মীয়, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের প্রতি সাম্য ও সুবিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কথার মারপেঁচে কিংবা অন্য কোন পরোক্ষভাবে যারা ন্যায়বিচার এড়িয়ে চলে তাদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চরণ করেছে।

এছাড়া এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলো হল: অভিযুক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈষম্য, ক্ষমতাসীনদের অবৈধ হস্তক্ষেপ, বিচারকের অযোগ্যতা, অদূরদর্শীতা, অনভিজ্ঞতা, বিচারকের নৈতিক দুর্বলতা, ঘুষ গ্রহণ ও স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি।

• *ন্যায়বিচারের জন্য মৌলিক শর্তাবলী ও বিচারকের নৈতিক গুণাবলী:* ন্যায়বিচারের জন্য বিচারকের করণীয় হলো, বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনে তা যাচাই-বাছাই ও সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা। বাদী ও বিবাদী কোন পক্ষের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণ না করা, কোন পক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত কিংবা নিষ্ঠুর বা রূঢ় আচরণ না করা। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রভাবিত অথবা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কিংবা অন্যের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক মোকাদ্দমার রায় প্রদান না করা। বাদী-বিবাদী কারো নিকট থেকে উপহার বা ঋণ গ্রহণ না করা। ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত না হওয়া। বাদী বা বিবাদীর কোন আহার্যের দাওয়াত গ্রহণ না করা।[ইবনু তাইমিয়াহ, *মিনহাজুস সুন্নাহ*]

রাসূল সা. আলী রা. কে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্তকালে এই উপদেশ দেন। তিনি বলেন–"যখন দু'ব্যক্তি তোমার নিকট কোন মোকাদ্দমা নিয়ে আসবে, তখন তুমি ততক্ষণ কোন ফায়সালা দেবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তির বক্তব্য শুনবে। কেননা দু'ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর তাদের ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।"[৩] অনুরূপভাবে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা যাবে না। কেননা এতে প্রবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। নাবী (সা.) এটা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন[৪], 'কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মধ্যে বিচার ফায়সালা না করে'।

হাসান আল-বসরী (র.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা বিচারকদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা যেন কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র আয়াতকে বিক্রয় না করেন। এর সমর্থনে তিনি কুরআনের সূরা সাদ-এর ২৬ নং আয়াত, আল-মা'য়িদাহ এর ৪৪ আয়াত, আল-আম্বিয়া এর ৭৮ ও ৭৯ আয়াত তিলাওয়াত করেন।...উমর ইবন্ আবদুল আযীয(র.) বলেছেন যে, বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা জরুরী। যদি এর একটিরও অভাব থাকে তা হলে সেটা তার জন্য দোষ বলে গণ্য হবে। তাকে হতে হবে বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও জ্ঞানী, জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু।[৫]

ন্যায়বিচার ক্ষেত্রে বিচারকের করণীয় সম্পর্কে *'ফিক্বহুস সুন্নাহ'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বিচারকের উচিত হক অনুসন্ধান করে ঐ সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা যা তার চিন্তাকে এলোমেলো করে দেয়। কাজেই কঠিন ক্রোধ, তীব্র ক্ষুধা, চিন্তা, অস্থিরকারী ভয়, তন্দ্রা, কঠিন গরম বা তীব্র শীত, এমন মানসিক অবস্থা যা সঠিক ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি থেকে বিরত রাখে এ সকল অবস্থায় বিচারক বিচার করবেন না'।[৬]

---

[১].মূল আরবী [إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر] *সূনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আহকাম, হা.১৩২৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ১৩৫।
[৩]. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আকদিয়া, হাদীস নং ৩৫৮২।
[৪]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ৬৭৩৯; *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল আক্বদিয়া, হাদীস নং ১৭১৭।
[৫]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, বাবু মাতা ইয়াসতাওজিবুর রাজুলুল ক্বাদা (ব্যক্তি কখন বিচারক হওয়ার যোগ্য হয়) ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত।
[৬]. আস-সাইয়েদ আস-সাবেক, *ফিক্বহুস সুন্নাহ*, 'বিচার' অধ্যায়; খ.৩, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.) পৃ. ৪০০।

সাম্য প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য ও ভেদাভেদ নির্মূল: সাম্য-সুবিচার আল-কুরআনের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কুরআনের দৃষ্টিতে জন্মগতভাবে সব মানুষ সমান এবং তারা প্রত্যেকেই আদম ও হাওয়ার সন্তান। উচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, শাসক-শাসিত, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ও আরব-অনারবের মধ্যে কোনই ভেদাভেদ নেই। মানুষের মধ্যে জাতি, অঞ্চল, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতার দরুন বৈষম্য বা বিভাজন কুরআন অনুমোদন করে না। কুরআন মতে, এ সব বৈচিত্র্য আল্লাহর সৃষ্টি নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ।[১] এসব মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টিকারী নির্দশন কোন নয়। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বিশেষ কোন গোষ্ঠী ও জাতির মধ্যে সীমিত করে দেননি। তাই কারো জন্য আভিজাত্য প্রদর্শন ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী তোলার সুযোগ নেই। এখানে নেই কোন সামাজিক, বর্ণ বা শ্রেণী বৈষম্য, এখানে চিরুনীর দাঁতের মতোই সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। মানুষের এই মৌলিক সাম্য ও ঐক্যের ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন-[২] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "হে মানব! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে করেন এবং তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"

উপরোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে মহান আল্লাহ বর্ণবাদ, গোত্রপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা কিংবা বিশেষ কোন স্বার্থের ওপর ভিত্তিশীল সংঘপ্রীতি নিষিদ্ধ করেছেন। তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব সমাজের মধ্যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বর্ণ, জাতি ও ভাষাগত বৈষম্য নির্মূল করা। সকল মানুষকে সমান অধিকার প্রদান করা। বর্ণ, বংশ, গোষ্ঠী, জাতিভেদে কাউকে কোন বিশেষ অধিকার না দেয়া, আবার কাউকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না করা কিংবা অন্যের মোকাবেলায় মর্যাদা খাটো না করা। কেননা উৎসগত দিক থেকে সব মানুষ আদম সন্তান এবং সবাই সমান। তাই সাদা-কালো, উচুবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ ইত্যাদি ভেদাভেদ নেহায়েত অন্যায়। এ সব দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করা অনুচিত ও গর্হিত।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা বা জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, যোগ্যতা, বংশ, গোষ্ঠী, বর্ণ, জাতি, ভাষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে সব পার্থক্য রয়েছে তা আল্লাহর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে এর কোনটির ওপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তি বা জাতি অন্যের শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তার সততা, উন্নত নৈতিকতা, মহৎ গুণাবলী ও উত্তম কর্মকাণ্ডের নির্ভরশীল। তাই কুরআনে একজন ওপর অপরজনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি হলো তাকওয়া। এ কারণে সব বৈষম্যের মূলোৎপাটন করে কুরআন বলেছে-[৩] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

ইসলাম সকল মুসলিমকে চিরুনীর কাটার মত সমান গণ্য করে। ইসলামে বর্ণ, বংশ, গোষ্ঠী, জাতি ভেদের কোন স্থান নেই। নাবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেয়, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত সালাত আদায় করে এবং আমাদের যবেহ করা জন্তু খায়, সে মুসলিম। অন্য মুসলিমের মতই তার অধিকার আছে এবং অন্য মুসলিমের মতই তার কর্তব্য আছে।[৪]

সমাজের মানুষের মধ্য থেকে বৈষম্য ও ভেদাভেদ দূরীকরণে মহানাবী সা. বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। গোত্রীয় ও বংশীয় কৌলীন্য উচ্ছেদ করতে গিয়ে তিনি তাঁর আপন ফুফাতো বোন যয়নব রা. এর সাথে স্বীয় মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ রা. বিবাহ দিয়েছিলেন।[৫] মক্কা বিজয়ের দিন যখন নাবী করীম (সা.) মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তার চাচাতো ফজল ইবন আব্বাস এবং উসামা ইবন যায়দ (রা.) তার সঙ্গে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন। ইসলাম জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিল কুরাইশ-সরদারের ছেলে আর গোলামের ছেলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।[৬] পরবর্তীতেও এই সাম্যের ধারা অব্যাহত ছিল, দ্বিতীয় খলিফা উমার রা. সিরিয়া গমনকালে স্বীয় ভৃত্যের প্রতি অপূর্ব সাম্য প্রদর্শন করেন। তিনি অর্ধেক পথ উটের পিঠে চড়েছিলেন আর ভৃত্যকে চড়িয়েছিলেন বাকী অর্ধেক পথ। উমার রা. তাঁর মৃত্যুশয্যায় পরবর্তী খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যদি আবূ হুযায়ফা রা. এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সালিম জীবিত থাকত তবে আমি তাকেই খলীফা বানাতাম।'[৭]

বিদায় হজ্জের ভাষণে মানব জাতির বর্ণ বৈষম্য বিলোপ ও সাম্যের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৮] –

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০ : আয়াত ২২ ।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ০১।

[৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : আয়াত ১৩।

[৪].মূল আরবী [من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সালাত, হা.নং ৩৮৪;

[৫]. আল-কুরআন, ৩৩:৩৭; দেখুন, ড. হুসাইন হাইকল, *হায়াতু মুহাম্মাদ* (কায়রো: মুয়াসসাতু হানদবী লিত তা'লীম ওয়াস সাকাফাহ, ২০১৪), পৃ.৩১২-৩১৪।

[৬]. ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ,*ইসলামে শ্রমিকের অধিকার* (ঢাকা: ই.ফা.বা. ১ম সং, ১৯৮৪), পৃ.১৫।

[৭]. ইবনু কাছীর রহ. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, (বৈরুত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.) খ.০৬, পৃ.৩৩৬।

[৮]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ.৪১১, হাদীস নং ২৩৫৩৬।

হে লোক সকল! তোমাদের রব (প্রতিপালক) এক, এবং তোমাদের পিতাও এক। অর্থাৎ তোমরা সকলে আদম সন্তান, ভাই-ভাই। আনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাকওয়া ছাড়া। তিনি আরও বলেন–"নাক কাঁটা হাবশী গোলামও যদি তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং তাঁকে মান্য করবে।"[১]

মহানাবী সা. এমন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন যেখানে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে পূর্ণ সাম্য সুপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাস তারই সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। এ সম্পর্কে তৎকালীন রোমান সেনাপতির এক গুপ্তচরের উক্তি وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه او زنى لرجموه "তারা (সাহাবাগণ) রাত্রিতে ইবাদতে নিমগ্ন, আর দিনে তারা দুরন্ত অশ্বারোহী বীর, তাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও যদি চুরি করে তার হাত কেটে ফেলা হয়–যদি ব্যভিচার করে, তাকে প্রস্তারঘাতে উড়িয়ে দেয়া হয়।"[২]

❑. রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, জনগণের নিরাপত্তা বিধান এবং বিশৃঙ্খলা-নৈরাজ্য নির্মূলকরণ :

উন্নয়নের প্রধান শর্ত রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতার উপস্থিতি। কোন সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকলে সেখানে কোন উন্নয়ন ও ভালো কিছু প্রচলন করা সম্ভবপর হয় না। পক্ষান্তরে, শান্তিপূর্ণ সমাজে মানুষের মানসিকতা ভালো থাকে। সহজেই তাদের ভালো পথে আনা যায়, সুপথে পরিচালিত করা যায়। যুগে যুগে নাবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা, ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল করা এবং মানুষকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা।[৩] এজন্য কুরআন সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খায়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব।"

বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করে রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে ফেলে। সমাজে ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদের জন্ম দেয়। বিশৃঙ্খলা কলহপরায়ন জাতি কখনও কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারে না। তাই কুরআন সমাজ জীবনে শৃঙ্খলার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।[৫] শৃঙ্খলা মু'মিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[৬] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ "মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয় তোমার কাছে যারা অনুমতি চায় তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে।"

শৃঙ্খলা মানুষের ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুসলিমদের জীবনে শৃঙ্খলা শিক্ষা দিতে রাসূল সা. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সম্পর্কিত তাঁর কিছু উক্তি নিম্নে বিবৃত হলোঃ -

"তিনজন সফরে বের হলে তারা তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে।"[৭] "তোমরা (সালাতে) তোমাদের কাতার গুলো অবশ্যই সোজা করবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোকে বিরোধপূর্ণ করে দেবেন।" (তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে)।[৮] "তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পড়ে হাঁটবে না, হয় দু'টো জুতা পড়ে নেবে নতুবা দু'টোই খুলে রাখবে।"[৯]

উদ্ধৃত হাদীসগুলোতে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃঙ্খলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।

কাজেই সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠা এবং অশান্তি, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একটি পন্থা ব্যর্থ হলে অন্যপন্থা প্রয়োগ করতে হবে। তবে যদি যালিম ও ফাসাদসৃষ্টিকারীদের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১০]– إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ "কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর যুলম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

❑. রাষ্ট্রে ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠাকরণ এবং অনৈক্য, ভেদাভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দূরীকরণ:

---

[১].মূল আরবী [اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ৬৭২৩।

[২]. ইবনু কাছীর রহ. *প্রাগুক্ত*, খ.০৭, পৃ.০৭।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৪২; আল-কুরআন ৭:৮৫, ১১:৮৪-৮৫, ৯৬-৯৭, ২১:৭৩, ১৬:৩৬।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১১৪।

[৫]. আল-কুরআন ৬১:০৪, ০২:৬০, ২৬:১৫৫,২৪:৫৮।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৬২; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৬১:০৪, ০২:৬০, ২৬:১৫৫,।

[৭].মূল আরবী [إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬০৮।

[৮].মূল আরবী [لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জামা'আত, হা.নং ৬৮৫; *মুসলিম*, কিতাবুস সালাত, হা. নং ৪৩৬।

[৯].মূল আরবী [لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল লিবাস,হা.নং ৫৫১৮; *মুসলিম*,কিতাবুল লিবাস, হা. ২০৯৭।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৪১।

একতা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শৃঙ্খলা-সংহতি রক্ষা করে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। ঐক্যই সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। অনৈক্য ও বিভেদ একটি মারাত্মক ব্যাধি। এটা জাতিকে দুর্বল, বিচ্ছিন্ন ও রুগ্ন করে ফেলে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। এজন্য ইসলাম সব ধরনের অনৈক্য, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে মুসলিমদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[১]

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে(কুরআন) দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। তোমরা তো ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।"

অন্যত্র বলেন[২]- فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ -"অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!"

উল্লেখিত আয়াতে ঐক্যের ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং অনৈক্য-বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ঐক্যই শান্তি-ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে পক্ষান্তরে, অনৈক্য অশান্তি-শত্রুতা সৃষ্টি করে। ঐক্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সুসংহত করে।

ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন[৩]-"তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে থাকবে, আর বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাকবে। শয়তান বিচ্ছিন্নবাদীর সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে অধিক দূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম স্থানের আশা রাখে সে যেন ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করে। যার সৎ আমল তাকে আনন্দ দেয় এবং মন্দ কাজ কষ্ট দেয় সেই প্রকৃত মুমিন।" রাসূল সা. আরও বলেন-[৪] "মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। যে তিনটি বিষয় তোমাদের জন্য আল্লাহ পছন্দ করেন তাহলো–তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছন্ন হবে না।"

ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মানুষের পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতা করা ইসলামের বিশেষ নীতি। তা হতে পারে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে কিংবা সরকার ও বিরোধী পক্ষের মাঝে। জাতি ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব নিরসনে ইসলাম পৃথিবীতে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ইসলাম আউস ও খাযরাজ দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চিরতরে মিটিয়ে এমন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করে যার নজির ইতিহাসে বিরল। এক্ষেত্রে জাতিগত বা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনে কুরআনের যুগান্তকারী বিধান হল–[৫]

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"আর যদি মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে বা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন।"

মানব জীবনে ঐক্য-শান্তি এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, এ কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। রাসূল সা. বলেছেন[৬]-"মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কেউ যদি কোন অসত্য কথাও বলে তবে তা মিথ্যা নয়।"

অনৈক্য, বিভেদ ও বিবাদ–বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্রের সংহতিকে দুর্বল করে ফেলে। বিশ্বে মুসলিম সম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক কারণ। তাই কুরআন মুসলিমদের সকল গোষ্ঠীগত আত্মকলহ, মতবিরোধ ও মতদ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।"

উদ্ধৃত আয়াতে এটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন মুসলিম স্বজাতির মধ্যে অনৈক্য, বিভক্তি কিংবা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা এতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হয় এবং জাতির দুর্বল হয়। এ ব্যাপারে সতর্ক

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৩।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৭৮।

[৩].[عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, হা.নং২১৬৫।

[৪].**মূল আরবী**[إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আকদিয়াহ, হা.নং ১৭১৫।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৯।

[৬].মূল আরবী[ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুস সুলহ,হা.নং২৫৪৬; *মুসলিম*,কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ,হা.২৬০৫।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৪৬।

করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১]-‘তোমরা পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না, একে অপরের পিছনে লেগো না, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও’।

অনৈক্য, বিভেদ–বিচ্ছিন্নতা দুর্ভাগ্যের কারণ। অনৈক্য, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে আনে। এ কারণে ইসলামে সব ধরনের অনৈক্য-বিভেদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মানব সমাজে যাতে অনৈক্য-বিভেদ বীজ বপন না হতে পারে, সেজন্য কুরআন বাস্তবসম্মত কর্মনীতি অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছে।[২] এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন[৩]- وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-“তোমরা তাদের মতো হও না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।” আরও বলেন[৪], وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ “আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হও না। যারা নিজদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হও না)। প্রত্যেক দলই নিজদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।

মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ–বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা গুরুতর অন্যায় এবং মহান আল্লাহ্র অবাধ্যতার শামিল। কেউ মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করলে তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নাবী সা.বলেন[৫]–‘যে ব্যক্তি এই উম্মত ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় তাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করবে, তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। সে যে কেউ হোক না কেন।’

বিভক্তি ও দলাদলি বর্তমান মুসলিম জাতিকে মারাত্মকভাবে গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে মুসলিমরা বিশ্বে আজ পর্যদুস্ত ও লাঞ্ছিত। এ অবস্থার উত্তরণ না ঘটালে মুসলিম জাতির মুক্তি আসবে না। সম্মিলিতভাবে সব অপশক্তির মোকাবেলা করতে হলে মুসলিম জাতির মধ্যকার সংহতি জোরদার করা জরুরী। কুরআন দাবী করে যে, যথাসম্ভব মুসলিমদের উচিৎ নিজেদের সংগঠিত করা এবং একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মুসলিমদের শান্তি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধেও শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

ইসলাম মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.) বলেন, চল্লিশ বছর ধরে আমি এমন কোন নামাজ পড়িনি, যাতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর জন্য দোয়া করিনি। বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা মিলিয়ে দেখ, তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কতটুকু হিংসা-দ্বেষ রয়েছে।[৬]

আজকাল ধর্মীয় নেতা, ইসলামী সংগঠনগুলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ঐক্য ও সম্প্রীতির বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সুযোগে ইসলাম বিদ্বেষী কুফর শক্তি ও স্বার্থান্বেষী মহল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে থাকে। ফলে মুসলিমদের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের উচিত কুরআন ও সুন্নাহর সত্যিকার অনুসরণে নিজ দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা ইসলাম ও মুসলিম জাতির বৃহত্তম কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করা। সব ধরনের গোঁড়ামী, চরমপন্থা ও ভুল পথ পরিহার করা এবং সত্যগ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকা। ইসলামী সংগঠন ও দলগুলোর পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা। পারস্পরিক মতবিরোধ থাকতে পারে এবং গঠনমূলক সমালোচনাও বিদ্যমান থাকতে পারে। কিন্তু ছোটখাটো বিষয়ে মতবিরোধ পরিহার করা। ইসলাম বিদ্বেষী কুফর শক্তি এবং ইসলামী নামধারী ভণ্ড ও স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে সর্বদা ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার থাকা। আর সত্য-মিথ্যার ভিত্তিতেই কারো সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা করা। এ প্রসংঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (মৃ.৭৫১হি.) সুন্দর কথা বলেছেন,

> ছোট-বড় দ্বীনের সমস্ত বিষয়ে আমাদের নীতি হচ্ছে যে, আমরা তার দাবী অনুযায়ী কথা বলব। একটার মাধ্যমে আরেকটার ওপর আঘাত করব না। এক দলের বিপক্ষে অন্য দলের পক্ষপাতিত্ব করবা না। বরং আমরা প্রত্যেক দলের সাথে এতটুকু ব্যাপারে একমত পোষণ করব যতটুকু ব্যাপারে তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রত্যেক দলের সাথে এতটুকু বিরোধিতা করব যতটুকু ব্যাপারে তারা সত্যের বিরুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এ নীতি থেকে কোন দল বা কোন ব্যক্তিকে আমরা পৃথক করব না।”[৭]

ঐক্য-সংহতি প্রতিষ্ঠায় করণীয়: সমাজ থেকে অনৈক্য, বিভেদ ও মতপার্থক্য দূরীকরণে বিভিন্ন উপায় থাকতে পারে। যেমন: ক).ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও সকলকে তাদের ন্যার্য অধিকার প্রদান, খ).ছোট-খাট বিষয়ে মতভেদ পরিহার এবং দ্বন্দ্ব মীমাংসা, গ).পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, ঘ).উপহার দেওয়া, ঙ). অন্যের দোষ গোপন, চ).বিনয় ও অমায়িক চরিত্র, ইত্যাদি। তবে সকল বিরোধ, অনৈক্য, বিভেদ ও মতপার্থক্য দূরীকরণে সর্বোত্তম উপাদান কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন[৮] – كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ “মানুষ(আদিতে) ছিল এক উম্মত। (পরে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল) অতঃপর আল্লাহ্ নাবীগণকে পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও

---

[১]. **মূল আরবী** [ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৬৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৬০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-‘ইমরান ০৩: আয়াত ১০৫।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৩১-৩২।
[৫].[إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমরাত, হাদীস নং ১৮৫২।
[৬]. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০১, পৃ.২৬।
[৭]. ইবনুল কাইয়িম, *তারীকুল হিজরাতাঈন* (সৌদী আরব, আদ-দাম্মাম: দারু ইবনিল কাইয়িম, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪হি.) খ.০১, পৃ.৫৮২।
[৮]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত ২১৩।

সতর্ককারীরূপে। এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।”

❑. সকলের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রতকরণ:

সমাজের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি জনগণের কল্যাণের নামে কোন দাবী নিয়ে যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তি উক্ত দাবী মিটানোর যে বাধ্যতা বোধ অনুভব করে তা-ই হল কর্তব্য।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের প্রতি মানুষের কিংবা অন্য সৃষ্টি জগতের প্রতি সাধারণ কিছু কর্তব্য থাকে। আবার সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় কোন কাজের চুক্তিবদ্ধতার দ্বারাই কর্তব্য নির্ধারিত হয়। প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ কর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করা। যথাযথ কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজ শান্তিময়, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে, কর্তব্যে অবহেলা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা দুর্ভোগ ও খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কর্তব্যে অবহেলা চুক্তির বরখেলাপ, ইত্যাদি বিশ্বাসঘাতকতার অংশ। তাই প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তি সদা স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকেন। এজন্য বিশ্বাসীদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন[১]– يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا -“তারা কর্তব্য পালন করে এবং এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।”
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করার পর যদি সে ব্যক্তি জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ না করে তাদের সাথে প্রতারণা করে তবে সে যেদিনই মৃত্যুবরণ করুক না কেন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।’ অপর বর্ণনায় আছে, ‘যে শাসক নিজ শাসনাধীন জনগণের সাথে ধোঁকাবাজি করে মারা যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন।’[২]

প্রত্যেকের নিজ কর্মের যেমন দায়বদ্ধতা আছে তেমনি তার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার অধীন ব্যক্তিদের কর্মের ব্যাপারেও নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তা ভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সেই নৈতিক কর্তব্য পালন সম্ভব। কুরআনে কর্তব্যকে আমানত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্তব্যে অবহেলা বা কর্মে যোগদানকালীন চুক্তি ও শর্তবলীর বরখেলাপ খিয়ানতের নামান্তর। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا “নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে।”

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কর্তব্যবোধ জাগ্রতকরণের মাধ্যমে নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এ জন্যই নাবী কারীম সা. বলেন-[৪]

> ‘তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। জনগণের নেতা তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তার দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনের উপর দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’

কর্তব্যে অবহেলার কারণ: ক.অপরাধ প্রবণতা, খ. অন্যার্য পারিশ্রমিক, গ.অলসতা,ঘ.দায়িত্বহীন অযোগ্য লোক নিয়োগ।
দূরীকরণে করণীয়: ক. কর্তব্যপরায়ন যোগ্য লোক নিয়োগ, খ.ইনসাফ ভিত্তিক পারিশ্রমিক দান। গ. কর্তব্যেবোধ সৃষ্টি।

❑. রাষ্ট্রের সর্বত্র স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন:

সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ এবং সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র গঠনে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি, অবক্ষয় ও অনিয়ম নির্মূল সম্ভব। এটা ব্যক্তিকে কর্তব্যনিষ্ঠ করে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা মাধ্যমেই প্রত্যেকেই স্বীয় কর্তব্য কর্মের ক্ষেত্রে সচেতন ও সতর্ক থাকে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৫] (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ)“প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে।” অন্যত্র বলেন[৬], (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) “আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে।” আরও বলেন[৭], (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) “সেটা ছিল একটি উম্মত, যারা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য। আর তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্র/আল-ইন্সান ৭৬: আয়াত ৭।
[২].মূল আরবী[(ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا **حرم الله عليه الجنة**) ও (ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة)] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ৬৭৩১ ও ৬৭৩২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ০৪ : আয়াত ৫৮।
[৪].মূল আরবী[كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জুমু‘আ, হাদীস নং ৮৫৩।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আত-তূর ৫২: আয়াত ২১।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮৬।
[৭]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৪১।

হবে না।" অন্যত্র আরও বলেন[১], (وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) "প্রত্যেককে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার করবে না।"

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি ব্যক্তিকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে এবং দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখা যায় উমর (রা.) জীবনীতে। তিনি খেলাফতের দায়িত্বে (১৩-২৩হি./৬৩৪- ৬৪৩ খৃ.) থাকা অবস্থায় বলতেন, *'যদি ফোরাত নদীর কূলে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি ভীত হই যে, সেজন্য আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'*।[২]

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একান্ত কর্তব্য হলো, স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নিজ কর্তৃত্বাধীন সকল সম্পদ হিফাযত করা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–"তোমাদের কাউকে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করার পর যদি সে একটি সূঁচ অথবা আর ক্ষুদ্র কিছু গোপন(আত্মসাৎ) করে, তবে আত্মসাৎ সাব্যস্ত হবে, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে।"[৩]
জনগণ, রাষ্ট্র ও সামষ্টিক দায়িত্বের ব্যাপারে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার নিশ্চিত করা কুরআনের অন্যতম শিক্ষা। মূসা('আ.) কে স্বীয় ভাই হারুন('আ.)কে রিসালতের দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহিতার তাকিদ দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে[৪]

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"আর মূসা যখন নিজ কওমের কাছে ফিরে আসল রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায়, তখন বলল, 'আমার পরে তোমরা আমার কত খারাপ প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমাদের রবের নির্দেশের পূর্বে তোমরা তাড়াহুড়া করলে?' আর সে ফলকগুলো ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগল। সে বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র, এ জাতি আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তাই তুমি আমার ব্যাপারে শত্রুদেরকে আনন্দিত করো না এবং আমাকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করো না। সে বলল, 'আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

স্বচ্ছতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন রাসূল সা.। মদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও বদর যুদ্ধের সেনাপতি থাকাকালীন সময় রাসূল সা.স্বজনপ্রীতি কিংবা বিন্দুমাত্র ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। এ প্রসংঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত, বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফির বন্দীদের মধ্যে রাসূল (সা.) এর জামাতা আবুল আস'ও (জয়নব এর স্বামী) ছিলেন। সাধারণ বন্দীদের মত তাকেও বন্দী করা হয়। তার মুক্তিপণের জন্য সে তার স্ত্রী জয়নব এর নিকট খবর পাঠান। জয়নব স্বামীর মুক্তিপণের জন্য তার মূল্যবান স্বর্ণের হার পাঠান। যে হারটি ছিল খাদিজা (রা.)এর যা রাসূল (সা.) তাকে উপহার দিয়েছিলেন। হারটি দেখে রাসূল (সা.) তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে স্মরণ করে কেঁদে ফেলেন। তথাপি তিনি নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মুক্তিপণের হারটি ফেরত দেননি, বরং তিনি উপস্থিত মুসলিমদের থেকে অনুমতি চান যে, তোমরা যদি অনুমতি দাও তাহলে মেয়েকে তার মায়ের স্মৃতি ফেরত দেয়া যেতে পারে। মুসলিমরা অনুমতি দিলে রাসূল (সা.)-এর জামাতা মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি লাভ করেন।[৫]

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আদালতের নিকট জবাবদিহি থেকে বাচাঁর কোন রক্ষাকবচ নেই। একজন সাধারণ নাগরিকের মতই তাকে আদালতে তলব করা যাবে এবং একজন সাধারণ নাগরিক তার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের করতে পারে। সাধারণ নাগরিকের মতই তাঁকেও জবাবদিহি ও বিচারের সম্মুখীন করা হবে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা হল[৬]: একবার খলীফা উমর (রা) ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এর মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তারা উভয়ে মদীনার কাযী(বিচারক) যায়েদ ইবন সাবিত(রা) এর আদালতে হাজির হলেন। যায়েদ রা. দাঁড়িয়ে উমার রা. কে নিজ আসনে বসাতে চাইলেই। কিন্তু তিনি উবাই রা. এর সাথে বসলেন। অতঃপর উবাই(রা) অভিযোগ পেশ করলে উমার রা. তা অস্বীকার করলেন। বাদী-বিবাদী কারো কাছেই সাক্ষী না থাকায় আইন অনুসারে যায়েদ(রা) এর উচিত ছিল উমার রা. নিকট শপথ নেয়া। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন। তখন উমর(রা) শপথ করে বিচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বললেন, *'যতক্ষণ না যায়েদের নিকট একজন সাধারণ মুসলিম ও উমার সমান না হয় ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারে না'*।

ইসলামে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল, একদা খলীফা উমর (রা.)-এর নিকটে কিছু কাপড় আসলে তিনি সেগুলো হকদারগণের মাঝে বন্টন করে দেন। এতে প্রত্যেকে একটি করে কাপড় পেল। কিন্তু তিনি নিজে দু'টি কাপড় দিয়ে তৈরী একটি পোষাক পরিধান করে খুৎবা দিতে মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা কি আমার কথা শ্রবণ করছ না? এমতাবস্থায় সালমান ফারেসী (রা.) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জি না, আমরা শ্রবণ করব না। উমর(রা.) বললেন, কেন হে আবূ আব্দুল্লাহ? তিনি বললেন, আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬ : আয়াত ১৬৪।
[২]. ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত: দারু সাদির, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮) খ.৩, পৃ.৩০৫;*কানজুল উম্মাল,প্রাগুক্ত* ,খ.০৫, পৃ.৯২২, রিওয়ায়েত নং ১৪২৯৪।
[৩]. মূল আরবী [من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৩৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৫০-১৫১।
[৫]. ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.) খ.২, পৃ.৪৩।
[৬]. ইমাম বাইহাকী, *আস-সুনানুল* কুবরা(হায়দাআবাদ: মাজলিস দাইরা আ্ল-মা'আরিফ, ১৩৪৪হি.) খ.১০, পৃ.১৩৬, রিওয়ায়েত নং ২০৯৮৭।

অথচ আপনি পরিধান করেছেন (দুই কাপড়ের) বড় পোষাক! উমর (রা.) বললেন, ব্যস্ত হয়ো না; হে আবূ আব্দুল্লাহ! অতঃপর তিনি তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে ডাকলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর ওমর (রা.) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে জিজ্ঞেস করছি, আমার পোষাকে যে অতিরিক্ত কাপড় রয়েছে, সেটা কি তোমার নয়? আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, জি, এটি আমার। অতঃপর সালমান ফারেসী (রা.) বললেন, এখন আপনি বক্তব্য শুরু করুন, আমরা শ্রবণ করব।[১]

❑.রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ :

মানবাধিকার বলতে সে অধিকার বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায়, যা তাকে বিশিষ্টতা দেয়, যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না এবং যে অধিকার থেকে প্রকৃতপক্ষে মানুষকে পৃথক করারও উপায় নেই।[২] ইসলাম মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের কিছু অধিকার নিশ্চিত করেছে, এ সব অধিকারের কোন রকম লংঘন অনৈসলামিক এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।
কুরআন প্রদত্ত এ সব অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুরক্ষা সম্ভব। কুরআন প্রদত্ত এই মৌলিক মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হলো– ক. জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান লাভের অধিকার। খ. সম্পদ সংরক্ষণ, সম্পদের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক লেন-দেনের অধিকার। গ. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার। ঘ. সম্মান-ইজ্জত লাভের অধিকার। ঙ. প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা। চ. সুবিচার পাওয়ার অধিকার। ছ. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা/অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার। জ. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার। নিম্নে কুরআন ও সুন্নাহর আলোক মৌলিক মানবাধিকার তুলে ধরা হলো–

ক. জীবনের নিরাপত্তা বিধান এবং জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান লাভের অধিকার: জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআনের দৃষ্টিতে আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন ব্যতীত কোন নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিনা অপরাধে ও আইনের চূড়ান্ত রায় ছাড়া মানুষ হত্যা করাকে ইসলাম জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]–

> مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ-
>
> এ কারণেই, আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। আর তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপরও তাদের অনেকেই দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে রয়ে গেল।

প্রাণ সংরক্ষণ ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলাম সমাজ থেকে হত্যারোধ কল্পে কিসাসের তথা হত্যার বদলে হত্যার মত কঠোর বিধান দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا “আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কর না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।”
জীবনের নিরাপত্তার কোন মুশরিক আশ্রয় চাইলে ইসলাম তার হত্যা নিষিদ্ধ করে আশ্রয় দিতে নির্দেশ দিচ্ছে। ইরশাদ হচ্ছে[৫]- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ- “মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।”
প্রাণ রক্ষায় দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদের হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[৬] প্রাণ সংরক্ষণে অস্ত্রের অবাধ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে রাসূল সা. বলেন, ‘যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বহন করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’[৭] ইসলাম জীবন রক্ষায় এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে হারাম ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছে।[৮] ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে, এরূপ ক্ষেত্রে হারাম খেয়ে প্রাণ রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি না খেয়ে ও না পান করে কেউ মারা গেলে সে জাহান্নামী হবে।[৯]

ইসলাম চূড়ান্ত বিচারের রায় সাপেক্ষে পাঁচ ক্ষেত্রে মানুষ হত্যার অনুমতি দেয়। তা কার্যকর করবে আদালত। যথা–

---

[১]. ইবনুল ক্বাইয়িম, *ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন*, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.১৮০।
[২]. গাজী শামসুর রহমান, *মানবাধিকারের ভাষ্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪),পৃ.০৯-১০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা’য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ ১৭: আয়াত ৩৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৬:১৫১, ২৫:৬৮-৬৯।
[৫]. আল-কুরআন,সূরা আত-তাওবা: আয়াত ০৬।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা’ ১৭: আয়াত ৩১।
[৭]. মূল আরবী [من حمل علينا السلاح فليس منا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস নং ৬৪৮০।
[৮]. আল-কুরআন ৫:৩,
[৯]. দেখুন, ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী), খ.১১, পৃ.৭৯।

ক. অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে কিসাসের দণ্ড স্বরূপ হত্যা। খ.বিবাহিত পুরুষ-নারী ব্যভিচার করলে দণ্ড স্বরূপ হত্যা। গ.মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারীকে দণ্ড স্বরূপ হত্যা।[১] ঘ.ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও তা উৎখাতের চেষ্টাকারীকে হত্যা। ঙ.ইসলামের পথে বাধাঁ সৃষ্টিকারী বা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরতদের হত্যা।[২]
উল্লেখিত পাঁচ ক্ষেত্রে অপরাধের দণ্ড হিসেবে মানুষ হত্যার বিধান কার্যকর করা কেবল আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে শাসনকর্তা বা প্রশাসকের পক্ষেই জায়েয। ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্বভাবে এ দণ্ড দানের কাজ করা আদৌ জায়েজ নয়। কেননা সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তখন নিজস্বভাবে বিচারক ও দণ্ডমুন্ডের মালিক হয়ে বসবে। ফলে দেশে চরম অরাজকতা দেখা দিবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকবে না। উল্লেখ্য যে, ইসলামী আদালত এ দায়িত্ব পালন করলেও হত্যার ক্ষেত্রেও মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা বা কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করা চলবে না।
কুরআন জীবনের নিরাপত্তা লাভের জন্য যেমন প্রত্যেক মানুষকে অধিকার দিয়েছে; তেমনি জীবন যাপনের অপরিহার্য উপাদান তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি লাভেরও অধিকার সকল মানুষকে প্রদান করেছে। কাউকে অন্যায়ভাবে তার ঘর-বাড়ী থেকে উচ্ছেদ না করা। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও গুরুতর অন্যায়।

খ. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার: বসত বাড়ী মানুষের একান্ত ব্যাক্তিগত স্থান, যেখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার করো নেই। তাই কারো গৃহে প্রবেশ করতে হলে সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে আনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে হবে। অনুমতি ছাড়া অথবা গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৩]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ-

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা সেসব গৃহবাসীদের অনুমতি নেবে এবং তাদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তবে যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও’ তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রকর। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।

গ.সম্পদ সংরক্ষণ, সম্পদের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক লেন-দেনের অধিকার: ধন-সম্পদ উপার্জন এবং ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোন ব্যবধান নেই। অন্যায়ভাবে অন্যের অর্থ-সম্পদ ভোগ-দখল নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪] – لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ “তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়াদাংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ কর না।”

সম্পদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে ইসলাম শুধু চুরি শুধু নিষিদ্ধ করেনি বরং সমাজ থেকে চুরি নির্মূলে চোরের হাত কাটার মত কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছে।[৫] অনুরূপভাবে ডাকাতি, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও রাহাজানি নির্মূল ও সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় সন্ত্রাসী ও ডাকাতের হাত-পা কর্তন করে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ডের কঠোর বিধান দেয়া হয়েছে।[৬]

ঘ. সম্মান-ইজ্জত লাভের অধিকার: সম্মান-ইজ্জত নিয়ে সমাজে বসবাস করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তি যাতে অপর কারো সম্মানহানি করতে না পারে সেজন্য কুরআন অন্যায়ভাবে কাউকে বিদ্রূপ-উপহাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ-

হে মু’মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, হতে পারে যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে, হতে পারে যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা এক অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যালিম। হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।

---

১. মূল আরবী [لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুদ দিয়াত, হাদীস নং ৬৪৮৪, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কাসামাহ ওয়াল মুহারিবীন, হাদীস নং ১৬৭৬।
২. আল-কুরআন, ৫: ৩৩-৩৪; ২:১৯০, ২২:৩৯।
৩. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ২৭-২৮।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮৮।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মা’য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩৮।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মা’য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩৩-৩৪।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১১-১২।

উদ্ধৃত অংশে কাউকে উপহাস, গীবত, দোষারোপ, কুধারণা করা ও মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে মানুষের সম্মানের নিরাপত্তা ও সমাজের শান্তির বিধান করা হয়েছে। এ সব বিষয় মানুষের জন্য সম্মানহানিকর ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারী উপাদান।

মিথ্যা অপবাদ ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্য মারাত্মক সম্মান হানিকর বিষয়। এটা সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারীও বটে। তাই কেউ অন্যায়ভাবে কারো উপর যাতে মিথ্যা অপবাদ আরোপ না করে সেজন্য কুরআন অপবাদদানকারীর জন্য জনসম্মুখে আশিটি বেত্রাঘাতের বিধান দিয়েছে। সম্মান রক্ষাকল্পে ইসলাম এই পার্থিব শান্তি নিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[১]-
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
"যারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই তো সত্যত্যাগী।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[২] إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-"যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।"

ঙ. সুবিচার পাওয়ার অধিকার: জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সুবিচার ও প্রত্যেকের নায্য অধিকার প্রদান করেছে ইসলাম। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে-সর্বস্তরে সুবিচার ও ইনসাফের এ নীতি সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিকটজনদের প্রতি ভালবাসা, শত্রুর প্রতি ক্ষোভ, ধনীর প্রতি আগ্রহ, দরিদ্রের প্রতি অবহেলা যাতে সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সে মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا-

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।"

সুবিচার ব্যক্তির নিজের প্রতি নিজের একটি কর্তব্য বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে। ব্যাক্তির নিজের প্রাপ্তি সম্পর্কে ইসলাম বিশেষভাবে তাকিদ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[৪] قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ-"বল, আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের।" অন্যত্র এসেছে-[৫] (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ)-"এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ই আমাদের রব।"

চ. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার: সমাজ ও রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের যে কোন স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সমালোচনা, অভিযোগ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এটা ইসলামের অন্যতম নীতি, যা কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শর্ত। সামাজিক সুবিচার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এর বিকল্প নেই। তবে এ সমালোচনা হবে গঠনমূলক। হীনস্বার্থসিদ্ধি কিংবা নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য সমালোচনা করা যাবে না। তাইতো খুলাফা রাশীদূনের সময় গঠনমূলক সমালোচনা ও মত প্রকাশের অবাধ সুযোগ খলীফাদের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হত। এ প্রসংগে একটি ঘটনা উল্লেখ্য যেতে পারে, দ্বিতীয় খলীফা উমার রা. একদা মসজিদে নববীতে খুতবাদান কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে স্ত্রী লোকদের মহরানার পরিমাণ সর্বোচ্চ চারশত দিরহাম নির্ধারণ করেন, যাতে এ ব্যাপারে কেউ বাড়াবাড়ি না করে। কেননা নাবী সা. তার স্ত্রী ও কন্যাদের ক্ষেত্রে চারশত দিরহামের বেশী মোহর নির্ধারণ করেননি। এই ভাষণ শুনে জনৈক মহিলা বললেন– কুরআন স্তুপীকৃত সম্পদ (কিনতার) মোহর হিসেবে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে [আল-কুরআন ০৪:২০]। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী? তৎক্ষণাৎ উমর রা. মত পরিবর্তন করে বললেন, *একজন মহিলা ঠিক বলেছে আর রাষ্ট্রনেতা ভুল করেছে।*[৬] মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায়ের আদেশ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "আর তোমাদের মধ্য থেকে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, আদেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর এরাই সফলকাম।"

ছ. প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা: ধর্মের ব্যাপারে ইসলাম কোন প্রকার জবরদস্তিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম অন্য ধর্মের সাথে সংঘাতে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ইসলাম নিজ সত্যের প্রতি আহবান জানালেও নিজ আদর্শ অন্যের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয় না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৮]–

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০৪-০৫।
২. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২৩-২৪।
৩. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ১৩৫।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭:২৯।
৫. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা ৪২ : আয়াত ১৫।
৬. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল নিকাহ, হাদীস নং ২১০৬; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুন নিকাহ, হা.নং১১১৪; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.১ পৃ.৪০, হা. নং২৮৫।
৭. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৪। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৪ : ১৪৮।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫৬; আরও দেখুন,আল-কুরআন (১০:১০৮)।

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ- "দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে।" অন্যত্র বলেন[১], قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ "আর বল, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে।"
ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলাম বরাবরই উদার দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। ইসলাম শুধু অমুসলিমদের জীবন ও সম্পদের প্রতি পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেনি বরং নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[২]– لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।" আরও বলেন[৩], فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ "অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও।" তবে উল্লেখ্য যে, যে সব কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক ইসলামকে উৎখাত বা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত লিপ্ত ইসলাম সে সব কুচক্রীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছে।

মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমারেখা : ইসলাম মানুষকে একদিকে যেমন জীবন ও সম্পদের প্রতি পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছে তেমনি অপরদিকে প্রত্যেকে নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম কখনই নিজ মতাদর্শ কারো প্রতি জোর করে চাপিয়ে দেয়াতে বিশ্বাস করে না। তবে একজন মুসলিম ইসলাম পালন না করলে বা ইসলামের পরিপন্থী কাজে যোগ দিলে সেটাকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা বলা যাবে না। কেননা একজন মানুষের যে কোন একটি ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করা বা না করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তার বিধি-নিষেধ পালন করা ব্যক্তির জন্য জরুরী। এটা ঠিক তদ্রূপ যেভাবে এক ব্যক্তি চাইলে কোন সমিতির সদস্য হতেও পারে আবার নাও পারে। কিন্তু যখন সে কোন সমিতির সদস্য হবে তখন তার বিধি-বিধান পালন তার জন্য জরুরী হবে। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে শাস্তি বা বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্য পদ বাতিলও হতে পারে। কাজেই নিজেকে মুসলিম দাবীর পর ইসলামের কোন বিধান অস্বীকার বা কোন বিধানের বিরোধিতার সুযোগ নেই। আবার মুসলিম দাবীর পর ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অস্বীকার করলে বা কোন শারয়ী বিধান ইচ্ছাকৃত লংঘন করলে ইসলামী আদালত অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখে।

অমুসলিমদের অধিকার ও স্বাধীনতা: ইসলামে প্রত্যেক অমুসলিমের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান পুরোপুরি সংরক্ষিত।[৪] তাদের প্রতি যুলম না করা এবং চুক্তি থাকলে পালন করা।[৫] কোন অমুসলিম সন্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা ও আশ্রয় চাইলে তাকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেয়া মুসলিমের কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন[৬]- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ "মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে; কারণ তারা অজ্ঞ লোক।" এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন[৭] –"সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমের উপর যুলম করে, তার হক নষ্ট করে, তাকে কষ্ট দেয়, তার সম্মান নষ্ট করে বা তার উপর সাধ্যাতীত কর চাপিয়ে দেয় কিংবা তার কোন জিনিস জোরপূর্বক ছিনিয়ে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবসে আমি অভিযোগ দায়ের করব।" রাসূল আরও সা. বলেন-[৮] "যে ব্যক্তি কোন লোককে নিরাপত্তা দান করার পর হত্যা করল, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত হয়ে গেল, যদিও নিহত ব্যক্তি অমুসলিম হয়।"

আবূ বকর (রা.) এর শাসনামলে হীরাবাসীদের সঙ্গে যে সন্ধি চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয়েছিল তাতে উল্লেখ ছিল– বৃদ্ধ, অক্ষম, আকস্মিক বিপদগ্রস্থ, ভিক্ষুক, হঠাৎ দরিদ্রে পরিণত হলে তাদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে। সেই সাথে তার এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।[৯]

ময়মুন ইবন মিহরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হীরার এক মুসলিম একজন ইয়াহুদীকে হত্যা করে। উমার ইবন আবদিল আযীয (র.) ঘটনা জানতে পেরে সেখানকার গভর্ণরকে লেখেন: হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করে দাও। তারা ইচ্ছে করলে তাকে হত্যা করতে পারে কিংবা ক্ষমাও করতে পারে। গভর্ণর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন এবং অমুসলিমরা সে ব্যক্তিকে হত্যা করে।[১০]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ২৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাফিরূন ১০৯: আয়াত ০৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৪২:১৫, ৭৬:০৩, ৩৬:১৭।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-গাশিয়াহ ৮৮: আয়াত ২১-২২। আরও দেখুন,আল-কুরআন ১০: ৯৯; ৭৬: ২৯; ১৬: ৮২।
[৪]. আল-কুরআন ০৫ : ৩২।
[৫]. আল-কুরআন ৬০:০৮; ০৯:০৪।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা : আয়াত ০৬।
[৭]. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল খারাজ, হাদীস নং ৩০৫২।
[৮].মূল আরবী [من أمن رجلا فقتله وجبت له النار وان كان المقتول كافرا] আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, খ.২০, পৃ.৪১, হাদীস নং ১৬৮২১।
[৯]. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, (কায়রো: আল-মাতবু'আত আস-সালাফিয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৩৮২হি.), খ.১, পৃ. ১৪৪।
[১০]. ইবনু আবী শাইবা, কিতাবুদ দিয়াত, খ.০৫. পৃ.৪০৮, হাদীস নং ২৭৪৬২।

কোন মুসলিমকে যেমন মারধর করা, কষ্ট দেয়া, অবিচার করা, গালি দেয়া, গীবত বা বদনাম করা জায়িয নয়; তেমনি এ সব কাজ অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও না জায়িয। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১] –" যে ব্যক্তি কোন অমুসলিমকে যিনার অপবাদ দেবে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের বেত দ্বারা প্রহার করা হবে।"

ইসলাম অমুসলিমদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছে। একজন অমুসলিম যে কোন ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে ইসলামী সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না। মাদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে যে সব মূর্তিপুজারী ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল অথবা যারা ইয়াহুদী ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, অথবা যে সব অগ্নি উপাসক ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের কাউকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনরূপ বাঁধা দেননি।

এ নীতি চার খলীফা ও মুসলিম শাসকবৃন্দ রক্ষা করেন। জেরুসালেম অধিকারের পর শাসনভার গ্রহণ করার দিন খলীফা উমর(রা.) খৃষ্টানদের পবিত্র স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন, সেখানে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। আর্নল্ড এর ভাষায়: খৃষ্টানদের প্রধান পূরোহিত সাথে উমর (রা.) যখন একটি গির্জা পরিদর্শন করেছিলেন, তখন সালাতের নির্দিষ্ট সময় এসে যায়। পূরোহিত ঐ স্থানে গির্জাতেই সালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু [তার অনুরোধ রক্ষার্থে তিনি গীর্জার পার্শ্বের একটি স্থানে নামাজ পড়ে] উমর (রা.) বললেন,"*আমি যদি আজ এখান থেকে সালাত আদায় করি, তাহলে পরবর্তীকালে মুসলিমরা একে তাদের উপাসনার স্থান বলে দাবী করতে পারে।*"[২]
–এ উমার রা. এর উদারতা নয়, বরং এটা ভিন্ন ধর্মালম্বীদের প্রতি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক।

❑. জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ:

জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কুরআন মোতাবেক জনগণের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান, জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা জরুরী পরিস্থিতিতে আক্রান্ত এলাকায় সার্বিক সহায়তা, দুঃস্থ, অসহায়, পঙ্গু, উপার্জন ক্ষমতাহীন ও কর্মক্ষম লোকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে বিশেষভাবে সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান– রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]- لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا "এই সম্পদ(যাকাত) নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন।"
এই আয়াত মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায় ও উপার্জন ক্ষমতাহীন নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নির্ধারণ এবং সম্ভব্য সব ধরনের সহযোগিতা করা।

কুরআন প্রদত্ত এই তাত্ত্বিক নীতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো: দ্বিতীয় খলিফা উমার (রা.) জনৈক এক ইহুদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "কি আর করবো, জিয্ইয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষা করছি।" এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তার জিয্ইয়া মাফ করে দিলেন এবং তার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি বাইতুল মালের কর্মকর্তাকে লিখলেন, "আল্লাহর কসম! এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হব, আর বার্ধ্যক্যে তাকে অপমান করব।"[৪]

রাষ্ট্রের নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায় ও উপার্জন ক্ষমতাহীন নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মিটাতে প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগার না থাকলে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনে ধনীদের সহায়তা নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ইবন হাযাম তার *আল-মুহাল্লা* গ্রন্থে বলেন[৫]

> সকল দেশের ধনী ব্যক্তিদের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, দরিদ্র জনগণকে সাহায্য করা। তারা যাকাত আদায় না করলে দেশের শাসক তাদের বাধ্য করতে পারবেন। যদি স্থানীয় পর্যায়ে আহরিত যাকাত, এমনকি সকল মুসলিমদের প্রদত্ত যাকাতও তাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট না হয় তাহলে সক্ষম ধনীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ধন–সম্পদ আদায় করার মাধ্যমে তাদের অত্যাবশ্যকীয় খাবার, শীত–গ্রীষ্ম থেকে বাঁচার কাপড় ও বৃষ্টি, গরম, সূর্যের তাপ ও পথচারীদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে এমন বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

❑. দ্বীন সংরক্ষণ ও নাগরিকের নৈতিক উন্নয়ন:

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোরদার, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতি লাভ যে কোন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলেও নাগরিকের নৈতিক উন্নয়নের কাজ করা রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ কর্তব্য। নাগরিকের জন্য কল্যাণকর কাজের ব্যাপক প্রসার, ভালো কাজ ও সৎগুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ, অশ্লীল ও অসৎ কাজের বিনাশ সাধন করা। কুরআন মুসলিম জাতিকে বিশেষভাবে এই ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছে।[৬] এটাই ছিল সকল নাবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতদের বিশেষ কর্তব্য।[১] কুরআন

---

[১].মূল আরবী [من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار] আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, খ.২২, পৃ.৫৭ বাবুল ওয়াও, হা.নং ১৭৯৮৬।
[২]. T.W.Arnold, *Preaching of Islam*, p.5-7, খুরশিদ আহমদ, *গোড়ামী,অসহনশীলতা ও ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫০-৫১।
[৩]. আল-কুরআন, ৫৯:০৮।
[৪]. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.১২৬।
[৫]. ইবন হাযাম, *আল-মুহাল্লা*, (http://www.ahlalhdeeth.com), কিতাবুয যাকাত, খ.০৪, পৃ.২৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৪, ১১০; আল-কুরআন ০২:১৪৩।

সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের এই দায়িত্ব পালনে বিশেষ তাকিদ দিয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[২]– الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"

এই আয়াতের দাবী অনুসারে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের দায়িত্ব নাগরিকের নৈতিক উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। যাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সততা, ন্যায়-নীতি অবলম্বন করে, ভালো কাজের প্রসার ঘটায় ও কল্যাণকর কাজে ব্যাপারে পরস্পরকে সহায়তা করে। এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথায় অন্যায়, অপরাধ ও অনৈতিক কাজ হতে দেখলে তা প্রতিহত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য এটা মৌলিক বিষয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "আল্লাহ যদি কাউকে প্রজা পরিচালনার দায়িত্ব দেন এবং সে যদি প্রজাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতকে হারাম করে দেবেন।"[৩] মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের এই নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে আল্লামা তাফতাযানী বলেন-[৪]

> মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য একজন ইমাম বা রাষ্ট্র প্রধান অবশ্যই থাকা অপরিহার্য। যিনি ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ কায়েম করবেন, রাষ্ট্রের সীমান্ত হিফাযতের ব্যবস্থা করবেন, শত্রুর অগ্রসান বন্ধের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত রাখবেন। লোকেদের নিকট থেকে যাকাত, সাদাকা ইত্যাদি গ্রহণ ও বন্টন করবেন, রাষ্ট্রদ্রোহী দুষ্কৃতিকারী, চোর, ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের দমন করবেন, জুম'আ ও ঈদের নামাযসমূহ কায়েম ও তাতে ইমামতি করবেন, মানুষের পরস্পরের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করবেন। লোকদের অধিক প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, গণীমত বা জাতীয় সম্পদ জনগণের মধ্যে বন্টন করবেন, অভিভাবকহীন দুর্বল-অসহায় বালক-বালিকাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবে, আর এই ধরনের বহু কাজ সে আঞ্জাম দেবে, যা কোন ব্যাক্তি ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতে পারে না।

❑. অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদশালীদের থেকে বিভিন্ন কর আদায়:

রাষ্ট্র ও সরকারের অন্যতম কর্তব্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থাপন করা। বিত্তহীনদের বাদ দিয়ে অর্থ-সম্পদ যেন কেবল বিত্তবানদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়–তা নিশ্চিত করা। মদীনা রাষ্ট্রে রাসূল সা. এটার পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন। ইয়াহুদী গোত্র বনী নযীর থেকে অর্জিত সম্পদের সবটুকুই দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। এভাবে তিনি মদীনার আনসারদের সাথে মুহাজিরদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]– كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ -"যাতে ধন–সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে।"

রাষ্ট্রীয় জাতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা পূর্ণ করার জন্য আল-কুরআন নির্ধারিত হারে যাকাত, সাদাকা, 'উশর, সাদাকা, খারাজ, জিযিয়া, খাজনা, শুল্ক, ওয়াকফ, গনীমত, নদী-সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ, খনিজ ও বনজ সম্পদ ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অংশ আদায় করা এবং এ সব আদায়ে কোন ধরনের দুর্বলতা প্রদর্শন না করা। রাসূল সা. ওফাতের পর মদীনা রাষ্ট্রে বহুবিদ গোলোযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়া সত্ত্বেও খলীফা আবূ বকর রা. যাকাত অস্বীকারকারী যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের দমন করেছিলেন।[৬] এ ব্যাপারে তিনি কোনরূপ ছাড় দেননি। এ মর্মে কুরআনের ভাষ্য[৭]- مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ "আল্লাহ্‌ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, রাসূলের, আত্মীয়– স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন–সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে।"

রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য হয়ে পড়লে, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হলে রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত অর্থ কর ধার্য করতে পারবে। কেননা নাবী সা. যাকাত ওশর ইত্যাদি আদায়ের পরও যুদ্ধের সময় জরুরীভাবে অর্থের প্রয়োজনে মুসলিমদের নিকট সাহায্য দাবী করেছিলেন। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায়সঙ্গত ও জনকল্যাণমূল আদেশ পালন করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। তবে অন্যায়ভাবে জনস্বার্থহানিকর কোন কাজের জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য বা প্রদান করা মুসলিমদের কর্তব্য নয়।[৮]

উল্লেখ্য যে, সরকার কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। তবে জনগণ বা রাষ্ট্রের স্বার্থে কারো সম্পত্তি গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে মালিককে উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে তা গ্রহণ করতে পারবে। মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণের জন্য মহানাবী (সা.) যে স্থানটি নির্বাচন করলেন তা ছিল বনি নাজ্জারের দু'জন ইয়াতীম বালকের

---

১. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ১৩, আল-কুরআন০৮:৩৯ ।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৪১।

৩. [ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হা.নং ৬৭৩১; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. ১৪২।

৪. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১ হি), *শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়াহ* (করাচী: মাকতাবাতুল মদীনা, ২য় প্রকাশ, ২০১২) পৃ.৩২৯।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৭।

৬. দেখুন, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৩৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২০।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৭।

৮. দেখুন, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ,২০০৫) পৃ.২৩১-২৩২।

মালিকানাধীন। তারা তাদের মালিকানাধীন জমি খণ্ডটি বিনামূল্যে মসজিদের জন্য দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু মহানাবী (সা.) তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী তা মূল্য নির্ধারণ করে এবং তা পরিশাধ করে উক্ত জমি গ্রহণ করেন।

❑.রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণ (بيت المال):

রাষ্ট্রীয় কোষাগার(*বায়তুল মাল*) রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের উপর আল্লাহ ও জনগণের একটি আমানত। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের অন্যতম কর্তব্য বেআইনীভাবে কোষাগারের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা এবং বেআইনীভাবে তা থেকে কিছু বের হয়ে যাওয়া প্রতিহত করা। অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কোন কর বা রাজস্ব আদায় করবে না এবং যথেচ্ছাভাবে ব্যয়ও করবে না। রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পদ সংরক্ষণ করবে। সরকারের জন্য নির্ধারিত বেতন-ভাতার বাইরে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেআইনীভাবে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ বা ব্যয় করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও আত্মসাতের শামিল। এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে[১] وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ "আর কোন নাবীর জন্য শোভনীয় নয় যে, সে খিয়ানত করবে। আর যে কেউ খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে না।" এই আয়াতের শিক্ষা মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধানসহ প্রত্যেক আমানতের রক্ষকের কর্তব্য আমানতের সম্পদ আত্মসাৎ না করা। খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। ইসলামের চার খলীফা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে পূর্ণ আমানতদারি ও অত্যন্ত মিতব্যয়িতার পরিচয় দেন। তারা যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংরক্ষণ করতেন এবং ইনসাফ সহকারে তা গ্রহণ ও ব্যয় করতেন। এ সম্পদের সম্পর্কে উমার রা. এক ভাষণে বলেন[২]:

> "এ রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যাপারে আমি তিনটি পন্থা ব্যতীত অন্য কোনভাবে হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। ক. ইনসাফ ও ন্যায়ানুগভাবে তা গ্রহণ করা হবে, খ.ন্যায়পথেই তা ব্যয় করা। গ.তাকে সর্বপ্রকার অন্যায় নীতির উর্দ্ধে রাখা। ইয়াতীমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক , তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক তদ্রূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করব না, আর অভাবী হলে ন্যায়ানুগ পন্থায় গ্রহণ করব।" তিনি আরও বলেন[৩], "গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে এক জোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার পরিজনের জন্য যথেষ্ট। এছাড়া আল্লাহ্‌র সম্পদের মধ্যে আর কিছু আমার জন্য হালাল নয়।"
>
> চতুর্থ খলীফা আলী রা. এর আপন ভাই আকীল রা. আর্থিক অসচ্ছলতা কারণে আলী রা. কাছে থেকে অর্থ চাইলে তিনি তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'তুমি কি চাও তোমার ভাই মুসলিমদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক।

❑ .রাষ্ট্রে যোগ্য ও সৎ কর্মচারী নিয়োগ :

সততাবিহীন যোগ্যতা এবং যোগ্যতাবিহীন সততা উভয়ই বিপদজনক। সমাজ ও রাষ্ট্রের সত্যিকার উন্নয়নে ও মূল্যবোধ বিকাশে যোগ্য ও সৎ উভয় গুণসম্পন্ন কর্মচারীর বিকল্প নেই। এজন্য কুরআন যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অযোগ্য ও অসৎ নের্তৃত্বের উচ্ছেদের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। এ কারণে প্রয়োজনে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪] এ কাজে বাতিল শক্তির সামনে ভীরুতা প্রদর্শনের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে।[৫] মহানাবী সা. এর হাতে গড়া সাহাবী রা. মধ্যে সততা ও যোগ্যতার সুষম সমন্বয় সাধনের ফলে খুলাফায়ে রাশিদূন পৃথিবীতে সর্বকালের সেরা সমাজ ও রাষ্ট্র উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজ-রাষ্ট্রে যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব ছাড়া সাম্য-সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি ও অনাচার রোধ অসম্ভব। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সব ধরনের অন্যায়-অবিচার, অনাচার ও দুর্নীতি বিদূরিত করে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে যোগ্য ও সৎ লোকদেরকে নেতৃত্বে আসীন জরুরী। যোগ্য ও সৎ লোকরাই সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম। কুরআন এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছে-[৬](إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)"নিশ্চয় আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম,যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত'।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৭]-(أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ)-"আমার যোগ্যতর বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে'।"

কোন ব্যক্তিকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে সেক্ষেত্রে তার কাজ আঞ্জাম দেয়ার মত কর্মক্ষমতা থাকতে হবে, তাকে যোগ্য হতে হবে। কেননা শুধু আমানতদারি ও বিশ্বস্ততার গুণ প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতার বিকল্প বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। এ কারণে ইউসুফ('আ.) মিশরের বাদশাহকে বলেছিলেন[৮]-(اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)-"আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হিফাযতকারী, সুবিজ্ঞ'। "

---

১. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৬১।
২. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত,* খ.১, পৃ.১১৭।
৩. ইবনু কাছীর রহ. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত,* খ. ০৭, পৃ. ১৩৪।
৪. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৭৫।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৬।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ২৬।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ১০৫।
৮. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৫৫।

উল্লেখিত আয়াতে 'হাফীয' শব্দ দ্বারা সততা আর 'আলীম' শব্দ যোগ্যতা প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইউসুফ ('আ.) এর মধ্যে এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটেছিল। তাই শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা, দক্ষতা, দৃঢ়তা, ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা, আন্তরিকতা, কর্তব্যপরায়নতা, ক্ষমাপরায়ন, আত্মসংযমী, আল্লাহভীরু, জনগণের সেবক, জবাবদিহিতা মনোভাবসম্পন্ন, নিরপেক্ষ, ও ন্যায়পরায়নতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হতে হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের জন্য নিষ্ঠাবান দরদী মানুষের অভাব না থাকলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের যুগপোযুগী নের্তৃত্বের ক্ষেত্রে যে ধরনের এবং যে পরিমান যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের দরকার, তার বড়ই অভাব। এ কারণে অধিকাংশ মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্নীতি, শোষণ, যুল্ম ও নানা অনাচারে নিমজ্জিত। অথচ সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য এটা অপরিহার্য শর্ত। তাই প্রত্যেক শাসকের দায়িত্ব হলো নিজের অধীনস্থ এমন কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা, যারা সৎ, যোগ্য ও সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ। উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য রাসূল সা. '*মানুষকে তার মর্যাদা (সততা ও যোগ্যতা) অনুযায়ী সম্মান প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন*'।[১]

অনুরূপভাবে অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত, পাপাচারী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে না। কারণ এ ধরনের লোকেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থক্ষুন্ন এবং সাধারণ মানুষের অধিকারহরণ করবে। অধিক যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা, উৎকোচ কিংবা কোন সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে যদি অযোগ্যকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয় তা শুধু অনৈতিকই নয় বরং তা দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-"যে ব্যক্তি কাউকে কোন কাজে নিযুক্ত করল, অথচ প্রজাদের মধ্যে সে কাজের জন্য তার চেয়েও অধিক উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়, তাহলে নিয়োগকারী আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সমস্ত মুসলিমের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করল।"[২]

যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব একটি আমানত। এই আমানত রক্ষা জরুরী বিষয়। কিন্তু অধিকাংশ সমাজ ও রাষ্ট্রে আজ তার বড়ই অভাব। এটা শুভ লক্ষণ নয়। কেননা রাসূল সা. কে জনৈক বেদুইন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি বললেন-আমানত যখন নষ্ট হবে তখন কিয়ামাতের অপেক্ষা কর। সে জিজ্ঞেস করল, আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, (সরকারী) *কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর*।"[৩]

সমাজ ও রাষ্ট্রের নের্তৃত্বের ক্ষেত্রে আজ যোগ্যতা ও সততা সমান সমন্বয় দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় কোন ক্ষেত্রে যদি যোগ্যতা ও সততা সমান মাত্রায় না পাওয়া যায় তবে পরিস্থিতি ও অধিক কল্যাণ বিবেচনা করে অবস্থানুযায়ী আপেক্ষিক কর্মযোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্বে নিযুক্ত করা যেতে পারে। যেমন, সামরিক ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে সাহসী ব্যক্তিকেই প্রাধান্য পাবে তুলনামূলকভাবে তার আমল কিছুটা দুর্বল হলেও। আবার বিশেষ পরিস্থিতে অপেক্ষাকৃত কম প্রজ্ঞাশীল কিন্তু বলিষ্ঠ ও কঠোর এরূপ ব্যক্তি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে প্রাধান্য দিতে হবে। আবার বিচার কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞানী ও সৎ লোককে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর নিয়োগপ্রাপ্ত সকলকে স্বীয় দায়িত্ব পালনে আন্তরিক ও যত্নবান হতে হবে। এ মর্মে

> রাসূল সা. বলেন[৪]-'নেতৃত্ব হচ্ছে একটি আমানত। এ নেতৃত্ব (ক্ষেত্র বিশেষ) কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে যিনি ন্যায়-নীতিভিত্তিক নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন এবং সঠিকভাবে পালন করেছেন, তার কথা আলাদা।'

❑. রাষ্ট্রীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের প্রধান উৎস আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ। এই দুই উৎসতে যে সব বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি সেসব বিষয় সমাধান হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। আর এজন্য একটি পরামর্শ পরিষদ থাকবে, যাকে আরবীতে '*মজলিস আশ-শূরা*' বলা হয়। শূরার সদস্যদের বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। শূরার সদস্য জনগণের প্রতিনিধি এবং শাসকের মগজ ও চক্ষু। তারা শাসনকর্তাকে সঠিক পরামর্শ দেবেন। তাদের সতর্ক দৃষ্টি শাসনকর্তাকে সীমালংঘন থেকে এবং বায়তুল মালের (জাতীয় সম্পদ) আত্মসাৎ থেকে বিরত রাখতে পারে।

পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরামর্শ ও মতবিনিময় একটি প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়। এতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন, পারিবারিক পরিমণ্ডলে পরামর্শ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও আন্তরিকতা গভীরতর হয় এবং পারিবারিক জটিল বিষয়াদির সহজে সমাধান হয়। আর রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে পরামর্শ জনসাধারণ প্রভুত কল্যাণ সাধিত হয়। পারস্পরিক বিষয়াদি পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]- (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) "অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না।"

১.মূল আরবী[عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله علية وسلم أن ننزل الناس منازلهم] *সহীহ মুসলিম*, মুকাদ্দামাহ, খ.০১, পৃ.০৪/হা.০৪।

২.**মূল আরবী**[من استعمل رجلا من عصابة و في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنين] *আল-মুস্তাদরাক 'আলা সহীহাইন*, খ.৪, পৃ.১০৪, কিতাবুল আহকাম, হা.৭০২৩।

৩. মূল আরবী [إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৫৯।

৪. মূল আরবী [وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮২৫।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩৩।

এ আয়াতে সন্তান লালান-পালনের মত অতি সাধারণ ব্যাপারেও আল-কুরআন পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপর জনের উপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি। –এ বিষয়টি চিন্তা করলে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় কল্যাণকর বিষয়সমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন যায়।

ব্যক্তি, পারিবার ও সামাজিক পর্যায়ে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজনীয় হলেও রাষ্ট্রীয় কার্য পরামর্শ ভিত্তিক সম্পন্ন করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা পরামর্শ ভিত্তিক কোন কাজ করলে তা সুন্দর হয়। এতে সকলের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়। পরামর্শের গুরুত্ব ও কল্যাণ শিক্ষা দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে ফিরিশতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। অথচ তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। কারো সাথে পরামর্শ করার তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি কুরআনের ৪২ নং সূরার নাম শূরা (পরামর্শ) রেখেছেন। রাসূল সা. পরামর্শ ভিত্তিতে কাজ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ বলেন[১]-وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ "কাজ-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার উপর নির্ভরকারীদের ভালবসেন।" উল্লেখিত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তাঁর প্রতি সর্বদা ওহী অবতীর্ণ হত, তাই তিনি পরামর্শের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও তাঁকে এই আদেশ দানের গূঢ় তাৎপর্য হলো, যাতে তাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে এবং এটা যেন পরবর্তীকালে উম্মাতের কাছে আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে।[২]
আবূ বকর জাস্‌সাস বলেন[৩],"নাবী কারীম (সা.) এর সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ অবশ্যই এমন সব ব্যাপারে হতো, যেগুলোর ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। যে সব ব্যাপারে সুস্পষ্ট কুরআনী নির্দেশ বিদ্যমান, সেসব ব্যাপারে পরামর্শের কোন অবকাশ নেই।"...পরামর্শের ব্যাপারে ইজতিহাদী ব্যাপারসমূহ এবং কুরআনী ঘোষণাবিহীন ব্যাপার সমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; উভয়েই সমান।

খলীফা আবূ বকর (রা.) এর নীতি ছিলো, তাঁর সামনে কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব কি বলে। সেখানে কোনো নির্দেশ না পেলে এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) কি ফয়সালা দিয়েছেন, তা জানতে চেষ্টা করতেন। রাসূলের সুন্নায়ও কোনো নির্দেশ না পেলে জাতীয় শীর্ষস্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শক্রমে যে মতই স্থির হতো, তদানুযায়ী ফায়সালা করতেন।[৪] ওমর (রা.) এর কর্মনীতিও ছিলো অনুরূপ। পরবতী ন্যায়পরায়ন খলীফা ও মুসলিম শাসক এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এটা মু'মিনদের একটি মৌলিক কর্মনীতি। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৫] وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ "যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের আমি যে রিয্‌ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে ।"
এই আয়াতে মুসলিমদেরকে সমষ্টিক ব্যাপারসমূহ, ফায়সালার জন্য পরামর্শ করার জোরালো তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। তাই মুসলিমদের কোন সামাজিক সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরামর্শ ছাড়া সম্পাদন করা উচিত নয়। এ আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামে রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের কোন স্থান ইসলামে নেই।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে ঐ ব্যক্তির নিকট যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিক জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ।[৬] যেমন, যুদ্ধের ব্যাপারে অভিজ্ঞ সৈনিকদের নিকট, অর্থনীতির ব্যাপারে অর্থনীতিবিদের নিকট এবং শিল্পের ব্যাপারে শিল্পীদের পরামর্শ নিতে হবে। এভাবে প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারে সে বিষয়ে অভিজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]–فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ-"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাস কর।" হাসান (রা.) বলেন[৮], "আল্লাহর শপথ কোন সম্প্রদায় লেকজন পরামর্শ করে কাজ করলে তারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পেয়ে যায়।" এ প্রসংগে *তাফসীর রূহুল মা'আনী* আলী রা. থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তা এই যে,

> আলী (রা.) বলেন[৯], আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার পরে এমন বিষয়ের উদ্ভব হবে যে সম্পর্কে না কুরআনে কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আর না আপনার নিকট থেকে কিছু শোনা গেছে। রাসূল (সা.) বললেন, আমার উম্মাতের ইবাদত গুজার লোকদের একত্র করো এবং বিষয়টি পরামর্শের জন্য তাদের সামনে উপস্থিত করো, কিন্তু একজনের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিও না। আলী (রা.) নাবী সা. থেকে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন[১০], "আহলুররাই তথা যারা বিচক্ষণ এবং বর্ণিত বিষয়ে কার্যকর মত প্রকাশে সক্ষম এমন লোকদের সাথে পরামর্শ কর এবং তাদের অনুসরণ কর।"

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু খুয়াইয মিনদাদ সূত্রে ইমাম কুরতূবী বলেন-[১১],

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৫৯।
[২]. দেখুন, শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০৪, পৃ.১০৭।
[৩]. আবূ বকর আল- জাস্‌সাস, *আহকামুল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩২৯।
[৪]. আব্দুল্লাহ দারিমী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৬৯, মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ১৬১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৩৮।
[৬]. দেখুন, আল-কুরআন, ২১:০৭; ২৫:৫৯; ৩৫:১৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্‌বিয়া ২১: আয়াত ০৭।
[৮].মূল আরবী [ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم] *আদাবুল মুফরাদ*, কিতাবু হুসনুল খুলক, হাদীস নং ২৫৮।
[৯]. শিহাবুদ্দীন আলূসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২৫, পৃ.৪৬।
[১০]. মূল আরবী [مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتِّبَاعُهُمْ] ইবনু কাছীর, *তাফসীর*,*প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ.১৫০।
[১১]. ইমাম কুরতূবী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৪, পৃ.২৫০।

রাষ্ট্রকর্তারা যেসব বিষয় জানে না, সেসব বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। দীন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে দীনের আলিমদের সাথে, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে, জনকল্যাণ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে সাধারণ মানুষের সাথে। আর শহর-নগর নির্মাণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে মন্ত্রী, সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে।...শরীয়তী আহকামের ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে আলিম ও দীনদার ব্যক্তিদের সাথে। আর বৈষয়িক ব্যাপারসমূহে যাদের পরামর্শ চাওয়া হতে পারে তাদের হতে হবে বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী দীর্ঘকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক।

কাজেই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির মধ্যে প্রত্যেক কল্যাণকর ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। আর কোন খারাপ ও অন্যায় ব্যাপারে পরামর্শ করা যাবে না। এ নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচারণ, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরূদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়, তোমরা কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাঁর নিকট তোমাদের সমাবেত করা হবে।"

❑.মহান আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধান আল-কুরআনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা :

মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দিয়েছেন যুগে যুগে আসমানী গ্রন্থ ও নাবী-রাসূলের মাধ্যমে জীবন বিধান প্রদান করেছেন। সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ সা. এর প্রতি নাযিলকৃত আল-কুরআন প্রদত্ত সেই চূড়ান্ত জীবন ব্যবস্থা হল 'ইসলাম'। এই জীবন বিধান কেবল নিছক কতিপয় ইবাদত ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের তথা ব্যক্তিগত, পরিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ের সকল মৌলিক সমস্যার নির্ভুল ও সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল-কুরআনের পূর্ণ অনুসরণের মধ্যেই মানব জাতির জন্য প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কুরআনের সূরা আল-বাক্বারাহ, সূরা আলে-'ইমরান, সূরা আন্-নিসা', সূরা আল-মা'য়িদাহ, সূরা আল-আন্'আম, সূরা আল-আ'রাফ, সূরা আল-আনফাল, সূরা আত্-তাওবাহ, সূরা আল-ইসরা', সূরা আন-নূর, সূরা লুক্মান, সূরা আল-আহ্যাব, সূরা আ্শ-শূরা, সূরা মুহাম্মাদ ও সূরা আল-হুজুরাত প্রভৃতি সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর মু'মিন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গোটা জীবনের সকল বিষয়াদি আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা ছাড়া বিকল্প পথ নেই। এটা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। কেননা কুরআন মতে, আল্লাহ আইন ও বিধান দাতা। তাই মুসলিমদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও জীবন বিধান তথা ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোন মতবাদ বা বিধান অনুসরণের সুযোগ নেই।[২] মুখে ঈমানের ঘোষণা দিয়ে বাস্তব কর্মকাণ্ডের কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পালন এবং জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের বিধান পালন বড় ধরনের স্ববিরোধিতা ও কপটতা। তাই গোটা জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন আনতে হলে ব্যক্তি জীবনের ন্যায় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও কেবল তাঁর আইন ও বিধান পালন করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ "তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।" আরও বলেন [৪] أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ "তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে অধিক উত্তম? " –উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মানব প্রবর্তিত বিধি-বিধানকে জাহিলিয়্যাতের (বর্বরতামূলক) বিধান হিসেবে উল্লেখ করে তা বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর বিধি-বিধানকে মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম ও কল্যাণকর বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে তা গ্রহণের নির্দেশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন[৫]–"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হলেন বিধানদাতা। আর তাঁর নিকট থেকেই বিধান নিতে হবে।"

কুরআন-সুন্নাহর অনেক বিধি-বিধান ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ছাড়া প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমনঃ চুরি, ডাকাতি, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, মানুষ হত্যা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামে যে বিধান রয়েছে তা ইসলামী রাষ্ট্র না হলে কার্যকর করা সম্ভব নয়। ইসলামে কুফরী শক্তির বিরূদ্ধে জিহাদ, ওশর, যাকাত, খারাজ ইত্যাদির যে বিধি-বিধান দিয়েছে তা ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া প্রয়োগ অসম্ভব। এসব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম শরী'আতের বাস্তবায়ন, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন ও সকল অন্যায়, অনাচার, বৈষম্য প্রতিরোধ, হক

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮: আয়াত ০৯।

২. আল-কুরআন ৩৩:৩৬; ৬:৫৭, ৬২, ৩৮:২৬; ০৪:৫৯, ০৫:৪৪-৫০; ০৭:৮৭।

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ০৩।

৪. আল-কুরআন,সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৫০।

৫. মূল আরবী [إن الله [تعالى] هو الحكم وإليه الحكم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হা. নং ৪৯৫৫।

ও ইনসাফ কায়েম ও দীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য। বিচার ফয়সালার জন্য আজ মানবীয় আইনের দ্বারা পরিচালিত কোর্ট আদালতে যেতে হয়। অথচ আল্লাহর আইনের পরিপন্থী মানবীয় আইন মেনে নেয়া মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ছাড়া মুসলিমদের জন্য অন্য রাষ্ট্র গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন[১]– إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ -"আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর।"-এ আয়াত মোতাবেক মুসলিম দেশে মুসলিদের জন্য আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার সুযোগ নেই।

এজন্য মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (সা.) কুরআন প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নির্মিত মসজিদই ছিল এই রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রস্থান। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় তিনি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। একটি সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনার জন্য যা যা অপরিহার্য, তিনি তার প্রত্যেকটি কাজই সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক গড়ে তুলেছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন, যাকাত আদায় ও বণ্টন করেছেন, আল্লাহ প্রদত্ত আইন অনুযায়ী বিচার পরিচালনার করেছেন, বিভিন্ন গোত্রপতি বা রাষ্ট্রপ্রধানদের সহিত নানা ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছেন এবং বদর, ওহুদ, খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধকালে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন।

ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তি জীবনে নামায-রোযাসহ কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। যেমন, হালাল রুজি উপার্জন ফরয। কিন্তু আজকের সমাজে অবৈধ পন্থায় ব্যবসায়-বাণিজ্য, অফিস আদালতে ঘুষ ছাড়া সহজে কোন কাজ করা যায় না। অথচ ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই মহাপাপী বলা হয়েছে। চাকরি ও ব্যবসার সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেন-দেন, অথচ সুদ হারাম। রাস্তাঘাট, বাজার হাটে বেপর্দা, স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা, উলঙ্গপনা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা প্রত্যক্ষ করতে হয়। চাকরি ও ব্যবসায় অনেক সময় পর্দা লঙ্ঘন হয়। অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কোথাও শরীয়াত-এর কিছুই মানা হচ্ছে না। যারা চাকরি করেন তাদেরকে এমন অনেক কিছুই চাকরির খাতিরে অনেক সময় করতে হয় যা শরীয়াতে অনুমোদন নেই। সুতরাং, ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তি জীবনেও বর্তমান যুগে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ সম্ভব নয়। এজন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে[২]- فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ " সুতরাং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে তুমি তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর না।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৩] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- " হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ।"

উল্লেখিত আয়াতগুলো শুধু মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর আবেদন মুসলিমদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিদের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও বিচারালয়ের কোন দিকই এর আওতামুক্ত নয়। বরং তাদের সবকিছুই এর আওতাভুক্ত। এখানে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি অবিচল থাকাকে প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রে ইসলাম প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইমাম ইবন তাইময়িাহ (মৃ.৭২৮হি.) বলেন-[৪],

> জনগণের যাবতীয় ব্যাপার সুসম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র কায়েম, ক্ষমতা ও শাসন পরিচালনা করা দীনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বরং দীনের অস্তিত্ব ও স্থিতি এর সাথে সংশ্লিষ্ট (রাষ্ট্র ও নেতা ছাড়া দীন কায়েম হতেই পারে না)। এজন্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নেতা অপরিহার্য।...অধিকন্তু, আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং নিপীড়িতদের সাহায্য করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আমীর(রাষ্ট্রপতি) ছাড়া এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে তিনি জিহাদ, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, সালাত, জুমু'আ ও ঈদ কায়েম, হদ কার্যকর ও আইন-শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সব কাজ ওয়াজিব করে দিয়েছেন তা রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব ব্যতীত কিছুতেই বাস্তবায়ন হতে পারে না।

উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন যে সব অপরিহার্য শর্ত দিয়েছে তার মধ্যে সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়-অসত্যের প্রতিরোধ এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন করা অন্যতম। সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়, অসত্য ও মন্দ উৎখাত জন্য ক্ষমতা ও শক্তি অপরিহার্য। এটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া সম্ভবপর নয়। কারণ শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া দুস্কৃতিকারীদের দমন করা যায় না। অনেক লোক আছে যারা শুধু কুরআনের ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদানের দ্বারা অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে না। অথচ তারা রাষ্ট্রীয় শাস্তির ভয়ে অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। তাই রাসূল সা. বলেন–"আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা অনেক অন্যায় কাজ বন্ধ করে দেন, যা শুধু কুরআন দ্বারা(কুরআনের শিক্ষা প্রচার) বন্ধ হয় না।" তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে। এজন্য স্বয়ং রাসূল সা. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০৫।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৪৮।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০১।
[৪]. ইমাম ইবন তাইমিয়াহ, *আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

ইরশাদ হচ্ছে[১]–وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا "আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর'।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ রহ, বলেন[২]–

> রাসূল সা. এটা জানতে পেরেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করা ছাড়া দ্বীনের প্রচার এবং তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য দু'আ করেছেন। যেন তিনি আল্লাহর কিতাব প্রচার এবং দ্বীনের বিধান ও ফরজসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ, যদি না থাকত তবে একে অন্যকে আক্রমণ করত এবং শক্তিশালী দুর্বলকে খেয়ে ফেলত।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে অনেক সহজেই সত্য, ন্যায় ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সমাজ থেকে অন্যায়, অপরাধ, পাপাচার ও অবক্ষয় দূর করা যায়। কুরআন এটাকে প্রত্যেক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"

–এখানে "নামাজ কায়েম করার" কথা বলে বুঝানো হয়েছে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিককে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য তৈরী করার কাজ। যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে জনকল্যাণের সুষ্ঠু বুনিয়াদে পুনর্গঠিত করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধের কথা বলে ইংগিত করা হয়েছে জনগণের জন্য ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া ও সর্বব্যাপারে ইসলামী আইন-কানুন জারি করার দিকে। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সত্য, ন্যায় ও শন্তি প্রতিষ্ঠা এবং অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে ইসলামের সার্বিক সুফল লাভ করতে হলে তা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা জরুরী। কেননা ইসলাম ও রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করার কোনই সুযোগ নেই। এবং এর একটি অপরটির সাহায্য ছাড়া কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৪]

> ইসলাম ও রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে দু'জমজ ভাই। তারা একজন ছাড়া অপরজন সুস্থভাবে চলতে পারে না। ইসলাম হচ্ছে ভিত্তি, আর রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে সংরক্ষক। যে জিনিসের ভিত্তি নেই তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আর যে জিনিসের সংরক্ষক নেই তা এমনি নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ প্রদত্ত আইন-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা তথা ইসলামী রাষ্ট্র গঠন নতুন কোন ধারণা নয়, বরং অতীত মানব সমাজে তা প্রচলিত ছিল। কুরআনে বর্ণিত দাউদ আ., সুলাইমান আ., ইউসুফ আ., তালুত, জুলকারনাইন প্রমূখের রাষ্ট্র পরিচালনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-[৫],

> বনী ইসরাঈলকে শাসন করতেন নাবীগণ। যখনই কোনো নাবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নাবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নাবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন: আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন: ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি এভাবে তাদের আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (আনুগত্য) প্রদান করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।"

উল্লেখ্য যে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণের মর্মকথা হলো– নিরঙ্কুশভাবে কেবল আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন ও সুন্নাহকেই আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণী বা জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার না করা। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এককভাবে স্বীকৃতির সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহকে রাষ্ট্রের আইন হিসেবে গ্রহণ এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে তা জারি করা। মানব রচিত মতাদর্শের পরিবর্তে সর্বক্ষেত্রে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করা এবং রাসূল সা. কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা । আর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নির্বাচিত সরকার সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করা। সরকার সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষকে বহু সংখ্যক সার্বভৌম শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করে কেবল এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দাসত্বের দিকে নিয়ে আসা।

আল্লাহর প্রদত্ত বিধি-বিধানের কল্যাণকারিতা: মানব জাতির মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষার জন্য ইনসাফপূর্ণ আইন ও বিধানের একান্ত প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সমাজে ন্যার্যত সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হানাহানির অবসান ঘটে। কিন্তু এই আইন-বিধান কার হবে? মানুষের না আল্লাহর, এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, ইনসাফপূর্ণ আইন প্রণয়ণের জন্য চারটি শর্ত জরুরী। ক.সর্বব্যাপী জ্ঞান, খ. পরিপূর্ণ দয়াপরায়নতা, গ.সর্বময় ক্ষমতা, ঘ. নিরপেক্ষতা। আর এজন্য জরুরী যে, ক). মানবিক অধিকারসমূহের প্রতিটি দিক সম্পর্কে আইন প্রয়োগকারী সম্যক অবগতি এবং মানবিক কল্যাণসমূহ ও অধিকারসমূহের সাথে সম্পৃক্ত মানব জীবনের সকল যুগের উপর তার দৃষ্টি থাকবে, যেন তার ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা মানব জীবনের সকল যুগে সঠিক হয়। তা এমন হবে না যে, এক যুগের জন্য সঠিক আর অন্য যুগের জন্য ভুল গণ্য হবে। আর

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৮০।

[২]. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ.১১১।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৪১।

[৪].[الإسلام والسلطان أخوان توأمان لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه] *কানজুল উম্মাল*, খ.০৬, পৃ.১৪, হা. নং ১৪৬১৩।

[৫].[كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا ؟ قال (فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৪২।

এটাও জরুরী যে, সেই ফায়সালা মানুষের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিক পরিণামের হিসেবেও এবং আভ্যন্তরীণ পরিমান হিসাবেও সঠিক হবে। যেমন কোন কোন দেশে সুদের বৈধতা এবং সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের বৈধতার আইন রয়েছে। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতার লাগামহীন আতিশয্যের বিবেচনা করা হলেও সমাজের সামষ্টিক অনিষ্টতা লক্ষ্য করা হয়নি। কারণ সুদের সুদূরপ্রসারী পরিণাম লোভ-লালসা বৃদ্ধি, মানবিক সহানুভূতি বিলোপ সাধন করে। আর ব্যভিচার বংশগত ও সামাজিক পবিত্রতা নষ্ট করে এবং নৈতিক চরিত্র ধ্বংস সাধন করে। খ). ইনসাফপূর্ণ আইন প্রণয়নকালে আইন প্রণয়নকারী যেন উদাসীনতা প্রদর্শন না করে এবং জেনে-বুঝে আইনের মধ্যে ইনসাফ পরিপন্থী কোন অংশ সংযোজন না করে। গ). আইন প্রণয়নকারী যেন নিজ জাতি, দেশ, বর্ণ ও ভাষা-ভাষী লোকদের প্রতি যেন পক্ষপাতিত্ব না করে এবং আইন প্রণয়নে তাদের বিবেচনা করে অন্যদের ক্ষতি সাধন না করে।–এ সব গুণ কেবল আল্লাহর মধ্যেই বিদ্যমান। তাঁর মত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও দয়া কারো নেই, তাঁর সমান ক্ষমতাধর কেউ নেই যে, তিনি কারো চাপের মুখে নতি স্বীকার করে আইন প্রণয়ন করেন না, অথবা অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে ভয় পান না, আর কেবল তিনিই নিরপেক্ষ। সুতরাং ইনসাফপূর্ণ আইন দেয়ার একমাত্র অধিকারী কেবল আল্লাহ।[১]

আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধানের মূল্যমান ও গুরুত্ব : আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম মানব ইতিহাসের অন্য কোন ধর্মের মত নিছক ধর্ম নয়। বিভিন্নভাবে তা অন্য সকল ধর্ম থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এটা কালোত্তীর্ণ ও সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। এতে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক বিধি-বিধানসহ সর্বকালের মানুষের উপযোগী অত্যাধুনিক, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বজনীন বিধি-বিধান। সর্বকালের উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য–

ইসলাম এমন কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক মতাদর্শ নয় যা কোন একজন মানুষ বা এক দল মানুষের জ্ঞান ও যুক্তির সমষ্টি, অথবা এমন কোন নীতিদর্শন কিংবা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তাহযীব-তমুদ্দুন নয়, যা যুগ যুগ ধরে অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত হয়েছে। আর তা কোন নেতা কিংবা সংস্কারকের উদ্ভাবিত চিন্তাধারাও নয়-যার দিকে মানুষকে ডাকা হয় এবং তা ভাল হোক বা মন্দ হোক তার তোয়াক্কা না করে জাতিকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এ হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত উদার, শান্তিময়, ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থী চূড়ান্ত জীবন ব্যবস্থা। এতে সব নাবী-রাসূল ও সব আসমানী গ্রন্থে সমানভাবে সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ঈমান আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।[২] এতেই রয়েছে মানব জীবনের সুষ্ঠু সমাধান এবং ইহলৌকিক শান্তি-সমৃদ্ধি ও পারলৌকিক মুক্তির গ্যারান্টি। এতে নেই কোন সংকীর্ণতা, অসম্পূর্ণতা বা দুর্বলতা। এছাড়া অন্য যত পথ-মত আছে তার সবই ত্রুটিপূর্ণ এবং আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য এবং সে সব অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ ও মুক্তি সম্ভব নয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ- "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন।" তিনি আরও বলেন[৪]- وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ- "কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে (তাহলে) তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।" অন্যত্র বলেন[৫], أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ "তারা কি আল্লাহ্‌র দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনগুত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

একবার রাসূল (সা.) এর নিকট উমর (রা.) এসে বললেন, আমাদের কাছে ইয়াহূদী (আলিম)-দের কোন কোন কথা খুব পছন্দ হয়। আপনি অনুমতি দিলে আমরা তাদের কিছু কথা লিখে রাখতে পারি। রাসূল(সা.) বললেন, তোমরাও কি তোমাদের দ্বীন ও কিতাবের ব্যাপারে বিভ্রান্ত, যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল ইয়াহূদী এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ? আমি তোমাদের কাছে এমন শরী'আত নিয়ে এসেছি যা (সূর্যের ন্যায়) স্পষ্ট ও আলোকময়। যদি মূসা (আ.) নিজেও আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তারও আমার আনুগত্য ব্যতিরেকে গত্যন্তর থাকত না।[৬]

মানব জাতির সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা যিনি জীবন বিধানদাতাও হবেন একমাত্র তিনিই–এটা যৌক্তিক কথা। সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে আদেশ-নিষেধ জারি ও জীবন বিধান দেয়ার অধিকার শুধুই তাঁর।[৭] পক্ষান্তরে, সৃষ্টি ও প্রতিপালক করবেন একজন আর বিধান দিবে অন্যজন এটা চরম অনধিকারচর্চা। আর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তাঁর বিধান প্রত্যাখ্যান করে তদাস্থলে অন্য কারো বিধান পালন করা অন্যায়, অকৃতজ্ঞতা ও অনৈতিক। তাছাড়া স্রষ্টা হিসেবে তিনি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। মানুষের জন্য প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ কোন পথে, আর অকল্যাণ ও অশান্তি কিসে, তা

---

[১]. দেখুন, শামছুল হক আফগানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫-৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩৫-১৩৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৮৫।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৮৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৩:১০২, ০২:১২০।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৮৩; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৩:১০২, ০২:১২০।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৪০, আল-কুরআন ৩:১৫৪।

তিনি সাম্যক অবগত। তাই প্রকৃত শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণ পেতে হলে তাঁর বিধান অবলম্বন করতে হবে। অধিকন্তু, যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সত্তা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানই বিশ্বমানবতার জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ, নির্ভুল ও সব ধরনের সংকীর্ণতামুক্ত, সর্বাপেক্ষা সঠিক ও সকলের জন্য উপযোগী। সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষের পক্ষে এরূপ চূড়ান্ত কল্যাণকর জীবন বিধান রচনা অসম্ভব। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১] –(أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) "জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্।" অন্যত্র বলেন[২] –(وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) "আর যারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" আরও বলেন[৩], (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ) "আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ্ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। ..." অন্যত্র আরও বলেন[৪], (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) "হুকুম কেবল আল্লাহ্র কাছে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী'।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহে এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, আইন ও বিধান জারি করার অধিকার কেবল আল্লাহর, অন্য কারো নয়। যে ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, সে ক্ষমতা অন্যের উপর আরোপ করা শিরক। তাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর বিধান মেনে নেয়াই মানুষের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহর আইন ও বিধান উপেক্ষা করে কিংবা তাঁর বিধানের বিপরীত বিধান রচনা বিদ্রোহের শামিল। তাই যারা আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে তারা কাফির। আর যারা তা স্বীকার করবে কিন্তু তদানুযায়ী ফায়সালা করে না তারা ফাসিক ও যালিম।

জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বমানবতার শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। এটা বিশ্বশান্তির প্রকৃত ও প্রধান মাধ্যম। এর শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেই নিহিত আছে মানুষের সত্যিকার বৈষয়িক শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং পারলৌকিক সফলতার গ্যারান্টি। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]–

قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ- يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আল্লাহ্র নিকট ইতে এক জ্যেতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এটা দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।"

ইসলাম এক মহাকল্যাণকর জীবন বিধান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম থেকে মানুষ যখন দূরে সরে গিয়েছে তখনই জন্ম নিয়েছে অনাচার, অশান্তি ও অনৈতিকতা। বর্তমান পৃথিবীতে যে সকল অশান্তি, অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও সংকট রয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে কাঙ্ক্ষিত শান্তি-শৃঙ্খলা লাভ এবং সমাজ থেকে সকল অন্যায় ও অনাচারের অবসান সম্ভব।[৬] এর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা ও পালনের মধ্যে আল্লাহর অশেষ রহমত ও কল্যাণের নিশ্চয়তা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ওয়াদা-[৭]

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ

"আর যদি তারা তাওরাত, ইনজীল ও তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম করত, তবে অবশ্যই তারা আহার করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে। তাদের মধ্য থেকে সঠিক পথের অনুসারী একটি দল রয়েছে এবং তাদের অনেকেই যা করছে, তা কতইনা মন্দ!"

আল-কুরআন প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা 'ইসলাম' একটি সহজ-সরল জীবন বিধান। এতে নেই কোন জটিলতা ও বক্রতা। এই জীবন ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির সাথে সর্বাধিক সংগতিশীল। এজন্য ইসলামকে মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম তথা দ্বীনে ফিতরাত বা দ্বীনে হানিফ বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেন-[৮] فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا "অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্র প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" অন্যত্র বলেন-[৯], (أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) "এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৫৪।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৪৪, আল-কুরআন ০৫:৪৫, ০৫:৪৭।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৪৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ৫৭; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৮:৭০।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১৫-১৬।
৬. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারা : আয়াত ৩৮।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৬৬।
৮. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৩০।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৫৩।

ইসলাম একটি ভারসাম্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহান আল্লাহ এতে মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্ন্তজাতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মৌলিক দিক নির্দেশনা দিয়ে একটি সর্বকালের উপযোগী, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান প্রদান করেছেন। সেই জীবন বিধান মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর, সকল বিভ্রান্তি, মতভেদ ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের স্থায়ী শান্তি ও মুক্তি। এছাড়া অন্য যত পথ-মত আছে সেগুলো অপূর্ণাঙ্গ এবং সে সবের মধ্যে মানুষের চূড়ান্ত কল্যাণ ও মুক্তি নির্দেশিকা নেই। মহান আল্লাহ বলেন[১]–(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)"আর আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি–প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদরূপে।"

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক মরহুম সামছুল হক যথার্থই বলেছেন–

> বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি ও পরিবেশের ভেতর যেসব সমস্যা ও সংঘাত মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তার সমাধান কল্পে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠে। পার্লমেন্টারী গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পূঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি সমস্ত মতবাদেই খণ্ড খণ্ডরুপে কোন কোন সমাধান হতে পারে। সমস্ত খণ্ড সমাধানের ভিতর আবার বিরোধ ও বৈষম্য আছে।...জগৎ জুড়ে আজ যেসব সমস্যা নানারূপে দেখা দিয়েছে প্রত্যেক দেশ ও জাতি সেসব সমাধান খুঁজে ফিরছে কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান বা সমাধান দিতে পারছে না। মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে এর একটি একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে নতুন সমস্যা ও সংঘাতের সৃষ্টি করছে। কেউ সত্যিকার সমাধান দিতে পারেনি।
>
> একমাত্র ইসলামই বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি ও পরিবেশের ভেতর যে নিত্য নতুন সংঘাত ও সমস্যা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান। ইসলামই মানুষকে তাঁর বাঁচার ও ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির সাধারণ নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতরূপে চিরন্তন সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে নিতে পারে। কোরআন, হাদিসে মূলনীতি ও মৌলিক এ সত্যই লিপিবদ্ধ আছে, যা সব যুগে, সব দেশে, সব অবস্থায় সব জাতির ভেতর প্রযোজ্য হবে। [২]

ইসলাম মুহাম্মাদ সা. প্রবর্তিত নতুন কোন ধর্মমত নয়, বরং ইসলাম একটি চিরন্তন দ্বীন বা জীবন বিধান। এটা সকল নাবী-রাসূলের দ্বীন। এটাই মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রথম ও চূড়ান্ত দ্বীন। শারয়ী বিধি-বিধানে কিছু পার্থক্য থাকলেও আদম ('আ.) থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সব নাবী-রাসূল ইসলামের অনুসারী ও ধারক-বাহক ছিলেন। মানব জাতির স্রষ্টা যেহেতু এক, সেহেতু সবার জীবন বিধান হবে এক। আর ইসলাম হলো সেই চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। সব নাবী-রাসূলের কালেমা ও ধর্মের মূলমন্ত্র তারই প্রমাণ বহন করে। কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ "আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এ ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই; অতএব আমার ইবাদত (দাসত্ব-উপাসনা) কর।"

ইসলাম সব নাবী-রাসূল ও পূর্ববর্তী উম্মতের শাশ্বত ও সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা– এর সমর্থনে পূর্ববর্তী নাবী-রাসূল ও উম্মতের কতিপয় বিবৃতি কুরআন থেকে উদ্ধৃত করা হলো। যেমন:

•নূহ('আ.)ঘোষণা করেন[৪]وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"আমি তো মুসলিমদের(আত্মসমর্পণকারী) অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।"

•ইবরাহীম('আ.)ও ইসমাইল('আ.)কাবাগৃহ নির্মাণ শেষে দু'আ করেছিলেন-(رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ)"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত (মুসলিম) কর এবং আমাদের বংশ হতে তোমার এক অনুগত উম্মত(মুসলিম জাতি) কর।"[৫] আরও বলা হয়েছে[৬]– مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ-"ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

•ইয়াকুব ('আ.) তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন[৭]– وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ "ইবরাহীম('আ.) ও ইয়াকুব('আ.)তাঁর পুত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে,হে বৎস! আল্লাহ্ তোমাদের দ্বীনের(ইসলাম) জন্য জন্য মনোনীত করেছেন। কাজেই মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যবরণ কর না।"

•ইউসুফ ('আ.) দু'আ করেন[৮], (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) "আমাকে মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন।"

•মূসা ('আ.) তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বলেন[৯]–وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ "হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা মুসলিম হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর।"

---

১. আল-কুরআন,সূরা আন-নাহল : আয়াত ৮৯, আল-কুরআন ০৬: ৩৮; ১৬: ৬৪।
২. সামছুল হক, *বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম*, (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৭৭), ভূমিকা থেকে গৃহীত।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ২৫।
৪. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৭২।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১২; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:১৩১-১৩২।
৬. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৬৭।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৩২।
৮. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ১০১।
৯. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৮৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৫:৪৪।

•'ইসা ('আ.)এর অনুসারীরা তাঁর নিকট ওয়াদা করেছিল[১]-قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ"আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম।"
উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণ হয় যে, সকল নাবী-রাসূলের প্রকৃত দ্বীন ছিল একটি, তা হল– ইসলাম।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নৈতিক দায়িত্ব: মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম হওয়ায় মহান আল্লাহ সকল মতাদর্শ ও বিশ্বাসের উপর ইসলামী জীবন বিধানকে বিজয়ী করার গুরু দায়িত্ব দিয়ে সব নাবী-রাসূল প্রেরণ করেন। নাবী-রাসূলগণ তাদের জীবদ্দশায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সকল মতভেদের উর্দ্ধে উঠে এ দায়িত্ব পালনের জন্য মহান আল্লাহ জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন-[২] شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যারা নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, 'তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ কর না।" শেষ নাবী মুহাম্মাদ সা. কে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এ কাজের আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ "তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" নাবী-রাসূলগণের অবর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত এই কাজের নৈতিক দায়িত্ব বর্তিয়েছে মুসলিম জাতির উপর। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রয়োজন ইসলামী জীবন বিধান ভালোভাবে জানা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা পালন এবং প্রচার-প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা উচিত।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মনীতি: বর্তমান সমাজে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রচলিত ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এজন্য সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ভ্রান্ত চিন্তাগুলো সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সমাজে চলছে পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ, মানুষের সার্বভৌমত্ব, শাসক শ্রেণীর স্বার্থের রাজনীতি ও তাদের বিদেশী প্রভূদের নির্দেশের অন্ধানুসরণ। সমাজ পরিবর্তন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সমাজের এসব দুষ্ট চিন্তা ও নিয়ম-নীতিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, যেমনটি করেছিলেন রাসূল(সা.) তাঁর মক্কী জীবনে। বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চর্চাকে আলোচনায় এনে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আলোচ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে সীমাহীন দুর্নীতি, অনাচার ও যুলম চলছে। এর মূল উৎস সমাজে প্রচলিত দুষ্ট চিন্তা ও নিয়ম পদ্ধতি। অপরদিকে ইসলামকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন জনগণ বুঝতে পারে যে, সমাজের মানুষের চাহিদা পূরণের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ইসলাম। আর এটা করার প্রধান উপায় হচ্ছে চলমান জীবন ও ঘটমান বাস্তবতা থেকে বিভিন্ন বিষয় যা জনগণের চিন্তাকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করছে তা নিয়ে মানুষের সাথে আলোচনা করা এবং মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া কিভাবে সমাজে প্রচলিত চিন্তা ও নিয়মগুলোর সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী শাসক শ্রেণী ও তাদের বিদেশী প্রভুরা জনগণকে শোষণ ও নির্যাতন করছে; সেই সাথে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কিভাবে মানুষকে এসব মানব রচিত আইনের যুল্ম থেকে মুক্ত করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও অগ্রগতির ধারা প্রতিষ্ঠিত করে তাও জনগণের সামনে উপস্থাপন করা। যখন জনগণ আস্থার সাথে বুঝতে পারবে যে, একমাত্র ইসলামী জীবনাদর্শ দ্বারাই আমাদের সব চাহিদা ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত তখন ব্যাপক জনমতকে ভিত্তি করে সমাজের নেতৃস্থানীয় সৎ মানুষদের সহযোগিতায় বর্তমান পুঁজিবাদী-যালিম নেতৃত্ব তথা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে নীতিবান ইসলামী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

উল্লেখ্য যে, জনগণের উপর জোর করে কিছু ইসলামি আইন চাপিয়ে দিয়ে কিংবা শুধু কিছু নেতাকে অপসারণ করে নতুন কিছু লোককে ক্ষমতায় বসিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। বরং ভ্রান্তচিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেই যুক্তিপূর্ণভাবে কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে এবং জনগণকে অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা।* মোটকথা, সমাজের বর্তমান দুরবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন করতে হলে সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সেগুলো পরিবর্তনের জন্য যথাযথভাবে চেষ্টা চালাতে হবে।

❑.অপরাধ নির্মূল ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান:

আল-কুরআন মানুষকে বিভিন্ন উত্তম গুণাবলী অর্জনের তাকিদ দিয়েছে এবং মন্দ গুণাবলী বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। এর মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। কিন্তু কিছু লোক আছে যারা কুরআনের উপদেশ ও নির্দেশের দ্বারা সংশোধন হয় না। তাদের সংশোধন, তাদের অনিষ্ট থেকে সমাজের মানুষকে রক্ষা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে জন্য শান্তি-নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধানকল্পে কুরআন দৃষ্টান্তমূলক কিছু শাস্তির বিধান দিয়েছে। সেগুলো হলো অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদির শাস্তি। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, অপরাধীর শাস্তি

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ১১১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৩:৬৭-৬৮, ০৩:৮৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ১৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৩৩, আল-কুরআন ৬১:০৯, ৪৮:২৮, ০৩:৮১।

বাস্তবায়ন, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও বিচারালয় স্থাপন ও পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে কোনরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন কিংবা গরিমসি না করা। মহান আল্লাহ বলেন-[১] (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) "আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে্‌ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও।"

মহানাবী (সা.)-এর যুগে মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকজন তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর কাছে আসে। উসামা (রা.) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, *'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর কেউ চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার উপর নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করত। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম'*।[২]

ইসলামী শরীয়া ঘোষিত শাস্তি তিন ধরনের। যেমনঃ ক. কিসাস, খ. হুদূদ গ. তাযীর।

ক. কিসাস(القصاص): কিসাস শব্দের আভিধানিক অর্থ একই রূপ কাজ করা, পদাংক অনুসরণ করা, সমান বদলা গ্রহণ করা ইত্যাদি। কিসাস হল অপরাধীর সাথে তার অপরাধের অনুরূপ আচরণ করা।[৩] অন্য মতে–যে যেরূপ করল তার সাথে সেরূপ করাকে কিসাস বলে। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে শাস্তি হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান, ইসলামী শরীয়তে তাকে কিসাস বলে।[৪] যেমন:কেউ কাউকে হত্যা বা জখম করলে তাকেও হত্যা বা জখম করা।

অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা ও সন্ত্রাস একটি জঘন্যতম অপরাধ। সমাজ থেকে এ অপরাধ নির্মূলে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে কিসাস একটি যুগান্তকারী বিধান। এটা জীবন রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এতেই সমাজের মানুষের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]–

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ- وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা প্রর্দশন করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।

উল্লেখিত আয়াতে কিসাসের বিধানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কুরআন বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বোধন করে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, একজন হত্যাকারীর প্রাণ রক্ষা করে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের প্রাণ সংকটাপন্ন হবে। আর কিসাস মাধ্যমে সমাজের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ভুলবশত কাউকে হত্যা করে ফেলে, সেক্ষেত্রেও ইসলাম তাকে হত্যার পরিবর্তে বড় ধরনের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৬] –

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ

"আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু' মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০২।

[২].মূল আরবী [إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها...] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্‌বিয়া, হাদীস নং ৩২৮৮; মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬৮৮।

[৩].মূল আরবী [هو أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح] ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.৭৩।

[৪]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭৮-১৭৯।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্‌-নিসা' ০৪: আয়াত ৯২।

কিসাস মানব জাতির প্রতি নতুন কোন বিধান নয়, ইতঃপূর্বে তাওরাতে এ বিধান দেয়া হয়েছিল।[১] বর্তমান বাইবেলেও এর ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে: 'যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তোমাকে এই পরিশোধ দিতে হবে; প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ।'[২]

কিসাস ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীক। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা প্রতিরোধে সর্বাধিক উপযুক্ত বিধান কিসাস। তবে কিসাসের বিধান অপরাধ দমনের জন্য, প্রতিহিংসা চারিতার্থের জন্য নয়। এজন্য কিসাসের ক্ষেত্রে কোন রকমের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) "সুতরাং যে তোমাদের উপর সীমালংঘন করেছে, তোমরা তার উপর সীমালংঘন কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর সীমালংঘন করেছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" আরও বলেন-[৪] وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ- "যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম।" অন্যত্র বলেন[৫]–وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا "কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।"

কিসাসের শাস্তি কার্যকরের শর্তাবলী: কিসাস একটি কঠোর বিধান হওয়ায় তা কার্যকরের ক্ষেত্রে ইসলাম কতগুলো শর্ত আরোপ করেছে। যেমন: ১. হত্যাকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন হওয়া। ২. হত্যাকারী মুসলিম অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া। ৩. হত্যাকারী সন্দেহ মুক্ত হত্যার অভিপ্রায় থাকা এবং অস্ত্রযোগে, শ্বাসরোধ করে, বিষ প্রয়োগে, আগুনে নিক্ষেপ করে, পানিতে ডুবিয়ে, জীবন্ত মাটিতে পুঁতে, উচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে ইত্যাদি উপায়ে হত্যা করা। ৪. বিনা চাপে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে হত্যা করা। ৫.হত্যাকাণ্ডে কিসাসের পাত্র নয়-এমন কেউ হত্যাকারীর সাথে শরীক না হওয়া। ৬.নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর সন্তান বা অধঃস্তন ব্যক্তি না হওয়া ৭. নিহত ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা থাকা। ৮.হত্যা সরাসরি ও সীমা লঙ্ঘনমূলক হওয়া। ৯.হত্যা ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া। ১০. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছদের পক্ষ থেকে কিসাসের দাবী করা এবং কিসাসের দাবিদার বিদ্যমান থাকা। ১১. রক্তের দাবিদারদের শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ উপযুক্ত থাকা। ১২. হত্যা প্রমাণে হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি বা ন্যায়পরায়ন দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা।[৬] উল্লেখ্য যে, হত্যাকৃত ব্যক্তির অভিভাবকরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করলে অথবা ইচ্ছাকৃত হত্যা ছাড়া অন্য উপায়ে হত্যা যেমন: ক. প্রায় ইচ্ছামূলক হত্যা, খ.ভুলবশত হত্যা, গ. প্রায় ভুলবশত হত্যা, ঘ. কারণবশত হত্যার ক্ষেত্রে– কিসাসের বিধানের পরিবর্তে দিয়াত(রক্তপণ) ও কাফফারা-এর বিধান কার্যকর করা হবে।

খ. হুদূদ (الحدود): হুদূদ শব্দটি হদ্দ এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ–বাঁধা দান বা বারণ করা। ইসলামী পরিভাষায়– কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহকে হুদূদ বলে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, মদপান এই পাঁচটি জঘন্য অপরাধের জন্য যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে তা হুদূদের অন্তর্ভূক্ত।

চুরির শাস্তি: চুরি মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। তাই সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে চৌর্যবৃত্তি নির্মূল ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আল-কুরআন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-[৭]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় শাস্তি; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। কিন্তু সীমালংঘনের করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজকে সংশোধন করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

ইসলাম সামান্য কারণে চুরির জন্য হাতকাটার বিধান দেয়নি। চুরির এ শাস্তির যারা সমালোচনা করেন তারা না বুঝেই তা করে থাকে। 'সৌদী আরবেব রাজপথে রাত্রিতে অথবা দিবাভাগের যে কোন সময়ই ভ্রমণ করলে যে কেউ এই বিধানটির স্বস্তিকর প্রভাবটি লক্ষ্য করতে পারবেন।'[৮]

---

[১].মহান আল্লাহ বলেন (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ) "আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত ও যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তার পাপ মোচন হবে।" সূরা আল-মা'য়িদাহ : আয়াত ৪৫।

[২]. পবিত্র বাইবেল, *প্রাগুক্ত*, যাত্রাপুস্তক ২১, পৃ.৯৫

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৪।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ১২৬।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩৩।

[৬]. দেখুন, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯) পৃ. ২৩৫-২৫২।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩৮-৩৯।

[৮]. ড. মুরাদ হফম্যান, *ইসলাম : দি অলটারনেটিভ*, অনু. মুঈন বিন নাসির (ঢাকা: ইফাবা, ২য় সং.২০০৯) পৃ.৩১৩।

চুরির শাস্তির বিধান কঠোর হওয়ায় কেউ যাতে হীন স্বার্থ চারিতার্থ করার জন্য কাউকে চোর সাব্যস্ত না করতে পারে সেজন্য ইসলাম কোন ব্যক্তিকে চোর বা কোন ঘটনা চুরি গণ্য করার জন্য কতগুলো শর্ত আরোপ করেছে। এসব শর্ত পেলেই কেবল তা চুরি বলে গণ্য হবে এবং আদালতের রায়ের ভিত্তিতে অপরাধীর শাস্তি দেওয়া যাবে।

চুরির শাস্তি কার্যকরের শর্ত: ১.চোরকে প্রাপ্ত বয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন হওয়া। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল না হওয়া। ২ চোরকে মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া। ৩. চুরির উদ্দেশ্যে জেনেশুনে অপরের মাল গোপনে হস্তগত করা। ৪. স্বেচ্ছায় ও প্রলোভনবশত চুরি করা। চুরি করতে বাধ্য হয়েছে এমন ব্যক্তি, কিংবা গ্রেফতারের পূর্বে আত্মসমর্পণ কারীর হাত কাটা যাবে না। ৫. চোর ও মালিক রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় যেমন, পিতা, দাদা, ভাই-বোন, ফুফু, খালা, মামা, স্বামী-স্ত্রী, মেহমান ও সেবক-সেবিকা না হওয়া। ৬. হস্তগত মালের মধ্যে চোরের কোন মালিকানা বা অধিকার না থাকা। ৭. চুরির নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। ৮. মালের মালিক জানা থাকতে হবে। ৯. চুরিকৃত মালের বৈধ মালিক থাকা বা কারো অধিকারে থাকা। ১০. চুরিকৃত বস্তু মাল হওয়া এবং তা হস্তান্তরযোগ্য হওয়া। ৯. চুরিকৃত বস্তু অবশ্যই মূল্যবান হওয়া তথা আর্থিক মূল্য থাকা। চুরিকৃত বস্তুর নিসাব পরিমান মূল্য থাকা। যার মূল্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট নিসাব তথা দশ দিরহাম বা দুই দিনার বা ৪.৫৭ গ্রাম স্বর্ণের সমমূল্যের হতে হবে। দশ দিরহাম বা দুই দিনার নীচে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। তা মানব জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় হবে। ৯. চুরিকৃত বস্তু তুচ্ছ বস্তু না হওয়া যেমন, লাকড়ি, কাঠ, বাঁশ বা কোন ক্ষুদ্র জিনিস। ১০. চুরিকৃত বস্তু সংরক্ষিত হওয়া। পরিত্যক্ত বা অরক্ষিত মাল না হওয়া; অনুরূপভাবে বস্তু সংরক্ষণযোগ্য হওয়া এবং তা অসংরক্ষণযোগ্য পচনশীল না হওয়া। যেমন-মাছ, দুধ, তরকারী ইত্যাদি। ১১. চুরিকৃত মাল অপরের দখলভুক্ত হওয়া। ১২.মাল নিরাপদ সংরক্ষিত স্থান থেকে করায়ত্ত করা। ১৩.মাল সম্পূর্ণরূপে চোরের দখলভুক্ত হওয়া। ১২.দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে অথবা আসামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া। উল্লেখ্য যে, দুর্ভিক্ষের সময় বা অনাহারে ক্ষুধার কষ্টের দরুন কেউ বাধ্য হয়ে চুরি করলে অথবা বিচারকের কাছে পৌঁছার পূর্বে মালিক চোরকে ক্ষমা করলে কিংবা হদ্দ ঘোষণার পূর্বে চোর চুরিকৃত বস্তুর মালিকানা অর্জন করলে, বা আসামীর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।[১]

ডাকাতি, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের শাস্তি: ডাকাতি, রাহাজানি, বিদ্রোহ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড জঘন্য অন্যায় ও মানবতা বিরোধী কাজ। এতে সমাজের সর্বসাধারণের জীবন ও সম্পদ নিরাপত্তহীন হয়ে যায় এবং সমাজে চরম অশান্তি-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এরূপ দুষ্কৃতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কুরআন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন সশস্ত্র ডাকাত ও লুণ্ঠনের জন্য চার প্রকার শাস্তি ঘোষণা করেছে। তা হলো: হত্যা, শূলবিদ্ধকরণ, বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন ও দেশ থেকে নির্বাসনে পাঠানো। ইরশাদ হচ্ছে-[২]

> إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ-إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
>
> "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে তারা ছাড়া, যারা তাওবা করে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে; সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

উল্লেখিত চারটি শাস্তির কোন একটি শাস্তি অপরাধের ধরণ ও মাত্র অনুযায়ী প্রয়োগযোগ্য। কৃত অপরাধ অনুপাতে বিচারক তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী তা নির্ধারণ করবেন। ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের মত ডাকাতি ও সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগীদের শাস্তি একই শাস্তি হবে।[৩] তবে কেউ যদি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট ধরা পড়ার পূর্বে স্বেচ্ছায় বিশুদ্ধচিত্তে তাওবা করে ভালো হয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে প্রমাণও পাওয়া যায় তবে সে নির্ধারিত শাস্তি থেকে রেহাই পাবে; কিন্তু মানুষের অধিকারের সাথে যা কিছু জড়িত তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমার উপর নির্ভরশীল হবে।

ডাকাতির শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী: ডাকাতির শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় তা কার্যকরে ইসলাম সতর্কতা স্বরূপ বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে। যেমন, ১. মুসলিম অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। ২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে। ৩. পুরুষ হতে হবে। ৪. ডাকাতদেরকে সশস্ত্র হতে হবে। ৫. ডাকাতি ইসলামী রাষ্ট্র সীমার মধ্যে হতে হবে। ৬.ডাকাতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি মুসলিম অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হতে হবে। সম্পদের ওপর তাদের মালিকানা থাকা। ৭. ডাকাত আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় হবে না। ৮.লুটকৃত মালের আর্থিক মূল্য থাকা এবং তার নিসাব পরিমান মূল্য থাকা। ৯. লুটকৃত মালের বৈধ মালিকানা থাকা।

---

[১]. দেখুন, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* (ঢাকা:বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৯) পৃ.৫২-৭৮, আফীফ আবদুল ফাত্তাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৯-১৮০।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৩৩-৩৪।

[৩]. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ.০৯, পৃ.১৩২ উদ্ধৃত, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৫।

১০. মাল সংরক্ষিত থাকা। ১১. ডাকাতি ইসলামী রাষ্ট্রে সংঘটিত হওয়া। ১২. দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে অথবা আসামীর স্বীকৃতির মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া।[১]

ব্যভিচারের শাস্তি: নৈতিক, বংশধারা ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষাকল্পে এবং অশ্লীলতা ও ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। সমাজ থেকে এই নিকৃষ্ট অপরাধ প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–[২]
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে,যদি তোমরা আল্লাহে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"
–কুরআনী এই বিধানের রহস্য হল–এ অপরাধের প্রতি যাতে কেউ আগ্রহী না হয়, সেজন্য প্রকাশ্যভাবে এর শাস্তি কার্যকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ শাস্তির তীব্রতা ও জনসম্মুখে লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করে অপরাধীরা এই অপকর্মের অনাগ্রহী হবে।

ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী: ১. মুসলিম হওয়া। ২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন হওয়া। ৩. পুরুষাঙ্গ নারীর জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট করা। ৪. যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত থাকা। ৫. নারীর জননেন্দ্রিয়ে সঙ্গম করা। ৬. স্বেচ্ছায় সঙ্গম করা। ৭. ইসলামী রাষ্ট্রের যিনা সম্পন্ন হওয়া। ৮. ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষ বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া। ৯. জীবিত মহিলার সাথে সঙ্গম করা। ১০. দু'জনের একজন পুরুষ এবং অপরজন নারী হওয়া। ১১.যৌন মিলনের ব্যাপারে সন্দেহ মুক্ত হওয়া। ১২. কমপক্ষে চারজন মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ বিবেকবান, ন্যায়পরায়ন, বাকশক্তিসম্পন্ন পুরুষের চাক্ষুষ (যিনা লিপ্ত দেখেছি শব্দ ব্যবহার করে) সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং সাক্ষ্য একই মজলিসে পেশ করতে হবে। [সাক্ষি দিতে যে সব বাঁধা আছে, তার কোনটি সাক্ষিদের মধ্যে থাকতে পারবে না। চারের কম সাক্ষী বা কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলে প্রমাণ সাপেক্ষে তার জন্য রয়েছে ৮০ বেত্রাঘাত]। সাক্ষীদের প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও বিশদ হতে হবে এবং সাক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকা ১৩. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থবিবেকবান, বাকশক্তিসম্পন্ন, পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী ব্যভিচারী পুরুষ বা নারী বিচারকের নিকট চারবার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি প্রদান এবং স্বীকারোক্তির অটল থাকতে হবে।[৩]

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি: নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ মারাত্মক অন্যায় ও একটি ভয়ানক অপরাধ। ইসলামী শরীয়াত এই জঘন্য অপরাধের জন্য আশি বেত্রাঘাতের কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–[৪]
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
"আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর এরাই হলো ফাসিক।"

মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী: ১. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। ২. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া। ৩. স্বেচ্ছায় অভিযোগ আরোপ করা। ৪. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া। ৫. বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া। ৬. মিথ্যা অপবাদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। ৭. অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুমতি না থাকা। ৮. ঊর্ধ্বতন (পিতা, দাদা) বা অধস্তন(ছেলে, নাতী) কেউ না হওয়া। ৯. অভিযোগের পক্ষে চারজন সাক্ষীর অভিন্ন সাক্ষ্য পেশ করতে না পারা। ৯.অভিযুক্ত ব্যক্তি মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া।[৫]

মদ্যপানের শাস্তি: মাদকদ্রব্য সেবন একটি গুরতর অপরাধ ও ঘৃর্ণিত কাজ। এটা নানা অপরাধ ও পাপের উৎস। মদ্যপ নেশাগ্রস্ত হয়ে হত্যা, ধর্ষণসহ নানা অপরাধ করে এবং নেশার অর্থের জন্য বিভিন্ন অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়। তাই এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপরাধ দমনে ইসলামী শরীয়াত মদ্যপায়ীর চল্লিশ থেকে আশি বেত্রাঘাত শাস্তির বিধান দিয়েছে । তবে এ শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেছে। যেমন: ১. মুসলিম হওয়া। ২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থবিবেক সম্পন্ন হওয়া। ৩. বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া। ৪. মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। ৫. মাদক জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে তা সেবন করা। আর মদ সেবনের প্রমাণ পন্থা হলো: দু'জন ন্যায়বান সাক্ষী, আসামীর স্বীকৃতি,মুখে মদের গন্ধ, মাতলামি ও বমি।[৬]

অপরাধ নির্মূল ও সুশৃঙ্খল সমাজ-রাষ্ট্র গঠনে কুরআন ঘোষিত কঠোর শাস্তির বিধানের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য:
ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াও সমাজ থেকে স্থায়ীভাবে অপরাধ, অনাচার, হত্যা সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ও মিথ্যা অপবাদ, দুর্নীতি ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধ প্রতিরোধ কল্পে হদ্দের গুরুত্ব অপরিসীম। আপাত দৃষ্টিতে হদ্দ কঠোর মনে হলেও সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে এর চেয়ে বিকল্প আর কোন পথ নেই। কুরআন এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এজন্য প্রবর্তন করেছে যাথে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অপরাধ স্থায়ীভাবে বন্ধ হয় এবং সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

---

[১]. ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮১-৮৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০২।
[৩].দেখুন, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩১-১৫১; *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*(ঢাকা:ইফাবা, ১ম প্রকাশ,২০০৬),পৃ.২৭২-২৮২;
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ০৪।
[৫]. দেখুন, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৮-১৬৪।
[৬]. দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৮-১৮১।

মূলত ইসলাম ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা অপবাদ, মদপান ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের জন্য যে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে– এ সবগুলোই চরম নিকৃষ্ট গর্হিত কাজ। এতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা মানবিক গুণাবলী হারিয়ে পশুর স্তরে চরে যায়। ইসলামী শাস্তি আইনের লক্ষ্য হল- মানব সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রতিহত করা। হত্যার দ্বারা সমাজের নিরপরাধ জীবনের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয় এবং সমাজে ফাসাদ ও হানাহানি উস্কে দেয়। চুরি-ডাকাতির দ্বারা সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ব্যভিচারের দ্বারা একজন মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতাকে ধ্বংস হয়, বংশগত পবিত্রতা নষ্ট হয়, ব্যক্তির মধ্যে পাশবিকতা বৃদ্ধি পায়। মিথ্যা অপবাদের দ্বারা ব্যক্তির সম্মান-মর্যাদাহানী ঘটে, দুর্বৃত্তরা প্রতিহিংসা চারিতার্থ করতে এ অন্যায়ে লিপ্ত হয়–যা সমাজে অশান্তির জন্ম দেয়। মদ পানের দ্বারা বিবেক বিলোপ ঘটে, আর বিবেক বিলোপ হলে মানুষ যে কোন অন্যায় করতে পারে। তাই এ সংক্রান্ত কুরআনী বিধান অযৌক্তিক বা অন্যায় নয়।

যারা এ সংক্রান্ত কুরআনী বিধান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন তারা প্রকৃত বিষয়টি না বুঝে সমালোচনা করে থাকেন। কারণ হুদুদ শাস্তি যেমন কঠোর তেমনি এগুলোর অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও কঠোর। নির্ধারিত শর্তসমূহের একটি শর্ত না পাওয়া গেলে তা কার্যকর হবে না। যেমন কুরআন ব্যভিচারের শাস্তির প্রদানের ক্ষেত্রে একই সাথে চার জন পুরুষ সাক্ষী কর্তৃক সরাসরি ব্যভিচারে লিপ্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা শর্ত আরোপ করেছে। বাস্তবে এটা কঠিন। ফলে শরীয়তের নির্ধারিত শর্ত পূরণের পর হদ কমই ঘটে। আর চার জন পুরুষের উপস্থিতিতে একজন মানুষ তখনই এরূপ হতে পারে যখন সে ব্যাপকভাবে ব্যভিচারে অভ্যাস্ত হয় এবং এটাকে অপরাধ মনে করে না। কাজেই এরূপ ঘৃণ্য অপরাধীর জন্যই এই কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। আর ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতদের শাস্তি কঠিন কারণ– বিবাহিতদের বৈধ যৌনচাহিদা পূরণের ক্ষেত্র রয়েছে; প্রয়োজনে স্বামীর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। স্বামী যৌন অক্ষম হলে ঐ স্বামীকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীকে অধিকার দেয়া হয়েছে। এরপরও যদি কেহ বৈধ পথ বর্জন করে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে সমাজকে অপবিত্র করে তবে সে সমাজের বিষাক্ত কীট, সে বেঁচে থাকলে সমাজ তার বিষাক্ত ছোঁবলের দ্বারা অপবিত্র হতে থাকবে তাই কুরআন তাকে পাথর মেরে হত্যার বিধান দিয়েছে। এভাবে সমাজকে স্থায়ী পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখার জন্য ব্যভিচারের কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে।

ইসলাম ক্ষুধা-দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত অভাবে তাড়নায় সামান্য কিছু চুরি করার ক্ষেত্রে কুরআন হাত কাটার বিধান দেয়নি। বরং কুরআন সেই সব দাগী চোরের হাত কাটার বিধান দিয়েছে, যারা পেশাদার চোর। যাদের কারণে সমাজে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এবং ঐসব দুর্নীতিবাজ কর্মচারী-কর্মকর্তা, যারা রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ চুরি ও লুটপাট করে খায় তাদের হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন–কোন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারীভাবে নিযুক্ত অনেক কর্মচারী-কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় গ্রহণ করে থাকে। যা ইসলামী বিধানে সুস্পষ্টভাবে চুরির আওতার মধ্যে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি অভিযুক্ত কর্মচারী-কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি বা মন্ত্রীর দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি কাটা হতো এবং তা গণমাধ্যমে তা প্রচার হত তাহলে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয়ে দুর্নীতিবাজরা আর দুর্নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ চুরি ও লুটপাট করার সাহস করত না। এভাবে এক বা দু'জন অপরাধীকে শাস্তি দিলে অন্য সব অপরাধী সতর্ক হয়ে অপরাধ ছেড়ে দিত। ফলে সমাজ থেকে দুর্নীতি ও চুরির বন্ধ হয়ে যেতো। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মদীনায় রাসূল সা. প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র,তৎপরবর্তী খুলাফা রাশেদা এরপর উমাইয়া ও আব্বাসী আমল থেকে ১৯২৪ সালে তুর্কী খিলাফত পতনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে শরীয়াহ আইন-কানুনের ভিত্তিতে বিচারালয় পরিচালিত হত। শরীয়াহ আইন চালু থাকার ফলে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ, মদ-জুয়া, ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দেয়নি।

উল্লেখ্য যে, হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা অপবাদ, মদপান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের শাস্তির বিধান কার্যকরের কর্তৃত্ব সরকারের কিংবা সরকার স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা বা গ্রাম্য সালিসে এ সব শাস্তি প্রয়োগের কোন অধিকার নেই। কারণ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা বা গ্রাম্য সালিসে বিজ্ঞ আলিম ও বিচারক সাধারণত থাকে না। তাই অনেক মাতবর স্বীয় স্বার্থ হাসিল, ক্ষমতা প্রর্দশন বা আক্রোশ মিটাতে স্বার্থান্বেষী মহল অল্পশিক্ষিত ও অদূরদর্শী ব্যক্তিকে ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধি করে। তাই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এটা বাস্তবায়ন করলে সে ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী হবে।

> হদ্দ প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি বা নির্দয়তা নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ সাধনই এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য। হদ্দ কায়েমের লক্ষ্য হল, মানুষকে তাদের নিজেদের জন্য ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে নিবৃত রাখা। যেমন ডাকাতির হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হল, যে কোন ধরনের ধংসাত্মক ও অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস ও চেষ্টা থেকে রাষ্ট্রের শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা। যিনার হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হল, মানব বংশকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ রাখা। চুরির হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হল, জনগণ ও সরকারের সম্পদ ও মালামালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। মিথ্যা অপবাদের হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হল, মানুষের মান মর্যাদার যথার্থ হিফাযত করা। মাদক গ্রহণের হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হল, মানবতার বিবেক বুদ্ধির সুস্থতা সুরক্ষা করা। মুরতাদের হদ্দ কার্যকর করার উদ্দেশ্য হল, ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন থেকে মানুষকে বিরত রাখা। খুনের দন্ড কার্যকর উদ্দেশ্য হল, মানব জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা।[১]

[১]. আল বাহরুর রায়িক, উদ্ধৃত, *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*. (ঢাকা: ইফাবা, ২য় সং ২০০৮), খ.০২, পৃ.১১৬।

সকল শর্ত পাওয়ার পর হদ্দ কার্যকর করা এজন্য জরুরী যে, এরূপ পাপী অপরাধীর কঠোর শাস্তি দেয়া হলে সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পেতে থাকতে এবং মানব সমাজের বৃহৎ কল্যাণ ক্ষুন্ন হবে।

হদ্দ কার্যকর করার ফলে মানুষ পাপাচারিতা থেকে বিরত থাকে। এতে সমাজে কল্যাণ নাযিল হয় এবং নানান প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও অকল্যাণ দূরীভূত হয়। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"*পৃথিবীতে একটি হদ্দ জারি করা পৃথিবীবাসীর জন্য চল্লিশ দিনের প্রাতকালীন বৃষ্টি বর্ষণ অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর।*"[১]
এটা এজন্য যে, গুনাহর দ্বারা রিযকের মাত্রা হ্রাস পায় এবং অন্তরে শত্রুভীতি সঞ্চারিত হয়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এটা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে, হদ্দ জারিতে আল্লাহর অবাধ্যতা হ্রাস পেয়ে অপরাধের মাত্রা কমে আসে। কাজেই পাপাচার হ্রাস পাওয়ার ফলে বান্দার রিযক ও সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্য নাযিল হয়।[২]

গ.তা'যীর(সাধারণ দণ্ড)/অন্যান্য অপরাধের শাস্তি: তা'যীর শব্দের আভিধানিক অর্থ–ফিরিয়ে রাখা বা বারণ করা। পরিভাষায় তা'যীর হল, শিষ্টাচার শিক্ষামূলক শাস্তি, যা এমন সব অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে যেখানে কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত শাস্তির বিধান নেই কিন্তু ঐসব অপকর্ম শরী'আতে নিষিদ্ধতার প্রমাণ রয়েছে।
বস্তুত আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের শাস্তি শরী'আত নির্ধারণ করেনি এমন সব অপরাধের শাস্তিই তা'যীর-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরণের শাস্তি নির্ধারণ করার দায়িত্ব ইসলামী আদালতের বিচারকের। এর উদ্দেশ্য সুস্থ আচরণ শিক্ষা দেয়া, সংশোধন করা ও ভবিষ্যত শৃঙ্খলা মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করা।

তা'যীরি শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন: নসীহত বা উপদেশ করা, তিরস্কার কিংবা সতর্ক করা, অপমান করা, গ্রেফতার বা আটক করা, বেত্রাঘাত করা, বন্দী করা, নির্বাসন বা দেশ থেকে বহিষ্কার করা, শূলে চড়ানো, বয়কট, ঢোল-শাহরত, প্রচার ও মাইকিং করা, আদালতে তলব, চাকুরীচ্যুত করা, সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়া, উপায়-উপকরণ ও সম্পদ নষ্ট করা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, আর্থিক দণ্ড, এমনকি বড় ধরনের অপরাধের কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াও যেতে পারে, যদি শাসক এটিকে যথোপযুক্ত মনে করেন। এক্ষেত্রে শাসককে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, সমাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পারেন যদি এর দ্বারা সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।[৩]

তা'যীরি যে সব শাস্তি অবৈধ: ক.অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বা ভেঙ্গে দেয়া। খ.চেহারা বা স্পর্ষকাতর স্থানে প্রহার করা। গ.ক্ষুধা-পিপাসায়, আগুন জ্বালিয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে কিংবা ঠাণ্ডা-গরমে শাস্তি দেয়া। ঘ. বিবস্ত্র করা। ঙ. চরম অপমানকর শাস্তি দেয়া। চ. অভিশাপ দেয়া। ছ. নামাজ আদায় বা হাজত পূরণে বাধা দেয়া। জ.গলা টিপে ধরা বা চপেটাঘাত করা।[৪]

❑.বিধি-বিধান ও শাস্তি প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন :

অপরাধীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিকভাবে যাচাই ছাড়া অপর্যাপ্ত সাক্ষী, অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য, পূর্বশত্রুতা, মন্দ চিন্তা কিংবা ভুল ধারণার উপর ভিত্তি কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে ইকরামা রহ. বলেন, উমর রা. আবদুর রহমান ইবন আওফ রা কে বললেন, *যদি তুমি শাসক হও, আর তুমি কোন ব্যক্তিকে হদ্দের কাজ (যিনা বা চুরিতে) লিপ্ত দেখ, তাহলে তুমি কি করবে, উত্তরে তিনি বললেন, (আপনি শাসক হওয়া সত্তেও) আপনার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের মতই। উমর রা. বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো।*[৫]
বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রতিটি তথ্য সঠিকভাবে যাচাইয়ের পর চূড়ান্ত সত্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে শাস্তি নির্ধারণ করা। কোন একপক্ষের কথার ভিত্তি করে তথ্য সঠিকভাবে যাচাই ছাড়া তাড়াহুড়া করে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে[৬]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।" অন্যত্র এসেছে[৭]-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায় তাকে বলবে না যে, 'তুমি মুমিন নও'। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র কাছে প্রচুর গনীমত আছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।"

---

[১].মূল আরবী [حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবু কাত্বয়ি সারিক্ব, হাদীস নং ৪৯০৪।
[২]. ইবন তাইমিয়াহ, *আস-সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ*, (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, তা.বি) পৃ.৮৭।
[৩]. দেখুন, ড.আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, *প্রাগুক্ত*,পৃ.৩১৪-৩২২।
[৪]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২৩-৩২৬।
[৫]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, অনুচ্ছেদ-বিচারক নিজে বিবাদের সাক্ষ্য হলে থেকে উদ্ধৃত।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৯৪।

উদ্ধৃত আয়াত দু'টির প্রথমটিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিরুদ্ধে পরিবেশিত যে কোন অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে সত্যতা যাচাইয়ের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে তার সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা যাচাই ছাড়া প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তড়িৎ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা ভুল হতে পারে। পরবর্তী আয়াতে ভুল ধারণার ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এ কারণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অনুরূপভাবে নিছক অনুমান কিংবা ভুল ধারণার ভিত্তিতে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়া যাবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[১] (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) "হে মু'মিনগণ! তোমার অধিক অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমান পাপ।"

বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের যুক্তি-তর্কের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন জরুরী। এ ব্যাপারে বাদী-বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের সতর্ক হওয়া উচিত। মিথ্যা কথা বলে কিংবা অন্যায়কে কথার মারপ্যাচে ন্যায় বানিয়ে অন্যায়ভাবে কাউকে হারিয়ে বিচারে জয়ী হওয়া কোন বিজয় নয়, বরং তা বড় ধরনের নৈতিক পরাজয় ও পরকালে জাহান্নামের কারণ। এ প্রংসঙ্গে উম্মে সালামা রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, (একদিন) তিনি সা. তাঁর কামরার দরজার নিকট ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট চলে আসেন। (তাঁর নিকট মামলা পেশ করা হলে) তিনি বলেন,

> আমি একজন মানুষ। আমার কাছে বিবাদকারীরা আসে। তাদের মধ্যে হয়ত কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলছে। তদনুযায়ী আমি তার পক্ষে রায় দেই। সুতরাং বিচারে যদি আমি অন্য মুসলিমের হক তাকে দেই তবে তা দোযখের একটা টুকরো। এখন ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।[২]

❑.সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অসত্যের অবসান এবং কুপ্রবৃত্তি দমনে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা/ জিহাদ (الجهاد):

সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অসত্যের অবসান এবং কুপ্রবৃত্তি দমনে চূড়ান্ত প্রচেষ্টার আরবী নাম *জিহাদ*। এটি কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শাশ্বত বিধান ও বিশেষ অর্থবোধক পরিভাষা।কিন্তু বিভিন্ন সময় কিছু সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী নিজেদের সন্ত্রাসী কর্ম, বাড়াবাড়ি ও অপকর্মকে জিহাদ বলে চালিয়ে দেয়ার কারণে বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ *জিহাদ* কে একটি আতঙ্ক ও সন্ত্রাসী কর্ম বলে গণ্য করে থাকেন। এ বিষয় নিয়ে কথা উঠলে অনেক নিষ্ঠাবান মুসলিমও হীনমন্যতায় ভোগেন এবং একে অযাচিত কাজ গণ্য করেন। তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা দরকার।

আরবী *জিহাদ* শব্দের অর্থ–চূড়ান্ত চেষ্টা করা, কঠোর পরিশ্রম বা সাধনা করা, কোন কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা, ইত্যাদি। পরিভাষায়,"জিহাদ হল পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন(ইসলাম) সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জীবন-সম্পদের মাধ্যমে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।" কেউ কেউ বলেন,"অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার নিমিত্তে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে যুদ্ধ করা।" কারো কারো মতে,"কাফিরদের মধ্যে যাদের সংগে চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই যারা ইসলামের জন্য হুমকি তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করা।" মূলকথা হল, দ্বীনের (ইসলাম) জন্য যে কোন ধরনের চেষ্টা-সাধনা করাই জিহাদ। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধকে কিতাল বলা হয়। (কিতাল বা সশস্ত্র সংগ্রাম জিহাদের চূড়ান্ত স্তর। কিতালের কিছু শর্ত রয়েছে, যা ছাড়া তা বৈধ নয়।) কুরআনে জিহাদ শব্দটি ০৪বার, মুজাহিদূন ০১বার, মুজাহিদীন ০৩বার এবং বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ৩২বার সহ মোট ৪০ বার এসেছে।

আল্লাহর পথে জিহাদ কয়েকভাবে হতে পারে। যেমন– *ক. ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি ভিত্তিক জিহাদ*: যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের মোকাবেলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, মেধা-যোগ্যতা, প্রচার-প্রচরণা, বক্তৃতা, লিখনী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও শাশ্বত শিক্ষা তুলে ধরা। তাদের অপতৎপরতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞান, মেধাগত যোগ্যতা ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন[৩]–فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا "সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি এর সাহায্যে(কুরআনের) তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর।"

উল্লেখিত আয়াতে(بِهِ) দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এবং কুরআন তথা জ্ঞানের দ্বারা জিহাদকে সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। বর্তমান মুসলিমদের এই জিহাদ মুখ্যভাবে করা উচিত। এ সম্পর্কে মও. মুহাম্মদ মুশাহিদ(মৃ.১৯৭০) বলেন

> সকল প্রকার জিহাদের মধ্যে জ্ঞানের সাহায্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামের প্রকৃত প্রাণশক্তি এই জিহাদের ভেতরই নিহিত। এরই সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে–ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, দুনিয়াজয়ী ধর্মের মর্যাদা লাভ করেছে। যদি এর পথে ইসলামের দুশমনেরা অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতো তবে দুনিয়ার বুকে কোন সত্য সন্ধানী অন্তর আত্মাই ইসলাম কবুল ব্যতিরেকে থাকতে পারতো না।[৪]

খ.কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: তা হলো কু-প্রবৃত্তি (যা মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে) এবং মানুষের চরম চিরশত্রু ইবলিস ও তার দলবলের বিরুদ্ধে চিরন্তন লড়াই। স্বীয় প্রবৃত্তির সব ধরনের অবৈধ কামনা-বাসনা ও অন্যায়

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১২।

[২].মূল আরবী [أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাযালিম, হা.নং২৩২৬; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আকদিয়া, হা.১৭১৩।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ৫২।

[৪]. মওলানা মুহাম্মদ মুশাহিদ, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তারাধিকার*, অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮) পৃ.১৯০।

চাওয়া-পাওয়া এবং শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিহত করে নিজকে সার্বক্ষণিক আল্লাহর পথে অটল-অবিচল রাখাই কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। এ জিহাদকে কেউ কেউ বড় জিহাদও বলে থাকেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ-"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।" এ জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন–'যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে আল্লাহর অনুগত বানানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সে প্রকৃত মুজাহিদ।'[২]

গ.শত্রুদের দ্বারা ইসলাম, মুসলিম জাতি ও দেশ আক্রান্ত হলে জিহাদ: কাফির, মুশরিক বা শত্রুরাষ্ট্রের দ্বারা যদি ইসলাম, মুসলিম জাতি ও দেশ আক্রান্ত হয় এবং ইসলাম, মুসলিম জাতিসত্তার ও দেশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়ে তখন প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। এ পর্যায়ে জিহাদ বিভিন্নভাবে হতে পারে। এক্ষেত্রে জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায় হলো সশস্ত্র যুদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ "হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও তাদের প্রতি কঠোর হও; তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যবর্তনস্থল!"

জিহাদ সাধারণভাবে ফরজে কিফায়া। তবে যখন মুসলিম জনপদ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন জিহাদ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মু'মিন নর-নারীর উপর ফরয। এ থেকে পিছে থাকার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন মুসলিম জিহাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তবে মুনাফিক হিসেবে সে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।"

যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রামের (জিহাদ) ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা: আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ হত্যা করা কঠিন মহাপাপ। তবে ইসলাম কেবল দু'টি পন্থায় মানুষ হত্যার অনুমতি দিয়েছে। প্রথমত: আদালতের বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে হত্যা এবং দ্বিতীয়ত: অনুমোদিত সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধে। তবে ইসলাম সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নৈতিক বিধান ও শর্ত আরোপ করেছে। যথাপোযুক্ত কারণ ও মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কারো বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া যাবে না। ইসলাম যুদ্ধের এই মূলনীতি দিয়েছে মানব সমাজকে ব্যাপক ক্ষতি থেকে বাঁচাতে। আর ইসলাম যুদ্ধ ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব কম রক্তপাত ঘটাতে নির্দেশ দিয়েছে। এটা অনেকটা ক্যান্সারে আক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে অঙ্গ সার্জারীর মাধ্যমে কেটে ফেলার মত বিষয়। তাই জিহাদের শর্তগুলি পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদের নামে অস্ত্র ধারণ করে বা হত্যাকাণ্ড চালায় তবে সে ব্যক্তি কঠিন মহাপাপে লিপ্ত হবে। আবার জিহাদের সব শর্ত পূরণ হওয়ার পরেও যদি কেউ জীবনে জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তার পাপ হবে। ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কিংবা যুদ্ধে বিজয়ের পর যে সব শর্ত ও নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো–

•সশস্ত্র জিহাদের প্রথম শর্ত ইসলামী রাষ্ট্র[৫] ও রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় চরম নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও সশস্ত্র জিহাদে লিপ্ত হননি। রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ও নেতৃত্ব ছাড়া কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সশস্ত্র জিহাদের ঘোষণা বা অনুমতি প্রদান করতে পারে না। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন ছাড়া জিহাদের সুযোগ নেই। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৬], "রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢালস্বরূপ, যার নের্তৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং দুশমনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।"

•মুসলিম রাষ্ট্র বা তার নাগরিকগণ অন্য কোনো রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হওয়া অথবা এরূপ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা যখন প্রকাশিত হবে তখন কিতাল বা সশস্ত্র জিহাদ বৈধ হবে। মূলকথা, যুদ্ধ হতে পারে আত্মরক্ষার জন্য, অথবা দুর্বলদের সাহায্যের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন[৭]– أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ "যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদের, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের বিজয় দানে সক্ষম।" অন্যত্র বলেন[৮], فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا "সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।"

•সশস্ত্র যুদ্ধের পূর্বে প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করা। যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে জিযিয়ার বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব পেশ করা। যদি এ দু'টির কোনটি গ্রহণ না করে শেষ উপায় হিসেবে সশস্ত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯: আয়াত ৬৯। আল-কুরআন ৯০:১১-১৭।

[২].মূল আরবী [المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله عز و جل] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২২, হাদীস নং ২৪০১১।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৭৩।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৪১।

[৫]. ইসলামী রাষ্ট্র : আল-কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সংগঠিত এবং পরিচালিত আদর্শবাদী রাষ্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র।- শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র* , *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫২।

[৬].**মূল আরবী** [إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৭৯৭, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৪১।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৩৯।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৯১ ।

•সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধ শুধু শত্রু সৈন্যের সাথে কিংবা তাদের সহায়তাকারীদের সাথেই করা। কোন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। যুদ্ধ বা জিহাদের নামে সন্ত্রাস, অকারণে প্রাণ হত্যা ও নৈরাজ্য সৃষ্টিসহ কোন ধরনের অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]- وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

•সশস্ত্র জিহাদ বা যুদ্ধে নারী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও নিরপরাধ সাধারণ লোকদের হত্যা করা যাবে না। কোন বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, কোন ধ্বংসযজ্ঞ চালানো যাবে না। এ মর্মে রাসূলুলাহ (সা.) বলেন, যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না।[২]

অনুরূপভাবে কোনো বৃদ্ধ বা অসুস্থ মানুষকে হত্যা করা যাবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস করা যাবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করা যাবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটা যাবে না। প্রথম খলিফা আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণের প্রাক্কালে তাদেরকে দশটি নির্দেশ দেন। নির্দেশগুলো হলো[৩]:

১.তোমরা খিয়ানত করবে না। ২. বাড়াবাড়ি করবে না। ৩. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, ধোঁকার আশ্রয় নেবে না। ৪. কোনো মৃতদেহ বিকৃত করবে না। ৫. কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না। ৬. কোনো বৃদ্ধ ও মহিলাকে হত্যা করবে না। ৭. খেজুর গাছ/বৃক্ষ উচ্ছেদ করবে না, ফসলের ক্ষেত যেন পোড়াবে না। ৮. ফলবান গাছ কাটবে করবে না। ৯. খাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া ছাগল, গরু ও উষ্ট্রী হত্যা করবে না। ১০.কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে কষ্ট প্রদান করবে না এবং কোন উপাসনালয় ভাঙ্গবে না।

এই অমূল্য উপদেশসমূহে ইসলামের সশস্ত্র জিহাদের নৈতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। তবে সামরিক লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরও কিছু নৈতিক বিধান রয়েছে। তা হলোঃ ক.অতর্কিত আক্রমণ না করা। খ.আগুনে না পোড়ানো। গ. নির্যাতনপূর্বক কাউকে হত্যা না করা। ঘ. লুটতরাজ না করা। ঙ. সম্পদ নষ্ট না করা। চ.লাশ বিকৃত না করা। ছ. দূত হত্যা না করা। জ. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করা। ঝ. উচ্ছৃংখলতা ও নৈরাজ্য না করা। ঞ. হাঙ্গামা ও গোলযোগ সৃষ্টি না করা।[৪]

•বিশেষ পবিত্র স্থান, নিরাপদ অঞ্চলে ও নির্দিষ্ট কিছু সময়ে যেমন মক্কায় ও হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ না করা। মহান আল্লাহ বলেন[৫]- (وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِين) "এবং তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদের হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান।"

• শত্রুপক্ষ এবং যে সব জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে যে সব চুক্তি ও অঙ্গীকার রয়েছে তার সবটুকু রক্ষা করা। এমনকি কৃত চুক্তির কোন শর্ত যদি নিজেদের জন্য ক্ষতিকরও হয় কিংবা প্রতিকূলে যায় তবুও তা পালন করা।[৬] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা অংগীকার পূর্ণ করবে।' অন্যত্র বলেন[৮]- وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ "তাদের চুক্তির পর তারা যদি তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রুপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি রইল না; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।"

উল্লেখিত নীতির ভিত্তিতে কোন অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে অনুমতি নিয়ে আসে এবং সে যদি গুপ্তচরবৃত্তি বা ষড়যন্ত্র না করে তবে তার পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা রাষ্ট্র ও সকল মুসলিম নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

•প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা না থাকলে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া যাবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৯]– وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ- "নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।"

• যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুর ভয় না করা।[১০] যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাকা, ধৈর্য ও সাহস না হারানো। মহান আল্লাহ বলেন[১১]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ- وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯০।
২. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ১৭৩১; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০১, পৃ.৩০০, হাদীস নং ২৭২৮।
৩. ইবন জারীর আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.২৪৬।
৪. দেখুন, সাইয়েদ আবুল 'আলা, *আল-জিহাদ*, ভাষান্তর: আকরাম ফারুক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩) পৃ.২৩২-২৪৪।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯১, আল-কুরআন ৯:৩৬।
৬. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ৯১-৯২।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০১।
৮. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯ : আয়াত ১২, আল-কুরআন ৮:৫৮।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৫,আল-কুরআন (০৪:২৯)।
১০. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৫৬; আল-কুরআন ৩:১৫৪, ৪:৭৭-৭৮, ৩:১৭১-১৭৪।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৪৫-৪৬, আল-কুরআন ৩:১৩৯,২০০।

“হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও। আর তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

• সংখ্যাধিক্য বা অস্ত্রশস্ত্রের বিপুলতায় নির্ভর না করে আল্লাহর পূর্ণ নির্ভর করা।[১] দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে লড়াই করা। শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদের ময়দান বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে থেকে পালায়ন না করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ- وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।”

•জিহাদ বা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের কাফিরদের নিকট আত্মসমর্পণ না করা। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ “অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না ও সন্ধির আহ্বান করো না এবং তোমরাই প্রবল। আর আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথেই রয়েছেন এবং কখনই তিনি তোমাদের কর্মফল হ্রাস করবেন না।”

•ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত প্রতিহিংসা চারিতার্থ করার জন্য বা জাগতিক কোন স্বার্থে জিহাদ করা যাবে না। জিহাদ করতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য, তাঁরই পথে এবং তার নির্দেশিত পন্থায়। মহান আল্লাহ বলেন-[৪] الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ “যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।”এ মর্মে রাসূল সা. বলেন[৫], “যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে সংগ্রাম করে, গোষ্ঠীর ভালবাসার কারণে ক্রুদ্ধ হয়, গোষ্ঠীর ভালবাসার দিকে আহবান জানায় কিংবা গোষ্ঠীর সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লক্ষ্য থাকে না) সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।”

•যুদ্ধে বিজয়ের পর কোন প্রকার গর্ব, সীমালঙ্ঘন বা মন্দ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা যাবে না। যারা আনুগত্য স্বীকার করবে তাদের জান-মালকে অবিকল মুসলমানদের জন-মালের মত নিরাপত্তা দিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৬] – وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ “ তারা তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। ”

এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ্য যে, মক্কাবাসী রাসূল সা. ও সাহাবীদের সাথে চরম নির্যাতন করে তাদের মদীনায় হিজরতে বাধ্য করেন। রাসূল সা. পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মক্কাবাসীর সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সা. মক্কাবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন[৭]–(لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ) “আজ তোমাদের উপর কোন ভর্ৎসনা নেই, আল্লাহ্‌ তোমাদের ক্ষমা করুন।”

এ কাজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব: পৃথিবী থেকে সব ধরনের অন্যায়, অবিচার, ফিৎনা-ফাসাদ ইত্যাদি নির্মূল করা। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত ও সাহায্য করা। কাফিরদের ষড়যন্ত্র, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি ও দম্ভ চূর্ণ করা। সত্য-ন্যায়, শান্তি-নিরাপত্তা, ইসলাম ও পূণ্যবান মু'মিনদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা এবং ইসলামকে হিফাযত ও বিজয়ী জন্য মহান আল্লাহ জিহাদের বিধান দিয়েছেন।[৮] মহান আল্লাহ বলেন[৯] – وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ “আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালিদেরকে ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না।” অন্যত্র বলেন[১০], هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ “তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।”

উল্লেখিত আয়াতে (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ) *ফিতনা* বলতে শিরক ও কুফরের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফিতনা উদ্দেশ্য। আর (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ) বলতে দ্বীনের বিজয় ও কর্তৃত্ব উদ্দেশ্য। এরপর (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) দ্বারা দ্বীনের এ

---

[১]. আল-কুরআন ০৯:২৫-২৬।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ১৫-১৬।

[৩]. আল-কুরআন ৪৭:৩৫ আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:১৯২-১৯৩, ৮:৬১-৬৩, ৪:৯৪।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৭৬।

[৫].মূল আরবী[ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাত, হা.নং ১৮৪৮; *সুনান আন-নাসাঈ*,হা.৪১১৪।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা ০৫: আয়াত ০২

[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৯২।

[৮]. দেখুন- আল-কুরআন, ২২: ৩৮-৪১; ৪:৭৪-৭৬, ৯:১৩-১৬, ৪৭:১, ৪-৮, ৮:৩৯-৪০, ২১:১০৫-১০৬, ২৪:২৫, ৬১:৯।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৩। এছাড়াও আল-কুরআন, ০৮: ৩৯।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্‌ফ ৬১: আয়াত ০৯; । এছাড়াও আল-কুরআন ৯:৩৩, ৪৮:২৮।

পরিমাণ শক্তি ও কতৃত্ব অর্জিত হবে যে, কুফরী শক্তির সামনে তার পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং দ্বীন ইসলাম কুফরের ফিতনা থেকে পুরোপুরি নিরাপদ হয়ে যাবে।

কোন যালিম কাফির যদি কোন অসহায় মুসলিমের প্রতি যুলম করে তবে তা প্রতিরোধ করা কিংবা অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার মুক্তির জন্য ইসলাম জিহাদের নির্দেশ দেয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা।"[১] জিহাদের আংশিক এ ধরনের উদ্দেশ্য তথা শত্রু দমন ও নির্যাতিতদের রক্ষায় তো আজ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সেনাবাহিনী গঠন করে এবং বিধ্বংসী অস্ত্র দিয়ে তাদের সজ্জিত করে। তাই এটা জিহাদের সবর্জন স্বীকৃত অনুমোদিত একটি ক্ষেত্র। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন[২]–

وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا-

"তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহ্র পথে অসহায় নর-নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ, যার অধিবাসী যালিম, তা হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট হতে কাউকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকেও আমাদের সহায় কর।"

শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে ভারসাম্য রক্ষা, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য দমন ও আত্মরক্ষার্থে ইসলামে জিহাদ এক কল্যাণকর বিধান। সত্য-মিথ্যার সংঘাত ও নিপীড়ক-নিপীড়িতের দ্বন্দ্বে এটা ন্যায়সঙ্গত কর্মনীতি। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে[৩] وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ "আর আল্লাহ্ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল।"

ইসলাম ও মানবতা দুশমন, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সত্যত্যাগী যালিম কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি উৎখাতসহ সকল অপশক্তির মূলৎপাটন এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪]

(قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)

"তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না, এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না; যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্য়া দেয়।"

উল্লেখিত আয়াতে জিযিয়ার(الْجِزْيَةَ) বিধানের হিকমত সম্পর্কে ফখরুদ্দিন আল-রাযী (মৃ. ৬০৬হি./১২০৯খৃ.) বলেন[৫]–

জিযিয়ার উদ্দেশ্য কাফিরকে কুফরীর আবস্থায় বাকী রাখা নয় বরং উদ্দেশ্য হল তাকে বাঁচিয়ে রেখে কিছু দিন সময় দেয়া, যে সময়ের মধ্যে তার ব্যাপারে এ আশা হবে যে, সে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকন করে কুফর থেকে ইসলামের দিকে আসবে। ... অতএব কাফেরদের কিছু দিন সময় দেয়া হবে এবং ইসলামের প্রভাব দেখবে তার সত্যতার দলীলসমূহ শুনবে এবং কুফরের লাঞ্ছনা দেখবে তখন এসব বিষয় তাকে ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে। বস্তুত জিযিয়া বিধিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই।

জিহাদ মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধান, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যুগে যুগে সৃষ্ট ফিৎনা-ফাসাদ নির্মূলে এটা কার্যকরী পন্থা।[৬] এ ব্যাপারে মু'মিনদের হীনবল হওয়া, কোনরূপ গরিমসি করা কিংবা অপব্যাখ্যা করে তা থেকে দূরে সরে আসার কোনই সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষায় বলেন[৭]–

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।"

উদ্ধৃত আয়াতে জিহাদের প্রতি গড়িমসি ও অনীহা পোষণকারী ব্যাক্তিদের প্রতি কঠোরভাবে সতর্ক বার্তা প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিদান ও পুরস্কার: জিহাদের মাধ্যমে আসমানী আযাব-গযব দূরীভূত হয়। জিহাদকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা, জান্নাত ও মহাপুরস্কার। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৮] – إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ "যারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করেরে সারিবদ্ধভাবে

---

[১].মূল আরবী [جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৫০৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৭৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫১। আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৪০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ২৯।
[৫]. ফখরুদ্দীন আল-রাযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৬, পৃ. ২৭, ৩৩-৩৪।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪৬-১৪৭।
[৭].আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ২৪। আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৯:১১১।
[৮].আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্ফ ৬১: আয়াত ০৪।

সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।" মহান আল্লাহ আরও বলেন[১]– وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ "আর যারা আল্লাহ্‌র পথে জীবন দিয়েছে,তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিয্‌ক দেয়া হয়।" অন্যত্র আরও বলেন[২] –

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ-تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
>
> হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন–সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম আবাসগুলোতেও, এটাই মহাসাফল্য।

জিহাদ আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন[৩]–"আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।" আবূ যার রা. বলেন[৪], আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা'।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতি কাফিরদের দ্বারা নির্যাতিত হতে থাকবে, তাদের উপর একের পর এক অন্যায় ও যুলুম চলতে থাকবে। অন্যদিকে, বিশ্ববাসীর মন-মগজে নৈরাজ্যসৃষ্টিকারী যালিম কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে তাদের কুফরী বিধি-বিধান, নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ প্রচলিত থাকবে, তাদের ক্ষমতা ও কতৃত্ব বিজয়ী থাকবে আর মুসলিমরা চুপ থাকবে-এ সুযোগ নেই। তবে যদি কাফিরদের প্রতিপত্তি নির্মূলের প্রয়োজনীয় শক্তি মুসলিমদের না থাকে তবে শক্তি অর্জন পর্যন্ত তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যেতে পারে। কিন্তু শক্তি অর্জনের পরও যদি মুসলিমরা জিহাদ পরিত্যাগ করলে তাদের উপর আপতিত হবে চরম লঞ্ছনা-বঞ্ছনা। বর্তমান বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতির লাঞ্ছনার কারণ এটাই। মহান আল্লাহ বলেন[৫] – إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও, তবে তিনি তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"এই দুরবস্থা থেকে সতর্ক করতে

> রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন[৬], তোমরা যখন গরু-বাছুরের লেজ ধরে থাকবে, ক্ষেত-খামারের উৎপাদনে তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর আরোপ করবেন এমন লাঞ্ছনাকর জীবন যা থেকে মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের দীনে ফিরে আসবে।
>
> রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন[৭], সবার আগে যে তিনজন বেহেশতে প্রবেশ করবে তাদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। শহীদ, হারাম ও সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে ও অপরের কাছে হাত পাতা থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং উত্তমরূপে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী ও মনিবদের কল্যাণকামী গোলাম।

জিহাদ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও শ্রেষ্ঠতম 'আমল।[৮] মু'নাফিক ব্যতীত কেউ এই বিধানের ব্যাপারে আপত্তি করতে পারে না। জিহাদের ব্যাপারে অনীহা পোষণকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূল সা. বলেন[৯]-"*যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করেনি, এমনকি জিহাদের আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেনি, সে মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল।*"

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ বনাম জিহাদ: ইসলাম বিদ্বেষীমহল সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এবং ইসলামের জিহাদকে এক মনে করেন। অথচ জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের এটা জানা উচিত, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের নাবী মুহাম্মাদ সা. কে জগতবাসীর জন্য শান্তি ও রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। ইসলাম মানুষকে শান্তির পথে আহ্বান জানায়। ইসলামের অবির্ভাব হয়েছে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অশান্তি দূরীভূত করার জন্য। তাই ইসলামে সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই। তবে ইসলাম আত্মরক্ষার্থে, যুলম প্রতিরোধ, শত্রুদমন ও অসহায়-নির্যাতিতদের সাহায্যের ইসলাম শর্তসাপেক্ষে যুদ্ধ বা জিহাদের অনুমতি দেয় [শর্তগুলো পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে]। সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী ছাড়া যেমন যুদ্ধ বা সশস্ত্র জিহাদের সুযোগ নেই তেমন কোন অন্যায় উদ্দেশ্যে এর অনুমতি নেই। তাই স্বার্থান্বেষী কোন গোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বা জিহাদের ঘোষণা দিলেই অন্ধভাবে তাতে অংশগ্রহণের সুযোগ কোন মুসলিমের নেই।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৬৯, আল-কুরআন ০৪:৭৪।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্ফ ৬১: আয়াত ১০-১২।

[৩].মূল আরবী [لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, হা.নং ২৬৩৯,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হা. নং ১৮৮০।

[৪].মূল আরবী [أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইতক্ব, হাদীস নং ২৩৮২, *সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল ঈমান, হা.নং ৮৪।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৩৯।

[৬].মূল আরবী [إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল ইজারাহ, হা.৩৪৬২।

[৭]. মূল আরবী [من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু ফাদাইয়লিয জিহাদ, হাদীস নং ১৬৪২।

[৮]. আল-কুরআন, ০৯: ৩৬-৪১;৬১:১০-১৩।

[৯]. মূল আরবী [من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৯১০।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিছু উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কে গভীর ও সঠিক জ্ঞান অর্জন না করেই জিহাদের নামে সন্ত্রাসী পন্থায় নিরীহ মানুষের রক্তপাত ঘটাচ্ছে যা সম্পূর্ণ ইসলামের আদর্শ পরিপন্থী ও গুরতর অপরাধ। যারা এতে লিপ্ত তারা ইসলামের ক্ষতি করছে। শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলুষিত করছে। কোন মুসলিম তা করতে পারে না। ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা, ভাসাভাসা জ্ঞান, উগ্রপন্থীর সাহচর্য ও অন্যায়ভাবে নির্যাতনের স্বীকার ব্যক্তির সৃষ্ট ক্ষোভ এর অন্যতম কারণ। এছাড়াও বিশ্বে সবচেয়ে বেশী প্রসারমান ধর্ম ইসলামের প্রসার ঠেকাতে ও ইসলামের প্রতি ঘৃর্ণা ছড়াতে এবং মুসলিম জাতিকে বর্বর ও জঙ্গী প্রমাণ করার জন্য এ ব্যাপারে ইহুদী ও খৃষ্টানসহ অমুসলিমদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। তারা মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী লোকদের মধ্যে শুভাকাঙ্খী সেজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম জাতিকে নির্যাতন থেকে রক্ষাকল্পে জিহাদের নামে কিংবা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে অস্ত্র তুলে দিতে পারে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড.মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ এ সম্পর্কে বলেন[১]

> ইসলামের ইতিহাসে অতীতে এমনটি দেখা গেছে যে, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে জিহাদের নামে অনেক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় অন্যায়ভাবে মানুষের, এমন কি মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ খারেজী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা যায়। আধুনিক যুগেও মুসলিম বিশ্বে কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে জিহাদের শ্লোগানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে চালিয়ে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে। কিন্তু তারা যদি সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করত এবং বুঝতো যে, জিহাদ কিভাবে হয় তাহলে তারা এমন কাজে লিপ্ত হতে পরতো না।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ ও ২০০০ সংঘটিত ইরাক-মার্কিন যুদ্ধ, ২০০১ সাল আফগানিস্থানে যুদ্ধ, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং বর্তমান সিরিয়ার যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যা, লক্ষ লক্ষ মানুষ পুঙ্গত্ব বরণ ও লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্বে পরিঃণত হয়েছে। কথিত সভ্যদেশ, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আদালত এখানে কী ভূমিকা পালন করেছে– তা বিশ্ববাসী অবগত? সন্ত্রাসবাদের মূলহোতা তথা ইসরাইল, আমরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াসহ সন্ত্রাসীদের কোন বিচার বা শাস্তি হচ্ছে না। অধিকন্তু, এ সব সন্ত্রাসীরাই আজ নির্যাতিত স্বাধিকার অন্দোলরত মুসলিমদের যেমন ফিলিস্তিনীদের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী বলে থাকেন। তারা নীতি দ্বিমুখী। ক্রুসেডের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই ইউরোপের খৃস্টানদের চরম বর্বরতা ও হত্যযজ্ঞ। শুধু ক্রুসেড নয় বরং বিভিন্ন সময়ে তারা যে দেশই দখল করেছেন, জোরজবরদস্তি করে বা ছলে বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন। অথচ এই ইহুদী-খৃষ্টানরাই অভিযোগ করে যে, ইসলাম জিহাদ তথা তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। *'ইসলাম তরবারীর জোরেই প্রচারিত হয়েছে'*– যদি তা-ই হয় তবে প্রশ্ন হলো ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হলো কি করে? সেখানে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি। গত অর্ধ-শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। তারা কোন্ তরবারীর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন?

আজকাল উগ্রপন্থীদের দমনের নামে বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীন সরকারও সীমাহীন বাড়াবাড়িও করছে। বিভিন্ন ধরনের ভুল পদক্ষেপ ও কর্মনীতি অবলম্বন করছে। যেমন- কোন সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করার পূর্বে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কিংবা ইসলামপন্থীদের দমন ও হেনস্তা করার জন্য নিরপরাধদের উপর দোষ চাপিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। কারো কাছে ইসলামী বইপত্র থাকলে গণভাবে তাকে জিহাদী বা সন্ত্রাসী বই বলে প্রচার করা হচ্ছে। এভাবে ইসলামপন্থীদের প্রতি নানাভাবে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ ও অবিচার করা হচ্ছে। এ সব ভুল কর্মনীতি। তাই উগ্রপন্থ ও জঙ্গিবাদ সত্যিকারভাবে বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজ-রাষ্ট্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও যুলম বন্ধ, দ্বীন সম্পর্কে উচ্চতর গভীর জ্ঞানী, বর্তমান সমাজ সম্পর্কে সচেতন ও উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের নের্তৃত্ব অর্পণ, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার, ইসলাম বিদ্বেষী লেখক ও কথিত বুদ্ধিজীবীদের ভ্রান্তচিন্তা নিরোসনে উচ্চতর ইসলামী চিন্তাবিদদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা এবং উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসে লিপ্ত প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করে বিচারে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

❑.নিজ ভূখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য অর্জন:

ইসলাম ও দেশ রক্ষার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা দেশ যদি কোন কুফরী শক্তির দখলে চলে যায় তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে কুফরী শক্তি আধিপত্য বিস্তার করবে এবং মুসলিম মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন করবে। এজন্য শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা। শত্রুদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে সদা প্রস্তুত রাখা। শত্রুদের সাথে অন্তরঙ্গ না হওয়া কিংবা শত্রুকে দুর্বল না ভাবা।[২] তাদের আক্রমণ মোকাবেলায় সামরিক সরঞ্জাম, উন্নততর প্রযুক্তি, সামরিক সামর্থ্য ও যুগপোযোগী অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা কৌশল অবলম্বন করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]- وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ "আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের

---

[১]. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *রাসূলুল্লাহ সা. শিক্ষাদান পদ্ধতি*, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ২০১১) পৃ.৫৩।

[২]. আল-কুরআন ৬০:১.৮,৯ ৫৮:২২, ৩:৩৮]।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৬০।

শত্রুদেরকে।" অন্যত্র বলেন[১] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় বা একসাথে বের হও।"

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ ও বাহিরাক্রমণ প্রতিরোধে ধৈর্য ও পাহারাদারির সাথে সক্রিয়া থাকা। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[২]-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- "হে ঈমানদার লোকগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের প্রতিরোধে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, ইসলামী রাজ্য সংরক্ষণে সর্বদা প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা আছে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো-ক. দ্বীন-ইসলাম সংরক্ষণ। অর্থাৎ মুসলিম সমাজকে দীনের সামগ্রিক বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। খ.বিবাদমান পক্ষসমূহের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করা। গ. প্রত্যেকটি নাগরিকের বৈধ স্বত্ব বেআইনী দখল থেকে রক্ষা করা, যেন সকলেই নিজ দখলের উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে। তারা কোন বেআইনী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয় এবং নিশ্চিত নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন যাপন সকলের পক্ষেই সম্ভব হয়। এক কথায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও সংরক্ষণ। ঘ.শরীয়ত ঘোষিত হদ্দ' ও 'কিসাস' কার্যকর করণের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা, যেন আল্লাহর হারাম ঘোষিত কোন কাজ হতে না পারে, সকলের অধিকার সব ধরনের আঘাত থেকে পূর্ণরূপে রক্ষা পেতে পারে। কোন লোকই স্বীয় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। ঙ.বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ ও দেশের জনগণ ও তাদের জান-মাল ও সম্মান রক্ষা করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা। চ.ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা। অবশ্য প্রথমে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান ও জিযিয়ার বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব পেশ, সর্বশেষ উপায় হিসেবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ছ.কর খাজনা ও অন্যান্য সরকারী পাওনা সঠিক রূপে আদায়ের ব্যবস্থা করা। তা শরীয়তের স্থায়ী নীতি অনুযায়ী হতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনরূপ নির্দয়তার প্রশ্রয় না দেয়া। জ.বায়তুল মাল সংরক্ষণ। তা থেকে যাকে যা দেওয়ার তার পরিমান নির্ধারণ ও যথাযথ দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, অপচয় না করা, পাওনা পরিমানেও হ্রাস-বৃদ্ধি না করা, যথাসময়ে দিয়ে দেয়া, বিলম্ব না করা। ঝ. দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগ করা, তাদের কাজের সুযোগ করে দেয়া, তাদের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া–তাদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা। ঞ.রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করা। তথা সমস্ত জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া পরিস্থিতি অধ্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন সার্বিকভাবে গোটা উম্মত রক্ষা পায় এবং জাতি সংরক্ষিত থাকে।[৩]

নাগরিকের বিশেষ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক বিশেষ করে মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, তারা বিধিসম্মত বিষয়ে রাষ্ট্র বা নেতার আনুগত্য ও আইন পালন করবে, কল্যাণের বিস্তার ঘটাবে, অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে, নিজেদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফের উপর কায়েম রাখার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাবে এবং রাষ্ট্রে যোগ্য ও সৎ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করবে। এ বিষয়ে সামাজিক জীবনে করণীয় অনুচ্ছেদে অনেকটা আলোচনা করা হয়েছে, তবে সেখানে যা বাদ পড়েছে নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো:

❑.বিধিসম্মত বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য, আইন পালন, শৃঙ্খলা রক্ষা ও ফাসাদ পরিহার:

শাসকের সৎ ও ন্যায়সংগত নির্দেশের আনুগত্য করা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আবশ্যক। চাই সে শাসক অথবা নির্দেশ নিজের পছন্দ হোক বা না হোক। আঙ্গুরের মতো(ক্ষুদ্র) মস্তক বিশিষ্ট কোন হাবশী দাসকে শাসক নিয়োগ করা হলে রাসূল সা. তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।[8] তবে অন্যায় নির্দেশ বা পাপাচারের কাজে ব্যাপারে আনুগত্য করা হারাম। যেমন[৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً-

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট।এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" অন্যত্র এনেছে-[৬]

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।"

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,"প্রতিটি মুসলিমের উপর(শাসকের আদেশ) শোনা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপাচারের আদেশ না দেয়া হয়। কাজেই তাকে কোন পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তা শুনবে ও মানবে না।"[৭]

সরকার বা শাসক অন্যায়ের সমর্থক বা অনুগামী হওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৭১।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২০০।

[৩]. মও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১৫৪-৫৫।

[8]. দেখুন, *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হাদীস নং ৬৭২৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৫৯, আল-কুরআন ০২:২৮২।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৭।

[৭].মূল আরবী[السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হা.নং ৬৭২৫; *মুসলিম*, হা.১৮৩৯;

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে অপছন্দ করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।) সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–যদি তোমাদের মধ্যে কেউ তার নেতা বা শাসকের মধ্যে কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে।কারণ যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রশক্তির আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।[২]

রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে নাগরিকগণ সতর্ক থাকবে। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রতিরোধে মন্দ পরিস্থিতি সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অবহিত করবে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ "আর যখন তাদের কাছে শান্তি কিংবা ভীতিজনক কোন বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রাসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত।"

❑.সর্বসাধারণের প্রয়োজনের ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভালো ব্যাপারে সুপারিশ:

সমাজের বিভিন্ন এলাকার জ্ঞানী ও বিবেকবান নাগরিকের কর্তব্য হলো, সর্বসাধারণের জন্য ক্ষতি ও অকল্যাণরোধে এবং তাদের জন্য কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ গ্রহণ করবে। এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাসীন ও ধনীদের নিকট তাদের কল্যাণের জন্য সুপারিশ করবে। এটা মু'মিদের বিশেষ কর্তব্য এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা সর্বসাধারণ উপকৃত হয় এবং সমাজ কল্যাণ হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪]– وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ "যারা তাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের আমি যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে ।"

তাদের জন্য এই সুপারিশ হবে নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থভাবে ভালো ব্যাপারে, যা সবার জন্য সার্বিক কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়। মহান আল্লাহ বলেন[৫]- مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا "কেউ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে নযর রাখেন।"

❑. সুযোগ্য ও সৎ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন:

রাষ্ট্রের মজলিসে শূরার(পরামর্শ সভা) সদস্য অথবা নাগরিকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যোগ্য ও সৎ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব একটি জাতিকে বৈষয়িক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। কুরআন এর দৃষ্টান্ত হিসেবে মূসা ('আ.), ইউসুফ ('আ.) দাউদ ('আ.) ও সুলাইমান ('আ.) এর কথা উল্লেখ করেছে। যাদের নেতৃত্বে বনী ইসরাইল তথা ইহুদী জাতি পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণ, মুক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাই সৎ ও যোগ্য ও জনসাধারণের কল্যাণকামী ব্যক্তিকে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচন করা নাগরিক বা মজলিসে শূরার (পার্লামেন্ট মেম্বার) অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে[৬] –(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) -"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে।"

কুরআন ও সুন্নাহ রাষ্ট্রের শাসক নির্বাচনে যে সব গুণাবলী লক্ষ্য করতে বলেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ক. শাসককে মু'মিন ও দ্বীনদার হওয়া।[৭] খ. পুরুষ হওয়া। [৮] গ.যোগ্যতাসম্পন্ন ও সৎ হওয়া।[৯] ঘ. রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা থাকা। ঙ. ন্যায়পরায়ন ও নিরপেক্ষ অধিকারী হওয়া। চ. মানবিক ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ছ. জন্মসূত্রের দিক থেকে পবিত্র হওয়া। জ. পদলোভী না হওয়া।

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত? কোন ধরনের লোক নেতা হওয়ার উপযুক্ত এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ও কর্মনীতি কিরুপ হওয়া কাম্য?–এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন[১০] – وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ "আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা

---

[১].মূল আরবী [ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن نكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৫৪।

[২].মূল আরবী [من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আহকাম, হা.নং ৬৭২৪, *মুসলিম*,হা.১৮৪৯।

[৩]. আল-কুরআন , সূরা আন্-নিসা' ৪: আয়াত ৮৩

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আশ্-শূরা ৪২: আয়াত ৩৮।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৮৫।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৫৮।

[৭]. আল-কুরআন : ০৪:১৪১; ১৮:২৮; ৩৩:৬৬,৬৮; ৪৯:১৩।

[৮]. আল-কুরআন : ০৪:৩৪।

[৯]. আল-কুরআন : ০২:২৪৭।

[১০]. আল-কুরআন সূরা আল-আম্বিয়া ২১ঃ আয়াত ৭৩।

আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।"

এছাড়াও কুরআন রাষ্ট্র প্রধান কিংবা শূরা সদস্য(পার্লামেন্ট মেম্বার) নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের কতগুলো গুণ ও যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছে।[১] এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে-[২]

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا ... وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

"আর তাদেরকে তাদের নাবী বলল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তালূতকে রাজারূপে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, 'আমাদের উপর কীভাবে তার রাজত্ব হবে? ...আর তাকে সম্পদের প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি'। সে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

উল্লেখিত আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক তালূতকে বনী ইসরাইলের বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়েছে তার জ্ঞানগত ও দৈহিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে।

খিলাফতের সর্বোত্তম ব্যক্তি সর্ম্পকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এক প্রশ্নের উত্তরে উমর (রা.) বলেন, " হে ইব্নু আব্বাস, খলীফা হওয়ার যোগ্য হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী কিন্তু নিষ্ঠুর নয়, বিনয়ী কিন্তু দুর্বল নয়; মিতব্যয়ী কিন্তু কৃপণ নয় ; উদার হস্ত কিন্তু অপব্যয়ী নয়।"[৩]

কোন ধরনের ব্যক্তি শাসক হওয়া উচিত নয়, তার বর্ণনা দিয়েছেন আলী (রা.)। তিনি বলেন, তোমরা জ্ঞাত আছো, যে ব্যক্তি মুসলিমদের মান-ইয্যত, জীবন, ধন-সম্পদ ও আইন প্রয়োগের দ্বায়িত্বে ও নেতৃত্বে থাকবে, তার কৃপণ হওয়া উচিত নয়। নতুবা তাদের ধন-সম্পদের প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি থাকবে। তার অজ্ঞ হওয়া উচিত নয়, নতুবা তার অজ্ঞতা দিয়ে সে জনগণকে বিপথগামী করে ফেলবে। তার রূঢ় স্বভাবের লোক হওয়া উচিত নয়, নতুবা তার রুঢ়তা দিয়ে জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে ফেলবে। সে নীতিহীন বা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবে না, নতুবা সে এক দলকে অপর দলের উপর প্রাধান্য দিবে; সিদ্ধান্ত প্রদানে তার উৎকাচ গ্রহণকারী হওয়া চলবে না, নতুবা সে অনেকের হক নষ্ট করে ফেলবে এবং রাসূলের কোন সুন্নতকে নিশ্চিহ্নকরী হতে পারবে না নতুবা উম্মতকে ধ্বংস করে ফেলবে।[৪] তিনি আরও বলেন, লোকদের উপর নেতৃত্ব দানের অধিকারী হবে সেই ব্যক্তি, যে তাদের সকলের তুলনায় অধিক দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অধিক শক্তিশালী হবে। আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অন্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান, কেউ ফেতনা সৃষ্টি করলে তাকে তাওবা করে সংশোধন হতে বলবে, তাতে দমিত না হলে প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[৫]

কুরআন রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী, শূরা সদস্য(পার্লামেন্ট মেম্বার) কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে অসৎ, অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ন ও পদলোভী লোকদের বর্জন করার জোর তাকিদ দিয়েছে। কোন পাপাচারী, দুর্নীতিবাজ, ফাসিক ও বিদ'আতী ব্যক্তিকে এ সব পদে নির্বাচন করা যাবে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৬]–(وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا) "আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।"

লক্ষ্য রাখা উচিত যে, শাসকের চরিত্র ও আদর্শ দ্বারা শাসিতরা প্রভাবিত হয়। কেননা শাসক ইসলামী আদর্শ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হলে জনগণের ওপর যেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর শাসক ইসলামী আদর্শচ্যুত ও চরিত্রহীন হলেও তার নেতিবাচক প্রভাবও জনগণের ওপর পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা.) যথার্থই বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'টি শ্রেণী এমন যে, তারা ঠিক হলে গোটা উম্মত ঠিক হয়ে যাবে আর তারাই নষ্ট হলে গোটা উম্মত বিনষ্ট হয়ে পড়বে। জিজ্ঞাস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা ফিকহবিদ ও প্রশাসকবৃন্দ।[৭]

দুনিয়া ও আখিরাতে যাদের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে তাদেরকেই নেতা নির্বাচিত করা উচিত। কারণ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি যার নেতৃত্ব মেনে চলবে পরকালে সে ব্যক্তির সাথে তার হাশর হবে। অসৎ ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করলে তার কৃত পাপের দায়ভার নিজের উপর বর্তাবে। ইরশাদ হচ্ছে[৮]–(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)"স্মরণ কর, সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহবান করব।"

---

১. কুরআনের নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র প্রধান কিংবা শূরা সদস্য হতে হলে কতগুলো গুণ ও যোগ্যতা অপরিহার্য। যেমন- তাকে মুসলিম হতে হবে (আল-কুরআন ০৪:৫৯); পুরুষ হতে হবে (আল-কুরআন ০৪:৩৪); সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে(আল-কুরআন ০৪:০৫); বিশ্বস্ত ও আল্লাহ ভীরু হতে হবে (আল-কুরআন ৪৯:১৩) এবং রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে (আল-কুরআন ০৮:৭২)।

২. আল-কুরআন ০২:২৪৭।

৩. আবুল হাসান মাওয়ার্দী, *আহ্কামুস সুলতানিয়া* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫), পৃ.১৩, *আহ্কামুস সুলতানিয়া*, http://www.al-islam.com, পৃ. ১৬।

৪. আলী ইবনু আবী তালিব, *নাহ্জুল বালাগা*, সং.আশ-শরীফ আর-রাজী, ইং. অনু. সৈয়দ আলী রেজা, বা. অনু. জেহাদুল ইসলাম (ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০০) খুতবা নং ১৩০।

৫. *প্রাগুক্ত*, খুতবা নং ১৭২।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: ২৮।

৭. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০১, পৃ. ০৬।

৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৭১।

পরামর্শসভার সদস্য নির্বাচন: যোগ্য ও সৎ এবং জনসাধারণের কল্যাণকামী ব্যক্তিকে মজলিসে শূরা সদস্য(সাংসদ) নির্বাচিত করা। এটা রাষ্ট্রের নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য ও পবিত্র আমানত। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে[১]– إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا-"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে।"

❑ .আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা সংক্রান্ত আল-কুরআনের নৈতিক নীতিমালা:

আল-কুরআন ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে। এক্ষেত্রে মৌলিক নীতিগুলো হলো:

ক. বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের পক্ষে এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান: বিশ্বমানবতার শান্তি ও কল্যাণে কাজ করা। অন্যায়-অবিচার ও ফাসাদের পথ পরিহার করা।[২] শান্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা।[৩] এ সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে[৪]–لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ "নিশ্চয় তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"

পারস্পরিক শান্তি স্থাপনে মধ্যস্থতায় কোন অপরাধীদের পক্ষাবলম্বন না করা। মহান আল্লাহ বলেন[৫] وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا -وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا "এবং তুমি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না। আর যারা নিজদের খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না খিয়ানতকারী, পাপীকে।"

মুসলিম জনগণের মধ্যে শান্তি রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সম্ভব্য সব শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যবহার এবং মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতা জন্য কাজ করা। এ ব্যাপারে ইসলাম মুসলিমদের নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেন[৬] وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না।"

শান্তি প্রতিষ্ঠায় করণীয়: আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানদের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ১. শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপক আয়োজন করা। [আল-কুরআন ৯:১২৮. ২৯:৪৬] ২. হিংসা-বিদ্বেষ প্রজ্জ্বোলিত না করা। [আল-কুরআন ৬: ১০৮] ৩. পৃথিবীতে যুলুম ও অন্যায় ত্যাগ করা। [আল-কুরআন ২৮:৮৩] ৪. দ্বীন গ্রহণের ক্ষেত্রে কারো প্রতি জবরদস্তি না করা। [আল-কুরআন ২:২৫৬] ৫. সুসম্পর্ক ও সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। [আল-কুরআন ৬০:৭]

খ. বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মানবতা বজায় রাখা: বৈষম্য ও ভেদাভেদ নির্মূল করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও মানবতা রক্ষায় কাজ করা। কুরআনে বলা হয়েছে[৭] – يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء "হে মানব! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীকে করেন এবং তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[৮]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

গ. প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম চায় গোটা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি কোন ধরণের অন্যায় আচরণ, যুল্ম বা সংঘাত সৃষ্টি না করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা কুরআনের শিক্ষা। প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি অমুসলিমও হয় কিন্তু দেশ ও ধর্মের জন্য হুমকি না হয় তথাপি কুরআন তাদের সাথে সৌজন্যতা ও সম্প্রীতি রাখার নির্দেশ দেয়। ইরশাদ হচ্ছে[৯]– لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি–ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন।"

ঘ. নিরপেক্ষ ও নিরীহ সর্বসাধারণের নিরাপত্তা বিধান: পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অশান্তি-নৈরাজ্য প্রতিহত করা কুরআনের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য নিরীহ ও নিরপেক্ষ সর্বসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ৫৮।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বাসাস ২৮: আয়াত ৮৩।
[৩]. আল-কুরআন, ৪৯:৯
[৪]. আল-কুরআন সূরা আত-তাওবা ৯: আয়াত ১২৮
৫. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০৫,১০৭।
৬. আল-কুরআন ২৯:৪৬।
৭. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা'০৪: আয়াত ০১।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : আয়াত ১৩।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০: আয়াত ০৮

রাখতে কুরআন বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১] – فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً "অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি।" মহান আল্লাহ আরও বলেন-[২] لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ-"তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।"

ঙ. শান্তি, কল্যাণ ও ইসলামের প্রতি আহবান: পৃথিবীতে বিভিন্ন অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর নিকট তাদের হিতাকাঙ্খী হয়ে প্রজ্ঞা সহকারে উত্তমভাবে শান্তি ও কল্যাণের উৎস ইসলামী নীতি বা ইসলামের আদর্শের প্রতি আহবান করা। এক্ষেত্রে অসৌজনতা অথবা মন্দ পন্থায় তাদের বিশ্বাসে আঘাত না করা কিংবা পীড়াপীড়ি বা জোর-জবরদস্তি না করে ভদ্রতা ও সৌজনতা বজায় রেখে বুদ্ধিমত্তার সত্য, শান্তি ও মুক্তির পথে আহবান জানানো।[৩] মহান আল্লাহ বলেন[৪] - وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-"আর তোমাদের মধ্য থেকে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, আদেশ দেবে ভালো কাজের এবং নিষেধ করবে মন্দ কাজ থেকে। আর এরাই সফলকাম।"

চ. বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত সন্ধি ও চুক্তি পালন: বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা মানবিক বিপর্যয়সহ নানা অন্যায়, অনাচার ও অবক্ষয়ের জন্ম দেয়। এতে মানুষ একে অপরকে ঘৃণা করে এবং একে অপরের ক্ষতি সাধন করতে চেষ্টা করে। সামাজিক উন্নয়নের উপায়-উপকরণ ধ্বংস সাধন করে। পক্ষান্তরে, পারস্পরিক হানাহানি, রক্তপাত ও সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি বা শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং শান্তি ও কল্যাণ লাভের অন্যতম উপায়। এতে সমাজের মানুষের দুর্ভোগ ও অশান্তির অবসান ঘটে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতে মানব কল্যাণ থাকে, সামাজিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথ সুগম হয়। মহান আল্লাহ বলেন[৫]-وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। কৃত চুক্তি ও সন্ধি পালনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৬]- إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।"

ছ. পারস্পরিক দ্বন্দ্ব/বিরোধ/যুদ্ধাবস্থায় নৈতিক নীতি: পারস্পরিক বিরোধ, শত্রুতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা যুদ্ধাবস্থায় কুরআন কতগুলো নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে। যেমন: ১. অন্যায় ও অনাচার নিয়ে ছুটাছুটি বর্জন করা। [আল-কুরআন ৫: ২] ২. হারাম মাসগুলোতে বা সম্মানিত স্থানসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। [আল-কুরআন ৯:৩৬. ২:১৯১] ৩. নগরবাসীদেরকে উত্যক্ত না করা এবং কেবল যুদ্ধবাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। [আল-কুরআন ২: ১৯০] ৪. উভয় পক্ষকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার মেনে চলতে হবে। [আল-কুরআন ৫:১, ১৬:৯১-৯২] ৫. মানবীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করবে, তাকে পবিত্র সম্পর্ক বলে বিবেচনা করবে, তা থাকবে দল ও জাতি গোষ্ঠীর উর্ধ্বে। [আল-কুরআন ৪:১] ৬. সবশেষে কুরআন যুদ্ধরত মুসলিমদের ধৈর্যের আহ্বান জানায়। একইভাবে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও ভয় না করার জন্য আহ্বান করে। [আল-কুরআন ৩:২০০. ৮:৪৫-৪৬]। যুদ্ধ বা প্রতিশোধের সময় সীমালঙ্ঘন না করা। মহান আল্লাহ বলেন[৭], وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ "আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোস নিস্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ যালিমদের পছন্দ করেন না।"

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা ৪: আয়াত ৯০
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৯।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫৬; আল-কুরআন ৬:১০৮, ২৯:৪৬।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১০৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০৫:০২, ১৬ : ১২৫, ৩৩:৭০,০৩:১৩৫।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮ : আয়াত ৬১।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ৯: আয়াত ০৪।
[৭]. আল-কুরআন সূরা আশ-শূরা ৪২: আয়াত ৪০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহঃ

অর্থনীতি মানব জীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কিন্তু অর্থ উপার্জনের পথে মানুষের সততা ও নৈতিকতা যাচাই হয়। তাই ইসলাম বৈধপন্থায় সম্পদ উপার্জনের কর্মপন্থা এবং সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের কতগুলো নৈতিক নীতিমালা দিয়েছে। ইসলাম প্রদত্ত এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মধ্যে মানুষের সত্যিকার অর্থনৈতিক কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলোঃ

❑.প্রচলিত অর্থনৈতিক মতাদর্শের শোষণ-নিষ্পেষণরোধে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুকরণ এবং সম্পদের সুষম বন্টনঃ

অর্থনীতি মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চালিকা শক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম হয়েছে। এসব মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক মতাদর্শের হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রী অর্থব্যবস্থা। এ সব অর্থনৈতিক মতাদর্শের কিছু দিক ভালো থাকলেও এর কোনটি ভোগকেন্দ্রিক, কোনটি রাজনীতি সর্বস্ব ও প্রান্তিক একদেশদর্শী, সর্বপরি এর কোনটিই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি দিতে পারেনি। পুঁজিবাদে উৎপাদন, মুনাফা অর্জন, সঞ্চয় ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সীমাহীন কর্তৃত্ব, স্বেচ্ছাচার, নীতিহীনতা ও শ্রমিক শোষণসহ নানা বিচ্যুতি রয়েছে। আর সমাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে। পুঁজিবাদ ব্যক্তি কর্তৃক শোষণ, আর সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক শোষণ। এই দুই মতবাদের দ্বারা মানুষ শোষিত ও নিষ্পেষিত হয়েছে। এই দুই মতবাদে ত্রুটি ও অসরতা তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল(১৮৭২-১৯৭০খ্রী.)–I dislike communism because it is undemocratic and capitalism because it favours exploitation"[১] তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল ইসলামী অর্থনৈতিক মতবাদ।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক-বিভাগ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম যে নীতিমালা দিয়েছে তা নির্ভুল, কল্যাণকর ও ইনসাফপূর্ণ। সম্পদ অর্জন, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামে যে নীতিমালা দিয়েছে তা পালনেই রয়েছে মানুষের পার্থিব-অপার্থিব যাবতীয় বিষয়ের প্রকৃত মুক্তি ও উন্নয়ন। পুঁজিবাদের কুপ্রভাবে ফলে আজ অন্যায়ভাবে যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে পুঁজিপতি হওয়ার অদম্য স্পৃহা শুধু মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করছে না, বরং মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কুরআন মানব মন থেকে এই মানসিকতা নিবৃত্ত করে। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীসহ সকল সম্পদের চূড়ান্ত মালিক মহান আল্লাহ।[২] এখানে পুঁজিবাদী মানসিকতা ও পুঁজিবাদের মত সম্পদে ব্যক্তির অবাধ মালিকানার সুযোগ নেই। আবার সমাজতন্ত্রের মত এখানে ব্যক্তির সম্পদে অধিকার খর্ব করা হয়নি, বরং ব্যক্তির স্বত্বাধিকার প্রদান করা হয়েছে।[৩] তবে এ স্বত্বাধিকার অবাধ নয় বরং তা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত; এবং ব্যক্তির সম্পদে

---

[1] .Bertrand Russell, *unarmed victory*, penguine Books Ltd. 1963, p.13. উদ্ধৃত, *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা)*, সম্পা.মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (ঢাকা:ইফাবা ২০০৫), পৃ.২৫১।

[২]. আল-কুরআন ০২:২৮৪, ০৩:১০৯,১২৯; ০৪:১২৬, ১০:৫৫; ১৪: ২; ১৬:৫২; ২০: ৬; ২২:৬৪; ২৪:৬৪; ৩১:২৬; ৩৪:১;৪২:৪; ৫৩:৩১; ৫৭:১;৫৯:১ ৬১:০১।

[৩]. আল-কুরআন ৩৬:৭১।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।[১] ইরশাদ হচ্ছে-[২] -وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ "আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও।
–উদ্ধৃত আয়াতে 'তোমাদের সম্পত্তি' এর স্থলে 'আল্লাহর সম্পত্তি' বলে সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহর সম্পৃক্ত করে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অবাধ মালিকানা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আবার 'যে সম্পত্তি আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন' কথা দ্বারা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ধ্যানধারণার মূলৎপাটন করে মানুষের মালিকানা সীমিত আকারে স্বীকার করা হয়েছে।

কুরআন পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করেনি। ইসলামে বৈষয়িক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ইসলাম মানুষের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এ দু'টি বিষয়কে একত্রিত করার শিক্ষা দিয়েছে।[৩] মানুষকে ইবাদতের পাশাপাশি পার্থিব সম্পদ উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন সালাত আদায়ের পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে।[৪] সম্পদ উৎপাদন জন্য কুরআন মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য,ফল-ফসল, মৎস শিকার, পশুপালন, চামড়া শিল্প, পরিবাহন, খনিজ দ্রব্য আহরণ, পোষাক শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৫] কুরআন বলেছে[৬]– وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا "আর আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়াছেন তদ্দারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। –উদ্ধৃত আয়াতে মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে কাঙ্খিত ভারসাম্য বজায় রেখে পার্থিব উন্নতির ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

তবে কুরআন মানুষকে দুনিয়ার প্রতি এমন আসক্তির ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে যা দ্বীন থেকে গাফিল বা বিমুখ করে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে[৭]- رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ "সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্‌র, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।"
রাসূল (সা.) উপার্জন ও উৎপাদনের জন্য কেবল উৎসাহই দেননি, পাশাপাশি উৎপাদনের বিভিন্ন পথ ও পন্থাও বাতলিয়ে দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে জীবজন্তু, বৃক্ষগুল্ম, জড় পদার্থ, শিল্প পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮]

ইসলামে সম্পদ জীবনের লক্ষ্য নয়, বরং জীবন ধারণের উপকরণ মাত্র। এতে সম্পদ উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছে। ইসলামে পারস্পরিক সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বৈধ(হালাল) পন্থায় সম্পদ উপার্জনের জন্য জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং সুদ, ঘুষ, চুরি, ছিনতাই, মজুতদারি ইত্যাদি সব ধরনের অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৯] কৃপণতাকে ধ্বংসাত্মক ও নিন্দনীয় বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে, অপচয়-অপব্যয়কে নিন্দা করা হয়েছে।[১০] ইসলামে একচেটিয়াবাদ ও মুনাফাখোরি নিষিদ্ধ। মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় উৎপাদন সংকোচন কিংবা মজুদদারী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জনকল্যাণের পরিপন্থী এসব কাজে যারা লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে কুরআন ও হাদীসে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। সঠিক ওজন ও পরিমাপের জন্য আল-কুরআনে সুনির্দিষ্ট তাগিদ রয়েছে।

সম্পদের সুষম বন্টন: ইসলাম একটি সুষম অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামী ব্যবস্থায় যেহেতু ভূমি ও সম্পদের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ এবং মানব জাতি যেহেতু তারই সৃষ্টি কাজেই ভূমির মালিক কর্তৃক সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার কিংবা পুঁজির মালিক কর্তৃক শ্রমিকের ওপর অত্যাচার ইসলামে অকল্পনীয়। সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রেও দিয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মুষ্ঠিমেয় কিছু লোকের হাতে সমাজের সমগ্র সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই, বরং যথাসম্ভব আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যতার নির্দেশ করা হয়েছে।[১১] কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে যে, সম্পদ দুঃস্থ ও অসহায়দের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে যাতে কেবল ধনীদের মধ্যেই সম্পদ সঞ্চারিত হয় না। এজন্য সম্পদশালীদের উপর যাকাত ও ওশর(ফসলের যাকাত) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে, যা দারিদ্র বিমোচন ও মানব কল্যাণে এক বলিষ্ঠ ও কার্যকরী পদক্ষেপ। যাকাত ও ওশর ছাড়াও মানব কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। এজন্য ইসলাম করয আল-হাসানাহ (সুদমুক্ত ঋণ) সাদাকাহ (ঐচ্ছিক দান), কাফফারা (পাপমোচনের জন্য দান), ফিদিয়া(মুক্তিপন), সাদাকাতুল ফিত্‌র, ওয়াকফ (এককালীন দান) ও ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাহে ব্যয়) ইত্যাদি ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে, যার প্রাপ্য শুধুই দারিদ্র মানব গোষ্ঠী। অধিকন্তু, নিঃস্ব, দুঃস্থ, বৃদ্ধ, বিধবা, ইয়াতীম ও অক্ষম নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পুরণের দায়িত্ব ইসলাম তার বাইতুলমাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এর উপর ন্যাস্ত

---

[১]. আল-কুরআন ৫১: ২০; ৭০:২৪-২৫।
[২]. আল-কুরআন সূরা আন-নূর ২৪:৩৩।
[৩]. কুরআন বলেছে-হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। সূরা আল-বাকারা :২০১।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ১০।
[৫]. আল-কুরআন ০৫:৯৬, ১৬: ৫-৮, ১১, ১৪, ৬৬-৬৯, ৮০-৮১; ১৭: ৬৬, ।
[৬]. আল-কুরআন,সূরা আল-ক্বাসাস ২৮ : আয়াত ৭৭।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩৭।
[৮]. দেখুন, ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনু. আবদুল মতীন জালালাবাদী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ.১৪৫-১৬৯।
[৯]. আল-কুরআন ০৪:২৯, ২:১৮৮,২৭৫-২৭৯; ৫:৩৮,৯০; ২৪:৩৩, ৮৩:১-৩; ।
[১০]. আল-কুরআন ।
[১১]. আল-কুরআন ৫৯:০৭, ১৬:৭১।

করেছে। এভাবে ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়পরায়নতা ও মানব কল্যাণে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে।

❑.অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মিতব্যয়ীতা অবলম্বন এবং অপচয়-অপব্যয় রোধঃ

মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। কেননা অর্থনীতি মানুষের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা জরুরী। কেননা শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা বর্তমান মুসলিম জাতির গোলামী ও অপমানজনক জীবন যাপনের অন্যতম কারণ। উন্নত জাতি হতে হলে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং আমদানী নির্ভরতার পরিবর্তে রপ্তানী নির্ভর হতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মৌলিক দিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে গুরুত্ব প্রদান করা। কুরআন আমাদের কাছে ইউসূফ (‘আ.) এর যে ঘটনা বর্ণনা করেছে, তাতে ইউসূফ(‘আ.) কর্তৃক দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার জন্য পনের বছর মেয়াদী কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-[১]

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ- ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ- ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

সে(ইউসুফ) বলল, ‘তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দেবে’। ‘তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখে দেবে এরা(ঐ সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে’। এরপর আসবে এমন এক বছর যাতে মানুষ বৃষ্টি সিক্ত হবে এবং যাতে তারা(ফলের) রস নিংড়াবে’।

উদ্ধৃত বক্তব্য মোতাবেক প্রত্যেক রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের একটি পরিকল্পনা থাকা এবং সে লক্ষ্য অর্জনে প্রত্যেকের কাজ করা কর্তব্য এবং উপার্জিত সম্পদ অপচয়-অপব্যয় থেকে রক্ষা করা উচিত। এছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

নৈতিকতা বর্জিত অর্থনৈতিক নীতিমালা শোষণের হাতিয়ার। কেবল নৈতিকতাযুক্ত অর্থনৈতিক নীতিমালায় সম্পদ ভোগ ও সুবিধায় সকলের অধিকার যথার্থই স্বীকৃত হয়। তাই ভারসাম্যপূর্ণ ও বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও কার্যকর করার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের অধিকার পূর্ণভাবে সংরক্ষিত থাকবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। কেবল ইসলামই সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রদান করেছে। যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য-অনাচারোধে মহান আল্লাহ বলেন[২] وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ “তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতের হক।” অন্যত্র বলেন[৩] وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ- لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ “আর যাদের ধন–সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের।”

সমাজের এক শ্রেণী সীমাহীন প্রাচুর্যের উদ্দাম স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে আর অপর শ্রেণী থাকবে বঞ্চিত-নিঃস্ব-সর্বহারা, ইসলাম কিছুতেই এটা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। এ ধরনের অবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসলাম সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে। এটা এমন একটা মূলনীতি যা ঐতিহাসিক ভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে প্রমাণিত। তিনি বনু নজীর থেকে সংগ্রহীত ‘ফায়’ এর সমগ্র অর্থই শুধুমাত্র দরিদ্র মোহাজেরদের মধ্যে বিতরণ করেন, যাতে প্রথম সুযোগেই ইসলামী সমাজে খানিকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল দু’জন দরিদ্র আনসারকে তিনি তাদের সাথে শামিল করেন। অতঃপর কোরআন এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ “যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য্য আবর্তন না করে।”

এ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত অর্থবহ ও গুরুত্বপূর্ণ। এর আলোকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনকারী মুসলমান শাসক মুসলিম সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাইতুল মাল থেকে অভাবী ও দরিদ্র লোকদেরকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য করার সর্বদাই ক্ষমতা রাখে। সামাজের বিভিন্ন পর্যয়ের লোকদের মধ্যে যাতে সাধারণ ভারসাম্য ব্যাহতকারী বৈষম্য বিরাজিত না থাকে এ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য।[৫] অর্থনৈতিক ভারসাম্য সম্পর্ক বলা হয়েছে-[৬] وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ-এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহানাবী সা. মুয়ায রা. কে ইয়ামেনে প্রেরণের প্রক্কালে নির্দেশ দেন[৭] *“সম্পদশালীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের বিতরণ করবে।”*

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত৪৭-৪৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত ৫১: আয়াত ২০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা’আরিজ ৭০: আয়াত ২৪-২৫।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৭।
[৫]. সাইয়েদ কুতুব,*আল-‘আদালাতুল ইজতিমা‘ইয়া ফীল ইসলাম*, (কায়রো : দারুশ শুরক, ১৯৯৩), পৃ- ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি,অনু:-আকরাম ফারুক, স্মৃতি প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ-২০০৫,পৃ-১০৫।
[৬]. আল-কুরআন ২৪:৩৩,
[৭]. মূল আরবী [أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত,হাদীস নং১৪২৫।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত যাবতীয় আয়-ব্যয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মধ্যম পন্থা ও 'মিতব্যয়িতা'[১] কর্মনীতি এবং অপচয় ও অপব্যায়রোধ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।[২] কেননা বিলাস দ্রব্যাদি মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে না বরং দক্ষতার অবনতি ঘটাতে পারে। কাজেই এসব দ্রব্যাদির উৎপাদন অর্থনৈতিক অপচয় ছাড়া কিছুই নয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রে এ জাতীয় অপচয় প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নয়। বরং বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সব উপাদান ও সম্পদ নিয়োজিত রয়েছে সে সবকে অধিকতর জনহিতকর কাজ তথা আবশ্যকীয় পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা উচিত।[৩] সুষম ব্যয় ও মিতব্যয়ের গুরুত্ব কুরআনে বলা হয়েছে[৪]– وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

মু'মিন ব্যক্তি অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় ও দান-সাদাকার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অপচয়-অপব্যয় পরিহার করবে। ইরশাদ হচ্ছে[৫] وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا "এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে।"

সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমাজ থেকে অর্থনৈতিক অনাচার তথা ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও অপচয়-অপব্যয় ইত্যাদি কঠোরভাবে প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছে। সম্পদ নষ্ট, অপচয়-অপব্যয় ও বিলাসিতা ব্যাপারে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ মর্মে নাবী সা. বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া হারাম করেছেন। আর অনর্থক কথা বলা, বেশি বেশি যাঞ্চা করা এবং সম্পদ নষ্ট করা তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।"[৬] সম্পদের যাতে কোন অপচয় না হয় সেজন্য মৃত গরু-ছাগলের চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মিতব্যয়ীতার ব্যাপারে ইসলামে তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[৭] [الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم] "মিতব্যয়ীতা জীবিকার অর্ধেক, মানুষের কাছে প্রিয় হওয়া বুদ্ধির অর্ধেক এবং প্রশ্নের সৌন্দর্য জ্ঞানের অর্ধেক। তিনি আরও বলেন[৮],"যে ইসতিখারা করে সে ব্যর্থ হয় না, যে পরামর্শ করে সে অনুতপ্ত হয় না এবং যে মিতব্যয়ী হয় সে দারিদ্র্য ক্লিষ্ট হয় না।"

❑.বৈধ পন্থায় উপার্জন (كسب الحلال) এবং অবৈধ উপার্জন পরিহার:

হালাল বা বৈধ উপার্জন হলো সেই আয়-উপার্জন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুমোদিত ও নির্দেশিত পন্থায় করা হয়। ইসলাম সম্পদ উপার্জন বৈধতা দিয়েছে। তবে তা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে, হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর ইবাদত করা যেমন মানুষের কর্তব্য তেমনি হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনও মানুষের কর্তব্য। নৈতিক উৎকর্ষতায় হালাল খাবারের বিকল্প নেই। বরং আত্মার কল্যাণের জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য। কেননা হারাম খাবার দেহ-মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, আর হালাল খাবার ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। এজন্য কুরআন হালাল উপার্জনের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন[৯]– يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করও না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" অন্যত্র বলা হচ্ছে[১০]-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ"হে মুমিনগণ, আহার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।" আরও বলেন[১১], يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ -"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত।" আরও বলেন-[১২] فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّبًا "অতএব আল্লাহ তোমাদের যে হালাল উত্তম রিয্‌ক দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে আহার কর।"

---

[১]. 'মিতব্যয়িতা' হল, নিষ্প্রয়োজনে অর্থ-সম্পদ এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয় না করার গুণ।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭ : আয়াত ২৯।
[৩]. ড. এম এ মান্নান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৬।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭ : আয়াত ৩১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ৬৭।
[৬]. মূল আরবী [إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات . وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইসতিকরাদ,হাদীস নং ২২৭৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল আক্বদিয়াহ, হাদীস নং ৫৯৩।
[৭]. আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, (কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.), খ.০৭, পৃ.২৫, হা.নং ৬৭৪৪।
[৮]. মূল আরবী [ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد]আবুল কাসেম তাবারানী, *প্রাগুক্ত*, খ.০৬, পৃ.৩৬৫, হা.নং ৬৬২৭।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৬৮।
[১০]. আল-কুরআন সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭২।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ৫১।
[১২]. আল-কুরআন সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬ঃ আয়াত ১১৪)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলগণ এবং মু'মিনদেরকে পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর রহস্য হলো- হালাল জীবিকা ও খাদ্য মানুষের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এর ফলে মানুষের অন্যায়, অসচ্চরিত্রতা ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃর্ণাবোধ সৃষ্টি হয় এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর ইবাদতের প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে এবং দু'আ কবুল হয়। পক্ষান্তরে, হারাম খাদ্য খেলে মন্দ অভ্যাস, নৈতিক দুর্বলতা ও চরিত্রহীনতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। ইবাদতের আগ্রহ কমে আসে এবং ভোক্তার দু'আ কবুল হয় না।

ইসলামে হালাল উপার্জনের ব্যাপারে জোর তাকিদ দিয়েছে। কুরআন ফরয ইবাদতের হালাল জীবিকা অন্বেষণের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়ার তাকিদ দিয়েছে। এ মর্মে বলা হয়েছে[১]– فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌কে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।"

কুরআন মতে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। আর ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[২]

> "হে মানব জাতি! আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলদের, তিনি বলেছেন–'হে আমার রাসূলরা! পবিত্র জিনিস খাও, আর নেক আমল কর।' তিনি আরও বলেছেন–'হে ঈমানদারগণ! আমার দেয় জীবিকা থেকে পবিত্র জিনিস খাও।' অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, যে দীর্ঘ পথের সফর করেছে, আর আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে দোয়া করছে, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম দ্বারাই সে প্রতিপালিত হয়েছে, সুতরাং এমন ব্যক্তির দোয়া কি করে কবুল হতে পারে?"
>
> রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন[৩], "হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দরভাবে রিযিক সন্ধানে চেষ্টা কর। কেননা কোন মানুষই তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান রিযিক গ্রহণ সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত মরে যাবে না, তাতে সে যতই ধীরতা অবলম্বন করুক না কেন। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং রিযিক সন্ধানে সুষ্ঠতা আন। যা হালাল তাই গ্রহণ কর, আর যা হারাম তাই পরিহার কর।"
>
> অন্যত্র বলেন[৪], "যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবন যাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।"
>
> অন্যত্র আরও বলেন[৫], "হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরযের পর একটি ফরয।"

হালাল উপার্জনকারী সৎ ব্যবসায়ীদের প্রশংসায় রাসূল সা. বলেন–[৬] "সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামাতের দিন নাবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থায় করবে।"

আয়-উপার্জন যেমন হালালভাবে করতে হবে তেমনি উপার্জিত সম্পদও ব্যয় করতে হবে বৈধ কাজে। মহান আল্লাহ বলেন–[৭] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ "হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না।"

হারাম উপায়ে উপার্জন এবং অবৈধ কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় ইসলামে গুরুতর অপরাধ ও অনৈতিক। এরূপকারী কিয়ামতের দিন ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেককে কিয়ামত দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। এ মর্মে রাসূল(সা.) বলেন-[৮],

> কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক পা নড়তে দেয়া হবে না। ক. জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে? খ. যৌবন শক্তি-সামর্থ্য কি কাজে ব্যয় করেছে? গ. ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে? ঘ. উপার্জিত সম্পদ কি কাজে ব্যয় করেছে? ঙ. দ্বীন সম্পর্কে যা জেনেছে সে অনুযায়ী কতটুকু কাজ করেছে?

❑.লেন-দেনে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা:

কুরআন আর্থিক লেন-দেনে ও ধার-কর্জ সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ঋণ, চুক্তি ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এটা সুশৃঙ্খল নৈতিক নীতিমালা। এতে পারস্পরিক বিবাদ ও সংশয় দূরীকরণে যে বিধি-বিধান দেয়া হয়েছে যুগান্তকারী। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–[৯]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ১০।

[২]. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০১৫, তিরমিযী ২৯৭৯।

[৩].মূল আরবী[أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها . فاتقوا الله وأجملوا في الطلب] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুত তিজারাত, হা. নং ২১৪৪।

[৪]. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার বাক্বায়িক ওয়াল ওরা'আ, হাদীস নং ২৫২০।

[৫]. মূল আরবী [طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة] ইমাম বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, খ.০৬, পৃ. ৪২০, হাদীস নং ৮৭৪১।

[৬].**মূল আরবী** [التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء] *সুনান তিরমিযী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা.নং ১২০৯; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুত তিজারাত, হা.নং ২১৩৯।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৭।

[৮]. মূল আরবী [لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وماذا عمل فيما علم] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ওয়ার রাকায়িক, হাদীস নং ২৪১৬ ।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ২৮২-২৮৩।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ- وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্য কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেরূপ আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বস্তু বলে দেয় এবং তার রব আল্লাহকে ভয় করে, এবং পাওনা থেকে যেন কোন কিছু না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। দেয়। আর তোমরা দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দু' জন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী– যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত মেয়াদ সহ লিখিতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তা না লিখলে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা কর তখন সাক্ষী রাখ। আর লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে হস্তান্তরিত বন্ধক রাখবে। আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে কর, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহকে ভয় করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করে, অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা আমল কর, আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

উল্লেখিত আয়াতে লেন-দেনে সম্পর্কিত কতগুলো সর্বজনীন নৈতিক নীতি প্রদান করা হয়েছে। এখানে প্রথম নীতি হল, আর্থিক লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা উচিত। যাতে ভুল-ভ্রান্তি কিংবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতি উদ্ভব না হয়। দ্বিতীয় নীতি হল, ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ বা দিন-তারিখ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার রোধ হয়। তৃতীয় নীতি হল, লেখক নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দেবে, এবং এতে সাক্ষী রাখবে,–যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা করা যায়।

পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে কুরআন দয়া ও কোমলতার নির্দেশ দেয়।[১] এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-[২],

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির এক ব্যক্তির হিসাব গ্রহণ করা হলে তার (আমলনামায়) তেমন কোন ভাল কিছু পাওয়া গেল না। তবে সে ছিল ধনবান ব্যক্তি। লোকদের সাথে সে যখন লেনদেন করত তখন নিজ কর্মচারীদের অভাবগ্রস্ত খাতকের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করার হুকুম দিত। এতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ ক্ষমা ও সহানুভূতির ব্যাপারে আমি তার চেয়ে অধিক উপযোগী। অতএব (হে ফিরিশতাগণ) তাকে রেহাই দাও।

বুখারীর বর্ণনা[৩] এরূপ–"এক লোক অন্যদের সাথে লেন-দেন করত। তার লোকদের সে বলত, কোন অভাবীর নিকট থেকে তোমরা যখন ঋৃণ আদায় করতে যাবে, তাকে ক্ষমা করে দিবে। হয়ত আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। ফলে মৃত্যুর পর সে যখন মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল, মহান আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন।"

এছাড়াও অর্থ-সম্পদ উপার্জন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কিছু নৈতিক নীতিমালা রয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৪]–"

সে ব্যবসায়ীদের উপার্জন সর্বাধিক উত্তম ও পবিত্র, যারা মিথ্যা কথা বলে না, ওয়াদা খেলাফ করে না, আমানতের খিয়ানত করে না, ক্রয় করার সময় অযথা মন্দ বলে না, বিক্রয় করার সময় পণ্য-দ্রব্যের মিথ্যা প্রশংসা করে না। আর তাদের নিকট কারোর পাওনা হলে তা দিতে বিলম্ব করে না, আর কারোর নিকট তাদের পাওনা থাকলে দেনাদারকে ভর্ৎসনা করে না, লজ্জা দেয় না।"

❑.স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কর্মপ্রচেষ্টা:

দারিদ্র্য[৫] অলসতা ও কর্মবিমুখতা মানবতার জন্য একটি বড় অভিশাপ। এটা মানুষকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, দুর্নীতি সহ নানাবিদ অন্যায়, ও অপরাধ পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। এ কারণে মানুষের মানবতাবোধ লোভ পায়, মানুষ যে কোন হিংস্রতা ও নিষ্ঠুর আচরণে জড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যায়। এটা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। তাই ইসলাম দারিদ্র্য, অলসতা ও কর্মবিমুখতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি, অলসতা ও কর্মবিমুখতার নিন্দা করেছে। মহানাবী সা. বলেন, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরীর

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা ০২: আয়াত ২৮০।

[২] . *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ১৫৬১, *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বুয়ূ', হাদীস নং১৩০৭।

[৩] . *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২৬৬।

[৪].মূল আরবী[إن أطيب الكسب كسب التجار الذي إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا و إذا باعوا لم يطروا و إذا كان عليهم لم يمطلوا و إذا كان لهم لم يعسروا] ইমাম বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ.০৪, খ.২২১, হাদীস নং ৪৮৫৪, আস-সুয়ূতী, *জামিউল আহাদীস*, খ.০৭, পৃ.১৮১, হা. নং ৩৬৪৫।

[৫]. দারিদ্র্য হচ্ছে–অভাব ও দীনতা। জীবনের মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার লাভের অপ্রতুলতা ও সংকট।

দিকে নিয়ে যায়।[১] এবং তিনি দারিদ্র্যের ফিতনা হতে ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[২] তাই ইসলাম কর্মপ্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন ও অভাব-অনটন থেকে বেঁচে থাকতে প্রয়োজনীয় পার্থিব সহায়-সম্পদ অর্জন করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। কর্মপ্রচেষ্টার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন–[৩] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্বরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" এখানে সালাত আদায়ের পর ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা অন্য কোন হালাল পন্থায় রিযক অন্বেষণের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার বলা হয়েছে।[৪] হালাল উপার্জন করাও ইবাদত ও পূণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে বলেন[৫], "নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কিছু খায় না। আল্লাহর নাবী দাউদ আ. নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"
কুরআন মানুষকে দুনিয়া ত্যাগের নির্দেশ দেয়নি কিংবা স্বচ্ছল, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুন্দরভাবে জীবন যাপনে নিষেধ করেনি।[৬] ইসলামে সম্পদকে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম গণ্য করা হয়েছে। তবে কুরআন কেবল পার্থিব ধন-সম্পদ পূজারী হওয়া এবং ভোগ-বিলাসে বিভোর থাকার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। বরং কুরআনে পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।[৭] দারিদ্র্য ও আর্থিক অনটন সংক্রান্ত যেসব বিষয় মানুষকে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে তা রোধকল্পে কুরআন কর্মপ্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৮] – هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً-"তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" আরও বলেন[৯]
وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا...وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
"আর যমীনকে আমি বিস্তৃত করেছি ... আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিয্ক দাতা নও তাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ ।" অন্যত্র বলেন-[১০] هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে–প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিয্ক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।" অন্যত্র আরও বলেন-[১১] وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ "এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার।" আরও ইরশাদ হচ্ছে[১২]-وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا- "আর আমি দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময়।"

কর্মের দ্বারা মানুষ উন্নতি ও অগ্রগতির চূড়ায় সমাসীন হয়। কর্মবিমুখ মানুষ যেমন নিজের উন্নতি সাধন করতে পারে না তেমনি সমাজেরও কোন উপকার করতে পারে না। ব্যক্তির উন্নতি ও অগ্রগতি যেমন কর্মের উপর নির্ভরশীল, তেমনি জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধিও গোটা জাতির সার্বিক কর্মপ্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি ও ও সামষ্টিক সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রত্যেকের কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে যেতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১৩] – وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى-"আর মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়।"
উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সীমিত রাখা যাবে না বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[১৪]–وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ "এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর।"

উন্নয়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল হবে মানুষ। মানুষের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে– মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আকাঙ্খা, আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি ও সামাজিক উন্নয়ন করতে হবে। তাই উন্নয়নের জন্য যেমন গুরুত্ব দিতে হবে ভৌত সম্পদ, মূলধন, শ্রমশক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, দক্ষতা ও সংগঠন প্রতি ঠিক তেমনি গুরুত্ব দিতে হবে মানুষের আদর্শ, মনোভঙ্গি, ইচ্ছা ও আকাংখা প্রতি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উজ্জীবিত করতে হবে এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জনে মানসিকতা তৈরী করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় সার্বিক জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে যে, নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন না

---

[১]. আবূ নুআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০৩, পৃ. ৫৩।
[২]. রাসূল সা. বলেছেন–হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে পানাহ চাই।[*সুনান আবূ দাউদ*, কিতবুল আদাব, হাদীস নং ৫০৯০] তিনি আরও বলেন–হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ক্ষুধা ও অনাহার থেকে কারণ তা নিকৃষ্ট শয্যাসাথী। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই খিয়ানত ও আত্মসাৎ থেকে কারণ তা নিকৃষ্ট অভ্যন্তরীণ অভ্যাস। [*সুনান আন-নাসাঈ*, কিতবুল ইস্তিযান, হাদীস নং ৫৪৬৮]
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ১০।
[৪]. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ.১৮, পৃ.১০৮।
[৫]. মূল আরবী [ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং ১৯৬৬।
[৬]. আল-কুরআন, ০৭:৩২।
[৭]. আল-কুরআন ২:২০১।
[৮]. আল-কুরআন সূরা আল-ফাতিহা ০২: আয়াত ২৯।
[৯]. আল-কুরআন সূরা আল-হিজ্‌র ১৫: আয়াত ১৯-২০) (৭: আয়াত ১০)।
[১০]. আল-কুরআন সূরা আল-মুল্‌ক ৬৭: আয়াত ১৫
[১১]. আল-কুরআন সূরা আল-ইসরা/বানী ইসরাঈল ১৭: আয়াত ১২
[১২]. আল-কুরআন সূরা আন-নাবা ৭৮: আয়াত ১১
[১৩]. আল-কুরআন সূরা আন-নাজম ৫৩ঃ আয়াত ৩৯।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৮৭।

করলে আল্লাহ পরিবর্তন করবেন না। মহান আল্লাহ বলেন[১]– إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ "আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"মহান আল্লাহ আরও বলেন[২] –وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ "প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী , এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।"

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে সফলতা অর্জনের জন্য পরিশ্রম ও সাধনার বিকল্প নেই। কোন কাজের ফল বৃথা যায় না। হাদীসে এসেছে[৩], "যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগায় বা ফসল ফলায় আর তা হতে যা কিছু খাওয়া হলে তা তার জন্য সাদাকা; তা থেকে যা চুরি করা হলে তা তার জন্য সাদাকা; তা থেকে বন্য প্রাণী খেলে তা তার জন্য সাদাকা; তা থেকে কোনো পাখী খেলে তা তার জন্য সাদাকা; কেউ তার ফসল নষ্ট করলেও তা তার জন্য সাদাকা।" অন্য বর্ণনা মতে[৪], "তোমাদের কারো কোন ফসল যদি কোন প্রকার দুর্যোগ বা আপদে নষ্টও হয় তবে তার জন্যও আল্লাহ সাওয়াব লিখবেন।"

ইসলাম ব্যক্তিকে নিষ্কার্মা হয়ে বসে থাকার শিক্ষা দেয় না, বরং পরিশ্রমী ও কর্মময় জীবনের শিক্ষা দেয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৫], "যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, আর তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সে যেন চারাটি রোপন না করে না উঠে অর্থাৎ সে যেন তা রোপণ করে।"

পার্থিব উন্নতির ন্যায় পরকালীন সফলতার জন্য সৎকর্ম সম্পাদনে কঠোর পরিশ্রম করা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন[৬]

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ- فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا - وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا-وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ- فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا- وَيَصْلَى سَعِيرًا - إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا- إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ- بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

"হে মানুষ, তোমার রব পর্যন্ত (পৌঁছতে) অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে; অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব–নিকাশ করা হবে। আর সে তার পরিবার–পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছনে দেয়া হবে, অতঃপর সে ধ্বংস আহ্বান করতে থাকবে। আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। নিশ্চয় সে তার পরিবার- পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল। নিশ্চয় সে মনে করত যে, সে কখনো ফিরে যাবে না। হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি দানকারী।"

❑কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বেকারত্ব দূরীকরণঃ

বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইসলাম সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা এবং বাস্তবসম্মত কর্মনীতি প্রদান করেছে। মানব জীবনকে কর্মময় করতে ইসলাম বৈরাগ্যবাদ এবং অলসতা ও অকর্মণ্যতাকে নিষিদ্ধ করেছে।[৭] ইসলাম বেকারত্ব, অলসতা ও অকর্মণ্যতা পরিহারে তাকিদ দিয়েছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা দিয়েছে।

মহান আল্লাহ মানুষের সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য পৃথিবীতে আবাদযোগ্য ব্যাপক কৃষি জমি ছাড়াও বিপুল পরিমানে প্রাণীজ, মৎস,কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও শিল্পজাত সম্পদ ভাণ্ডার প্রদান করেছেন।[৮] দারিদ্র্য, বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এ সব উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। জীবনকে কর্মময় করতে কুরআনে বলা হয়েছে[৯] – هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর; এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।"

কুরআন ও সুন্নাতে কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন পথ ও উপায় বাতলে দিয়েছে। ইসলাম কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন ও বিভিন্ন শিল্প কর্মে উৎসাহিত করেন। মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন। আর খাদ্য উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম কৃষিকাজ। কুরআনে কৃষিকাজের প্রতি উৎসাহ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১০]–

فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

অতঃপর তাতে (যমীনে) আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর ও শাক–সবজি, যায়তূন ও খেজুর বন, ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ–বাগিচা, আর ফল ও তৃণ গুল্ম। তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণ স্বরূপ।

---

[১].আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ১১।

[২].আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্ক্বাফ ৪৬: আয়াত ১৯।

[৩].মূল আরবী [ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق له منه صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة] *সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল মুসাকাত, হা. নং ১৫৫২।

[৪]. মূল আরবী [ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب الله له به أجرا]আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৭, পৃ.১৪৪, হা.নং ৬৬৫৫।

[৫]. মূল আরবী [ان قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৩, পৃ.১৮৩, হাদীস নং ১২৯২৫।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইন্শিক্বাক ৮৪: আয়াত ০৬-১৫।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭: আয়াত ২৭, আল-কুরআন ৭: আয়াত ২০৫।

[৮]. আল-কুরআন, ০৫:৯৬, ১৬:০৫,০৮,১৪,৬৬,৮০-৮১; ১৭:৬৬; ২০:৫৩-৫৪; ২১:৩১,৮০; ২৩:২১; ৩৬:৭১-৭৩,৮০; ৪৫:১২; ৫৭:২৫; ।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুল্ক ৬৭: আয়াত ১৫।

[১০]. আল-কুরআন,সূরা আবাসা ৮০: ২৭-৩২।

বেকারত্ব দূরীকরণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পতিত প্রতি ইঞ্চি অনাবাদি জমি চাষ করার ব্যাপারে ইসলামে তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–[১] "যে ব্যক্তি কোন পতিত অনাবাদি ভূমি চাষ করে, সে ঐ জমির মালিক হবে।" তিনি আরও বলেন "কারো কোন জমি থাকলে সে যেন তা চাষ করে। যদি সে চাষ করতে না পারে এবং অক্ষম হয়ে পড়ে, উক্ত জমি নিজ মুসলিম ভাইকে (চাষ করার জন্য মুফত) দিয়ে দেয়া উচিত, তবে তা ইজারা দিবে না।"[২]

বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইসলাম বৈধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে।[৩] মহান আল্লাহ বলেন[৪]- وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ-"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–[৫]"সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামাতের দিন নাবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থায় করবে।" অন্যত্র বলেন[৬], "সর্বোত্তম উপার্জন হলো কল্যাণকর ব্যবসা থেকে অর্জিত এবং ব্যক্তির স্বহস্তে উপার্জিত সম্পদ"। আরও বলা হয়েছে[৭] *"রিজকের দশভাগের নয় ভাগেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে"*।

বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও শিল্প-কারখানা মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজসাধ্য করে, উৎপাদন বৃদ্ধি করে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। তাই যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও শিল্পকর্মের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহী লোহা, তামা ও শিশার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮] –وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ "আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।"

লৌহের ব্যাপক নিত্যনতুন ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যানবাহন আবিষ্কারের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লব হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিমদের মনোযোগী করতে কুরআনে অতীত যুগের বিভিন্ন শিল্প কর্মের বিশেষ বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন জাহাজ শিল্পের গড়ে তোলার ইঙ্গিত রয়েছে নূহ ('আ.) জাহাজ নির্মাণে,[৯] প্রাচীর ও সেতু নির্মাণে ইঙ্গিত রয়েছে জুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মাণে[১০] দুর্গ, প্রসাদ, পানির পাত্র, বড় বয়লার ইত্যাদি নির্মাণে ইঙ্গিত রয়েছে সুলাইমান ('আ.) এর স্থাপত্য নির্মাণে।[১১] এভাবে লৌহ, তামা, শিশা প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন শিল্প গড়ে তোলা ইঙ্গিত রয়েছে এবং তেমনি এ সবের মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থানের পরোক্ষ নির্দেশনা রয়েছে।

বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কুরআন পশুপালনে উৎসাহিত করেছে।[১২] নদী-সমুদ্র ও জলাশয়ে মৎস চাষ ও শিকারের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।[১৩] মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণে দৈনিক বিপুল মাছ-মাংসের প্রয়োজন তেমনি বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন। এর মাধ্যমে বিশাল বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হতে পারে। জীবিকা নির্বাহের এ সব বৈধ মাধ্যমে মানুষ যেমন কর্মসংস্থান করতে পারে তেমনি বিপুল অর্থপোর্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে।

গাছ-পালা ও বনজ সম্পদ মানুষের জীবনে অতি প্রয়োজনীয়। এটা জ্বালানী কাজ, আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণসহ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ফলের বাগানের মাধ্যমেও নানাভাবে লাভবান হওয়া যায়। বেকার সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ। তাই কুরআন গাছ-পালা ও বনজ সম্পদের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।[১৪]

বেকারত্ব দূরীকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্র অর্জনে বিভিন্ন দেশে গিয়ে চাকুরী বা কাজ করতে উৎসাহ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে[১৫]- وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ -আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে।

বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ইসলামে দৈহিক পরিশ্রম, বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম অনুমোদিত। তাই ইসলাম বেকার হয়ে বসে থাকা পছন্দ করে না। আল্লাহর প্রিয় রাসূলগণও বেকার বা কারো প্রতি নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করেননি, বরং তাঁরা দৈহিক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন; অধিকন্তু, তাঁরা দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব পালন করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস বলেন, আদম ('আ.) কৃষক ছিলেন। নূহ ('আ.) ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। ইদরিস('আ.) দর্জি ছিলেন। দাউদ ('আ.) অস্ত্র প্রস্তুতকারী ছিলেন। মূসা('আ.) মেষপালক ছিলেন। ইবরাহীম('আ.) চাষী ছিলেন। সালিহ

---

[১].মূল আরবী [من أحيا أرضا ميتة فهي له] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল খারাজ, হাদীস নং ৩০৭৩।

[২].মূল আরবী [من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মুযারা'আহ, হা. নং ২২১৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বুয়ূ, হা. নং ১৫৩৬।

[৩]. আল-কুরআন ৪:২৯

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৫, আরও দেখুন, আল-কুরআন, ৬২:০৯-১০, ০২:১৯৮।

[৫].**মূল আরবী** [التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء] *সুনান তিরমিযী*, কিতাবুল বুয়ূ', হা.নং ১২০৯; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুত তিজারাত, হা. ২১৩৯।

[৬].মূল আরবী [سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৩, পৃ.৪৬৬, হাদীস নং ১৫৮৭৪।

[৭].মূল আরবী [تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي] *কানজুল উম্মাল*, খ.০৪, পৃ.৫৫, কিতাবুল বুয়ূ, হা. নং ৯৩৪২।

[৮]. আল-কুরআন (সূরা আল-হাদীদ৫৭: আয়াত ২৫) (সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৯৬) (সূরা আন-নামল ২৭: আয়াত ৪৪)

[৯]. আল-কুরআন, ১১:৩৮-৪১।

[১০]. আল-কুরআন, ২৮:৯৬।

[১১]. আল-কুরআন, ৩৪:১৩, ২৮:৩৮।

[১২]. আল-কুরআন, ৬:১৪২, ১৬:৫।

[১৩]. আল-কুরআন, ৫:৯৬, ১৬:১৪।

[১৪]. আল-কুরআন ২০:৫৩, ৩৬:৮০।

[১৫]. আল-কুরআন ৭৩:২০।

('আ.) ব্যবসায়ী ছিলেন।...রাসূল সা. নিজেও (মক্কায়) মেষ চরিয়ে ছিলেন।[১] কুরআনে ইউসুফ আ. ঘটনায় বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমেরও অনুমোদন পাওয়া যায়।[২] বিশিষ্ট বুজুর্গ শায়খ শা'রানী-'আবিদের (বুজুর্গদের) উপর কারিগরদের প্রাধান্য দিতেন। কেননা ইবাদতের উপকার আবিদের নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর বিভিন্ন পেশার কারিগর দ্বারা গণমানুষ উপকৃত হন।'[৩]

স্বনির্ভরতা অর্জন ও বেকারত্ব দূরীকরণে করণীয়: ক. জনগণের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ। খ.সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। গ.বেকার যুবক ও মহিলাদের যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ঘ.নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা। ঙ.ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎসচাষ, পল্ট্রিফার্ম, পশু পালন, তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে চাকুরী।

.....

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়সমূহের বর্ণনা এখানেই শেষ করা হলো। অর্থনীতি একটি চলমান ও পরিবর্তনশীল বিষয় হলেও আয়-ব্যয় ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করণীয় বিষয়সমূহ:

শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানব জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহের একটি। মানব সভ্যতার গতিধারা রক্ষার জন্য তা অতি জরুরী। যা মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে। এজন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে মানব জাতিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে নাবী-রাসূল প্রেরণ করেন। ইরশাদ হচ্ছে[৪]- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوعَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوامِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ "তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের নিকট পাঠ করে শুনান তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।"

বর্তমানকালে শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপকভাবে চর্চা হলেও সমাজে ব্যাপক অজ্ঞতা-মূর্খতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত এই শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারায় নানা ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও মন্দ দিক থাকায় মানুষ এ থেকে প্রকৃত উপকার পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় মানুষের জন্য ওহী নির্ভর চিরকল্যাণকর শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা জরুরী। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো–

❑. যথাযথ সূত্র থেকে দ্বীনি ও কল্যাণকর জ্ঞানার্জন (طلب العلم):

জ্ঞান শব্দের আরবী প্রতিশব্দ আল-ইল্ম(العلم)। এর আভিধানিক অর্থ-জ্ঞান, তথ্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান, তত্ত্ব। পরিভাষায় العلم هوالإعتقاد الجازم المطابق للواقع-"জ্ঞান হলো কোন বিষয় সম্পর্কে বাস্তবতার অনুরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস করা।"[৫] রাগিব ইস্পাহানী বলেন, "জ্ঞান হচ্ছে কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাকে যর্থাথভাবে অনুধাবন করা।"[৬] আয-যারকানী বলেন, "আল্লাহ, তাঁর নির্দেশনাবলী এবং মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী অনুধাবন করার নাম 'ইলম।"[৭]

আল-কুরআন তার অনুসারীদের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে না। কুরআন মানুষকে জ্ঞান-গবেষণার আহবান জানায়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করে জেনে-বুঝে মানুষকে ঈমান আনার তাকিদ দেয়।[৮] কুরআনে জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব আরোপ তা অনুমান করা যায় এ থেকে যে, কুরআনে সর্বপ্রথম যে বাণী বা নির্দেশ নাযিল

---

১. *আল-মুস্তাদরাক 'আলা সহীহাইন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ. ৬৫২, কিতাবুত তাওয়ারিখ, হাদীস নং ৪১৬৫।
২. আল-কুরআন ১২ : ৫৪-৫৫।
৩. ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *মুশকিলাতুল ফাকুরি ওয়া কাইফা 'ইলজুহা ফীল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ০২ ।
৫. আল-জুরজানী, *আত-তা'রীফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৯।
৬. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ. ০২, পৃ.৪৪৬।
৭. মুহাম্মদ আবদুল আযীম আয্-যারকানী, *মানাহিলুল ইরফান*, *প্রাগুক্ত*, খ. ০২, পৃ.১০।
৮. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ১৯।

হয়েছে তা ঈমান আনা, কিংবা সালাত কায়েম, সাওম পালম, যাকাত বা হজ্জ আদায় সম্পর্কিত ছিল না, বরং তা ছিল জ্ঞানার্জনের নির্দেশ সম্বলিত। এ মর্মে বলা হয়েছে[১]

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ-خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ-اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ-الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

"পড়, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে; পাঠ কর, আর তোমার রব মহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।"

উল্লেখিত আয়াতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের নিকট জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ছিল না তখন মানুষকে জ্ঞানচর্চার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যা মূর্খতা, কুসংস্কার ও নিরক্ষরতার দূরীকরণের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটা মানুষকে সমৃদ্ধ করার আহবান। মানুষ যাতে ব্যাপকভাবে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নিজে উপকৃত হয় এবং জগতবাসীকে সমৃদ্ধ করতে পারে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এই নির্দেশ বাস্তবায়নে নাবী সা. জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ফরয করে দেন। শুধু তাই নয়, জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে[২]- وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا "বল, হে আমার রব! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর।"

কুরআনে জ্ঞানীদের যেসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তারা চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ন। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণকারী এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টিবৈচিত্র চিন্তা-গবেষণকারী, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানের অধিকারী এবং স্বীয় পাপ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।[৩] তারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ কামনা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত ও দান-সাদাকা করে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা অটুট রাখে। পরকালে মন্দ হিসাবের ভয় করে। ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে।[৪] বস্তুত এ সব গুণ যার মধ্যে আছে তিনি সত্যিকার জ্ঞানী। আজকের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কেউ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিলে তাকে জ্ঞানী মনে করা হয়। বাস্তবে তারা নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ে কিছু জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে, তবে উল্লেখিত গুণাবলী না থাকলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। আর জ্ঞানীর অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য মধ্যে অন্যতম হলো, জ্ঞানীরা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন, সত্য উত্তমভাবে শ্রবণ করে, সত্য অনুধাবন ও গ্রহণে সচেষ্ট হয়। এ মর্মে কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন[৫]– الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ "যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান।"

জ্ঞানের প্রকারভেদ: জ্ঞান প্রধানত দু'প্রকার, যথা ক. দ্বীনি জ্ঞান, খ. প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই দু'ধরনের জ্ঞানের মধ্যে প্রথম প্রকার জ্ঞান তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজে আইন বা আবশ্যক। আর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান তথা ফরযে কিফায়াহ্ জ্ঞান, তা প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব শাখা, যা সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর। প্রত্যেক জনপদের একদল লোকের জন্য তা অর্জন করা আবশ্যক। আর কেউ তা অর্জন না করলে সকলে অপরাধী হবে।[৬] যেমন, চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদি। এছাড়া যে সব বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা ফরয নয়, বরং অতিরিক্ত বা বৈধ পর্যায়ের তা কেউ চাইলে গ্রহণ করতে পারে। তবে যে সব জ্ঞানের বিষয়ে মানুষের কল্যাণ নেই এবং যা দ্বীন, ঈমান ও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর; যেমন যাদু বিদ্যা, ভেলকিবাজি ইত্যাদি। ইসলাম এ জাতীয় অকল্যাণকর বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ সা. এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও অকল্যাণকর জ্ঞান থেকে আশ্রয় চেয়েছেন [ইমাম ইবনু মাজাহ, *সুনান*, আল-মুকাদ্দমাহ, হাদীস নং ২৫০]।

প্রত্যেকের জন্য দ্বীনের কতটুকু পরিমান জ্ঞানার্জন ফরয–এ নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে সাধারণ কথা এই যে, একজন মুসলিমের জন্য দীন ও দুনিয়ার জন্য যতটুকু জ্ঞান না থাকরে চলে না ততটুকু জ্ঞানার্জন ফরয। তা হলো– ক.বিশুদ্ধ ঈমান-আকীদা অর্জন এবং শিরক, কুফর, নিফাক ও বিদ'আত মুক্ত হওয়ার জ্ঞান। খ.সঠিকভাবে ইবাদতের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান। গ. ব্যক্তিগত, পরিবার ও সমাজ জীবনে স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন, আচার-আচরণ, লেন-দেন, স্বীয় পেশার বৈধতা-অবৈধতা, মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-কাজ, পবিত্রতা অর্জনের পন্থা, সালাত, সাওম, সালাতে পঠিত কুরআন, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কিত বিধান, বিবাহ-তালাক, নিজ পেশা তা কৃষি, ব্যবসা, চাকুরী বা অন্য যা-ই হোক না কেন, হালাল-হারাম, আবশ্যকীয়-অনাবশ্যকীয়, তথা ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব ইত্যাদি শরয়ী বিধি-বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান।[৭] এছাড়াও ব্যক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠায়, কর্মে ইখলাস অবলম্বন, আমল পরিশুদ্ধ উপযোগী ইখলাস হাসিলের জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আলাক্ব ৯৬: আয়াত ০১-০৫।
[২]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১১৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ৩: আয়াত ৭-৯, ১৮, ১৯০-১৯৪; আল-কুরআন ৩৯:২১; ৬৫:১০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ১৯-২২।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ১৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত , আল-কুরআন ৪৩; ২১:৭।
[৭].দেখুন, ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *রাসূলুল্লাহ সা. শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩০-৩৮, ইবন হাযম রচিত *'আল-আহকাম ফী উসুলিল আহকাম'* এর ৩১ পরিচ্ছদ, আবূ হামিদ আল-গাযালী রচিত *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ১ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছদ।

হারাম-হালালের জ্ঞান, রিয়ার অনিষ্টকারিতার জ্ঞান এবং মানুষের সঙ্গে সহঅবস্থানের নিমিত্ত ন্যূনতম অপরিহার্য জ্ঞান, এমনিভাবে, অমুসলিম অধ্যুষিত দেশের অধিবাসী সে দেশে অবস্থান করার ব্যাপারে তাদের করণীয় বিষয় ও কৌশল অবলম্বনের ব্যাপারে জানা, যাতে বাচতে পারে ইত্যাদি জ্ঞান ফরযে আইন। হিংসা, দম্ভ, অহংকারের অনিষ্টকারিতার জ্ঞান, বিয়ে-শাদী ও তালাক সম্পর্কিত জ্ঞান, এমন সব বাক্য উচ্চারণ ও শব্দ প্রয়োগের জ্ঞান যেগুলো প্রয়োগের কারণে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ হারাম ও কুফরির সীমায় পৌঁছে যায়– এসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ফরযে আইনের আওতায় পড়ে।
দ্বীনের বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জন ফরযে কিফায়াহ্, যা প্রত্যেক জনপদের কিছু লোকের জন্য আবশ্যক, সবার জন্য নয়।[১]

তবে জ্ঞানের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বিদ্যমান আল্লাহর প্রতি দিক নির্দেশক ও রহস্যরাজি নিদর্শনমালার জ্ঞান সব জ্ঞান থেকে উত্তম। কুরআন বিশেষভাবে সৃষ্টি রহস্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানুষকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য, বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টিদান ও চিন্তা-গবেষণা নির্দেশ দিয়েছে।[২] যারা চিন্তা-গবেষণাকে কাজে লাগায় না কুরআন তাদের ধিক্কার দিয়েছে।[৩]

জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে– মহান আল্লাহকে জানা, তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানব জীবনে দায়িত্ব-কর্তব্য, মনুষ্যত্ব্যের বিকাশ সাধন, পূর্ণতা অর্জন, ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা জানা, কুবৃত্তি দমন ও সুবৃত্তির লালন। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ উদ্‌ঘাটন করে মানব জীবনে তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে মার্জিত, সুসভ্য, বিনম্র, ন্যায়পরায়ন ও দায়িত্বপরায়ন রূপে গড়ে তোলা। মোটকথা–জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য শুধু শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের বিকাশের মধ্যে সীমিত নয়, বরং তা আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলনও বটে।

জ্ঞানের গুরুত্ব: বিশুদ্ধ কল্যাণকর জ্ঞান কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। বিশুদ্ধ কল্যাণকর জ্ঞান এমন শক্তি যা মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের সাথে সাথে মানুষের আত্মিক উন্নতি সাধন করে। এটা মানুষের নিকট সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ ও এদের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করে। জ্ঞানের কারণে মানুষকে অন্যান্য জীব-জানোয়ার থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ। এটা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে উপযোগী করে গড়ে তোলে। বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যদি তা সৎ উদ্দেশ্যে হয়। এ সব কারণে ইসলাম জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথম মানব আদম('আ.) কে সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ্ প্রথমে তাঁকে সব মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেন। ইরশাদ হচ্ছে[৪] -وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا-"আর তিনি শিখালেন আদমকে সব কিছুর নাম।"

কোন বিষয় বিশ্বাস করতে হলে প্রথমে তা সঠিকভাবে জানতে হয়। আর ঈমান কোন অন্ধবিশ্বাসের নাম নয়, বরং তা বিশুদ্ধ জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস। তাই প্রকৃত মু'মিন হতে হলে ঈমান ও ইসলাম বিষয়ক সঠিক জ্ঞানার্জন জরুরী। উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞান ঈমানের ভিত্তি স্বরূপ। 'আমল সঠিক হওয়ার জন্য এই জ্ঞান অপরিহার্য। এছাড়া ইবাদত ও আচরণ সঠিক হয় না। বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করলেই পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না। পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার জন্য প্রয়োজন বাস্তব আমল। আর বাস্তব আমলের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা গ্রহণ ও সুস্থ মানসিকতা তৈরি। ঈমানের পরে বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞান আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির প্রথম উপায়। যারা যত্ন ও সতর্কতার সাথে জ্ঞানার্জন করে তারা আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা ও দয়া সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে এবং তার দয়া লাভে সচেষ্ট হয়। এজন্য বলা হয়েছে[৫]–فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ "জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।"
এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানের আগে ইলম জরুরী। কিসে ঈমান আনতে হবে এবং কিভাবে ঈমান বিশুদ্ধ হবে তা প্রথমে জানতে হবে। অনুরূপভাবে সকল কর্মের সফলতা নির্ভর করে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর। তাই প্রত্যেককে দীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা ফরয। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্ভব না হলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ ফরয আদায় করতে হবে। এজন্য দ্বীনি জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও জ্ঞান অন্বেষণকারীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৬],

> যদি কেউ জ্ঞানার্জনের মানসে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফিরিশতাগণ শিক্ষার্থীর এই কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাদের পাখাগুলি বিছিয়ে দেন। আলিম(জ্ঞানী) এর জন্য আসমান এবং জমিনের সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (রাতের বেলায়) তারকাররাজির উপরে চাঁদের যেমন মর্যাদা, ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত 'আবিদের' উপরে 'আলিমের' মর্যাদা তেমনই। আলিমরাই হচ্ছেন নাবীদের উত্তরাধিকারী। নাবীগণ(আ) কোনো টাকা-পয়সা দীনার-দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যান নি। তাঁরা শুধু ইলম-এর উত্তরাধিকার রেখে যান। কাজেই যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করল, সে নাবীদের উত্তরাধিকার থেকে একটি বড় অংশ গ্রহণ করল।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ৯: আয়াত ১২২।
[২]. আল-কুরআন, ৫১:২০-২১, ৩৫:২৭-২৮, ৮৬:০৫, ১০:১০১,০২:১৬৪, ০৩:১৯০।
[৩]. আল-কুরআন, ০৮:২২; ২২:৪৬; ০৭:১৭৯।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৩১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ১৯।
[৬]. **মূল আরবী** [من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر] *সুনান আবূ দাঊদ*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ৩৬৪১।

জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. কে জিহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমি কি তোমাকে জিহাদের চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা বলবো না? তা হলো তুমি একটি মসজিদ বানাবে এবং সেখানে মানুষকে কুরআন, রাসূল সা. এর সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞান শিক্ষা দেবে।"[১]

বিশুদ্ধ জ্ঞান মহান আল্লাহর ভূষণ।[২] বিশুদ্ধ জ্ঞান মানুষকে সুসভ্য, বিনয়ী, সৎ, সংযমী হতে সাহায্য করে। বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে ব্যক্তি উদারতা, সহনশীলতা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি আল্লাহর গুণের মহৎ গুণ হাসিল করে থাকে। সত্যিকার জ্ঞান আল্লাহর প্রতি বিনীত, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক গুণ অজর্নে সহায়তা করে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ-"আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে।"
এখানে আলেম বলতে দ্বীনী ইলমের অধিকারীদের বুঝানো হয়েছে। কেননা পার্থিব ইলম কাফের-মুশরিকরাও শিখে থাকে। কিন্তু তারা আল্লাহ ভীরু নয়। কারণ পার্থিব ইলম কাউকে আল্লাহ ভীরু বানায় না।
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, "ব্যক্তির জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে থাকে। আর তার মূর্খতা অনুপাতে স্বীয় জ্ঞানের জন্য দম্ভ প্রকাশ করেন।"[৪]

দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণের জন্য ইসলাম বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৫]–" জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারীর) উপর ফরয।"
"এখানে যে ইল্‌ম বা জ্ঞানের–এর কথা বলা হয়েছে, তা প্রচলিত ধরনের দীনী ইল্‌মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব ধরনের কল্যাণকর ইল্‌মই এর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সমাজ তার এই জীবনে যত ধরনের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী তা সবই শিখতে হবে। তাতে স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ সভ্যতা পরিচালনা ও সংগঠন সংক্রান্ত সব ইল্‌ম শামিল রয়েছে। শত্রুদের প্রতিরোধ করার জন্য সামরিক বিদ্যাও এর বাইরে নয়। এ সবই ফরযে কিফায়া।"[৬]

সর্বসাধারণের জ্ঞানার্জনের তাকিদ দিতে গিয়ে জুমু'আর দিন দ্রুত জুমু'আয় গিয়ে খুৎবা শ্রবণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৭] জ্ঞানার্জনের জন্য জুমু'আর খুৎবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ওয়াজিব করা হয়েছে।

ইসলামী সমাজে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি ধন–সম্পদ, ক্ষমতা ও পদবীর মধ্যে নয় বরং ইলম(জ্ঞান), ঈমান ও তাকওয়াই মর্যাদার মাপকাঠি।[৮] বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর জ্ঞান মানুষের মুক্তির দিশারী এবং সত্য পথে চলার চালিকাশক্তি। তা মানুষকে কল্যাণের পথনির্দেশ করে এবং অকল্যাণ থেকে ফিরিয়ে রাখে। বিশুদ্ধ জ্ঞান সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদের মাধ্যম। বিশুদ্ধ জ্ঞান মানুষকে অন্যায়, অসত্য, অকল্যাণ, মিথ্যা ও মন্দ পথ পরিহার করে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। তাই মূল্যবোধের উন্নয়নে মানুষের জন্য জ্ঞানের চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন বলা হয়েছে[৯]–قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ "বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" জ্ঞানার্জনের তাকিদ দিয়ে আরও বলা হয়েছে[১০]–فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ- "তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাস কর।"
জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ইবাদতের চেয়ে কম নয়। এ সম্পর্কে মুয়ায ইবন জাবাল রা. বলেন–

> জ্ঞান অর্জন কর। কেননা জ্ঞানার্জন করাই হলো আল্লাহভীতি, জ্ঞানান্বেষণ ইবাদত। জ্ঞানচর্চা তাসবীহ পাঠ তুল্য। তার গবেষণা হলো জিহাদ। যে জানেনা তাকে জ্ঞান দান করা সাদাকা। উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা ব্যয় করা নৈকট্য। এই জ্ঞান একাকীত্বে সঙ্গী, নির্জনে বন্ধু, দ্বীনের ব্যাপারে পথপ্রদর্শক, স্বচ্ছলতা ও অভাবে সাহায্যকারী,বন্ধুদের সাথে থাকাবস্থায় পরামর্শদাতা, ঘনিষ্ঠদের সাথে থাকার সময় অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান তার অধিকারীকে ন্যায়-অন্যায় চিনতে সহায়তা করে। তা জান্নাতের পথের আলোকবর্তিকা, [নির্বান্ধব অবস্থায় এই জ্ঞান আমাদের সংগী, এই জ্ঞান আমাদের সুখের পথে পরিচালিত করে; দুর্দশায় তা আমাদের রক্ষা করে, শত্রুর বিরুদ্ধে তা অস্ত্র, আর বন্ধু সমাবেশে তা অলংকার।] এই জ্ঞানের কারণে আল্লাহ বিভিন্ন জাতিকে উন্নত করেন এবং সৎকাজে তাদের পথ প্রদর্শন করেন তাদের নেতৃত্ব দান করেন, ফলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়, তাদের কার্যাবলী অনুসরণ করা হয় এবং তাদের মতামত অনায়াসে গৃহীত হয়...এই দ্বারাই আল্লাহর অনুগত্য ও ইবাদত করা হয়, এর দ্বারা আল্লাহর একত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করা হয়, এর দ্বারা তাকওয়া অবলম্বন করা হয়, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করা হয়, হালাল-হারাম চিনা যায়। জ্ঞান হলো ইমাম তুল্য হয়, 'আমল তার অনুসারী। সৌভাগ্যবানরা তা দ্বারা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে তা লাভ করে, আর হতভাগারা তা থেকে বঞ্চিত হয়।[১১]

---

[১]. ইবন 'আবদিল বার,*জামি'উ বয়ানুল ইলম* (http://www.alsunnah.com),খ.০১,পৃ.১৪১, রিওয়ায়েত নং ১৩০ এবং খ.০১,পৃ.২৫৯, রিওয়ায়েত নং ২৪৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৭১, আল-কুরআন (০৯:১৫,৬০) (৬০:১০)।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ২৮।
[৪]. **মূল আরবী** [بحسب المرء من العلم أن يخاف الله وبحسبه من الجهل أن يعجب بعمله]*আল-মুছান্নাফ ইবন আবী শায়বা*, খ..০৭, পৃ.১০৩, কিতাবুয যুহদ, রিওয়ায়েত নং ৩৪৫১৮।
[৫]. **মূল আরবী** [طلب العلم فريضة على كل مسلم] *সুনান ইবন মাজাহ*, (আল-মুকাদ্দমাহ), হাদীস নং ২২৪ ।
[৬]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ফিকহুয যাকাত*, (বৈরুত : মু'আসাসতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৩ হি.), খ.০২, পৃ.৫৭০।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ০৯।
[৮]. আল-কুরআন : ৪৯:১৩ , ৩৯:৯, ৫৮:১১।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আয্‌-যুমার ৩৯: আয়াত ০৯। সূরা আত্‌-তাওবাহ ৯: আয়াত ৭৫-৭৭
[১০]. আল-কুরআন, ১৬:৪৩, ২১:০৭।
[১১]. ইবন 'আবদিল বার, *জামি'উ বয়ানুল 'ইলম* , *প্রাগুক্ত*, খ.০১,পৃ.২৩৫, রিওয়ায়েত নং ২১৯; আবূ নুআইম ইসপাহানী,*প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.২৩৯।

বিশুদ্ধ জ্ঞান আলো স্বরূপ, যা মানুষকে আলোকিত করে বা আলোর পথ নির্দেশ করে। আর অজ্ঞতা অন্ধকার স্বরূপ, যা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছান্ন করে এবং ভ্রষ্টতা ও অন্ধকার পথে ধাবিত করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকবর্তিকা মানুষকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথ দেখায় এবং কুসংস্কারাচ্ছান্ন হওয়া থেকে মুক্ত করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং অন্যকেও রক্ষা করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, অজ্ঞতা এমন এক অন্ধকার, যার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মানুষ বিপথগামী হয়ে ধ্বংস ও জাহান্নামের পথের দিকে অগ্রসর হয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ-وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَاالنُّورُ-وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ-وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ

"আর অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, আর অন্ধকার ও আলো সমান নয়, আর সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র, আর জীবিতরা ও মৃতরা এক নয়।" উল্লেখিত আয়াতে রূপকের মাধ্যমে জ্ঞানকে আলো এবং জ্ঞানীকে জীবিত ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যাক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর অজ্ঞতাকে অন্ধকার এবং অজ্ঞকে অন্ধ ও মৃত ব্যাক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে। এবং বলা হচ্ছে, সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানী ও মূর্খের দৃষ্টিভঙ্গি সমান নয়। আর উভয়ের মর্যাদাও এক নয়। আবার অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়– এ প্রসঙ্গে এটাও বলা যেতে পারে, অন্ধ ব্যক্তি ভালো-মন্দ দেখতে পায় না; ফলে সে যে কোন মুহুর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। পক্ষান্তরে, চক্ষুষ্মান ভালো-মন্দ দেখতে পায়; ফলে সে নিজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। তেমনি জ্ঞানীরা জ্ঞানের আলোর সাহায্যে ভালো গ্রহণ এবং মন্দ থেকে নিজকে বাঁচাতে পারে কিন্তু মূর্খরা তা পারে না।

জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎকৃষ্ট নিয়ামত, এর কল্যাণ নানাবিধ। জ্ঞান মানব মনের সংকীর্ণতা দূর করে চিন্তা-চেতনায় প্রশস্ততা আনে এবং মানুষের মধ্যে উদারতা সৃষ্টি করে। জ্ঞান অজ্ঞতা, কুসংস্কার, চরমপন্থা, উগ্রতা, ভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে বের করে আনে। জ্ঞানের দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়, মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় এবং শত্রুকে মিত্রে পরিণত করা যায়। এভাবে এর মাধ্যমে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এজন্যে কুরআনে বলা হয়েছে[২]– وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ "যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কলাণ দান করা হয় এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) যথার্থই বলেছেন, ' আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনের ইলম দান করেন'।[৩]

কল্যাণকর জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যুর পরও উপকৃত হয়ে থাকে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন,

> যখন মানুষ মরে যায় তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার থেকে সমস্ত কাজ ছিন্ন হয়ে যায়। সে তিনটি ব্যতীত কোনো আমলই তার কাছে পৌঁছায় না। সাদকায়ে জারিয়াহ, তথা এমন সাদ্‌কা, যা প্রচলিত থাকে। কিংবা এমন কোনো ইল্‌ম বা জ্ঞান, যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। অথবা নেক-সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।[৪]

জ্ঞান মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। সমাজ ও রাষ্ট্রে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য পূর্বশর্ত জ্ঞান।[৫] মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য, জীবন ও জগৎ গুরু রহস্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খরা উদাসীন। কেবল জ্ঞানীরাই এ সব ব্যাপারে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে কাজ করতে পারে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ কোন অজ্ঞ জাতি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থভাবে সম্পন্ন করতে পারে না, অধিকন্তু, তারা সহজেই অধঃপতন ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে[৬]–وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ "আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি;আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।"

হাদীসে এসেছে[৭], নিশ্চয়ই মানুষ ভালো কাজ করে থাকে, তবে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামতের তাদের প্রতিদান দেয়া হবে। ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, বান্দাদেরকে তাদের জ্ঞান অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ একজনের উপর অন্যজন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। জ্ঞান মানুষের মর্যাদা সমুন্নত করে এবং ব্যক্তিত্বকে শানিত করে। জ্ঞানীরাই সমাজে নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠেত্বর আসন অলংকৃত করে। আর জ্ঞানহীন লোক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না। জ্ঞানের দিক থেকে যখন কোন জাতি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে তখন তারা পৃথিবীতে নের্তৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে আসীন হয়। এজন্য বলা হয় 'জ্ঞানই শক্তি'। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮] – يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

---

[১]. আল-কুরআন, (সূরা ফাতির ৩৫ঃ আয়াত ১৯-২২) আরও দেখুন (সূরা আল-মু'মিন/গাফির ৪০ঃ আয়াত ৫৮)

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৯।

[৩].মূল আরবী [من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين] *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ৭১।

[৪]. মূল আরবী [إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ওসীয়ত, হাদীস নং ১৬৩১।

[৫]. আল-কুরআন, ০২: ২৪৭; ১২:৫৫।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৩।

[৭]. ইবন কুতাইবা, '*উয়ূনুল আখবার*, (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.) খ.১, পৃ.২৭৯; ইমাম বাইহাকী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ৪৬৪০।

[৮]. আল-কুরআন, (সূরা আল-মুজাদালা ৫৮: আয়াত ১১) (সূরা আল-আন'আম ০৬:আয়াত ৫০)।

বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে সত্য ও মুক্তির পথ দেখাতে নাবী-রাসূলদের প্রেরণ করা হয়। প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে যখন শিক্ষার কোন গুরুত্ব ছিল না, তখন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (‘আ.) নিজ বংশধর ও পরবর্তী মানব জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, ধর্মতত্ত্ব সহ মৌলিক শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। যেমন বলা হয়েছে–[১] رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ “হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’।” আরও বলা হয়েছে[২]– كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ “যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না। ” উল্লেখিত আয়াতের আলোকে আমাদের উচিত নিজ সন্তান ও বংশধরদের জন্য নৈতিকতা ধর্মতত্ত্ব সহ মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সততা, উন্নত নৈতিকতা ও তাকওয়ার জন্ম দেয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আমি যে সব বিষয় জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তবে তোমরা খুব কমই হাসাহাসি করতে, বরং খুব বেশি করে কান্নাকাটি করতে এবং সুখ-শয্যায় স্ত্রীদের সাথে মিলন স্বাদও গ্রহণ করতে না। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ ও আর্তচীৎকার করতে করতে জঙ্গল বা ঊষর মরুভূমির দিকে বের হয়ে পড়তে।”[৩]

বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের মধ্যে দ্বীনি জ্ঞান সর্বোত্তম। দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষ ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও সত্য-মিথ্যা জানতে পারে। এটা শিরক, কুফর, নিফাক ও সর্বপ্রকার অন্যায় কর্ম থেকে বাঁচতে সহায়তা করে। এটা মানুষকে শয়তানের ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। দ্বীন ও ঈমান সঠিক বুঝার জন্যও সাহায্য করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪] – الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ “যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।” অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-[৫] أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ “যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। ”

আবূ দারদা (রা.) বলেন, ‘আমি সারা রাত সালাত আদায় করা অপেক্ষা একটি মাস‘আলা শিক্ষা করাকে অধিক পছন্দ করি।’ তিনি আরও বলেন, “হয় আলিম, নচেৎ ছাত্র কিংবা শ্রোতা হও, চতুর্থ কিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।”[৬]

এ প্রসঙ্গে শায়খ আবদুল কাদির জীলানী রহ. (১০৭৭-১১৬৬ খৃ.) জীবনের একটি ঘটনা শিক্ষণীয়। একদা শয়তান তাঁকে বিভ্রান্ত করতে এসেছিল। তিনি বলেন–“একদা আমি যখন গভীরভাবে ইবাদতে মগ্ন ছিলাম তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে একটি চমৎকার বিশাল সিংহাসন দেখতে পেলাম যার চতুর্দিকে অতিশয় উজ্জল আলোর জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তখন একটি বজ্রধ্বনি তুল্য স্বর আমার কানে আঘাত করল, ওহে আবদুল কাদির আমি তোমার প্রভু; আমি অন্যের জন্য যা নিষিদ্ধ (হারাম) করেছি তোমার জন্য তা বৈধ(হালাল) করলাম। আবদুল কাদির জিজ্ঞাসা করলেন,‘তুমি কি আল্লাহ, যিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই’। যখন উত্তর এলো না, তিনি বললেন, ‘দুর হও, হে আল্লাহর দুশমন’। সাথে সাথে আলোকময় সিংহাসনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলএবং অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করল।সেই কণ্ঠটি তখন বলল, আবদুল কাদির, দ্বীন সম্পর্কিত তোমার অগাধ জ্ঞান ও তোমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে তোমার সম্যক অবগতির দ্বারা আমার চক্রান্ত থেকে বেঁচে গেলে। আমি এই কৌশল দ্বারা সত্তর জনেরও বেশী পুণ্যাত্মা ইবাদতকারীকে বিভ্রান্ত করেছি।” পরবর্তীতে লোকে আবদুল কাদির(রহ.) কে জিজ্ঞাসা করেছিল– তিনি কিভাবে বুঝলেন যে সেটা ছিল শয়তান? তিনি উত্তরে বলেন, তার কথা দ্বারা (আমি অন্যের জন্য যা হারাম করেছি তোমার জন্য তা হালাল করলাম) তাকে চিনতে পেরেছি। কেননা আমি জানি যে, মুহাম্মাদ সা. এর নিকট যে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে তা রহিত ও পরিবর্তন করা যায় না। তাছাড়া শয়তান যখন বলেছিল– আমি তোমার প্রভু; তখন কিন্তু তার পক্ষে একথা বলা সম্ভব হয়নি যে, আমি শরীকবিহীন আল্লাহ যিনি ব্যাতীত কোন উপাস্য নেই। এ থেকেও আমি তার শয়তান হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেছি।[৭]

বিশুদ্ধ জ্ঞান মানুষের ইহ ও পরকালীন মুক্তির পথ নির্দেশ করে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কল্যাণকর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সুপ্রশস্ত করে এবং মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা ও আত্মিক কলুষতা

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ০২: আয়াত ১২৯।
[২]. আল-কুরআন, (০২:১৫১) আরও দেখুন আল-কুরআন(২:১২৯)(৩৯:০২)
[৩]. মূল আরবী [لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا . وما تلذذتم بالنساء على الفرشات . ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হা. নং ৪১১৪।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ০২: আয়াত ১২১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আর-রা’দ ১৩: আয়াত ১৯।
[৬]. আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.০৯।
[৭]. ইবনু তাইমিয়া, *আত-তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওসীলাহ* (রিয়াদ: দারুল ইফতা, ১৯৮৪), পৃ.২৮।

দূর করে।এজন্য জ্ঞানচর্চার উৎসাহ প্রদান করে কুরআনে বলা হয়েছে-[১] وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
"আর তারা বলবে,'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না'।"

বিশুদ্ধ জ্ঞান জ্ঞানীকে সত্য উপলব্ধিতে ও সঠিক কর্মনীতি অবলম্বনে সহায়তা করে। জ্ঞানের কল্যাণ ও জ্ঞানীর গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআনে বলা হয়েছে-[২] وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ "আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" অন্যত্র এসেছে[৩] - شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই, আর ফিরিশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
এখানে প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ জ্ঞানীদের প্রশংসা করেছেন। আর পরবর্তী আয়াতে জ্ঞানীদের মর্যাদা প্রকাশার্থে মহান আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাদের পাশাপাশি জ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন।
সর্বপরি, জ্ঞান থেকে সুফল পেতে হলে জীবন ও সমাজে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জ্ঞানার্জন করে তদানুযায়ী নিজকে প্রস্তুত ও সমাজকে পরিশীলিত না করা হলে সে জ্ঞান অর্থহীন। এজন্য জ্ঞান অনুযায়ী কর্মের শক্ত নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে[৪]– وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ "জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।"

জ্ঞানের দাবী হলো ভালোভাবে না জেনে কোন কথা না বলা ও কাজ না করা: জ্ঞান মানুষের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন করে ও বুদ্ধিকে শাণিত করে। জ্ঞান মানুষকে ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা করে। তাই কোন বিষয়ে কথা বলা কিংবা কাজ করার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং সঠিকত্ব জানা। কোন বিষয়ে ভালোভাবে না জেনে ও না বুঝে আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কোন কাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]-(وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) "আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"
এ আয়াতের তাফসীরে যা বলা হয়েছে তার সারকথা হল–সঠিকভাবে না জেনে ও না শুনে কেবল ধারণা, অন্দাজ-অনুমান ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে কিছু বলতে কিংবা কোন কাজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

বর্তমান মুসলিম জাতির দুর্দশা ও পতনের পিছনে যে সব কারণ রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ–জ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিম বিশ্ব অনেক পিছিয়ে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে উচু মানের আলেমের সংখ্যাও অতি নগণ্য। আজ মুসলিম জাতির দুরবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক মুসলিম পরিবারের সন্তান পাশ্চাত্য বস্তুবাদী শিক্ষা গ্রহণ করে নাস্তিক, কাফির ও মুশরিকে পরিণত হচ্ছে। সঠিক দ্বীনী জ্ঞানের অভাবে মুসলিম সমাজ নানা শিরক, কুফর, বিদ'আত, অনৈতিকতা, মূর্খতা ও বর্বরতায় লিপ্ত হচ্ছে। অথচ খ্রীঃ সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম জাতি পৃথিবীতে উন্নত নৈতিকতা, সততা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। প্রথম যুগের মুসলিমরা সম্মান ও নেতৃত্ব লাভ করেছিল কারণ তারা জ্ঞান ও যোগ্যতার অধিকারী ছিল। প্রথম যুগের পুরুষরা ছাড়াও মহিলারা জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে গভীর আগ্রহী ছিলেন। আয়শা (রা.) এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়: "রাসূল (সা.) এর যুগে কুরআন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্ত না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"[৬] আজকের মুসলিম জাতিকে এই অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের মোকাবেলা করতে অনাগত ভবিষ্যতদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে পৃথিবীতে নের্তৃত্ব দেয়ার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীর নৈতিক কর্তব্য: শিক্ষার্থীর কিছু নৈতিক গুণ থাকা উচিত। যেমন: ক).জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত করা। পার্থিব স্বার্থ, সুনাম অর্জন, বড়ত্ব প্রকাশ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন না করা। খ).অর্জিত জ্ঞান বিশুদ্ধ সূত্র থেকে গ্রহণ করা। ত্রুটিপূর্ণ ও অনির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সতর্কতা সাথে বিবেচনা করা। গ). জ্ঞানার্জনের পথে বিনয়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। ঘ). শিক্ষকের বক্তব্য ও সদুপোদেশ ভালোভাবে শ্রবণ এবং তা মেনে চলা। অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা, জ্ঞানার্জনে লজ্জবোধ না করা। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সুযোগ্য ও সুদক্ষ করে গড়ে তোলা। ঙ). জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল ও আত্মগঠন করা; সততা অবলম্বন ও মিথ্যা বর্জন করা। কেননা 'আমল ছাড়া 'ইলম কোন উপকারে আসে না। চ). শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। জ্ঞানী ও আদর্শবান শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী শিক্ষকদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই-বাছাই ছাড়া গ্রহণ না করা। আর দ্বীনি জ্ঞান

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুলক ৬৭: আয়াত ১১।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩: আয়াত ০৭।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩: আয়াত ১৮; আল-কুরআন, ১৪: ৫২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ৩৭।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' : আয়াত ৩৬।
[৬]. ইব্‌ন আবদি রাব্বিহি, *আল-ইকদুল ফরিদ* খ.১, পৃ.১৬৬।

কোন বাতিল আকীদার অধিকারী, বিদ‘আতি ও ফাসিক ব্যক্তি থেকে গ্রহণ না করা। ছ). মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা এবং জ্ঞানের দ্বারা মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা।

❑.উপলব্ধি সহকারে নিয়মিত কুরআন-হাদীস চর্চা এবং তদানুযায়ী ‘আমল :

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। দেহের তুলনায় আত্মা শ্রেষ্ঠ। এজন্য মৃত্যুর পর দেহ হতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে দেহ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। দেহ রক্ষার জন্য আল্লাহ্ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। দেহ যেহেতু মাটি দ্বারা তৈরী তাই তার খাদ্যও মাটি হতে উৎপন্ন। আর আত্মা আল্লাহ্র আদিষ্ট বস্তু হওয়ায় তা উর্দ্ধ জগতের সাথে সম্পর্কিত এবং তার খাদ্যও উর্দ্ধ জগতে। সেই খাদ্যই হচ্ছে ওহী বা কুরআন ও সুন্নাহ। দেহের সুস্থতার জন্য যেমন নিয়মিত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা অপরিহার্য; তেমনি ঈমান সুদৃঢ় রাখা এবং অন্তরের সুস্থতা, প্রশান্তি, পরিশুদ্ধতা এবং নৈতিক মানকে সুদৃঢ় রাখার জন্য আন্তরিকতা সহকারে কুরআন ও হাদীসের[১] নিয়মিত চর্চা, তা উপলব্ধি এবং তদানুযায়ী আমল করাও অপরিহার্য। দৈহিক খাদ্যের অভাবে যেমন দেহের ক্ষতি ও মৃত্যু ঘটে তেমনি আত্মিক খাদ্যের অভাবে আত্মার ক্ষতি ও মৃত্যু সংঘটিত হওয়া অনিবার্য। এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে-[২] إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "মু’মিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"অন্যত্র এসেছে[৩] - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে।"

-উদ্ধৃত আয়াতসমূহে কুরআন ও সুন্নাহ চর্চাকে ঈমানের জন্য সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল সা. বলেন–[৪]"পানি লেগে লোহায় যেমন মরিচা পড়ে তেমনি (পাপের কারণে) মানুষের অন্তরে মরিচা পড়ে (রাসূল সা.) কে বলা হল সে জিনিস কি যা দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধ করা যায়? তিনি বললেন: মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন অধ্যয়ন করা।"

কুরআন হিদায়েত, সত্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ যাবতীয় কল্যাণের উৎস। এটা মানব জাতির জীবন বিধান। এটা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সমৃদ্ধি, সফলতা ও মুক্তির মুলমন্ত্র। এটা অন্তরের বিভিন্ন ব্যাধি ও প্রবৃত্তির রোগসমূহ থেকে মুক্তির সর্বাপেক্ষা কার্যকরী চিকিৎসাপত্র। এই মহাগ্রন্থ নির্দিষ্ট জাতি, নির্দিষ্ট যুগ, নির্দিষ্ট সমাজের জন্য নাযিল হয়নি, বরং তা সর্বকালের সমস্ত মানুষের জন্য সার্বজনীনভাবে নাযিল হয়েছে। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতকে আল-কুরআন আরবদের যেমন জাহেলিয়্যাতের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিল তেমনি আজকের একবিংশ শতকের নব্য জাহেলিয়্যাতের কবল থেকে কেবল কুরআনই মুক্তি দিতে পারে। কুরআন-সুন্নাহ ব্যাপক চর্চা, অনুশীলন এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তার শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোন যুগের মানব সমাজ উন্নত চরিত্র ও নৈতিক গুণে গুণান্বিত হতে পারে। তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহর চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মহান আল্লাহ বলেন[৫] – يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ- قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ- "হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বল, ‘আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়’। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম।" অন্যত্র আরও বলেন–[৬] يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا- "হে মানবকুল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো নাযিল করেছি। অতঃপর যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে আঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর দিকে সরল পথ দেখাবেন।" অন্যত্র বলেন–[৭] اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ " আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসমঞ্জস্য, যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহ্র স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহ্র হিদায়াত। " অন্যত্র আরও বলেন–[৮] إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا "নিশ্চয় এ এক উপদেশ। অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক।"

---

[১]. হাদীস-মহানাবী সা. এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২৪।

[৪].মূল আরবী [إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل : يا رسول الله و ما جلاؤها قال : كثرة ذكر الموت و تلاوة القرآن] -ইমাম বাইহাকী, *শু‘আবুল ঈমান* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ,১৪১০হি.) খ. ০২, পৃ.৩৫২, হাদীস নং ২০১৪।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৫৭-৫৮, আল-কুরআন ১৭:৮২।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ০৪: আয়াত ১৭৪-১৭৫।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯ : আয়াত ২৩।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩: আয়াত ১৯; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৫ : ২৯।

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে মুমিনদের জীবন গঠনে কুরআন চর্চা ও অনুশীলন ব্যাপারে তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। এ কাজে উৎসাহ দিতে রাসূল সা. বলেন[১], যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোন রাস্তায় বের হয় মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। কোন জনসমষ্টি যখন এ উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয় যে মহান আল্লাহ কিতাব পাঠ করবে, তাদের উপর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে মহান আল্লাহ রহমত আচ্ছাদিত করে ফেলে এবং রহমতের ফিরিশতারা তাদের ঘিরে ফেলে মহান আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ মাখলুকের (ফিরিশতাদের) মাঝে তাদের আলোচনা করেন। আর যে ব্যক্তির আমল পিছনে থাকবে, তার বংশ গৌরব তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেবে না।

কুরআন চর্চা, অনুধাবন ও তদানুযায়ী আমল করা কোন ঐচ্ছিক ব্যাপার কিংবা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর দায়িত্ব নয়। বরং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্যই তা অধ্যয়ন করা ও তার বিধি-নিষেধ জানা ফরজ।[২] এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৩] – اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ "তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম কর।" আরও বলা হয়েছে-[৪] فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ-وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ- অতএব আপনার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তা আপনি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথের উপর রয়েছেন। নিশ্চয় এটা(কুরআন) আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদের(এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে-[৫] وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ "আর তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তুমি তা তিলাওয়াত কর ।" আরও বলা হয়[৬] - فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ-"অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়।"

মুসলিম ব্যক্তির জীবনে কুরআন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে আবূ যার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[৭]–

> হে আবূ যার! প্রত্যেহ আল্লাহর কিতাব থেকে একটি আয়াত শিক্ষা করা একশত রাকাআত (নফল) নামায আদায় করা থেকেও উত্তম। অনুরূপভাবে প্রত্যহ জ্ঞানের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা–এ শিক্ষার উপর কেউ আমল করুক বা না করুক–এক হাজার (নফল) নামায আদায় করা থেকেও উত্তম।" অন্য একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে[৮]–"যে ব্যক্তি কুরআনের তিলাওয়াত করে, কুরআন মুখস্ত করে এবং কুরআনে বর্ণিত হালালকে হালাল গণ্য করে এবং হারামকে হারাম গণ্য করে, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারস্থ এমন দশজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ কবূল করবেন যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।

ইবনুল কাইয়িম রহ. (মৃ.৭৫১হি.) মহান আল্লাহর ভালবাসা লাভের দশটি মাধ্যমের মধ্যে সর্বপ্রথম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন, "চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন পড়া এবং তাঁর মর্ম ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করা।"[৯]

কুরআন ব্যাপকভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বরং কুরআনের অর্থ ও মর্ম নিয়ে অবশ্যই গভীর চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।[১০] আন্তরিকভাবে তা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাতে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহর নির্দেশ[১১]– كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ-"আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।" আন্তরিকতা ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন এবং তদানুযায়ী 'আমল মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[১২] -الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"-এ আয়াতে সেই সব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করে এবং তদানুযায়ী সত্যের অনুসরণ করে, বস্তুত এরাই মু'মিন। আর যারা এরূপ করে না তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

রাসূল সা. এর সাহাবীগণের (রা.) মধ্যে সুদৃঢ় ঈমান ও উন্নত চরিত্রের মূল কারণ ছিল তাঁরা নিয়মিত কুরআন ও সুন্নাহ চর্চা এবং নিষ্ঠার সাথে তদানুযায়ী 'আমল করত। এর মাধ্যমে তাঁরা পৃথিবীর সেরা মানুষে পরিণত হয়েছিল। অথচ ঈমান আনার পূর্বে তাঁরা আরব সমাজে ছিল চরম বর্বর ও অসভ্য। বর্তমান সত্যভ্রষ্ট ও নীতি-নৈতিকতা বর্জিত মানব জাতির

---

[১]. মূল আরবী [ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা, হা. নং ২৬৯৯।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ৯১-৯২।

[৩]. আল-কুরআন,সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৫।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৪৩-৪৪।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ২৭।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩: আয়াত ২০।

[৭]. **মূল আরবী** [يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة.ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة] ***ইবন মাজাহ*, আল-মুকাদ্দমাহ, হা.২১৯।**

[৮]. **মূল আরবী** [من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন,হা.২৯০৫।

[৯]. ইবনুল কাইয়িম, *মাদারিজুস সালিকীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.৩, পৃ.১৭।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ২৪; আল-কুরআন ৪:৮২; ৭:২০৪।

[১১].আল-কুরআন, সূরা সাদ ৩৮: আয়াত ২৯।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ০২:আয়াত ১২১।

সত্য লাভ ও নৈতিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কুরআন-হাদীসের চর্চা ও 'আমলের বিকল্প নেই। হাসান বসরী (রহ.) বলেন,[১] "তুমি তাদের মধ্যে হয়ো না, যারা আলিম ও দার্শনিকদের মত ইলম রাখে; কিন্তু 'আমলে মূর্খদের সমান।"

উল্লেখ্য যে, কুরআন ইসলামী নৈতিকতার মূল উৎস হলেও রাসূল সা. এর জীবন ও কর্মে তথা হাদীসে এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। অধিকন্তু, কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হাদীসের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন কুরআনে সালাত ও যাকাতসহ বিভিন্ন বিধানের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়নি। আর এ সবের বর্ণনা সুন্নাতে পাওয়া যায়। তাই কুরআন ভালোভাবে অনুধাবনের জন্য হাদীসও চর্চা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[২]– وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ "এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নি'মাত, কিতাব ও হিক্‌মত (হাদীস) যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, তা স্বরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর।" অন্যত্র বলেন-[৩], وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ "আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও হিকমত (হাদীস) যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রেখো।" তাফসীরকারদের মতে, উল্লেখিত আয়াতে হিক্‌মত দ্বারা হাদীস বা সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে।

মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথের দিশা পেতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়নের বিকল্প নেই। রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে অনাগত মুসলিমদের জন্য এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন[৪],"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"

বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনেক দূরে। তাদের বেশীর ভাগ শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে জানে না। যারা মোটামুটি শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করতে পারে তারা অর্থ জানে না, নিছক সাওয়াবের আশায় তিলাওয়াত করে। মাদ্‌রাসাগুলো থেকে কুরআনের লক্ষ লক্ষ হাফিয বের হলেও অনারবদের অধিকাংশই কুরআনের অর্থ জানে না। অতি নগণ্য সংখ্যক লোক অর্থ জানার চেষ্টা করলেও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআনের মর্ম, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে না। কদাচিৎ দুই একজন কুরআনের মর্ম, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুধাবন চেষ্টা করলেও কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী যথাযথভাবে নিজ জীবন ও পরিবারকে পরিচালিত ও পরিশীলিত করে না। অধিকাংশ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কুরআনের উচ্চতর গবেষণা লক্ষ্য করা যায় না। ফলে মুসলিম সমাজ আজ কুরআন থেকে সত্যিকারের সুফল লাভ করতে পারছে না। আর মাদ্‌রাসাগুলোতে সুন্নাহ বা হাদীস চর্চার ধারা কিছুটা থাকলেও তা অনেকাংশ ত্রুটিপূর্ণ। ফলে কুরআনের মত সুন্নাহ থেকেও মানুষ কাঙ্ক্ষিত উপকার পাচ্ছে না। কুরআনের বাহকদের দৃষ্টান্ত আজ অনেকটা তাওরাতের বাহক ইহুদীদের মতই হয়েছে, যারা কিতাব পড়ত কিন্তু তার উপর 'আমল করত না। মহান আল্লাহ বলেন[৫] – مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ-"যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মত! যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে। সে সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা নিকৃষ্ট, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"

কুরআন চর্চা না করার অশুভ পরিণতি ব্যাপক। এজন্য আজকের মুসলিম জাতি পৃথিবীব্যাপী লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। পার্থিব জীবন তারা আজ নানা সংকট, দারিদ্রতা, অশান্তি ও অস্থিরতায় জর্জরিত। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরে আসা এবং তদানুযায়ী জীবন যাপন না করাই এর মূল কারণ। এ তো গেল পার্থিব শাস্তি; আখিরাতের জীবনে তারা আরও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৬] –

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى-قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا- قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى

''আর যে আমার স্মরণ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জন্য হবে এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, 'হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, 'এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল'। অন্যত্র বলেন[৭],

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ-وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্বরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে ।"

---

১. মূল আরবী [لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء] আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, খ.০১, পৃ.৫৯।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৩১।

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩: আয়াত ৩৪।

৪. *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল কদর, হাদীস নং ১৫৯৪; *মিশকাত*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, হা. নং ১৮৬।

৫. আল-কুরআন, (৬২ঃ৫) ।

৬. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০ : আয়াত ১২৪-১২৬। ইবনু আ

৭. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩ : আয়াত ৩৬-৩৭।

কুরআন ও সুন্নাহ শুধু অধ্যয়ন বা আলোচনা করে পাণ্ডিত্য অর্জন করলে মুক্তি আসবে না, বরং এর সুফল পেতে হলে নিজ জীবন ও সমাজে তার প্রয়োগ ঘটানে হবে। তাই জ্ঞানার্জনের সাথে তদানুযায়ী 'আমল উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]– فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ "জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ছাড়া কোন(সত্য) ইলাহ্ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য।" এই আয়াতে জ্ঞানার্জনের সাথে 'আমলেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যত্র জ্ঞানের সাথে 'আমলের তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[২] – وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ "আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সালাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট' করি না।"

এজন্য রাসূল সা.বলেছেন-[৩] "নিশ্চয় মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন) দ্বারা (তার উপর 'আমলকারী) জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এর দ্বারা (এর উপর অবাধ্য) গোষ্ঠীর পতন ঘটান।" আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন–"যে ব্যক্তি দীনী ইল্ম শিক্ষা করল অথচ তদনুযায়ী নিজে 'আমল করেনি তার জ্ঞান কেবল তার অহংকারই বৃদ্ধি করবে।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস(রা.) বলেন[৫],"মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যিনি কুরআনের অনুসরণ করেন। আর তাহলো, সে ব্যক্তি দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে দুর্ভাগ্যবান হবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন, যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী এবং দুভার্গ্যও হবে না' [আল-কুরআন ২০:১২৩]।"

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম জাতি পৃথিবীতে সম্মানিত ও নের্তৃত্ব-কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল কুরআন ও সুন্নাহ সঠিক ভাবে চর্চা এবং তার শিক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আজকের মুসলিম জাতিকেও লঞ্ছনা-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে হলে একইভাবে কুরআন ও সুন্নাহর চর্চা এবং তদানুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৬]- قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

ইবনু নুমাইর (রহ.) বলেন, 'অনেক কাজ রয়েছে যা উপকার না করলেও ক্ষতি করে না। কিন্তু দ্বীনী ইলম দ্বারা যদি (পরকালীন) উপকার না হয়, তবে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়'।[৭]

❑. সুস্থ বিবেক ও মূল্যবোধ বিকাশে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু:

বিবেক মানুষের উন্নত চরিত্রের প্রাণশক্তি। বিবেকই মানুষের নৈতিকতাকে সঞ্জীবিত রাখে। সুস্থ বিবেকবোধ জাগ্রতকরণ ছাড়া মানুষের নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিবেক গঠনের জন্য অপরিহার্য উপাদান হলো নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ শিক্ষা। কুরআন বা ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যক্তির বিবেককে সদা জাগ্রত রাখার এবং চেতনা ও অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করার শিক্ষা দেয়।[৮] তাই ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষাই এক্ষেত্রে মৌলিক কার্যকরী উপাদান।

বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ঘটেছে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার মানুষের জীবনকে সহজসাধ্য ও সমৃদ্ধ করেছে। দেশ ও সমাজ নতুন নতুন আইন-বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাও ব্যাপক সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মানব সমাজে অন্যায়-অনাচার ও অপরাধ মোটেও কমেনি, তা দিনে দিনে উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলছে। এর কারণ হল মানুষ নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর চরম অধঃপতন ঘটেছে। নৈতিকতা বর্জিত বস্তুবাদী শিক্ষার কুপ্রভাবে মানব মনে সীমাহীন লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, ভোগ-বিলাস ও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অধিক মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু আইন-আদালত ও পুলিশ বাহিনী দ্বারা এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর সমাধান করতে মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে। তবেই পুলিশ, গোয়েন্দা ও আইন-বিচারের এত বেশী প্রয়োজন হবে না। এজন্য মানুষের জন্য এমন নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাতে হবে, যেখানে থাকবে আল্লাহর ভয় ও পরকালীন জবাবদিহিতার চিন্তা। পৃথিবীর যে কোন দেশ ও সমাজে যখনই এই শিক্ষা ও উপদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে, তখন সে দেশ ও সমাজের মানুষ প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিরাজমান দেখেছে। এছাড়া অন্য কোন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় ও অনৈতিকতা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে না। নৈতিকতা বর্জিত বস্তুবাদী জ্ঞান সাময়িকভাবে কিছু ব্যাপারে উপকার দিলেও তা মানুষের সত্যিকার সুফল ও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এজন্য দেখা যায় নৈতিকতা বর্জিত শিক্ষা স্বার্থপর, লোভী, অসৎ ও দুর্নীতিবাজ নাগরিক তৈরী করে। ইংরেজ শিক্ষাবিদ Stanely Hall যথার্থই বলেছেন– If you give them [your children] the three 'R's. i.e.: Reading, Writing and Arithmetic and do not give them the fourth 'R' i.e.: Religion, they are sure to become the fifth 'R'

---

১. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ১৯।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৭০।

৩.মূল আরবী [إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, হাদীস নং ৮১৭।

৪. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *আল-কাবাইর* (সংযুক্ত আরব আমিরাত: মাকতাবাতুল ফুরকান, ২য় প্রকাশ, ২০০৩) পৃ.২৯০।

৫.মূল আরবী[لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى]*আল-মুসান্নাফ ইবন আবী শায়বা*, খ.০৭, পৃ.১৩৬, কিতাবুয যুহুদ, রিওয়ায়েত নং ৩৪৭৮১।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১০৪।

৭. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৮, পৃ.৩২৯।

৮. আল-কুরআন (৫০:১৬-১৮) (৫৮ : ০৭) (৮২:১০-১২) (১৭:৩৬) (৪০:১৯) (১০ : ৬১) (০২:২২৩) ।

i.e.: Rascal. অর্থাৎ যদি আপনি শিক্ষার্থীদের কেবল তিনটি ‘R’ তথা পঠন, লিখন ও গণিত শিখান আর যদি চতুর্থ ‘R’ তথা ধর্ম না শিখান তবে এর মাধ্যমে তাদের পঞ্চম ‘R’ তথা বদমাইশ পাবেন।[১]
বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন–‘তথ্য ও তত্ত্ব ভিত্তিক জ্ঞান যদি বৃদ্ধি পায় কিন্তু সে অনুপাতে যদি নৈতিক মানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি না পায় তবে সে জ্ঞান শুধু দুঃখকে বৃদ্ধি করবে।’[২]

তাই আজকের এই দিনে শিক্ষা থেকে সত্যিকার সুফল পেতে হলে শিক্ষাকে বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর জ্ঞান নৈতিকতার ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। নৈতিকতার মৌলিক উপাদান হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থায় সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, উন্নত নৈতিক চরিত্র, ব্যবহারিক আচার-আচরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য, হালাল-হারাম ও লেন-দেন ইত্যাদি বিষয়গুলো রাখতে হবে। আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত করতে না পারলে কখনোই দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও হানাহানিমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে ধর্মীয় শাখায় পারদর্শিতা অর্জনকে ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ জ্ঞান মানুষকে যেমন বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণতা দেয়, তেমনি সমাজের মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, কর্ম ও সততা সৃষ্টির যোগ্যতা প্রদান করে। এজন্য শিক্ষা গ্রহণের মূলনীতি হবে ‘প্রতিপালকের নামে’ তথা জ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৃষ্টির কল্যাণের জন্য হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন[৩] -(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ... اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) “পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, ... পাঠ কর, আর তোমার রব মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।”

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পার্থিব হোক কিংবা দ্বীনি হোক - সর্বাবস্থায় জ্ঞানের উৎস বিশুদ্ধ, প্রামাণ্য ও ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। কেননা ত্রুটিপূর্ণ অশুদ্ধ জ্ঞান মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বরং তা দ্বারা মানুষ ক্ষতি ও অকল্যাণের সম্মুখীন হবে। সত্যিকার কল্যাণকর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর জ্ঞানের মৌলিক শর্ত হল : তা প্রামাণ্য, নির্ভুল, সন্দেহ ও ত্রুটিমুক্ত হবে। মহান আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমে কেবল তা পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বিকৃতমুক্ত আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনকে বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর জ্ঞানের মৌলিক ও প্রধান উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। এরপর বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস–বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করা। এছাড়া মহান আল্লাহ প্রদত্ত মেধা-মনন ব্যবহার করে যুগে যুগে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী ব্যক্তিগণ মানব জাতির কল্যাণে জ্ঞানের যেসব নানাবিদ শাখা-প্রশাখা আবিষ্কার করেছেন, তাও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অন্যতম উৎস হতে পারে, তবে তা আসমানী কিতাব প্রদত্ত জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ ওহীলব্ধ জ্ঞানের সাথে মানব প্রবর্তিত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন না হলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হবে আর সাংঘর্ষিক হলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞান হিসেবে গণ্য হবে না।

তাই জ্ঞান থেকে সত্যিকারের সুফল পেতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরে ওহীলব্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। কারণ ওহীলব্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞানই নৈতিকতা নির্ভর ও সর্বাধিক কল্যাণকর। আর ওহীলব্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে সেই সত্যিকার জ্ঞানের প্রকৃত সুফল পাওয়া সম্ভব। মানবীয় জ্ঞানের সাথে যদি ওহীর জ্ঞানের আলো না থাকে, তাহ'লে যে কোন সময় মানুষ পথভ্রষ্ট হবে এবং বস্তুগত উন্নতি তার জন্য ধ্বংসের কারণ হবে। বিগত যুগে কওমে নূহ, আদ, সামূদ এবং ফেরাউন ও তার কওমের পরিণতি, আধুনিক যুগে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন যুদ্ধ-সংঘাত এসবের বাস্তব প্রমাণ বহন করে।
ওহী ভিত্তিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান ‘তাকওয়া’ সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি ‘তাকওয়া’ অর্জন করে সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নৈতিকতা লাভ করে।[৪] তাই দেখা যায় যে, ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সাহাবাগণ রা. উন্নত ‘তাকওয়া’ লাভ করেন। এরফলে তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করা সত্ত্বেও উন্নত চরিত্র, নৈতিকতা, সততা ও জ্ঞানে পৃথিবীর সেরা মানবে পরিণত হয়েছিলেন। তাই ওহী নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থাই মানুষকে প্রকৃত কল্যাণকর জ্ঞান ও নৈতিকতা নিশ্চিত করতে পারে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৫]–وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ-“আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং রহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।”

প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তির জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। এর প্রমাণে একটি হাদীস–জনৈক যুবক রাসূল সা. নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দান করুন। এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর; চুপ কর। অতঃপর রাসূল সা. তাকে নিকট আসতে বললেন। সে নিকটে আসলে তাকে বসতে বললেন, সে বসল। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা তুমি কি এটা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? সে বলল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। এটা আমি আমার মায়ের জন্য পছন্দ করি না। তিনি বললেন–অন্য

---

[১]. ড.কাজী দীন মুহাম্মদ, *জীবন সৌন্দর্য*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৬) পৃ.১৮৯।
[২]. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, *জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়*, (ঢাকা:প্রফেসর্স পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ.১১০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-‘আলাক ৯৬: আয়াত ০১-০৫।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮২।

লোকও এটা তাদের মায়ের জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা তুমি কি এটা তোমার কন্যার জন্য পছন্দ কর? সে বলল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। এটা আমি আমার কন্যার জন্য পছন্দ করি না। তিনি বললেন–অন্য লোকও এটা তাদের কন্যার জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা তুমি কি এটা তোমার বোনের জন্য পছন্দ কর? সে বলল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। এটা আমি আমার বোনের জন্য পছন্দ করি না। তিনি বললেন–অন্য লোকও এটা তাদের বোনের জন্য পছন্দ করে না। এরপর রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা তুমি কি এটা তোমার ফুফুর জন্য পছন্দ কর? সে বলল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। এটা আমি আমার ফুফুর জন্য পছন্দ করি না। তিনি বললেন–অন্য লোকও এটা তাদের ফুফুর জন্য পছন্দ করে না। অবশেষে রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা তুমি কি এটা তোমার খালার জন্য পছন্দ কর? সে বলল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক। এটা আমি আমার খালার জন্য পছন্দ করি না। তিনি বললেন–অন্য লোকও এটা তাদের খালার জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূল সা স্বীয় হাত তার উপর রেখে এই প্রার্থনা করলেন–হে আল্লাহ! আপনি তার পাপ ক্ষমা করুন, তার অন্তর পবিত্র করে দিন এবং তার লজ্জাস্থান হিফযত করুন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর সেই যুবক কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করত না।[১]

উল্লেখ্য যে, নৈতিক শিক্ষা অর্থ এটা নয় যে, সবাই শুধু ধর্মীয় শিক্ষা করে গণভাবে আলেম হবেন। বরং যুগের চাহিদা অনুযায়ী কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, সামরিক বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল, আইন, তথ্য প্রযুক্তি সহ মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জন করবে। তবে জ্ঞানের এসব শাখার প্রত্যেক স্তরে ওহীলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয় করতে হবে। যাকে বলা যেতে পারে 'Islamization of knowledge' এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ায় 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[২] এক্ষেত্রে আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ধর্মের মৌলিক জ্ঞান নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক জনপদে পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষিত সুদক্ষ একদল লোক তৈরী করতে হবে।[৩] নৈতিক ও আদর্শিক দিক লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের অন্যদের মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্য বৈষয়িক সকল দিকের শিক্ষার ব্যাপারে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।[৪] এভাবে একটি উন্নত মূল্যবোধ সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা গঠন সম্ভব।

সুস্থ বিবেকবোধ জাগ্রতকরণে নীতি শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মাদরাসা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও গণমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

❑.দ্বীনি ও কল্যাণকর জ্ঞানের ব্যাপক প্রচারঃ

মানব সৃষ্টির পর স্বয়ং মহান আল্লাহ তাকে জ্ঞান শিক্ষা দান করেন। জ্ঞান বিতরণের জন্য তিনি দিয়েছেন বাকশক্তি ও কলম বা লেখনীর ব্যবহার।[৫] জ্ঞান প্রসার ও বিস্তার যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।[৬] ইসলাম তাঁর সূচনালগ্ন থেকেই এই প্রশংসনীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাসূল সা. জ্ঞান প্রসার ও শিক্ষা বিস্তারে মক্কায় দারুল আরকামকে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। মদীনায় হিজরতের পর মসজিদে নববীকে জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। জ্ঞানের সর্বাধিক সুফল লাভের জন্য কুরআন প্রত্যেক জাতির মধ্যে একদল লোককে সর্বদা জ্ঞান প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৭] –

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া উচিত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।" অন্যত্র বলেন[৮] -وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ-"আর তোমার রবের অনুগ্রহ তুমি বর্ণনা কর।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা বিস্তারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেছেন–'তোমরা আমার থেকে একটি বাণী হলেও অন্যের নিকট পৌঁছাও।'[৯] রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত রাখুন যে আমার নিকট থেকে কোন বাণী শুনে, অতঃপর তা মুখস্ত করে অবিকৃতভাবে অন্যের নিকট প্রচার করে। আর অনেক সময় বাণীবাহক অপেক্ষা যার

---

১. আবুল কাসেম তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, *প্রাগুক্ত*, বাবুস সাদ, হাদীস নং ৭৬৭৯,৭৭৫৯।

২. মালয়েশিয়ায় 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ, অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি) ও ইন্টারন্যশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এর কারিকুলাম প্রণয়ন ও ইসলামীকরণে বিরাট অবদান রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলাম উন্নত বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলামের চেয়ে উন্নতমানের। এর কারিকুলাম যেমন উন্নত তেমনি এর ইসলামায়ন করা হয়েছে যথাযথভাবে। {দেখুন, ড. আবদুল হামিদ আবূ সুলাইমান রচিত '*জ্ঞানের ইসলামায়ন*', অনুঃ এম রহুল আমিন, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, ২০০৭।]

৩. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১২২।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৬০।

৫. আল-কুরআন, ০২: ৩১, ৫৫:৩-৪, ৯৬:০৪।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৬৭।

৭. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১২২।

৮. আল-কুরআন সূরা আদ-দুহা ৯৩: আয়াত ১১।

৯.মূল আরবী [بلغوا عني ولو آية وحدثوا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩২৭৪; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ২৬৬৯।

নিকট প্রচার করা হয় সে অধিক বিজ্ঞতা ও সতর্কতার সাথে তা স্মরণ রাখে।[১] শিক্ষকের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সা. বলেছেন, 'আমি তো শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।'[২] জ্ঞান বিতরণকারীর প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"তোমরা কি জান, সবচেয়ে বড় দানশীল কে? সাহাবীগণ বললেন আল্লাহ্ ও তার রাসুলই ভালো জনেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সবচেয়ে বড় দানশীল হলেন মহান আল্লাহ্ তাআলা। তারপর আদম সন্তানের মধ্যে বড় দানশীল হলাম আমি। এরপর বড় দানশীল হলো ঐ ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করার পর এর প্রচার ও শিক্ষাদানে রত থাকে।[৩] হাদীসে জ্ঞান বিতরণকে উত্তম সাদাকা গণ্য করা হয়েছে।[৪]

রাসূল সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে মুসলিমদের উদ্দেশ্য যে সব মৌলিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন তন্মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল জ্ঞানের প্রসারের নির্দেশ। এ মর্মে তিনি বলেন[৫],'উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দেয়'।

শিক্ষা বিস্তারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বাস্তবমুখী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মক্কায় তিনি দারুল আরকামে (সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবী আরকাম রা. এর গৃহে) এবং মদীনায় তিনি মসজিদে নববীতে মুসলিমদের শিক্ষার জন্য সুব্যবস্থা করেন। এছাড়াও আর কিছু শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তন্মধ্যে মসজিদে কুবা অন্যতম। নও মুসলিমদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকার মু'আল্লিম (শিক্ষক) প্রেরণ করেন। এসব মু'আল্লিমের মধ্যে মুস'আব ইবন উমাইর রা., মুয়ায ইবন জাবাল রা., উবাই ইবন কা'ব রা, রাফি' ইবন মালিক রা., সালিম রা, উবাদা ইবন সামিত রা. নাম উল্লেখযোগ্য।[৬] জ্ঞানকে সর্বসাধারণে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নাবী সা. আবূ মূসা আশয়ারী ও মুযায়কে রা. ইয়ামেনে পাঠানোর প্রক্কালে তাদের উভয়কে বললেন: তোমরা লোকদের সুসংবাদ দাও, তাদের জন্য(কাজ-কর্ম) সহজ কর, তাদেরকে জ্ঞান দান কর এবং তাড়িয়ে দিও না।[৭] শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নাবী (সা.) সব ধরনের সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন এবং পার্থিব সম্পদ হাসিল অপেক্ষা শিক্ষার প্রসারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবন সা'দ (মৃ.২৩০হি.) এর ভাষ্য-

> বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফির যোদ্ধা বন্দী হন। তাদের (অনেকে) সামর্থ্য অনুযায়ী নিদিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভ করেন।...যাদের মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিল না এমন লেখাপড়া জানা বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ হয় মদীনার দশজন মুসলিম শিশু-কিশোরের লেখাপড়া শেখানো।[৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে, রাসূল (সা) ধর্মের ভিন্নতা সত্বেও মুশরিকদের থেকে জ্ঞান অর্জন করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি, বরং বৈধতা দিয়েছেন। এজন্য আলী (রা) বলেন, "জ্ঞান মুমিনদের হারানো বস্তু। মুশরিকদের থেকে হলেও তা গ্রহণ কর।"[৯] কাজেই অমুসলিমদের থেকে পার্থিব কল্যাণকর জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে। তবে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কৃতির অনুসরণ করা যাবে না।

নারী শিক্ষা বিস্তারে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর স্ত্রীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারীদের বিশেষভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য নাবী (সা.) [সপ্তাহে বা মাসে] একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন। যেদিন তিনি তাদের মাঝে ওয়ায-নসিহত করতেন এবং শরী'আতের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।[১০]

শিক্ষা বিস্তারে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অবদান সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ বলেন,

> রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবের সময় মক্কার কুরাইশ গোত্রে হাতে গোনা মাত্র সতের জন মানুষ কিছুটা লিখতে পড়তে জানতো। (বালাযুরী) মদীনার অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। কিন্তু তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন তখন মক্কা-মদীনায় নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু-কিশোর এমন কেউ ছিলেন না যারা কিছুটা লিখতে-পড়তে পারতেন না। তখন মক্কা-মদীনা ছাড়াও গোটা আরব উপদ্বীপের প্রতিটি শহর, মরুভূমির প্রতিটি বেদুঈন জনপদে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার প্লাবণ বয়ে চলেছে।[১১]

জ্ঞান-বিজ্ঞান একটি আমানত। সত্য ও কল্যাণকর জ্ঞান অবিকৃত ও বিশুদ্ধভাবে মানুষের প্রচার ও প্রসার করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব। ব্যক্তি নিজেকে সুশিক্ষিত করার সাথে সাথে অন্যদের নিকটেও শিক্ষার প্রসার ঘটাবে এ ব্যাপারে কুরআনে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। জ্ঞান প্রচার না করাকে ইসলামে বড় ধরনের অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[১২] وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ "আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ কিতাব প্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে,'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।"

---

[১]. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল'ইলম, হাদীস নং ৩৬৬০, *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল'ইলম, হাদীস নং ২৬৫৬-৫৮।

[২]. মূল আরবী [وإنما بعثت معلما]*সুনান ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ২২৯।

[৩]. *মিশকাত*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ২৫৯।

[৪]. মূল আরবী [أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم] *সুনান ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ২৪৩।

[৫].মূল আরবী [ليبلغ الشاهد الغائب] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং৬৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস নং ১২১৮।

[৬].বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *রাসূলুল্লাহ সা. শিক্ষাদান পদ্ধতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৮-২৩৯।

[৭]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং৬৯, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস নং ১৭৩৪।

[৮]. ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, (বৈরুত : দারু সাদির, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮) খ.০২, পৃ.২২।

[৯]. আবদুল্লাহ ইবন বার, *জামি'উ বয়ানুল ইলম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৪৮২, রিওয়ায়েত নং ৪৫৮।

[১০]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ১০১, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৬৩৩।

[১১]. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৮৭।

বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সমাজে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ থেকে অজ্ঞতা, মূর্খতা, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, অন্ধ অনুসরণ ও ভ্রান্তবিশ্বাস ইত্যাদি দূরীভূত হয়। সমাজের মানুষ উপকৃত ও আলোকিত হয়। কল্যাণকর জ্ঞান প্রচারককে রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়।'[১] কল্যাণকর জ্ঞান প্রচারের মর্যাদা ও প্রতিদান সম্পর্কে তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতামণ্ডলী, আসমান এবং জমিনের অধিবাসীগণ, এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছও কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষাদানকারীদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।"[২] তিনি আরও বলেন,"যে ব্যক্তি কোন জ্ঞানের শিক্ষা দান করল তাকে যত মানুষ সেই জ্ঞান অনুসারে 'আমল করবে তাদের সমান সওয়াব দান করা হবে। অথচ আমলকারীদের সওয়াবে হ্রাস ঘটবে না।"[৩]

শিক্ষক/ জ্ঞান বিতরণকারীর নৈতিক কর্তব্য: শিক্ষকের কিছু নৈতিক গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন: ক.বিশুদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষককে সমৃদ্ধ, সুদক্ষ ও সুযোগ্য হওয়া। খ. জ্ঞানের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হয়ে প্রচার করা; ভালোভাবে না জেনে, কাউকে ভুল-ত্রুটিপূর্ণ বা মিথ্যা তথ্য প্রদান না করা অথবা সত্য জ্ঞান গোপন না করা কিংবা জ্ঞানকে বিকৃত না করা– এ ধরনের কাজ করা বড় ধরনের অনৈতিক ও খিয়ানত। এ ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, তাঁর গুনাহ ফাতওয়া দাতার উপর বর্তাবে।"[৪] গ. শিক্ষককে জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল করা এবং সৎ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ঘ. জ্ঞান প্রচার-প্রসার ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হওয়া। ঙ. শিক্ষার্থীর সাথে কোমল, সহনশীল, স্নেহপরায়ন ও হৃদতাপূর্ণ আচরণ করা। শিক্ষার্থীর উন্নত চরিত্র গঠন ও মানসিক বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হওয়া। সকল শিক্ষার্থীর ব্যাপারে সমান ও নিরপেক্ষ থাকা। চ. শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষাদান করা, কম প্রয়োজনীয় বিষয়ে দীর্ঘ সময়ক্ষেপণ ও অন্তহীন বিতর্ক না করা এবং নিস্প্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা। ছ. সারা জীবন জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ধারা অব্যাহত রাখা, বিনয়-নম্র থাকা এবং আত্মতুষ্টিতে না ভোগা।

❑. সুস্থ ধারার সংস্কৃতি ও বিনোদন চর্চা (الثقافة الإسلامية):

সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে উঠতে এবং পরিচালিত হতে পারে।[৫] মূলত মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালীর প্রতিফলনই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের মনের খোরাক। মানুষের গোটা জীবনের আচার-আচরণের সাথে সংস্কৃতি জড়িত। সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন মানুষের আত্মিক উৎকর্ষতা দান করে। তা মানুষকে সততা, সত্যবাদীতা, বিনয়ী, উদারতা, মহানুভবতা, ন্যায়বিচার, মানব সেবা, কর্তব্যবোধ, সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। আর তা থেকেই তৈরী হয় নৈতিকতাবোধ। তাই নৈতিকতার বিকাশে সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আজকাল সংস্কৃতি ও বিনোদনের নামে সর্বত্রই চলছে উগ্র অশ্লীলতা, অনৈতিকতা, কপটতা, মিথ্যাচার, ইতরামী ও সন্ত্রাসের এক ধরনের প্রশিক্ষণ। এ সব অপসংস্কৃতির ফলে যুব সমাজ নানা ধরনের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ে জড়িয়ে পড়ছে। তাই এ অপসংস্কৃতি অনৈতিকতার স্থলে সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদন চালু করা জরুরী।

আল-কুরআন তথা ইসলাম মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ওহী ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিশীলিত জীবন প্রণালী দিয়েছে, যা সার্বজনীন, সর্বোত্তম ও উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন। ঘুম থেকে জেগে শোয়ার সময় পর্যন্ত মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনের খাবার গ্রহণ, পোষাক ব্যবহার, আচার-আচরণ ও চলাফেরার সকল কাজে ইসলামী সংস্কৃতি জড়িত। ইসলামী সংস্কৃতির নিদর্শন হলো পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময় করা, প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিছমিল্লাহ বলা, ভালো কাজ ডান দিক থেকে বা ডান হাত দ্বারা শুরু করা। যেমন, ডান হাতে আহার করা, অজু করা, মসজিদে প্রবেশকালে ডান পা আগে দেয়া হয়। আর শৌচকর্ম, নাক পরিস্কার, মসজিদ বের হওয়া ইত্যাদি কাজ বাম দিক থেকে বা হাত দ্বারা শুরু করা। ঈমান, আযান, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, পর্দা, শালীনতা, মৃত্যু ব্যক্তির জানাযা করে দাফন করা –এভাবে মুসলিমদের গোটা জীবন জুড়েই রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তৃতি। এই সংস্কৃতি তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজাতীয় বস্তুবাদী সংস্কৃতি থেকে এটা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই সংস্কৃতি স্বচ্ছ, নির্মল, মার্জিত, শিরক ও অশ্লীলতামুক্ত। তাই ইসলাম মুসলিমদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা এবং অমুসলিমদের আচার-আচরণ অনুকরণে নিষেধ করে। এজন্য রাসূল সা. বলেন–"যে অন্য জাতির চাল-চলন অবলম্বন করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। কাজেই তোমরা ইয়াহূদী ও ও খ্রিষ্টানদের (অমুসলিমদের)কৃষ্টি গ্রহণ করো না।"[৬]

---

[১].মূল আরবী [خيركم من تعلم القرآن وعلمه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, হাদীস নং ৪৭৩৯।
[২]. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল'ইলম, হাদীস নং ২৬৮৫।
[৩]. *সুনান ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, হাদীস নং ২৪০।
[৪].মূল আরবী [من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ৩৬৫৭।
[৫]. মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৪), পৃ.২৫৭।
[৬]. *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ইস্তিযান, হাদীস নং ২৬৯৫; *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং ৪০৩১।

ইসলাম মানব মনের সুকুমার বৃত্তির পরিচর্যা ও বিকাশ সাধন এবং কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের জন্য সুস্থ বিনোদনের বিধান দিয়েছে। অনেক লোক ধারণা করে যে, ইসলামে খেলা-ধুলা, হাসি-ঠাট্টা ও আনন্দ-বিনোদনের কোন স্থান নেই। তারা সর্বদা মুখ গোমড়া করে রাখাকে ধার্মিকতা মনে করে। বস্তুত পক্ষে এটা ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং ইসলাম সুস্থ ধারার সংস্কৃতির প্রবর্তন করেছে। মহানাবী (সা.) যখন মদীনায় আসলেন তখন মদীনাবাসীরা দু'টি দিন উৎসব হিসেবে পালন করত। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিন দু'টি কিসের? তারা জবাবে বলল, আমরা এ দু'দিন জাহেলী যুগে থেকে খেলা-ধুলার মাধ্যমে পালন করে আসছি। তখন মহানাবী (সা.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ দু'দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে আরোও উত্তম দু'টি দিন উপহার দিয়েছেন, তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন।[১]

সুস্থ বিবেকবোধ জাগ্রতকরণ ও মন্দ বিষয়াদি বিরত রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে মানুষ যাতে অপসংস্কৃতিতে নিমজ্জিত না হয় সে ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[২]– وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ এবং তুমি খেয়াল-খুশির অনুসরণ করোও না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে। অন্যত্র বলেন[৩]-وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى - আর যে স্বীয় রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজকে বিরত রাখে। জান্নাতই হবে তার আবাস।

বর্তমানে চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলার নামে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা সমাজকে ভয়ানকভাবে গ্রাস করছে। এতে মানুষ পশুত্বের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং মানুষের নৈতিক জীবনের অপমৃত্যু ঘটছে। বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতি বন্ধ হওয়া জরুরী। অনুরূপভাবে মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিভিশন, কম্পিউটার বা মোবাইল নিয়ে বসে থাকার সংস্কৃতিও বন্ধ করা উচিত। এর বিকল্প হিসেবে শরীর ও মনের সুষম উন্নয়নের জন্য শরীরচর্চামূলক নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা করা দরকার।

বিনোদন ও হাস্য-রসিকতা: বিনোদনের মাধ্যমে মানুষ নিজে লাভ করে কিংবা অন্যের মনে আনন্দ দান করে। আর হাস্যরস উত্তেজনা হ্রাস করে, দুশ্চিন্তা দূর করে এবং চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। তাই বৈধ পন্থায় নিজে বা অন্যকে আনন্দ প্রদান ইসলামে কোন দোষণীয় ব্যাপার নয়। অনেকে মুখ বিষন্ন অবস্থায় রাখাকে বুযর্গী মনে করে থাকেন। এটা ইসলামের শিক্ষা বিরুদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–"কোন ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে কর না, এমন কি তোমার ভাইয়ের সাথে হসিমুখে দেখা করাকেও।"[৪] রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেছেন, ফরয কাজসমূহের পর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো: কোন মুসলিমের অন্তরে (নির্মল) আনন্দ দান করা।"[৫]

হাস্য-রসিকতা ইসলামে অনুমোদিত হলে এক্ষেত্রে নৈতিক নীতিমালা রক্ষার বাধ্যবাধকতা আছে। যেমন-মিথ্যা আশ্রয় নিয়ে কোন হাস্যরস করা অনৈতিক। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন-[৬], "মানুষকে হাসানোর জন্য যে মিথ্যা বলে তার জন্য ধ্বংস।" রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও মানুষের সাথে হাস্য-রসিকতা করতেন, তবে তিনি সত্যের সীমা যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। হাদীসে এসেছে– একবার তিনি জনৈক বৃদ্ধাকে রসিকতা করে বললেন যে, বৃদ্ধারা জন্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কেঁদে ফেলল। তখন রাসূল (স.) বলেন: জান্নাতে যখন যাবে তখন যুবতী হয়েই যাবে।[৭] একবার সাহাবীগণ রাসূল সা. কে বললেন, আপনিও আমাদের সাথে কৌতুক করেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তো সত্য ছাড়া বলি না।[৮]

আবার ইসলাম এমন কোন বিনোদন ও হাস্যরসের বৈধতা দেয় না, যার মাধ্যমে অনৈতিকতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৯] –لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ-"মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।" এছাড়া ইসলাম এমন রসিকতা অনুমোদন করে না যাতে অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় কিংবা যাতে অন্যের দোষ-ত্রুটি ব্যঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়।[১০] আবার কৌতুকচ্ছলে কাউকে ভয় দেখানো বৈধ নয়। এ মর্মে হাদীসে বলা হয়েছে[১১] "কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য মুসলিমকে ভয় পাইয়ে দিবে।" ইসলামের কোন বিধি-বিধান ও শাস্তি-পুরস্কার নিয়েও রসিকতা করা গুরুতর অন্যায়। এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।[আল-কুরআন ০৯:৬৫-৬৬] আর মাত্রাতিরিক্ত হাস্য-রসিকতা অনুচিত। কেননা তাতে অন্তর কঠিন হয় এবং অন্তর আল্লাহকে ভুলে দেয়। এজন্য আলী (রা.) বলেন[১২],"কথাবার্তায় ততটুকু রসিকতা কর যতটুকু খাবারে লবন দিয়ে থাক।"

---

১. সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ১১৩৪; মুসনাদ ইমাম আহমাদ, খ.০৩, পৃ.২৫০, হাদীস নং ১৩৬৪৭।
২ .আল-কুরআন(৩৮ : ২৬)
৩ .আল-কুরআন(৭৯ : ৪০-৪১)
৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ২৬২৬।
৫. আবুল কাসেম আত-তাবরানী, আল-মু'জামুল কবীর, খ.১১, পৃ.৭১, বাবুল 'আইন, হাদীস নং ১১০৭৯।
৬. সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯৯০; সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩১৫।
৭. ইমাম বাগাভী, শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুল ইস্তিযান, খ.১৩, পৃ.১৮৩, হাদীস নং ৩৬০৬; মিশকাত, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং৪৮৮৮।
৮. সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ , হাদীস নং ১৯৯০।
৯. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ১৪৮।
১০. আল-কুরআন, সূরা ৪৯ : আয়াত ১১।
১১. সুনান আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫০০৪।
১২. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলাম ও শিল্পকলা(আল-ইসলাম ওয়াল ফুনূন), অনু. ড.মাহাফুজুর রহমান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৭) পৃ. ১০২-১০৩।

খেলা-ধুলা: খেলাধুলা মানুষের মানসিক আনন্দ ও প্রশান্তি বিশেষ মাধ্যম। এটা জীবনের হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর করে। এতে মানুষের শারীরিক ব্যায়াম হয়। তাই ইসলাম মানুষের জন্য কল্যাণকর কোন খেলাধুলা নিষেধ করে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য তাঁর মসজিদের ভিতর হাবশীদের যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে খেলার অনুমোদন দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) এর কাঁধে ভর দিয়ে তাঁর স্ত্রী আয়শা (রা.) তা উপভোগও করেছিলেন।[১] রাসূল (সা.) স্বীয় স্ত্রী আয়শা (রা.) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন।[২] তাই ইসলাম অনুমোদন দেয় না এ কথা ভুল। দৌড় প্রতিযোগিতা, তীর-বর্শা নিক্ষেপ, শুটিং, ভলি বল খেলা ইত্যাদি বিভিন্ন খেলা-ধুলা ইসলামে অনুমোদিত। তবে যে সব খেলাধুলা ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী, ইসলাম কেবল সেসব খেলাধুলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। যেমন: ১.যেসব খেলাধুলায় বিনা প্রয়োজনে এমন সব কাসরত পরিবেশন করা হয় যাতে কারো না কারো মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, রেসলিং। ২. যে সব খেলাধুলায় নারীর সব অঙ্গের প্রদর্শন করা হয়, যা খোলা পরপুরুষের সামনে তাদের জন্য বৈধ নয়, যেমন, সাতার। যদি নারীরা এসব খেলাধুলায় নারীরা অংশ গ্রহণ করতেই চায়, তবে সেখানে কোন পুরুষ থাকা যাবে না। ৩. যেসব খেলাধুলায় সত্যিসত্যি যাদু থাকে। কারণ, যাদু গুণাহের অন্তর্ভুক্ত। ৪. যেসব খেলাধুলায় প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা থাকে। যেমন, লটারী। ৫.যেসব খেলাধুলায় পশু-পাখীকে উত্তেজিত করে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত করা হয়। যেমন, ষাড় ও মোরগের লড়াই। ৬.যেসব খেলাধুলায় জুয়া আছে। ৭. যেসব খেলাধুলায় মানুষের মর্যাদা ভূ-লুন্ঠিত করা হয়, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়, তাকে অন্যের হাসি-তামাশার টার্গেট বানানো হয়।[৩]

কবিতা ও সাহিত্য চর্চা: রাসূলুল্লাহ (সা.) কবিতায় শুনেছেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মদীনায় মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি সাহাবীদের ইট ও মাটি বহনের সময় ক্লান্তি দূর করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তিনি কবি কা'ব ইবন যুহাইরকে (মৃ.) "বানাত সুআদ" কবিতাটির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর গায়ের চাদর(বুরদাহ) উপহার দিয়েছিলেন। অথচ এ কবিতাটি ছিল প্রেমগাথা। তিনি কাফিরদের অপপ্রচারের জবাব দানের ব্যবস্থা করেছিলেন কবিতার মাধ্যমে এবং এ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন কবি হাসসানকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিছু কিছু কবিতায় হিকমত আছে।'[৪] তবে বাতিলের প্রশংসায় লেখা, মিথ্যা অহংকারপূর্ণ কবিতা, সীমাহীন নিন্দা ও ব্যাঙ্গপূর্ণ কবিতা, অশ্লীল প্রেমের কবিতা ইত্যাদি যা ইসলামী মূল্যবোধের ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ প্রসংঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]

وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ- أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ- وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ্য করো নি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর নিশ্চয় তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আর আল্লাহকে অনেক স্মরণ করেছে।

গান-বাজনা: গান মূলত এক ধরনের মন তুষ্টকারী জিনিস। মানুষের বিবেক তা পছন্দ করে, মানব প্রকৃতি তা আনন্দ দায়ক মনে করে, আর শ্রবণ ইন্দ্রিয় তার প্রতি আগ্রহ বোধ করে। গান কানের খোরাক, যেমনিভাবে সুস্বাদু খাবার পাকস্থলির খাদ্য, আর সুন্দর দৃশ্য চোখের নন্দন, আর সুবাস নাকের উপভোগ্য। আর ইসলাম কোন বৈধ জিনিসকে হারাম করেনি।[৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা ও বিনোদনের স্বাভাবিক আগ্রহকে কখনো প্রত্যাখ্যান করেননি বরং তাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আয়শা রা. বলেন, (মদীনায়) ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গৃহে দুই আনসার বালিকা দফ বাজিয়ে গান গাইতে ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাপড়মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। এ সময় আবূ বকর রা. সেখানে উপস্থিত হন এবং মেয়ে দুটিকে ধমক দেন। তখন নাবী সা. তাঁর মুখের কাপড় সরিয়ে বলেন, হে আবূ বকর! ওদের ছেড়ে দাও, আজ তো ঈদের দিন।[৭]

ইসলাম সাধারণভাবে সব ধরনের সংগীতকে নিষিদ্ধ করে না। বিশেষ করে যে সব গানে অশ্লীলতা রয়েছে যা ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী এবং যা পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম কেবল তা-ই নিষিদ্ধ করেছে।[৮] পক্ষান্তরে যে সব সংগীতে আল্লাহর একাত্ববাদ, তার গুণকীর্তন ও রাসূল (সা.) এর ভালবাসা ও গুণকীর্তন বর্ণিত রয়েছে অথবা যে সব সংগীতে সততা, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয় কিংবা ইসলামের মৌলিক নীতি, আদর্শ ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা হয়- ইসলাম সে সব সংগীত অনুমোদন দিয়েছে। বরং এ সব সংগীত ব্যক্তিকে ভালো কাজ ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত করে এবং ব্যক্তির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

---

১. সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতুল ঈদাঈন, হাদীস নং ৮৯২ ও ৮৯৩; মুসনাদ ইমাম আহমাদ, প্রাগুক্ত, খ.০৬, পৃ.৫৬, হাদীস নং ২৪৩৪১।
২. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, খ.০৬, পৃ.৩৯, হাদীস নং ২৪১৬৪।
৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলাম ও শিল্পকলা*, অনু. ড.মাহাফুজুর রহমান (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী ২০০৭) পৃ. ১০২-১০৩।
৪. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫০১০; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০১, পৃ.২৬৯, হাদীস নং ২৪২৪।
৫. আল-কুরআন ২৬ : ২২৪-২২৭।
৬. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *আল- হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, প্রাগুক্ত*, পৃ.২৮৩; *ইসলাম ও শিল্পকলা(আল-ইসলাম ওয়াল ফুনূন),প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩-৪৪।
৭. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈদাঈন, হাদীস নং ৯০৭; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সালাতুল ঈদাঈন, হাদীস নং ৮৯২।
৮. আল-কুরআন ৩১:৬-৭।

আলী (রা.) বলেন, তোমরা তোমাদের মনকে কিছুক্ষণ পরপর সান্তনা দাও। কারণ মনকে বাধ্য করা হলে তা অন্ধ হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, মানুষের শরীর যেমন কাহিল হয়ে পড়ে তেমনি মনও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাকে উজ্জীবিত করার কৌশল অনুসন্ধান করো। আর আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি খেলা-ধুলার মাধ্যমে আমার নিজের মনকে কখনো কখনো পরিতৃপ্ত করি যাতে এর দ্বারা সত্য ও হক কাজ করতে শক্তি পাই।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্থ বিনোদন যেমন পছন্দ করতেন তেমনি অসুস্থ বিনোদনকে ঘৃণা করতেন। যেমন তিনি বলেছেন, "গান-বাজনা (মানুষের অন্তরে) নিফাক সৃষ্টি করে, যেমন পানি শস্য ও ফসলাদি উৎপন্ন করে।"[২] রাসূলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেন–" মহান আল্লাহ আমাকে জগদ্বাসীর জন্য রহমত ও পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর আমার সেই পরাক্রমশীল প্রভু আমাকে সর্ব প্রকারের ঢোল, যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিপূজা, শূলি ও ক্রশ এবং জাহেলী যুগের কু-প্রথা ও কুসংস্কার নির্মূল ও ধ্বংস সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩]

গান বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন, ক. গান বৈধ হওয়ার জন্য অবশ্যই গানের বিষয়বস্তু ইসলামী শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল হতে হবে। মদ, নারী, অশ্লীলতা ও ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী হতে পারবে না। খ.গানের বিষয়বস্তু ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়। কিন্তু গায়ক-গায়িকার গাওয়ার পদ্ধতি ও সুর তাকে হালালের সীমানা থকে হারামের সীমানায় নিয়ে যায়। কিংবা হারাম বা মাকরুহ স্থানে নিয়ে যায়। যেমন অনেক গায়ক গায়িকার কণ্ঠে এমন মাদকতা ও আকর্ষণ থাকে যা প্রবৃত্তি ও যৌন বৃত্তিকে জাগ্রত করে, কিংবা প্রেম প্রীতিতে শ্রোতাকে মাতাল করে ছাড়ে। গ. গানের সাথে হারাম কিছু থাকা চলবে না। যেমন মদ্যপান, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। ঘ. গানের ক্ষেত্রে অন্যান্য বৈধ জিনিসের মত অতিরঞ্জন পরিহার করা। ঙ. প্রত্যেক গানের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। যদি কোন গান প্রবৃত্তিকে তাড়িত করে অশ্লীল কাজের উদ্বুদ্ধ করে তবে তা বর্জন করতে হবে।[৪]

আলেমদের ঐক্যমতে ঐ সব গান হারাম যাতে অশ্লীলতা রয়েছে এবং যা গুণাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে ... অনুরূপভাবে তাদের মতে মুক্ত গান, যা বদ্যযন্ত্র মুক্ত স্বভাব সুলভভাবে অনুত্তেজিত কারণে গাওয়া হয়। যেমন, বিয়ের অনুষ্ঠানে, ঈদের দিনে। তবে শর্ত হলো– পরপুরুষের সামনে কোন নারীর কণ্ঠে হওয়া চলবে না। ...এছাড়া অন্যান্য গানের ব্যাপারে মতভেদ আলেমদের রয়েছে।[৫]

ইসলাম ও শিল্প-ভাস্কর্যঃ ইসলাম শিল্পকলার বিরোধী নয়। আল-কুরআন মানুষকে সৌন্দর্য উপভোগ ও তার দ্বারা উপকৃত হওয়াও অনুমোদন করেছেন।[৬] ইসলাম সৌন্দর্য চর্চা, উপভোগ ও সুন্দরকে ভালবাসতে আহ্বান যেমন জানায় তেমনিভাবে ইসলাম তা চর্চা করতে, উপভোগ করতে এবং তার প্রতি ভলোবাসার কথা ব্যক্ত করার অনুমতিও প্রদান করে। তবে যে সব শিল্পকর্ম পৌত্তলিকতা, নির্লজ্জতা, নগ্নতা ও চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটায় ইসলাম তার অনুমোদন দেয় না। শিরক, মূর্তিপূজা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট। ব্যক্তিপূজা রোধকল্পে ইসলাম নাবী-রাসূল, চার খলীফা, মুসলিমদের নেতা, বিজয়ী, বীর ও পূণ্যবানদের প্রতি সম্মান-ভক্তি প্রদর্শনের নামে মূর্তি তৈরীতে অনুমতি দেয়নি। কারণ যুগে যুগে ভক্তি প্রদর্শনের জন্য নির্মিত মূর্তি ও প্রতিকৃতি মানুষকে শিরক ও বিপথগামিতার দিকে নিয়ে গেছে।[৭] এজন্য নাবী সা. বলেন[৮], 'ছবি নির্মাতারাই কিয়ামতের দিন কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।' তবে শিশুদের খেলনা পুতুল এর আওতামুক্ত, কেননা এগুলোতে ভক্তি বা পূজার উদ্দেশ্যে থাকে না, নিছক খেলার জন্য তা ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে গাছ-পালা, নদী, পাহাড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক নৈসর্গিক ছবি বানান ও রাখায় দোষ নেই।[৯]
ইসলাম নাবী-রাসূল ও পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গের প্রতিকৃতি দিয়ে স্মরণীয় করা হয়নি এবং তাদের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকীর পালন নিরুসাহিত করেছে। তাই বলে রাসূল সা., চার খলীফা, সাহাবী, ইমাম ও মুজতাহিদগণ হারিয়ে যায়নি বরং তারা মানুষের স্মৃতি ও হৃদয়ের মনিকোঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং যুগ যুগ ধরে থাকবে।

বাসগৃহে প্রাণী জাতীয় কোন মূর্তি কিংবা প্রাণীর কোন প্রতীক রাখা চলবে না। এটা ইসলামে নিষিদ্ধ। কুকুর পালন বর্তমানকালে ফ্যাশন হলেও শিকার বা পাহাড়াদারী ছাড়া বাসগৃহে কুকুর রাখার অনুমতি ইসলামে নেই। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে বাড়িতে কুকুর, (প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি থাকে সে বাড়িতে (রহমতের) ফেরেস্তা প্রবেশ করেনা।[১০]

---

[১]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলাম ও শিল্পকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।
[২]. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪৯২৭; *মিশকাত*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং৪৮১০।
[৩]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৫, পৃ.২৬১, হাদীস নং ২২৩৬১; আল-বাইহাকী, হা. নং ৫১০০, *মিশকাত*, কিতাবুল হুদূদ, হা. নং ৩৬৫৪।
[৪]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলাম ও শিল্পকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২-৫৬ [সংক্ষেপিত]।
[৫]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলাম ও শিল্পকলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০।
৬. আল-কুরআন ১৬;৫,৬,৮,১৫; ১৬, ৫০, ৬, ৭, ২৭, ৬০, ৮৮।
[৭]. আল-কুরআন (৭১: ২৩-২৪) (৫৩: ১৯-২০,২৩) (২৬: ৬৯-৭৬)
[৮]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাত, হাদীস নং ২১০৯।
[৯]. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৩,৪৮,।
[১০].মূল আরবী[لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل]*সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবু বাদউল খালক,হা.নং ৩০৫৩; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আদাব, হা. ২৮০৪।

.....

শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখিত নির্দেশনাবলী মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ বিকাশের সহায়ক। এ সব বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ঢেলে সাজাতে হবে। তবেই সেই শিক্ষা-সংস্কৃতি আমাদের সত্যিকার কল্যাণ, সমদ্ধি ও মুক্তি বয়ে আনবে।

❑· আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও সৎকর্মের সংশ্লিষ্ট:

আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও সৎকর্ম মূল্যবোধ বিকাশের উপাদানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ বিষয়গুলো ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য আসমানী গ্রন্থসমূহে এর উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হয়েছে। যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ তাঁদের প্রচার কাজে এ ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও সৎকর্মের মধ্য থেকে মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

❑.মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সত্যে বিশুদ্ধচিত্তে ঈমান আনা এবং তাতে অবিচল থাকা(الإيمان):

আরবী ‘‘আমন’’ (أمن) শব্দ থেকে ‘‘ঈমান’’ (إيمان) শব্দটির উৎপত্তি। আমন অর্থ– শান্তি, নিরাপত্তা, আস্থা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদী। আর ‘‘ঈমান’ অর্থ–বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন করা, স্বীকৃতি সহকারে মেনে নেয়া। কুরআনে ঈমান শব্দটি ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপে কুরআনে মোট ৮১৫বার এসেছে। শরিয়াতের পরিভাষায়– ঈমান হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সা. যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার স্বীকৃতি প্রদান করা।” কারো কারো মতে, মুহাম্মাদ সা. এর আনীত দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা।[১] যেমন, তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস।

অন্তরের প্রত্যয় ও মুখের স্বীকৃতি ঈমানের মূল অংশ। তাই যদি কেউ মুখে স্বীকার করে, ও তদনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না রাখে, তবে সে মুনাফিক। যদি কেউ বিশ্বাস রাখে ও স্বীকার করে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ না করে, তবে সে ফাসিক। যে অন্তরে বিশ্বাস রাখে, মুখে স্বীকার করে এবং তদানুযায়ী কাজ করে, সে মু'মিন। যে অস্বীকার করে সে কাফির। তবে আ'মাল (কর্ম) প্রথম দু'টির সমান স্তরের অংশ না হলেও বাস্তব ঈমান অর্জনে তা অপরিহার্য। তাই বান্দাকে সত্যিকার মু'মিন হতে হলে আন্তরিক বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

ঈমানের যে সব মূলবিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরী, তা–সাতটি। যথা– ১.আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২.ফেরেশতাকুলে ঈমান, ৩.আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান, ৪.নাবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান, ৫.তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান, ৬.আখিরাতে প্রতি ঈমান, ৭.পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান।

ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈমান। ‘আমলের ক্রটির কারণে মানুষ গুনাহগার হলেও ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয় না। কিন্তু ঈমানের মধ্যে ক্রটি থাকলে ব্যক্তি শুধু ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না, বরং তার যাবতীয় আমল ও ইবাদত মূল্যহীন হয়ে যায়। আমলের ক্রটি আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেন। আর ক্ষমা না করলেও পরকালে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর মু'মিন ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানের ক্রটি আল্লাহ তাওবা ও সংশোধন

---

[১]. কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.) খ.০১, পৃ.১০৮।

ব্যতীত ক্ষমা করেন না। ঈমানে ত্রুটি ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। এজন্য মানব জীবনে ঈমানের বিষয়টি সর্বাধিক বিবেচনা করা হয়। প্রকৃত ঈমানের অভাবে পৃথিবীব্যাপী আজ মুসলিম জাতি লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত। অথচ মুসলিম জাতি পৃথিবীতে যতদিন যথার্থ ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন পর্যন্ত তারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান অধঃপতিত মুসলিম জাতির এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়, যদি না ঈমানী দৈনতা কাটিয়ে সত্যিকার মু'মিন হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক।"

ঈমানের গুরুত্ব ও কল্যাণ: বিশুদ্ধ ঈমান বা বিশ্বাস ব্যক্তির চালিকাশক্তি ও কর্মের ভিত্তি। এটা ব্যক্তির মাঝে থেকেই নৈতিকতা জন্ম দেয়। ঈমানের প্রভাবে পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় কাজ করে ফলে ব্যক্তি মন্দ, অন্যায় ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকে। এর মাধ্যমে ব্যক্তির যাবতীয় কর্ম নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। এটা এক বৈপ্লবিক বিশ্বাস ও চেতনা, ব্যক্তির মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একজন মু'মিন ঈমান আনার সাথে সাথে উন্নত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে যাবতীয় মন্দ স্বভাব থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে তৎপর হয়। এটা মু'মিনের কর্ম ও আচরণ সহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে উন্নত গুণাবলী অর্জনে ব্যক্তির জীবনে ঈমানের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। বিশুদ্ধ ঈমান সবচেয়ে বড় পূণ্যের কাজ। পক্ষান্তরে, ঈমানবিহীন মানুষ চরম ভ্রষ্ট, প্রবৃত্তি ও শয়তানের পূজারী। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]–

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতার এবং নাবীগণে ঈমান আনয়ন করলে ...।" অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-[৩]

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدً)

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই কিতাবে যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সেই কিতাবে যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে অস্বীকার করে আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতকে, সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।"

ঈমানের সাথে নৈতিকতা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ঈমান মু'মিন ব্যক্তির জীবন ও আচরণে আমূল পরিবর্তন ঘটায়।এটা ব্যক্তির মাঝে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মহৎ গুণাবলী সৃষ্টি করে। সত্যিকার ঈমান মানুষের কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করে সুবৃত্তির বিকাশ সাধন করে। এটা ব্যক্তির জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।[৪] ঈমান ব্যক্তিকে অন্যায় ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে পবিত্র জীবনের দিকে ধাবিত করে। সত্যিকার মু'মিন ব্যক্তি হত্যা-সন্ত্রাস, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, অহংকার, দম্ভ, মিথ্যাচার, মিথ্যা অপবাদ, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা,যুলম, চুরি, ডাকাতি, লোভ-লালসা, মদ, জুয়া, হারাম উপার্জন সহ সবধরনের পাপাচার ও মন্দ কাজ থেকে মুক্ত থাকে।[৫] ঈমান ব্যক্তিকে বিশ্বস্ত, অঙ্গীকার পালনকারী, উদারচিত্ত, ধৈর্যশীল, সহনশীল, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ, অকপটতা, কথা-কাজে নিষ্ঠা, ক্ষমাপরায়ন ও আমানতদার ইত্যাদি মহৎ গুণ অর্জনের শিক্ষা দেয়। ফলে সে স্বীয় অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, ও প্রতিশ্রুতি পালনে যত্নবান করে।[৬] ঈমান মু'মিন ব্যক্তিকে বিনয়-নম্র, ভদ্র, শান্তিকামী ও সাহসী হতে শিক্ষা দেয়। ঈমানদার ব্যক্তির প্রতিটি আচরণ ও কর্মে এই সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারা মন্দের বদলে মন্দ কাজ করেন না, বরং ভালো দ্বারা মন্দের প্রতিকার করে থাকেন। এছাড়াও পানাহার, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-তালাক সহ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে একটি নৈতিক ছকে বেঁধে দেয়। ঈমান মু'মিন ব্যক্তির মাঝে উন্নত গুণাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় উন্নীত করে।[৭] অধিকন্তু, ঈমানের কারণে বৈষয়িকভাবে মু'মিন ব্যক্তি সততা, সত্যবাদিতা, বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি উন্নত চারিত্রিক গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। ঈমান পার্থিব জীবনে মু'মিন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোভ-লালসা, অতৃপ্তি, অশান্তি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করে। বিশুদ্ধ ঈমান অন্তরের কলুষতা ও পাপ দূরীভূত করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। তা মানুষের ঈমানপূর্ব জীবনের পাপ ও কলুষতা মিটিয়ে দিয়ে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও নির্মল করে দেয় এবং পবিত্র জীবনের নিশ্চয়তা দেয় । এ মর্মে কুরআনের ভাষ্য[৮]– مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ "মু'মিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩ঃ আয়াত ১৩৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১৭৭।
৩. আল কুরআন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১৩৬।
৪. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ০২।
৫. আল-কুরআন, (০৩ : ১৩৪-১৩৫) (২৫ :৬৩-৭৪) ।
৬. আল-কুরআন, ২৩:১-৯।
৭. আল-কুরআন, (১৩:২২) (৩৩:৩৫) (০৯:১১২) (৪২:৩৭–৩৯)।
৮. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ৯৭, দেখুন আল কুরআন (৯৮:৭–৮)।

ঈমান নৈতিকতার উৎস। যথার্থ ঈমান মু'মিনদের বিশ্বাস ও চেতনাকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করে এবং মানুষের বিশ্বাসগত বিচ্যুতি, শিরক ও কুসংস্কার দূর করে। তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব), রিসালাত (নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব) ও আখিরাত (পরকাল) কেন্দ্রিক মু'মিনদের বিশ্বাস ও চেতনা গড়ে উঠে। সেই চেতনা অনুযায়ী–তারা সালাত কায়েমকারী, দানশীল ও যাকাত আদায়কারী হয়ে থাকে।'[১] ঈমান মু'মিনকে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু এক আল্লাহর গোলামী করার নির্দেশ দেয়। এভাবে ঈমান ব্যক্তিকে আত্মমর্যাদাশীল হতে শিখায় এবং মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারীরূপে গড়ে তোলে।এটা এমন এক বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনা যা মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহ অভিমুখী করে রাখে। কুরআনে বলা হয়েছে[২]- وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا "তারা তাঁকে (আল্লাহ্) ভয় করে এবং তাঁকে (আল্লাহ্) ছাড়া কাউকে ভয় করে না, আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

ঈমানের পথ আলোর পথপ্রদর্শন করে। ঈমান মানুষের অন্তরের প্রতিটি প্রান্তকে সত্যের আলোতে আলোকিত করে তোলে এবং বাতিল ও গোমরাহীর সমস্ত অন্ধকারকে দূরীভূত করে। বিশুদ্ধ ঈমানের নির্মল জ্যোতি মু'মিন হৃদয়ে এমন সজীবতার উন্মেষ ঘটায় যাতে বাতিল কোথাও আশ্রয় গ্রহণের স্থান খুঁজে পায় না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ- "আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে তার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রয়েছে।" আরও বলেন[৪]– اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ "যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান।"

ঈমান মানুষকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করে। ঈমান মু'মিন ব্যক্তির চিন্তা, বিশ্বাস, জ্ঞান-বুদ্ধির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। আল্লাহর পথে তার জীবনের সকল তৎপরতা পরিচালিত করার শক্তি লাভ করে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৫] –وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ- "এবং যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন।"

ঈমান ব্যক্তিকে সত্য, সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। শুধু তাই নয়, এটা ব্যক্তিকে সত্যের উপর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করে এবং সত্যের পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন।[৬] ফলে মু'মিন ব্যক্তি সত্যের জন্য যে কোন ধরণের ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। শত কষ্টের পরও কোন অবস্থাতেই সে বাতিল ও অন্যায়ের পথ বেছে নেয় না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭] – أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ "আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত হকের অনুসরণ করে।" শুধু তাই নয়, ঈমান ব্যক্তিকে সৎকর্মশীল হওয়ার সাথে সাথে সমাজের অন্য মানুষকে সৎ পথে আনার জন্য কাজ করেন। এ মর্মে বলা হয়েছে[৮] – أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ "তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।"

ঈমানই বিশ্বমানবতার কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির মহাউৎস। ঈমানের মাধ্যম আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও বরকত লাভ করা যায়। ঈমান এমন এক মহামূল্যবান জিনিষ যে, এতে শুধুই কল্যাণ,এতে নেই কোন ক্ষতি-লোকসান। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে[৯]–(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ) "যদি সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম।"

فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

"আর যে তার রবের প্রতি ঈমান আনে, সে না কোন ক্ষতির আশংকা করবে এবং না কোন অন্যায়ের।" [১০]

ঈমান ব্যক্তিকে আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় উদ্বুধ করে।[১১] ঈমান ব্যক্তিকে সৎকর্মপরায়ন দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন ও সদাচারী হতে শিখায়। অধিকন্তু, ঈমান ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থ পরোপকারী মহৎ ব্যক্তি হতে শিখায়। তাইতো মু'মিন অপর মু'মিনকে নিজের চেয়ে অগ্রাধিকার দেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে[১২]–

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا- وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا-

"তারা কর্তব্য পালন করে এবং এবং সে দিনের ভয় করে, যেই দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্বেও তারা অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম,ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।" অন্যত্র এসেছে-[১]

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১-৫; আরও দেখুন, আল-কুরআন (২৩:৫৯)।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৩৯।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ২২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫৭, আল কুরআন (০৬:৮২)।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ১১, আল কুরআন (২২:৫৪)।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ১৩-১৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্ক্বান ২৫ : আয়াত ৭২।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : আয়াত ৬১, আল কুরআন (০৩:১১৪)।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৯৬; আরও দেখুন,আল কুরআন (০৪:১৭০) (৪৫:৩০)।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-জিন্ন ৭২: আয়াত ১৩, আল কুরআন (২০:১১২)।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩: আয়াত ২১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্‌র/আল-ইন্সান ৭৬: আয়াত ৭-৯।

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-"এবং তারা নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।"

ঈমান ব্যক্তিকে শিক্ষিত ও জ্ঞানী হতে সহয়তা করে। ঈমানের দাবী অনুসারে মু'মিন ব্যক্তি মহান আল্লাহর কিতাব চর্চার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২]– يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ "তারা সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে।"

ঈমান সবচেয়ে বড় পূণ্যের কাজ। পূণ্যের যত কাজ আছে তৎমধ্যে ঈমানই সর্বোৎকৃষ্ট।[৩] এটি সকল ইবাদতের মূলভিত্তি। ঈমানই পূণ্যবান হওয়ার ও পূণ্যের পথ লাভের সিঁড়ি। যাবতীয় সৎকর্ম গ্রহণ ও পরকালীন মুক্তির পূর্বশর্ত বিশুদ্ধ ঈমান।[৪] ঈমানবিহীন পূণ্য যত চমৎকার ও যত বেশী হোক না কেন, তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং ঈমানবিহীন সৎকর্ম নিস্ফল।এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]– وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ "কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিস্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

ঈমান মু'মিনদের আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয়ে নিয়ে যায়. যা তাদের শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে সাহায্য করেন। ফলে মু'মিনরা শয়তানের ধোঁকা, অনিষ্ট, পাপচার ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা পায়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৬]– إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- "নিশ্চয়ই তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"

ঈমান ব্যক্তিকে আল্লাহর স্মরণে তৎপর রাখে, যা ব্যক্তিকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে।[৭] ঈমান ব্যক্তির মনে আল্লাহ ভীতি ও পরকালের জবাবদিহিতার ভয় সঞ্চায় করে। ফলে ব্যক্তি মহান আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তৎপর থাকে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৮] – وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ - " আর যারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত–সন্ত্রস্ত।"

ঈমান ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল বানায়। তাই মু'মিন ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সকল প্রয়োজনে কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে এবং তাঁর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকে । ফলে কোন ব্যর্থতা তার জীবনে হতাশা বয়ে আনে না, আবার কোন সফলতা তাকে আনন্দের সীমা অতিক্রম করায় না। কুরআনে এসেছে[৯] لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ-"যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।"

ঈমান ব্যক্তিকে তাকদীরের ভালো-মন্দ আস্থাশীল হতে শিখায়। ফলে সে আল্লাহর প্রতিটি ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে শোকর আদায় করে।[১০] নির্ধারিত রিজ্‌কের প্রতি আস্থাশীল থাকায় ঈমান ব্যক্তিকে ঘুষ, সুদ সহ অবৈধ উপার্জন থেকে দূরে রাখে। জাগতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঈমান মু'মিনকে মধ্যপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়। মহান আল্লাহর বাণী[১১]– وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا- "আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না কার্পণ্যও করে না, বরং তারা এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবস্বন করে।"

ঈমান ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রশস্ত হয়ে থাকে। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সংকীর্ণ সফলতার অন্ধত্ব থেকে মুক্ত রাখে এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের সফলতা এখানে মুখ্য হিসেবে দেখা দেয়। এটা মানুষকে পার্থিব জীবনের মোহ, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ও অনাচার থেকে বের করে পরকালীন মুক্তির জন্য সৎকর্ম উৎসাহিত করে। এটা জগৎবাসীর ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। এটাই বিশ্ববাসীর মুক্তির একমাত্র পথ। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে-[১২]

> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ
>
> "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবঈন-যারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের রবের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১১৩।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১৭৭।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ৪০, আল কুরআন (২১:৯৪)।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ০৫।
৬. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৯৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩৭।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ৭০: আয়াত ২৭, আল কুরআন (২৩:৬০)।
৯. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা ৪২: আয়াত ৩৬।
১০. আল-কুরআন সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : আয়াত ২২-২৩।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরক্বান ২৫ : আয়াত ৬৭।
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৬২।

ঈমানই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি। সত্যিকার ঈমান পার্থিব বিপদ-আপদ ও আযাব-গযব দূর করে এবং কল্যাণ লাভ বয়ে আনে।[১] ঈমান আল্লাহর রহমত, দয়া, ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও ক্ষমা লাভের পথ।[২] সত্যিকার ঈমান পার্থিব জীবনে মু'মিনকে সব ধরনের লাঞ্ছনা, হতাশা, পরাজয় ও ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়ে সফলতায় উপনীত করে।[৩] এটা আখিরাতে সফলতার মূল হাতিয়ার। এর বদৌলতে মু'মিনরা মহাপুরস্কার ও জান্নাত লাভ করবেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا "যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পদদেশ নদী প্রবাহিত,সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য।"

ঈমানের নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে '*তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*' বলা হয়েছে–[৫]

> ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার কায়া পরিবর্তন করে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত দুনিয়ার অন্য সকল জাতির মোকাবিলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে।... আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, প্রকাশ্যেই থাকি আর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা বদ্ধঘরে লুকিয়ে থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি–আমার সকল আচরণ, অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্খা পর্যন্ত বিরাজমান এক মহাসত্তার সম্মুখে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার সঙ্গে মিলে রয়েছে এমন সব প্রহরী যারা আমার প্রতিটি আচরণ ও অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে লিপিবদ্ধ করছেন।– এই বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের চাল-চলন ও আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত।

আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দূরাচারের চরিত্র শুদ্ধি ঘটানোও সম্ভবপর হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের সহনীয় হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের শাস্তির ভয় করার অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতা শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভবনা থাকে না, সে পরিবেশে এ সব লোকের পক্ষেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোনই বাধাই থাকে না।

ঈমান ও বর্তমান মুসলিম: ঈমানের বিবিধ কল্যাণ থাকলেও বর্তমান ঈমানের দাবীদার অধিকাংশ মুসলিমের উপর ঈমানের কোন ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায় না, বরং উল্টো মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বর্তমানকালের অধিকাংশ নামসর্বস্ব মুসলিম মিথ্যাচার, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, মদ, জুয়া, হারাম উপার্জন, হত্যা-সন্ত্রাস, অহংকার, দম্ভ, মিথ্যা অপবাদ, যুলম, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, চুরি, ডাকাতি, কবরপূজাসহ সবধরনের পাপাচার ও মন্দ কাজে লিপ্ত, যা মুনাফিক, কাফির ও মুশরিকদের চরিত্রিক গুণ। অধিকন্তু, ঈমান থেকে সৃষ্ট মহৎগুণ যেমন: ঈমান, সততা, ইনসাফ, আমানতদারি, বিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার পালন, উদারচিত্ত, ধৈর্যশীল, অকপটতা, কথা-কাজে নিষ্ঠা, ক্ষমাপরায়ন, মানব কল্যাণ, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও মানুষের হক আদায় ইত্যাদি থেকে তাদের অধিকাংশই দূরে। বস্তুত তারা সত্যিকার ঈমান থেকে অনেক দূরে, ঈমানের দাবীদার মাত্র। কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে পরিমাপ করলে দেখা যাবে যে, অতি অল্পসংখ্যক ছাড়া তাদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক পর্যায়ের। এদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৬]- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِيْنَ-"আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি', অথচ তারা মু'মিন নয়।"

এজন্যই নাবী সা. বলেন[৭],"*ঈমান শুধু কোন আকাঙ্খা ও বেশাভূষার নাম নয় বরং তা হলো স্বীকৃতি সহকারে অন্তরের এমন বিশ্বাস, কর্ম যার সত্যতা বহন করে।*" তাই শুধু মুখে ঈমানের দাবী করলে, মু'মিনের বেশাভূষা গ্রহণ করলে কিংবা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে মু'মিন হওয়া যায় না। বরং মু'মিন হতে হলে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণভাবে সমর্পণ করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে জীবনে পরিচালনার মাধ্যমে মু'মিন হওয়া যায়। কাজেই ঈমানের প্রকৃত সুফল পেতে হলে বিশুদ্ধচিত্তে ঈমান এনে ঈমানের সকল দাবী অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হবে।

❑.মহান আল্লাহর পরিচয়, গুণাবলী এবং তাঁর তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ:

---

১. আল-কুরআন ১০: ৯৮; ১১:৫৮ ।
২. আল-কুরআন, সূরা মার্ইয়াম ১৯:আয়াত ৯৬, আল-কুরআন (৬৭:১২)।
৩. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৩৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত০৯, আরও দেখুন, আল-কুরআন(০৪:১৩) (৪৬:১৩-১৪) ৪১:৩০,(৪৫:৩০) (৮৫:১১) এ ব্যাপারে শতাধিক আয়াত রয়েছে।
৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, ১মখণ্ড, পৃ. ১০৩-১০৪।
৬.আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ০৮-১০।
৭. মূল আরবী [ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل]জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ, হরফুল লাম*, খ.১৮, পৃ.২৪৩, হা. নং ১৯৩১৭; মুহাম্মদ কুতুব, *হাল নাহনু মুসলিমূন* (কায়রো : দারুশ শুরূক, ২০০২),পৃ.১৩।

মহান আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী-ক্ষমতা সম্পর্কিত জ্ঞান মু'মিনদের মনে আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মসচেতনতা আনে। এ জ্ঞান ছাড়া ঈমান বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও পূর্ণতা সম্ভব নয়। আল্লাহর সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিতে না পারলেও অন্তত শিরক, কুফর, নিফাকসহ বিভিন্ন বড় বড় পাপাচার থেকে বাধা দেয়। এতে নৈতিক অবক্ষয় অনেকাংশে রোধ হয়। মহান আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে কোন মু'মিন অবগত হলে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর প্রতি তার ভক্তি, ভয়, ভালবাসা, আশা-ভরসা, আগ্রহ ও মান্যতা বেড়ে যায়, ঈমানের স্বাদ লাভ করে, আল্লাহর ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাপকাজে লজ্জা অনুভব করে, মনের অহংকার ও ঔদ্ধত্য দূর হয়, আল্লাহর সাক্ষাৎ ও পরকালীন জীবনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, এটা মানুষের মধ্যে আল্লাহ ভীতি পয়দা করে– যা নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের মূল নিয়ামক শক্তি। এজন্য আল্লাহর আস্তিত্ব, তাঁর সত্ত্বা, সার্বভৌমত্ব, জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বলা আবশ্যক যে, মহান আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও মাহাত্ম্য-বড়ত্ব এমন একটি ব্যাপক বিষয় যে, কারো পক্ষেই তাঁর পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে[১]– وَلَوْأَنَّمَافِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّانَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"
তবে কুরআনে মহান আল্লাহর যে সংক্ষিপ্ত মৌলিক পরিচয় গুণাবলী, ক্ষমতা, মহত্ত্ব, ও বড়ত্ব বর্ণিত হয়েছে তা বর্ণনা করাও এখানে সম্ভব নয়। তবে কুরআনে তাঁর পরিচয়ের যে সব মৌলিক গুণ ও দিক ফুটে উঠেছে নিম্নে তুলে ধরা হল–

আল্লাহ (اللّٰه) শব্দটি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালকের সবচেয়ে বড় ও প্রকৃত নাম, যাকে বলা হয় আল্লাহর ইসমে যাত (সত্তাবাচক নাম)। অনেকে এটিকে ইসমে আযম বলেছেন। কুরআনে আল্লাহ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে ২৬৯৭ বার। এছাড়া বিভিন্ন গুণবাচক শব্দে ও সর্বনামে সমগ্র কুরআন জুড়ে মহান আল্লাহর আলোচনা এসেছে।

মহান আল্লাহ এমন এক সার্বভৌম মহাসত্তা, যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, সর্বসত্ত্বার ধারক, সর্বজ্ঞ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি অন্তহীনভাবে ক্রিয়াশীল ও চিরজাগ্রত। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[২]–

> اللّٰهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
> "আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা বা নিন্দ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করিতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"

সত্তা বা গুণগত দিক থেকে তিনি সৃষ্টিজগতের কোন কিছু তাঁর মত নয়। তাঁর মতও কেউ নয়। যে কোন সৃষ্টবস্তু থেকে তিনি ভিন্ন। তাঁর সাদৃশ্য ও সমতুল্য কোন কিছু নেই, হতে পারে না। তিনি নমুনাবিহীন ও অতুলনীয়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৩]–لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ- "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"
তিনিই একমাত্র চিরন্তন মহাসত্তা, যিনি অনাদি-অনন্ত। তাঁর কোন ক্ষয় ও লয় নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। যখন কেউ ছিল না তখন তিনি ছিলেন, সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর শুধু তিনি থাকবেন। কুরআনে বলা হয়েছে[৪]– هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।" অন্যত্র এসেছে[৫] كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ- وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ- "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্ত্বা,যিনি মহিমাময়,মহানুভব।"

উল্লেখিত বক্তব্য প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ চেয়ে বড় কোন কিছু নেই। তিনি সার্বভৌম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অতুলনীয় একক চিরন্তন মহাসত্তা। তিনি পরমতত্ত্ব। তিনি মানুষের জীবনে পরম কাম্য ও বাঞ্ছিত।সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য।

তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি জীব-জড়, প্রাণী-উদ্ভিদ, অণু-পরমাণু, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবকিছুর অস্তিত্বদানকারী মহাস্রষ্টা।[৬] সমগ্র সৃষ্টিকুল তাঁর একক সৃষ্টিকর্ম। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র উদ্ভাবক, রুপকার ও স্থপতি। তিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং এতোদুভয়ের মধ্যকার প্রতিটি বস্তুর স্বতন্ত্র ও অভিনব আকার-আকৃতি দানকারী এক নিপুণ মহাশিল্পী, মহাবিজ্ঞানী। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭]-اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَافِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ- "আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে; অতঃপর আরশে সমাসীন হন।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৮]–

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ২৭।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ১১, আল-কুরআন (১৬:৭৪ (৩০:২৭)।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭: আয়াত ৩।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান ৫৫: আয়াত ২৬-২৭, আল-কুরআন(২৮:৮৮)।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ৬২।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজ্দাহ ৩২: আয়াত ০৪, আল কুরআন (৪২:১১) (০২:২৯)।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১: আয়াত ১০-১১, আল কুরআন (০৬:৯৫-৯৮)।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ -هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

তিনি খুঁটি ছাড়া আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছ, আর পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী; আর আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করি, অতঃপর তাতে উদগত করি সর্বপ্রকার জোড়ায় জোড়ায় কল্যাণকর উদ্ভিদ। এ আল্লাহর সৃষ্টি; তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও! বরং যালিমরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে[১]– بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ -"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী। এবং যখন তিনি কোন কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন তখন তার জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়।" আরও বলা হয়েছে[২] هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

তিনি সমগ্র সৃষ্টিকুলের একমাত্র বর তথা প্রতিপালক, সংরক্ষক ও সংহারক। সমগ্র সৃষ্টির রিজক, জীবন-মৃত্যু ও কল্যাণ-অকল্যাণ সহ যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তাঁর একক নিয়ন্ত্রণে। তিনি সবার মহাপ্রভু ও মুনিব। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর বান্দা ও দাস।এ মর্মে বলা কুরআনে হয়েছে[৩]- رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ "যিনি আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৪]– وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ-"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই।তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"

তিনি বিশ্বজগতের সবকিছুর নিরঙ্কুশ পরিচালক ও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক। বিশ্বজগৎ পরিচালনায় তাঁর কোন সাহায্যকারী বা পরামর্শদাতা নেই। এ ব্যাপারে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেই। এ মর্মে বলা হয়েছে[৫] إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ "তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সক বিষয় পরিচালনা করেন।" অন্যত্র এসেছে[৬] يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ "তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।"

মহান আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতা নেই। তিনি কোন কিছু থেকে উদ্ভূত নন এবং তাঁর থেকেও কোন কিছু উদ্ভূত নয়। সত্তা ও গুণগত দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ একক ও অবিভাজ্য। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে নেই কোন শরীক। যেমন বলা হয়েছে[৭] قُلْ هُوَ اللَّهُ -اللَّهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ-وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَحَدٌ "তিনিই আল্লাহ্, এক–অদ্বিতীয়; তিনি (আল্লাহ্) কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" আরও বলা হয়েছে[৮]

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ-عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ অনেক পবিত্র।"

মহান আল্লাহই একমাত্র সত্যিকার উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কেহই উপাসনার যোগ্য নয়। নিরঙ্কুশ আনুগত্য শুধু তাঁরই প্রাপ্য। কুরআনে বলা হয়েছে[৯]– وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ "আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম দয়াময় ও অসীম দয়ালু।" অন্যত্র এসেছে, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ "তিনিই ইলাহ্ নভোমন্ডলে, তিনিই ইলাহ্ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"[১০] আরও বলা হয়েছে[১১] وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ "কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী। যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি মহাক্ষমাশীল।"

উদ্ধৃত আয়াতসমূহ এই মূল্যবোধ শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র বিশ্বের সবকিছুর মহাস্রষ্টা, প্রতিপালক (রব) ও উপাস্য (ইলাহ)। তিনি ছাড়া অন্য কেউ স্রষ্টা, প্রতিপালক(রব) ও উপাস্য(ইলাহ) নয়, হতে পারে না। তাই তিনি ছাড়া অন্য সব

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১১৭ ।
২. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ০৬। আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ০৩।
৩. আল-কুরআন, সূরা আদ্-দুখান ৪৪: আয়াত ০৭-০৮।
৪. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ০৬।
৫. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ০৩।
৬. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজদাহ ৩২: আয়াত ০৫-০৬, আল-কুরআন(১১:৫৬)।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ইখলাস ১১২: আয়াত ১-৪।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ৯১, আল-কুরআন (২৫:০২) (১৮:২৬)।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৬৩)
১০. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৮৪-৮৫।
১১. আল-কুরআন, সূরা সাদ ৩৮: আয়াত ৬৫-৬৬।

মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা বর্জন করা। কেননা এ ধরণের উপাসনা অনৈতিক ও অবৈধ। আর ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর দাসত্ব করা।

মহান আল্লাহ্ যাবতীয় মহৎ গুণ, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁর সত্তা যেমন অতুলনীয় ও অনন্য, তেমনি গুণগতভাবে তিনি অতুলনীয় ও অনন্য। তাঁর গুণসমূহ পরিপূর্ণ ও বর্ণনাতীত। তাঁর কোন গুণ সৃষ্টিজগতের কারো কোন গুণের সাথে তুলনা বা অনুমান করা যায় না। আল-কুরআনে তাঁর কিছু গুণের বর্ণনা এভাবে এসেছে[১]–

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ-هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যে শরীক স্থির করে তা হতে তিনি পবিত্র, মহান। তিনিই সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও দৃশ্য-অদৃশ্য পরিজ্ঞাতা। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টিসীমার মধ্যে। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য এমন কিছু নাই যা তিনি জানেন না। গোপন-প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর কাছে পূর্ণভাবে প্রকাশ্যমান। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সবকিছু জানেন। উচ্চকণ্ঠে কথা এবং গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই তিনি জানেন। এ মর্মে বলা হয়েছে[২]–

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না । জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুস্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ- سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ-

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও বাড়ে। আর তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে। যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান তিনি তা জানেন, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে কেউ কথা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে,আর রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, সবই তাঁর নিকট সমান।[৩]

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ- "আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি অবগত আছেন।"[৪]

তিনি সত্তাগত ও গুণগত সর্বপ্রকার ক্রটি-বিচুত্যি, দুর্বলতা, অক্ষমতা, মলিনতা, কলুষতা, অপবিত্রতা ও জৈবিক চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অতীব পবিত্র। কোন প্রকার ক্লান্তি, হতাশা, অক্ষমতা, দুর্বলতা, দুর্দশা, বিপদ-আপদ, অসুস্থতা, অভাব ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না।[৫] তিনি কখনও ভুল করেন না এবং কোন কিছুই ভুলে যান না।[৬] সর্বপ্রকার ভুল-ক্রটি, অজ্ঞতা, বিস্মৃতি উর্দ্ধে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭]– وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا "বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেনি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্থ হন না, যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।"

উল্লেখিত আয়াত ও আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বগুণের আধার ও পরিপূর্ণ সত্তা। তিনি ছাড়া সবকিছুই অসম্পূর্ণ। সত্তা বা গুণগত দিক থেকে তিনি অন্যন্য ও অতুলনীয়। তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না। তাই ইবাদত, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করা।

তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও আরশে আযীম[৮]এর একচ্ছত্র অধিপতি ও রাজাধিরাজ। এসবের মধ্যকার সবকিছুরই তিনি চিরন্তন মালিক। সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।[৯] তাঁর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কখনই শেষ বা ধ্বংস হবে না। কুরআনে বলা

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ২২-২৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌'আম ০৬: আয়াত ৫৯।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আর্‌-রা'দ ১৩ : আয়াত ০৮-১০, আল কুরআন (১১:১২৩)।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌'আম ০৬: আয়াত ০৩, আরও দেখুন আল কুরআন (২০: ৬-৭), (৪১:৪৭)।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ৩৮।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৫২।
[৭].আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ১১১।
[৮]. আরশে আযীম–সিংহাসন সাদৃশ্য সীমাহীন ক্ষেত্র, যার উপর সমাসীন রয়েছেন মহান আল্লাহ। সাত আসমান ও কুরসী উপরে আরশে আযীম অবস্থিত।এ সমুদয় পৃথিবী, সপ্ত মহাকাশ ও তার উপরে অবস্থিত কুরসী অপেক্ষা আরশ এত বিস্তৃত যে, মানবীয় জ্ঞান তা কল্পনা করতে পারবে না।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ১৫।

হয়েছে[১]– لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى "যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই।"[২] অন্যত্র বলা হয়েছে[৩]- وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ -"আসমান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।"

তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস, সর্বশক্তিমান ও প্রবল পরাক্রমশালী। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার সীমাহীন। তাঁর ক্ষমতা অ-প্রতিরোধ্য। তিনি সকলের উপর বিজয়ী। কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নেই। কারো সাধ্য নেই তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার। প্রত্যেক জিনিষ তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁর হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা থেকে অপসারিত করেন; যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বে কারোই বিন্দুমাত্র শরীক নেই কিংবা প্রভাব বিস্তারের সাধ্যও নেই। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৪]- وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "আসমান ও যমীনের এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" অন্যত্র আরও বলা হয়েছে[৫]–

> قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ- تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ
> "তিনি সর্বভৌম ক্ষমতার মালিক,তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন, যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, তাঁর হাতে সমস্ত কল্যাণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি রাত্রিকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাত্রিতে পরিণত করেন, তিনি মৃত হতে জীবিতকে বের করে আনেন এবং জীবিত হতে মৃত বের করে আনেন, তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।"

আরও বলা হয়েছে[৬]- إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ - "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই; তিনিই জীবন জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৭] – تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا "কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর অধিপতি! "আরও বলা হয়েছে[৮]– وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا "আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"

উল্লেখিত আয়াতসহ কুরআনের আরও অনেক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। আর সার্বভৌম ক্ষমতা অধিকারীকে হতে হয়- সর্বজ্ঞ, দোষ-ক্রটিমুক্ত, চূড়ান্ত ক্ষমতাধর, অবিভাজ্য, অসীম, অমুখাপেক্ষী। মূলত আল্লাহই এসব গুণের একচ্ছত্র অধিকারী। কিন্তু প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করা হয় জনগণ বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর প্রতি আরোপ না করে অন্যের প্রতি আরোপ করা যুলম ও অন্যায়। তাই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান কর্তব্য হলো, তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার বিধানের ভিত্তিতে এই পৃথিবী পরিচালনা করতে পারে।

তিনি অন্তর্যামী, মহাদ্রষ্টা ও সূক্ষ্মদর্শী। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল প্রকাশ্য-গোপন সূক্ষ্মবিষয় সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। কোনকিছু তাঁর নিকট গোপন নেই। মনে উদিত প্রতিটি কল্পনা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। এ মর্মে বলা হয়েছে[৯] يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।" তিনি অসীম। তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি, শ্রবণ ও কুদরত অসীম ও পরিপূর্ণ। কোন দৃষ্টিই তাঁকে ধারণ করতে সক্ষম নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকলেই তারঁ দৃষ্টিসীমার মধ্যে। তিনি সবকিছু দেখেন ও শুনেন। মহাবিশ্বের সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টি, শ্রবণ, জ্ঞান, অনুভূতি ও কুদরত সমানভাবে কার্যকর। একই সাথে তিনি সর্বত্র দেখেন, সকল সৃষ্টির কথা শুনেন, সকলের আকুতি ও অনুভূতি বুঝতে পারেন এবং সবার ডাকে সাড়া দেন। কোনকিছুই তাঁর দৃষ্টিসীমা, শ্রবণশক্তি, জ্ঞানের বাইরে নেই। জ্ঞানে তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[১০] – لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তিনি ধারণ করেন সকল দৃষ্টি, তিনি সুক্ষ্মদর্শী,

---

১. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ০৬, আল-কুরআন (৫৭:০২) (০৩:১০৯) (০৬:১২-১৩) (২৩:৮৪-৮৯)।
২. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ০৬, আল-কুরআন (৫৭:০২) (০৩:১০৯) (০৬:১২-১৩) (২৩:৮৪-৮৯)।
৩ .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: ১৮০, আরও দেখুন, আল-কুরআন(০৩: ২৬-২৭, ১০৯) (০৪:১৩২) (০৬:১২) (১০:৫৫) (১৯:৪০) (২০:০৬) , (৬৩:০৭)।
৪ .আল-কুরআন(০৫:১৭) ।
৫. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ২৬-২৭, আল কুরআন (০৫:১২০)।
৬. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১১৬, আল-কুরআন (০৩:১৮৯) (০৫:১৭) (৩৯: 8- ৫)।
৭. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৮৪-৮৫।
৮. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ৪৪, আল কুরআন (৬৫:১২)।
৯. আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ০৪, আল কুরআন(৬৭:১৩-১৪) আল-কুরআন(৩৫:৩৮)।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১০৩।

সম্যক পরিজ্ঞাত।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১] أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا "আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"আরও বলা হয়েছে[২] وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "তোমরা যেখানেই থাকনা কেন- তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন।" অন্যত্র এসেছে[৩] وَمَايَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَفِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاأَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"আরও বর্ণিত হয়েছে[৪] وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটবর্তী।"

উল্লেখিত আয়াতসমূহ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার সব কার্যকলাপ দেখছেন ও সবকিছু শুনছেন– বস্তুত এটি এমন এক সত্য যা অনুধাবন করলে মানব হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, পার্থিব লোভ-লালসা মুক্ত হয়, সব মন্দ ও পাপ কাজ থেকে সাবধান হয় এবং তাকওয়া, সততা, লজ্জাশীলতা ও উন্নত নৈতিক চরিত্র অর্জন করে।

তিনিই যাবতীয় কল্যাণ ও আকল্যাণের নিয়ন্তা। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন।[৫] তিনি যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় রহমত প্রশস্ত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা তা সংকোচন করেন। তিনি কারো কল্যাণ চাইলে তাতে বাঁধ সাধবার শক্তি কারো নেই, আর কারো অকল্যাণ চাইলে তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো ওপর কোন বিপদ আসতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে[৬] مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণকারী নেই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তৎপর কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই।তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" অন্যত্র এসেছে[৭] وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ- "আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে তবে তিনি তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

তিনিই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা ও জীবন-মৃত্যুর চূড়ান্ত মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তান দান, যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান করেন, যাকে ইচ্ছা হাসান, যাকে ইচ্ছা কাঁদান, যাকে চান সুস্থতা দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা রোগাক্রান্ত করেন। এটা একান্তই তাঁর কুদরত। ইরশাদ হচ্ছে[৮]–

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى- وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا-وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى- مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى-

"আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হইতে, যখন তা স্খলিত হয়।"

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ-أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথচ দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৯]

তিনিই ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দানের একমাত্র অধিকারী। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডার তাঁর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেন, আবার যাকে ইচ্ছা নিঃস্বে পরিণত করেন। তিনি সম্মান-ইজ্জতের মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। তিনি যাকে সম্মান দেন তাকে লাঞ্ছিত করার কেউ নেই; আর তিনি যাকে লাঞ্ছিত তাঁকে সম্মান দেয়ার কেউ নেই। ইরশাদ হচ্ছে[১০]- لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" অন্যত্র এসেছে[১১] وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى-"আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন।" আরও বলা হয়েছে[১২] مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا-"কেউ সম্মান

---

১. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ১২, আল কুরআন (২০:১১০) (০৪:১২৬)।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : আয়াত ০৪।
৩. আল-কুরআন, সূরা সূরা ইউনুস ১০ : আয়াত ৬১; আরও দেখুন, আল-কুরআন (৩৪:০৩)।
৪. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ১৬।
৫. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম ১৪: আয়াত ০৪, আল কুরআন (৩৫:০৮)।
৬. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫ : আয়াত ০২; আরও দেখুন,আল-কুরআন (০৩:৭৩-৭৪)।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৭।
৮. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজম ৫৩: আয়াত ৪৩-৪৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন (১৫:২৩)।
৯. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা ৪২: আয়াত ৪৯-৫০।
১০. আল-কুরআন, সূরা আশ-শূরা ৪২: আয়াত ১২।
১১. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজম ৫৩: আয়াত ৪৮।
১২. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ১০।

ও ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক, সকল সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌র।” অন্যত্র আরও বলা হয়েছে[১] (وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)- “আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই।”

তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, মহাপ্রচুর্যময়, ও সর্বপ্রকার অভাব থেকে মুক্ত। সমগ্র সৃষ্টিকুল অস্তিত্ব লাভ ও টিকে থাকার জন্য সদা তাঁর করুণার প্রতি মুখাপেক্ষী। কিন্তু কোন কিছুর প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী নন।[২] কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ - “তিনি অভাব মুক্ত! যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলে ও যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই।”

তিনি সৃষ্টিকুলের সব সমস্যার সমাধান এককভাবে সম্পন্ন করেন। দিন-রাত যখন যে অবস্থায় বান্দারা তাকে ডাকেন তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ দূর করে দেন, সমস্যার সমাধান করে দেন। ইরশাদ হচ্ছে[৪]- يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত।’

তিনি পরম সত্য। তাঁর কথা সত্য, ওয়াদা সত্য, তাঁর পথ সত্য, তাঁর সবকিছুই সত্য। সকল সত্যই তাঁর থেকেই উদগত। তিনি সর্বপ্রকার মিথ্যা ও অসত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এ মর্মে কুরআনে এসেছে[৫] – ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ “আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা অসত্য।”

তিনি সবকিছুর একমাত্র অস্তিত্ব প্রদানকারী ও পুনরুত্থানকারী।[৬] তিনি বিচার দিবসের একমাত্র অধিপতি ও মহাবিচারক। কিয়ামত দিবসে সকলকে স্বীয় কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দান করবেন। সেদিন কারো কোন কর্তত্ব থাকবে না, সবই তাঁর নিকট পদানত হবে। যেমন বলা হয়েছে[৭]– الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ- مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ “সকল প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই, যিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক।” অন্যত্র বলা হয়েছে[৮] – وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ-“যেদিন সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; তিনি প্রজ্ঞাময় সবিশেষ অবহিত।”
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ -“সেই দিন একের অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।”[৯]

তিনি পরম দয়ালু অসীম দাতা ও অশেষ দয়াবান। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া এক মুহূর্ত কারো পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সৃষ্টির সর্বত্রই তাঁর অশেষ করুণা ও অনুগ্রহ বিদ্যমান। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অগণিত নেয়ামত প্রতিনিয়ত অবারিতভাবে সৃষ্টিজগত ভোগ করছে।[১০] এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১১]–وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ-“আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।” তিনি পরম ক্ষমাশীল, তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু ও কঠোর শাস্তিদাতা। অন্যত্র বলা হয়েছে[১২]– نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-وَ أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ “আমার বান্দাকে বলে দাও যে, আমি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, এবং আমার শাস্তি-সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।”

তিনি সবার চেয়ে বড়। তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। তিনি সবার উপরে। তাঁর চেয়ে উপরে কেউ নেই। তিনি সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১৩]–وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ "আর নিশ্চয় আল্লাহ্, সমুচ্চ, সুমহান।”
তিনি মহাকৃতিমান, মহিমাময় ও মহানুভব।”[১৪] মহাবিশ্বের সর্বত্রই তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান। ইরশাদ হচ্ছে[১৫]- وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَالْعَزِيزُالْحَكِيمُ“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”

উল্লেখিত আলোচনায় মহান আল্লাহ্‌র যে মৌলিক পরিচয়, গুণাবলী ও ক্ষমতা ফুটে উঠেছে তাতে এরূপ সর্বগুণ সম্পন্ন সর্বশক্তিমান মহান সত্তাই কেবল সৃষ্টিকুলের আনুগত্য ও উপাসনার যোগ্য হতে পারে, অন্য কেউ নয়। কাজেই তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য বর্জন করা। আল-কুরআনে যথার্থই বলা হয়েছে[১৬]– “ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ “বল, ‘আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক।” এরপরও যদি কেউ শয়তানের ধোঁকায়

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ১৮।
২. আল-কুরআন, সূরা ফাতির ৩৫: আয়াত ১৫।
৩. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৬৮।
৪. আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান ৫৫ঃ আয়াত ২৯।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৬২।
৬. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ২৭; আরও দেখুন,আল-কুরআন (৩০:১১)।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহাহ ০১: আয়াত ২-৪।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬: আয়াত ৭৩।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইন্‌ফিতার ৮২: আয়াত ১৯।
১০. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ৩৪।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ ০৭: আয়াত ১৫৬।
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-হিজ্‌র ১৫: আয়াত ৪৯-৫০; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ০৫: ৯৮; (৪১:৪৩)।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৬২।
১৪. আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান ৫৫: আয়াত ৭৮।
১৫. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ৩৭।
১৬. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬ : আয়াত ১৬৪।

পতিত হয়ে কিংবা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহর পথ দূরে সরে গিয়ে থাকে তার উদ্দেশ্যে আহবান[১] – فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ "তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী।"

আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ):

তাওহীদ শব্দের অর্থ, একত্ববাদ। তাওহীদ মানে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, সত্তা ও গুণগতভাবে মহান আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টি, প্রতিপালন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি একক। বিশ্বসৃষ্টি, প্রতিপালন, পরিচালনা, ক্ষমতা, রাজত্ব ও কতৃত্বে তাঁর সাথে অন্য কারোই অংশীদারত্ব নেই। তাঁর এই একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, বরং তিনি একমাত্র পালনকর্তা, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, মালিক ও বিধানদাতা। তিনি একক, সার্বভৌম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাধর। বিশ্বজগতের সর্বত্র রয়েছে তাঁর একক নিয়ন্ত্রণ। তিনি তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে সম্পূর্ণ একক, অবিভাজ্য, অতুলনীয় ও সর্বপ্রকার শরীকমুক্ত। তিনি একমাত্র সত্যিকার ইলাহ, নিরংকুশ আনুগত্য ও উপাসনা শুধুই তাঁর প্রাপ্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অন্য সবার গোলামী প্রত্যাখান করে কেবল তাঁরই দাসত্ব করা।

মনীষীগণ বিভিন্নভাবে তাওহীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আবূ বকর আল-জাযাইরী বলেন–"তাওহীদ হলো মহান আল্লাহর যাত(সত্ত্বা), তাঁর গুণাবলী ও কর্মসমূহে কারো সমকক্ষ থাকা অস্বীকার করা[২] অথবা সে সকল ক্ষেত্রে তাঁর সাদৃশ্য হওয়া এবং তাঁর রুবুবিয়্যাত[৩] ও ইবাদাতে (উপাসনায়) কারো অংশীদারিত্ব থাকা অস্বীকার করা।"[৪]

আবদুল আযীয আল-সালমান বলেন–"তাওহীদ হলো, বান্দা এ কথা স্বীকার করবে যে, মহান আল্লাহ হলেন সেই রব যিনি সকল সৃষ্টির জীবিকা প্রদান ও তাদের পরিচালনার কাজ এককভাবেই করে থাকেন, তিনি সকল সৃষ্টির একমাত্র উপাস্য; যাবতীয় উপাসনা ও আনুগত্য এককভাবে তাঁর জন্যই নিবেদিত। আরো মনে করা যে, তিনি এককভাবে বড়ত্ব, মহত্ব, ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে সার্বিক পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত।"[৫]

তাওহীদের প্রকারভেদ: তাওহীদ তিন প্রকার, যথা–ক. তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ; খ. তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ; গ. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত।

ক.তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ: তা হল– আল্লাহর কার্যাবলীতে তাঁর এককত্ব সাব্যস্ত করা। যেমন–সমগ্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি, সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন এবং তাদের সকল সমস্যার সমাধান, রিযক, হায়াত-মাওত, কল্যাণ-অকল্যাণ দান ইত্যাদি সব ব্যাপারে একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ শুধুই আল্লাহর। এতে বিন্দুমাত্র অন্য কারোই কোন হাত নেই।

খ.তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ: তা হল–ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করা অথবা বান্দার সমগ্র কার্যাবলীতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহর মূলনীতি দু'টি–১. গাইরুল্লাহকে বাদ দিয়ে সকল ইবাদত শুধু আল্লাহর জন্যই নিবেদন করা। ২.সকল ইবাদত আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া। আর তা রাসূল সা. এর পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পন্ন করা। এটাই তাওহীদের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা। প্রতিটি কাজে প্রতিটি মুহুর্তে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুধু আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাই তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহর মূলকথা। যুগে যুগে আগত নাবী-রাসূলগণ এরই দাওয়াত দেন। মূলত এ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মানুষের অনেক ওজর-আপত্তি।

গ. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাত: তা হল–তিনি তাঁর সত্তা, নাম, গুণরাজি ও কার্যাবলীতে সম্পূর্ণ একক, অবিভাজ্য, অতুলনীয়, অনুপম ও অংশীদারবিহীন।

তাওহীদের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করণে ইসলামের ভূমিকা অপরিসীম। খ্রিষ্টান মিশনারীদের অন্যতম Rev. C. F. Andrews তার The Function of Islam এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

> মানবেতিহাসের সংকট-সংকুল মুহূর্তে স্রষ্টার অদ্বিতীয়তা(আল্লাহর একত্ববাদ) এর উপরে গুরুত্বারোপ, প্রাচ্য এবং অনুরূপভাবে প্রতীচ্যের জন্যেও ইসলামের মহত্তম অবদানসমূহের একটি। কেননা ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ব্যাপ্ত অন্ধকার যুগে অসংখ্য অপদেবতা ও মানুষের ক্রমবর্ধমান পূজার সমারোহে এই সত্য (অর্থাৎ তাওহীদ) হিন্দু ও খ্রিষ্ট ধর্মেও উপেক্ষা ও আচ্ছন্নতায় বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। তাওহীদের সার্বভৌম সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার অন্ধকারতম মুহূর্তে ইসলাম ভারত ও ইউরোপ উভয়েরই কাছে এক অমূল্য সংশোধক ও নিবর্তক হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভারত ও ইউরোপকে উদ্দেশ্য করে ইসলাম তার কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে এই সত্যের ওপরে যে চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিল,

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা ৫১: আয়াত ৫০ ।

[২]. এখানে সত্তাগত দিক তাঁর এক হওয়ার তাৎপর্য হল–তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, আবার কেউ তাঁর থেকে জন্ম নেননি। কোন কিছু তাঁর সত্তায় সংযুক্ত হয় না, আবার কোন কিছু তাঁর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং আদি থেকে তিনি সম্পূর্ণ একক ও অবিভাজ্য। সিফাতের দিক থেকে তাঁর একত্বের তাৎপর্য হল–আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন সৃষ্টিই পরিপূর্ণরূপে তাঁর এক বা একাধিক গুণের অধিকারী হতে পারে না। আর কর্মের দিক থেকে তাঁর একত্বের তাৎপর্য হল–তিনি যা করেছেন বা করতে পারেন তা তাঁর সৃষ্টি পক্ষে করা সম্ভবও নয়। সম্পূর্ণ একক ও অবিভাজ্য।

[৩]. রুবুবিয়্যাত এর ক্ষেত্রে তাওহীদ হলো– সৃষ্টি, রিজ্‌ক(জীবিকা), জীবন ও মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় আল্লাহ ছাড়াও অন্যের সাথে সম্পর্কিত না করা।

[৪]. আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী, *আক্বীদাতুল মু'মিন*, জেদ্দা: দারুস সুরুক, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ.৮৭।

[৫]. আবদুল আযীয আল-মুহাম্মাদ আল-সালমান, *আল-আসইলাতু ওয়ার আজইবাতিল উসূলিয়্যাতি আলাল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যা লি ইবনে তাইমিয়্যাহ;* প্রকাশকবিহীন. ২১ম সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ.৩২।

> সন্দেহ হয় তাকে বাদ দিলে আল্লাহ্‌র অদ্বিতীয়তার চেতনা মানুষের চিন্তায় আজ যে প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা লাভ করেছে যা কিনা আজকের বুদ্ধি নির্ভর জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্য–তা আদৌ সম্ভব হত কিনা।[১]

তাওহীদে বিশ্বাসের গুরুত্ব: ইসলামে তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ। এটা আল্লাহকে বিশ্বাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইবাদত তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল-কুরআন তাওহীদের চূড়ান্ত ধারক-বাহক। বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ সা. এর সমগ্র জীবন ও কর্ম ছিলো তাওহীদের মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নাবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল শিরক নির্মূল ও তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। এজন্য সব নাবী-রাসূল সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালান। এটাই হিদায়াত লাভের মাধ্যম। সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এটাই। তাওহীদ ব্যক্তিকে আত্মমর্যাদাবান, কর্মঠ, বিবেকবান ও জ্ঞানী করে গড়ে তুলে। সৃষ্টির আদিতে তা ছিল, যুগে যুগে ধরে তা অব্যহত আছে এবং তা অনাদি কাল পর্যন্ত তা থাকবে। বস্তুত আল্লাহকেই জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করাই তাওহীদের মূল উদ্দেশ্য। তাওহীদের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে কুরআনে বলা হয়েছে[২]- شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্‌ নেই, আর ফিরিশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্‌ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" আরও বলা হয়েছে[৩] أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا- "তোমাদের ইলাহ্‌ই এক ইলাহ্‌। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'।"

পূর্ববর্তী সব আসমানী গ্রন্থ ও নাবী-রাসূলগণও মূলত তাওহীদের ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁরা নির্ভেজাল তাওহীদ প্রচার করেছেন। সব আসমানী রিসালাতের মূল বক্তব্য ছিল তাওহীদ। তাওহীদের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে কুরআনে বলা হয়েছে[৪] وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا - نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ "আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নেই ; সুতরাং আমার ইবাদত কর।"

কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি হল তাওহীদ। তাওহীদের শিক্ষা স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের শিক্ষা, এর শিক্ষা আল্লাহ্‌র একত্ব ও অনন্যতার শিক্ষা। এর শিক্ষা মধ্যে আছে মানুষের ঐক্য ও সাম্যের বিষয়। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। পৃথিবীতে শাসন চলবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে সংগতি রেখে। তাওহীদের ধারণা থেকেই ইসলামের মৌলিক ধারণা এবং আদর্শিক ভিত্তির বিকাশ হয়েছে। তাওহীদ এমন এক মানব সমাজের ভিত্তি রচনা করে যাতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেক মানুষের উপর দায়িত্ব বর্তায়। এরূপ সমাজে উৎকর্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব কেবল স্রষ্টা আল্লাহ্‌র জন্য, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নয়। মানুষের জীবনে সামাজিক পার্থক্য হয় কেবল গুণ, কর্ম এবং কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে। তাওহীদের আদর্শ সমাজ এবং ব্যক্তিকে তার গন্তব্যের লক্ষ্যের ব্যাপারে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রকাশ করে।

তাওহীদ যুগে যুগে বিশ্বমানবতাকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। এ বিশ্বাসই মানুষকে দুনিয়ার সব রাজা-বাদশাহ, পোপতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে মুক্ত করে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক পরিশীলিত করেছে। মানুষের দৃষ্টিকে এক-অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এ বিশ্বাসই মানুষকে পৌত্তলিকতা, মূর্তিপূজা ও নানা কুসংস্কারের মলিনতা থেকে মুক্ত করেছে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে এতেই রয়েছে সব মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ। মহান আল্লাহ বলেন[৫]– إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও সাবঈনের মধ্যে -যারাই আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের রবের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

তাওহীদ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মমর্যাদা ও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র রক্ষাকবচ। তাওহীদ মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহর গোলামীর শিক্ষা দেয়। তাওহীদের মূলবাণী '*আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই*' –এটা মানব জাতির মুক্তির মূলমন্ত্র। এই ধারণাই মানুষকে আল্লাহর ঠিক নীচেই স্থান দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধরণ করে। এই তত্ত্বই মানুষের মধ্যকার সব উঁচু-নীচ ভেদাভেদের বিলোপ সাধন করে। এ সম্পর্কে ড. সায়্যিদ আব্দুল লতীফ বলেন–

> মানব সমাজে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তব মূল্য অপরিসীম। '*আল্লাহ ভিন্ন মানুষের ইবাদত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই*'–এই একটি মাত্র ধারণাই বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সকল উচু-নীচ ভেদাভেদের বিলোপ সাধন করেছ। মানব জাতির মুক্তি সাধনের জন্য এ হল এক মুক্তি বিপ্লবী নীতিবাণী। মানুষের সত্তাকে আল্লাহর ঠিক নিচেই স্থান দিয়ে নিষ্কলুষ জীবন যাত্রাকে সমাজ জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধারণ করে- এ মহাবাণী মানব প্রকৃতিকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে।[৬]

---

[১]. *The Genuine Islam,* Singapore V.1, P.08. উদ্ধৃত, ড.সায়্যিদ আব্দুল লতীফ, অনু.মুহম্মদ ইলাহি বখশ, *ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ*(ঢাকা : ই.ফা.বা,১৯৮৬), পৃ.০৬।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৮।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮: আয়াত ১১০।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ২৫।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৬২।

[৬]. ড.সায়্যিদ আব্দুল লতীফ, অনু.মুহম্মদ ইলাহি বখশ, *ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ,* (ঢাকা : ই.ফা.বা. ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬), পৃ.০৭। আবদুল মতিন জালালাবাদী, *কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল ২০০১), পৃ. ৮৩।

তাওহীদ সকল পূণ্যের উৎস এবং সমস্ত কল্যাণের মূল। এটাই উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও মনুষত্ব্যের গুণাবলী বিকাশের নিয়ামক শক্তি। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ.(মৃ.১১৭৬হি.) বলেন–সকল পূণ্যের উৎস হল তাওহীদ। সকল শ্রেণীর পূণ্যের ভেতর এটাই সর্বোত্তম। কারণ নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের সামনে একাগ্রভাবে সবিনয়ে আত্মনিবেদন করার কাজটি সর্বতোভাবে এর ওপর নির্ভরশীল। মানবিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের এটাই নৈতিক ভিত্তি। এটাই সেই জ্ঞানগত ব্যবস্থা যা উভয় ব্যবস্থাপনার ভেতর সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ। এর মাধ্যমে মানুষ অদৃশ্য জগতের দিকে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। তার আত্মা এক পবিত্র বন্ধনের সাহায্যে অদৃশ্য শক্তির সাথে সংযুক্ত হওয়র যোগ্যতা অর্জন করে।[১]

নিখুঁত তাওহীদ ছাড়া সৎকাজ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাওহীদের উসীলায় যাবতীয় নেক আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয়। এই মর্মে বলা হয়েছে[২] – إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "আল্লাহ্‌র নিকট উত্থিত হয় কালেমা তৈয়ব (তাওহীদ) এবং নেক আমল তার উত্থান কার্যে সাহায্য করে।"

তাওহীদই বিশ্বমানবের শান্তি ও কল্যাণের ভরসাস্থল। শান্তি-নিরাপত্তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের একান্ত চাওয়া। কিন্তু মানুষ কোথায় পাবে সেই শান্তি-নিরাপত্তা। একমাত্র তাওহীদই মানুষকে দিতে পারে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। মহান আল্লাহ বলেন[৩]–الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"

> মানব সভ্যতা আজ কিসের ভারে জর্জরিত? বস্তুবাদ, দুর্নীতি, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি একে দারুণভাবে ব্যহত করছে। এদের হিংস ছোবল মানবতা আজ বিপন্ন। জীবনের প্রকৃত পথ ভুল গিয়ে দিশেহারা মানুষ দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে অন্য পথে, অন্য মানসিকতায়। আত্মবিস্মৃতি মানব উচ্ছৃঙ্খলতা আর প্রবঞ্চনার মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তির অমিয়ধারা। কণ্ঠে গরল ঢেলে আহরণ করতে চাইছে অমৃতের স্বাদ। কিন্তু এই মরীচিকার শেষ কোথায়? ...আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে বিশ্বমানবতা আজ নিস্পেষিত, বন্দী। তার এই সংকট সন্ধিক্ষণে কে তাকে ভাষা দিবে ? কে তাকে ভরসা দিবে? অস্বাস্থ্যকর এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে কে তাকে আলো ঝলমল পথের সন্ধান দিবে? বিশ্বজোড়া এই মহাদায়িত্ব আজ সকলের উপর অর্পিত। ব্যক্তিগত , সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কর্তব্যবোধের চেতনা ফিরিয়ে আনার মাঝে রয়েছে এর সমাধান। গড্ডলিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে, কোন ভাবাবেগে আবিষ্ট না হয়ে সকল স্তর আত্মবিশ্লেষণের মহান অনুশীলনই সমাজকে করবে মহান আর উন্নত। আর প্রকৃত আত্মবিশ্লেষণের ধারণা, প্রক্রিয়া এবং সঠিক মূল্যায়ন নির্ভর করে স্রষ্টার একত্ববাদের বিভিন্ন ধারাগুলো যথাযথ তাৎপর্য নিরূপণ ও উপলব্ধির উপর। চাওয়া-পাওয়ার এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতে একত্ববাদের রঞ্জনরশ্মি মানুষের মাঝে সকল রুগ্ন মানসিকতার মৃত্যু ঘটিয়ে চারিত্রিক বলিষ্ঠতার এক সচ্ছ সাবলীল স্রোতধারা বয়ে আনবে, যাতে করে গড়ে ওঠবে এক উন্নত আর রুচিশীল মানব সমাজ। অন্যথায় স্রষ্টার একত্ববাদ বিবর্জিত এই বিশ্ব হিংসা, লোভ, গর্ব, পরশ্রীকাতরতা আর দায়িত্বহীনতার শিকার হয়ে সত্যিকার মানবতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হবে এবং তড়িৎগতিতে চরম বিপর্যয় আর ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই।[৪]

তাওহীদই মানব জাতির ঐক্যের মূলমন্ত্র। এর ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে ঐক্যে ও সংহত সম্ভব। যেমন আল্লাহর বাণী[৫]

> قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
>
> বল, 'হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এই যে, আমরা যেন এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, আর কোন কিছুকে তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি'। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, অবশ্যই আমরা মুসলিম'।

তাওহীদ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাওহীদের চেতনায় উজ্জীবিত মানুষ সুন্দর সমাজ জীবন গঠনে সক্ষম হয়। এই চেতনা সমাজের মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। মানুষের পারস্পরিক লেনদেন সুস্থ ও পরিশুদ্ধ হয়। আইনের প্রতি আনুগত্যের চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। এই চেতনা মানুষকে নৈতিকভাবে পরিশীলিত করে, ফলে এই চেতনায় উজ্জীবিত ব্যক্তি লোকচক্ষুর অন্তরালেও পাপচার ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে।

❑.ঈমান ও তাওহীদের দাবীসমূহ বাস্তবায়নঃ

ঈমান ও তাওহীদ শুধু কোন তত্ত্ব নাম নয়। এটা এমন বিশ্বাস ও চেতনা যা মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। যে ব্যক্তি তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করবে তার উপর বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। নিম্নে এর মৌলিক কিছু দিক তুলে ধরা হল।

ক.মহান আল্লাহকে একমাত্র রব, ইলাহ ও সার্বভৌম বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করাঃ
তাওহীদের প্রধান দাবী হলো, মহান আল্লাহকে মহাবিশ্বের সবকিছুর একমাত্র রব (সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, পরিচালক ও সংরক্ষক) হিসেবে বিশ্বাস করা। তাঁকেই একমাত্র সত্যিকার ইলাহ (উপাস্য) ও সার্বভৌম বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা।

---

[১]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১৮৪-১৮৫।
[২]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ১০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম ০৬:আয়াত ৮।
[৪]. *স্রষ্টা ও ইসলাম*, প্রবন্ধ সংকলন, শিরোনাম-স্রষ্টার একত্ব, লেখক, আনোয়ারুল হক , (ঢাকা : ই ফা বা), পৃ.৭৫-৭৬।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৬৪।

এবং তাঁর সাথে ইবাদত, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বে কাউকে শরীক না করা। এ মর্মে বলা হয়েছে[১]– ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ "তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন(সত্য) ইলাহ নেই।তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা।সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর।আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক।"

পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বে সকল মানব সন্তান থেকে আল্লাহ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং তিনিই সবার প্রতিপালক। তাই তাঁকে ছাড়া মানুষ যেন অন্য কাউকে ইলাহ গ্রহণ না করে। এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে[২]

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ-أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ-

আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর সাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' এটা এজন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণ তো পূর্বে শির্ক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন'?

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমার কাছে দোয়া করতে থাকবে এবং আমার কাছে প্রত্যাশা করবে ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ মাফ করতে থাকবো। তা তোমার গুনাহর পরিমান যত বেশী বড়ই হোক না কেন। এ ব্যাপারে আমি কোন পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমান যদি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, আর তুমি যদি আমার কাছে মাফ চাও, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দেব। এ ব্যাপারে আমি পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার কাছে পৃথিবী ভর্তি গুনাহ সহকারে হাজির হও আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমিও ঠিক পৃথিবী ভর্তি ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে এগিয়ে আসব।[৩]

ঈমান ও তাওহীদ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান দিক হলো, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আল্লাহ্‌কে একমাত্র সার্বভৌম সত্তা, চূড়ান্ত বিধানদাতা ও সকল ক্ষমতার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্নকারী বিধান, কর্তৃপক্ষ কিংবা তাঁর আইন-বিধান পরিপন্থী বিধি-বিধান প্রত্যাখ্যান করা। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]– أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন।

খ.একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকা :

তাওহীদের প্রধান দাবী শুধুমাত্র মহান আল্লাহর জন্য 'ইবাদত'[৫] করা। এজন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[৬] মানুষের কল্যাণের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।[৭] আর এটা কুরআনের অন্যতম মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। এ উদ্দেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই সব নাবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে।[৮] কুরআনের ঘোষণা মতে এক আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব স্বীকারই হচ্ছে শান্তি ও শৃংখলার উৎস। পক্ষান্তরে, এক আল্লাহকে না মেনে জীবনের বিভিন্ন দিকে ও বিভাগে বিভিন্ন শক্তি ও সত্তার প্রভুত্ব মেনে নেয়া ও আনুগত্য করা হচ্ছে শির্ক এবং তাই হচ্ছে সব অশান্তির মূল কারণ। ইবাদত শুধু তাওহীদের দাবীই পূরণ না, বরং এটা সৎ ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন যাপনের প্রেরণা ও শক্তি যোগায়। এটা নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেয়। এটাই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল এবং মানুষের মর্যাদার উচু শিখরে পৌঁছার মাধ্যম। এটাই সৌভাগ্য লাভের সোপান। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৯]– يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "হে মানবকুল! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের রবের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং যারা তোমাদের পূর্বে ছিল। আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।"

ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। এর মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজ অন্তর্ভুক্ত। তাই মানুষের কর্তব্য হলো মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি মুহূর্তে শুধু আল্লাহর গোলামী করা, তাঁর আদেশ ও নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর উদ্দেশ্য সকল আনুগত্য ও দীনতা প্রকাশ করা।

সালাত, সাওম, হাজ্জ-সহ সকল আমালে সালিহ, পার্থিব ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনে দু'আ, হিদায়াত, বিপদ-আপদে ফরিয়াদ ইত্যাদি সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এ সব কেবল তাঁর নিকট বিনীতভাবে ব্যক্ত করা।[১০] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১০২। আরও দেখুন, আল-কুরআন ১৭: ১১১; ২২:৭৩-৭৪; ০৪:৪৮; ১১৬ ।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৭২-১৭৩।

৩. মূল আরবী [قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুদ দু'আত, হাদীস নং ৩৫৪০।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১১৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন (০৫:৫০)।

৫.ইবাদত শব্দের শাব্দিক অর্থ-নিজেকে ছোট করা, আনুগত্য করা। পরিভাষায় **العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة** ইবাদত হলো প্রত্যেক এমন সব প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজ, যা আল্লাহর পছন্দ করেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্টি হন।–**ইবন তাইমিয়াহ, *আল-'উবুদিয়্যাহ, মাজমূ'ল ফাতাওয়া,* খ.১০, পৃ.১৪৯।**

৬. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬।

৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ০২: আয়াত ২৯; সূরা লুকমান ৩১: আয়াত ২০।

৮. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৩৬; আল কুরআন ২১:২৫, ০৭:৫৯,৬৫,৭৩,৮৫,১০৩; ১১:২৫-২৬,৫০,৬১, ৮৪,৯৬-৯৭।

৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১-২২।

১০. আল-কুরআন, সূরা আল-ফাতিহাহ ০১: আয়াত ০৪; আল কুরআন ০৩:০৮, ৭:৫৫-৫৬, ১৮:১০, ৪০:৬০।

মুখাপেক্ষী না হওয়া।[১] যেমন বলা হয়েছে[২] (فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ) “তাই আল্লাহ্‌র কাছে রিয্‌ক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” এ আয়াতের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কাছেই রিয্‌ক তালাশ করা বান্দার একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহকে ছেড়ে কোন সৃষ্টির কাছে রিয্‌ক তালাশ করা অনৈতিক ও শিরক। এ মর্মে রাসূলাল্লাহ বলেছেন[৩], “*তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ পালনকর্তার নিকট যাবতীয় প্রয়োজনের বিষয়ে প্রার্থনা করে। এমনকি জুতার ফিতাও প্রার্থনা করবে, যদি তা ছিড়ে যায়।*”

ইবাদত শুধু সাধারণ মানুষের জন্যই নয় বরং তা সবার জন্য, নাবী-রাসূলগণও এ থেকে মুক্ত ছিলেন না।[৪] তাই মৃত্যু পর্যন্ত সকলের জন্য ইবাদত বা শরী‘আতের অনুসরণ করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে[৫], وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ- “আর ইয়াকীন(মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।” উল্লেখ্য যে, ইবাদত গ্রহণযোগ্যতা দু’টি মৌলিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। ক. ইবাদত শুধু আল্লাহর নাযিলকৃত পদ্ধতিতেই করতে হবে, তাই তা কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। খ. তা কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে।[৬] তাই ‘আমল যদি ইখলাসপূর্ণ হয় কিন্তু সুন্নতে রাসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক না হয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার ‘আমল সুন্নতে রাসূলের পদ্ধতি অনুযায়ী সঠিক হয় কিন্তু যদি ইখলাসপূর্ণ না হয় তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

তাওহীদের অন্যতম দাবী স্বীয় জীবনের সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকা।[৭] সর্বদা কেবল তাঁর মুখাপেক্ষী থাকা। একমুহূর্তের জন্য অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর ব্যক্তিকে সুপথ প্রদর্শন করবেন এবং তাকে উন্নত ঈমান ও নৈতিকতা দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন[৮] – وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ “আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেয়া হবে।”

গ. মহান আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ:
ঈমানের প্রধান দাবী হলো নিজকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমার্পণ করা। যত কষ্ট হোক নিজের সকল চাওয়া-পাওয়া ও ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ববিষয়ে ও সর্বাত্মকভাবে কেবল তাঁরই আনুগত্য করবে। নিজ প্রবৃত্তি ও স্বভাব অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক সর্বাবস্থায় নিঃশর্ত ও দ্বিধাহীনচিত্তে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালনে সর্বোচ্চ তৎপর থাকা। এছাড়া কেউ মু’মিন বা মুসলিম হতে পারবে না। এর উপর নির্ভর করে ঈমানের দৃঢ়তা ও গভীরতা। এ দাবী বাস্তবায়ন করলে জীবন থেকে সব মন্দ স্বভাব, বক্রতা ও আত্মিক ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। এটা ব্যক্তির নৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৯] - وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ “আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমপর্ণ কর। তার (আযাব আসার) পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।”
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِاسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমপর্ণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই কাছে।”[১০]
بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ-হ্যাঁ, যে কেহ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।[১১]
রাসূল সা. নিজেও আল্লাহর কাছে হিদায়াত এবং হকের অটল থাকার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতেন। এজন্য তিনি দু‘আ করতেন–‘হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখ।[১২]

আল্লাহর আনুগত্য ও যাবতীয় ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নিকট সমর্পণ করতে হয়। আর আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনের সকল কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা পরিচালনা করার মাধ্যমে তাঁকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করা যায়। এটাই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মোক্ষম পন্থা। এটাই ঈমান, তাওহীদ ও ইসলামী নৈতিকতার চরম লক্ষ্য। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১৩]-قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ- لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ- “বল,

[১]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা’ ০৪: আয়াত ৩২।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-‘আনকাবূত ২৯: আয়াত ১৭।
[৩].মূল আরবী [ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع] *মিশকাত*, কিতাবুদ দু‘আত, হাদীস নং ২২৫১।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্‌বিয়া ২১: আয়াত ১৯; আল-কুরআন ২৩:৫১; ৭:২০৬; ৪০: ৬০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হিজ্‌র ১৫: আয়াত ৯৯।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮: আয়াত ১১০; আল কুরআন ০২:১১২; ০৪:১২৫; (১৮:১০৩-১০৪)।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্‌রীম ৬৬: আয়াত ১১-১২।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩ঃ আয়াত ১০১।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আয্‌-যুমার ৩৯: আয়াত ৫৪, আল-কুরআন (৪০:৬৬)।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা লুক্‌মান ৩১: আয়াত ২২।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১১২।
[১২]. মূল আরবী [يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল কদর, হাদীস নং ২১৪০।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬ : আয়াত ১৬২-১৬৩।

'আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম মুসলিম।"

ঘ. মহান আল্লাহ নির্ধারিত তাকদীরে (কল্যাণ-অকল্যাণে) সন্তুষ্ট থাকা:

ঈমান ও তাওহীদের অন্যতম দাবী হলো, জীবন চলার পথে আপতিত সুখ-শান্তি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুতেই হতে পারে না– এ বিশ্বাস করা। এর নামই ঈমান বিল তাকদীর। এর বিশেষ দিক হলো, আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি ফায়সালা সহজভাবে মেনে নেয়া।[১] কোন পাপ হয়ে থাকলে তাওবা করে নিজেকে পবিত্র করা। কষ্ট হলেও আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে অটল-অবিচল থাকা। নির্ধারিত রিজ্‌কের প্রতি কোনরূপ অভিযোগ না করা।[২] আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তাঁকে দোষারোপ না করে ধৈর্য্য ধারণ করা।[৩] যেমন, কারো মৃত্যুতে ইসলাম বিরোধী কথা না বলা, এখন তার পরিবারের কী হবে? কে তাদের চালাবে? ইত্যাদি। কোন কিছু না পেলে হতাশ না হওয়া। আবার কোন কিছু লাভ করলে আনন্দে আত্মহারা না হয়ে শোকর আদায় করা। কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করে ভালো কাজ থেকে বিরত না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪] مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুবই সহজ।"

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - বল, 'কখনই কোন বিপদ আমাদের উপর আসবে না, তবে শুধু ততটুকু আসবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর মু'মিনদের কর্তব্য কেবল আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করা।[৫]

উদ্ধৃত আয়াত শিক্ষা দেয় যে, মানব জীবনে আপতিত দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তি ভাগ্য নির্ধারিত। বস্তুত এই বিশ্বাস মানুষকে নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে মানব জীবনে ভারসাম্য আনে। কেননা যে কেউ উপলব্ধি করে যে, যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে, তখন সে কোন প্রাপ্তিতেই গর্ব-অহঙ্কার করে না এবং কাউকে দিতে কার্পণ্য করে না। সুখ-দুঃখ কোন অবস্থাতেই আল্লাহ বিমুখ হয় না, বরং বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখের অবস্থায় শোক্‌র আদায় করে।

হাদীসেও তাকদীরে আস্থাশীল হতে নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে ইবন আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা.আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

> হে বৎস! আল্লাহর হকসমূহের সংরক্ষণ কর, তবে আল্লাহ তোমার হক সংরক্ষণ করবেন, যদি তুমি আল্লাহর হকসমূহ হিফাযত কর, তাহলে আল্লাহকে তুমি নিজের সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন তুমি আল্লাহর নিকট চাইবে, আর যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তখন তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। মনে রাখবে, যদি সমস্ত মানুষও একত্রিত হয় তোমার উপকার করার জন্য, তাহলে তারা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমাকে কিছুই উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষও একত্রিত হয় তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য, তাহলে তারা আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালার বাইরে তোমাকে কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।[৬] অন্য একটি হাদীসে এসেছে–
>
> রাসূল (সা.) বলেন, যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে এ কথা বলো না, যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো'। বরং তুমি এ কথা বলো, 'আল্লাহ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।[৭]

বস্তুত তাকদীরের প্রতি আস্থায় মাধ্যমে মানুষের জীবন থেকে অস্থিরতা, হতাশা ও দুঃখ-কষ্ট দূর হয় এবং জীবন শান্তিময় ও সহজসাধ্য হয়। তাকদীরে আস্থাশীল থাকা প্রকৃত মু'মিন ও পূণ্যবান হওয়ার নিদর্শনও বটে। এ মর্মে রাসূল(সা.) বলেন,

> মানুষের সৌভাগ্যের উৎস হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট ভালো চাওয়া এবং তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। আর মানুষের দুর্ভাগ্যের উৎস হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট ভালো চাওয়া পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় অসন্তুষ্ট প্রকাশ করা।[৮]

ঙ. মহান আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালবাসা, সর্বাধিক ভক্তি ও ভয়:

অন্তরের চূড়ান্ত ভালবাসা আল্লাহর প্রতি নিবেদন করা ঈমান ও তাওহীদের বিশেষ দাবী। আল্লাহর প্রতি খাঁটি ভালবাসা মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট মহৎগুণের সৃষ্টি করে। মানুষের মনে আল্লাহর ভালবাসা স্থান করে নিলে সে এমন সব জিনিস পছন্দ করবে যা আল্লাহ পছন্দ করে এবং সেই সব জিনিস অপছন্দ করে যা আল্লাহ অপছন্দ করে। এই ভালবাসা সুরক্ষায় মু'মিন

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১৫৫-১৫৭, ২১৪, আল-কুরআন ২৯:১-৩।

[২]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ০৬।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৪১।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : আয়াত ২২-২৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ০৯ : আয়াত ৫১।

[৬]. **মূল আরবী**[يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাহ..., হা.২৫১৬।

[৭]. মূল আরবী [وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল কাদর, হাদীস নং ২৬৬৪।

[৮]. **মূল আরবী**[من سعادة ابن آدم رضاه بماقضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল কদর, হা. নং২১৫১।

ব্যক্তি আল্লাহ পছন্দনীয় সৎ কাজ করে, যা তাঁর মধ্যে মহৎ গুণের বিকাশ ঘটায়। আর এই ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধক প্রতিটি জিনিসকে সে অপছন্দ ও ঘৃণা করে। এটাই তাঁকে সকল প্রকার মন্দ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে সাহায্যে করে।[১] এজন্য মু'মিনরা মহান আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালবাসে। ইরশাদ হচ্ছে[২] – وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ "তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়।"অন্যত্র এসেছে[৩] -وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ- "আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ্ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।"
ইবনুল কাইয়িম(মৃ.৭৫১হি.) বলেন, "আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালবাসা অর্থাৎ বান্দার নিকট আল্লাহকে তা'য়ালা সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে প্রিয় গণ্য করা দ্বীনের সবচেয়ে বড় ফরজ, দ্বীনের সবচেয়ে বড় মূলনীতি ও দ্বীনের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাঁর সাথে অন্য কোন সৃষ্টিকে ভালবাসে তাহলে এটি সেই শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় যার কর্তাকে ক্ষমা হবে না, যার উপস্থিতিতে কোন আমলও কবুল করা হবে না।[৪]

আল্লাহর প্রতি ভালবাসা মানুষের নৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করে। এটা মানুষের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। কাফির ও অপশক্তির অপতৎপরতা প্রতিরোধে সৎসাহসী করে এবং সত্যপন্থীদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।[৫] এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ কুতুব (মৃ.২০১৪খ্রি.) বলেন–

> সম্প্রীতি, সৌহার্দ, নিষ্ঠা, সততা এবং জীবনের মহান ও পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ এবং যাবতীয় লোভ–লালসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্য যে সাধনার প্রয়োজন তার মূলে একমাত্র কার্যকরী শক্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা। ইসলাম এই ভালবাসা বৃদ্ধির শিক্ষাই মানুষকে দান করে। এর সাহায্যে মানুষ বল্গাহীন কামনা–বাসনাকে সংযত রাখতে সক্ষম হয় এবং গোটা জীবনে কেবলমাত্র আল্লাহর ভালবাসাকে পরম ও চরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতঃ উহাকেই অব্যর্থ শক্তি হিসেবে দেখতে চায় যে ব্যক্তি এই মহান সম্পদ থেকে বঞ্চিত, সে মুসলমানই হতে পারে না।[৬]

আল্লাহ প্রতি ভালবাসার শর্ত ও পদ্ধতি হচ্ছে– রাসূল সা. এর আনুগত্য করা। আল্লাহ প্রতি ভালবাসার অর্জন করতে হবে– রাসূল সা. এর শেখানো পদ্ধতি এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন[৭] –قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"বল,'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।

আল্লাহ প্রতি ভালবাসার নিদর্শন: যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভালবাসেন তারা তাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, আচার-আচরণ ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অন্বেষণ করেন।[৮] জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই তাদের জীবনের চূড়ান্ত ও সর্বক্ষণিক লক্ষ্য থাকে। এজন্য তারা সদা তাঁর অভিমুখী থাকে। যারা আল্লাহর অভিমুখী থাকেন আল্লাহ তাদের হিদায়েত দান করেন। মহান আল্লাহ বলেন[৯]–وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ "আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।"
রাসূল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার উপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকেন, এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।"[১০]

মহান আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভক্তি-ভালবাসার সাথে সাথে সর্বাধিক ভয় করাও তাওহীদের অন্যতম প্রধান দাবী। যেমন বলা হয়েছে[১১]–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ- "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরিও না।" এ আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, "আল্লাহর আনুগত্য করবে, নাফরমানী করবে না, আল্লাহকে স্মরণ করবে, বিস্মৃত হবে না এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে, কিন্তু কুফরী করবে না।"১২

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভের পন্থা:

---

১. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ২৩-২৪।
২ .আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৬৫।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২০৭।
৪. ইবনুল কাইয়িম, *ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান*, (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৯৫হি.) খ.০২, পৃ. ১৯৬।
৫ .আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫: আয়াত ৫৪।
৬. মুহাম্মাদ কুতুব, *শুবহাত হাওলাল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২।
৭ .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ৩১।
৮ .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৬২; আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২: ১৬৫, ২০৭।
৯ .আল-কুরআন, সূরা ৪২: আয়াত ১৩।
১০.**মূল আরবী**[من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس] *সহীহ ইবন হিব্বান*,খ.১, পৃ.৫১০,হা. নং২৭৬।
১১. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১০২।
১২. ইবন জারীর তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৭, পৃ.৬৫।

-সর্বদা যিকর (মহান আল্লাহ স্মরণ) ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত। মহান আল্লাহ পরিচয় জানা এবং তাঁর সৃষ্টি নিদর্শন চিন্তা-গবেষণা করা। মহান আল্লাহ সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী হওয়া। দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দান। মহান আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া। প্রতিটি অবসর মুহূর্তে মহান আল্লাহ এর প্রতি মনোনিবেশ করা। নির্জনতা অবলম্বন এবং আত্মবিনাশ (অহংকার, রিয়া, হিংসা, গীবত, প্রবৃত্তিপূজা ইত্যাদি ত্যাগ)করা। আল্লাহর রাহে প্রিয়বস্তু ব্যয় করা।

চ. জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্য:

ঈমান ও তাওহীদের প্রধান দাবী হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা। এটা ব্যক্তিকে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়। এটা ঈমানের আলামত।[১] আল-কুরআনে আদেশসূচকভাবে أَطِيعُواْ (আনুগত্য কর) শব্দটি উনিশ বার ব্যবহার হলেও তন্মধ্যে যৌথভাবে এগারো স্থানেই শর্তহীনভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[২] যেমন মহান আল্লাহ বলেন[৩]–

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً-
>
> "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোন নির্দেশ অমান্য করা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার পথ। এমনকি এ ব্যাপারে কোন প্রকার অমূলক ওজর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে।"

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই নাজাতের ওসীলা।[৫] এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা।[৬] এটাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার চাবিকাঠি। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]–وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ-"আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য।" পক্ষান্তরে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা কুফরী।[৮] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা ব্যক্তির আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়।[৯] এ ধরনের অবাধ্য হওয়ার পরকালীন পরিণতি অতি ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন-[১০] وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ "আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ্ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যারা অস্বীকার করেছে তারা ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার দ্বীনের আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে সেই আমাকে অস্বীকার করে'।[১১]

ছ. জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল সা. কে একমাত্র অনুসরণযোগ্য পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ:

ঈমান ও তাওহীদের অন্যতম দাবী জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল রাসূল সা. কে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। রাসূল সা. ছিলেন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জনকারী সর্বকালের সেরা মহামানব ও ইসলামী নৈতিকতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর মাঝেই মানবীয় সকল সদগুণের সমাহার ও পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। অন্য যত সব মহামানব, দার্শনিক, সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা পৃথিবীতে এসেছে, কেউই তার মত পরিপূর্ণ ও সফল ছিলেন না। তাই তিনিই মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১২]– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্বরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লার মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১৩]– فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ০১।
২. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৮-৫২৯।
৩. আল-কুরআ, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৫৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৩৬।
৫. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৩২।
৬. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ১৮।
৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৫২।
৮. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৩২।
৯. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ৩৩।
১০. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪।
১১. **মূল আরবী**[كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ই'তিসামি বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, হা.৬৮৫১।
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ২১।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৬৫।

يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَاشَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا "কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়।"
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে চাই তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক হোক রাসূল (স)-কে একমাত্র মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে না নেবে এবং তাঁর দেয়া সিদ্ধান্তকে সন্তুষ্টচিত্তে এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন হতে পারবে না।"

রাসূলুল্লাহ সা. মানব জাতির জন্য উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত বিকাশ সাধন করার জন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।[১] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–'সচ্চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।' নবুয়্যত লাভের পূর্বে তিনি স্বীয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক আল-আমীন উপাধী লাভ করেছিলেন। নবুওত লাভের পর তিনি উন্নত চরিত্রের চূড়ান্ত বিকাশ সাধন করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[২] – وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত।" আরও বলেন[৩]–وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক ।"

রাসূল সা. এর আনুগত্য ও অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য।[৪] এতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, হিদায়েত, ক্ষমা ও পরকালীন মুক্তি।[৫] মহান আল্লাহ বলেন[৬]–وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ "আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।"অন্যত্র আরও বলেন[৭] وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى"আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।"
যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসার দাবী করে অথচ মুহাম্মাদ সা. এর পথ অনুসরণ করে না, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ আয়াতে সুস্পষ্ট বক্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে। সে যতক্ষণ তার সমস্ত কাজ ও কথায় রাসূল সা. এর শরী'আতের অনুসারী না হবে ততক্ষণ সে তার দাবীতে বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। কেননা রাসূল সা.বলেছেন, আমার অনুসৃত বিধানের সাথে সংগতিশীল নয় এমন কাজ যে করে সে প্রত্যাখ্যাত।

ইহ-পরকালীন কোন ক্ষেত্রে রাসূল সা. এর আনুগত্যে মু'মিনের বিন্দুমাত্র আপত্তির সুযোগ নেই। তাঁর অবাধ্যতা বা আনুগত্যহীনতার পরিণাম ভ্রষ্টতা ও জাহান্নাম।[৮] তাঁর প্রতি সামান্য অসম্মান প্রদর্শন ধ্বংসের কারণ। ইরশাদ হচ্ছে–[৯]

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

"আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।"
রাসূল সা. কে অনুসরণের প্রধান শর্ত তাঁর প্রতি ঈমান আনা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১০]–"যার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ, এই উম্মতের(মানব জাতির) মধ্যে যে কেউই ইয়াহূদী হোক বা খ্রীষ্টান হোক, আমার(নুবূওয়াতের) কথা শুনবে অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্গত হবে।"

রাসূলুল্লাহ সা. বাস্তবিকভাবেই এই আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য।কেননা তিনি মানব জাতির সবচেয়ে সফল আদর্শ মহামানব। তিনি উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। তাই পৃথিবীর সকল মানুষ মহানাবী সা.-এর আদর্শে জীবন গঠন করতে পারে। তবেই সে নৈতিক অধঃপতনের পথ থেকে মুক্তি পাবে এবং উভয় জীবনে সফলতা লাভ করবে। মাইকেল এইচ. হার্ট বলেন–[১১]

> My choice of Muhammad to lead the list of the worlds most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels ...It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel intitles Muhammad to be considered the most influential single figure in the human history.

পি. কে. হিট্টি, বলেন-[১], No one regarded by any section of the human race as perfect man has been imitated so minutely. মানব জাতির কোন অংশই তাঁর মতো আর কাউকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গ্রহণ করে তাঁর আচার-আচরণগুলোকে এত সুক্ষ্মভাবে অনুকরণ করেনি।

---

[১] . দেখুন, আল-কুরআন ০২:১৫১, ২:১২৯, :১৬৪।
[২] .আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বালাম ৬৮: আয়াত ০৪।
[৩] .আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্‌-নিসা' ০৪: আয়াত ৮০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৩১।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৫৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩: আয়াত ০৩-৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০২।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আন্‌-নিসা' ০৪: আয়াত ১১৫।
[১০].মূল আরবী[الذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা. ১৫৩।
[11]. Michael H.Hart,*The Hundred: A Ranking of the most influential persons in History* (New Delhi : Meera Publication), P.33.

জ. মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ, তাঁর রহমত প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁর শাস্তি-পাকড়াও থেকে নির্ভয় না হওয়া:
প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ওয়াজিব। আল্লাহর রহমত থেকে কখনও নিরাশ না হওয়া।[২] এটা যেমন ঈমান ও তাওহীদের অন্যতম দাবী, তেমনি এটা দ্বীন ও নৈতিকতার দৃষ্টি থেকে অত্যন্ত পছন্দনীয় ও কাম্য। এছাড়া ব্যক্তি বিপথগামী ও কুফরের দিকে ধাবিত হতে পারে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৩]– وَلاَتَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَيَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّالْقَوْمُ الْكَافِرُونَ - "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" এ মর্মে রাসূল সা[৪]. বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে।'তিনি আরও বলেন[৫], 'ভালো ধারণা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত'।

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর রহমত থেকে শাস্তি-পাকড়াও থেকে কখনও নির্ভয় না হওয়া। এ মর্মে বলা হয়েছে[৬]– أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ "তারা কি আল্লাহ্‌র কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত কওম ছাড়া আল্লাহ্‌র কৌশল থেকে আর কেউ (নিজদেরকে) নিরাপদ মনে করে না।"
ইবন মাসউদ (রা) বলেন, "সবচেয়ে বড় গুণাহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।"[৭]

ঝ. মহান আল্লাহর নামে কৃত প্রতিজ্ঞা ও শপথ পালন,[৮] তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ[৯] তাঁর নামে অনর্থক শপথ না করা,[১০] তাঁর নাম ও গুণাবলী বিকৃত না করা, অভক্তি সহকারে তাঁর নাম না নেয়া,[১১] তাঁর ব্যাপারে শ্রদ্ধাহীন কথা কিংবা তাঁর অধিকারভূক্ত বিষয়ে কোন কথা না বলা, ধর্মদ্রোহী কথাবার্তায় সাথে জড়িত দুস্কৃতকর্মীদের বর্জন এবং তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা।
মুমিনগণের জন্য উল্লেখিত বিধি-নিষেধ মেনে চলা তাঁর ঈমান ও নৈতিকতার জন্য জরুরী। এর ব্যতিক্রম হলে তা হবে গোমরাহীর কারণ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন[১২]– وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ - "আর আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়।তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।"
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–'জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম! অমুককে আল্লাহ মাফ করবে না।' এতে আল্লাহ বললেন, সে কে যে আমার নামে কসম করে বললো যে, 'অমুককে আমি মাফ করবো না! তাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল বাতিল করে দিলাম'।[১৩]
মহান আল্লাহ আরও বলেন[১৪]- إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ "আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে।" আরও বলেন-[১৫]
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
হে ঈমানদারগণ, তোমরা নাবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমল–নিষ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।" –এখানে আল্লাহ্ ও রাসূল সা. এর প্রতি কিংবা দ্বীনের ক্ষেত্রে অবমাননাকর হতে পারে এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকার তাকিদ দেয়া হয়েছে।

❑. সালাত কায়েম (إقام الصلاة):
সালাত শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো–দু'আ, রহমত, বরকত, তা'যীম;[১৬] আগুনে পড়ে বাঁশ বা কাঠ নরম করে সোজা করাকেও অভিধানে সালাত বলে। শরীয়তের পরিভাষায়–'নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে রুকু-সিজদা এবং অন্যান্য নিদিষ্ট

---

[1] . P.Q. Hitti, *Op.cit.*, p.120.
[২]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৫৩, আল-কুরআন ১২:৮৭, ১৫:৫৬।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৮৭।
[৪].**মূল আরবী**[سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু জান্নাতি ওয়া সিফাতি নায়িমিহা...হা. নং ২৮৭৭।
[৫]. মূল আরবী [ان حسن الظن من حسن العبادة] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.২, পৃ.২৯৭, হাদীস নং ৭৯৪৩।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৯৯, আল-কুরআন ৭:৯৭-৯৮।
[৭]. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী, *আল-মুসান্নাফ* (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩হি.) খ.১০, পৃ.৪৫৯, কিতাবু আহলুল কিতাবাঈন, হা. নং ১৪৪৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩৪, আল-কুরআন ৫:৮৯।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ৩৪।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ২৪৪।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৫৫।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১৮০, আল-কুরআন ৪:১৪০; (০৬:৬৮) ।
[১৩].মূল আরবী[أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك] *সহীহ মুসলিম*,কিতাবু বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা.২৬২১।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৪০।
[১৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ০২।
[১৬]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা,প্রকাশকাল-১৯৯৮, পৃ.১২৩।

কতগুলো কার্যের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিশেষ ইবাদতকে সালাত বলে'। কুরআনে সালাত শব্দটি একবচনে ৭৮বার, বহুবচনে ০৫বার, মুসল্লী বহুবচনে ০৩বার, ক্রিয়াপদে ১২ বার এসেছে।

সালাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। এটা পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণের শরীয়াতের একটি প্রামাণ্য ইবাদাত।[১] এটা ব্যক্তির ঈমানের নিদর্শন বহন করে।এটা তাকওয়ার প্রাথমিক ধাপ এবং আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী মুত্তাকী ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য।[২] এটা নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এজন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর উপর দৈনিক পাঁচবার সালাত ফরয করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[৩], وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ "আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।" সালাত মু'মিনদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন[৪], الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ "যারা ঈমান (বিশ্বাস) রাখে, সালাত কায়েম করে।"
- সালাত কায়েমের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারদের মত হলো- ইবনু আব্বাস রা. (মৃ.৬৮হি.) বলেন, রুকু, সিজদা, তিলাওয়াত ও বিনয়-নম্রতা পূর্ণ করা এবং তাতে মনোযোগী হওয়া।[৫] মুকাতিল রহ.(মৃ.১৫০হি.)বলেন যে, তার ওয়াক্তের হিফাযত করা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা, রুকু' ও সিজদাহ ধীরস্থিরভাবে সম্পন্ন করা, শুদ্ধ ও ভালোভাবে কুরআন পাঠ করা, তাশাহুদ(আত্তাহিয়্যাতু)ও দরুদ পাঠ করার নাম হচ্ছে ইকামাতে সালাত।[৬]

সালাত শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই নয় বরং তা ব্যক্তির জীবনে নৈতিক উত্থানের সোপান। সালাত ব্যক্তির আত্মগঠনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সালাতের রুকু ও সিজদার মাধ্যমে বান্দার অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিনয়, কৃতজ্ঞতা, ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়–যা নৈতিক উন্নয়ন, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের মুখ্য মাধ্যম।[৭] সালাতের মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌত্বের প্রতি নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ, আনুগত্য প্রদর্শন, সৎপথে চলার প্রতিশ্রুতি এবং শয়তান থেকে দূরে থাকার অঙ্গীকার ইত্যাদি প্রতিটি আনুষ্ঠানিকতা মানুষের নৈতিক উন্মেষ ঘটাবার প্রশিক্ষণ দেয়। বিশেষ করে ব্যক্তির আত্মসংশোধনে সালাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সালাত ব্যক্তিকে যাবতীয় অন্যায়, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সালাত বান্দার মধ্যে উন্নত মহৎ গুণাবলী যেমন–চিন্তার পরিশুদ্ধি, বিশ্বাসের স্বচ্ছতা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, সহনশীলতা, সাম্য, সৌহাদ্য, ঐক্য, আনুগত্য ও ন্যায়বিচার ইত্যাদির বিকাশ ঘটায়। চারিত্রিক কলুষতা যেমন-অহঙ্কার, বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি মন্দ বিষয় থেকে পবিত্র করে তোলে। সালাত ব্যক্তিকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাই মূল্যবোধ বিকাশে সালাতের ভূমিকা অপরিসীম। সালাতের উপকারিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৮]–وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ "এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।" এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম আল-আল-কুরতুবী(মৃ.৬৭১হি.) বলেন[৯], "সালাত অশ্লীল, নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে, আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে, তার মধ্যে যে কুরআন পাঠ করা হয় তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

সালাতের মধ্যে বান্দা হৃদয়–মনে সর্বদা আল্লাহর স্মরণ জাগরুক রাখে। রুকু-সিজদা সহ সালাতের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুনয় -বিনয় সহকারে দোয়া, তাসবীহ ও আল্লাহর প্রশংসা করা হয়। এর ইতিবাচক প্রভাব ব্যক্তির আত্মার উপর পড়ে এবং আত্মকে পরিশুদ্ধ করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। তাছাড়া সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার কোন আদেশ বা নিষেধ, দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও ভোগ-বিলাসের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকা অথবা পরকালীন জীবনের কোন চিত্র থাকে, যা মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এভাবে সালাতের মাধ্যমে বান্দা হৃদয়-মনকে যাবতীয় খারাপ বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম। তাছাড়া সমাজে সৎকাজের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে সালাত কায়েম একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

অনেককে নিয়মিত সালাত আদায়ের পরও খারাপ কাজ করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তারা ফরজ, ওয়জিব ও সুন্নত যথাযথভাবে রক্ষা করে বিনয়, অন্তরিকতা ও পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে সালাত আদায় করে না। তারা সালাতের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। ফলে তারা সালাত আদায়ের পরও সালাত থেকে উপকৃত হয় না। এজন্য বলা হয়েছে[১০]-(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।"

---

[১].আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৮৭, আল-কুরআন(১৪:৪০) (১৯:৩০-৩১) (১৯:৫৪-৫৫) (৩১:১৭) (১৪:৪০)।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্‌ল ২৭: আয়াত ০৩, আল-কুরআন ৩১:০৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪৩।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ০৩।
[৫]. ইবনু কাছীর রহ., *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.১৬৮।
[৬]. *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৬৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'লা ৮৭: আয়াত ১৪-১৫।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৫।
[৯]. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৩৭২।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ১–২,৯।

সত্যিকারভাবে সালাত কায়িমকারী ব্যক্তি অন্যায় পথ থেকে ন্যায়ের পথে ফিরে আসে। নিম্নোক্ত হাদীছ তার প্রমাণ। আবূ হোরায়রা রা. বলেন–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললেন, অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়েন। আর যখন সকাল হয় চুরি করে। রাসূল সা. বললেন, সে যা করছে তা থেকে নামায তাকে বিরত রাখবে।[১]

সমাজ সংশোধন ও সুনাগরিক তৈরীতে সালাত এক বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে। সালাতে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, সাদা-কালো ও মুনিব-গোলাম একই কাতারে পাশাপাশি দাড়ায়। এতে ব্যক্তির দম্ভ-অহংকার দূর হয় এবং সাম্য-ভ্রাতৃত্ব জোরদার হয়। সালাত ব্যক্তিকে আনুগত্য, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা ও সময়নুবর্তীতার শিক্ষা দেয়। দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পক্রিয়ায় পাঁচবার সালাত যেভাবে আল্লাহর আনুগত্যের উত্তম শিক্ষা দেয় তেমনি সালাতে শৃঙ্খলা ও ইমামের (নেতার) আনুগত্যেরও উত্তম শিক্ষা দেয়। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাত কায়েম করা। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন[২]– الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ "আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।"

সালাত শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ গঠনের শিক্ষা প্রদান করে। এজন্য জামা'তে সালাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পারস্পরিক ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব গঠনে সালাতে সহায়তা করে। দৈনিক পাঁচবার সালাতে পারস্পরিক খোঁজ-খবর নেয়ার মাধ্যমে আত্মিক ও সমাজিক বন্ধন, ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। জুমুআ ও ঈদের সালাত সেই বন্ধনকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল। এছাড়া সালাতের মাধ্যমে মানবতার প্রতি শান্তি কামনার নির্দেশ রয়েছে। এভাবে সালাতে নানাবিধ উপকারিতা থাকায় আল্লাহ একে উত্তম ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন[৩]– إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ "যারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কয়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশা করে, যার ক্ষয় নেই।"

সালাত আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ, যার মাধ্যমে বান্দা সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে। সালাত আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়ার মুখ্য মাধ্যম। সালাত বিপদ, মুসীবত ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে সহায়তা করে। এজন্য বিপদে সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লে সালাত দাঁড়িয়ে যেতেন।[৪] মহান আল্লাহর বাণীতে এরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই[৫] – وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ "আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। "

সালাত ব্যক্তির হৃদয়ে এক বিশেষ ধরনের প্রশান্তি দান করে। নিয়মিত সালাত আদায়কারীগণ সালাতের মাধ্যমে বিভিন্ন জাগতিক অশান্তি, হতাশা, মানসিক অতৃপ্তি ও অস্থিরতা দূর করতে সহায়তা করে। এজন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে[৬] –

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا- إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا- وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا- إِلَّا الْمُصَلِّينَ -الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিশয় কৃপণ, তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া, যারা তাদের সালাতে নিয়মিত।

সালাত পাপ মোচন, পূণ্য হাসিল, আল্লাহর কৃপা ও কল্যাণ লাভের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ "আর তুমি সালাত কায়েম কর দিনের দু' প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে।নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।"

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনগুত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।"[৮]

সালাতের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস এসেছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

> তোমরা কি ভেবে দেখ, তোমাদের মধ্যে কারো ঘরের দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং তাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকবে? সাহাবীগণ বলল, না কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে পাঁচ সালাতের উদাহরণ। এ নামাজগুলোর সাহায্যে আল্লাহ গুনাহ সমূহ মুছে ফেলেন।[৯]

---

[১]. ইমাম বাইহাকী, খ.৩, পৃ.১৭৪, রিওয়ায়েত নং ৩২৬১; *মিশকাত*, কিতাবুস সালাত, হা. নং ১২৩৭; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, হা. নং ৯৭৭৭।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৪১।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫ : আয়াত ২৯।

[৪]. মূল আরবী [كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا حزبه أمر صلى] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুত তাতূ'য়, হাদীস নং ১৩১৯।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৪৫, আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১৫৩।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ৭০: আয়াত ১৯-২৩।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা হূদ১১: আয়াত ১১৪।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪:আয়াত ৫৬।

[৯].মূল আরবী [أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقى من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং ৫০৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদীস নং ৬৬৭।

সালাত পরকালীন মুক্তির পাথেয়। পরকালীন জীবনে সফলতা লাভের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সালাত। সালাত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। জান্নাতের চাবিকাঠি। মহান আল্লাহ বলেন[১] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- "হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর,তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।"

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-....وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ-

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে এবং যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে।"[২]

قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ

আমার বান্দাদের বল, 'যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও। [৩]

সালাত আদায় না করার পরিণতি ভয়াবহ। জাহান্নামী ব্যক্তির লক্ষণ হ'ল ছালাত ত্যাগ করা ও প্রবৃত্তির পূজারী হওয়া। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৪] مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ- قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ- "তোমাদেরকে কিসে সাকার (প্রজ্বলিত আগুন) এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না।"

সালাত ঈমানের মৌলিক নিদর্শন। কোন মুসলিমের জন্য সালাত ত্যাগের সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সালাত ব্যক্তি ও শিরক-কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয়।'[৫] ইচ্ছকৃত সালাত ছেড়ে দেয়া কুফরী কাজ। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন, "মুহাম্মাদ (সা.) সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।"[৬] সালাত পরকালীন মুক্তির উপকরণ। সালাত তরককারী পরকালে মহাক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ মর্মে রাসূল (সা.) বলেন[৭],

> কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আলাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা, তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযে ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতপর তার সকল আমল এরূপ হবে।"
>
> আরও বলেন[৮]–"যে নামায হিফাযত করবে অর্থাৎ যথাযথভাবে তা আদায় করবে, তার নিমিত্ত সে নামায কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রকাশ্য প্রমাণ ও মুক্তির বার্তা হবে। আর যে নামায যথাযথভাবে আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার জন্যে জ্যোতি, অকাট্য দলীল প্রমাণ ও মুক্তির বার্তা হবে না। অধিকন্তু, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর অবাধ্য কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খলফ এর সঙ্গী হবে।

❑. সাওম পালন (الصوم):

সাওম ইসলামের পঞ্চ মূলস্তম্ভের অন্যতম। সাওম কামনা-বাসনা পরিহার এবং ধৈর্যের প্রশিক্ষণের প্রধান বাহক। সাওম আরবী শব্দ, এর ফার্সী প্রতিশব্দ রোযা। অভিধানে যার অর্থ –যাবতীয় কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা।

পরিভাষায়–"সুবহে সাদিক (সূর্যোদয়ের নির্দিষ্ট পূর্বসময়) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার ও স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।" হারাম ও গর্হিত বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এর পূর্ণতা অর্জন হয়।

প্রতি বছর রামযান মাসে রোযা রাখা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ্য মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। ইরশাদ হচ্ছে[৯] –

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।"

নৈতিক, আত্মিক উন্নয়ন ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষকে কেবল নির্দিষ্ট সময় পানাহার ও বৈধ যৌনাচার থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সাওমের বিধান নাযিল করা হয়নি। বরং কুপ্রবৃত্তি দমন, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ ভীতি ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের মূলশিক্ষা প্রদানের জন্য সাওমের বিধান দেয়া হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১০]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার ।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৭৭।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩: আয়াত ১–২,৯।
৩. আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম ১৪:আয়াত ৩১।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ৭৪: আয়াত ৪২-৪৩।
৫. মূল আরবী [بين الشرك والكفر ترك الصلاة] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮২; *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৬১৯।
৬. মূল আরবী [كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৬২২।
৭. মূল আরবী [إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عزوجل لملائكته وهو أعلم – انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুস সালাত, হা. নং ৮৬৪; *তিরমিযী*, হা. ৪১৩।
৮. [أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.,০২, পৃ.১৬৯, হাদীস নং ৬৫৭৬, খতীব আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, কিতাব আস সালাত, হাদীস নং ৫৭৮।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ২: আয়াত ১৮৫।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ : আয়াত ১৮৩।

সাওম ব্যক্তির মাঝে আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও উচু মানের নৈতিকতা অর্জনে সহায়তা করে। সাওম ব্যক্তিকে মিথ্যাচার, পরচর্চা-পরনিন্দ, ঝগড়া-বিবাদ, অনর্থক ও অশ্লীলতা পরিহার সহ যাবতীয় পাপাচার, অনাচার ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে রাখে। এটা তাকওয়া অর্জনের মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নাবী সা. বলেন–"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও গর্হিত আচরণ পরিত্যাগ করে না। আল্লাহর জন্য তার খাদ্য পানীয় পরিত্যাগের প্রয়োজন নেই।"[১]
সাওম কুপ্রবৃত্তি হতে বাধা প্রদান করে এবং দুনিয়া ত্যাগী ও মিতব্যয়ী বানায়।[২] সাওমের মাধ্যমে ব্যক্তি জৈবিক চাহিদার উপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে। এটা ধৈর্য, সহনশীলতা, আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি মহৎগুণ আত্মস্থ করতে শিক্ষা দেয়। যেমন রাসূল সা. বলেছেন–"তোমাদের কোন ব্যক্তি রোযা রাখলে সে যেন খারাপ কথা না বলে এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযাদার'।"[৩]

সাওম আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের মোক্ষম মাধ্যম। বিশেষ করে রামদান মাসের শেষ দশকে ইতেকাফ তথা মসজিদে অবস্থান করে ইবাদতে মশগুল থাকা আত্মিক পরিশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাওমের নৈতিক গুরত্ব সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন, রোযা প্রবৃত্তিকে দমন করে ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পালনে বাধ্য করে। এভাবে প্রবৃত্তি দিনের পর দিন রোযা রেখে সংযমে অভ্যস্ত হয় ফলে তাকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সফল হয়।...মানুষের ফিরিশতা স্বভাকে জোরদার করে এবং পশু স্বভাবকে দুর্বল করে। আত্মার পরিচ্ছন্নতা ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রোযার চেয়ে ফলপ্রসূ কোন আমল নেই।...রোযা প্রবৃত্তিকে যত বেশী নিয়ন্ত্রিত করে পাপও তত বেশী হ্রাস পায়। ফলে তা মানুষকে ফেরেশতার স্বভাবের সাথে তুলনীয় করে তোলে।[৪]

সাওম মানুষকে সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। ধনী রোযাদার ব্যক্তি রোযার মাধ্যমে সারাদিন অভুক্ত থেকে ক্ষুধা-পিপাসার কষ্ট অনুভব করতে পারে। এর ফলে অভুক্ত-দরিদ্র মানুষের প্রতি তাদের সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, ও সহানুভূতি প্রর্দশনের মনোভাব জন্ম হয়। যা সমাজে ধনী-দরিদ্রের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বাড়ায়। দরিদ্রের প্রতি ধনীরা কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে। এছাড়া ইফতারের ফজিলত বর্ণনা করে মানুষকে দান, অতিথেয়তা ও আহার করানোর উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এরপর রামদান মাসে সাদকাতুল ফিতর তথা ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে দুঃস্থ-দরিদ্রের প্রতি সম্পদশালীদের সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটে এবং এতে ব্যক্তি অন্যের ব্যাপারে নৈতিক দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত হয়।

রামযান মাস সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিলের মাস। ফলে এ মাসে মুসলিমরা ব্যাপকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করে যা তাদের সত্যের পথ নির্দেশ করে এবং সত্য ও ঈমান পথে অটল থাকতে সহায়তা করে। যেমন বলা হয়েছে[৫]– (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) "রামাদান মাস, এতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত (সৎপথের দিশারী) এবং হিদায়াতের (সৎপথের) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।"

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসেবে সাওমের গুরত্ব অপরিসীম। রাসূল সা. বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন

> আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সাওম ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য। তাই আমিই এর প্রতিদান দেব। সিয়াম ঢাল স্বরূপ। ...যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! অবশ্যই সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিসকের গন্ধের চাইতেও সুগন্ধি। সায়িমের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি যা তাকে খুশি করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশি হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সাওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে।[৬]

❑.সম্পদশালীদের জন্য যাকাত প্রদান (إيتاء الزكاة):

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ–পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা বিশুদ্ধতা, প্রবৃদ্ধি, প্রশংসা ইত্যাদি। শরিয়তের নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সম্পদের দেয় অংশকে পরিভাষায় যাকাত বলে।[৭] যাকাত প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন, মুসলিম ও নিসাব[৮]

---

[১].মূল আরবী [من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, হা.নং ১৮০৪; *আবূ দাউদ*, হা. ২৩৬২।
[২]. ইমাম আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, প্রাগুক্ত, খ.০১, পৃ.৩৭২। (শা)
[৩].**মূল আরবী**[وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, হা.১৮০৫; *মুসলিম*, হা. ১১৫১।
[৪]. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩১।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ : আয়াত ১৮৫।
[৬]. **মূল আরবী** [كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৮০৫; *মুসলিম*, হা.১১৫১।
[৭]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৯।
[৮].**নিসাব:** কোন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পর কমপক্ষে যে পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় অন্তত এক বছর বিদ্যমান থাকলে তার উপর যাকাত প্রদান ফরজ হয়, তাকে নিসাব বলে। বিভিন্ন সম্পদের নিসাব বিভিন্ন রকম। যেমন : স্বর্ণের নিসাব সাড়ে সাত তোলা, রৌপের বায়ান্ন তোলা এবং নগদ অর্থের নিসাব সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপার বাজার দরের সম পরিমাণ [যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা বায়ান্ন তোলা রৌপার বাজার দরের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য

পরিমান সম্পদের মালিকের উপর বছরান্তে আদায় করা ফরজ। নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক সম্পদ, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ-রৌপ্য, কৃষি ফসল ইত্যাদির উপর নির্ধারিত হারে যাকাত দিতে হয়। কুরআনে যাকাত শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে ০৭ বার এসেছে, আর সালাত ও যাকাত একত্রে ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। এটা ঈমানের সত্যায়নকারী। একে বাদ দিয়ে পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। এটা দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যম। নৈতিক উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যাকাত প্রদানে যাকাতদাতার অর্থ-সম্পদ জমা করার মন-মানসিকতা পবিত্র হয়ে যায়। বিশেষ করে মনের কৃপণতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা-নীচুতা ও সম্পদের অসংযত লোভ-লালসা ইত্যাদি মন্দগুণ নিয়ন্ত্রণ করে মন ও আত্মাকে পবিত্র করে। আর আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে ব্যক্তির নৈতিক সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষতার সাধিত হয়। এর মাধ্যম অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। তা ব্যক্তির মাঝে দয়া, বদান্যতা, উদারতা, দায়িত্ববোধ ও তাকওয়া ইত্যাদি মহৎ গুণ সৃষ্টি করে। অধিকন্তু, অর্থের চেয়ে আল্লাহর ভালবাসা অধিক গুরুত্বপূর্ণ যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যাকাতের কল্যাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে[১] خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا "তাদের সম্পদ হতে যাকাত গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে ও পরিশোধিত করবে।" অন্যত্র বলা হয়েছে[২]- وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "ব্যয় কর তোমাদের কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত; তারাই সফলকাম।"

যাকাত এক নিঃস্বার্থ দান, যা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করে। যাকাত সমাজ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া,সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি ও সুদৃঢ়করণের উৎকৃষ্ট পন্থা। এজন্য যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ-"যখন তা ফলবান হয় তখন তা আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে তার হক প্রদান করবে।"

যাকাত আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ধনী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, পুঁজিবাদী শোষণ ও সামাজিক বঞ্চনা দূরীকরণে সহায়তা করে। যাকাতের মাধ্যমে দুঃস্থ, দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত, ও অসহায় মানুষেরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়। তাদের দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট লাঘব হয়। ক্ষুধা-দারিদ্র হ্রাস পায়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির প্রসার ঘটে এবং চুরি-ডাকাতি কমে যায়। অধিকন্তু, যাকাত অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও সম্পদের প্রবৃদ্ধি সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৪] (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) "যাতে ধন–সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে।" কুরআনের অন্যত্র এসেছে[৫] (وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধশালী।"

যাকাত একটি সমাজ কল্যাণধর্মী বিধান। জনকল্যাণ, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় মহান আল্লাহ যাকাত প্রদানের নানাক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। যাকাত প্রদানের এসব খাত ব্যাপকভাবে জনকল্যাণ, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রক্ষার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ সব খাতে যাকাত দানের মাধ্যমে সমাজের বড় অংশের প্রতি নৈতিক কর্তব্য পালন হয়। মহান আল্লাহ বলেন[৬]–

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"

যাকাত আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ নাযিলের মাধ্যম। যাকাত আদায় না করলে এর পার্থিব শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ অনাবৃষ্টি ও খরা চাপিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ' যে সম্প্রদায় তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে না, তাদেরকে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণও করা হ'ত না, যদি প্রাণীকুল না থাকত'।[৭] অর্থাৎ প্রাণীদের কারণেই তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হয়।

হয়, তবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মধ্যে যেটির মূল্য কম হবে সেটা-ই নিসাব হবে]। উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত হিসেবে প্রদেয়। যাকাত নগদ অর্থ দ্বারাও পরিশোধ করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদ দ্বারাও পরিশোধ করা যায়। -মুহাম্মদ মূসা, "যাকাত" *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ.২১, ১৯৯৬, পৃ.৪৭৭-৪৭৮।

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ১০৩।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ১৬।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১৪১।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ০৭।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম ৩০: আয়াত ৩৯।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ০৯: আয়াত ৬০; আরও দেখুন, আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫ : আয়াত ২৯; সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭১।

[৭].মূল আরবী [ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাব আল-ফিতান, হাদীস নং ৪০১৯।

যাকাত আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি করে, আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করে কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয়ে উৎসাহিত করে। সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছাড়াও চুরি-ডাকাতিসহ নানা সামাজিক অনাচার রোধে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব কারণে আবূ বকর রা. তাঁর খিলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।[১]

যাকাতের পরকালীন কল্যাণ অনেক। যাকাত মহান আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত ও পাপমোচন করে। এটা আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও পূণ্য লাভের একটি বড় উপায়। এটা আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা শিখায়। যাকাত পরকালীন মুক্তি লাভেরও বড় মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন[২]– الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের রবের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" আরও বলেন[৩], وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ "যে ধন-সম্পদ তোমার ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরিভাবে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।"

যাকাত আনাদায়ের মন্দ পরিণাম: যাকাত আদায় না করার পরকালীন পরিণতি অতীব ভয়াবহ। যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে না পরকালীন জীবনে তা তাদের শাস্তির উপকরণ হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ- يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ-

"আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর।"

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীসে রাসূল(সা.) বলেন[৫] আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত হবে যার (চোখ দুটোর উপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পেঁচানো হবে। অতঃপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় গালে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভাণ্ডার। তারপর নাবী সা. এ আয়াত পাঠ করলেন– وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা কিছু দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে এটা তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা দিয়ে তাদের গলার বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে। [সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৮০]

❑.দান-সাদাকাহ (الصدقة):

লোকেরা তাদের ধন-সম্পদ থেকে যা বের করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, তাকেই সাদাকা বা দান বলা হয়। যেমন যাকাত, তবে সাদাকা মূলত নফল দানকে বুঝায় যা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। আর যাকাত বলা হয় ফরজ দানের অংশকে। এই ফরজ দানকে কখনও কখনও সাদকাও বলা হয় যখন ব্যক্তি তার কাজে পরম সত্যতার পরিচয় দেয়।[৬]
দান-সাদাকা শুধু একটি পূণ্যের কাজই নয়। দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পুর্ণবাসন, দারিদ্র বিমোচন, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল, আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন ও নানাবিধ কল্যাণ লাভে দান-সাদাকার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে[৭] (وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ) "আর ব্যয় কর তোমাদের কল্যাণের জন্য; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত; তারাই সফলকাম।"

দান-সাদাকা করা মু'মিনের মৌলিক ও অন্যতম প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এটা মানুষের মধ্যে দয়া-মমতা, উদারতা, কোমলতা ইত্যাদি মহৎ গুণ সৃষ্টি করে। এতে পরোপকারের মানসিকতার প্রকাশ ঘটে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে[৮]–

الم- ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ -الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"আলিফ্-লাম-মীম। এটা (আল-কুরআন) সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য সঠিক-সুদৃঢ় পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক (জীবনোপকরণ) দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" এই আয়াতের (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) এর ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী(১৮৭২-১৯৫৩ খৃ.) বলেন

---

[১]. দেখুন,*সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৩৫; *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২০।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৩৪-৩৫।
[৫]. দেখুন,*সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৩৮।
[৬]. রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০২, পৃ.৩৬৫।
[৭] . আল কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন : আয়াত ১৬।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ২: আয়াত ১-৫।

All bounties proceed from Allah. They may be physical gifts, e.g. food,clothing, houses, gardens, wealth, etc. or intangible gifts, e.g., influence, power,birth and the opportunities flowing from it, health, talents, etc. or spiritual gifts,e.g., insight into good and evil, understanding of men, the capacity for love, etc.We are to use all in humility and moderation. But we are also to give out of every one of them something that contributes to the well-being of others. We are to be neither ascetics nor luxurious sybarites, neither selfish misers nor thoughtless prodigals. [১]

অর্থাৎ সমস্ত দান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এগুলো হতে পারে বাহ্য বস্তু; যেমন–খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বাগান, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি; অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন দান; যেমন-প্রভাব, ক্ষমতা, বংশ, মর্যাদা,স্বাস্থ্য, মেধা ইত্যাদি; অথবা আধ্যাত্মিক শক্তি, যেমন–অন্তর্দৃষ্টি যা দ্বারা ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপন করা যায়, মানুষকে বোঝার ক্ষমতা, ভালবাসার শক্তি ইত্যাদি। আমাদের এগুলো ব্যবহার করতে হবে বিনয় ও সংযমের সাথে। কিন্তু ঐসব সম্পদ থেকে আমাদের কিছু দিতে হবে যা অন্যের কল্যাণে অবদান রাখে। আমাদের কৃচ্ছ সাধন ও বিলাসিতা এর কোনটি উচিত নয় আবার স্বার্থপর কৃপণ বা অবিবেচক অপব্যয়ীও হওয়া উচিত নয়। (টীকা-২৭)

দান-সাদাকা মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনে। এটা মানুষের বিপদ-আপদ ও অকল্যাণ দূরীভূত করে। এতে মানুষের সম্পদের কমতি হয় না, বরং তাতে সম্পদে বরকত হয়। মহান আল্লাহ বলেন[২] –

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

“আর যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।”

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ-الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَيُتْبِعُونَ مَاأَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَأَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُون

যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপাদন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ শস্যদানা। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন[৪], দান-সাদাকা দ্বারা সম্পদের ঘাটতি হয় না। ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ মান-সম্মান বাড়িয়ে দেন।[৫] তিনি আরও বলেন–“দাতা আল্লাহর নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে ও জাহান্নাম থেকে দূরে।”

দান-সাদাকা মানুষের মধ্যে উন্নত মানসিকতা, আত্মিক পরিশুদ্ধতা ও আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি করে।[৬] এটা মানুষকে সত্য পথে চলতে এবং মুত্তাকী (আল্লাহ ভীরু) হতে সহায়তা করে। এটা মানুষকে জান্নাত পথ দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন-[৭] فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى- “সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর উত্তমকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।”

দান-সাদাকা মানুষের পাপরাশি মোচন করে এবং অভাবী মানুষের কষ্ট লাঘব করে। তাই ইসলাম এ ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহিত করেছে ও তাকিদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. (সা.) ফিতরা প্রদান করাকে উম্মতের উপর ওয়াজিব করেছেন যেন রোযা অবস্থায় ঘটে যাওয়া নিরর্থক বাক্য ও অশ্লীল কর্মের থেকে পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হতে পারে এবং অভাবী মিসকীনদের জন্য খাদ্যের সংস্থান হয়।”[৮]

দানের পার্থিব কল্যাণ ছাড়াও রয়েছে অফুরন্ত পরকালীন পুরস্কার। নাবী সা. বলেন[৯], “হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় কর তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা থেকে বিরত থাক তবে তা তোমার জন্য অকল্যাণকর। যদি তোমার প্রয়োজন পূরণের জন্য পরিমিত পরিমান রাখ, তবে তুমি তিরস্কৃত হবে না। তোমার দায়িত্বাধীন পরিবর্গের জন্য প্রথমে ব্যয় করবে। নিশ্চয় দাতার হাত গ্রহীতার হাত থেকে উত্তম। দান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালীন মুক্তিতেও বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।”মহান আল্লাহ বলেন[১০]–

وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ-

---

1. Abdullah Yusuf Ali, *ibid*, v.1, P.17,
২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৫।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬১-২৬২।
৪. মূল আরবী [السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়া সিলাহ, হা.নং১৯৬১।
৫. মূল আরবী [ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা.২৫৮৮, *তিরমিযী*, হা. ২০২৯।
৬. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্‌র/আল-ইন্‌সান, ৭৬: আয়াত ৭-৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-লাইল ৯২: আয়াত ৫-১১।
৮. মূল আরবী [فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬০৯।
৯. মূল আরবী [يا بن آدم انك ان تبذل الخير خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على الكفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৫, পৃ.২৬২, হা. ২২৩১৯।
১০. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১২১।

"তারা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয় –যাতে তারা যা করে, আল্লাহ্ তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন।"

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন দানই ব্যর্থ হয় না কিংবা দানের প্রতিদান নষ্ট হয় না। এ মর্মে হাদীসে এসেছে,

একদা এক ব্যক্তি দান করার জন্য অর্থ নিয়ে বের হলো এবং এক চোরের হাতে তা সমার্পণ করল। সকালে লোকেরা বলাবলি করল, এক চোরকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল, আমি অবশ্যই (রাতে) আবারও কিছু দান খয়রাত করব। আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) এক ব্যভিচারিণীকে দান করল। সকালে লোকেরা বলাবলি করল, এ রাতে এক ব্যভিচারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল, এক ব্যভিচারিণীকে দান করা হল? আমি অবশ্যই(রাতে) কিছু দান খয়রাত করব। সুতরাং সে তার অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) তা এক ধনী ব্যক্তিকে দিল। সকালে লোকেরা বলাবলি করল, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। এক চোর, এক ব্যভিচারিণী ও একজন ধনীকে দান করা হল। পরে(স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এ সব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়ত এর কারণে চোর চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে; এবং ব্যভিচারিণী ব্যভিচার থেকে বিরত থাকবে, আর ধনী ব্যক্তি হয়ত এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে।[১]

যাকাত ও দান-সাদাকার নৈতিক নীতিমালা: যাকাত ও দান-সাদাকা করার ক্ষেত্রে কতিপয় নৈতিক নীতি রয়েছে। কুরআনের আলোকে নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

•সম্পদ হালাল ও পবিত্র হওয়া। যাকাত বা দান করার ক্ষেত্রে দানকারীর খারাপ জিনিষ বেছে বেছে দান করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে যাকাত আদায়কারী কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠীর উচিত নয় ভালো জিনিষ বেছে বেছে নেয়া। যেমন বলা হয়েছে[২]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক।"

মুয়ায ইবনু জাবাল রা. কে রাসূল সা. ইয়ামেনে(শাসক হিসেবে) পাঠানোর প্রাক্কালে বলেন–

তুমি আহলে কিতাবদের একটি গোষ্ঠীর নিকট যাচ্ছ। তাই তাদের এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এ বিষয় মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রত্যেহ দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। তারা যদি এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে *তবে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ নেয়া বিরত থাকবে*। আর মাযলুমের অভিযোগকে ভয় করবে। কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।[৩]

•যাকাত বা দানের ক্ষেত্রে যার জন্য ব্যয় করা হবে সে সাদাকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যয় করলে সাদাকা ব্যর্থ হবে। যাকাত বা দানের ক্ষেত্রে প্রকৃত অভাবগ্রস্ত লোক খুঁজে বের করে দান করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন[৪]

لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(সদাকা) সে সব অভাবগ্রস্তদের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে, তারা যমীনে ঘুরাফিরা পারে না। না চাওয়ার কারণে অনবহিত ব্যক্তি তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চিহ্ন দ্বারা। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

•দান কেবল আল্লাহর জন্য করা, লোক দেখানো দান, দান করে খোঁটাদান, দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা থেকে দূরে থাকা এবং গ্রহীতাকে হেয় বা তুচ্ছ না করা যাতে সে কষ্ট পায়। কেউ এরূপ করলে তার দান নিষ্ফল হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে[৫]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ-فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ

হে মু'মিনগণ ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের দান-সদাকা বাতিল করো না; সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ঈমান রাখে না আল্লাহ ও আখিরাতে। অতএব তার উপমা এমন একটি মসণৃ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি; অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার কোন কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَيُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّاوَلاَأَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে,অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না,তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই,আর তারা চিন্তিত হবে না।"[১]

---

[১]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং১৩৫৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০২২।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৭।

[৩].মূল আরবী[فإياك وكرائم أموالهم] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৪২৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৯।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭৩।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৪।

রাসূল সা. বলেন[২],“কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা’য়ালা তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদের পাপ থেকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তিনি বলেন, তারা হল-ক. পায়ের গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী, খ.নিজ কৃত দানের জন্য খোটা দানকারী , গ.মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারী।”

•কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের প্রিয়বস্তু দান করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৩]– لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ “তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে সম্বন্ধে অবহিত।”

•স্বচ্ছল ও অস্বসচ্ছল সর্বাবস্থায় প্রত্যেকেই দান-খয়রাত করা কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪] – الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء ...وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে...আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।”

নাবী সা. বলেন-[৫] প্রত্যেক মুসলিমেরই দান করা কর্তব্য। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর নাবী! যার কিছু নেই সে কি করবে? তিনি বললেন, সে নিজ হাত দিয়ে কাজ (শ্রম) করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্থদের সাহায্য করবে। তাঁরা বলেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে যেন সৎকাজ করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সাদাকা।

•সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় দান-সাদাকা করা। এক্ষেত্রে বিলম্ব করা উচিত নয়। এ মর্মে বলা হয়েছে[৬]–

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

আর আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছুকাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সদাকা করতাম এবং সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আর আল্লাহ কখনো কাউকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে। এক ব্যক্তি নাবী সা. এর নিকট এসে জিজ্ঞাস করল, হে রাসূলুল্লাহ! কোন ধরনের দান সর্বাধিক পূণ্যের? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় যে দান করবে এবং দারিদ্রের আশংকা করছো, ধনী হওয়ার আশা করছো, এমতাবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কণ্ঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।[৭]

•দান প্রকাশ্য ও গোপন উভয়ভাবে হতে পারে, তবে গোপন দান-সাদাকা-ই উত্তম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন[৮]–

إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ

“তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভালো; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দান কর তা তোমাদের জন্য আরও ভালো; এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন।”

•দান-সাদাকা করার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা উচিত। দানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা উত্তম। এক্ষেত্রে বেছে বেছে সবচেয়ে ভালো জিনিস দান যেমন বাড়াবাড়ি তেমনি বেছে বেছে মন্দ জিনিস দানও অনৈতিক। আবার সবকিছু দান করে নিঃস্ব হওয়া যেমন অনুচিত, তেমনি কার্পণ্য অবলম্বন করাও গর্হিত। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৯]

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاآتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিয্ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে।আল্লাহ্ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী। আল্লাহ্ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন।” وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বল, ‘যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত’।”[১০]

বৈধ উপার্জন থেকে দান করা উচিত, কেননা অবৈধ উপার্জন থেকে দানের গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছে[১১]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ-“হে মু’মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা পবিত্র তা ব্যয় কর।”

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬২।
২. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১০৬, আবূ দাউদ হা. ৪০৮৫, তিরমিযী হা. ১২১১, *সুনান আন-নাসায়ী*, হা.৪৪৫৮, *সুনান ইবন মাজাহ*, হা. ২২০৮।
৩. আল-কুরআন, সূরা আলে-‘ইমরান ০৩: আয়াত ৯২, আল-কুরআন (০২:২৬৫)।
৪. আল-কুরআন, সূরা আলে-‘ইমরান ০৩ : আয়াত ১৩৪-১৩৫।
৫. **মূল আরবী**[جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হা১৩৭৬।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিকূন ৬৩: আয়াত ০১০-১১।
৭. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৩৫৩।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭১।
৯. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ০৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৯।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৬৭।

রাসূল সা. বলেন–যে ব্যক্তি একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ তো পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না, আর আল্লাহ ঐ দান ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা দানকারীর জন্য পরিপোষণ করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের অশ্বশাবক পরিপোষণ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।[১]

•যাকাত বা দানকে দরিদ্রদের প্রতি কোনরূপ করুণা মনে না করে তাদের অধিকার মনে করা। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[২]– وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ- "আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।"

•দান-সাদাকা কিংবা হাদীয়া প্রদান করে তা থেকে ফেরত না নেয়া। এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন[৩]–'যে ব্যক্তি সাদাকা করে তা ফেরত নেয়, সে এমন কুকুরের সমতুল্য যে বমি করে আবার খেয়ে ফেলে'।

•দান মুখ্য উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, লোক দেখানো, প্রশংসা বা অনুদান লাভ কিংবা পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য দান যাবে না। দান-সাদাকার প্রতিদান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রত্যাশা না করা। ইরশাদ হচ্ছে[৪]

وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

"তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়,কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান হিদায়াত করেন এবং তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপর্ণূভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না।"এছাড়াও অন্যত্র বলা হয়েছে[৫]

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى- وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى- إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

"যে তার সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে, আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই,যার প্রতিদান দিতে হবে।" অন্যত্র আরও বলা হয়ে[৬] ছ– وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ- "আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না।"

•যাকাত নির্ধারিত আটটি খাতে যাকাত প্রদান করা।[৭] নির্ধারিত খাতের বাইরে ব্যয় করা যাবে না। আর সাধারণ দান-সদাকার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীমসহ যাকাতের নির্ধারিত খাত গুলোতেও ব্যয় করা যাবে।[৮]

সর্বপরি, দানের আরও উদ্দেশ্য হবে পরকালীন নাজাত, জান্নাত লাভ, পরকালীন পুরস্কার হাসিল, আত্মশুদ্ধি অর্জন, কৃপণতার স্বভাব দূরীকরণ, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও মানব কল্যাণ সাধন করা।[৯] মহান আল্লাহ বলেন[১০] –

يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْأَنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّبَيْعٌ فِيهِ وَلاَخُلَّةٌ وَلاَشَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন–বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপাারিশ। আর কাফিররাই যালিম।"

দান পরকালীন নাজাত একটি বড় মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–"প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন স্বল্পধিকারী হবে। অবশ্য যাদের আল্লাহ্ সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে, বামে, আগে ও পেছনে ব্যয় করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায় (তারা ব্যতীত)।"[১১]

❑. করদে হাসানা প্রদান (القرض الحسن):

মহান আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি কল্যাণকর মাধ্যম হলো করযে হাসানা। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল ও পরকালীন পুরস্কার লাভেরও অন্যতম মাধ্যম। অভাবীদের সাময়িক অভাব মোচন ছাড়াও গরীব ও পুঁজিহীন মানুষের কৃষি,বাণিজ্যিক ও শিল্প কারবারের জন্য তা একটা কার্যকর উপায়।

করযে হাসানা অর্থ: করযে হাসানা দুটি শব্দ। তন্মধ্যে করয–(قَرْضً) অভিধানিক অর্থ–কর্তন করা, পরিভাষায় এর অর্থ–'একজন অন্যজনকে নিজের সম্পদের কোন কিছু দেয়া তার সমপরিমান ফেরত পাওয়ার আশায়।' আর হাসানা(حَسَن) অর্থ–উত্তম। করজে হাসানা হল– "এমন করয, যা নিষ্ঠা ও সানন্দচিত্তে করা হয়।"[১২]
আল্লামা হিফজুর রহমান বলেন–"করযে হাসানা বলা হয় কোন বিত্তবান কর্তৃক কারো প্রয়োজন মেটানো ও তাকে উপকৃত করার মহৎ উদ্দেশ্যে বিনা লাভে কর্জ দেয়া।"[১]

---

[১].মূল আরবী[من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হা.১৩৪৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত ৫১: আয়াত ১৯, আল-কুরআন৭০:২৪-২৫।
[৩].মূল আরবী [العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল হিবা, হাদীস নং ২৪৪৯;, *সহীহ মুসলিম*,কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৬২২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৭২, আল-কুরআন ৭৬:৮-৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-লাইল ৯২: আয়াত ১৮-১৯।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ৭৪: আয়াত ০৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ৬০।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১৫।
[৯]. আল-কুরআন,সূরা আল-বাক্বারাহ ০২:আয়াত ২৬১, ২৭৪; আল-কুরআন ৯:১০৩, ৬৩:১০-১৬, ৫৭:৭, ৫৯:৯, ৬৪:১৬, ৫১:১৬,১৯।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৫৪।
[১১].মূল আরবী [إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হা. নং ৬০৭৮।
[১২]. কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, ১ম খণ্ড, অনু: সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকা: ইফাবা ১৯৯৭) পৃ.৭৩১-৩২।

করযে হাসানা একটি পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও বন্ধত্বমূলক চুক্তি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরপোকারমূলক কাজ। এটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রেমপ্রীতি পূর্ণ সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সমাজ থেকে দরিদ্রতা বিমোচন, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ধরনের ঋণের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদে বরকত আসে, অলস সম্পদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়। এতে ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্রতা মানুষকে নানা অন্যায়, পাপাচার এমনকি কুফরীর দিকে ধাবিত করে। তাই সম্পদশালী ব্যক্তিদের উচিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ ধরনের নিঃস্বার্থ ঋণ প্রদান করে দরিদ্র বিমোচন করা। কর্জ গ্রহীতার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অসাধুতার আশংকা থাকায় এ ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা বাধ্যতামূলক না করে তা ঐচ্ছিক করা হয়েছে এবং এতে পুরস্কারের উল্লেখ করে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[২] – مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ্ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।"মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন[৩] – إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ-"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম করয দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।"

❑. সামর্থ্যবানদের জন্য হাজ্জ আদায় (الحج):

হাজ্জ এর অভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা করা, উপস্থিত হওয়া, মনোনিবেশ করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়–নির্দিষ্ট মাসে নিদিষ্ট নিয়মে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, যিয়ারত, আরফায় অবস্থান, কুরবাণী ইত্যাদি আরকান-আহকাম পালন করা।[৪] কুরআনে হাজ্জ শব্দটি ১০বার, হিজ্জ ০১বার ও হাজ্জু ০১বার ব্যবহৃত হয়েছে।

হাজ্জ ফরজ যা প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধি সম্পন্ন, সুস্থ্য, মুসলিম ধনী ব্যক্তির উপর ফরজ। যিনি পরিবার পরিজনের ব্যয়ভার বহন করে অতিরিক্ত সম্পদের এরূপ অধিকারী হবেন, যতক্ষণ সে হাজ্জ থেকে ফিরে আসবেন। সামার্থ্যবানদের জন্য জীবনে হাজ্জ একবারই ফরজ।

হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। হাজ্জ বিশ্ব মুসলিমের আন্তর্জাতিক বার্ষিক মহাসম্মেলন। বিশ্বশান্তি, সাম্য, ঐক্য, সংহতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ও ভালবাসা সৃষ্টিতে হাজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম। হাজ্জের সময় সারা পৃথিবীর মানুষ মক্কায় ও আরাফার ময়দানে সমবেত হয়। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদের মধ্যে মত বিনিময়, পরামর্শ ও আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। হাজ্জের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। হাজ্জ এমন একটি ইবাদত যা মুসলিম জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করে এবং পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতার আহবান জানায়। মুসলিম দেশগুলো মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব আদায়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও হাজ্জের মধ্যে নানা কল্যাণ রয়েছে। হাজ্জ মুসলিম জাতির ঐক্য, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ হজ্জের বিধান দিয়ে ইরশাদ করেন[৫]–

> إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ- فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
>
> "নিশ্চয়ই মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী। "

হাজ্জের সময় বিভিন্ন দেশ ও জাতি থেকে আগত মানুষ যেমন–আরব-অনারব, সাদা-কলো, সবাই একই কাপড় পরিধান করে একই উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, যা সকলের মধ্যে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সৃষ্টি, বর্ণ ও লিঙ্গগত বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং জাতিগত কৌলিন্য দূরীকরণের এক অপূর্ব শিক্ষা দেয়। হজ্জের সময় হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নিদিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট নিয়মে কতগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হয়, যা মানুষকে শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়। এভাবে বহুবিদ কল্যাণ

---

[১]. আল্লামা হিফজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৯৯।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২ঃ আয়াত ২৪৫ ।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ৫৭ঃ আয়াত ১৮।
[৪]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩০।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৯৬-৯৭।

থাকায় মহান আল্লাহ হজ্জ ফরজ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন– وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ "তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।"[১]

ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি এবং বর্ণবাদ, জাতিগত কৌলিন্য দূরীকরণে হাজ্জের গুরুত্ব প্রসংঙ্গে পি.কে. হিট্টি (মৃ.১৯৭৮ খৃ.)বলেন–

> যুগ যুগ ধরে এই হজ সমাবেশ ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে বড় ঐক্য সৃষ্টিকারী উপাদান এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী মিত্রতার বন্ধন হিসেবে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। ...এই সমাবেশে নিগ্রো, বার্বার, চীনা, পারসি, সিরীয়, তুর্কি ও আরবী –ধনী ও গরীব, উচু ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের একই ধর্মবিশ্বাসে উদ্ধুদ্ধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ করে দেয়। বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলাম ধর্মেই জাতি, বর্ণ ও জাতীয়তাবোধের বৈষম্য–অন্তত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে–ধ্বংস করতে সবচেয়ে বেশী সফল হয়েছে। [২]

হাজ্জ মানুষকে শান্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নৈতিকতা ও সংযমের প্রশিক্ষণ দেয়। হাজ্জের সময় হাজ্জপালনকারীর জন্য যে সব কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ তন্মধ্যে মারামারি, ঝগড়া-ফাসাদ ও পাপাচার অন্যতম। এছাড়াও হাজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ভোগ-বিলাস নিষিদ্ধ, যা মানুষকে তাকওয়া, ধৈর্য, সহনশীলতা, ত্যাগ ও সংযমে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া হাজ্জের সময় বেশী করে পূণ্যের কাজ করার জন্য বলা হয়েছে।এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

> الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ- "হজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতঃপর যে কেউ এই মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে রাফাছ[৩] (স্ত্রী-সম্ভোগ, অশ্লীলতা), ফুসূক[৪] (অন্যায় আচরণ ও পাপচার) ও জিদাল[৫] (কলহ–বিবাদ) বৈধ নয়। আর তোমরা ভালো কাজের যা কর, আল্লাহ্ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।"[৬]

হজ্জ পাপমুক্তি ও আত্মসংযমের মাধ্যম। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৭], যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং তাতে অশ্লীল কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে যায়।

হাজ্জ পালনকালীন সময় আল্লাহকে বারংবার স্মরণ করে, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাঁর দয়া ও সন্তুষ্টি কামনা করে।[৮] হাজ্জের এই কার্যক্রম মানুষকে আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া, আত্মত্যাগ ও বিপন্ন সাহায্যের শিক্ষা দেয়।[৯] অধিকন্তু, হাজ্জে গমনের পূর্বে মানুষ অন্যের হক নষ্ট করলে ফেরত দেয় বা কাউকে কষ্ট দিলে ক্ষমা চেয়ে নেয়, তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করে, হাজ্জ পরবর্তী সময় মানুষ সৎভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করে। এভাবে হাজ্জ মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

হাজ্জ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, হাজ্জে মাবরূর(কবূল হাজ্জ)।[১০]

❑.সৎকর্ম সম্পাদন, মন্দকর্ম বর্জন এবং বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন (البر/الاعمال الصلحات):

সব ধরনের ভালো কল্যাণকর ও পূণ্যের কাজকে বলা হয় البر বা الاعمال الصلحات। আল-কুরআন শুধু ঈমান বা বিশ্বাসের উপর জোর দেয়নি বরং ঈমান বা বিশ্বাসের সাথে 'আমল বা কর্মের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআনের সর্বত্রই এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআন মতে, কেবল ঈমান পোষণ করাই যথেষ্ট নয়। ঈমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সৎকাজ করাও মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফারূপে দায়িত্ব পালনের এটাই সঠিক পথ। এজন্য আল-কুরআনে ৫৫ বারের বেশি স্থানে ঈমান আনার সাথে সাথে ভালো কাজ সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তা একত্রে তুলে ধরেছে। সুন্দর সমাজ গঠনে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য নিজে সৎকর্মশীল হওয়া, মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা, সৎ কাজ সম্পাদনে তৎপর থাকা এবং কোন সৎকাজ উপেক্ষা না করা। মহান আল্লাহ বলেন[১১]–وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- এবং ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৬।
2 . P.Q. Hitti, *Op.cit.*, p.36.
৩. রাফাছ হলো–কথাবার্তায় নারীর সঙ্গে অশ্লীলতা। (কুরতুবী)
৪. ফুসূক হলো–সব ধরনের গুনাহ ও পাপ কাজ। (ইবনে জারীর)
৫. জিদাল হলো–মারামারি, গর্ব-অহংকার সম্বলিত কথাবার্তা, বাকবিতণ্ডা ইত্যাদি। (তাফসীরে মাজেদী-আবদুল মজিদ দারিয়াবাদী)
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৭।
৭. মূল আরবী [من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল হজ্জ, হা.নং ১৪৪৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হজ্জ, হা.নং ১৩৫০।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৯৮-২০০।
৯. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ২৭-৩০, ৩৬-৩৭।
১০.মূল আরবী [سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا ؟ قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا ؟ قال حج مبرور] *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল হজ্জ , হাদীস নং ১৪৪৭, *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ৮৩।
১১. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৭৭।

ইসলামের সত্যিকার অনুসারীরাই সৎকর্মশীল হয়। হাদীসে বলা হয়েছে-[১] "ইসলাম অসহায় বা অপরিচিত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে এবং অসহায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, সুতরাং অসহায়দের জন্য সুসংবাদ। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অসহায় কারা? তিনি বললেন, '*যারা মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়ার সময় সৎকর্মশীল থাকে*'।"

ভালো কাজের অনেক কল্যাণ রয়েছে। ভালো কাজ মানুষের অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্তরে প্রশান্তি আনে। মনে সৎ সংকল্পের উদয় ঘটায় এবং তা বাস্তবায়নে শক্তি যোগায়। ভালো কাজের অনুশীলন ও চর্চা ব্যক্তিকে পূণ্যবান হতে সহায়তা করে। এতে মূল্যবোধের বিকশিত হয়।ভালো কাজ ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক শক্তি জাগ্রত করে, মন্দকাজের প্রতিকার করে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ বলেন[২]- وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ "তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে, এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।" তাই ভালো কাজে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করতে রাসূল (সা.) বলেন[৩],"তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর,কোন খারাপ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে ভালো কাজ কর, তাতে খারাপ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।" নাবী সা. আরও বলেন,[৪] "সর্বোত্তম মানুষ হলো সে ব্যক্তি যার জীবন দীর্ঘ এবং কর্ম ভালো, সর্বনিকৃষ্ট মানুষ হলো সে ব্যক্তি যার জীবন দীর্ঘ এবং কর্ম মন্দ।"

কাজেই কোন ভালো কাজকে ছোট করে না দেখা। রাসূল(সা.) বলেন[৫],"প্রতিটি ন্যায় কাজই সদকা। তোমার ভাইয়ের সাথে প্রফুল্ল মুখে সাক্ষাত করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র পূর্ণ করে দেয়াও কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত।" আর ভালো কাজে কখনও অবাধ্য না হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন[৬]–وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ-এবং সৎকাজে তারা তোমার(রাসূল) অবাধ্য হবে না।" রাসূল (সা.) এর নিকট বাই'আত গ্রহণকারিণী জনৈক মহিলা বলেন[৭], রাসূল সা. আমাদের থেকে যে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল– " ভালো কাজে আমরা যেন অবাধ্য না হই, (বিপদে) আঁচড়িয়ে মুখমণ্ডল রক্তাক্ত না করি, বিপদ বা ধ্বংস প্রার্থনা না করি, বুকের বস্ত্র না ফাড়ি এবং চুল না ছিঁড়ি'।"

রাসূল সা. দিনের বেলায় ইসলাম প্রচার, দ্বীনি শিক্ষা দান, জিহাদসহ বিভিন্ন সৎকর্মে ব্যস্ত থাকতেন এরপরও রাতের দীর্ঘ সময় নামাজ পড়তেন এমনকি তাঁর পাদ্বয় ফুলে যেত। অথচ তাঁর পূর্বের ও পরের যাবতীয় গোনাহই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।[৮] তাই ভালো কিছু জানা, তত্ত্ব জ্ঞান হাসিল ও আল্লাহকে বিশ্বাস করলেই মুসলিম হওয়া কিংবা নৈতিক উন্নয়ন করা যায় না। বরং ঈমান আনার সাথে সাথে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হওয়া যায়। এজন্য কুরআনের কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, শুধু ঈমান আন, তাহলে তুমি ভালো মানুষ হতে পারবে। বরং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য বিশ্বাস সাথে সৎকর্ম সম্পাদনকে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর সৎকর্ম বলতে বাস্তব উপলব্ধি, ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে বুঝায়, এজন্য শুধু সদিচ্ছা যথেষ্ট নয়। তাই আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. বলেন[৯],"*আমল ব্যতীত ঈমান এবং ঈমান ব্যতীত আমল গ্রহণযোগ্য নয়।*" বস্তুত কুরআনে এই সত্যরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন[১০] لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ "তোমরা কখনো পূণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় করবে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"

ভালো কাজে দুনিয়াতে যেমন বহুবিদ কল্যাণ রয়েছে তেমনি আখিরাতে রয়েছে বিরাট পুরস্কার। ভালো কাজের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন[১১] - إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ "নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণগণ থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে।আর নিশ্চয় অন্যায়কারীরা থাকবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে।" আরও বলেন[১২], إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ "নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" অন্যত্র বলেন-[১৩] إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ-"নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।"

---

[১].মূল আরবী[ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا:يا رسول الله وما الغرباء؟ قال:الذين يصلحون عند فساد الناس]তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, বাবুল হা',খ.৬, পৃ.১৬৪, হা.৫৮৬৪।

[২]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১ : আয়াত ১১৪।

[৩]. মূল আরবী [اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা.নং১৯৮৭; *মুসনাদ আহমাদ*, খ.৫, পৃ১৫৩, হা.২১৩৯২।

[৪].মূল আরবী [أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شره من طال عمره وساء عمله]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হা.২৩৩০; *মুসনাদ আহমাদ*, হা.২০৪৯৯।

[৫]. মূল আরবী [كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বির্রি ওয়াস সিলাহ, হা. নং ১৯৭০।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্তাহিনাহ ৬০: আয়াত ১২।

[৭].মূল আরবী[كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا] *সুনান আবূ দাউদ*, হা. ৩১৩১;

[৮]. দেখুন, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন ওয়া আহকামুহুম, হাদীস নং ২৮১৯।

[৯].মূল আরবী [لايقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان]আলাউদ্দিন আলী ইবন হিসামুদ্দীন, *কানজুল উম্মাল*(বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালা,১৯৮৯) খ.০১, পৃ.৯৪, হা.২৬০।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৯২।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইন্ফিতার ৮২: আয়াত ১৩-১৪; আল-কুরআন ৮৩:৭,১৮।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারা ০২: আয়াত ২৭৭; আরও দেখুন, আল-কুরআন, ০২: ১১০।

[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৫৬; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২:৫৮, ১১২, ৩:১৩৬, ১৪৮, ৫:৮৫,৯৩, ৬:৮৪, ৭:১৬১, ১০:২৬, (১১:১১৫) ১২:২২,৫৬,৯০, ১৬:১২৮, ১৮:৩০, ২৯:৬৯, ৩৯:৩৪-৩৫,৫১:১৫-১৬, ৫৫:৬০।

বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয় ইসলামী নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু বর্তমান কালের মানুষ এ দু'টো জিনিসকে একত্র করতে চায় না। অথচ কর্মই বিশ্বাসের সত্যায়ন করে। আর বিশ্বাস ও কর্মের বৈপরিত্য গর্হিত ও কপটতার নামান্তর। মহান আল্লাহ বলেন[১] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ "হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।" উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী যে, মুমিনের কর্তব্য হলো কথার সাথে কাজের এবং জ্ঞানের সাথে আচরণের সামঞ্জস্য বিধান করা। যদি তা না হয় তবে কথা বা জ্ঞান নিছক তাত্ত্বিক পর্যায়ে থেকে যায়, যার কোন মূল্য নেই এবং যা কল্যাণও বয়ে আনে না।

এজন্যই রাসূল সা. বলেন-[২]"কোন বান্দার ঈমান সঠিক বা পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক না হয় এবং তার অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার হৃদয়ের সাথে তার মুখের ঘোষণা অভিন্ন হবে। অর্থাৎ তার কথা ও আমলের মধ্যে বৈপরিত্য থাকবে না এবং তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হবে।" এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়িম (মৃ.৭৫১হি.) বলেন-[৩]

> যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর জীবনী মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করবে, সে দেখতে পাবে যে, আহলি কিতাব ও মুশরিকরা বিভিন্ন সময়ে রাসূল সা. এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু এই সাক্ষ্য দান তাদেরকে মুসলিম বানাতে পারেনি। এ থেকে জানা গেল যে, ইসলাম এই সাক্ষ্যদানের অতিরিক্ত কিছু। ইসলাম শুধু ইসলামের প্রকৃত পরিচয় জানার নাম নয় এবং প্রকৃত পরিচয় জানা ও তার প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণারও নাম নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে জানা, স্বীকৃতি দেয়া, মান্য করা এবং ইসলামী রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানকে গোপন ও প্রকাশ্যে অনুসরণ করার নাম।

বিশ্বাস ও কর্মের বৈপরীত্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গর্হিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন[৪]–

> কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেয়া হবে। আগুনে দগ্ধ হয়ে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়বে। ফলে সে যন্ত্রণায় এমনভাবে ছটফট করতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাক্কীর চারধারে ঘুরে থাকে। জাহান্নামীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ করতে এবং অন্যায় থেকে বাধা দিতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ন্যায়ের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। অন্যায় কাজে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম বটে, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম।

❑. মৃত্যু ও আখিরাতের কথা পুনঃপুন স্মরণ (ذكر الموت) এবং এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ:

মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। জন্মিলে অবশ্যই মরতে হবে–এটা এক চিরসত্য। এ থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।[৫] মানুষ যত ক্ষমতাধর হোক, যত শক্তিশালী নিরাপত্তায় বলয়ের মধ্যে থাকুক না কেন, যত সম্পদশালী হোক কিংবা যত বড় জ্ঞানী হোক না কেন–এ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু তাকে অবশ্যই গ্রাস করবে।[৬] শুধু মানুষ নয় বরং প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। পার্থিব জীবন পরীক্ষা ক্ষেত্র। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে-[৭] الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।" –এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষার জন্য। আর এই পরীক্ষার মূল বিষয় হলো সৎকর্ম। অর্থাৎ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা এবং যা পালনে আদেশ দিয়েছেন তা পালনে তৎপর থাকা। ব্যাপক অর্থে তা হলো-উন্নত নৈতিক চরিত্র অর্জন করা।

মৃত্যুর চিন্তা মানুষকে সৎপথে চলতে সহায়তা করে এবং মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মৃত্যু চিন্তা ও আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে দীনের উপর চলার পথ সহজ করে দেয়। এটা তাকওয়া ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর চিন্তা লালনের দ্বারা মানুষ নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। এই বিষয়টি সামনে রাখলে মানুষ পার্থিব সুখ-সম্পদের মোহ, লোভ-লালসা, পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা বলেন–'*তোমরা স্বাদ, উপভোগ ধ্বংসকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ কর*'।[৮] পক্ষান্তরে, মৃত্যু ও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা মানুষকে প্রতিনিয়ত পাপাচার ও অনাচারে লিপ্ত করে। এটা কল্যাণ ও নেক কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং অন্যায় ও পাপের পথ আকর্ষণ করে। কেবল অধিক পরিমানে মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণই মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি আনে এটাই মনের মধ্যে এই চিন্তা লালন মানুষকে সব অন্যায় ও অনৈতিকতা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৯]–"*লোহার মধ্যে পানি পড়লে যেমন মরিচা*

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফফ ৬১: আয়াত ০২-০৩।

[২].মূল আরবী[إن الرجل لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء ويكون لسانه مع قلبه سواء ولا يخالف قوله عمله ويأمن جاره بوائقه] হাফিয আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, খ.১, পৃ.৭৫, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ২২৩। *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং ১৩০৭১।

[৩]. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ* (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪শ প্রকাশ, ১৯৮৯), খ.০৩, পৃ.৫৫৭।

[৪]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যুহদ; হাদীস নং ২৯৮৯।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ৩৪-৩৫।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৭৮।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুল্ক ৬৭: আয়াত ০২; এছাড়াও দেখুন, আল-কুরআন (১০:০৪, ১১:০৭)।

[৮].মূল আরবী [أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হা. নং ২৩০৭; *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হা. নং ৪২৫৮।

[৯]. ইমাম বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, *প্রাগুক্ত*, খ.০২ পৃ.২৫২, হাদীস নং ২০১৪।

ধরে, তেমন মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে। এ কথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! অন্তরের এ মরিচা কিভাবে দূর করা যায়? তিনি বললেন, মৃত্যুকে স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা।"

যে ব্যক্তির মনে সর্বদা মৃত্য ও পরকালের চিন্তা জাগুরুক থাকে সে কখনো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করা থেকে দূরে থাকতে পারে না। পারে না গুনাহ, অন্যায়, মন্দ ও অশ্লীল কাজে জড়িত থাকতে। তার জীবনে প্রতিদিন নেক কাজের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং পাপের পরিমাণ কমতে থাকে। সে প্রতিটি কাজকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের মাপকাঠিতে বিচার করে চলতে শিখে।[১]

ইসলাম মতে, মৃত্যুই মানুষের জীবনের শেষ নয়। বরং মৃত্যুর মাধ্যমে তারা অনন্ত জীবনে স্থানান্তর হয়। সেখানে তাদের পার্থিব জীবনের কৃতকর্মের ভিত্তিতে প্রত্যেককে ফলাফল জানিয়ে দেয়া হবে এবং অবশ্যই প্রত্যেকে চিরস্থায়ী মহাশান্তি বা মহাশান্তি লাভ করবে।[২] সেই মহাশাস্তির থেকে রক্ষা পেয়ে মহাশান্তি লাভ করার মধ্যেই প্রকৃত সফলতা। ইরশাদ হচ্ছে [৩]
كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ
জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতের দাখিল করা হবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"

বস্তুত আখিরাতে সফলতা অর্জনই প্রকৃত সফলতা। এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। এ সম্পর্কে

রাসূল সা. বলেন[৪], তোমরা কি জানো সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ কে? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভালো জানেন। রাসূল সা. বলেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ সে ব্যক্তি যে অধিক পরিমাণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য উত্তমভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সাহাবীগণ বলেন, এর কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি বলেন– হ্যাঁ, তা হল–দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি এবং আখিরাতের প্রতি আসক্তি। যখন অন্তরে নূর প্রবেশ করবে তখন মৃত্যু আসার আগেই তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে অন্তর প্রশস্ত ও বিকাশিত হয়ে উঠে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) বলেন[৫], আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় আনসারদের জনৈক ব্যক্তি এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন মু'মিন সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তি। অতঃপর জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে বিচক্ষণ? তিনি বললেন, 'মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণকারী এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সুন্দরতম প্রস্তুতি গ্রহণকারী। মূলত তারাই হ'ল বিচক্ষণ ব্যক্তি'।

তাই বুদ্ধিমান মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবে আখিরাত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর বলেন, রাসূল (সা.) আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলেন, তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথিকের মত থাক। আর ইব্‌ন উমর (রা) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবকাশে পীড়িত অবস্থার জন্য সঞ্চার করে রেখো। আর জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিও।[৬]

মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণে বিভিন্ন কাজ করা যেতে পারে। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনি জ্ঞানার্জন, পূণ্যবানদের সাহচর্য, মুমূর্ষু ব্যক্তিদের দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ ও কবর যিয়ারত। এ মর্মে নাবী সা. বলেছেন–"তোমরা কবর যিয়ারত করো, কবর যিয়ারত তোমাদের দুনিয়া ত্যাগ এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।"[৭]

❑. স্বীয় কর্মকাণ্ডের জন্য আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয় লালন(خوف حساب الاخرة):

আখিরাত শব্দের শাব্দিক অর্থ–শেষ, পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকালকে পরিভাষায় আখিরাত বলা হয়। কুরআনে সাধারণত আখিরাত শব্দটি দুনিয়া শব্দের বিপরীত ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে আখিরাত ও ইয়ামূল আখির– ৯৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে, আর– ৪৯ বার দুনিয়া ও আখিরাত একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে উদ্দেশহীনভাবে সৃষ্টি করেনি এবং বল্গাহীনভাবেও ছেড়ে দেননি। আর মৃত্যু মানব জীবনের শেষ পরিণতি নয়।[৮] কিয়ামাত (পুনরুত্থান) সংঘটন এবং সেদিনের জবাবদিহিতা অবশ্যম্ভাবী।[৯] পার্থিব জীবন প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি কর্ম ক্ষেত্র। এই জীবনে একজন মানুষ যেমন কাজ করবে পরকালে তেমন ফল পাবে। সৎ-অসৎ ও পাপী-পূণ্যবানকে সমান গণ্য করা হবে না।[১০] সেদিন প্রত্যেককেই তার কর্মের প্রতিদানের সম্মুখীন হবে। সেদিন বাতিলপন্থীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং সত্যপন্থীরা মুক্তি লাভ করবে।[১১] সেদিন হবে সফলতা ও ব্যর্থতা ও হার-

---

[১]. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *ভাল মৃত্যুর উপায়* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ ২০০৬), পৃ.২৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ০৮।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৮৫।
[৪].ফখরুদ্দীন আল-রাযী, খ.১, পৃ.১০৬; ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, হা.৪২৬০; **ইবন মাজার ভাষ্য**[الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله]
[৫]. *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪২৫৯।
[৬].মূল আরবী [كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস নং ৬০৫৩।
[৭]. মূল আরবী [كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং ১৫৭১।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫: আয়াত ৩৬-৪০।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১৫-১৬।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ২১, আল-কুরআন (৩৮:২৮)।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ২৭-২৯।

জিতের নির্ধারণের চূড়ান্ত দিন। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১] – قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "বল, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

এ ব্যাপারে আলী রা. কথা অত্যন্ত মূল্যবান, তিনি বলেন–'দুনিয়া ক্রমান্বয়ে পিছনে সরে যাচ্ছে, আর আখিরাত সামনে এগিয়ে আসছে। দুনিয়া-আখিরাত প্রত্যেকেরই সন্তান রয়েছে। সুতরাং তোমরা আখিরাতের সন্তান হও। কেননা আজ শুধুই আমল করার সময়, নেই কোন হিসাব। কিন্তু আগামীকাল (পরকালে) শুধুই হিসাব দিতে হবে, আমল করার কোন সুযোগ থাকবে না'।[২]

কিয়ামত দিবসের জবাবদিহিতার অনুভূতি মানুষের মূল্যবোধ বিকাশ এবং যাবতীয় অন্যায় থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখতে পারে। মানব মনে স্থায়ীভাবে এই জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করতে পারলে সব ধরনের অন্যায় ও পাপাচার পথ থেকে সরে আসতে পারে। এই অনুভূতি মানুষকে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় বিচার করে প্রতিটি কাজ সম্পাদনে তাকিদ দেয়। এই বিশ্বাস মানুষের মধ্যে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতি এবং সে বিশ্বাস কেন্দ্রিক জীবনাচরণ মানুষকে ইহজগতে নৈতিক ও আর্দশ মানবে পরিণত করে। এ পবিত্র পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ মানুষ দ্বারা সঙ্গী, প্রতিবেশী, সমাজে ও রাষ্ট্র কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং এরূপ যথার্থ ধার্মিক মানুষের দ্বারা পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত উপকৃত হয়। সুতরাং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাস মানুষকে অধঃপতিত না করে নৈতিক প্রগতিতে উন্নীত করে। এটাই প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের জীবনে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছিল। আজকের মানব জাতির প্রকৃত নৈতিক উন্নতি এ পথেই সম্ভব। এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে

আখিরাতের জবাবদিহিতার এই অনুভূতি এমন এক অভ্যন্তরীণ নিয়ামক শক্তি যা সর্বতোভাবে মানুষের সাথেই লেগে থাকে। নির্জনে ও প্রকাশ্যে কোথাও সে তার নাগাল ছাড়ে না এবং সর্বক্ষণ তার প্রকৃতি ও স্বভাবে আত্মসমালোচনার কাজ জাগ্রত রাখে। এই অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার ধারণার বর্তমানে যদি কোন বাহ্যিক জবাবদিহিতা পয়দা নাও হয় তবুও মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়া এবং যুল্‌ম ও অন্যায়ের পথে চলার কোন সম্ভবনা অবশিষ্ট থাকে না।[৩]

কিয়ামত দিবসের কিছু বাস্তবতা: কিয়ামত দিবস এক মারাত্মক ভয়াবহ দিবস।[৪] এই দিন প্রত্যেক মানুষকে উপস্থিত করা হবে এবং প্রত্যেককে তার যাবতীয় কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেককে তার নিজ কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন কেউ কোথাও পালাতে বা আত্মগোপন করতে পারবে না। এ মর্মে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে[৫] –

يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ- كَلَّا لَا وَزَرَ-إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ- يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ-

"সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চতে রেখে গিয়েছে।"

কুরআন এ সম্পর্কে যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে তা অতি সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল:

কিয়ামত দিবসে সকল ধরনের বন্ধন ও রক্ত-আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সেদিন কেউ কারো খোঁজ-খবর নেবে না এবং কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না। সেদিন মানুষ একা হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৬] –

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ- فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ- تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ -

"এবং যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অন্যের খোঁজ-খবর নেবে না এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। "

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "কিয়ামত দিবসে তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না।"[৭]

সেদিন এমন গুরুতর অবস্থা হবে যে, মানুষ নিজ ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী লোক দেখে দূরে সরে যাবে। এই আশঙ্কায় না জানি এদের কেউ কোন পাপের ভার চাপিয়ে দেয়। সেদিন বন্ধু বন্ধুর কোন খোঁজ নেবে না। থাকবে না কোন সাহায্যকারী। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে। কেউ কারো পাপভার বহন করবে না যদিও সে আত্মীয় হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে[৮]– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ "যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, এবং তার মাতা, তার পিতা, তার

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ২৬।

[২]. মূল আরবী [وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل] *সহীহ আল-বুখারী*, (তা'লীক) কিতাবুর রিক্বাক, অনুচ্ছেদ নং ২৬৮৬; ইবনু আবী শাইবা, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৩৪৪৯৫।

[৩]. সালাহউদ্দীন, *মৌলিক মানবাধিকার*, অনু. মাও. মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, (ঢাকা : ই ফা বা, ১ম প্রকাশ, ২০০৪),পৃ. ১৮০।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা ২২:১-২; ২০:১০৫-১০৮, ২৭:৮৭, ৪৬:৪৭-৪৯, ৪০:১৮; ৭৭:৭-১৫, ৮২:১-৫,৬৯:১৩-১৮,৭৩:১৪, ৮৯:২১-২৪; ৭৫:২২-২৫।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫: আয়াত ১০-১৩।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিনূন ২৩ : আয়াত ১০১-১০৪।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্‌তাহিনাহ ৬০: আয়াত ০৩, আল-কুরআন (৩১:৩৩)।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা 'আবাসা ৮০: আয়াত ৩৩–৩৭।

স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।” অন্যত্র বলা হয়েছে[১]–يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ-“সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।”অন্যত্র এসেছে-[২] وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ “প্রত্যেককে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারও ভার করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যবর্তন তোমাদের প্রতি-পালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।” আরও বলা হয়[৩] - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى “আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়।”

সেদিন প্রত্যেকে ভয়ে নতজানু হয়ে যাবে। মানুষ তার পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য-গোপন ও ছোট-বড় যাবতীয় ভালো-মন্দ কর্মকাণ্ড উন্মুক্তভাবে লিখিত অবস্থায় দেখতে পাবে।[৪] সেদিন কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না।[৫] ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন, ‘তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট’।[৬] এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৭] وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا “সেদিন উপস্থিত করা হবে প্রত্যেকের আমলনামা। অতঃপর তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদের দেখবে আতংকিত। এ সময় তারা বলবে, হায় দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন আমলনামা যে, ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, সবকিছুই লিখে রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। বস্তুতঃ তোমার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না’।”

সেদিন মানুষ বাঁচার জন্য তার কৃত পাপ ও অপরাধ অস্বীকার করবে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। প্রত্যেক পাপী ও অপরাধীর জিহবা, হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি সব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৮]–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

“যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।”

সেদিন অপরাধী স্বীয় পাপভার বহন করবে এবং যাদের বিপথগামী করেছিল তাদের পাপভারও।[৯] কোন অপরাধী পাপীর কাছ থেকে কোন ধরনের মুক্তিপণ বা কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। পাপ ও অপরাধ বিনিময়ে শাস্তি ছাড়া অন্য কোন বিনিময় থাকবে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১০]– وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ “আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো নিকট থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না, এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশ লাভজনক হবে না, আর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।”

সেদিন প্রত্যেকের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে। প্রত্যেককে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী যথার্থ প্রতিদান দেয়া হবে।[১১] কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।[১২] যার পূণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে হবে মহাসফলকাম, আর যার পূণ্যের পাল্লা হালকা হবে সে হবে মহাক্ষতিগ্রস্থ। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে[১৩] – وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًاوَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ “কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদন্ড। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণও ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।”

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

“আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পালা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পালা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) যুল্ম করত।”[১৪]

---

[১] .আল-কুরআন, সূরা আদ্-দুখান ৪৪: আয়াত ৪১-৪২।
[২] .আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‘আম ০৬ : আয়াত ১৬৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন (৩৫:১৮) (৫২:২১)।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ১৮।
[৪] . আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ২৮-২৯, আল-কুরআন (৯৯:৬-৮)।
[৫] .আল-কুরআন, সূরা আলে-‘ইমরান ০৩: আয়াত ৩০, আল-কুরআন (৬৯:১৮)।
[৬] .আল-কুরআন, সূরা আল-কাহফ ১৮: আয়াত ৪৯ ।
[৭] .আল-কুরআন, ১৭:১৪।
[৮] . আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২৪-২৫, আল-কুরআন(৩৬:৬৫)।
[৯] . আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্ল ১৬: আয়াত ২৫।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১২৩।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৭০।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮১।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া ২১: আয়াত ৪৭, আল-কুরআন (০৪:৪০)।
[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ ০৭: আয়াত ০৮-০৯, আল-কুরআন (২৩ : ১০২-১০৩)।

সেদিন পাপী, অপরাধী ও কাফিরদের চেহারায় ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠবে।[১] সেদিন তাদের চেহারার উপর থাকবে মলিনতা, কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে।[২] সেদিন পাপীরা শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য অনেক অনুতাপ ও আকুতি করে ফরিয়াদ করবে। তারা যে কোন মূল্যে শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাবে কিন্তু তাদের সে সব আকুতি না কোন কাজে আসবে। আর না তাদের আযাব থেকে রেহাই দেবে।[৩] এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে[৪] –

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ....فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"হায় তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে নতশিরে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় (পৃথিবীতে)পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি।...তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতকে যে ভুলে গিয়েছিলে, তার স্বাদ তোমরা আস্বাদন কর। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, আর তোমরা যা করতে, তার জন্য তোমরা স্থায়ী আযাব ভোগ কর।" অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-[৫]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ- وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না।এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে নিস্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল।অতএব শাস্তি ভোগ কর; যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

কাজেই সেদিন মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষের উচিত আল্লাহ নির্দেশিত নৈতিক পথে চলা। কুরআনে বলা হয়েছে-[৬]

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ

"তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেদিন আসার পূর্বেই, যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোনো উপায় নেই। সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য প্রতিরোধকারীও থাকবে না।"[৭]

❑. তাকওয়া অবলম্বন (التقوي):

আরবী তাকওয়া শব্দটি وقى বা تقى থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ-রক্ষা করা, বাঁচান, সতর্ক ও সজাগ থাকা;[৮] এছাড়া কম কথা বলা(قلة الكلام), আল্লাহভীতি, সংযম অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআনে তাকওয়া ১৭ বার, বহুবচনে মুত্তাকী ৫০বার,বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ১৯৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তাকওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী বলেন[9], তাকওয়া এবং মূলের সাথে সংযুক্ত ক্রিয়া ও বিশেষ্য পদগুলো দু'টি অর্থ নির্দেশ করে। ক). আল্লাহর ভয়, যা বিজ্ঞজনের মতে, প্রজ্ঞার প্রারম্ভ। খ).সংযম তথা অন্যায় থেকে জিহ্বা, হাত ও হৃদয়কে বিরত রাখা, এখান থেকে সৃষ্টি হয় ন্যায়পরায়নতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সদাচরণ।

পরিভাষায় 'মহান আল্লাহর অবাধ্য ও নাফরমানীমূলক কাজগুলো পরিহার করে তাঁর আদেশাবলী পালনপূর্বক সদা অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখাকেই তাকওয়া বলে'। তবে তাকওয়া ও মুত্তাকীর পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন:

•উমর ইবন আবদুল আযীয(মৃ.১০১হি.)বলেন[১০]-"দিনে সিয়াম পালন ও রাতে সালাত দাড়ানো এবং উভয়ের সংমিশ্রণের নাম তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বর্জন করা এবং যা তিনি ফরজ করেছেন তা পালন করাই তাকওয়া।"

•ইবরাহীম ইবন আদহাম রহ. (মৃ.১৬৫হি.) বলেন–"তাকওয়া হল, সব সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকা, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও কোন বিষয়ে অতিরঞ্জন থেকে বেঁচে থাকা।"[১১]

•ইমাম আল-কুরতুবী (মৃ.৬৭১হি.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মুত্তাকীর পরিচয় সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে উত্তম দু'টি উদ্ধৃতি হলো[১২]– ক. 'মুত্তাকী হল সে ব্যক্তি, যিনি কথা বললে আল্লাহর জন্য বলেন এবং কোন কাজ করলে আল্লাহর জন্য করেন।' খ.'মুত্তাকী হল তারা, যাদের অন্তরসমূহ থেকে আল্লাহ প্রবৃত্তির কামনা দূরীভূত করেছেন।'

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আর-রাহমান ৫৫: আয়াত ৪১।
[২]. আল-কুরআন, সূরা 'আবাসা ৮০: আয়াত ৪০-৪২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'আরিজ ৭০: আয়াত ১০–১৮।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজ্দাহ ৩২: আয়াত ১২,১৪।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ৩৬-৩৭।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাজ্দাহ ৩২: আয়াত ১২,১৪।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ৪৭।
[৮]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩।
[9]. Abdullah Yusuf Ali, *ibid*, p.17, টীকা.২৬
[১০].মূল আরবী [ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছুর ফীত তাফসীরি বিল-মাসূর* (বৈরুত :দারুল ফিকর, ১৯৯৩),খ.০১, পৃ.৬২।
[১১]. মূল আরবী [الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات] ইবনুল কাইয়িম, *মাদারিজুস সালিকীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.২১।
[১২]. মূল আরবী [وقال أبو سليمان الداراني: المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات] ও [وقال أبو يزيد البسطامي:المتقي من إذا قال قال لله ، ومن إذا عمل عمل لله] ইমাম আল-কুরতুবী,*আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন*, (বৈরুত: দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫), খ.০১, পৃ.১৬১।

•নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী বলেন[১], "মুত্তাকী হল, যিনি আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় থেকে সতর্কতার সাথে নিজেকে বিরত রাখেন।"

আল-কুরআনে মুত্তাকীদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তারা আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্‌তা, নাবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসী, সালাত কায়েমকারী, যাকাত আদায়কারী, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত ও অসহায়দের দান-সাদাকাকারী, প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং কষ্ট ও দুর্দশায় ধৈর্যধারণকারী।[২] সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয়কারী, ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষকে ক্ষমাকারী। আল্লাহকে স্মরণকারী, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী জেনে-বুঝে কোন পাপ বা অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে না।[৩] তারা সদা সত্যের পথ অবলম্বনকারী।[৪] তারা আল্লাহর অনুগত, তাঁর ভয়ে ভীত, তাঁর স্মরণকারী, ভদ্র-বিনম্র।[৫] আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বর্জনকারী।[৬]

তাকওয়া কিছু নিদর্শন রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বলেন,[৭] "তাকওয়ার নিদর্শন হলো-বিপদে ধৈর্য, তাকদীরে সন্তুষ্ট, নি'আমতের উপর শোকর ও আল-কুরআনের বিধান নত হয়ে মেনে নেয়া।" ইবনুল মুবারক রহ. বলেন,[৮] দাউদ ('আ.) স্বীয় পুত্র সুলাইমান ('আ.) কে বলেন, "তাকওয়ার চিহ্ন হলো-বিপদে আল্লাহর উপর পূর্ণরূপে ভরসা করা, প্রাপ্ত রিজকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট থাকা ও অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি উত্তরূপে মুখাপেক্ষীহীন থাকা।"
বস্তুত তাকওয়া এক অন্তর শক্তি, যা মানুষের অন্তরে সুপ্ত থাকে, বাহ্যিক বেশাভুষা এর চিহ্ন বহন করে না। এটা মানুষকে আল্লাহর আদেশাবলী পালনে তৎপর, নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকতে সতর্ক এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁর অভিমুখী রাখে।

তাকওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তর-শিরক, কুফর ও নিফাক থেকে বেঁচে থাকা। দ্বিতীয় স্তর, এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। তৃতীয় স্তর, অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহর স্মরণ, তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। এ স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

রাগিব ইস্পাহানী বলেন, তাকওয়ার তিনটি স্তর বিন্যাস করেছেন। ক. সর্বপ্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকা। এ স্তর সব মানুষের জন্য ওয়াজিব। খ. সন্দেহপূর্ণ জিনিস বর্জন করা, এটা উত্তম এবং মাধ্যম স্তরের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। গ. কিছু বৈধ ও স্বল্প প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। এটা নাবী-রাসূল ও উচুমানের পূণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য স্তর।[৯]

তাকওয়া মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ, কুপ্রবৃত্তির দমন ও মহৎ গুণ অর্জনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এটা মানুষের মধ্যে সৎ কাজের প্রেরণাদায়ক এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁচার এক শক্তিশালী অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটা কুপ্রবিত্তির দমনের মূল উপাদান। এটি এমন এক স্বয়ংক্রিয় শক্তি, যা উন্নত মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ও সুন্দর সমাজ গঠনে, সমাজের শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কার্যকরী উপকরণ। এটা সামাজিক নিরাপত্তা, সম্প্রীতি, সংহতি ও সামাজিক আস্থা গড়ে তোলে এবং সমাজকে সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও শান্তিময় করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ও পারস্পরিক অধিকার রক্ষা অনেকাংশ নির্ভর করে সততা ও আন্তরিকতার উপর। এসব ক্ষেত্রে তাকওয়ার চেয়ে উত্তম বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। এজন্য তাকওয়ার অর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[১০] – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" যদি তাঁকে যথার্থভাবে ভয় করতে অসামর্থ্য হয় তবে যেন যথাসাধ্য ভয় করার চেষ্টা করে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[১১] – فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ -"তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের কল্যাণের জন্য।"

তাকওয়া কিভাবে একজন মানুষের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা সৃষ্টি করে এ প্রসঙ্গে অসংখ্য ঘটনার একটি ঘটনা হলো:
নাফে' রহ. বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. সাথে মদীনার এক প্রান্তে গেলাম, আর তাঁর সাথে কয়েকজন সঙ্গী ছিল। তারা খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছালো, এমন সময় সেদিক দিয়ে এক রাখাল যাচ্ছিল। আবদুল্লাহ রা. তাকে বললেন, এসে হে রাখাল! এই দস্তরখান থেকে আহার কর। সে বলল, আমি রোযাদার। আবদুল্লাহ রা. তাকে বললেন, এরূপ তীব্র গরমের দিন তুমি পাহাড়ের পাদদেশে গিরিপথে মেষ চড়াচ্ছ, অথচ তুমি রোযাদার। সে বলল, আমি আমার বিরাণ দিনগুলো এভাবে কাটাই। আবদুল্লাহ রা. তাঁর কথায় অভিভূত হলেন এবং বললেন তুমি কি তোমার মেষপাল থেকে

---

১. মূল আরবী [اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة] কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়দাভী, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.৯৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২-৫, আল-কুরআন (০২ : ১৭৭)।
৩. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৩৪-১৩৫।
৪. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৩৩।
৫. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯ : আয়াত ২৩।
৬. আল-কুরআন, সূরা আন-নাযি'আত ৭৯: আয়াত ৪০-৪১।
৭. মূল আরবী [من صبر على البلاء ورضى بالقضاء وشكر النعماء وذل لحكم القرآن] জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছূর*, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৬২।
৮. মূল আরবী [لحسن توكله على الله فيما نابه ولحسن رضاه فيما أتاه ولحسن زهده فيما فاته], *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৬২।
৯. দেখুন, রাগিব ইস্পাহানী, *আয-যারীআহ ইলা মাকারিমিশ শরী'আহ* (কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৭), পৃ.২২৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১০২।
১১. আল-কুরআন, সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ১৬। আরও দেখুন, আল-কুরআন, ০৫:৪৪।

একটি মেষ বিক্রি করবে? আমরা এর মূল্য তোমাকে দিব এবং তোমাকে গোশতও দিব যা দিয়ে তুমি ইফতার করবে। সে বলল, এগুলো আমার নয়। এগুলো আমার মালিকের। তিনি বললেন, তাতে কী হয়েছে? তোমার মালিককে গিয়ে বলবে যে, নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে খেয়ে ফেলেছে। সে আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে বলল, *'তাহলে আল্লাহ কৈ রইলেন'*?–এ কথা বলে সে চলে গেল। আবদুল্লাহ রা. রাখালের সেই উক্তি বারবার বলছিলেন, *'আল্লাহ কৈ রইলেন'*? তাঁকে এই কথাটি এতই মুগ্ধ করল যে, তিনি মদীনায় গিয়ে রাখালের মুনিবের কাছে লোক পাঠালেন। এবং মালিকের কাছ থেকে রাখাল ও মেষগুলো কিনে নিলেন। এরপর রাখালটিকে মুক্ত করলেন এবং মেষগুলোও তাকে দান করলেন।[১]
এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে, তাকওয়াই একজন সাধারণ রাখালকে অন্যায় ও অনৈতিক কাজ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এবং এটা তার মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ বিকশিত করেছে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমাদের কতজন মনের এ স্তরে পৌঁছেছে, যা অর্জন করেছিল চৌদ্দশত বছর আগের ঐ রাখাল? আমাদের কতজন ঐ রাখালটির মত আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে, কতজন স্ব স্ব জীবনের সকল চিন্তা ও কর্মের জন্য নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে দায়ী মনে করে? –এটাই সে ধারণা যা কুরআন আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছে, যার প্রত্যেকটি সদস্য হবে দায়িত্বশীল।

প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে, আইন-শৃঙ্খলায় নিযুক্ত বাহিনীর করে এবং দণ্ডবিধি ও শাস্তি ভয় দেখিয়ে সাময়িক কিছু উপকার পাওয়া গেলেও মানুষকে অপরাধ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, তাকওয়া এমন এক নৈতিক শক্তি, যা মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার অন্যায়, অনাচার ও পাপাচার থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আত্মিক ব্যাধিসমূহ দূর করে। এ শক্তি অপরাধ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে আইন ও শাস্তির ভয়ের চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী ও কার্যকর। এ শক্তি মানুষের নৈতিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধিতার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে। এর মাধ্যমে নৈতিক স্খলন ও সামাজিক আনাচার রোধ সম্ভব। এর দ্বারা মানুষের সৎ গুণাবলীর উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী যে, আইয়্যামে জাহেলিয়ার চরম অসভ্য ও বর্বর আরব জাতি কুরআন ও রাসূল সা. সংস্পর্শে এসে তাকওয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এক অভূতপূর্ব নৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিল। তারা যথার্থ তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে উচু মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। তাকওয়াই সেই শাশ্বত শক্তি, যা সর্বযুগের মানুষের মনে আল্লাহর ভয় পয়দা করে মানুষকে যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম। প্রকৃত মুত্তাকী ব্যক্তি যদি কোন ভুল বা অন্যায় করে তবে তাক্বওয়াই তাকে তওবা করে নিজের পাপ কাজ অকপটে স্বীকার করে দুনিয়াবী যেকোন শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নেয়। এর বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় সাহাবীদের জীবনে। মা'ইয ইবন মালিক (রা.) ব্যভিচার করার পর পরকালীন শাস্তির ভয়ে তওবা করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে। অতঃপর তাকে রজম করা হয়। একইভাবে আযদ বংশের গামেদী গোত্রীয় এক মহিলা তাক্বওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করে। অতঃপর তাকেও রজম করা হয়।[২] তাকওয়াই সাহাবীদেরকে নিজের অপরাধ স্বীকার করে দুনিয়াবী সর্বোচ্চ শাস্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই মানুষের মাঝে তাকওয়া জাগ্রত করতে পারলে সত্যিকারভাবে নীতি-নৈতিকতা বিকাশ হবে।

তাকওয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।[৩] এর দ্বারা মানুষের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং এর দ্বারাই মুত্তকীরা আল্লাহর সাহায্য লাভে ধন্য হয়।[৪] এর দ্বারা শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।[৫] এটা আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ, রহমত ও সাহায্য লাভের মুখ্য মাধ্যম। আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভ, ক্ষমা, পাপ মুক্তি ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এর বিকল্প নেই।[৬] এরই মধ্যে মানুষের যাবতীয় দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি এবং সকল কল্যাণ ও সফলতা নিহিত। এটাই মানুষের পাপ মোচনকারী এবং মানুষকে পবিত্র জীবনের দিকে পরিচালনাকারী নিয়ামক শক্তি। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৭]–وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- "যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার উপায় বের দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করেন রিয্‌ক।" তা মানুষের প্রয়োজনসমূহ সহজে পূরণ করে দেয় এবং সমস্যা-সংকটের অবসান ঘটিয়ে জীবিকায় প্রাচুর্য আনে।[৮] ইরশাদ হয়েছে[৯] وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا- "আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যা সমাধান সহজ করে দিবেন।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১০] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে

---

১. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৯হি.) খ.০২ পৃ.১৮৮।
২. দেখুন, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল হুদূদ, হাদীস নং ১৬৯১, ১৬৯৫ ও ১৫৯৬; *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মুহারিবীন, হা. ৬৪৩০।
৩. আল-কুরআন, ১০:৬৩-৬৪; ২৪: ৫২।
৪. আল-কুরআন ০৭:৯৫, ১৫৬, ১৬:১২৮।
৫. আল-কুরআন ০৩:১২০, ১২৩-১২৫।
৬. আল-কুরআন ৩:৭৬, ০৯: ০৪, ৩৩:৭০-৭১, ৪৫:১৯, ৬৫: ০৫, ।
৭. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ০২-০৩।
৮. আল-কুরআন ৬৫:০২-০৪, ৯২:৫-৭ ।
৯. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ০৪।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭: আয়াত ২৮।

তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
উদ্ধৃত আয়াতসমূহে তাকওয়ার পার্থিব বহুবিদ কল্যাণ ধরা হয়েছে। সুফিয়ান আস-সাওরী (মৃ.১৬১হি.) যথার্থই বলেছেন– *"আল্লাহ্‌কে ভয় করে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি অভাবগ্রস্ত দেখিনি।"*[১]

মানুষের নিকট মর্যাদার মাপকাঠি পার্থিব ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মানজনক চাকুরী, জাতীয়তা, বংশমর্যাদা, প্রতিভা ও সৌন্দর্য ইত্যাদি। ফলে মানুষ মর্যাদার এ সব উপাদান অর্জনে মরিয়া এবং এজন্য গর্বিত। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট এগুলো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। বরং মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাকওয়া তথা উন্নত নৈতিকতা ও সততা। তাকওয়া মানব সমাজে সাম্যের রক্ষাকবচ এবং বর্ণ-বৈষম্য নির্মূলকারী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইসলামে একজন মানুষের মূল্যায়ন ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-মূর্খ, সাদা-কালো, কুৎসিত-সুন্দরের ভিত্তিতে নয় বরং তাকওয়ার ভিত্তিতেই তা বিচার্য। তাকওয়ার এই ধারণা সমাজে থেকে সব ধরনের ভেদাভেদ নির্মূল করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। তাকওয়ার ভিত্তিতে যে যত বেশী অগ্রণী সে ততবেশী মর্যাদাবান। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[২]

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
> "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।"

উল্লেখিত আয়াতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে তাকওয়া তথা নৈতিকতা ও সততাকে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত পার্থিব কোন বস্তু নয় বরং তাকওয়াই মানুষের মর্যাদার প্রকৃত মানদণ্ড হিসেবে যথার্থ। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি তাকওয়াকে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকঠি ও মর্যাদার মানদণ্ড গণ্য করা হয়, তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন যথার্থরূপে সম্ভব হবে। বিশেষ করে রাষ্ট্র নিয়োজিত সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তার পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতার সাথে তাকওয়া, আমানতদারি, সততা ও কর্তব্যপরায়নতা ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা উচিত। তাহলে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজ থেকে দুর্নীতি, নৈরাজ্য ও অশান্তি বন্ধ হয়ে যাবে।

তাকওয়াই সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা। এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, 'অধিক হাদীছ বর্ণনা প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং আল্লাহ ভীতিই হ'ল প্রকৃত জ্ঞান'।[৩] তাকওয়া কল্যাণকর জ্ঞান, দ্বীনের সঠিক বুঝ, ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি, হিদায়েত ও সত্য লাভের মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ- "আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ্ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।" উচু তাকওয়া অবলম্বনের কারণে মহান আল্লাহ খিজির('আ.) কে বিশেষ জ্ঞান দান করেন। ইরশাদ হচ্ছে[৫]– فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا "অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছি এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।"

তাকওয়াই সবচেয়ে বড় পূণ্যের কাজ ও প্রকৃত দ্বীনদারী। তাকওয়াই যাবতীয় ইবাদতের নির্যাস। যাবতীয় ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা। এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে[৬]– لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَاوَلَادِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ "আল্লাহ্ নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকাওয়া।"

তাকওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না দমনের শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশেষ করে তা শয়তানের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন[৭]– إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ "যারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহ্‌কে স্বরণ করলে তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।"

পার্থিব জীবনের লোভ-লালসা ও ধোঁকা থেকে রক্ষার প্রধান উপকরণ তাকওয়া। মহান আল্লাহ বলেন-[৮] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ- হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং মহাপ্রতারক(শয়তান) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলতে না পারে।

---

১. মূল আরবী [اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا]আবূ হামিদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ. ২৪২।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : আয়াত ১৩।
৩. মূল আরবী [ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية] আবূ নুআইম ইসপাহানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০১, পৃ. ১৩১।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৮২, আরও দেখুন, আল-কুরআন ০২:০১-০২, ০৬:১৫৩।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮: আয়াত ৬৫।
৬. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২ : আয়াত ৩৭, আল-কুরআন ০২: আয়াত ১৮৯।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ২০১।
৮ .আল-কুরআন, সূরা লুক্‌মান ৩১ : আয়াত ৩৩; আল-কুরআন ৫৯: আয়াত ১৮।

তাওকয়া যাবতীয় আমল(কর্ম) কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আদম ('আ.) দুই সন্তান হাবিল ও কাবিল, তন্মধ্যে হাবিল মুত্তাকী ছিল, সে কারণে মহান আল্লাহ তার কুরবাণী কবুল করেছিলেন। আর কাবিল নাফরমান হওয়ার কারণে মহান আল্লাহ তার কুরবানী কবুল করেননি। এভাবে সর্বদাই মহান আল্লাহ মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন, আর পাপীদের আমল প্রত্যাখ্যান করেন। মহান আল্লাহ বলেন[১]–إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ-"অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন।"

তাকওয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ন্যায়পরায়নতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিয়ামক শক্তি। এটা মানুষের দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে এবং মানুষকে যুলম, অন্যায়, দুর্নীতি ও অনাচার থেকে রক্ষা করে।[২] আর যে সমাজের লোকের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও পরকালের জবাবদিহিতা থাকে না, সে সমাজে ন্যায়বিচার থাকে না। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৩]– اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সম্যক খবর রাখেন।"

তাকওয়া মানুষের মধ্যে সত্য-মিথ্যা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যসূচক সুস্থ বিবেক ও সূক্ষ্ম অন্তর দৃষ্টি সৃষ্টিকারী অতি মূল্যবান উপাদান। যার দ্বারা প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তি সহজেই সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তা ব্যক্তির মধ্যে সত্য গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করে। এটা ব্যক্তির মাঝে তার কামনা-বাসনা, কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা ও আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৪] –

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ-

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায় –অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মংগলময়।"

তাকওয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পরোপকার, ওয়াদা-অঙ্গীকার-শপথ রক্ষা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রতকরণ সহ বিভিন্ন উন্নত নৈতিক গুণ সৃষ্টি করে। এটা ব্যক্তির চারিত্রিক মাধুর্যতা বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ বলেন[৫]– بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ- "হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।"

তাকওয়ার পরকালীন কল্যাণ ব্যাপক। এটা পরকালীন চিরস্থায়ী সফলতা ও মুক্তির উত্তম পাথেয়।[৬] এটা মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষাকারী ও পাপমোচনকারী।[৭] মুত্তাকীরা আল্লাহর বন্ধু ও সাথী।[৮] পরকালে তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই।[৯] তাদের রয়েছে শুভ পরিণতি, মহাপুরস্কার, উচু মর্যাদা ও অগণিত নিয়ামতবেষ্টিত জান্নাত। মহান আল্লাহর বাণী-[১০] لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ "যারা তাকওয়া অর্জন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি'।" আরও বলেন[১১] وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে তাদের সাফল্যসহ নাজাত দেবেন। কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর তারা চিন্তিতও হবে না।" অন্যত্র আরও বলেন[১২], إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ "যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" অন্যত্র আরও ইরশাদ হয়েছে[১৩]-

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ- هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ- مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ - ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ- لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيد

"আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের কাছেই আনা হবে। এটাই, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী অধিক সংরক্ষণশীলদের জন্য। যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হত। তোমরা তাতে শান্তির সাথে প্রবেশ কর। এটাই স্থায়িত্বের দিন। তারা যা চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।"

তাকওয়া প্রয়োজনীয়তা : বর্তমানে পাপাচারপূর্ণ সমাজকে পাপাচার, মন্দকাজ ও নৈতিক অধঃপতন থেকে উত্তরণের সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মানুষের মধ্যে তাক্বওয়া সৃষ্টি করা। মানুষ যখন জানবে ও চিন্তা করবে যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টি, শ্রবণ ও পর্যবেক্ষণ সর্বত্রই সমানভাবে কার্যকর। তিনি প্রতিনিয়ত সবার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ছোট-বড় যাবতীয় কথাবার্তা কথা

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ২৭-৩০।
[২]. আল-কুরআন ০২:২৪১; ০২:১৮০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-মা'য়িদাহ ০৫ : আয়াত ০৮।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ২৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৭৬।
[৬]. আল-কুরআন ০২: ১৯৭; ২৪:৫২,৭৮:৩১, ৭৯:৪০-৪১।
[৭]. আল-কুরআন, ৬৫:০৫।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-জাছিয়াহ ৪৫: আয়াত ১৯, আল-কুরআন, ০২:১৯৪, ১৬: ১২৮, ৫৮:৪-৭।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৩৫।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: ১৫, আল-কুরআন০৩:১৩৩, ১০:৬২-৬৪; ১৯:৬৩, ৭২, ৮৫; ৩৯:২০,৭৩; ৪৩:৬৭; ৪৪:৫১,৫৪; ৪৭:১৫; ৫৪:৫৪-৫৫।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৬১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুল্ক ৬৭: আয়াত ১২, আরও দেখুন, আল-কুরআন ২০:১৩২, ১১:৪৯, ৩৮:৪৯।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ৩১-৩৫, আল-কুরআন (৫৫ : ৪৬)

শুনছেন, সব কর্মকাণ্ড দেখছেন এবং সব চিন্তা-কল্পনা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং ফিরিশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করছেন। তাঁর দৃষ্টি বাইরে কোন কিছুই নেই। তাঁকে ফাঁকি দেয়া যায় না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে[1] وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-"তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" অন্যত্র এসেছে[2]- يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ-"চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।"আরও বলা হয়[3]

سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ- لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

"তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্য বিচরণ করে, তারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তারা সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহ্র আদেশ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।" এ প্রসঙ্গে আরও যা যা ইরশাদ হয়েছে তা হলো-

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ....وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ তুমি যে কোন অবস্থায় থাক ...এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক-যখন তোমরা তাতে লিপ্ত হও।"[4]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক অবগত।[5]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ-إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ-مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটবর্তী। স্মরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চরণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটই রয়েছে।"[6]

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

"হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবগত।"[7]

أَلَاإِنَّ لِلَّهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاأَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"সাবধান, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই; তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি অবশ্যই জানেন এবং যেদিন তাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।"[8] إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً "নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"[9] وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ-"তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্কেও ভয় করিও। আর জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হতে যাচ্ছ।"[10]

উল্লেখিত আয়াতসমূহের আলোকে মানুষ যদি সর্বদা মনে এই চিন্তা লালন করে যে, মহান আল্লাহর তার সব আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড দেখছেন, সব কথা শুনছেন, সব পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করছেন। মানুষের প্রতিটি কর্ম ও আচরণ দু'জন ফিরিশতা প্রতিনিয়ত রেকর্ড করছেন। আর এ ব্যাপারে পরকালে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিও করতে হবে। তাই এই মহাসত্তার দৃষ্টির সামনে তাঁর নির্দেশ উপেক্ষা করে পাপ ও অন্যায় কাজ করা চরম ধ্রষ্টতা। তাহলে এই অনুভূতিই তাকে সব মন্দ ও অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখবে। এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূল (সা.) বলেন, 'যেখানেই তুমি থাক, আল্লাহকে ভয় কর।'[11]

তাকওয়া অর্জনে পন্থা: তাকওয়া অর্জনের গুরুত্বপূর্ণপন্থাগুলো হল: ক. আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। তাঁর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।[12] খ. দ্বীনি জ্ঞানার্জন এবং নিয়মিত কুরআন ও সুন্নাহ চর্চা। গ. নিষ্ঠার সাথে সব

---

[1]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭: আয়াত:০৪।
[2]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ১৯।
[3]. আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩ : আয়াত ১০-১১।
[4]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০ : আয়াত ৬১।
[5]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮ : আয়াত ০৭; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১০:৪৬, ২০:৪৬, ৩৩:৫১, ৪২:২৫, ৬৫:১২।
[6]. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত ১৬-১৮, আল-কুরআন (৮২:১০-১২)।
[7]. আল-কুরআন, সূরা লুক্মান ৩১ : আয়াত ১৬।
[8]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৬৪।
[9]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' : আয়াত ৩৬।
[10]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২৩।
[11].মূল আরবী[اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হা.১৯৮৭; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.৫, পৃ১৫৩, হা.২১৩৯২।
[12]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ৩২।

ইবাদত করা এবং হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। ঘ. সৎ ও পূণ্যবানদের সাহচর্য অবলম্বন। ঙ.বিগত পূণ্যবানদের জীবনী পাঠ। চ.সত্যানুরাগ ও সত্য সন্ধানী হওয়া।[১] ছ.মনকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণ(যিকর) এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করার মাধ্যমে সজীব রাখা। ছ. আত্মশুদ্ধির অনুশীলন। জ. কিয়ামুল লাইল বা রাত জেগে ইবাদত।[২]

❑.বিশুদ্ধ নিয়্যত(النية الصحيحة) ও ইখলাস (الاخلاص):

নিয়্যত শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা,অভিপ্রায় ও সংকল্প। পরিভাষায়'কোন কাজ করার সময় মানব মনে যে উদ্দেশ্য থাকে যে কারণে সে কাজটি করতে উদ্যোগী হয় তাই নিয়্যত।'.কাযী আল-বায়যাভী(মৃ.৬৯১হি.)বলেন, "বর্তমান বা ভবিষ্যতের কল্যাণ লাভ বা অকল্যাণ রোধের জন্য কোন কাজের প্রতি মনের অভিনিবেশ।"[৩] নিয়তের দু'ধরনের হয়ে থাকে। ক. ইখলাস: কাঙ্ক্ষিত কাজটি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য খাঁটিভাবে সম্পন্ন করা হয় তবে তা ইখলাস। খ. রিয়া: যদি কাঙ্ক্ষিত কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া মানুষের প্রশংসা, সুখ্যাতি বা পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য সম্পন্ন করে তবে তা রিয়া।

ইসলামে নীতিশাস্ত্রে সব কাজের ক্ষেত্রে নিয়্যত অতি গুরুত্বপূর্ণ। কর্মের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত ছাড়া কোন ইবাদত হয় না। সু-নিয়্যত থাকলে কৃত কর্মের সাওয়াব, কল্যাণ ও সুফল পাওয়া যাবে। আর নিয়ত মন্দ হলে ভালো কাজ করলেও কোন কল্যাণ নেই। যেমন মসজিদ নির্মাণ একটি পূণ্যের কাজ কিন্তু মন্দ নিয়্যতে তা করলে তাতে কোন সাওয়াব নেই। মন্দ নিয়্যতে নির্মিত একটি মাসজিদকে কুরআনে '*মাসজিদে দিরার*' বলা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে-[৪] وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ...وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - আর যারা মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরীর তাড়নায় ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে...তারা অবশ্যই শপথ করবে যে,'আমরা কেবল ভালো চেয়েছি'। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আরও বলা হয়েছে[৫] - قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ "বল,'তোমরা যদি তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা জানেন।"

উদ্ধৃত আয়াতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত ও পূণ্যের কাজের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এবং এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইখলাসবিহীন 'আমল ব্যর্থ তা যত চমৎকার হোক না কেন। এজন্য রাসূল সা. বলেন[৬]–"সব কাজ নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোন মেয়েকে বিয়ে করার নিয়াতে হয়েছে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।"

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন,"অনেক ছোট আমল আছে নিয়ত যাকে বড় করে দেয়, অনেক বড় আমল আছে নিয়ত যাকে অতি ছোট করে দেয়।"[৭]

ইসলামে নিয়্যতকে 'আমল বা কর্ম অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কোন কাজ কি উদ্দেশ্যে ও কোন পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে তা বিচারের ভিত্তিতেই তার মূল্যায়ন হবে। কোন সৎকর্ম সঠিক পন্থায় করা হয় এবং তাতে যদি মানুষের সত্যিকার কল্যাণও নিহিত থাকে কিন্তু তা যদি অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, কেউ যদি দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে ডাকাতি বা চুরি করে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে বিতরণ করে তা অন্যায় বলে গণ্য হবে। আবার কেউ যদি স্বীয় যশ -খ্যাতির জন্য দান করে অথবা লোকদের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সঠিক পন্থায় উত্তমভাবে সালাত আদায় করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত শুধু 'আমলকে বিনষ্ট করে না, বরং তার পরিণতি অতি মন্দ। এ মর্মে রাসূল সা.বলেন[৮]-

> "যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞান এই উদ্দেশ্যে অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সাথে সে তর্কে লিপ্ত হবে কিংবা নির্বোধ লোকদের প্রতারিত করবে বা নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।"
>
> আরও বলেছেন[৯]-"যে ইলম বা শিক্ষা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, কেউ যদি সেই শিক্ষা দুনিয়ার স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অন্বেষণ করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"

উল্লেখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, নিয়ত মন্দ হওয়ার কারণে ভালো কাজও করার পরও তা মন্দ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, আরেক হাদীসে দেখা যায় যে, জনৈক ব্যক্তি অজ্ঞাতে এক চোরকে, এক ব্যভিচারিণীকে ও এক ধনী ব্যক্তিকে দান করে আফসোস করেন। কিন্তু স্বপ্নযোগে তাকে জানানো হয় যে, তার দান আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে।[১০] বস্তুত এই ব্যক্তির দান অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে গেলেও নিয়তের বিশুদ্ধতা ও ইখালাসের কারণে মহান আল্লাহ তার দান কবুল করেন।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: আয়াত ১৭।
[২]. আল-কুরআন সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩: আয়াত ০৬।
[৩].মূল আরবী[النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مايراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر, حالا أومآلا]আস-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের*(বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,তা.বি.), পৃ.৩০।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা ০৯:১০৭।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২৯।
[৬].**মূল আরবী**[إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه] *সহীহ আল-বুখারী*,কিতাবুল ওহী, হা.০১;
[৭]. **মূল আরবী** [رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية]শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, *প্রাগুক্ত*, খ.১৫, পৃ.৪১৬।
[৮].**মূল আরবী** [من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار]*সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল 'ইলম, হাদীস নং ২৬৫৪।
[৯].**মূল আরবী**[من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عزوجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল'ইলম, হা. ৩৬৬৪।
[১০]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং১৩৫৫; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১০২২।

ইসলামে ভালো নিয়তের ব্যাপারে এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ভালো কাজের নিয়ত করে কাজটি সম্পন্ন করতে নাও পারে তবুও সে সাওয়াব পাবে। হাদীসে এসেছে[১]-"যে ব্যক্তি সত্যিকার অন্তরে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন। যদিও সে নিজ বিছানায় মারা যায়।" রাসূল সা. আরও বলেন-[২],

> আল্লাহ ভালো ও মন্দ লিখে দিয়েছেন আর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করল অথচ কাজটা করল না, আল্লাহ তাকে (সৎ কাজের) পূর্ণ সওয়াব দিবেন। আর যদি সে সৎ কাজের ইচ্ছা করল এবং বাস্তবে তা করেও ফেলে, আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব দিবেন। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, অথচ বাস্তবে তা করল না, তবে আল্লাহ তাকে পূর্ণ সওয়াব দিবেন। পক্ষান্তরে, সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং তদানুযায়ী কাজটা করে ফেলে তবে, আল্লাহ তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিখেন।

ইখলাস (الاخلاص) :

ইখলাস শব্দের আভিধানিক অর্থ–নির্ভেজাল, সন্দেমুক্ত, অমলিন, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা। ইখলাস রিয়া (প্রদর্শনী মনোভাব) এর বিপরীত। ইখলাস হল নিয়তের বিশুদ্ধতা। ইখলাসের পরিচয় দিতে মনীষীগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন–

ইবরাহীম আদহাম (রহ.) (মৃ.১৬৫হি.) বলেন–"ইখলাস হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে নিয়ত সাচ্চা করা।"[৩]

জুনায়িদ বাগদাদী (রহ.) (মৃ.২৯৭/২৯৮হি.) বলেন–"সর্ব প্রকার মলিনতা থেকে আমলকে পরিচ্ছন্ন করার নাম ইখলাস।"[৪]

সাহল আত-তস্তরী রহ.(মৃ.২৮৩হি.)ইখলাস হচ্ছে,"বান্দার গতিবিধি ও স্থিরতা সবকিছু কেবল মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা।"[৫]

ইয়াকুব মককুফ বলেন, মুখলিস সে ব্যক্তি, যে তার নেক কর্মসমূহকে গোপন করে যেমন তার পাপকর্মসমূহকে গোপন করে থাকে।[৬]

'ইসা ('আ.)এর সহচরগণ জিজ্ঞাসা করলেন–হে রূহুল্লাহ্! মুখলিস ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে 'আমল করে এবং মানুষ তাকে প্রশংসা করুক সে তা পছন্দ করে না।'[৭]

কারো কারো মতে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে মুখলাস বলা হয়'।[৮]

ফুদায়িল ইবন ইয়ায (রহ.) বলেছেন, মানুষের সমালোচনার কারণে আমল ছেড়ে দেওয়া রিয়া, মানুষের জন্য আমল করা শিরক এবং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করা ইখলাস।

মোটকথা–ইখলাস হচ্ছে, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় ইবাদত ও সৎকর্ম একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া। মানুষের থেকে কোন সম্মান-মর্যাদা, পার্থিব ফায়েদা কামনা না করা কিংবা মানুষের সমালোচনা ও ভয়ের পরওয়া না করে কেবল আল্লাহর জন্য কাজ করা।

ইখলাসের স্তর: ইখলাসের কিছু স্তর রয়েছে। ক.'আমল ও ইবাদতে লৌকিকতা বর্জন করা, তা আল্লাহর দয়া ও তাওফিকে হয়েছে বলে মনে করা, তা গোপন রাখা, এজন্য আত্মতুষ্টিতে না ভোগা এবং স্বীয় 'আমলের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা অন্বেষণ করা। খ.যথাযথভাবে 'আমল সম্পন্ন হয়নি মনে করে লজ্জাবোধ করা। গ.'আমলটি সুন্নাহ অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও বিদ'আত মুক্ত হওয়া।

মানুষের প্রতিটি পূণ্যের কাজের মূল্যায়ন হয় নিয়ত (অন্তরের সংকল্প) অনুসারে। নিয়তের ভিত্তিতে পূণ্যের কাজের কোনটি মূল্যবান ও কোনটি মূল্যহীন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। নিয়ত ভালো হলে কাজটি মূল্যবান ও আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়, আর নিয়ত খারাপ হলে কাজটি মূল্যহীন ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়। এজন্য ইখলাস অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ধর্মের কিছু মূল শিক্ষা রয়েছে। যেমন ইহুদী ধর্মের মূল শিক্ষা হল: তাওরাতের কঠিন বিধি-বিধান পালন করা। খ্রিষ্টান ধর্মের মূল শিক্ষা হল: প্রেম-ভালবাসা, সহিষ্ণুতা। হিন্দু ধর্মের মূল শিক্ষা হল: বিনয়-নম্রতা। আর ইসলামের মুখ্য শিক্ষা হল:'ইখলাস'। আর ইখলাসের মধ্যে উল্লেখিত সব বিষয় এসে যায়। এজন্য কুরআনে ইখলাসের ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে[৯]– وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে এটাই সঠিক দ্বীন।" অন্যত্র বলা হয়েছে[১০] هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -"তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা দীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাক।" এসব আয়াতে রিয়ামুক্ত হয়ে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে কেবল মহার আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[১]. **মূল আরবী** [من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৯০৯।

[২]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৬১২৬; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ১৩১।

[৩]. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল-গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩৮১।

[৪]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮২।

[৫].*প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮১।

[৬]. প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭৮।

[৭]. ইবনু কাছীর রহ. *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৫, পৃ.২৩৭।

[৮]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, খ. ০৬, পৃ.২৮।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-বায়্যিনাহ ৯৮: আয়াত ০৫, আল-কুরআন (৩০ : ৩০-৩১) (১৮:১১০) (৩৯ : ১৪) (০৬ : ১৬২-১৬৩)।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-মু'মিন ৪০: আয়াত ৬৫।

কুরআন ও সুন্নাহ মতে, যাবতীয় ভালো কাজ ও ইবাদত কবুলের মৌলিক দুটি শর্ত হলো- ইখলাস ও সুন্নাহ মোতাবিক ‘আমল। এছাড়া কোন ‘আমল বা পূণ্যের কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। ইখলাস সম্পন্ন অল্প আমলও ভালো। কিন্তু ইখলাসবিহীন অনেক আমলও গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য কুরআন যাবতীয় ইবাদত ও সৎকর্ম লৌকিকতামুক্ত থেকে ইখলাসের সাথে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]–قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ “বল, ‘নিশ্চয় আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহ্‌র ইবাদাত করি তাঁর-ই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে’।” নাবী সা. বলেন,[২] “নিশ্চয় আল্লাহ শুধু সে ‘আমল গ্রহণ করেন, যা ইখলাসের সাথে ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।”

ইখলাস মানুষের হৃদয়কে কলুষতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে। এটা মানুষকে উৎকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধ মানুষে রূপান্তরিত করে।[৩] এটা ব্যক্তির মধ্যে সততা, কর্তব্যপরায়নতা, নিঃস্বার্থপরতা ইত্যাদি মহৎ গুণ সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি থেকে কপটতা, লৌকিকতা ও স্বার্থপরতা দূর করে। এটা ব্যক্তিকে নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীতে পরিণত করে। ফলে এ শ্রেণীর মানুষ স্বপ্রণোদিত হযে সমাজের কল্যাণে কাজ করে। তারা তাদের কাজের কোনরূপ বিনিময় প্রত্যাশা করে না। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]–وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا- إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا “আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্থ, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।” ইখলাস সকল ইবাদতের মগজ। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–“আল্লাহ তা’য়ালা তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্য ও ধনসম্পদের দিকে লক্ষ্য করবেন না বরং তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে লক্ষ্য করবেন।”[৫]

ইখলাস সকল নাবী-রাসূল ও পূণ্যবাদের চরিত্রের মৌলিক দিক ও বড় গুণ।[৬] এই মহৎ গুণ মানুষের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। এজন্য মু’মিনদের ইখলাস অর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৭]– فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ “সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে। জেনে রাখ,অবিমিশ্র অনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।”

ইখলাস পার্থিব ও পরকালীন বিপদ-আপদ মুক্তির মাধ্যম।[৮] ইখলাস আল্লাহর সন্তুষ্টি, ভালবাসা ও নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম। এটা জান্নাত ও পরকালীন মুক্তির উৎকৃষ্ট পন্থা।[৯] ইখলাসসম্পন্ন সামান্য আমলও পরকালে মানুষের কল্যাণে আসবে। ইখলাসবিহীন ‘আমলে পার্থিব বা ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত থাকে। এ ধরনের লৌকিক উদ্দেশ্যে কৃত ‘আমল মরিচীকা সদৃশ্য। এগুলো পরকালে কোন উপকারে আসে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–“তোমার দীনকে (‘আমল) ইখলাসসম্পন্ন কর। তাহলে অল্প ‘আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।”[১০]

ইখলাসবিহীন ‘আমল নিস্ফল এবং তা শাস্তির উপকরণ হবে।[১১] এরূপ ‘আমলের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে[১২]-

> কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে এবং (দুনিয়ায়) তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে তা মনে করতে পারবে। মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তোমাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি তোমার পথে লড়াই করে শহীদ হয়েছি। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো? বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছো যে, লোকেরা তোমাকে বীর বলবে, আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে সে ইলম(জ্ঞান) অর্জন করেছে, তা লোকদের শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে তা মনে করতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন,আমি তোমাকে যে সব নিয়ামত দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে,আমি জ্ঞানার্জন করেছি, লোকদের তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো? বরং তুমি এই উদ্দেশ্যেই ইলম অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলিম বলবে এবং কুরআন এজন্যে পাঠ করেছিলে যে,তোমাকে কারী বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে আল্লাহ অঢেল সম্পদ দান করেছেন। তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে তা মনে করতে পারবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ সম্পদ দ্বারা তুমি কি কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে সেখানেই ব্যয় করেছি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো? বরং তুমি এজন্য দান করেছ যে, লোকেরা তোমাকে দাতা বলবে। আর তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ১১।

[২]. **মূল আরবী** [إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه] *সুনান আন-নাসাঈ*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ৩১৪০।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা মার্‌ইয়াম ১৯: আয়াত ৫১।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্‌র/আল-ইন্‌সান ৭৬: আয়াত ৯।

[৫]. মূল আরবী [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, হাদীস নং ৬৩৬০।

[৬]. আল-কুরআন ১৯:৫১; ১০:২৪; ০২:১৩৯।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯ : আয়াত ০২- ০৩।

[৮]. আল-কুরআন ৩৭:৭১-৭৪; ১০:২২-২৩; ৩১:৩২।

[৯]. আল-কুরআন ৩৭:৪০-৪৩।

[১০]. **মূল আরবী** [أخلص دينك يكفك العمل القليل] হাকিম নাইসাপূরী, *আল-মুস্তাদরাক* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং,১৪১১হি.),খ.৪, পৃ.৩৪১, কিতাবুর রিক্বাক, হা.৭৮৪৪।

[১১]. আল-কুরআন ২৫:২৩; ১৭:১৮-১৯, ১৮:১১০।

[১২]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৯০৫।

ইখলাস অর্জনে করণীয়: ইখলাস অর্জন এবং তাতে অটল থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সহল আত-তাস্তুরী রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল "প্রবৃত্তির নিকট কঠিনতম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, ইখলাস। কেননা প্রবৃত্তি কখনও ইখলাস গ্রহণ করতে চায় না।"[১] তবে ইখলাস অর্জনে সহায়ক বিষয়গুলো হলো: ক.মহান আল্লাহ প্রতি ভালবাসা পোষণ এবং তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ব অনুধাবন করা। খ. আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া ও তাওফীক লক্ষ্য করা। গ. গোপনে ইবাদত করা ও রিয়ার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে জানা। ঘ. আত্মসংশোধন ও আত্মসমালোচনা। ঙ. তাওবা-ইস্তিগফার, যিকর ও মৃত্যুর স্মরণ করা। চ. নাফসের ধোকা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা সর্বদা সতর্ক থাকা। ছ. আল্লাহর নিকট দু'আ, সাহায্য চাওয়া ও রিয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। জ. মুখলিস ব্যক্তির সাহচর্য এবং তাদের জীবন ও কর্ম জানা। ঝ. চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন অধ্যয়ন।

❑. তাওয়াক্কুল তথা যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর উপর গভীর আস্থা (التوكل):

তাওয়াক্কুল শব্দের আভিধানিক অর্থ–ন্যস্ত করা, সমার্পণ করা, ভরসা করা। পরিভাষায়–তাওয়াক্কুল অর্থ মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তাতে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে ভরসা করা।[২] ভিন্ন মতে, তাওয়াক্কুল হল কল্যাণ অর্জন এবং এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা।[৩] কুরআনে তাওয়াক্কুল শব্দটি বিভিন্ন রূপে সর্বমোট ১৪০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা ব্যয় করে কাজ করার পর কিংবা উপায় অবলম্বনের পর আল্লাহর সাহায্য ও তাওফীক চেয়ে চূড়ান্ত ফলাফলের ব্যাপারে তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভর করার নাম তাওয়াক্কুল। কাজ-কর্ম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে এবং কর্মের উপকরণাদি গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহ সবকিছু করে দেবেন–এরূপ ভরসা করার নাম তাওয়াক্কুল নয়। এটাকে 'ভরসার ভান' বলা হয়, যা সম্পূর্ণ আল্লাহর রীতির পরিপন্থী।

মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ বাচাঁর জন্য মানুষ আশ্রয় খোঁজে। এই আশ্রয়স্থল এমন হওয়া উচিত যিনি সত্যিকার আশ্রয়ের উপযুক্ত ও কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ন্ত্রক। বলাবাহুল্য, ক্ষমতা, শক্তিমত্তা, উত্তম ইত্যাদি সবদিক থেকে সর্বশক্তিমান সত্তা আল্লাহর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই।[৪] তাই তাঁকে ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা মূর্খতা, ভ্রষ্টতা ও অকৃজ্ঞতা। কখনও কখনও তা মানুষকে ও শিরকের দিকে ধাবিত করতে পারে। এজন্য যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করা নৈতিকতা ও বিবেকের দাবী। কুরআনে এই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে[৫]– وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا-"আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৬]- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ "আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন না। তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর।" উল্লেখিত আয়াতের ভিত্তিতে মানুষ যদি আল্লাহর উপর ভরসা করত এবং বুঝত যে, আল্লাহর ফায়সালা তার জন্য কল্যাণকর তবে তা নিজের জন্য উপকারী হত এবং অশান্তি থেকে মুক্তি লাভ করতে পারত।

ইবনু তাইমিয়া বলেন, সকল মুসলমান এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন, বান্দার জন্য জায়েয নেই– আল্লাহ ব্যতীত কারো উপর ভরসা করা, কারো কাছে সাহায্য চাওয়া, কাউকে আহবান করা বা কারো ইবাদত করা। যে ব্যক্তি নৈকট্য লাভকারী ফিরিশ্‌তা, কোন প্রেরিত নাবীর ইবাদত করে অথবা বিপদে তাঁর কাছে সাহায্য চায় কিংবা তাঁকে আহবান করে, তাহলে সে শিরকে লিপ্ত হবে।[৭]

মানব জীবনে তাওয়াক্কুলের ব্যাপক কল্যাণ রয়েছে। এটা মানুষের মধ্য থেকে লোভ-লালসা, দুর্নীতিপরায়নতা ও পরনির্ভরশীলতা দূর করে। তাওয়াক্কুল মানুষকে আল্লাহ অভিমুখী করে এবং জীবনে স্থিতিশীলতা আনে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৮]– وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই; আল্লাহ্‌ সকল কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।"

তাওয়াক্কুল মু'মিনদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।[৯] এটা মানব জীবন থেকে অশান্তি ও অস্থিরতা দূর করে জীবনকে শান্তিময় করে তোলে।[১০] এটা মানব চিত্তকে প্রশান্ত রাখে এবং কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১১]–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

---

১. মূল আরবী[أي شيء اشد على النفس فقال الإخلاص لأنه لها فيه نصيب] ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৪, পৃ.৬৫।

২. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, পৃ.২০২।

৩. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ, *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৪।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৪৯।

৫.আল-কুরআন, সূরা আন্‌-নিসা' ০৪: আয়াত ৮১, আল-কুরআন (৩৩ : ০৩) (৩৩ : ৪৮)।

৬. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুর্‌ক্বান ২৫: আয়াত ৫৮, আল-কুরআন (১১: ১২৩) (০৮ : ৬৪)।

৭. ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমু'ল ফাতাওয়া*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ. ২৭২।

৮. আল-কুরআন, সূরা আত-তালাক ৬৫: আয়াত ০৩।

৯. আল-কুরআন, সূরা আল-'আনকাবূত ২৯: আয়াত ৫৯-৬০।

১০. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৬৮।

১১. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৫৬।

হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না,যারা কুফরী করেছে এবং তাদের ভাইদেরকে বলেছে– যখন তারা যমীনে সফরে বের হয়েছিল অথবা তারা ছিল যোদ্ধা (অতঃপর নিহত হয়েছিল) – 'যদি তারা আমাদের কাছে থাকত, তবে তারা মারা যেত না এবং তাদেরকে হত্যা করা হত না'। যাতে আল্লাহ তা তাদের অন্তরে আক্ষেপে পরিণত করেন; এবং আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন।আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

তাওয়াক্কুলের দ্বারা আল্লাহর রহমত ও সাহায্য নাযিল হয় এবং মানুষের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়।[১] ইবরাহীম আ. কে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তিনি পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করায় আগুন তার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যায়।[২] মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীরা যখন দেখল তাদের পিছনে ফিরআউন ও তার বাহিনী এবং সামনে অথৈ সাগর তখন বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে মূসা আ.দৃঢ়তার সাথে বলেছিল[৩](قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ-'কখনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন'।) ফলে মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের সাগরে রাস্তা বের হয় আর ফিরআউন ও তার বাহিনী সাগরে ডুবে ধ্বংস হয়ে। মুহাম্মাদ সা. মদীনায় হিজরতের সময় সওর গুহায় শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়লে তাঁর সঙ্গী আবূ বকর রা. চিন্তিত হয়ে পড়েন কিন্তু নাবী সা.তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন[৪] (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا-'তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'।) এভাবে যুগে যুগে তাওয়াক্কুলের দ্বারা আল্লাহর রহমত ও সাহায্য লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- একবার কোন এক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সা. একটি গাছের নীচে একাকি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন এক মুশরিক ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ সা. কে বলেছিল, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ সা. উত্তরে বলেছিলেন, আল্লাহ। তখন তার হাত থেকে তরবারিটি নীচে পড়ে যায়।... এরপর রাসূলুল্লাহ সা. তাকে ক্ষমা করে দেন। আর সে ইসলাম গ্রহণ করে। বর্ণিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সা. আক্রমণকারীর প্রতি কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন বা আকুতি না করে নির্ভিকভাবে উত্তর দেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন।[৫] এই ঘটনাটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর বদৌলতে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য ও রক্ষা করেন। এজন্য কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে[৬] (وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ- আল্লাহর উপরই মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।)

তাওয়াক্কুল নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। এটা মু'মিন ব্যক্তির নৈতিক মনোবলকে সুদৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৭] তাওয়াক্কুল মানুষকে অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে ফিরিয়ে রাখে। মিশর বিজয়ের পর শুকিয়ে যাওয়া নীলনদে উমর রা. পত্র তাতে নিক্ষেপের পর পানি প্রবাহের ঐতিহাসিক ঘটনা তার জ্বলন্ত সাক্ষী। অন্যদিকে, তাওয়াক্কুলহীনতা মানুষকে অকল্যাণ, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।[৮] তাওয়াক্কুল পরকালীন সফলতা ও জান্নাত লাভের মাধ্যম। এ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করল, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলেন সেসব লোক যারা কোন দিন (অসুস্থ বা বিপদের কারণে) কোন ঝাড়-ফুক চেয়ে বেড়ায় না, কুলক্ষণ গ্রহণ করে না, ছেক দেয়ার ব্যবস্থা করে না, *বরং তারা শুধু তাদের রবের উপর ভরসা করে*।[৯]

তাওয়াক্কুলের মূলনীতি: তাওয়াক্কুল অবলম্বনের ক্ষেত্রে কতগুলো মূলনীতি রয়েছে। এগুলো বাদ দিলে ক্রটি তাওয়াক্কুল যুক্ত হয়। যেমন– (ক). প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পর সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ নির্ভর করা হবে।[১০] আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাওয়াক্কুল না করা। এটা শিরক, অবৈধ ও অনৈতিক।[১১] কেননা তাঁর হাতে কল্যাণ-অকল্যাণের চাবিকাঠি। তিনি কাউকে কল্যাণ ও সাহায্য করলে কারো ক্ষমতা নেই তা রহিত করার, আবার তিনি কারো অকল্যাণ ও লাঞ্ছিত চাইলে কেউ নেই তা প্রতিহত করার।[১২] কোন কিছু পাওয়া-না পাওয়ার ব্যাপারে তার প্রতি আস্থা রাখা।[১৩] এ বিশ্বাস নিয়ে যাবতীয় কাজকর্মে সম্পন্ন করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বাণী[১৪] –

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ دُونِ اللَّهِ... أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ... قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। ... আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নয়? ...বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা' ২৬ : আয়াত ৬১-৬৭।

[২].ইরশাদ হচ্ছে [قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ; আমি বললাম,'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য']–সূরা আল-আমবিয়া ২১:আয়াত ৬৯।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা ২৬ : আয়াত ৬২।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা ০৯ : আয়াত ৪০।

[৫]. *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস নং ৩৯০৫ও ৩৯০৬; *সহীহ মুসলিম* , কিতাবুল ফাদাইল, হা. নং ৮৪৩।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১২২; আল-মায়িদাহ ০৫: আয়াত ১১; ২৩।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩ : আয়াত ১৭৩-১৭৪।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ২৫-২৬।

[৯].মূল আরবী [هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون]*সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তিব, হাদীস নং ৫৩৭৮; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, হা.২১৮।

[১০]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৫৯।

[১১]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৩৮।

[১২]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৬০, আল কুরআন (৬৪:১৩) (১৪:১২) (৩৩:১৭) (৩৫:০২)।

[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ০৯: আয়াত ১২৯।

[১৪]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৩৬-৩৮।

যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করে।"

খ).বাহ্যিক সতর্কতা ও কর্মনীতি অবলম্বন তাওয়াক্কুলের অন্যতম নীতি। কুরআনে এই শিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে[১] –
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
"সে(ইয়াকুব 'আ.) বলল, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হুকুম একমাত্র আল্লাহ্রই। তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করছি এবং তাঁরই উপর যেন সকল তাওয়াক্কুলকারী তাওয়াক্কুল করে'।"

রাসূল সা. বলেন, 'তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযক দেবেন যেমন তিনি রিযক দেন পাখিদের। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[২]
এই হাদীসে সত্যিকার তাওয়াক্কুল করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। সত্যিকার তাওয়াক্কুলের কারণে পাখিদের রিযক অন্বেষণে দুঃশ্চিন্তা ও হা-হুতাশ করতে হয় না, অথচ তারা খাদ্য সঞ্চয় করে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, পাখিরা তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকে না। তারা রিযক অন্বেষণে প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ে। তাই তাওয়াক্কুল অর্থ বসে থাকা নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই তাওয়াক্কুল।
আনাস রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সা.কে প্রশ্ন করল 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি উট ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করব নাকি রশিতে বেঁধে ভরসা করব? তখন নাবী সা. বললেন–রশিতে বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করবে।[৩] -এখানে উট ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ঘরে বসে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, তাওয়াক্কুল অর্থ আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকা নয়। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করে পরিণামের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

গ).তাওয়াক্কুল হবে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায়। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত সব ব্যাপারে কেবল তাঁর উপর ভরসা করা এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী হওয়া।[৪] এ ব্যাপারে উদাসীন না হওয়া।[৫] আবূ বকর রা. বলেন, আমরা (হিজরত কালে) গুহায় অবস্থানের সময় আমি মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম, যখন তারা আমাদের মাথার উপর ছিল। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের কেউ যদি এখন নিজের পায়ের নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন,"হে আবূ বকর! এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন হচ্ছেন আল্লাহ?"[৬]
উল্লেখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, কঠিন বিপদের মুহূর্তেও রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করতে ভুলে যাননি।

ঘ).তাওয়াক্কুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ভবিষ্যতের বিষয় আল্লাহর ইচ্ছার উপর সোপর্দ করা। মহান আল্লাহ বলেন[৭]
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا- إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا
"আর কোন কিছুর ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, 'নিশ্চয় আমি তা আগামী কাল করব', তবে 'আল্লাহ্ যদি চান'। আর যখন ভুলে যাও,তখন তুমি তোমার রবের যিকির কর এবং বল,আশা করি, আল্লাহ্ আমাকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সত্য পথের হিদায়াত দেবেন।"
আবূ হুরায়রা রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নাবী সুলাইমানের ষাটজন স্ত্রী ছিল। (একদিন) তিনি বললেন, আজ রাতে আমি আমার সব স্ত্রীর কাছে যাব। আর সব স্ত্রীই গর্ভবতী হয়ে এক একজন অশ্বারোহী (যোদ্ধা) সন্তান প্রসব করবে যারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করবে। তাই তিনি তাঁর সব স্ত্রীর কাছে গেলেন। কিন্তু তাদের থেকে একজন ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সে-ও একটি অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করলো। নাবী সা. বলেছেন, যদি সুলাইমান ('আ.) ইনশা-আল্লাহ্ বলতেন তাহলে সব ক'জন স্ত্রীই গর্ভবতী হতো। আর প্রত্যেকেই একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রসব করতো যারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করতো।[৮] –এই হাদীসে মানব জীবনে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

❑.তাওবা (التوبة) ও ইস্তিগফার (الإستغفار):

তওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুশোচনা, প্রত্যাবর্তন, পাপের স্বীকৃতি ও তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প।[৯] আল-কুরআনে তাওবা শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৮৫ বার এসেছে।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৬৭।
[২]. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩৪৪।
[৩]. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু সিফাতিল ক্বিয়ামাহ ওয়ার রাক্বায়িক ওয়াল ওরা', হাদীস নং ২৫১৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আত্-তাওবাহ ৯: আয়াত ১২৯, আল-কুরআন ৩৯:৩৮।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮ : আয়াত ২৩-২৪।
[৬]. *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, হাদীস নং ৩৪৫৩; *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু ফাদায়িলিস সাহাবা, হা.২৩৮১।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮:২৩-২৪।
[৮]. *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬৬৪।
[৯]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫।

পরিভাষায় তওবা হচ্ছে অতীত কৃত পাপের জন্য অনুশোচনার অনলে অন্তরের বিগলিত হওয়া, পাপ ও অনাচারের পথ থেকে সরে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হওয়া। সহল আত-তাস্তরী রহ.(মৃ.২৮৩হি.)বলেন, নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে বদলে দেয়ার নাম তওবা।

তাওবার বিভিন্ন স্তর আছে। যথার্থ মানের তাওবা তথা উচ্চস্তরের তাওবার অভাবে অন্তরে পাপের কিছু কালিমা থেকে যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে অন্য পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য প্রত্যেহ নিয়মিত তাওবা করা দরকার। এতে প্রতিদিনের পাপের কাফফারা আদায় হয় এবং অন্তরে পাপের কলুষতা ক্রমাগত দূর হতে থাকে। স্বয়ং রাসূল সা. বলেন–(যার পূর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছিল) হে লোক সকল! তোমরা মহান আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আমি নিজেও আল্লাহর নিকট প্রত্যেহ একশত বার তাওবা করি।[১]

তাওবার কবুলের শর্ত: তাওবার কবুলের কতগুলো শর্ত রয়েছে। এগুলোর যে কোন একটির অভাব থাকলে তাওবা হবে না। শর্তগুলো হল–ক. কৃতপাপের জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। খ. ভবিষ্যতে কখনও পাপ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা। গ. নিজেকে সংশোধনের পূর্ণ চেষ্টা করা এবং পাপ পরিহার করে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে দাখিলের হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা। ঘ.বান্দার হক নষ্ট করলে তা ফিরিয়ে দেয়া এবং তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া। সহল আত-তাস্তরী রহ. বলেন, নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া তওবা সহজলভ্য নয়।

মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়। অজ্ঞতাবশত বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ভুল বা পাপ করতে পারে। পাপ সাধারণত অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত হয়ে থাকে। কিন্তু পাপ হয়ে যাওয়ার পর দ্রুত হল ইস্তেগফার করে নিজকে সংশোধন করার নামই তাওবা। কুরআন মানুষকে নির্দেশ দেয় যে, যদি সে সততার দিকে আসে, অনুতাপ করে, পাপের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিজ্ঞা করে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে সংশোধনের সুযোগ পাবে। এতে পাপ ক্ষমা করা দেয়া হয় এবং এটাই পাপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ। খাঁটি তাওবা মানুষকে পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন[২], يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভাবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে,যার পাদ দেশে নদী প্রবাহিত।"

বান্দা গুনাহ থেকে মুক্তির জন্য কেবল আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিবে। কেননা বান্দার গুনাহ ক্ষমা ও তাওবা কবুলের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব শুধুই আল্লাহর। তাই আল্লাহ দরবার ছাড়া মাজার বা পীরের দরবারে ধর্ণা দেন গুরুতর বিভ্রান্তি ও অনৈতিক। ইরশাদ হচ্ছে[৩] وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ "আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কর, তা তিনি জানেন।"

অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আত্মসংশোধনের ক্ষেত্রে তাওবা-ইস্তেগফারের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমাগত পাপ ও অন্যায়ের কাজে লিপ্ত থাকলে তা মানুষের অন্তরকে কলুষিত, ময়লাযুক্ত, অন্ধকার, কঠোর, নিষ্ঠুর ও নির্দয় করে তোলে এবং অন্তরের স্বচ্ছতা, নির্মলতা ও কোমলতা বিনষ্ট করে ফেলে। জীবনে অশান্তি ও দুর্ভাগ্য বয়ে আনে। পাপের কারণে মানুষের অন্তরে সৃষ্ট সেই কলুষতা, পাপ ও কঠোরতা তাওবার দ্বারা দূর হয়। তাওবা অন্তরের নির্মলতা, সচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে এবং জীবনে অশান্তি ও দুর্ভাগ্য দূর করে। তাওবা অন্তরের শক্তি ও সজীবতা বৃদ্ধি করে। তা মানুষকে ভালো কাজ করার শক্তি যোগায় এবং মন্দ কাজে নিরুৎসাহিত করে। তাওবা ও ইস্তেগফার অন্তরকে এমনভাবে পবিত্র ও স্বচ্ছ করে যেমন সাবান কাপড়ের ময়লা দূর করে। মহান আল্লাহ বলেন[৪]– وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ "এবং যারা কোন অশ্লীল কার্য করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।" আরও বলেন-[৫] أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا "যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না?"
যাদের অন্তর কুফর ও অজ্ঞতা দ্বারা মৃত এই আয়াতে উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বর্ণনা করেছেন। তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ উক্ত কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে হিদায়েত ও ঈমান দ্বারা তার অন্তর জীবন্ত করেন এবং তাকে আলো দান করেন যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে সত্য-সঠিক পথে চলতে পারে।

১.**মূল আরবী**[يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ ওয়াত তাওবা ওয়াল ইসতিগফার, হা.নং ২৭০২।
২. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহ্‌রীম ৬৬: আয়াত ০৮।
৩. আল-কুরআন, সূরা আ্শ-শূরা ৪২: আয়াত ২৫।
৪. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৩৫।
৫. আল-কুরআন সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১২২।

তাওবা ও ইস্তিগফার কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। এটাই ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও সফলতার মাধ্যম। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর আযাব-গযব দূর হয়। [আল-কুরআন ০৮:৩৩] এর দ্বারা মানুষের জীবন থেকে বিপদ-আপদ, অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য দূরীভূত হয় এবং কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দ্বার খুলে যায়। আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত লাভ করা যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ "আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ উপকরণ দেবেন এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মুতাবিক দান করবেন।" অন্যত্র বলেন[২] اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ "তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও অতঃপর তার কাছে তাওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন।" আরও বলেন[৩] وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–"যে ব্যক্তি নিজের জন্য সর্বদা ইস্তিগফার বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে আল্লাহ তাকে সকল সংকীর্ণতার মধ্যে উদ্ধারের পথ বের করে দেন, সকল দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে মুক্তির পথ করে দেন, এবং তাকে তিনি রিযক সরবরাহ করেন এমন স্থান থেকে যার সে চিন্তাও করেনি।"[৪]

বান্দার তাওবা মহান আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় কাজ। এটা পরকালীন মুক্তি লাভের মাধ্যম। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন[৫]– وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ "যারা অসৎকার্য করে তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অন্যত্র বলেন-[৬] وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا "কেউ কোন মন্দকার্য করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে পরে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্‌কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।" অন্যত্র আরও বলেন[৭]– إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন।" রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"আদম সন্তানের সবাই (কম-বেশি) পাপী। আর পাপীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা বেশি বেশি তাওবা করে।"[৮]

তাওবা-ইস্তেগফার লজ্জাকর কোন কাজ নয়। নাবী-রাসূলগণ এতে লজ্জা করতেন না, বরং তাদের কারো দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাওবা-ইস্তেগফার করতেন। কুরআন এক্ষেত্রে আদম আ., মূসা আ., দাউদ আ. এর তাওবা-ইস্তেগফারের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছে।[৯] রাসূল সা. এর তাওবা-ইস্তেগফার আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। এ মর্মে তিনি বলেন[১০],"অন্যমনস্কতা আমার অন্তরকে ঢেকে নেয়। তাই আমি দিনে আল্লাহর কাছে একশত বার ইস্তেগফার করি।"

তাওবার নৈতিক নীতিমালা: জীবন চলার পথে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানুষের পাপ করে থাকে। কিন্তু পাপ ঘটে গেলে সত্যের পথ থেকে সরে আসা যাবে না, তাহলে শয়তান ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এ থেকে বাঁচতে হলে পাপ তাওবার মাধ্যমে দ্রুত সুপথে ফিরে আসতে হবে। আর তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কিছু নীতি রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

•ভয় ও আশা সহকারে আল্লাহর নিকট তাওবা-ইস্তেগফার করা। পাপ যত বড় বা যত জঘন্যই হোক না কেন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভের ব্যাপারে কখনই নিরাশ হবে না। নিরাশ হওয়ার মানসিকতা ধ্বংসকারী ও বিভ্রান্তিকর।এটি কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। তাই মনে রাখতে হবে যে, পাপ যত বড় ভয়ানক হোক না কেন আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বিস্তৃত। মহান আল্লাহ বলেন-[১১] قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ,আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

•পাপের পর দ্রুত নিষ্ঠার সাথে তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করা ও পাপের পথ থেকে দূরে থাকা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[১২] إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সব লোকের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তাওবা করে, এরাই তারা, যাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন।" অন্যত্র বলেন-[১৩], كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ০৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১: আয়াত ৫২। আরও দেখুন, আল-কুরআন ১১: ৯০।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ৩১।
[৪]. *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল বিতর, হাদীস নং ১৫১৮; *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.১ পৃ.২৪৮, হাদীস নং ২২৩৪।
[৫]. আদম আ. এর তাওবা সম্পর্কে দেখুন আল-কুরআন ০৭: ১৫৩, মূসা আ. এর তাওবা সম্পর্কে দেখুন আল-কুরআন ২৮:১৬, দাউদ আ. এর তাওবা সম্পর্কে দেখুন ৩৮:২৪-২৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪ : আয়াত ১১০।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২২২।
[৮]. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি ওয়ার রাকায়িক ওয়াল ওরা', হাদীস নং ৩৩৩৪।
[৯]. আল-কুরআন ০৭: ২৩, ।
[১০]. **মূল আরবী**[سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول انه ليغان على قلبي حتى استغفر الله مائة مرة] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ.২১১, হাদীস নং ১৭৮৮২।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৫৩।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৭-১৮।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ৫৪, আল-কুরআন ১৬: আয়াত ১১৯।

بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

হাতিম আসাম্ম রহ. বলেন, "তড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ। কিন্তু পাঁচটি বিষয়ে তাড়াতাড়ি করা নাবী সা. এর সুন্নত। ক. যখন মেহমান আসে তখন তাকে খাবার পরিবেশন করা। খ. কেউ মারা গেলে মৃত্যের দাফনের ব্যবস্থা করা। গ. কন্যা সবালিকা হলে বিবাহের ব্যবস্থা করা। ঘ. ঋণ যখন ওয়াজিব হয়ে যায়, তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা। ঙ. যখন কোন গুনাহ হয়ে যায় তখন তাওবা করা।"[১]

•সারা জীবন নিজেকে সংশোধন না করে পাপাচারে লিপ্ত রেখে মৃত্যুর আসন্ন দেখে জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর আলামত প্রকাশের পর তাওবা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের পাপীর তাওবা গ্রহণযোগ্য নয় এবং তারা মুক্তি পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে-[২] وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا "তাওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি তাওবা করছি। এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।" তবে কেউ যদি অজ্ঞতার কারণে গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকে এবং মৃত্যুর আলামত আসার পূর্বে লজ্জিত হয়ে বিশুদ্ধচিত্তে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে তবে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এ মর্মে নাবী সা.বলেন[৩]–"নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার মৃত্যুর আগে গরগর শব্দ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাওবা কবুল করে থাকেন।"

• তাওবার পর পাপের পুনরাবৃত্তি না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং সৎপথে অটল-অবিচল থাকা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]-وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى -"এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সৎপথে অবিচলিত থাকে।" এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, তাওবার উপর অটল থাকার জন্য জরুরী শর্ত বেশী বেশী ইস্তেগফার, সৎকর্ম ও সৎপথে অবিচলিত থাকা।

•পাপ ঘটার পর দ্রুত তাওবা এবং সাথে সাথে ভালো কাজ করা। কেননা 'সৎকর্ম মানুষের অসৎকর্ম মিটিয়ে দেয়।'[৫]

•পাপ বা সীমালংঘনের সময় কারো হক নষ্ট করে থাকলে হকদারকে তা ফেরত প্রদান করা।

•বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৬]– إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا-"তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলো মোচন করব এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে দাখিল করব।"

•তাওবার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সর্বদা সতর্ক ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থাকা। এজন্য আত্মহিসাব গ্রহণ করা। দুর্বলতা ও পাপের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃর্ণার অভাবের ফলেও অনেক সময় অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য ও উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। তাই সারা জীবনই কৃত পাপের অনুতপ্ত থাকা। সর্বদাই পাপ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে সদা চেষ্টা রাখা। মহান আল্লাহ বলেন[৭] – رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا "তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল।"

❑.সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ (ذكر الله), দু'আ(الدعاء) ও আল্লাহর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা:

ঈমান ও তাওহীদের দাবী আল্লাহর স্মরণ বা যিকর। যিকর এর আভিধানিক অর্থ–স্মরণ, উপদেশ ইত্যাদি। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে মনে-প্রাণে জাগরুক রাখাই যিক্র। কুরআনে যিক্র শব্দটি ৭৬ বার, তাযকিরা ১০ বার, মাযকূর ০১ বার, যাকিরীন ০২ বার, যাকিরাত ০১ বার, যিকরা ২৩ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৫৩ বার এসেছে।

শরীয়তের পরিভাষায়– 'মহান আল্লাহকে কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচরণে তথা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ভক্তি-ভালবাসা সহকারে হৃদয়-মনে ও মুখে স্মরণ করা'।

যিকর বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন: আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর উপর পূর্ণ নির্ভর করা, তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া, তাঁর কাছে দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করা, তাঁর নামের তসবীহ পাঠ করা, পরকালীন ভাবনা ইত্যাদি। তবে সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে কুরআন চর্চা বা তিলাওয়াত। এটা এমন এক উত্তম যিক্র যে, এর প্রায় প্রতিটি আয়াতে নৈতিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।[৮] উল্লেখ্য যে, আল্লাহর অবাধ্যচারে লিপ্ত থেকে মুখে আল্লাহর স্মরণ করলেও যিকরকারী গণ্য হবে না।

---

১. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসতি'দাদ লি ইয়াওমিল মা'আদ (الاستعداد ليوم المعاد)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭২।
২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১৭-১৮।
৩. *সুনান আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুদ দু'আত, হাদীস নং ৩৫৩৭।
৪. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ৮২।
৫. আল-কুরআন, সূরা হূদ ১১ : আয়াত ১১৪।
৬. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৩১।
৭. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা' ১৭: আয়াত ২৫।
৮. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৪৪, আল-কুরআন ০৩:১৯১।

সাঈদ ইবন যুবাইর রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর যিকির করে না, প্রকাশ্যে যত বেশি নামায এবং তাসবীহ সে পাঠ করুক না কেন।"[১]
মুজাহিদ রহ. (মৃ.১০৩ হি.) বলেন—"কোন ব্যক্তি যাকিরীনদের অর্ন্তভুক্ত হতে পারে না যে পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।"[২]
তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা, এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্য না হওয়া—মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।[৩] আর এটাই যিকর এর মূলকথা। এরূপ সর্বাস্থায় যিকরকারীদের(আল্লাহর স্মরণকারীদের) মহান আল্লাহ ভালবাসেন। তারাই সত্যিকার জ্ঞানী। তাদের প্রশংসায় মহান আল্লাহ বলেন[৪]—الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ "যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে।"

যিকর নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সোপান। এটা আত্মশুদ্ধির মুখ্য মাধ্যম। এর মাধ্যমে অন্তর আল্লাহ অভিমুখী হয়। এটা অন্তরের অন্ধকার ও মলিনতা দূর করে অন্তরে সচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা আনায়ন করে এবং তাকওয়ার বৃদ্ধি ঘটায়। শুধু তাই নয়, পাপের কারণে বান্দার আত্মার উপর যে কালিমা আপতিত হয় যিকর তা দূরীভূত করে। পার্থিব ভোগ-বিলাস অনাগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং মানুষের লোভ-লালসা লোপ পায়। এটা মানুষকে আল্লাহ অভিমুখী করে নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার শিক্ষা দেয়। এজন্য বেশী বেশী যিকর করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন[৫]—يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا- وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا "হে মু'মিনগণ! তোমারা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর, এবং সকাল-সন্ধায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-[৬] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ-"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান—সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্বরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ।"
যিকর একটি উত্তম আমল ও মুক্তি লাভের পাথেয়। জনৈক ব্যক্তি নাবী সা. কে বললেন, ইসলামের বিধান তো অনেক। তা থেকে বিশেষ একটি বলে দিন যা আকড়ে ধরবো। তখন নাবী সা. বললেন, '*তুমি তোমার জিহ্বাকে মহান আল্লাহর যিকিরে সর্বদা সজীব রাখবে*।'[৭]

দেহের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি আত্মারও শক্তি লাভের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন আছে। যিকর অত্মার খোরাক। যিক্‌রের মাধ্যম মানব হৃদয়-মন সজীবতা, প্রশান্তি ও শক্তি লাভ করে। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৮] —

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্বরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্বরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[৯]
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে আর যে আল্লাহর যিকর করে না তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায় (যিকরকারী জীবিত আর যিকরহীন ব্যক্তি মৃত)।

যিকর অন্তরকে কোমল রাখে। যিকর থেকে অন্তরকে বিরত রাখা হলে অন্তর কঠিন, শক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই যারা আল্লাহর স্মরণে বিমূখ তাদের হৃদয় কঠোর প্রকৃতির হয়ে যায়। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১০]—فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ "অতএব ধ্বংস সেই লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত।" এজন্য রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[১১], "*আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশী কথা বলা থেকে বিরত থাক, কেননা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অধিক কথা অন্তরকে কঠিন করে দেয়। আর শক্ত অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য থেকে বহু দূরে*।"

মানুষের অন্তরে যে সব কুমন্ত্রণা উদয় হয় তা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। যিকরের মাধ্যমে শয়তানের এসব কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। যিকরবিমূখ ব্যক্তিরা শয়তানের অনুসরণ করে এবং ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়। তাই এমন ব্যক্তির আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে যে, কুরআন ও আল্লাহ্ স্মরণবিমূখ।[১২] মহান আল্লাহ বলেন[১৩]—

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ-وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

---

[১]. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, খ.০১, পৃ.৩৬৬।
[২]. মূল আরবী [لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرًا، حتى يذكر الله قائما وقاعدًا ومضطجعًا] ইবনু কাছীর রহ. *তাফসীর কুরআনুল 'আযীম*, *প্রাগুক্ত*, খ.৫, পৃ.২৮৩।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাশ্‌র ৫৯: আয়াত ১৯ ।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৯১।
[৫].আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্‌যাব ৩৩ : আয়াত ৪১-৪২।
[৬].আল-কুরআন, সূরা আল-মুনাফিক্বূন ৬৩: আয়াত ০৯।
[৭]. মূল আরবী [لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله عز و جل] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৩৭৯৩; *সুনান আত-তিরমিযী*, হাদীস নং ৩৩৭৫।
[৮]. মূল আরবী [مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুদ দু'আত,হা.নং ৬০৪৪,*সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, হা.৭৭৯।
[৯].আল-কুরআন, সূরা আর্-রা'দ ১৩ : আয়াত ২৭-২৮।
[১০] .আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ২২।
[১১] .মূল আরবী [لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৪১১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮: আয়াত ২৮।
[১৩]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩ : আয়াত ৩৬-৩৭, আল-কুরআন ৫৩ :২৯- ৩০।

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্বরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে।"
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১]–"শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। বান্দা যখন আল্লাহর যিকর করে তখন শয়তান পালিয়ে যায়। যখন সে আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল হয় তখন তাকে প্ররোচনা দেয়।"

যিকর মু'মিনদের ঈমানের প্রাণশক্তি স্বরূপ। বেশী বেশী যিকর আত্মিক ও নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ঈমানকে সজীব করে। এটা তাদের সৎকর্ম সম্পাদন করতে আত্মিক শক্তি যোগায় এবং অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ বলেন-[২] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "মু'মিনতো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।" অন্যত্র বলেন-[৩]

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ "সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।"

যিকর স্রষ্টার সাথে মানবাত্মার যোগসূত্র স্থাপনের অন্যতম উপায়। যিকরের দ্বারা মানুষ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৪]–(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ) "তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব, তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়োও না।" এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন[৫],

> আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার জন্য সেরূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে লোকজনের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে আমিও এমন এক জামায়াতের মধ্যে তাকে স্মরণ করে থাকি যা তার জামায়াতের চেয়ে উত্তম। আর যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে একগজ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক বা পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে দৌড়ে অগ্রসর হই।

যিক্‌র আল্লাহর দয়া ও রহমত লাভ এবং বিপর্যয় ও বিপদ থেকে রক্ষার বড় মাধ্যম।[৬] বিশিষ্ট নাবী ইউনুছ ('আ.) কে মহান আল্লাহ যিকরের বদৌলতে বড় বিপদ (মাছের পেট) মুক্তি দান করেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]–
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ-فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ- فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ- فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ- لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
আর নিশ্চয় ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন। স্বরণ কর, যখন সে পালিয়ে একটি বোঝাই নৌযানে পৌছিল, অতঃপর সে লটারীতে অংশগ্রহণ করল এবং তাতে সে হেরে গেল। তারপর একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। তখন সে (নিজেকে) ধিক্কার দিচ্ছিল। আর সে যদি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা না করত, তবে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার পেটেই থেকে যেত। অন্যত্র বলেন[৮]- وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا "যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।"
মু'আয ইবন জাবাল রা.বলেন:'আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই'।[৯]

যিকর নৈতিকতার শিক্ষা দেয় এবং অনৈতিক বিষয় থেকে বিরত রাখে। তাই সর্বাবস্থায় যিকরে সচেষ্ট থাকা। বিশেষ করে অবসর সময়ে একাগ্রচিত্তে যিকরে আত্মনিয়োগ করা উচিত।[১০] সকাল-সন্ধ্যায়, চলা-ফেরায় ও প্রতিটি কাজকর্মে বিভিন্ন তাসবীহ ও দোয়া মাধ্যমে যিকর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১১]- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ-"এবং তাসবীহ পাঠ কর তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে, সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং তাসবীহ পাঠ কর রাতের কিছু অংশে ও দিনের প্রান্তসমূহে।" আরও বলেন[১২] - فَإِذَا

---

[১]. *মিশকাত*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুদ দু'আত, হাদীস নং ২২৮১।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮ : আয়াত ০২।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪ : আয়াত ৩৭।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৫২।
[৫]. [يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুত তাওহীদ,হাদীস নং৬৯৭০; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ, হা. নং ২৬৭৫।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৫৬।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আস্-সাফ্ফাত ৩৭ : আয়াত ১৩৯-১৪৪।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-জিন্ন ৭২: আয়াত ১৭।
[৯]. মূল আরবী [ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবুদ দু'আত, হাদীস নং ৩৩৭৭; *ইবন মাজাহ*, হা.৩৭৯০; *মুসনাদ আহমাদ*, হা.২১৭৫০।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইনশিরাহ ৯৪: আয়াত ৭-৮, আল-কুরআন ৭৩: ৯।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা ২০: আয়াত ১৩০, আল-কুরআন ৫০:৩৯-৪০, ৭৬:২৫, ৬৯:৫২, ৯৪:৭-৮,।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ১০৩।

قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ "অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ করবে।"

যিকর পার্থিব ও অপার্থিব সফলতা এবং আল্লাহর সাহায্য ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[১]– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ- "হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও।" অন্যত্র বলেন-[২] - وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- "এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।"

যিকর-এর গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত, যা কিছু দুনিয়াতে রয়েছে তাও অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকির, যা তিনি পছন্দ করেন অথবা আলিম ব্যক্তি অথবা 'ইলম শিক্ষায় রত ব্যক্তি ব্যতীত।"[৩]

> রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্টি? তোমাদের রবের নিকট অধিক সন্তোষজনক, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করা এবং নিজে শাহাদত বরণ করার চেয়েও উত্তম? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেন, 'আল্লাহর যিক্র।'

•*যিকরের আদব*: যিকর করতে হবে বিনম্রচিত্তে, অনুচ্চস্বরে, আল্লাহ ভীতি ও ধ্যান সহকারে। এ মর্মে বলা হয়েছে[৪]– وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ- "আর তুমি নিজ মনে স্বীয় রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়–বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চস্বরে। আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" ধ্যান বা আন্তরিকতাবিহীন যিকর মানুষকে ঐশী আলোর পথে এগিয়ে নিতে পারে না। মুখে যিকর আর পাপ কর্মে লিপ্ত থাকা গর্হিত কাজ। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রা. বলেন, 'দুর্ভোগ তার জন্য যে মুখে আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ করে কিন্তু কাজের বেলায় আল্লাহর নাফরমানী করে।'[৫]

দু'আ(الدعاء): দু'আ হচ্ছে এমন জিনিস চাওয়া, যা আবেদনকারীকে কল্যাণ হাসিল, অপছন্দনীয় জিনিস বা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করতে সহায়তা করে। দু'আ এমন একটি ইবাদত, যা মুমিনের কাঙ্ক্ষিত বস্তু ও বিপদ-আপদ নাজাতের অবলম্বন। দু'আ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। এর মাধ্যমে অকল্যাণ দূর হয় ও কল্যাণ লাভ করা যায়। মানুষকে অস্থিরতা, হাতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে দু'আর গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য কুরআন জীবন চলার পথে প্রতিটি পরিস্থিতিতে দু'আর শিক্ষা দিয়েছে।[৬] জীবন সংগ্রামে বাস্তবতা মোকাবিলায় দু'আর ভূমিকা নির্দেশ করতে বলা হয়েছে[৭]–

> وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ... وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ - وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ- فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ
>
> আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল,'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। ... আর স্মরণ কর যুন-নূন(ইউনুস) এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল,'আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই', আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম'। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে দেখা যাচ্ছে যে, আইউব ('আ.), ইউনুস আ. ও যাকারিয়্যা ('আ.)এর নিজ নিজ বিপদ, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভে দু'আ এক অব্যার্থ উপায়। এটা মানব জীবনে কল্যাণ ও সৌভাগ্য বয়ে আনে। রাসুল সা. বলেন–"যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে তার অভাব নিবারণ হবে না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট পেশ করে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন–হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে নতুবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে।"[৮]

❑.আল্লাহর পরিচয়, ক্ষমতা ও গুণাবলী অনুধাবনে সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা(التفكر و التدبر):

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল ০৮: আয়াত ৪৫।

২. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আহ ৬২: আয়াত ১০।

৩. মূল আরবী [الدنيا ملعونة . ملعون مافيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما] *সুনান ইবন মাজাহ*, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৪১১২।

৪ . আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ২০৫।

৫. মূল আরবী [ويل لمن يكثر ذكر الله بلسانه ويعصي الله في عمله] *কানজুল উম্মাল*, খ.১৬, পৃ.২৪, কিতাবুল মাউত, হাদীস. নং ৪৩৭৩৮।

৬. আল-কুরআন, ০২:১৮৫, ৪০:৬০ ।

৭. আল-কুরআন, ২১:৮৩-৮৪, ৮৭-৯০।

৮.মূল আরবী[من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৪৫।

জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে সৃষ্টি জগত, সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও নি'আমতরাজি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যান করাকে কুরআনের ভাষায় তাফাক্কুর বলা হয়। কুরআন মু'মিনদেরকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, ঋতুর পরিবর্তন, দিবস-রজনীর পরিবর্তন, বৃষ্টি বর্ষণ, সমুদ্র, মেঘ, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের নিয়মাবলী সম্পর্কে চিন্তা ও যুক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দেয়।[১] কুরআন মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, মানুষ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, সত্য উদ্ঘাটন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ফল-ফসল উৎপন্ন ও পরিপক্ক, প্রশস্ত ময়দানে গবাদির বিচরণ ও গৃহে প্রত্যাবর্তন, নক্ষত্রখচিত সুবিশাল আকাশ এবং নদী ও সমুদ্র বক্ষে জলযানের যাতায়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে নির্দেশ দেয়।[২] কুরআনে মহাবিশ্ব, সৃষ্টিজগত ও সৃষ্টি বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত প্রায় ৭৫৬টি আয়াত আছে।

মহান আল্লাহর পরিচয়, ক্ষমতা, গুণাবলী এবং মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহরাজি অনুধাবনে এ ধরনের চিন্তা-গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা তৈরীতে, তাওহীদ ও ঈমান সুদৃঢ়করণ, জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ঘাটন, পার্থিব লোভ-লালসা থেকে মুক্তি, তাকওয়া এবং নৈতিক মান বৃদ্ধিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য কুরআন ইবাদতের পাশাপাশি এ সব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে[৩]–

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত-দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকবানদের জন্য বহু নির্দশন। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে)'হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর'।"

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ...وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

"সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তোমাদের নিজদের মধ্যেও। তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না? "[৪]

أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

"তারা কি দৃষ্টিপাত করেনি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্বে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর(এর প্রতি যে) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গিয়েছে? সুতরাং তারা এরপর আর কোন কথার প্রতি ঈমান আনবে?"[৫]

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–"আমার রব আমাকে নয়টি নির্দেশ দিয়েছেন ১.আল্লাহ্কে গোপনে ও প্রকাশ্যে ভয় করতে; ২.সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে; ৩. দারিদ্র্যে বা প্রাচুর্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে; ৪. যে লোক আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে করতে; ৫. যে লোক আমাকে বঞ্চিত করেছে, তাকে তার অধিকার দিতে; ৬. যে আমার প্রতি অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমা করতে; ৭. মৌনতার মূহূর্তে চিন্তারত থাকতে এবং সরবতার মুহূর্তে আল্লাহ'র স্মরণে কথা বলতে; ৮. শিক্ষা গ্রহণের জন্যই কোনো বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে; ৯. আর ন্যায়বিচার বা ভালো কাজ করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে।[৬]

আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান অসংখ্য আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বা বিশ্বাস না করা গুরুতর বিভ্রান্তি। এর মন্দ পরিণাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৭]- (إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)"যারা আল্লাহ্র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না,তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়েত করেন না এবং তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি"।

❑.আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (الشكر):

শুক্র বা কৃতজ্ঞতা ঈমান ও তাওহীদের দাবী। শুক্র শব্দটি কুফর শব্দের বিপরীত। এর আভিধানিক অর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিয়ামতের স্বীকৃতি। পরিভাষায় শুক্র বলতে আল্লাহর নিয়ামতের মোকাবিলায় বিশ্বাসে, কথায় ও কাজে তার আনুগত্য করা এবং তার অবাধ্যতা হতে পারে এমন কিছু পরিহার করাকে বোঝায়।[৮] কুরআনে শুক্র শব্দটি ০১ বার, শুকূর ০২ বার, শাকূর ১০ বার, শাকির একবচনে ০৫ ও বহুবচনে ১০ বার, মাশকূর ০২ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪৬ বার এসেছে।

শুক্র বা কৃতজ্ঞতা দুই ধরনের, যথা: ক. স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা খ. সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে নিয়ামত বৃদ্ধি হয় এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আর সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

মহান আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে দিয়েছেন অগণিত নিয়ামত ও অফুরন্ত রিজ্ক। এ সবের মধ্যে কিছু রয়েছে বাহ্য বস্তু যেমন- অতি উত্তম আকৃতি, বাসস্থান, ধন-সম্পদ, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও

---

১. আল-কুরআন, ০২:১৬৪-১৬৫; ০৩:১৯০-১৯১; ২৫:৬১-৬২; ২৯:৪০; ৩০:০৮, ২০-২৫; ৩১:১০-১১।

২. আল-কুরআন, ০২:২৮-২৯; ১০:২২-২৩; ১৩: ০২-০৪; ১৪:৩২-৩৪; ১৫: ১৬-২৩; ১৬: ১০-১৮, ১৬: ৬৬-৭০; ২২:৫-৬; ২৩:১২-২১; ৪৫:০৩-০৫,

৩. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ৩: আয়াত ১৯০-১৯১।

৪. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত ৫১: আয়াত ২০-২১।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ৭: আয়াত ১৮৫; আরও দেখুন,আল-কুরআন ২:১৬৪, ৩০:০৮।

৬.মূল আরবী[أمرني ربي بتسع : خشية الله في السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضى والقصد في الفقر والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة وآمر بالعرف] *মিশকাত*, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং ৫৩৫৮।

৭. আল কুরআন,সূরা আন-নাহ্ল: আয়াত ১০৪, আরও দেখুন, আল কুরআন ১৬: ১০৭।

৮. ড.মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআনের পরিভাষা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৬।

জীবনধারণের নানাবিদ উপকরণ ইত্যাদি; কিছু রয়েছে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু যেমন, মেধা-প্রজ্ঞা, ক্ষমতা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি; আবার কিছু রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তি যেমন-অন্তর্দৃষ্টি, বিবেকবোধ, মানুষকে বোঝার ক্ষমতা ইত্যাদি।[১] মহান আল্লাহর এ সব সীমাহীন দয়া-অনুগ্রহ প্রতি লক্ষ্য করে মানুষের উচিত প্রতিনিয়ত বিনয় ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন[২](وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ)"আর তোমাদের কাছ যে সব নিআমত আছে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।"

পান করার জন্য সুস্বাদু পানি, জীবিকার জন্য ক্ষেত-খামার উৎপন্ন ফল-ফসল, নদী-সমুদ্রে উৎপন্ন মাছ, রান্না ও কাল-কারখানা কাজের জন্য আগুন, আসবাবপত্র ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য গাছ-পালা সৃষ্টি করেছেন।[৩] চতুষ্পদ জন্তুর দুধ, গোশত ও বিবিধ কল্যাণ এবং মানুষের কাছে তাদেরকে বশীভূত করে দিয়েছেন।[৪] দিন ও রাতের ভারসাম্যপূর্ণ নিত্য আবর্তন, জীবিকা নির্বাহের জন্য আলোকোজ্জ্বল দিন এবং বিশ্রামের জন্য অন্ধকার, রাত ও নিন্দ্রা সৃষ্টি পৃথিবীকে বসবাস যোগ্য করার সকল উপাদান দিয়েছেন। এভাবে মানুষের জীবন তাঁর অসংখ্য অনুগ্রহ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন-[৫]

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

"তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিআমত ব্যাপক করে দিয়েছেন; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করে জ্ঞান, হিদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়া।" অন্যত্র বলেন[৬],- وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নি'আমত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।"

আল্লাহ প্রতিটি নি'আমতের জন্য মানুষকে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত– কুরআন আমাদের এ শিক্ষাই দেয়। যেমন, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন হলো আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাঁর শোকর আদায় করা। ইরশাদ হচ্ছে[৭] وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ-আর আমি তো লুকমানকে হিকমাত দিয়েছিলাম(এবং বলেছিলাম) যে,'আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।"

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রজ্ঞাবান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী লোকমানের এ ঘটনাকে পরবর্তী মানব জাতির জন্য আদর্শ হিসেবে স্থাপন করেছেন। পরবর্তী মানব জাতির মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা অবশ্যই এ থেকে শোকর আদায়ের শিক্ষা গ্রহণ করবে। কাজেই মানব জাতির মধ্যে যারা তাদের প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তাঁর শোকর আদায়কে অস্বীকার করে তাদের চেয়ে নির্বোধ আর কেউ হতে পারে না।

স্রষ্টার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন প্রকৃত সৌজনতা ও বুদ্ধিমত্তা পরিচায়ক। মানুষ আল্লাহর এ সব নিয়ামত স্বীকার করবে, মুখে স্বীকৃতি দেবে, নিজ কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার প্রমাণ পেশ করবে। এটাই নৈতিকতার দাবী। এই প্রেরণা ও অনুভূতিই হলো ঈমানের ভিত্তি। স্রষ্টা প্রদত্ত এই অসংখ্য নিয়ামতকে অস্বীকার করা এবং নিয়ামত দাতার শুকরিয়া আদায় না করা অকৃতজ্ঞতা, অনৈতিকতা ও নির্বুদ্ধিতা। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৮]– أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ "এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবনোপকরন দান করবে, তিনি যদি তার জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন? বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।"

শুক্‌র আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামত বৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভ হয়। এতে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। এর মধ্যেই পার্থিব ও পরকালীন নানা কল্যাণ নিহিত আছে। মহান আল্লাহ বলেন[৯] -لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ "তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব।" আরও বলেন[১০]–يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ "হে মুমিনগণ, আহার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহ্‌র জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর।"

শুক্‌র যেমন কল্যাণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম, তেমনি এর বিপরীত রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।[১১] এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[১২]– وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ "তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৭৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৩:৭৮, ৬৭:২৩।
২. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬: আয়াত ৫৩।
৩. আল-কুরআন ৬৩-৭৪, আরও দেখুন, আল-কুরআন ২৮:৭১-৭২,৩৫:১২, ১৫:১৯-২১, ১৬:১৪, ৪৩:১২-১৪, ৪৫:১২ ,৮০:২৫-৩২।
৪. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসীন ৩৬: আয়াত ৭১-৭৩, আল-কুরআন ২৩:২২, ১৬:৬৬।
৫. আল-কুরআন, সূরা লুকমান ৩১: আয়াত ২০।
৬. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ৩৪।
৭. আল কুরআন,সূরা লুকমান ৩১: আয়াত ১২।
৮. আল-কুরআন, সূরা আল-মুল্‌ক ৬৭: আয়াত ২১।
৯. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ০৭।
১০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৭২; আরও দেখুন, আল-কুরআন ১৬:১১৪, ৩৪:১৫।
১১. আল-কুরআন, সূরা ইব্‌রাহীম ১৪: আয়াত ০৭।
১২. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৫২।

শুক্র আদায় জ্ঞানীর নিদর্শন। আল্লাহর জ্ঞানী ও প্রিয় বান্দারা শোকরগুজার হন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[১] –"মহান আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যে আহার করে আল্লাহর গুণগান করে এবং পানীয় পান করে তাঁর প্রশংসা করে।"

স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সাথে সাথে সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা আদায় করাও জরুরী। কেননা প্রত্যেক মানুষের প্রতি অন্যের অনুগ্রহ থাকে। সেই অনুগ্রহকারী হতে পারে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী কিংবা সাধারণ মানুষ। মানুষের অনুগ্রহ, সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুদানের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নৈতিক কর্তব্য। কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। কৃতজ্ঞতার পন্থা হল, অনুগ্রহ স্বীকার করা ও অনুগ্রহকারীর প্রশাংসা জ্ঞাপন করা।[২] অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করা, সম্ভব না হলে তার জন্য কল্যাণ কামনা করা। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন[৩]-"যে ব্যক্তি মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হয় না।"

রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেন[৪]–'যাকে কোন হাদিয়া দেয়া হলো এবং সে তা গ্রহণ করল এমতাবস্থায় সে যেন হাদিয়া প্রদান কারীকে প্রতিদান দেয়। প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকলে সে যেন তার প্রশংসা করে। কেননা যে হাদিয়া প্রদানকারীর প্রশংসা করল সে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করল। আর যে হাদীয়া প্রদানের ব্যাপারটি গোপন করল সে অকৃজ্ঞতা করল।'

শোকর জীবনে নানাবিদ কল্যাণ বয়ে আনে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়।[৫] পক্ষান্তরে, অকৃতজ্ঞতা নানা দুর্ভাগ্যের কারণ। অকৃতজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন জাতি বা ব্যক্তিকে প্রদত্ত নিয়ামত কেড়ে নিয়ে শাস্তি প্রদান করা। এক্ষেত্রে কুরআনে সাবার অধিবাসীদের[৬] ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন[৭] –

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ- فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ- ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ-

"নিশ্চয় সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শন : দু'টি উদ্যান, একটি ডানে ও অপরটি বামে, (তাদেরকে বলা হয়েছিল) 'তোমরা তোমাদের রবের রিয্ক থেকে খাও আর তাঁর শোকর কর। এটি উত্তম শহর এবং (তোমাদের রব) ক্ষমাশীল রব'। তারপরও তারা মখু ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাধঁ ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম।আর আমি তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় তিক্ত ফলের গাছ, ঝাউগাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ। সে আযাব আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আর আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া অন্য কাউকে এমন আযাব দেই না।"

অকৃতজ্ঞতার কারণে পূণ্যবান ব্যক্তিও আল্লাহর শাস্তি সম্মুখীন হতে পারেন। [দেখুন, আল-কুরআন ৭:১৭৫-১৭৬]

মুমিনগণ আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ধন-সম্পদই একমাত্র নিয়ামত নয়, যার জন্য তারা আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। বরং আল্লাহই সবকিছুর মালিক ও অধিকারী জেনে ঈমানদাররা তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতবোধ করেন। তাদের সুস্বাস্থ্য, সুষমা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধর্মপ্রীতি, অধর্ম বিদ্বেষ, সমঝদারিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি ও ক্ষমতার জন্য। তারা কৃতজ্ঞ, ঠিক পথে পরিচালিত হবার জন্য এবং ঈমানদারদের দলে অন্তর্ভক্ত থাকার জন্য। ...পক্ষান্তরে একজন অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি এমনকি সর্বাধিক মনোরম পরিবেশের মধ্যেও ত্রুটি ও অপূর্ণতা আবিষ্কার করে অতৃপ্ত ও অসুখী হবে।...কৃতজ্ঞতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, আন্তরিকতা। আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমপর্ণ না করে এবং আল্লাহর অশেষ করুণা ও অনুকম্পাজনিত অন্তরের শান্তি উপলব্ধি না করে আল্লাহর প্রতি লোক দেখানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চরম আন্তরিকতাহীনতা তথা ভণ্ডামিরই নামান্তর। আল্লাহ জানেন প্রতিটি হৃদয়ের প্রবৃত্তি কি। ভণ্ডামি লুকাবে কোথায়? মনের অসৎ উদ্দেশ্যগুলো অন্যদের কাছ থেকে লুকানো যাবে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে নয়। এ ধরনের লোকেরা সুদিনে জাঁকজমক করে কৃতজ্ঞতার প্রদর্শনী করতে পারে কিন্তু দুঃসময়ে খুব সহজেই তারা অকৃতজ্ঞতায় পতিত হবে।[৮]

শুক্রের পুরস্কার: শুক্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম উপায়। আল্লাহ শোকরগুজার বান্দাদের ভালবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন[৯]-وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ- "বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" অন্যত্র বলেন[১০], إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ "তোমরা যদি কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না এবং তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন।"

শুক্র আদায়ের পন্থা: বিভিন্ন পন্থায় শুক্র আদায় করা যেতে পারে। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি দিক হলো–

---

[১].মূল আরবী[إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها]*সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ, হাদীস নং ২৭৩৪।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দুহা ৯৩:আয়াত ১১।

[৩]. মূল আরবী [لا يشكر الله من لا يشكر الناس] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ৪৮১১, *সুনান আত-তিরমিযী*, হাদীস নং ২০৩৪।

[৪].মূল আরবী[من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره] *সুনান আবূ দাউদ*, কিতাবুল আদব, হা. নং ৪৮১৩; *তিরমিযী*, হা.নং ১৯৫৪।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ৪০।

[৬]. সাবার অধিবাসী,

[৭]. আল-কুরআন, সূরা সাবা' ৩৪: আয়াত ১৫-১৭, আল-কুরআন ২১ : ৪৪।

[৮]. হারুন ইয়াহিয়া, *কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য*, অনুবাদ-আবুল বাশার (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল,১ম সং. ২০০৩),পৃ.১৬-১৭।

[৯]. আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ১৪৪।

[১০] .আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ৭।

ক).আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার পন্থা হল, একমাত্র তাঁর ইবাদত করা ও অপর কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার না করা।[১] আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামত তাঁর নির্দেশিত পন্থায় ভালো কাজে ব্যয় করা। আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাদের নির্দেশিত পথে চলা। বিনীতভাবে সৎকর্ম সম্পন্ন করা। কুরআন এক্ষেত্রে সুলাইমান ('আ.) দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।[২] আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার স্বাভাবিক দাবী এই যে, বান্দা তাঁর দান ও দয়ায় অপর কাউকে অংশীদার করবে না। সে তার ভালবাসা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সকল আবেগ ও অনুভূতি একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করবে।[৩] আল্লাহর প্রতি শোকর আদায় ক্ষেত্রে আমল বৃদ্ধি এবং যথাসাধ্য ইবাদতের চেষ্টা করা। মুগীরা ইবন শু'বা রা. বলেন, রাসূল সা. (এতে দীর্ঘ সময় ধরে) নামাজ পড়তেন যে, তাঁর পাদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হলো যে, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন? আপনার তো আগের ও পরের যাবতীয় গোনাহই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?[৪]

খ). নি'আমতের স্বীকৃতি ও নি'আমতদাতার প্রশাংসা জ্ঞাপন করা। মহান আল্লাহ বলেন[৫]–وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ- "আর তোমার রবের অনুগ্রহ তুমি বর্ণনা কর।" এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন[৬]–কেউ আল্লাহর নামে আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দাও। এবং কেউ আল্লাহর নামে চাইলে তাকে দাও। কেউ আল্লাহর নামে আহবান করলে তার আহবানে সাড়া দাও। কেউ তোমাদের কোন উপকার করলে তার উপযুক্ত প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকলে তার জন্য দু'আ করতে থাক যতক্ষণ না মনে হবে তোমার পক্ষ থেকে তার প্রতিদান যথেষ্ট হয়েছে।

গ). আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের নির্দশন নিজের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। এ মর্মে নাবী সা. বলেন[৭]"আল্লাহ তা'আলা কাউকে নি'আমত দান করলে তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর দেয়া নি'আমতের নির্দশন যেন তাঁর বান্দার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।"

ঘ). প্রাপ্ত নি'আমত তথা স্বীয় রিযক, স্ত্রী, সন্তান, মেধা ও সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ফায়সালা প্রতি কোন অসন্তুষ্টি, আক্ষেপ বা অভিযোগ ব্যক্ত না করা। এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে[৮]- فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ- সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে প্রদান করলাম তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

❑.আত্মসংশোধন ও আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس):

আত্মশুদ্ধির আরবী প্রতিশব্দ تزكية النفس। আরবী তাযকিয়াহ (تزكية)অর্থ–পরিশুদ্ধ করা, পবিত্র করা, পরিচ্ছন্ন করা, আর নাফস (النفس)[৯] অর্থ-আত্মা। অন্তরকে শিরক, কুফর, নিফাক, রিয়া, ভ্রান্তবিশ্বাস, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কৃপণতা, নির্দয়তা, মিথ্যাচার, মূর্খতা, কুপ্রবৃত্তির কামনা সহ যাবতীয় মন্দ গুণাবলী থেকে পরিশুদ্ধ করার নাম আত্মশুদ্ধি।

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার নফস ও শয়তান। মানুষের মধ্যে শয়তান তার অধিকাংশ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে নফসের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, নফসের মধ্যে ভালো-মন্দ দুটি বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে, যার একটি শয়তানসুলভ বৃত্তি, অপরটি ফিরিশতাসুলভ বৃত্তি। যে মানব অন্তর শয়তানসুলভ মন্দ বৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত তাই নাফসে আম্মারাহ (কুপ্রবৃত্তি)। এই নফস মানুষকে কামনা-বাসনা, অহঙ্কার, হিংসা, লোভ, আত্মতুষ্টি, রিয়া, কপটতা ইত্যাদি নানা ধোঁকার জালে আবদ্ধ

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২১- ২২।
[২]. দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আন্-নাম্ল ২৭: আয়াত ১৬-১৯।
[৩]. মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী,*আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*,অনু.এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, (ঢাকা: ইফাবা, ২য় সংস্করণ ২০০৫), পৃ.৩৩।
[৪]. মূল আরবী [أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا ؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবু সিফাতিল মুনাফিকীন ওয়া আহকামুহুম, হাদীস নং ২৮১৯।
[৫]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দুহা ৯৩: আয়াত ১১।
[৬].মূল আরবী [من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه]*সুনান আবূ দাঊদ*, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ১৬৭২।
[৭]. মূল আরবী [من أنعم الله عز و جل عليه نعمة فان الله عز و جل يحب ان يرى أثر نعمته على خلقه] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, খ.০৪, পৃ. ৩৩৮, হাদীস নং ১৯৯৪৮।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-আরাফ ০৭: আয়াত ১৪৪।
[৯]. **নাফস চার প্রকার,** যথা– ক. নাফসে আম্মারাহ, খ. নাফসে লাওয়্যামাহ, গ.নাফসে মুলহামাহ, ও ঘ.নাফসে মুতমায়িন্নাহ।
ক. নাফসে আম্মারাহ (النَّفْسَ الأَمَّارَةُ-কুপ্রবৃত্তি): যে প্রবৃত্তি মানুষকে সর্বদাই অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে উস্থানী দেয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন– وَمَا أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ মানুষের মন অবশ্যই মন্দ প্রবণ, কিন্তু সে নহে, যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। [আল-কুরআন ,সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ৫৩]।
খ. নাফসে লাওয়্যামাহ (النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ-তিরস্কারকারী নাফস): যে নাফস নিজের কাজের হিসাব নিয়ে স্বীয় মন্দ কাজের জন্য নিজকে ধিক্কার দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ -আর শপথ তিরস্কারকারী আত্মার। আল-কুরআন ,সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ৭৫: আয়াত ০২।
গ.নাফসে মুলহামাহ (النَّفْسُ الْمُلْهَمَةُ-এলহাম প্রাপ্ত নাফস): যে নফস ভাল-মন্দ নির্ণয় করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন- وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا-فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا কসম নাফ্সের এবং যিনি তা সুষম করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। [আল-কুরআন, সূরা আশ-শাম্স ৯১: আয়াত ০৭-০৮]।
ঘ.নাফসে মুতমায়িন্নাহ (النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ -প্রশান্ত আত্মা): যে নফস আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে, যা রুহ ও বিবেকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي- হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ কর আমার জান্নতে। [আল-কুরআন, সূরা আল-ফাজ্র ৮৯: আয়াত ২৭–৩০]।
উল্লেখিত শ্রেণীভেদের মধ্যে শুধু নাফসে আম্মারাহ(কুপ্রবৃত্তি) নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। আর নাফসে লাওয়্যামাহ (তিরস্কারকারী নাফস), নাফসে মুলহামাহ (এলহাম প্রাপ্ত নাফস) ও নাফসে মুতমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) এদের প্রত্যেকেই প্রশংসনীয়। তবে মর্যাদায় একে অন্যের থেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। তবে এদের মধ্যে চূড়ান্ত মর্যাদা সম্পন্ন ও অভীষ্ট স্তর হল নাফসে মুতমায়িন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) ।

করে এবং মানুষকে সর্বদা পাপ ও মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। শুধু তাই নয়, এটা মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিচ্যুত করে অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তির মধ্যে নাফসে আম্মারাহ (কুপ্রবৃত্তি) যত শক্তিশালী হয় তার ফিরিশতাসুলভ বৃত্তি তত দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে নাফসে আম্মারাহর অধিকারী ব্যক্তিরা পশুপর্যায়ে বা তার চেয়ে নিম্ন স্তরে চলে যায়। পক্ষান্তরে, যে সব মানব অন্তর ফিরিশতাসুলভ ভালো বৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত, যা ব্যক্তিকে সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে তাই নাফসে মুতমায়িন্নাহ(প্রশান্ত আত্মা), এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ফিরিশতা বা তাদের চেয়েও উচু স্তরে চলে যায়। কেবল আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ নাফসে আম্মারাহ-এর সব অনিষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে নাফসে মুতমায়িন্নাহ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। তাই আত্মশুদ্ধি ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষ লাভ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কেননা অন্তর ব্যক্তির সবকিছুর কেন্দ্রস্থল ও তার পরিচালক। অন্তর কলুষাচ্ছন্ন হলে ব্যক্তি কলুষাচ্ছন্ন হয়, আর অন্তর পরিশুদ্ধ হলে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ ও কলুষমুক্ত হয়। তাই কুরআন আত্মশুদ্ধিকে ব্যক্তির সফলতা এবং আত্মিক কলুষতাকে তার ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-[১], قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا "সে-ই সফলকাম হবে যে নিজকে পবিত্র করবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।" অন্যত্র বলেন-[২] قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى "সে-ই সাফলকাম হবে যে আত্মশুদ্ধি করবে।"
উল্লেখিত আয়াতে আত্মশুদ্ধি অর্জনকে সফলতার মূল এবং আত্মিক কলুষতাকে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হাদীসেও আত্মশুদ্ধিকে ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়নের প্রধান উপাদান চিহ্নিত করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন-[৩] *"নিশ্চয়ই মানুষের শরীরে এক টুকরা গোশত আছে– তা বিশুদ্ধ থাকলে গোটা শরীর সুস্থ থাকে। আর তা বিনষ্ট হলে গোটা শরীরই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায়। জেনে রেখো ঐ গোশতের টুকরাটি মানুষের কলব বা অন্তর।"*

আত্মশুদ্ধি ইসলামের একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাবী-রাসূলদের মিশন ও সার্বিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধিকরণ ও কলুষমুক্তকরণ। মহান আল্লাহ বলেন[৪] كَمَاأَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاًمِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ "যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর যা তোমরা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।" অন্যত্র বলেন[৫], وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ "আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও শুধরে নিয়েছে, তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।"

আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে রাসূল সা. অতীব গুরুত্ব আরোপ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন[৬]–"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের শারীরিক সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের দিকে তাকাবেন না বরং তোমাদের অন্তর ও কাজের দিকে তাকাবেন।"

ইসলামের ইবাদতসমূহের উদ্দেশ্য আল্লাহকে খুশী করা হলেও এগুলোতে বহুবিদ কল্যাণ ও নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। ঈমান, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ, যিক্র, ইত্যাদি ইবাদত মানুষের মধ্যে সদগুণাবলীর উন্মেষ ঘটায়, আত্মিক কলুষতা দূর করে এবং মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ সব ইবাদতসহ যাবতীয় ইবাদতের উদ্দেশ্য তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি অর্জন। আর আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষ উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হয়। এভাবে আত্মশুদ্ধি মানুষকে প্রভূত কল্যাণ ও সম্মানে ভূষিত করে। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-[৭] وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ "যে কেউ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য।" এজন্যই ইবরাহীম ইবন আদহাম রহ. (মৃ.১৬৫হি.) বলেছেন, 'কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। যে নিজের মনকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে হেফাযত করতে পারবে, সে দুনিয়া ও দুনিয়ার বালা-মুছীবত থেকে আরামে থাকবে। সে দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকেও রক্ষা পাবে'।[৮]

আত্মসংশোধন মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতার মুখ্য মাধ্যম। এটা মানুষের আচার-আচরণ, কর্মকাণ্ড ও চরিত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করে। ছাড়াও আত্মশুদ্ধি আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভের প্রধান উপকরণ। কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ পরিশুদ্ধ আত্মার লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং উচু মর্যাদায় সমাসীন করবেন। কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলা হয়েছে যে[৯], يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ -إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্তুতি কোন কাজে আসবে না, সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে।"

---

১. আল-কুরআন, সূরা আশ-শাম্‌স ৯১: আয়াত ৯-১০।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-আ'লা ৮৭: আয়াত ১৪-১৫।
৩.মূল আরবী[ألا وإن في الجسد مضغة إذاصلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهي القلب] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, হা.নং ৫২; *মুসলিম*, হা.১৫৯৯।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ১৫১; আরও দেখুন, আল-কুরআন ২:১২৯, ৩:১৬৪, ৬২:২।
৫. আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম ০৬: আয়াত ৪৮।
৬.মূল আরবী [إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم] *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং ২৫৬৪।
৭. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির ৩৫: আয়াত ১৮।
৮. আবূ নু'আইম, *প্রাগুক্ত*, খ.০৮, পৃ.১৮।
৯. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা' ২৬ : আয়াত ৮৮-৮৯।

ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, *কালব সালীম* হলো সেই অন্তর, যে অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অথবা আল্লাহর ইবাদত ছাড়া, বা আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিংবা আল্লাহর ভালবাসা ছাড়া অন্য সকলের ভালবাসা থেকে পূত-পবিত্র ও সুরক্ষিত থাকবে।[১]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, *কালব সালীম* হলো সেই অন্তর, যা শিরক, গোপন শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, অহঙ্কার, দুনিয়ার ভালবাসা ও নেতৃত্বের লোভ থেকে মুক্ত। এবং তা প্রত্যেক সেসব আপদ থেকে মুক্ত যা আল্লাহর থেকে দূরে সরে দেয়। এবং যা সেসব ব্যাপারে সন্দেহ মুক্ত যা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। এবং সেসব বিষয় থেকে কামনা মুক্ত যা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত এবং সেসব আশা-আকাঙ্খা থেকে মুক্ত যা তাঁর নৈকট্য লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সেসব বিচ্ছিন্নকারী বিষয় থেকে যা তাকে আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।[২]

বস্তুত হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কৃপণতা, অহঙ্কারসহ সব মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত নির্মল অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মানুষ।এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবন আমর রা.বলেন, রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? তিনি উত্তরে বললেন,

> ‘প্রত্যেক শুদ্ধ অন্তর ও সত্যভাষী ব্যক্তি’। সাহাবীগণ বললেন, সত্যভাষীকে আমরা চিনতে পেরেছি, কিন্তু নির্মল অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিকে কিভাবে চিনব? তিনি বললেন, তা এমন অন্তর যা আল্লাহভীরু, নির্মল-পরিচ্ছন্ন, পাপমুক্ত, যা সত্যবিমুখ নয় এবং যাতে হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই।[৩]

মানুষের মূল কৃতিত্ব বা গুণ হল তার ভিতরকার পশু প্রকৃতিতে মানব প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রবৃত্তির তাড়নাকে বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা বশীভূত রাখা। তারই ফলে মানুষ জীব জগতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে।[৪] আর আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। তাই কুরআন প্রবৃত্তির অনুগামী না হয়ে আত্মশুদ্ধি অর্জনে তাকিদ দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে[৫] هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى “তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত-যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রুণরূপে ছিল। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।” আরও বলা হয়েছে[৬]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।” অন্যত্র এসেছে-[৭]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

“তুমি কি তাদেরকে দেখ নি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে ? বরং আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন।”

উদ্ধৃত আয়াতসমূহে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং আত্মশুদ্ধিহীন মানুষ সহজে যে বিভ্রান্ত হতে পারে তার দিকে ইঙ্গিত করে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাই রাসূল সা. বলেন,[৮] “বুদ্ধিমান মানুষ সে ব্যক্তি যে নিজ প্রবৃত্তিকে অনুগত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর নির্বোধ অক্ষম সে ব্যক্তি যে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে আশা পোষণ করে।”

শয়তানী শক্তির প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আল্লাহর আনুগত্য ও সত্যের উপর টিকে থাকতে হলে মানব জীবনে আত্মার পরিশুদ্ধি অতীব জরুরী। আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটা জরুরী নিম্নোক্ত হাদীস থেকে তা অনুধাবন করা যায়। মুয়ায (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাকে অনুরোধ করলো যে, আপনি রাসূল সা. থেকে শোনা একটি হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করুণ মুয়ায তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। আমার আশংকা হচ্ছিল যে, তিনি বোধ হয় শীঘ্র কান্না থামাবেন না। কিছুক্ষণ পর থামলেন। তারপর বললেন, একবার রাসূল সা. আমাকে বললেন,

> হে মুয়ায! আমি বললাম, “আমি উপস্থিত। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক।” তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা বলছি, যা স্মরণ রাখলে তোমার অনেক উপকার হবে। আর যদি ভুলে যাও এবং মনে না রাখ, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তোমার জবাবদিহির কিছু থাকবে না। হে মুয়ায! আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ সাতজন ফিরিশতাকে সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর আকাশসমূহ সৃষ্টি করলেন এবং উক্ত সাতজন ফিরিশতার এক একজনকে প্রত্যেক আকাশের দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করতঃ আকাশগুলোকে মহিমান্বিত বানালেন। অতঃপর প্রত্যেক বান্দার ‘আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃত ‘আমলসমূহ নিয়ে আকাশে আরোহণ করেন। এ সময় তার সৎ কাজগুলো থেকে সূর্যের কিরণের ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই ফিরিশতারা যখন প্রথম আকাশের কাছাকাছি আসেন, তখন তারা তাদের বহন করে আনা সৎ কাজের প্রচুর প্রশংসা করেন। (যাতে আকাশে আরোহন করা যায়) তখন উক্ত আকাশের দ্বাররক্ষক ফিরিশতা সৎকাজ সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদেরকে বলেন, এই সৎকাজকে তার কর্তার

---

[১]. ইমাম ইবন তাইমিয়াহ, *আল-‘উবুদিয়্যাহ, মাজমু‘ল ফাতাওয়া, প্রাগুক্ত*, খ.১০, পৃ. ২১৮-২১৯।

[২].মূল আরবী [والقلب السليم هو الذى سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله] ইবনুল ক্বাইয়িম, *আল-জাওয়াবুল কাফী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

[৩].মূল আরবী [أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب ؟ قال هو التقي النقيث لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী, *আস-সুনান*, তাহক্বীক, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী (বৈরুত:দারুল ফিকর,তা.বি.) কিতাবুয যুহদ, হা. নং ৪২১৬।

[৪]. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, প্রাগুক্ত,পৃ-১৬৩।

[৫]. আল-কুরআন,সূরা আন-নাজ্‌ম ৫৩ : আয়াত ৩২।

[৬]. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর ২৪: আয়াত ২১।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আন্‌-নিসা’ ০৪: আয়াত ৪৯।

[৮].মূল আরবী[الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله] *সুনান আত-তিরমিযী*, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, হা.নং ২৪৫৯, *ইবন মাজাহ*, হা.৪২৬০।

মুখের ওপর ছুঁরে মারো। আমি গীবতের তদারককারী। আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোন গীবতকারীর সৎকাজকে আমার উর্ধ্বে আরোহণ করতে না দেই ।

এরপর কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ পুনরায় কোন এক বান্দার সৎকাজ নিয়ে আসেন। তারা উক্ত কাজের প্রচুর প্রশংসা করে প্রথম আকাশ অতিক্রম করে দ্বিতীয় আকাশের কাছে চলে যেতে সমর্থ হন। দ্বিতীয় আকাশের দ্বাররক্ষক ফিরিশতা তাদেরকে বলেন, তোমরা এখানেই থামো। এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ছুঁরে মারো। কেননা সে এই সৎকাজ দ্বারা পার্থিব স্বার্থ অর্জন করতে চেয়েছিল। আমার প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছেন আমি যেন এই সৎকাজকে আর সামনে অগ্রসর হতে না দেই। এই ব্যক্তি মানুষের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রকাশ করত।

আবার কখনো কখনো বান্দার কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা কোন এক বান্দার জ্যোতির্ময় সৎকাজ নিয়ে তৃতীয় আকাশ পর্যন্ত চলে আসে। তার নামায, রোযা, সদকায় উক্ত ফিরিশতারা মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু তৃতীয় আকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা তাদেরকে বলেন, তোমরা আর এগিও না। এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারো। আমি অহংকারের তদারককারী ফিরিশতা। আমাকে আমার প্রতিপালক এই ব্যক্তির সৎকাজকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে না দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। কারণ সে মানুষের সামনে অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতো ।

বান্দাদের 'আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা আবার কখনো কখনো কোন বান্দার এমন সৎকাজ নিয়ে আসেন, যা নক্ষত্রের মত ঝিকমিক করে। নামায, হজ্ব, ওমরা ও তাসবীহ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফিরিশতারা এগুলি নিয়ে চতুর্থ আকাশের প্রবেশদ্বার পযর্ন্ত পৌঁছে যায়। তখন আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন, তোমরা থামো এবং এই সৎকাজ তার কর্তার মুখে, পেটে ও পিঠে ছুঁড়ে মারো। আমি আত্মতুষ্টির(তদারককারী) ফিরিশতা। এই ব্যক্তি যখনই কোন সৎকাজ করত তাতে সে আত্মতুষ্টিতে লিপ্ত হতো। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন, যেন তার কোন কাজকে সামনে অগ্রসর হতে না দিই।

আবার কখনো কখনো আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতারা কোন বান্দার সৎকাজ নিয়ে পঞ্চম আকাশের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত উপস্থিত হয়। নবপরিণীতা স্ত্রী যেভাবে নিজের স্বামীর নিকট (সুসজ্জিত হয়ে) আসে। পঞ্চম আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন, থামো, এই ব্যক্তির সৎকাজকে তার মুখের ওপর ছুঁরে মারো এবং তার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও। আমি হিংসার (তদারককারী) ফিরিশতা। যারা তার সমপর্যায়ে ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও আমল করতো, তাদেরকে সে হিংসা করতো। আর যে ব্যক্তি ইবাদতে তার চেয়ে অগ্রণী হতো, তার প্রতিও ঈর্ষাকাতর থাকতো এবং তার বিরুদ্ধে নিন্দা করতো। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তার আমলকে সামনে অগ্রসর হতে না দিই।

আবার কোন কোন সময় বান্দাদের আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতা কোন এক বান্দার নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা প্রভৃতি সৎকাজ বহন করে ষষ্ঠ আকাশের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত চলে আসেন। তখন এ আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন, তোমরা থামো এবং এই বান্দার এই সৎকাজকে তার মুখের ওপর ছুঁরে মারো। কেননা সে মানুষের ওপর দয়া করতো না, তা সে যতই দুর্দশা ও বিপদ-মুসিবতে পতিত হোক না কেন। বরং সে অন্যের দুঃখে আনন্দবোধ করতো। আমি দয়ার ফিরিশতা। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন তার আমলকে সামনে অগ্রসর হতে না দিই ।

আবার কখনো কখনো আমল সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ কোন বান্দার, রোযা, আল্লাহর পথে দান, চেষ্টা-সাধনা ও পরহেজগারী ইত্যাদি বহন করে সপ্তম আকাশের প্রবেশদ্বারে পৌঁছেন। তার আমল থেকে বিদ্যুতের মত চমক ও সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে এবং তাদের সাথে তিন হাজার ফিরিশতা থাকে, এভাবে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছলে ঐ আকাশের দায়িত্বশীল ফিরিশতা তাদেরকে বলেন, তোমরা থামো এবং এই এই সৎকাজকে তার কর্তার মুখের ওপর ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর ছুঁড়ে মারো এবং তার হৃদয়কে তালাবদ্ধ করে দাও। যে সৎকাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় না, তা আল্লাহর কাছে যাওয়া প্রতিহত করা আমার দায়িত্ব । এই ব্যক্তি তার এই সৎকাজ দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য আরো সন্তুষ্টি কামনা করেছে। সে চেয়েছিল ফকীহদের নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক, আলেমদের নিকট তার খ্যাতি বাড়ুক এবং দেশে সে খ্যাতিমান হোক। আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর আমল আর সামনে অগ্রসর হতে না পারে। খাঁটিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয় না তা-ই রিয়া। রিয়াকারী সৎকাজ আল্লাহ কবুল করেন না।

আবার আমল সংরক্ষক ফিরিশতারা কখনো কখনো কোন বান্দার নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব, সচ্চরিত্র ও সদাচরণ, নীরবতা, আল্লাহর যিকির ইত্যাদি সৎকাজ বহন করে আকাশের ফিরিশতাদের সাথে নিয়ে সব পর্দা অতিক্রম করে সপ্তম আকাশের উর্ধ্বে আরোহণ করে আল্লাহর সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং উক্ত বান্দার একনিষ্ঠ সৎকাজের পক্ষে সাক্ষ্য দেন। আল্লাহ তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার কার্যকলাপ সংরক্ষণকারী, কিন্তু অন্তরের খবর রাখি শুধু আমি। এই বান্দা এই আমল দ্বারা আমার সন্তুষ্টি চায়নি, সে অন্য কারো সন্তুষ্টি চেয়েছে। তার ওপর আমার অভিসম্পাত। অতঃপর সব ফিরিশতা, সব আকাশ ও আকাশে যা কিছু আছে সবাই তার ওপর অভিসম্পাত দেয়।

মুয়ায বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আর আমি মুয়ায। (আমার আমলে ত্রুটি থাকলে কী উপায় হবে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার আমলে ত্রুটি থাকলে আমার অনুকরণ করতে থাকো। হে মুয়ায, আল কুরআন বহনকারীদের (যারা কুরআন অধ্যয়ন ও তদানুযায়ী কাজ করে) নিন্দা থেকে তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। তোমার গুনাহ নিজের ওপরেই রাখো, তাদের ওপরে চাপিও না। তাদের নিন্দা করে নিজেকে সৎ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করো না। তাদের চেয়ে অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা করো না। দুনিয়ার কাজকে আখিরাতের মধ্যে প্রবেশ করিও না। অহংকার প্রকাশ করো না, যাতে লোকেরা তোমার খারাপ ব্যবহারের ভয়ে তোমাকে এড়িয়ে চলে। তৃতীয় ব্যক্তি তোমার কাছে থাকা অবস্থায় কারো সাথে গোপনে

কথা বলো না। মানুষের ওপর বড়াই করো না, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করো না, তাহলে জাহান্নামের কুকুরগুলো তোমার হাড়-মাংস ছিন্ন-ভিন্ন করবে। আল্লাহ বলেছেন, "যারা ছিন্ন-ভিন্ন করবে তাদের শপথ।" হে মুয়ায, জানো এরা কারা? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এরা কারা? তিনি বললেন, জাহান্নামের কুকুর, জাহান্নামবাসীদের হাড়-মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে আলাদা আলাদা করবে। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। এই সব সৎগুণ অর্জন ও এই সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া কিভাবে সম্ভব? রাসূল (সা.) বললেন, "আল্লাহ যার জন্য সহজ করে দেন, তার জন্য এটা সহজ কাজ।" এরপর মুয়ায এই হাদীসে বর্ণিত বিষয়গুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক মাত্রায় আল-কুরআন অধ্যয়ন করতেন।[১]

উল্লেখিত হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, গীবত, শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই, অহঙ্কার, আত্মতুষ্টি, হিংসা, নির্দয়-নিমর্মতা, রিয়া ও ইখলাসহীনতা ইত্যাদি মন্দ গুণ তথা অশুদ্ধ অন্তর মানুষের কষ্টার্জিত যাবতীয় ইবাদত ও সৎকর্মসমূহকে নিষ্ফল করে দেয়। এই মন্দ বিষয়গুলোতে এমন ব্যক্তিরা জড়িত, যারা সমাজে দ্বীনদার কিংবা আলিম হিসেবে পরিচিত। আর এ সব অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় আত্মশুদ্ধি।

আত্মশুদ্ধি(তাযকিয়াতুন নাফস)এর উপায়সমূহ: আত্মশুদ্ধি অর্জনের ব্যাপারে ইসলাম সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা বাতলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে হল: ক. আল্লাহর নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁর করুণার উপর নির্ভরশীল হওয়া।[২] খ.তাওবা-ইসতিগফার, গ.নফল সালাত ও সাওম, ঘ.যিকরুল্লাহ(আল্লাহর স্মরণ), ঙ.চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন তিলাওয়াত, চ.তাকওয়া অবলম্বন, ছ.সৎকর্ম সম্পাদন, জ.আল্লাহর পথে ব্যয়, ঝ.নিজ অবস্থার সংশোধন, ঞ.রাতের শেষভাগে জেগে ইবাদত ও তাহাজ্জুদ, ট.আল্লাহর নিকট দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা, ঠ.বিনয়-নম্রতা অবলম্বন এবং আত্মপ্রশংসা না করা, ড. পূণ্যবান আলিমদের সাহচর্য, এক্ষেত্রে নামধারী আলিম ও ভণ্ড পীর থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

❑. কুরআন-সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল:

মহান আল্লাহর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে জীবনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রত্যেক বিশ্বাসীর কর্তব্য কুরআন-সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়া। জীবনের যে সব ক্ষেত্রে দ্বীনের ঘাটতি আছে সেখানে দ্বীনের বিধি-নিষেধ পালন করা। মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের আংশিক অনুসরণ ও আংশিক পরিহার সত্যিকার মুসলিম হওয়া এবং হিদায়েত লাভের পথে বড় অন্তরায়। এতে ইসলামের প্রকৃত কল্যাণ লাভ অসম্ভব। বর্তমান মুসলিম সমাজের অধিকাংশই ব্যক্তি জীবনে নামায-রোজা কিংবা ইসলামের দু'চারটা বিধান মানলেও জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের বিপরীত আদর্শ গ্রহণ করছে। সমাজে দেখা যায় অনেকে নামায পড়ে ও রোজা রাখে, কিন্তু এর বাইরে সুদ-ঘুষ, ওজনে কম, পণ্যে ভেজাল, প্রতারণা বা হারাম উপার্জনের সাথে জড়িত। পরিবারে, সমাজে, অফিসে, প্রতিষ্ঠানে ও ব্যবসায় কোথাও আল্লাহর বিধি-বিধানের তোয়াক্কা করছে না। নিজের দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেকের অপূর্ণতার কারণে হোক আজকের মুসলিমরা ঈমান ও ইসলামের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে ঈমান ও কুফরের মত পরস্পর বিরোধী ও অসঙ্গতিপূর্ণ কর্মকাণ্ড তাদের জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে নানা অসঙ্গতি বর্তমান মুসলিম জাতিকে জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৩]–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ-

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবগত।"

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

"আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না এবং তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর আর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর; তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"[৪]

উদ্ধৃত আয়াতে ইসলামের আংশিক অনুসরণ সত্যিকার মুসলিম হওয়ার পথে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং এজন্য পার্থিব জীবনে হীনতা ও পরকালীন মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। তাই এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং মানব জীবনে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে হলে মহাস্রষ্টা আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর দেয়া চূড়ান্ত জীবন বিধান ইসলামের পূর্ণ অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ায় এর বিধি-বিধান মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে একটির সাথে আরেকটি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তাই বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের দু-চারটি বিধান পালন করলে কিছু কল্যাণ পাওয়া গেলেও পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না। ইসলাম থেকে প্রকৃত সুফল পেতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ জরুরী। ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষ সহ সকল সৃষ্টির কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তি। মানুষ ছাড়া মহাশূন্য ও পৃথিবীর অন্য সব সৃষ্টি যথানিয়মে আল্লাহর আনুগত্য করছে। ফলে সর্বত্রই সুশৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা

---

[১]. হাফিজ মুনযিরী, খ.০১, পৃ.৩৮-৪০, কিতাবুল ইখলাস, হাদীস নং ৫৯।

[২]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নিসা' ০৪: আয়াত ৪৯, আল-কুরআন ২৪:২১, ৫৩ : ৩২, ৭৩:৬, ৮৭:১৪-১৫।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ৮৫।

[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব ৩৩: আয়াত ৪৮।

ও শান্তি বিরাজ করছে, ব্যতিক্রম শুধু মানুষ। তাই সত্যিকার শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন[১]–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ- فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তোমরা যদি পদস্খলিত হও, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" আরও বলেন -[২] " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে।

....

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা-দৃষ্টিভঙ্গি এই স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করা একটি কঠিন কাজ। কেননা কুরআনের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নৈতিক শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। সাধ্যমত সংক্ষেপে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা থাকায় আলোচনা এখানেই শেষ করতে হয়েছে।

❑. মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষার চিরন্তন উপযোগিতা:

আল-কুরআন মানব জাতির উপর অসাধারণভাবে প্রভাব বিস্তারকারী মহাগ্রন্থ। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন ধর্ম বা মতাদর্শ এ পর্যন্ত তার অনুসারীদের এত বিপুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার ও নবজীবন প্রদান করতে সক্ষম হয়নি। কেবল কুরআনই মানব জাতির কর্মকাণ্ডের সব বিভাগকে প্রভাবিত করেছে। যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং বস্তুগত, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ এনে দিয়েছে। কুরআন শুধু চরমভাবে অধঃপতিত আরব সমাজকে অল্পকালের মধ্যে অধঃপতনের অতল গহবর থেকে মুক্তি দেয়নি, বরং বিশ্বমানবতাকে সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করেছিল যেখানে বহু শতাব্দীর সংস্কারমূলক কাজ নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। আজও কুরআন অসংখ্য অমুসলিমের হৃদয় জয় করে তাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিচ্ছে।

আল-কুরআনের এই সফলতার মূলে নিহিত আছে–কুরআন মানব জাতিকে দিয়েছে একটি নির্ভুল, নিখুঁত, শাশ্বত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। কুরআন প্রদত্ত এই বিধি-বিধান মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর, সর্বজনীন, পরিপূর্ণ, সর্বপ্রকার ত্রুটি ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। এতেই নিহিত রয়েছে মানুষের স্থায়ী শান্তি ও মুক্তি। এছাড়া অন্য যত মতাদর্শ রয়েছে সেগুলো অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয় এবং সে সবের মধ্যে মানুষের সর্বজনীন চূড়ান্ত কল্যাণ ও মুক্তি নির্দেশিকা নেই। এজন্য মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষার উপযোগিতা চিরকাল থাকবে। এই বিধি-বিধান কখনও সেকেলে বা অনুপোযোগী হবে না। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে–[৩], (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ) "সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই।"

আল-কুরআন তাঁর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করেছে ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার জন্য আল-কুরআনেই মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[4] এতে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সারসংক্ষেপ সংরক্ষিত হয়েছে। এতে পূর্ববর্তী সকল নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবকে সমানভাবে স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী নাবীদের মধ্যে নূহ ('আ.), ইব্‌রাহীম ('আ.), মুসা('আ.) ও 'ইসা ('আ.) প্রমূখের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসমাঈল('আ.), ইসহাক ('আ.), ইয়াকুব ('আ.), লূত ('আ.), হূদ('আ.), সালিহ('আ.), ইউসুফ ('আ.), আইয়ুব ('আ.), দাউদ ('আ.), সুলাইমান ('আ.), ও যাকারিয়া ('আ.) প্রমূখ অনেককে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে তাদের আলোচনা করেছে। নূহ('আ.), ইব্‌রাহীম('আ.), হূদ ('আ.),ইউসুফ ('আ.), ইউনুস ('আ.), মরিয়ম ('আ.) প্রমূখের নামে কয়েকটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। তাই আল-কুরআন একেশ্বরবাদী সব মানুষের জন্য সমন্বয় সাধনকারী এক প্রামাণ্য ধর্মমত। যার শিক্ষা দ্বীনে হানিফ তথা ইবরাহীম ('আ.) এর দ্বীনের অনুরূপ। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–[৫]

قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাক্বারাহ ০২: আয়াত ২০৮-২০৯।
২. আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯: আয়াত ১।
৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্'আম ০৬: আয়াত ১১৫।
4 .আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান: আয়াত ০৩, আরও দেখুন, সূরা আন্-নিসা': আয়াত ১৩৬।
৫ . আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান : আয়াত ৮৪।

> "বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"

তাই একেশ্ববাদী মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে কুরআনের শিক্ষা চিরশাশ্বত হয়ে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য এর বিধান সেকেলে হবে না। কাজেই বিশ্বমানবতার মুক্তিতে কুরআনের বিকল্প নেই।

❑. মূল্যবোধ বিকাশে ঐতিহাসিক মদীনা রাষ্ট্রে আল-কুরআনের ভূমিকা : একটি বিশ্লেষণ

ইসলামের অর্বিভাবের পূর্বে আরব দেশে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। গোটা আরব ছিল কতগুলো বিচ্ছিন্ন গোত্রের সমষ্টি। এসব গোত্রের মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। প্রত্যেক গোত্রই নিজস্ব রীতি অনুযায়ী চলত। আর গোত্রপতির নির্দেশের ভিত্তিতে গোত্র পরিচালিত হত। কোন গোত্রই অন্য কোন গোত্রের প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির অধীনতা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। মূলত তখন প্রত্যেক গোত্রই ছিল স্বেচ্ছাচারী। ফলে দুর্বলদের উপর চলত শক্তিমানদের যুলম-অত্যাচার। চারিদিকে অবাধে চলত লুণ্ঠন, মারামারি ও হত্যাকাণ্ড। সে সময়ে সমাজের মানুষ ছিল চরম অসভ্য, বর্বর, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ইতিহাসের এই চরম ক্রান্তিলগ্নে সংকটাপন্ন সময়ে বিশ্ববাসীর শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ আরব ভূখণ্ডে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি নাযিল করলেন সর্বশেষ আসমানী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। কুরআনের মাধমে তিনি আরবদের আলোর পথে নিয়ে আসেন এবং গঠন করেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরতের[১] পর মুহাম্মাদ সা. অল্পসময়ে কুরআনের আলোকে আদর্শ রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে সক্ষম হন।[২] মদীনায় আগমনের পর তিনি সেখানকার অধিবাসী ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক ও মুসলিমদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে উপনীত হন যা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার কাজ করেন। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের[৩] পর মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে মক্কাবাসীদের আরও কিছু যুদ্ধ-সংঘাত হয় কিন্তু সেসবে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়নি, বরং ক্রমে তা সুসংহত হয়েছিল। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর মদীনা ইসলামী রাষ্ট্র সম্প্রসারিত হতে থাকে কালক্রমে তা বিশাল সম্রাজ্যে পরিণত হয়। এভাবে স্বল্প সময়ে সমগ্র আরবে গোত্রীয় শাসনের অবসান ঘটে। গোত্রীয় অনৈক্য-বিভেদ ও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিবাদের অবসান ঘটে। শত শত বছর পূর্ব থেকে চলে আসা সেই নৈরাজ ও বিশৃঙ্খলপূর্ণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উত্তরণ সম্ভবপর হয়েছিল আল-কুরআন প্রদত্ত উন্নত মতাদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই। শুধু তাই নয়, আল-কুরআন তথা ইসলামের সুমহান আদর্শ আরববাসীকে এক মহান আদর্শিক ঐক্য সূত্রে গ্রেথিত এবং সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। রাসূল সা. সুযোগ্য নের্তৃত্ব, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার কারণে এটা সহজে ও স্বল্প সময়ে সম্ভবপর হয়েছিল। এ সম্পর্কে P.Q. Hitti বলেন–

> Arabia,which had hitherto never bowed to the will of one man,seemed now inclined to be dominated by Muhammad and be incorporated into his new scheme.Its heathennism was yielding to a nobler faith and a higher morality .[8]

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পিছনে রাসূল সা. এর এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, রাজা-বাদশাহর মত ক্ষমতা হস্তগত করে সাম্রাজ্য বিস্তার করবেন এবং রাজকীয় বিলাসবহুল জীবন যাপন করবেন। সেখানে ক্ষমতা নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখার কোন ইচ্ছা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাই তো দেখা যায় যে, রাসূল সা. বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার পর সেখানকার রাজা-বাদশাহগণের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বা ইসলামের কর্তৃত্ব মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল তিনি তাদের পদচ্যুত না করে তাদের হাতেই সে এলাকার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। তিনি মক্কায় যেমন সাদাসিধা জীবন যাপন করেছিলেন মদীনায় রাষ্ট্রপ্রধানের পদ অলংকারের পরও তার কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি। রাসূল সা. সমগ্র জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে এই সত্যতা পাওয়া যাবে। P.Q. Hitti বলেন–

> "তাঁর জীবনের অখ্যাত অধ্যায়ের মতো গৌরবময় অধ্যায়েও তিনি একটি মাটির বাড়িতে অতি সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন।...প্রায়ই তাঁকে নিজের কাপড় সেলাই করতে দেখা যেত এবং সর্বদাই সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। যা কিছু তাঁর সঞ্চয় ছিল, তাকে তিনি রাষ্ট্রের সম্পত্তি গণ্য করতেন।"[৫]

রাসূল (সা.) এর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল– মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র মহান আল্লাহ দাসত্বে নিয়োজিত করা, সমাজ ও রাষ্ট্রে সত্য, ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামকে সকল কুফর শক্তির

---

[১]. হিজরত: ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী সা. মক্কা কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য স্থায়ীভাবে মদীনায় গমন করেন ইতিহাসে-এটাই হিজরত ।

[২]. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬।

[৩]. বদর যুদ্ধ: ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মদীনার নিকটবর্তী *'বদর'* প্রান্তরে মক্কা কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ইসলামের প্রথম ঐতিহাসিক যুদ্ধ।

[4]. P.Q. Hitti, *ibid.*, p.119.

[5]. *ibid.*, p.120.

উপর বিজয়ী করে মহান আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সমাজ থেকে সব ধরনের যুলম,অসত্য, অশান্তি ও নৈরাজ্যের নির্মূল করে সমাজে শান্তি-নিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব-সৌহার্দ্য ও সকলের ন্যার্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। P.Q. Hitti ভাষায়– "This was the first attempt in the history of Arabia at a social organization with religion, rather than blood, as its basis, Allah was the personification of state supremacy."[1] আল-মদীনায় যে সমাজ গঠিত হয়েছিল তাতে আল-কুরআনের বিধৃত নীতিমালা বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। কুরআনের শিক্ষার প্রভাবে সে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষ(মুসলিম জাতি) এমন উন্নত নৈতিক চরিত্র ও যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ্য হয়েছিল ফলে ঐ সমাজে ছিল না চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, মিথ্যাচার, অন্যায়, প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, ব্যভিচার, পরনিন্দা, মদ, জুয়া, মূর্খতা, শোষণ, অবিচার, কর্মবিমুখতা, অসম বন্টন ও সমাজ বিধ্বংসী কুপ্রথা। সেখানে এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, কোন অভিজাত ব্যক্তিও অপরাধ করলে দণ্ডে সেও দণ্ডিত হত।

রাসূল সা. এর প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক ও অগ্নি উপাসকরাও বাস করত, এ সব ভিন্ন ধর্মালম্বী লোকদের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রে পূর্ণ সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করা হত। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিক যে সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত সংখ্যালঘু অমুসলিমরাও সেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে এমন মহত্তম সাম্য ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাষ্ট্রের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এক অপূর্ব সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলাম মুসলিমদের এ নির্দেশই দিয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে[২] (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি–ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন নি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।"

ইসলাম এসব ভিন্ন ধর্মালম্বীদের পূর্ণ ধর্মীয় ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছিল। তারা কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্বীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানদি পালন করত, নিজ ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করত, তাদের নিজেদের পারস্পরিক সমস্যা ও বিবাদ নিজ ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে মীমাংসা করে নেয়ার অধিকারী ছিল। জোর করে তাদের ধর্মমত পরিবর্তন কিংবা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার কোন অধিকারই ইসলাম কাউকে দেয়নি। বরং কুরআনে অনেক স্থানে অমুসলিম নাগরিকদের সুবিচার ও ভালো ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে।[৩] এমনকি ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের এই অধিকার দিয়েছিল যে, সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সৌজন্যতার সাথে তারা মুসলিমদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে[৪]–

(وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)

'আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল,'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমপর্ণকারী।'

মদীনা সেই ইসলামী রাষ্ট্রে সাধারণ রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক ব্যাপারে অমুসলিম নাগরিকরা রাষ্ট্রের একজন সাধারণ মুসলিম নাগরিকের মত নিরপেক্ষ বিচার বা আচরণ লাভ করত। একজন মুসলিম নাগরিকের ন্যায় তাদেরও সকল মৌলিক অধিকার ছিল। রাষ্ট্রের প্রতি একজন মুসলিম নাগরিকের যে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পিত হত, তাদেরও উপর তাই অর্পিত হত। মুসলিম নাগরিকের মতই তারাও অভিন্ন সম্মান মর্যাদা লাভ করত। অমুসলিম নাগরিকদের যাকাতের পরিবর্তে জিযিয়া নামক এক ধরনের বিশেষ কর দিতে হত। আর এই কর তাদের অধিকার আদায়, নিরাপত্তা বিধান ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করা হত। মুসলিম নাগরিকের যাকাত ছাড়াও সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আরও নানা খাতে ব্যয় বাধ্যতামূলক ছিল, যা অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না।

রাসূল সা. এর যুগে মদীনা রাষ্ট্রে ইহুদী, খৃষ্টান, মুশরিক ও অগ্নি উপাসকরা ছাড়াও মুনাফিকদের একটি শ্রেণী বর্তমান ছিল। তারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করলেও অন্তরে কুফর লালন করত, গোপনে ইসলামের ক্ষতি সাধনে তৎপর ছিল, তাদের অনেক ষড়যন্ত্র প্রকাশও হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূল সা. তাদের বাহ্যিক আচরণ গ্রহণ করে তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। তবে তাদের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ কোন পদে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়নি।

মদীনা সেই ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু আরব ছাড়াও সংখ্যালঘু অনারব যেমন- ইরানী, রোমান, আবিসিনীয়, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণঙ্গ নাগরিক বাস করত। কিন্তু ইসলাম স্থানীয়-বহিরাগত, জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে পূর্ণ সাম্যের নীতি

---

[1]. *ibid.*, p.120.
[২]. আল-কুরআন, সূরা আল-মুম্তাহিনাহ ৬০: আয়াত ০৮।
[৩]. আল-কুরআন, ৬০:০৮,০৮:৬১, ০৫:০৮।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৬।

অবলম্বন করেছিল। আবর অনারবের উপর, স্থানীয় বহিরাগতের উপর, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। বরং আরব-অনারব, স্থানীয়-বহিরাগত, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু, ধনী-দরিদ্র, স্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণঙ্গ ইত্যাদি সকল ভেদাভেদ দূর করে সকল মুসলিমকে সমান ও অভিন্ন মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছিল। কথায় নয় বাস্তব কর্মের মাধ্যমে রাসূল সা. এই আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন। এ কারণে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে আরব ছাড়া অন্য জাতির লোকেরাও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। জাতি, বর্ণ ও আঞ্চলিকতা নির্বিশেষে সবাই তাদের আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। যেমন আরবীয় যায়েদ রা., হাবশী বিলাল রা., ইরানী সালামান রা. রোম দেশীয় সুহাইব রা. প্রমূখ ক্রীতদাস সাহাবী সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ ও রাসূল সা. এর প্রতি আনুগত্য, তাকওয়া, যোগ্যতা ও আমানতদারি কোন পদে লোক নিয়োগ করা হত। কারণ সেই সমাজে মর্যাদার স্বীকৃত মানদণ্ড ও লোক বাছাইয়ের মাপকাঠি ছিল তাকওয়া।[১] এখানে চিরুনীর কাটার মত সকল মুসলিম সমান। একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

বস্তুত রাসূল সা. ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি এমন রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন যেখানে ছিল না অভিজাত-নীচু, ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য, সাদা-কালো ইত্যাদি ভেদাভেদ, যেখানে ছিল না কোন যাজকতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, আমলাতন্ত্র, কিংবা বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতা। মসজিদই সেখানে ছিল জনতার সমাবেশস্থল, বিচারস্থল ও সবার ইবাদতের স্থান।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাজতন্ত্রের শোষণ ও নিপীড়নে অতিষ্ট জনগণের দাবীর মুখে ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা ম্যাগনাকার্টা চুক্তি সম্পাদন করেন। জনগণের আন্দোলন মুখে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। ব্রিটেনে গৌরবময় বিপ্লবের পর ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বিল অব রাইটস, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে, ব্রিটেন ও আমরিকার জনগণ কিছু অধিকার লাভ করেন। কিন্তু তাদের অনেক পূর্বে জনগণের কোনরূপ আন্দোলন বা দাবী ছাড়াই রাসূল সা. আল-কুরআনের ভিত্তিতে মদীনার যে ইসলামী রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত করেন তা ছিল ইতিহাসের নজিরবিহীন একটি জনকল্যাণকর ও জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার রক্ষা করা হয়েছিল।

রাসূল সা. এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মূলনীতি ছিল জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে কাজ করা। পূর্ণ ইনসাফের সাথে সমস্ত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা এবং সকলের প্রতি সাম্য ও সুবিচার প্রদর্শন করা। অথচ বর্তমান কালের সুসভ্য ও প্রগতিশীলতার দাবীদার পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির রাষ্ট্রনীতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ। তাদের মানসিকতা এতই সংকীর্ণ যে, তারা নিজ জাতি, নিজ দেশ, নিজ ভাষা, নিজ অঞ্চলের উর্দ্ধে উঠে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে না। তারা যদি কখনও অন্য মানুষের কল্যাণে কোন কাজ তা করে একান্ত নিজ স্বার্থে। ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার কথা বলে তারা দুর্বল জাতিসমূহকে ধোঁকা দিয়ে নিজের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে যাতে প্রয়োজনে সেসব জাতির ভূমি, খনিজ সম্পদ কিংবা তাদেরকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু রাসূল সা. প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এসব সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিল। সেখানে সত্যিকার এক অভূতপূর্ব সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এভাবে রাসূল সা. কুরআনের অনুপম আদর্শের মাধ্যমে ঐতিহাসিক মদীনা রাষ্ট্রে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিকাশ সাধন হয়েছিল। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছিলেন। উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা, শান্তি-শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব, উদারতা, সুসভ্য-সুশৃঙ্খল জাতি, আদর্শ-কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মদীনার যে রাষ্ট্রটি রাসূল সা. রূপদান করেছিলেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুলাফা রাশিদূন সেই উন্নত মূল্যবোধের বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখেন। প্রথম খলীফা আবূ বাকর (রা) -এর খিলাফতকালে উমার ফারুক (রা) প্রধান বিচারপতির আসনে দুই বছরে নিয়োজিত ছিলেন। অথচ তাঁর আদালতে একটি মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়নি। কেননা সরকার প্রধানসহ সমাজের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এমন নিখুঁতভাবে পালন করেছিলেন যার ফলে কোথাও অধিকার সম্পর্কে কোন অভিযোগ উঠেনি।

খলীফা আবূ বাকর (রা) -এর মৃত্যুর পর উমার রা. দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত হন। তাঁর সময় রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিদের দখলে চলে আসে। কিন্তু এত বিশাল সাম্রাজ্য জয়ের পরও ক্ষমতার দম্ভ, ঔদ্ধত্য, পার্থিব জৌলুস, ভোগ-বিলাস খলীফা উমার (রা.) কে স্পর্শ করেনি। একজন সাধারণ মানুষের মতই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। ইনসাফ, সাম্য, সুবিচার, সততা ও জনকল্যাণে তিনি পৃর্থিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তৃতীয় খলীফা উসমান রা. ও চতুর্থ খলীফা আলী রা. আল-কুরআন, সুন্নাহ ও তাঁদের পূর্ববর্তী খলীফাদ্বয়ের নীতি অনুসরণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন। এভাবে রাসূল সা. ও চার খলীফা আল-কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও নৈতিক চরিত্র গঠন করে পৃথিবীতে গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে

[১]. দেখুন, আল-কুরআন, সূরা আল-হুজুরাত ৪৯ : আয়াত ১৩।

গেছেন। আল-কুরআনের মূল আদর্শে অধিষ্ঠিত থেকে মুসলিম জাতি দীর্ঘকাল পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদান করে। সততা, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীবাসীকে আলোর পথে নিয়ে আসে। কিন্তু আল-কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে সরে যখন মুসলিমগণ পার্থিব ভোগ-বিলাস, প্রবৃত্তিপূজা এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে তখনই তাদের পতন ঘটেছে। দীর্ঘকাল থেকে মুসলিম জাতি পতনের গ্লানিতে নিমজ্জিত।

এমতাবস্থায় বর্তমানে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যে মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নের ফলে মুহাম্মাদ সা. মদীনায় কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন সেই নীতি ও মূল্যবোধের অনুসরণের মাধ্যমে অনুরূপ কল্যাণকর রাষ্ট্র তাঁর অনুসারীরা পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোন সময় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এজন্য প্রয়োজন শুধু মানব গোষ্ঠীর জীবনে মুহাম্মাদ সা. এর অনুসৃত নীতি, বিধি-বিধান ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি :

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা প্রধানত নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তাই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির রয়েছে। *'আল-কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ'* শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনায় ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থের ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ, অবলুপ্তি ও বিকৃতি। এরপরও সেগুলোতে কিছু নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা আছে তা স্ব-স্ব ধর্মাবলম্বী গ্রহণ করলেও পার্থিব ক্ষেত্রে তা দ্বারা অনেকটা উপকৃত হতে পারে। তবে পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য সত্য দ্বীন ইসলাম ও তাঁর মূল্যবোধ গ্রহণ করার বিকল্প নেই নতুবা সেখানে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।[১] অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের বিশেষ ইতিবাচক মূল্যবোধগুলোর অতি সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল−

ইহুদী ধর্মের মূল নৈতিক শিক্ষা: ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তাওরাত' বিকৃতির পরও প্রচলিত তাওরাতে বেশকিছু নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মূসা ('আ.) এর আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত দশটি আদেশ। এতে ইহুদীদের নৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা ফুটে উঠেছে। এই দশটি বিষয় হল: ১. আল্লাহই একমাত্র মাবুদ (তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই) আল্লাহর জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ২. তোমরা কখনো কোন মূর্তি তৈরী করবে না, মূর্তির পূজা করবে না এবং সেগুলোর সেবা করবে না। ৩. কোন বাজে উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম নেবে না। ৪. বিশ্রাম দিনের (শনিবারের) মর্যাদা রক্ষা করবে। এদিনে বিশেষভাবে প্রার্থনা করবে। ৫. পিতা-মাতাকে যথাযথ সম্মান করবে। ৬.নরহত্যা করো না। ৭. ব্যভিচার কারো না। ৮.চুরি করো না। ৯.প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিও না। ১০.প্রতিবেশীর গৃহ, স্ত্রী, গোলাম-বাদী, পশু বা অন্য কিছুর প্রতি লোভ করো না।[২]
বস্তুত এই নির্দেশগুলোর মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের মৌলিক দিকসমূহ ফুটে উঠেছে।

খ্রিষ্ট ধর্মের মূলশিক্ষা: খ্রিষ্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলের বিকৃতির পরও বর্তমান বাইবেলে বেশকিছু নৈতিক শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তাতে মানব প্রীতি, অহিংসা ও মানব সেবাকে অতি উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সেখানে হত্যা, ব্যভিচার, চুরি ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে নিষেধ করা হয়েছে। অপরের অন্যায় ও ছিদ্রান্বেষণ পরিহার করতে বলা হয়েছে। পিতা-মাতা ও প্রতিবেশীকে সম্মান করতে বলা হয়েছে। দুব্যবহারকারীর সাথে সদাচারণ করতে, শত্রুকেও ভালবাসতে, তার জন্য ক্ষমা ও সৎ পথে ফিরে আসে প্রার্থনা করতে এবং নিঃস্বার্থ দান ও সেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন বাইবেলের বলা হয়েছে,

> তোমরা চুরি করিও না এবং আপন আপন স্বজাতীয়কে বঞ্চনা করিও না ও মিথ্যা কথা কহিও না। ১২আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, ...১৩তুমি আপন প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করিও না, এবং তাহার দ্রব্য অপহরণ করিও না। বেতনজীবীর বেতন প্রাতঃকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি রাখিও না। ১৪তুমি বধিরকে শাপ দিও না, ও অন্ধের সম্মুখে বাঁধাজনক বস্তু রাখিও না, কিন্তু তোমার ঈশ্বরকে ভয় করিও; আমি সদাপ্রভু। ১৫তোমরা বিচারে অন্যায় করিও না; তুমি দরিদ্রদের মুখাপেক্ষী করিও না ও ধনবানের সমাদর করিও না; তুমি ধার্মিকতায় স্বজাতীয়ের বিচার নিস্পন্ন করিও। ১৬তুমি অপবাদকারী হইয়া আপন লোকদের মধ্যে ইতস্ততঃ সৃষ্টি করিও না, এবং তোমার প্রতিবেশীর রক্তপাতের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইও না। ১৭তুমি হৃদয় মধ্যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না; তুমি অবশ্য আপন স্বজাতীয়কে অনুযোগ করিবে, তাহাতে তাহার জন্য পাপ গ্রহণ করিবে না। ....২৮ মৃত লোকের জন্য আপন আপন অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিও না, ও শরীরে উল্কি আঁকিও না।২৯ তুমি আপন কন্যাকে বেশ্যা হতে দিয়া অপবিত্র করিও না, পাছে দেশ ব্যভিচারী হইয়া পরে ও দেশ কুকার্যে পূর্ণ হয়। ...৩৬তোমরা বিচার কিম্বা পরিমাণ কিম্বা কাঠার বিষয়ে অন্যায় করিও না। তোমরা ন্যায্য দাড়িঁপাল্লা, ন্যায্য বাটখারা, ন্যায্য ঐফা ও ন্যায্য হিন রাখিবে।[৩]
> যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে, তুমি মিথ্যা জনরব উপস্থাপন করিও না এবং বিচারে অন্যায় সাক্ষী হইয়া দুর্জনের সহায়তা করিও না। তুমি দুষ্কর্ম করিতে বহু লোকের অনুসরণ করিও না, এবং বিচারে অন্যায় কারণার্থে বহু লোকের পক্ষ লইয়া প্রতিবাদ করিও না।

---

[১]. এ ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে,(وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)“কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে (তাহলে) তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।” আল-কুরআন, সূরা আলে-'ইমরান ০৩: আয়াত ৮৫।
[২]. পবিত্র বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম, বাংলা অনুবাদ, যাত্রাপুস্তক, ২০:০১-১৭, (ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১),পৃ.৯৩-৯৪, *কিতাবুল মুকাদ্দাস*, তৌরাত শরীফ : হিজরত অধ্যায়, ২০:১-১৭ (ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০০), পৃ.১১১-১১২।
[৩]. পবিত্র বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম, *প্রাগুক্ত*, লেবিয় পুস্তক : ১৯(১১-১৭, ২৮-২৯, ৩৬) পৃ.১৪৭-১৪৮।

দরিদ্রের বিচারে তাহারও পক্ষপাত করিও না।....দরিদ্র প্রতিবাসীর বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না। মিথ্যা বিষয় হইতে দূরে থাকিও এবং নির্দোষের কি ধার্মিকের প্রাণ নষ্ট করিও না। ....তুমি উৎকোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে, ধার্মিকদের কথা সকল উল্টায়। আর তুমি বিদেশীর প্রতি উপদ্রব করিও না।[১]...

অনন্ত জীবন কিভাবে পাওয়া সম্ভব এ প্রশ্নের জবাবে যীশু বলেন, ''খুন করিও না ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা-মাতাকে সম্মান করিও। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করিও।[২] বস্তুত এসব প্রত্যেকে মেনে চললে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ সহজেই ফিরে আসবে।

হিন্দু ধর্মের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি: হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন ধর্মমত। এই ধর্মের মূল গ্রন্থ 'বেদ'। বেদ ছাড়াও গীতা ও উপনিষদ এ ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ। আল্লাহর একত্ববাদের উপর এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে ধারনা করা হলেও এ ধর্মে বহু দেব-দেবী ও প্রকৃতি বিভিন্ন বস্তুর পূজা বহুল প্রচলিত। এছাড়া এই ধর্মে জাতিভেদ, বর্ণপ্রথা, অবতারবাদ[৩] জন্মান্তরবাদ[৪] ইত্যাদি বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ ধারণা লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্মে নানা ত্রুটিসত্তেও এখানে বিনয়, সততা, ন্যায়পরায়নতা ও মানবতা ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ঋগবেদ মানবতার সহায়ক সততা, সরলতা, সত্যপরায়ণতা, সংযম ব্রক্ষচর্য প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। কঠোপনিষদে উল্লেখ আছে, যে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখে না, নিজের ইন্দ্রিয়কে সংযত করে না এবং যার মন প্রশান্ত নয়, তার ব্রক্ষোপলব্ধি হবে না। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের করুণা লাভ ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। আর ঈশ্বরের করুণা লাভের প্রধান শর্ত হলো নৈতিক জীবন। গীতায় মুক্তি লাভের জন্য চারটি পথের কথা বলা হয়েছে, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ও ভক্তিযোগ। কিন্তু এর প্রত্যেকটির পূর্বশর্ত হলো আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযম।[৫] মূলত এ সব উপদেশাবলী নৈতিক উন্নয়ন সহায়ক।

বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষা: বৌদ্ধ ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্মমত। গৌতম বুদ্ধ (খ্রি.পূ.৪৭৬-৩৯৬) এই ধর্মের প্রবর্তক। ত্রিপিটক এই ধর্মের ধর্মগ্রন্থ। বৌদ্ধধর্মে আল্লাহর ধারণা অনুপস্থিতসহ কিছু ত্রুটি থাকলেও এই ধর্মে বেশ কিছু নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। এ ধর্ম ব্যক্তিকে সৎ, চরিত্রবান ও আত্মত্যাগী হতে শিখায়। এ ধর্মে বর্জনীয় ও বাঞ্ছনীয়-এ দু'ভাগে কাজকে ভাগ করা হয়েছে। বর্জনীয় কাজ হচ্ছে: ক.হত্যা, খ.চৌর্যবৃত্তি, গ.ব্যভিচার, ঘ.অসৎ বাক্য, ঙ.মাদক দ্রব্য ইত্যাদি। বাঞ্ছনীয় কাজ হচ্ছে: ক.প্রেম ও ভালবাসা, খ. দয়া ও বদান্যতা, গ. সততা ও আত্মসংযম, ঘ. সৎ ও মহৎ চিন্তা ইত্যাদি।[৬]

কনফুসীয় মতবাদ: চীনা দর্শনিক কনফুসিয়াস (খ্রি.পূ.৪৪৮-৪০৫) এ মতবাদের প্রবর্তক। এ ধর্মমতেও আল্লাহর সম্পর্কে কোন ধারণা প্রদান করে না। এই মতবাদ অনেকটা দার্শনিক ধাঁচের হলেও এর শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন- কনফুসিয়াসের মতে, তিনিই সমাজের শ্রেয় ব্যক্তি, যিনি সৎ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। এই মধ্যপন্থা বলতে তিনি মনে করেন, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের প্রতি আন্তরিকতা, সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় এবং বিশ্বশান্তি। কনফুসিয়াস বলেন, বাড়াবাড়ি করো না, কারো ক্ষতি করো না, তাহলে কেউ তোমাকে অনুসরণ করবে না। তিনি আরও বলেন যে, তোমার জন্য যা কামনা কর না অন্যের জন্য জন্যও তা কামনা করো না। সৎ গুণের উপর এ ধর্মের এতো বেশী জোর দেয়া হয়েছে যে, এ ধর্ম অনুসারে একজন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হলো তার সৎ গুণের সাথে বন্ধুত্ব। কনফুসিয়াস বলেন, স্বর্গকে পেতে হলে মানুষকে জয় করো; মানুষকে জয় করতে হলে তার হৃদয় জয় করো।[৭]

তাওইজমের শিক্ষা: তাওইজম মানব প্রবর্তিত ধর্ম হলেও এতে বেশ কিছু নৈতিক শিক্ষার সমাবেশ ঘটেছে। এ ধর্মে পাঁচটি কাজ বর্জনীয় এবং দশটি কাজ বাঞ্ছনীয়। বর্জনীয় কাজ হচ্ছে:-ক. মাদকদ্রব্য, খ.হত্যা, গ. মিথ্যা ভাষণ, ঘ. চৌর্যবৃত্তি, এবং ঙ. ব্যভিচার। আর বাঞ্ছনীয় কাজ হচ্ছে:-ক.জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা, খ.সম্রাট ও গুরুর প্রতি আনুগত্য, গ.সর্বজীবে দয়া, ঘ.ধৈর্য ধারণ করা ও ভুল কাজ থেকে বিরত থাকা, ঙ.আত্মত্যাগ, চ.দাসকে মুক্তি দেয়া, ছ. কুপ খনন ও রাস্তা নির্মাণ, জ.জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান, ঝ.সামাজিক মঙ্গল সাধন, এবং ঞ.ধর্মপুস্তক পাঠ।[৮]

তাওইজমের প্রতিষ্ঠাতা লাও যু বলেন যে, আমার কাছে তিনটি জিনিষ আছে যাকে আমি অনেক শক্ত করে ধরে রেখেছি এবং যাকে আমি অনেক মূল্য দেই। এর প্রথমটি হলো-ভদ্রতা, দ্বিতীয়টি-মিতব্যয়িতা, তৃতীয়টি হলো- বিনয়, যা আমাকে অন্যদের কাছে বড় করে দেখানো থেকে বিরত রাখছে। তোমরা ভদ্র হও, তাহলে সাহসী হতে পারবে, মিতব্যয়ী হও

---

[১]. *প্রাগুক্ত*, যাত্রাপুস্তক ২২ ও ২৩ : পৃ.৯৭।

[২]. মোঃ আবদুল ওদুদ, *ধর্মদর্শন* (ঢাকা:মনন পাবলিকেশন, ২০০৭), পৃ.৩৪৪-৩৪৫।

[৩] .অবতারবাদ- অনেকে মনে করেন যে, সৃষ্টিকর্তা মানবকুলকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মানুষ বা অপর কোন জাগতিক রূপ নিয়ে পৃথিবীতে অবির্ভূত হন। যেমন- হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, প্রমুখ আসলে মানুষ্যরূপে স্বয়ং ভগবান। খ্রিস্টানরাও যীশুর অবতারত্বে বিশ্বাস করেন। মানুষ বা জাগতিক কোনো প্রাণী বা বস্তুকে ভগবানরূপে কিংবা ভগবানের ন্যায় সকল দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তির ঊর্দ্ধে এবং সর্বজ্ঞ ও মহাক্ষমতাবান বলে বিবেচনা করাই অবতারবাদ।-হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা:মাওলা ব্রাদার্স,২০০০),পৃ.৩১।

[৪]. জন্মান্তরবাদ: হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে যে জীবের মৃত্যুর পর জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। পূনর্জন্মকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও সকলেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী। -ড. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ধর্মদর্শন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৬৫।

[৫]. ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড.কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ.১৮-১৯।

[৬]. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২-৩৩।

[৭]. *প্রাগুক্ত* , পৃ.১৬।

[৮]. *প্রাগুক্ত* , পৃ.১৬-১৭।

তাহলে উদার হতে পারবে। অন্যদের কাছে নিজকে বড় করা থেকে বিরত থাকো, তাহলে তুমি নেতা হতে পারবে।তিনি আরও বলেন, তোমার প্রতিবেশীর লাভ ও ক্ষতিকে নিজের লাভ–ক্ষতির মতোই মনে কর। পূণ্যের পথ থেকে দূরে সরে যেও না। স্বার্থপরতাকে সংযত কর এবং কামনা–বাসনার পরিমাণ কমাও।[১]

জৈন ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি: জৈনধর্ম মানুষের মুক্তির জন্য নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এ ধর্ম অনুসারে মুক্তির উপায় হলো: ১.সম্যগ দর্শন বা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ২.সম্যগ জ্ঞান বা সংশয় শূন্য ভ্রমমুক্ত বিষদ জ্ঞান, ও ৩.সম্যগ চরিত্র বা হিত আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং অহিতকর আচরণ থেকে বিরত থাকা। এদেরকে ত্রিরত্ন বলা হয়।[২]

জরথুষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গি: জরোষ্ট্রিয়ানিজমও সততা ও নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ধর্মে কিছু কাজ করণীয়। এবং কিছু কাজ বর্জনীয়। করণীয় তিনটি বিষয় হলো– ১.হুমাতা বা সৎচিন্তা, ২.হুকতা বা সৎ বাক্য ৩.হবার্শতা বা সৎ কর্ম। বর্জনীয় তিনটি বিষয় হলো–১.দুশ্মাতা বা অসৎ চিন্তা, ২.দুঝুকতা বা অসৎ বাক্য এবং ৩.দুশর্বাতা বা অসৎ কর্ম। জরথুষ্ট্র বলেন–মানুষের পূর্ণতার প্রথমে সৎ চিন্তা, সৎবাক্য এবং পরে সৎ কাজ। পৃথিবীর সমস্ত লোকও যদি মিথ্যা বলে তবে একজন সত্যবাদী তাদের চেয়ে শ্রেয়। সৎ চিন্তা, সৎবাক্য এবং সৎ কাজ স্বর্গে যাওয়ার ছাড়পত্র। চারটি অভ্যাস হলো এ ধর্মের মূলতন্ত্রঃ ১. যোগ্য ব্যক্তিদের প্রশ্নে উদার হওয়া, ২.ন্যায়বিচার করা, ৩. সবার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়া এবং ৪. আন্তরিকতা ও সততার মাধ্যমে মিথ্যাকে দূরে রাখা।[৩]

শিখ ধর্মের শিক্ষা: শিখধর্ম অনেকটা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ দুটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা দ্বারা শিখধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক বলেন, চারটি উপায়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়; ক.সাধুসঙ্গ, খ.সততা, গ.সন্তোষ, ঘ.ইন্দ্রিয় সংযম।[৪] গুরু নানক বলেন, অস্ত্র দিয়ে নয় বরং ঈশ্বরের বাণী ও মানুষের প্রতি ভালবাসা দিয়েই সব কিছু জয় করা সম্ভব। সততা, ধৈর্য ও ধ্যানই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়।

সংক্ষেপে,বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার প্রধান প্রধান দিকসমূহ উপরে ফুটে উঠেছে।

ইসলামী ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

উপরে উল্লেখিত আলোচনায় ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের যে সব মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায়, ইসলাম নির্ভেজাল তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী বিশ্বাস মতে, আল্লাহ বিশ্বস্রষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারক। তিনি একক, অদ্বিতীয়, অবিনশ্বর, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সত্ত্বা। তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্বে কোন শরীক নেই, থাকতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে শিরক সাব্যস্ত সবচেয়ে বড় মহাপাপ এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইয়াহুদীদের ধর্মবিশ্বাসে একত্ববাদের কথা থাকলেও তাদের বড় অংশ নাবী ওযায়ের('আ.) কে আল্লাহর পুত্র মনে করে। খ্রিষ্টানরা আসমানী গ্রন্থের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী,তাদের বড় অংশই ঈসা('আ.) কে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে। হিন্দুরা একেশ্বরবাদী দাবী করলেও তাদের বিশ্বাস: বিশ্বস্রষ্টা হলেন-ব্রক্ষ্মা, বিশ্বপালক ও রক্ষক হলেন-বিষ্ণু ও সবকিছুর সংহারক হলেন-শিব। এই ত্রিশক্তি ছাড়াও তারা অসংখ্য দেবতা ও বহুত্ববাদে বিশ্বাসী, কথিত আছে তাদের দেবতা সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ কোটি। বৌদ্ধরাও বিভিন্ন কুসংস্কার ও শিরকে লিপ্ত। হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়েই অবতারবাদে বিশ্বাসী।

ইসলাম মানুষের সাথে আল্লাহর সরাসরি সম্পর্কের কথা বলে, এর জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। অথচ অমুসলিমরা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতা স্থির করে। এ সব বিষয় তারা দোষের মনে করে না। কেউ মূর্তিপূজা অন্যায় মনে করে, আবার কেউ তাকে কর্তব্য জ্ঞান করে। এদের কেউ এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যকে, কেউ সৃষ্টির পূজা-অর্চনাকে বিশুদ্ধ মনে করছে। একেক জনের ইবাদত ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পদ্ধতি একরকম, অন্যজনের আরেক রকম। ইসলাম তাওহীদ (আল্লাহ একত্ববাদে), রিসালাত (আসমানী কিতাব ও নাবী-রাসূল) ও আখিরাত(পরকালীন বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম) এই তিনটি মৌলিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন জাতির নবুয়্যত দর্শন একরকম এবং অন্যের আরেক রকম। কেউ জান্নাত ও জাহান্নামকে কর্মের প্রতিদান বলে স্বীকার করে, আবার কেউ মনে করে, তা আত্মার প্রশান্তি ও দুঃখানুভূতি ছাড়া কিছুই নয়। আবার কোন কোন জাতি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। সকল আত্মিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা প্রযোজ্য।

এরপর সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মুসলিম সমাজ মাদক দ্রব্য, শুকরের মাংস, মৃত্যু জন্তু, সুদ, ঘুষ, হারাম উপার্জন, অবৈধ ও অনৈতিক মনে করে। কিন্তু অধিকাংশ অমুসলিম সমাজে এ সবকে অবৈধ বা অনৈতিক গণ্য করা হয় না। কোন জাতি গরুর গোশত ভক্ষণকে পাপ কাজ বলে মনে করে, আবার কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করে। কেউ শূকরের মাংস ভক্ষণকে ভালো মনে করে, আবার কেউ এর বিপরীত মনে করে থাকে। আবার মুসলিম সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার বিবাহ বহির্ভূতভাবে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যৌনসম্ভোগকে ব্যভিচার ও চরম গর্হিত অনাচার হিসেবে গণ্য করে।

---

[১]. *প্রাগুক্ত* , পৃ.১৬-১৭।
[২] . *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭-১৮।
[৩]. আজিজুন্নাহার ইসলাম ও কাজী নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১৭।
[৪] .*প্রাগুক্ত*, পৃ.২১।

অন্যদিকে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যকার বিবাহ বহির্ভূতভাবে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যৌনসম্ভোগ তথা ব্যভিচারকে কোনরূপ অন্যায়-অনৈতিক কাজ বলে গণ্য করা হয় না। একইভাবে আজ অনেক অমুসলিম সমাজে অশ্লীলতা, উলঙ্গ নাচ-গান, নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত একত্রে বসবাস (লিভ-টু-গেদার), সমকাম, গর্ভপাত, কুমারী মাতা ইত্যাদি তেমন কোন দোষণীয় ব্যাপার গণ্য করা হয় না, বরং এসব কোন কোন দেশে আইনসিদ্ধ; অথচ ইসলামে এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও অনৈতিক। অমুসলিম বা পাশ্চাত্য সমাজে নারীদের বেপর্দা চলাফেরা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, যুবতীদের সার্ট প্যান্ট ও ব্রা পড়ে অর্ধনগ্ন বা নগ্নভাবে পরপুরুষের সামনে রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন বা অবাধ বিচরণ কোন দোষণীয় বিষয় নয়, অন্যদিকে ইসলামে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দা বাধ্যতামূলক। সেখানে নারীদের নগ্নতা তো দূরের কথা বরং যে কোন ধরনের অশ্লীলতা নিষিদ্ধ। ইসলামে বিশেষ জরুরী ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন দেয়, কারণ ইসলামে ব্যভিচারের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় একাধিক বিবাহ গর্হিত মনে করা হয়, অথচ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীর সাথে যৌনাচার, স্বামী ছাড়াও অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন তেমন কোন অপরাধ বা অনৈতিক কর্ম হিসেবে গণ্য করা হয় না।

ইসলাম বিশ্বমানবের কল্যাণ অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু কোন জাতি নিজ জাতির স্বার্থ রক্ষায় যে কোন অন্যায় কাজ অনৈতিক গণ্য করে না। যেমন একজন আমেরিকান যতই সভ্য হোক, যতক্ষণ কিছুতে নিজের বা জাতির কোন স্বার্থ উদ্ধার হবে অথবা অন্তত কোন ক্ষতির আশংক থাকবে না কেবল ততক্ষণই সে ব্যাপারে তার সততা বলবৎ থাকবে। কোথাও অসত্যে তার জাতির কল্যাণ সম্ভবনা দেখা গেলে, সে সেখানে সেটাকেই প্রকৃত নৈতিকতা বলে গ্রহণ করবে। এ থেকে প্রতীয়মান হলো যে, বিজাতির অনিষ্ট সাধনের নিমিত্তে সে সততা পরিহার করতেও পারে, যদি তাতে তার স্বজাতির কোন কল্যাণ সম্ভবনা থাকে। কিন্তু ইসলাম এ জাতীয় মিথ্যাচারকে প্রশয় দেয় না। সততা প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব মানবিক সৌহার্দ্যই ইসলামের লক্ষ্য; কোন ব্যক্তি দেশ বা জাতি বিশেষ নয়। সুতরাং কোথাও যদি মিথ্যায় বিশ্বমানব কল্যাণের সম্ভবনা থাকে, তবে হয়তো সেক্ষেত্রে মিথ্যাকেও ইসলাম অনুমোদন করে। তবে এমন কোন মিথ্যা নেই। কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের কল্যাণ হলেও অপরের কল্যাণ হতে পারে,এমন মিথ্যাকে ইসলাম অনুমোদন দেয়নি। যখন কোন জরুরী অবস্থা দেখা দেয় অর্থাৎ যখন সত্য বলায় জীবনাশংকা থাকে তখন ইসলাম তাকে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যা বলার কেবল অনুমতি(নির্দেশ নয়) দেয়। কারণ, এতে অন্যদের কোন ক্ষতির আশংকা নেই।[১]

আরো লক্ষণীয় যে, ইসলাম চৌর্যবৃত্তি অনুমোদন করে না। কিন্তু বিশেষে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চুরি চৌর্যবৃত্তি হিসেবেই গণ্য হয় না। যেমন, একজন অপরজনের জীবন নাশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। কেউ তা জানতে পারলো। কিন্তু তার এমন সুযোগ নেই যে, সে তাকে এ ব্যাপারে গিয়ে অবহিত করে। এমনি নাজুক মুহূর্তে সে হত্যাকারীর অস্ত্র চুরি করে লুকিয়ে ফেললো। ফলে একজন নির্দোষীর জীবন রক্ষা করা হলো। একজন সাধূ তো তাকে চোরই বলবে এবং তার স্থলে সে হলে হয়তো এরূপ করতো না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ চুরি, চুরি নয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মানব প্রকৃতিও তা–ই বলে। কারণ এটা একক ব্যক্তির প্রশ্ন নয়। কারণ সৃষ্টি-স্বভাবগত দিক থেকে প্রত্যেক মানুষই আদম এবং যে তার জীবন রক্ষা করলো, সে যেন সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো। এখানে চোরটি হত্যাকারীর অস্ত্র চুরি করে কেবল একের নয় বরং সমস্ত মানুষেরই যেন জীবন রক্ষা করেছে।[২] এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।"

মানব জাতির বিশেষ একটি গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি– মানুষ পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সত্তা। তারা দৈহিক সত্তা অবজ্ঞা করে। দেহের ব্যাপারে তারা শুধু উদাসীন নয় বরং দেহকে কষ্ট দিয়ে আত্মকে এর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে পরিশুদ্ধির কথা বলে। যাকে তারা 'নির্বাণ' হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু ইসলাম বলে যে, দৈহিক সত্তার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে মানুষকে শুধু আধ্যাত্মিক সত্তা ধারণা করাটা ভুল। কারণ তা অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতির বিরোধী, তাই তা আত্ম উন্নয়নের স্বীকৃত কোন পন্থা হতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মসহ কিছু কিছু গোষ্ঠীর নিকট তা স্বীকৃত পন্থা।[৪]

ইসলাম সন্ন্যাসবাদ ও আত্ম-অস্বীকৃতির মনোভাবকে সমর্থন করে না। মানবাত্মার অপরিমেয় শক্তিকে ক্রমান্বয়ে বিকশিত করাই ইসলামের লক্ষ্য। এজন্যই ইসলাম মতে, কর্ম ও সংগ্রাম যথার্থ জীবনের অনিবার্য পূর্বশর্ত। প্রতিটি ব্যক্তিই একটি সসীম কর্মকেন্দ্র বটে, কিন্তু অশুভকে শুভতে পরিণত করার অফুরন্ত শক্তি রয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির। মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি ও শক্তিকে বিকশিত করতে হবে। পাশবিক প্রবণতাসমূহকে নির্মূল করার মাধ্যমে নয়, বরং সেগুলো যথার্থ নিয়ন্ত্রণে আনার

---

[১]. জা'ফর ফুলওয়ারবী, *ইসলাম ও ফিতরাত*, অনু. মোহাম্মদ সাদেক, (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮০) পৃ.৮১।
[২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১-৮২।
[৩] . আল-কুরআন, সূরা মায়িদাহ : আয়াত ৩২।
[৪]. ড. জামাল আল-বাদাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬২।

মাধ্যমে। আবেগ প্রবণতাকে প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পূর্ণ বিনাশ নয়, বরং সব চিন্তা ও কর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা আবেগ ও প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।[১]

মানুষের আদি পাপ(আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ) এর প্রায়শ্চিত্ত করতে মানব জাতির পৃথিবীতে আগমন এবং সেই আদি পাপের বোঝা জন্ম-জন্মান্তর ধরে মানব জাতির বয়ে বেড়াতে হচ্ছে–এটি খ্রিষ্টানবাদের গুরু তত্ত্ব। অথচ ইসলাম এটাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অবাস্তব ও ভিত্তিহীন মনে করে। ইসলাম মতে–একজনের পাপের বোঝা অপরজন বহন করতে পারে না। একের অপরাধ বা ভুলের জন্য অন্যকে শাস্তি প্রদান করে না। একজন ব্যক্তি শুধু সেই কাজের মূল্য পেয়ে থাকে যা সে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্জন করেছে। এখানে একজনের ভুলের জন্য অন্য কারো প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন নেই। এ মর্মে বলা হয়েছে-[২] (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)-"আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"

ইসলাম অনুযায়ী–প্রত্যেক মানব শিশু পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও পবিত্র অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে[৩]– وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও অন্তর। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

ইসলাম মতে–পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তাকে এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। –এই বিশ্বাস মানুষের মাঝে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে। সে স্বীয় জীবনকে আল্লাহ প্রদত্ত এক উপহার হিসেবে গ্রহণ করে তার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকে। পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সে সচেতন হয়। পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসকারী যে কোন পদক্ষেপ থেকে সে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি মতে– মানুষ বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত প্রাণী এবং এখনও বিবর্তনশীল। এর বস্তুগত অস্তিত্বই এর সবকিছু। এ মতে মানব সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা বিবর্তনের ধারায় স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের ভিত্তিহীন এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম মতে–বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা মানুষকে দেহ সর্বস্ব বস্তুর মত চিন্তা করে এবং যারা কোন আত্মার অস্তিত্বের কথা ভাবে না তারা চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।[৪]

উল্লেখিত পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য থাকলেও বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্যতা রয়েছে। যেমন- সততা, বিনয়-নম্রতা, মানবতা, অহিংসা, পরোকার ইত্যাদি ভালো কাজের প্রসার এবং চুরি, হিংসা, ব্যভিচার, অন্যায়ভাবে হত্যা ইত্যাদি মন্দ কাজ বন্ধে অন্য সব মূল্যবোধ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর কতিপয় ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ অন্যান্য মূল্যবোধ থেকে বাস্তবসম্মত, মানবতাবাদী, মধ্যপন্থী ও সমন্বয়ধর্মী। যেমন, প্রয়োজনে ইনসাফসাপেক্ষে একাধিক বিবাহ অনুমোদিত, কিন্তু বিবাহবহির্ভূত যৌনাচার নিষিদ্ধ। অথচ খ্রিষ্টানদের সমাজে একাধিক বিবাহ গর্হিত, কিন্তু বিবাহ বহির্ভূত পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যৌনাচার অনুমোদিত। আবার কতিপয় ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ অন্যান্য মূল্যবোধ থেকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আবার কতিপয় বিষয়ে ইসলামী মূল্যবোধ অন্যান্য মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা বিপরীতধর্মী। যেমন: ইসলাম নির্ভেজাল তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে, হিন্দু ও বৌদ্ধসহ কিছু মতবাদ শিরকের (আল্লাহর অংশীবাদ/ বহুশ্বরবাদের) উপর প্রতিষ্ঠিত।

এভাবে বিভিন্ন জাতি ও সমাজে রয়েছে মূল্যবোধের বিস্তর ফারাক। এ সবের মধ্যে কোন একটি যেমন ঠিক; তেমনি অন্যটি অবশ্যই বেঠিক। যদিও কোনটি ঠিক আর কোনটি বেঠিক তা নির্ণয়ে–মতভেদ রয়েছে। স্থান, কাল, সমাজ ও জাতি ভেদে মূল্যবোধের এই বিভিন্নতা সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে, এটি নতুন কিছু নয়। তবে মূল্যবোধের বিষয়ে কিছু ক্ষেত্রে বৈপরিত্যও বিরোধ রয়েছে এবং কিছু বিষয় অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তাই কোন কোন সমাজ ও জাতির মধ্যে একটি বিষয় অনৈতিক বলে গণ্য করা হচ্ছে, কিন্তু অন্য সমাজ ও জাতি সেই বিষয়কে নৈতিক গণ্য করছে। গ্রহণযোগ্য নীতির আলোকে এটা স্থির হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে নিরেপেক্ষভাবে প্রত্যেক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির মূলভিত্তি ও উৎস সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই করে মানব জাতির জন্য সর্বজনীন, কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা জরুরী। এক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে যা সত্য নয়, সুস্থ বিবেক যাকে গ্রহণ করে না এবং যা সামগ্রিকভাবে মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়, তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত বিষয়াদির সমাধানের ক্ষেত্রে মানবীয় যুক্তি-বুদ্ধি, চিন্তাধারা ও জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের চূড়ান্ত নির্ভুল উৎস হিসেবে ওহীই কেবল এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, স্থায়ী ও সর্বজনীন উৎস ও মানদণ্ড হতে পারে। আল-কুরআন এক্ষেত্রে নির্ভুল ও নির্ভযোগ্য।কেননা এর মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত ও অবিকৃত। এতে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত, লেন-দেন, চারিত্রিক ও আত্মশুদ্ধিসহ মানব জীবনের সকল দিক-বিভাগের নৈতিক নীতিমালা দেয়া হয়েছে। আর এ ব্যাপারে আল-কুরআনের শিক্ষা নতুনও নয়, বরং তা পূর্ববর্তী সব আসমানী গ্রন্থেরও দাবী পেশ করেছে। এতে

---

[১]. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪-৪৫।

[২]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির : আয়াত ১৮; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৯: ০৭, ০৬:১৬৪।

[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহ্‌ল: আয়াত ৭৮।

[৪]. ড. জামাল আল-বাদাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬২-১৬৩।

পূববর্তী সব আসমানী গ্রন্থের শিক্ষার সমন্বয় ঘটেছে।[আল-কুরআন০৫:৪৮] আল-কুরআন প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা অবিকৃত, পরিপূর্ণ ও সর্বজনীন। বর্তমানে অবিকৃতভাবে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থের অস্তিত্ব না থাকলেও সেসব আসমানী গ্রন্থের নামে বিকৃত কিছু ধর্মগ্রন্থ সমাজে প্রচলিত আছে। বিকৃতি সত্ত্বেও সেখানে মূল আসমানী গ্রন্থের মূল্যবোধ সম্পর্কিত কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রচলিত সেসব ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ না হলেও আল-কুরআনের শিক্ষার সাথে যে সব অংশের মিল আছে, তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যেগুলো সরাসরি বিশ্বস্রষ্টা প্রদত্ত– আসমানী কিতাব নয়, বরং মানব প্রবর্তিত। সেগুলো অনেকটা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাতে জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত নৈতিক নীতিমালা অনুপস্থিত। কাজেই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উৎস হিসেবে আল-কুরআন অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।

তবে বিশেষ কথা হল, ইসলামী নৈতিক বিধিমালার সাথে পাশ্চাত্য বা অমুসলিম নৈতিক বিধিমালার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। তাই পাশ্চাত্য ও অমুসলিম দার্শনিকদের কেউ কেউ হয়ত ইসলামী নৈতিক বিধিমালার কোন বিষয় নিয়ে আপত্তি মনে করতে পারেন। এর জবাবে বলা যায়– ইসলামী নৈতিক বিধিমালা জ্ঞানের নির্ভুল উৎস ওহী তথা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ইসলাম যে নৈতিক বিধিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে তাই-ই সঠিক ও সত্য এবং যা কিছু এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তাই-ই বেঠিক ও অসত্য। আর এজন্য কোন কৈফিয়ত প্রদান বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কোন বিশেষ যুগের বা বিশেষ কোন শ্রেণীর মানুষের অভিরুচি ও আদর্শের সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য ইসলামের কোন বিধান পরিবর্তন ও সংস্কারের কোনই সুযোগ নেই। এটা দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট যুগ বা শ্রেণীর মানুষ যাকে ভালো বলে জানে অন্য যুগ বা শ্রেণীর মানুষ তাকেই আবার মন্দ বলে গণ্য করে। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট যুগের মানুষ যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ অন্য সময়ে তা-ই নিন্দনীয় প্রতীয়মান হতে পারে। সর্বপরি, মানুষের ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে কোন বিষয়ে সঠিক ও চিরন্তন রায় দেয়া সম্ভবপর নয়। পক্ষান্তরে, মহান আল্লাহ সব ধরনের ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে, তাই কেবল তাঁর মূল্যায়ন ও নৈতিক বিধিমালা ভারসাম্য, সার্বজনীন, যথার্থ ও সঠিক।

আল-কুরআন যেহেতু জোর করে তার মতবাদ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়াতে বিশ্বাসী নয়।[১] তাই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ও দর্শনের মধ্যকার আদর্শগত সব মতপার্থক্য দূর করা না গেলেও সর্বজনীনভাবে কিছু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত্যে আসতে পারে। যেমন–সৃষ্টির প্রতি দয়া, প্রেম, সততা, ন্যায়পরায়নতা, মানবতা, অহিংসা. সরলতা, আত্মসংযম, পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ ইত্যাদি করণীয় বিষয়ে সকল ধর্ম ও নীতিবিদরা একমত। আর অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা, মিথ্যাচার, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য, ইত্যাদি বর্জনীয় বিষয়েও প্রায় সকল ধর্ম ও নীতিবিদরা একমত। এসব বাস্তবায়ন মাধ্যমে সমাজে সত্য-সুন্দরের লালন এবং অসত্য ও অন্যায়ের নির্মূল করতে পারে। এতে একদিকে যেমন মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে তেমনি কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে উঠবে এবং বিশ্বময় শান্তি ও সুন্দরের বিজয় হবে। আর ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে ব্যক্তি, স্থান ও কাল ভেদে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; সেক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে যা সত্য ও ন্যায়, সর্বজনীনভাবে মানুষের জন্য যা কল্যাণকর এবং সুস্থ বিবেক যাকে ভালো বলে স্বীকৃতি প্রদান করে– তাকে আমরা নৈতিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। পক্ষান্তরে, সামগ্রিকভাবে যা মানুষের জন্য অকল্যাণকর, চূড়ান্তভাবে যা সত্য নয়, সুস্থ বিবেক যাকে ভালো বলে স্বীকৃতি প্রদান করে না তাই অনৈতিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এভাবে মানব জাতির জন্য সর্বজনীনভাবে যা সত্য ও কল্যাণকর সে সব বিষয়ে মানুষ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। আর সর্বজনীনভাবে যা মন্দ ও অকল্যাণকর সে সব বিষয় প্রতিরোধে বিশ্ববাসী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের কল্যাণ ও শুভ পরিণাম:

মানব জীবনে আল-কুরআন প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অপরিসীম কল্যাণ রয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমান পৃথিবীতে যে সকল অশান্তি, অস্থিরতা, নৈরাজ্য ও সংকট রয়েছে তা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে। এ কারণে মানুষকে আল্লাহর আযাব ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা করে।[২] এর দ্বারা সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজ থেকে সকল অন্যায় ও অনাচারের অবসান ঘটবে এবং পৃথিবী আল্লাহর রহমত ও কল্যাণে ভরে যাবে। এ মর্মে মহান আল্লাহর ওয়াদা[৩]– وَلَوْأَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْوَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَاعَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْفَأَخَذْنَاهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ "যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি।" অন্যত্র বলা হয়েছে[৪]-وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا-"আর তারা যদি সৎ পথে অবিচল থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতাম(কল্যাণে ভরে দিতাম)।"

---

১. আল-কুরআন ০২:২৫৬।
২.আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ৯৮।
৩.আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ ০৭: আয়াত ৯৬; আরও দেখুন,আল-কুরআন ৫:৬৬।
৪. আল-কুরআন, সূরা আল-জিন্ন ৭২: আয়াত ১৬।

যারা সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে আল্লাহ তাদের জীবনকে সুন্দর ও সহজসাধ্য করে দেন।[১] আল্লাহ তাদের জন্য বহুবিদ কল্যাণ, রহমত, অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি দান করেন এবং সকল দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি প্রদান করেন।[২] সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন যাপনকারীদের আল্লাহ পার্থিব সম্মান, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে দেন, তাদের সাহায্য, বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের উপর থেকে অকল্যাণ ও বিপদ-আপদ দূর করে দেন।[৩] এই শ্রেণীর লোক দ্বারা সমাজের মানুষ উপকৃত হয়। তাদের থেকে মানুষ সৎ চিন্তা ও সৎ জীবন যাপনের প্রেরণা শক্তি লাভ করে। তাদের থেকে জাতির মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়নতা, উন্নত চরিত্র, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবকল্যাণ প্রভৃতি মহৎ গুণ বিকশিত হয়। ফলে সমাজ জীবন থেকে দুস্কৃতি ও অপরাধ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। তাই এ সব লোকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে[৪] لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ-"যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।"

ঈমান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জীবন যাপনকারী ধৈর্যশীল, বিনয়ী, সৎ চরিত্রবান, পূণ্যবান মু'মিন ও মুত্তাকীগণকে আল্লাহ ভালবাসেন।[৫] তাদের কোন ভালো কাজের প্রতিদান নষ্ট করা হবে না। পরকালীন জীবনে প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, সাদর সম্ভাষণা, উত্তম অঙ্গীকার, বিরাট সফলতা, সৌভাগ্য, উচু মর্যাদা, নিরবিচ্ছন্ন বিপুল পুরস্কার, চিরশান্তিময় জান্নাত[৬] ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের জন্য আরও রয়েছে ক্ষমা, অবারিত করুণাধারা, পূর্ণ নিরাপত্তা, নেই কোন ভয় ও চিন্তার কারণ, নেই কোন লাঞ্ছনা, অতৃপ্তি। সেখানে থাকবে না কোন বাজে কথা ও শোরগোল, থাকবে না কোন আত্মিক কলুষতা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। তাদের স্পর্শ করবে না কোন কষ্ট, ক্লান্তি, যন্ত্রণা বা মৃত্যু। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেখানে থাকবে উদ্যান, প্রস্রবণ, মনমুগ্ধকর পরিবেশ, নানা ধরনের সুস্বাদু ফলমূল ও খাদ্য-পানীয়, পানপাত্র, খাট-পালঙ্ক, উন্নত পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিছানাপত্রসহ আরামদায়ক জীবনের সকল উপকরণ। সেখানে থাকবে অপরূপ সুন্দরী সঙ্গীনি ও অগণিত সেবক। সেখানে থাকবে পূণ্যবান সাহচর্য, স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের পূণ্যবান সবাই। এক কথায় সেখানে সেখানে মন চাইবে তাই থাকবে। রাসূল সা. বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন–আমি আমার পূণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। এ কথার সপক্ষে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন[৭]– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "কোন আত্মা জানে না যে জান্নাতবাসীদের জন্য কত চোখ জোড়ানো নিয়ামত গোপন রাখা হয়েছে। আর এসব সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ যা তারা দুনিয়াতে করেছিল।" এ সম্পর্কিত কুরআনের বিশেষ কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল– لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি। আর ধূলোমলিনতা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা তাতে স্থায়ী হবে।"[৮]

মুমিন সৎকর্মশীলদেরকে তাদের ঈমান ও পূণ্যের জন্য অশেষ ও মহানিয়ামত বেষ্টিত জান্নাত প্রবেশ করানো হবে। জান্নাতের নিয়ামত এত ব্যাপক যার পরিপূর্ণ বর্ণনা প্রদান করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ বলেন[৯]– وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ "আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে।"

কুরআনে সৎকর্মশীল মু'মিনদের জন্য যে মনোহর পুরস্কার বর্ণনা করা হয়েছে তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল–[১০]

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ- وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদের অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দিয়ে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা পবিত্র বাক্যের অনুগামী হয়েছিল এবং পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহ্র পথে।" অন্য একটি ভাষ্য[১১],"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদের জন্যে আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, তথায় তাদের স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।" মহান আল্লাহ বলেন-[১২]

---

[১] .আল-কুরআন, ৬৫: ০৪।
[২]. আল-কুরআন, ৬৫: ০২-০৩, (১১:০৩)।
[৩]. আল-কুরআন, ৩৭: ৭৫-৮১, ১০৯-১১১,১১৪-১২২; ৩৪:১০-১৩, ৫৪:৩৩-৩৫; ৩:১২০, ১৯৩; ২২:৩৮; ৮:১৯; ৬৩:৮; ৪৭:৭; ৩০:৪৭; ২৪:৫৫।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার ৩৯: আয়াত ১০।
[৫]. আল-কুরআন, ০২: ১৫৭, ১৯৩, ২২২; ৩:৩১, ১৪৬, ১৫৯,১৬২; ৫:৪২; ২২:৩৭, ১৮:৪৮, ৩৯:৭, ৫৮:২২; ৬১:৪।
[৬]. জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান। জান্নাত হলো সৎকর্মশীল মু'মিন লোকদের জন্য আখিরাতের চিরস্থায়ী বাসস্থান, যা অসংখ্য নি'আমত ও ভোগসামগ্রী পরিবেষ্টিত এবং সর্বপ্রকার কষ্টমুক্ত ও মহাশান্তিময়। কুরআনে জান্নাত শব্দটি ১৪৯ বার এসেছে। জান্নাতের সংখ্যা বা স্তর আটটি। যথা, আদন, খুলদ, নাঈম, মাওয়া, দারুস সালাম, দারুল মাকাম, দারুল কারার ও ফিরদাউস (দেখুন, আল-কুরআন ৬১:১২, ১৮:১০৭, ০৬:১২৭, ১০:২৫, ৩৫:৩৫, ২৯:৬৪, ৫৩:১৫, ২৫:১৫, ১০:০৯, ০৫:৬৫)।
[৭]. আল-কুরআন সূরা আস-সাজদা ৩২: আয়াত ১৭।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০: আয়াত ২৬।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্দাহ ৪১: আয়াত ৩১।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাজ্জ ২২: আয়াত ২৩-২৪, আল-কুরআন ১৮:৩০-৩১।
[১১]. আল-কুরআন, সূরা আল-কাহ্ফ ১৮: আয়াত ৩০-৩১।
[১২]. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুখরুফ ৪৩: আয়াত ৬৯-৭৩।

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ- ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ- يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

"যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল; তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র, সেখানে রয়েছে সবকিছু, যা মন চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা হতে তোমরা আহার করবে।" মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন-[১]

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ- إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ- فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ- فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ- قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ-

"তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে 'নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। 'আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' অতঃপর সে যাপন করবে সুখী জীবন; সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়।" আরও বলা হয়েছে-[২]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ- فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ- يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ- كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ- يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ- فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-

"মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যানরাজি ও ঝর্ণাসমূহের মাঝে। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমীবস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে, আমি তাদেরকে দেব আয়তলোচনা হুর। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুবরণ করবে না। আর তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। এটাই তো মহাসাফল্য।" অন্যত্র বলা হয়েছে-[৩]

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَاأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ-أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ- فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ- ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ-وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ-عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ- مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَامُتَقَابِلِينَ- يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ- بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ- لَايُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ-وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ- وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ- وَحُورٌ عِينٌ- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ- جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا- إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا- وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَاأَصْحَابُ الْيَمِينِ- فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ- وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ- وَمَاء مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ- لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ- وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ- إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا -عُرُبًا أَتْرَابًا- لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ-

ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত; তারা থাকবে নি'আমতপূর্ণ উদ্যানসমূহে। স্বর্ণখচিত সিংহাসনে, তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির-কিশোরেরা। পানপাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে। যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা বিকারগ্রস্তও হবে না। আর তাদের পছন্দ মতো ফলমূল, এবং তাদের রুচিমত পাখীর গোশত নিয়ে। আর তথায় তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর। সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। তাদের কর্মের পুরুস্কার স্বরূপ। তথায় তারা শুনবে না কোন অবান্তর ও খারাপ কথা।'সালাম' আর 'সালাম' ছাড়া। ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা থাকবে এমন উদ্যানে, তথায় রয়েছে কাঁটা বিহীন কুলবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল; যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। আর থাকবে সমুচ্চ শয্যাসমূহ। তাদের আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, তাদেরকে করেছি কুমারী। সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। ডানদিকের লোকদের জন্য।

....

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা একটি ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। এটা শুধু মানুষের ব্যক্তি চরিত্র কিংবা ব্যক্তিগত সততার সাথে জড়িত নয়। বরং এর বিস্তৃতি মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিসহ সমগ্র জীবনের সাথে জড়িত। মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এ সবের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেবল মূল্যবোধের বিকাশ সম্ভব। মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পার্থিব কল্যাণ কিংবা জান্নাত লাভ নয়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর গুণে গুণান্বিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করা।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাক্কাহ ৬৯: আয়াত ১৯-২৪।
[২]. আল-কুরআন, সূরা আদ্-দুখান ৪৪: আয়াত ৫১-৫৭, আল-কুরআন ৫২:১৭-২০, ২২-২৪, ৪৭: ১৫।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ ৫৬: আয়াত ৮, ১১-১২, ১৫-৩৮।

৫ম অধ্যায়ঃমূল্যবোধ বিকাশে মানব জীবনে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রায়োগ পদ্ধতি

৫.১ মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে করণীয়

৫.২ আল-কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা এবং তা উত্তরণের উপায়

৫.৩ বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে গবেষকের মতামত ও সুপারিশ

❑. নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন আল-কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তিনি তাঁর বাস্তব কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে কুরআনের প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন। সাহাবা (রা.) এর একটি দল তাঁর সাহচর্যের মাধ্যমে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক কর্মনীতি আত্মস্থ করেছিলেন। তাই কুরআনের শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ প্রয়োগ করতে হলে তাঁদের অবলম্বিত পথ ও কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটাই কুরআন অনুধাবন ও প্রয়োগের সঠিক পদ্ধতি। বর্তমান যুগে নব্য জাহিলিয়্যাতের এই সমাজ পরিবর্তন করে কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ করতে হলে আমাদেরকে আল-কুরআন ও রাসূল(সা.) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। শিরক, কুফর ও দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজ পরিবর্তনের জন্য তিনি যে কয়টি পর্যায় অতিক্রম করেছেন আমাদেরকেও সেই পর্যায়গুলো অতিক্রম করা। তাই কুরআন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

০১. নিয়মিত আল-কুরআন অধ্যয়ন :

আল-কুরআন মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।[১] মানব জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এখানে মৌলিক ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে।[২] তাই মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথের দিশা পেতে হলে প্রত্যহ কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই পড়া উচিত। প্রতিদিন এজন্য কিছু সময় ব্যয় করা। কেননা উত্তম আমল তা-ই যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়। কুরআন অধ্যয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী শয়তানের সম্ভব্য অপকৌশল সতর্ক থাকা। কেননা শয়তান মানুষের হিদায়েতের পথে বাধা সৃষ্টিকারী [আল-কুরআন ৭:১৬-১৭]। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। বর্তমানকালের বিভক্ত ও অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে সত্য ও মুক্তি পেতে আল-কুরআন অধ্যয়ন ও তদানুযায়ী জীবন পুনর্গঠন অতি জরুরী। নিম্নে কুরআন বুঝা এবং তদানুযায়ী 'আমলের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এর তিলাওয়াত ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। এজন্য হাদীসে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ সুন্নাত হলো ০৭ দিনে বা একমাসে পূর্ণ কুরআন একবার পড়ে শেষ করা। এক বৎসরের মধ্যে কুরআন একবার পড়ে শেষ করতে না পারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। কুরআন নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে যথাসম্ভব কুরআন মুখস্থ করা। হাদীসে বেশি পরিমাণ বা পুর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রাত্রের নামাযে বা তাহাজ্জুদে দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াত করা।

তিলাওয়াতের শর্ত ও আদব: কুরআন তিলাওয়াতের কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। এই শর্ত ও আদবগুলো হচ্ছে-

•শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করে পরিশুদ্ধ মন নিয়ে তিলাওয়াত বা অধ্যয়ন করা। হিদায়াত তথা সুপথের দিশা ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে অধ্যয়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন-[৩] إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ-فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ-لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
"নিশ্চয়ই এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।"

•আল-কুরআনের মহত্ত্ব, মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি খেয়াল করা অর্থাৎ হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে বিশ্বাস করা যে, এই কুরআন বিশ্বস্রষ্টার মহান আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। এটা অন্য সব গ্রন্থের মত সাধারণ কোন গ্রন্থ নয়। এই কুরআন অতি উচু মর্যাদা সম্পন্ন। [আল-কুরআন ৫৯:২১] মহান আল্লাহর মর্যাদা, গৌরব, ক্ষমতা, দয়া-করুণা চিন্তা করে তাঁর বাণীর মর্যাদা অনুধাবন করা।[আল-কুরআন ৮১:১৯-২০] আল্লাহর স্মরণে বিনম্র ও বিগলিত হৃদয়ে তা তিলাওয়াত করা।[কুরআন ৮:২] কেননা কুরআন কোন দাম্ভিককে পথ দেখায় না। [আল-কুরআন ৭:১৪৭, ৪০] তিলাওয়াতের সময় আল্লাহকে উপস্থিত মনে করা, নিজেকে মনে করা আল্লাহর সাথে কথা বলছি। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে-[৪] إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতি মর্যাদাপূর্ণ বাণী নাযিল করছি।

•ইখলাসের সাথে তিলাওয়াত করা তথা কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হবে কেবল মহান আল্লাহর পথনির্দেশ(হিদায়েত) লাভ, তাঁর নৈকট্য হাসিল ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। নিয়তের পরিচ্ছন্নতা ও মনের এই ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা একান্ত

---

[১]. আল-কুরআন, ০৩ : ১৯, ৮৫।
[২]. আল-কুরআন ২৫: ৩৩; ১৬: ৮৯;।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ওয়াক্বি'আ: আয়াত ৭৭-৮০।
[৪]. আল-কুরআন, ৭৩:০৫ ।

জরুরী। মানসিক তৃপ্তি, চিত্তবিনোদন, বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদা পূরণ, নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে উপস্থাপন কিংবা নিজের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে কুরআন অধ্যয়ন সমীচীন নয়। এতে সামান্য পার্থিব নাম-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ লাভ হলেও –এতে হিদায়েত ও পরকালীন মুক্তি সম্ভবপর নয়।

• মস্তিকে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা পরিহার করে গভীর মনোযোগ ও ধ্যান সহকারে পাঠ করা এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।[১] কেননা পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা কুরআনের সঠিক বুঝ ও হিদায়েত লাভের পথে অন্তরায়।

•কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ।[২]

•ধীরে ধীরে, সুস্পষ্টভাবে, সুমিষ্ট কণ্ঠে তথা তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন[৩]- وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا-"আর সুস্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে আল-কুরআন আবৃত্তি কর।"

•বাক্য ও অর্থের সংযোগ রক্ষার জন্য পূর্ণ আয়াত পাঠ করা। পূর্বাপর লক্ষ্য না করে এমন কোন আয়াত বা আয়াতাংশ না পড়া যাতে শ্রোতার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

•ভক্তি, আদব ও বিনম্র সহকারে তিলাওয়াত। ক্ষমার আয়াত পড়লে ক্ষমা প্রার্থনা, ভীতির আয়াত পড়লে অশ্রু বিসর্জন সহকারে নাজাত চাওয়া,[৪] রহমতের আয়াত পাঠ করলে রহমত প্রার্থনা এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক বা আল্লাহর মহিমা জ্ঞাপক আয়াত পড়লে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। কুরআন এবং তাঁর বাণীর যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করা।

•বিশুদ্ধ তিলাওয়াত জানা। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত জরুরী, কেননা তা না করলে অর্থবিভ্রাট ঘটে।

•কুরআন যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আরবী ভাষা-সাহিত্যের প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। তবে নিয়মিত দৈনন্দিন কাজকর্মের বাস্তব নির্দেশ লাভের জন্য কুরআনের যে পরিমান জ্ঞান আবশ্যক তার জন্য আরবী ভাষার তেমন গভীর জ্ঞান অপরিহার্য নয়। এক্ষেত্রে কুরআনের একটি সমৃদ্ধ অনুবাদ যথেষ্ট উপকার দিতে পারে।

•কুরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক আয়াত পড়ার ক্ষেত্রে তা নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং ঠিক তার আগের ও পরের আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা। আর এর আগের ও পরের আয়াত সমূহের সঙ্গে এর পর্যায়ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করে প্রত্যেক সূরা ও সূরার অংশ পড়া ও বোঝা উচিত। কুরআন কেন পড়ছেন? কেন ও কিভাবে পড়া উচিত–তা আত্মপর্যালোচনা করা। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[৫]– إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তর অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।
তবে কোন বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য বিশেষ শব্দ বা বাক্য কেন এবং কি কারণে ব্যবহার করা তা সতর্কতার সাথে নিরূপন করতে হবে। সর্বত্র রহস্যের সন্ধান না করে সহজ ও সরল অর্থ গ্রহণ করেই কুরআন অধ্যয়ন করা উচিত। তবে উপমা, রূপক, অলংকার ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
আর বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য রূপক অর্থজ্ঞাপক আয়াত (মুতাশাবিহ আয়াত) রহস্য উদঘাটনের অপচেষ্টায় লিপ্ত না হওয়া।

০২.কুরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবন:

মানুষের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে কুরআন একটি নিখুঁত দিশারী। মহান আল্লাহ কুরআন প্রেরণ করেছেন অনুধাবন করার জন্য, না বুঝে শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআনের তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদত, তেমনি কুরআন অনুধাবন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে মানুষ ইহ ও পরজীবনে সফলকাম হওয়ার জন্য বাস্তব জ্ঞান লাভ করতে পারে। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই তা অনুধাবন করা। মহান আল্লাহ বলেন-[৬] (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) "আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।"
যারা কুরআন বুঝতে ও কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে না, কুরআন কি বলছে তা উপলব্ধি সহকারে অধ্যয়ন করে না, মহান আল্লাহ তাদের ভর্ৎসনা করেছেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৭]: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا
"তারা কি কুরআনকে অনুধাবণ করে-না ? না-কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"

হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে অনুধাবন ও চিন্তা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য সাহাবীগণ ১০টি আয়াত শিখে এর ব্যাখ্যা ও অর্থ ভালোভাবে না-বুঝা পর্যন্ত অন্য ১০টি আয়াত শুরু করতেন না। রাসূলুলাহ সা. বুঝে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম

---

১. আল-কুরআন,০৭:২০৪।
২. আল-কুরআন, ১৬:৯৮।
৩. আল-কুরআন, ৭৩:৪।
৪. আল-কুরআন, ১৭:১০৯।
৫. আল-কুরআন, সূরা ক্বাফ ৫০: আয়াত৩৭।
৬. আল-কুরআন, সূরা সাদ: আয়াত ২৯। আল-কুরআন ১২:২।
৭. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ: আয়াত ২৪ ।

করে তিলাওয়াত করার জন্য তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে কুরআন বুঝার জন্য সাহাবী ও তাবেয়ীদের কর্মনীতি, বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ এবং যুগে যুগে যারা কুরআন গবেষণা করেছেন তাদের সহায়তা নেয়া।

যারা কুরআন পাঠ করে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করে না তারা কুরআন অনুধাবন করতে সামর্থ্য হয় না। তাই প্রকৃত মুমিনগণ যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তারা কুরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তিলাওয়াত করে। এ মর্মে বলা হয়েছে-[১] الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ - যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

কুরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবন পদ্ধতি: আল-কুরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে ইসলামী চিন্তাবিদগণ কতগুলো বিষয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। সংক্ষেপে সেগুলো হলো–

•কুরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে তা আন্তরিক মনোনিবেশ সহকারে এবং অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বারবার পড়া।

•কুরআন তিলাওয়াতকালীন সময় নীরবতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

•সমগ্র কুরআন অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একক হিসেবে বুঝা।

•আল্লাহর নিকট দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করা।

•কুরআনের সাহায্যে কুরআন বুঝা। কেননা কুরআনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনেই পাওয়া যায়।

•হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআন বুঝা নির্ভরযোগ্য সীরাত গ্রন্থ থেকে। রাসূল (সা.) এর জীবনী ভালোভাবে অধ্যয়ন। কেননা রাসূল সা. ছিলেন জীবন্ত কুরআন। কুরআনের এমন কোন শিক্ষা নেই যা তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন ঘটেনি।

•তাফসীর গ্রন্থের সহায়তা নিয়ে কুরআন বুঝা।

•আরবী ভাষা ও ব্যকরণ জানা।

•কুরআন ও ইসলামের মৌলিক পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। যেমন: ঈমান-কুফর, তাওহীদ-শির্ক, নিফাক, তাগূত, ফুসূক, মুহকাম-মুতাশাবিহ, নাসিখ-মানসুখ ইত্যাদি পরিভাষাগুলো ভালোভাবে জানা।

•আয়াতের শব্দার্থ, সরল অর্থ, ব্যাখ্যা, শব্দ অধ্যয়ন, মূল পাঠের বিষয়বস্তু, শানে-নুযূল, নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-পটভূমি এবং নাযিলকালীন ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ ও বাস্তব পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক সংগ্রামমূখর জীবন্ত কুরআন বুঝা।

•মাক্কী-মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য, কুরআনের সূরা নাযিলের স্তর তথা রাসূল সা. নবুয়্যতের মাক্কী জীবনের ১২বছরে বিভিন্ন স্তরে সূরা নাযিল, যেমন (০১-০৩ বছরে)=২৮টি, (০৪-০৫)=১১টি,(০৫-১০)=৩৭টি ও (১১-১৩)=১৩টি সম্পর্কে ধারণা রাখা অনুরূপভাবে মাদানী সূরার স্তর সমূহ জানা।

• সামষ্টিক অধ্যয়ন/দরস।

•কুরআনের শিক্ষার প্রতি অন্তরের সাড়া দেয়া।

•কুরআনের দ্বারা আত্মাকে সজীব করা। কুরআন পাঠ করে হৃদয়ে আল্লাহর ভক্তি, ভালবাসা, ভয়, শ্রদ্ধা জগ্রত করা।

•আল-কুরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনে চিন্তা-গবেষণা করা। উপলব্ধি সহকারে অধ্যয়ন করা এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করা। মন-মানস ও ধ্যান-ধারণায় কুরআন প্রতিষ্ঠার জন্য পুনঃপুনঃ গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্ত করা। কুরআন চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে আরবী অভিধান, ব্যকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র ও আরবী ভাষার বর্ণনারীতি এবং কুরআন নাযিলকালীন সময়ের আরবদের অবস্থা ও মন-মানসিকতা এবং তাদের সমাজ-সভ্যতা ও ইতিহাস জানা জরুরী।

বিশিষ্ট কুরআন গবেষক আমীন আহসান ইসলাহীর মতে, আল-কুরআন বুঝার জন্য কিছু প্রাথমিক শর্ত রয়েছে। তা হলো: ক). নিয়তের বিশুদ্ধতা অর্থাৎ কেবল হিদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করা। নিজের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে কুরআনের নিকট ন্যস্ত করা। পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস ও কুপ্রবৃত্তির খাহেশ পূরণের ইচ্ছা থেকে নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সুস্থবিবেক ও আগ্রহী মন নিয়ে অধ্যয়ন করা। খ). কুরআনের প্রতি যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করা অর্থাৎ কুরআনকে উচু মর্যাদাপূর্ণ কিতাব হিসেবে গ্রহণ করে তা বুঝার চেষ্টা করা। গ). কুরআনের দাবী অনুযায়ী নিজেকে গঠন করা তথা কুরআন অনুযায়ী নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকের পরিবর্তন আনার দৃঢ় সংকল্প করা এবং এর আলো যে পথ প্রদর্শন করে সেদিকেই চলা। ঘ). গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করা। অর্থাৎ সওয়াবের নিয়তে তিলাওয়াতের পরিবর্তে একটি জীবন বিধান হিসেবে চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করা। ঙ). কুরআনের কোন জটিলতার দরুন হতাশ বা ভগ্নোৎসাহ না হয়ে তা আল্লাহর নিকট পেশ করে তাঁর সাহায্য চাওয়া।[২]

০৩.দৃঢ় আস্থা সহকারে আল-কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা তথা আমল ও উন্নত আখলাক:

[১]. আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ : আয়াত ১২১।

[২].দেখুন, আমীন আহসান ইসলাহী, *কুরআন গবেষণার মূলনীতি*, সৈয়দ মোহাম্মদ জহীরুল হক (ঢাকা : ই. ফা. বা. ১ম প্রকাশ, ১৯৮০), পৃ.১-৯, ১২-১৩,।

আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়েত ও মুক্তির দিশারী। এর নির্দেশ পালন ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই শুধু সেই হিদায়েত ও মুক্তি আমরা পেতে পারি। তাই শুধু সাওয়াব হাসিল অথবা মানসিক তৃপ্তি কিংবা চিত্তবিনোদনের জন্য কুরআন পাঠ না করা, বরং কুরআন প্রদত্ত প্রতিটি বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়নের জন্য তা তিলাওয়াত করা এবং নিজেদের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও জীবন যাপনে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটানো। এর কোন একটি শিক্ষাকে সেকেলে মনে করে বাদ দেয়া কিংবা কিছু গ্রহণ আর কিছু বর্জন করার কোনই অবকাশ নেই। জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারে কুরআন যে পরিবর্তন কামনা করে তা দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প সহকারে মেনে নেয়া। সন্দেমুক্তভাবে কুরআনের দেয়া জ্ঞান ও নির্দেশিকা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা। পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠন না করলে তা ক্ষতি ও দুর্দশার কারণ হবে। যারা কুরআন বিশ্বাসের দাবী করে অথচ এর বিধান পালনে অবহেলা করে কুরআন তাদের নিন্দা করে।[১]

কুরআনের তিলাওয়াত ও অনুধাবন ইবাদত, তাতে সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এই দুই পর্যায়ের ইবাদত মূলত নফল পর্যায়ের। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ফরয। আর ফরয পালনের পরেই নফল ইবাদত আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা ও মহান পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। তিলাওয়াত ও অনুধাবনের ‘আমল জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন[২] - وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বে, অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না।
এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, “আমাদের কেউ যখন দশটি আয়াত শিক্ষালাভ করত, তখন তার অর্থ ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও তদানুযায়ী আমল করার পূর্বে সে আর কিছু শিখার জন্য অগ্রসর হত না।”[৩]

আল-কুরআন প্রদত্ত জীবনাদর্শ ভালোভাবে অনুধাবন এবং সে অনুযায়ী নিজ জীবন ও পরিবার গঠনে পূর্ণপ্রচেষ্টা করা ও কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নে মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হচ্ছে–ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে ইসলামিক ব্যক্তিত্ব তৈরী করা, যার জীবনের সব কাজ সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি মেনে চলবে এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। আর শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ (যিকির), নফল ইবাদত এবং আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করা।

০৪.আল-কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসারে দাওয়াত :

মানুষের কাছে আল-কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা প্রচার এবং এর কল্যাণকারিতা তুলে ধরা। মানব জীবনে কী করণীয় আর কী বর্জনীয় তা মানুষকে জানিয়ে দেয়া। ব্যক্তির জীবনে তার দায়িত্ব-কর্তব্য জানানোর সাথে সাথে তা পালনে সচেতনতা সৃষ্টি করা। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে বাঁধা প্রদান করা এবং এ সবের অনিষ্টতা তুলে ধরা। ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের অশুভ পরিণাম বর্ণনা করা। এ সবই দাওয়াহ–এর অন্তর্ভুক্ত।

দাওয়াতের কর্মনীতি: মানুষের মাঝে দাওয়াহ এর কাজে সফলতা অর্জনে কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন–
-কুরআন-সুন্নাহ তথা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং সমসাময়িক যুগ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়া।[৪]
-দ্বীনের দাওয়াহ কার্যক্রমের সর্বক্ষেত্রে সহজ-সরল পন্থা অবলম্বন করা। এ মর্মে রাসূল সা. বলেছেন-[৫] “*তোমরা সহজপন্থা অবলম্বন কর, কঠোরতা অবলম্বন কর না। সুখবর দাও, ঘৃণা-বিরক্তি সৃষ্টি করো না।*”
-দাঈকে স্বীয় কথা ও কাজে রাসূল সা.এর অনুসারী হওয়া। জ্ঞানানুযায়ী ‘আমল ও আত্মগঠন করা।[৬] দাওয়াহর কাজ ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রে দাঈর জন্য এটা জরুরী নতুবা উপদেশ তো ক্রিয়াশীল না হয়ে অনেক সময় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
-দাওয়াহর কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে ধৈর্য-সহনশীলতা, বিনয়-নম্রতা, সততা, উদারতা, সৎসাহস ইত্যাদি মহৎ গুণ উন্নত নৈতিক গুণবলী ও প্রশংসনীয় চরিত্র অধিকারী হওয়া। এ মর্মে বলা হয়েছে[৭]-وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون
“আর যখনই তাদের কাছে কোন নাবী এসেছে তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করেছে।”
-দাওয়ার কাজের জন্য মানুষের কাছে প্রতিদান আশা না করা কিংবা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের চিন্তায় তা না করা।[৮]
-দাওয়াহর পথে আসা যে কোন কষ্ট-যাতনা সহ্য করা এবং এজন্য যে কোন ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকা [আল-কুরআন ১৯:৪১-৪৮]।
-পূর্ণ আন্তরিকতা, ভালবাসা ও আল্লাহর দ্বীন প্রচারের দায়িত্বনুভূতি নিয়ে দাওয়াহর কাজ করা।[১]

---

[১]. আল-কুরআন, ০২ : ৪৪; ৬১: ০২-০৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা ৩৯: আয়াত ৫৫।
[৩]. ইবন জারীর তাবারী, *জামি‘উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, খ.০১, পৃ.৮০।
[৪]. আল-কুরআন ১২:১০৮।
[৫]. মূল আরবী [يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবুল ‘ইলম, হাদীস নং ৬৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং১৭৩৪।
[৬]. আল-কুরআন ০২:৪৪; ৬১:০২, ১১:৮৮।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা আয-যুখরুফ ৪৩:আয়াত ০৭।
[৮]. আল-কুরআন ১০:৭২; ১১:২৯, ৫১; ২৬:১০৯,১২৭,১৪৫,১৬৪,১৮০; ৩৪:৪৭।

-স্নেহ-ভালবাসা সহকারে এ কাজ করা। মহান আল্লাহ মূসা ও হারূন আ. কে ফিরআউনের সাথে কোমল আচরণে নির্দেশ দেন। ইরশাদ হচ্ছে[২]– فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى "তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"

- দাওয়াহর কাজে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও উত্তম কৌশল অবলম্বন করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।"[৩] উল্লেখিত আয়াতে হিক্‌মাত সম্পর্কে ইমাম রাযী বলেন, "কথা ও কাজে সঠিক তথা যথার্থতা এবং প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তুকে যথাযথ স্থানে রাখাকে হিক্‌মত বলে।"[৪]

কারো কারো মতে,হিকমত হচ্ছে এমন সব দলিল-প্রমাণ যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবে এবং সংশয় দূরীভূত করবে। আর সদুপদেশ বলতে বুঝানো হয়েছে, লাভজনক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য। প্রথম পর্যায়ে দাওয়াত দিতে হবে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দিতে হবে সাধারণ গণমানুষকে।এরপর বিষয়টি যদি বিতর্কের ময়দানে চলে যায় তাহলে বিতর্ক হতে হবে সুন্দর, শালীন ও সুস্থভাবে অর্থাৎ কথাবার্তায় মাধুর্য ও নমনীয়তা সৃষ্টি করতে হবে ফলে ভিন্নপক্ষের উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে সংযত করতে এবং তাদের ক্রোধের আগুনে পানি ঢেলে দিতে সক্ষম হবে।[৫]

দাওয়াহর পদ্ধতি: ইসলামী দাওয়াহ-এর বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি রয়েছে। যেমন :-

•*ওয়ায-নসীহত/স্মরণ করিয়ে দেয়া*: ওয়ায, নসীহত ও সদুপোদেশ মানুষের নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদপোদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কুরআন, হাদীস, পূণ্যবানদের বিভিন্ন ঘটনা ও পাপীদের মন্দ পরিণতি দ্বারা উপদেশ দানের মাধ্যমে মানুষকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করার ক্ষেত্রে এটা কার্যকর পদ্ধতি। এতে অপরাধী, পাপী, অবাধ্যচারী ও মুনাফিকরাও অনেক ক্ষেত্রে সংশোধিত হন এবং মু'মিনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন[৬]–وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ-"এবং উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।" আরও বলেন[৭] وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, "আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না।"

• *ভালো কাজে উদ্বুদ্ধকরণ, পথপ্রদর্শন এবং মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্কীকরণ:* ভালো ও পূণ্যের কাজে উৎসাহ প্রদান এবং পাপ ও মন্দ কাজে সতর্ক উচ্চারণ করে এবং মানুষের মুক্তির পথনির্দেশ করে কুরআন যে সব বার্তা দিয়েছে–তা মানুষকে উত্তম পন্থায় জানিয়ে দেয়া। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন-[৮] هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ-"এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং হিদায়াত ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।"

• *দৃষ্টান্ত ও উপমা বর্ণনা*: কুরআন মাজীদ মানুষকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নানান দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছে। যেমন–وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি; আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।[৯]

• *স্নেহ-ভালবাসা সহকারে মানুষের নিকট আল-কুরআনের বিধান ও শিক্ষাকে উপস্থাপন* : হৃদয়ভরা ভালবাসা ও বিপুল ধৈর্য নিয়ে মানুষকে এ পথে আহবান করা। এ ব্যাপারে কারো উপর জবরদস্তিমূলক পন্থা কিংবা তড়িঘড়ি করে ফল লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল সা. প্রদত্ত পন্থার বাইরে কোন পদ্ধতি অবলম্বন না করা। এ মর্মে বলা হয়েছে[১০]– إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا নিশ্চয় এটি উপদেশ; অতএব যে চায় সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে।

০৫. শিক্ষার সর্বস্তরে আল-কুরআনকে পাঠ্যভুক্ত এবং সর্বসাধারণের মধ্যে কুরআন চর্চার ব্যবস্থা:

মক্তব শিক্ষার আধুনিকায়নসহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সর্বস্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহর কোর্স চালু করা। শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে বয়স ও শ্রেণী অনুপাতে কুরআনের শিক্ষা বিন্যাস ভিন্ন রকম হবে। যেমন: শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, ছোট ছোট সূরা ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হিফযের ব্যবস্থা করা। মাধ্যমিক স্তরে ছোট ছোট সূরাসমূহের তরজমা, সীরাত এবং আখলাক গঠনের উপযোগী উপদেশপূর্ণ ছোট গল্প শিক্ষা দেয়া। এ পর্যায়ে কুরআন কারীমের সে সব উপদেশপূর্ণ ছোট গল্প অন্তর্ভুক্ত করা যা মানুষকে সততায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দকে ঘৃণা

---

[১]. আল-কুরআন ৭৩:১-৫; ৭৪:১-৩।
[২]. আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা ২০: আয়াত ৪৪।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আন্-নাহ্‌ল ১৬ : আয়াত ১২৫।
[৪]. ফখরুদ্দীন আল-রাযী, *প্রাগুক্ত*, খ.৪, পৃ.৬১।
[৫]. ড.আব্দুল্লাহ আল-মুসলিহ ও অন্যান্য, *মুসলমানকে যা জানতেই হবে*, অনুঃ আঃ মান্নান তালিব ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬৩।
[৬]. আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত ৫১: আয়াত ৫৫।
[৭]. আল-কুরআন, সূরা মারইয়াম ১৯: আয়াত ৩৯।
[৮]. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান ০৩: আয়াত ১৩৮।
[৯]. আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত ২৯: আয়াত ৪৩।
[১০]. আল-কুরআন, সূরা আদ-দাহ্‌র / আল-ইন্সান ৭৬: আয়াত ২৯।

করতে শিখায়। যেমন ইউসুফ ('আ.) এর গল্প যা মানুষের নীতি জ্ঞান আরোপ করে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]– لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।

উচ্চ শিক্ষা স্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, নৈতিক ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে কুরআনের শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইতিহাস, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তাফসীর ও জীবন-জগত সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন দিকের হিসেবে গভীর অধ্যয়ন করা।

• **প্রত্যেক মহল্লার মসজিদে মক্তব ও বয়স্ক কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ:** প্রতিটি মহল্লার মসজিদে ও মক্তব উন্নত পদ্ধতিতে ব্যাধতামুলকভাবে শিশুদের জন্য বাদ ফজর অথবা বাদ আসর এবং বয়স্কদের জন্য বাদ মাগরিব অথবা বাদ এশা কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থা করা। সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেখানে দক্ষ শিক্ষকের নিযুক্তির ব্যবস্থা করা।

• **জুমু'আর খুৎবায় ধারাবাহিকভাবে ০৫ আয়াত করে সমগ্র আল-কুরআন আলোচনা:** জুমু'আর খুৎবায় সাধারণভাবে বিভিন্ন মাসের ফযীলত কিংবা বিশেষ কিছু ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ ধরনের আলোচনায় জীবন পরিচালনা কিংবা ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ জানা যায় না। কিন্তু প্রতি শুক্রবার জুমু'আর খুৎবায় ০৫ আয়াতের মর্মার্থ বা সংক্ষিপ্ত তাফসীর পেশ করে মানব জীবনে তার শিক্ষাসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনায় মাধ্যমে সব শ্রেণীর মানুষ সমগ্র আল-কুরআন সম্পর্কে জেনে প্রকৃত সত্য ও সঠিক হিদায়েত লাভ করতে পারে।

০৬. প্রত্যেক জনপদে কিছু যুগোপযোগী সত্যপন্থী সুদক্ষ আলিম তৈরী করা:

সমগ্র জাতি কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য প্রত্যেক জনপদে কিছু যুগোপযোগী সত্যপন্থী সুদক্ষ আলিম তৈরী করা। এক্ষেত্রে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, মুত্তাকী, প্রতিভাবান ও সম্পদশালীদের পরিবার থেকে এগিয়ে আসা উচিত। জাতীয় পর্যায়েও সততা, তাকওয়া, নিষ্ঠা, মেধা ও যোগত্যার ভিত্তিতে বাছাইকৃত তরুণ আলিমদের মধ্য থেকে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উচু মানের কিছু আলিম তৈরীর জন্য বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এবং সুযোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক দ্বারা দেশেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মত কিছু ইসলামী প্রতিষ্ঠান তৈরী করা।

আলিমদের নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞান, আখলাক, তাকওয়ার দ্বারা সমৃদ্ধ করা। নিজ জীবন ও কর্মে কুরআন ও সুন্নাহর সত্যিকার অনুসরণ করা। নিষ্ঠাপূর্ণ (ইখলাস) কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য তুলে ধরা। মানুষের নিকট ইসলামকে রাসূল সা. ও সাহাবীদের মত করে সঠিকভাবে তুলে ধরেন।

০৭.জনমত গঠনে বিরামহীনভাবে কাজ করা:

সমাজে কুরআনের শিক্ষা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজন জনসমর্থনের। এজন্য প্রয়োজন কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধানের কল্যাণকারিতা তুলে ধরে জনমত গঠন এবং মানুষের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। যুগে যুগে নাবী-রাসূল নিজ জাতির মধ্যে এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। আর এটাই দুনিয়ায় সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌঁছানোর গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ কাজে নূহ ('আ.)স্বীয় কাওমে প্রায় ৯০০ বছর অবিরামভাবে মানুষকে আহবান করেন।[২] হুদ ('আ.) স্বীয় কাওম আদ জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী মানুষকে আহবান করেন।[৩] সালিহ ('আ.) স্বীয় কাওম সামুদ জাতির মধ্যে দীর্ঘ সময়মানুষকে আহবান করেন।[৪] শু'আয়েব ('আ.)মাদায়েনে স্বীয় কাওমকে দীর্ঘ দিন আহবান করেন।[৫] ইব্রাহীম ('আ.), ইসমাঈল('আ.), ইসহাক ('আ.), ইয়াকুব ('আ.), লূত ('আ.), ইউসুফ ('আ.), আইয়ুব ('আ.), দাউদ ('আ.), সুলাইমান ('আ.), যাকারিয়া ('আ.), 'ইসা ('আ.) প্রমূখ এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[৬]

রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সমগ্র জীবনে এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নাবী আগমনের ধারা বন্ধ হওয়ার তাদের অবর্তমানে এই দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তেছে। এখন যাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন পৌঁছেনি কিংবা যারা দ্বীন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন না তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো আমাদের জন্য জরুরী; চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক না কেন। মহান আল্লাহ বলেন[৭]- قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'। মানুষকে এ পথে আহবান করা সর্বোত্তম মহৎ

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২: আয়াত ১১১।
[২]. আল-কুরআন, (০৭:৫৯)
[৩]. আল-কুরআন, (০৭:৬৫)
[৪]. আল-কুরআন, (০৭:৭৩)
[৫]. আল-কুরআন, (০৭:৮৫)
[৬]. আল-কুরআন, (১২:৩৯-৪০)
[৭]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ ১২:আয়াত ১০৮।

কাজ। মহান আল্লাহ বলেন[১]– وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ "কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত।" রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[২], "আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং এর মধ্যাকার সবকিছু থেকে উত্তম।"

কুরআন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন[৩]-

> তোমাদের কেউ কোথাও আল্লাহর জন্য কথা বলার প্রয়োজন বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কথা না বলে নীরব থাকাকে হালকা ভাবে দেখবে না। কারণ, আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বলনি? তখন সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি মানুষদের ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।

এ কাজ বাস্তবায়নে করণীয়: ব্যক্তিগতভাবে মানুষের নিকট গিয়ে দাওয়াত পেশ, ওয়ায-নসিহত, বইপত্র লিখা ও বিতরণ করা, আলিম ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তৈরী করা, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা।

০৮. উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা:

কুরআনের শিক্ষার প্রতি আহবানকারীদের উন্নত আমল-আখলাক, সততা, ন্যায়পরায়নতা ও কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এজন্য সত্যের পথে একদল লোককে সত্যের জীবন্ত সাক্ষ্যে পরিণত হওয়া। যাদের আচরণ ও চরিত্রে ইসলামের প্রকৃত ও সার্বিক সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। এটা করতে হবে শুধুই আল্লাহর জন্য। রাসূল সা. নবুয়তের পূর্বে সমাজে বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, দয়ালু, অনাথ, বিধবা, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও আত্মীয়তা রক্ষাকারী ছিলেন।[৪] নবুয়ত লাভের পর তিনি কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেন। সাহাবীগণ উন্নত আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন কারণ তারা কুরআনের সকল নির্দেশনাবলী নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছিল। তাদের আচার-আচরণ, উঠা-বসা ও চাল-চলনের ভিতরে কুরআনকে এমনভাবে প্রবেশ করেন যে, ইসলাম তাদের বাস্তব জীবন ও কর্মে মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল। তারা প্রত্যেকেই ঈমানের জ্বলন্ত চিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেন। এরূপ ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালবাসা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সততায় এমনভাবে গড়ে উঠবেন যেন তারা এই সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পারেন। আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গকারী এই মানুষরা সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে একটি সংস্থার অধীনে কাজ করবেন এবং যথাযথ লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টায় শামিল হবেন। এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণী-[৫]

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
>
> "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও। যেমন মারইয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিল, আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। তারপর বনী–ঈসরাইলের মধ্য থেকে একদল ঈমান আনল এবং অপর এক দল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর ওপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।"

এভাবে কুরআনের তিলাওয়াত, হিফয, অনুধাবন ও পালনের পাশাপাশি কুরআন কেন্দ্রিক এ সকল ইবাদত পালন শিক্ষা দানও মাসনূন ইবাদত।

০৯. আল-কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধান বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় সাহায্য গ্রহণ করা:

আল-কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা অর্জন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কেননা অন্যায়, অসত্য ও মন্দ উৎখাত এবং অন্যায়কারীকে দমন করা শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়া সম্ভবপর নয়। এজন্য স্বয়ং রাসূল সা. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে[৬]– وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا "আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর'।"[৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ রহ, বলেন–

> "রাসূল সা. এটা জানতে পেরেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাসিল করা ব্যতিত দ্বীনের প্রচার এবং তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য দু'আ করেছেন। যেন তিনি আল্লাহর কিতাব প্রচার এবং দ্বীনের বিধান ও ফরজসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ, যদি না থাকত তবে একে অন্যকে আক্রমণ করত এবং শক্তিশালী দুর্বলকে খেয়ে ফেলত।" এজন্য মহান আল্লাহ বলেন[৮]–

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা হা-মীম আস-সাজ্‌দাহ ৪১ : আয়াত ৩৩।

[২].মূল আরবী[لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها] *সহীহ আল-বুখারী*, কিতাবল জিহাদ, হা.নং ২৬৩৯; *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, হা.নং ১৮৮০।

[৩]. *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, *প্রাগুক্ত*, খ.০৩, পৃ.৩০, হাদীস নং ১১২৭৩।

[৪]. দেখুন, *সহীহ আল-বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ওহী, হাদীস নং ৫৩০৯।

[৫]. আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্‌ফ ৬১: আয়াত ১৪; আরও দেখুন, আল-কুরআন ৩৩: ২১; ৪৬:৩৫।

[৬]. ইবনু কাছীর *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*,, *প্রাগুক্ত*, খ.৫, পৃ.১১১।

[৭]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা/বানী ইসরাঈল ১৭: আয়াত ৮০।

[৮]. আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : আয়াত ২৫।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, রয়েছে তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিদ কল্যাণ। আর এটা এজন্য যে , যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর,পরাক্রমশালী।"

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুরআনের শিক্ষা প্রচার-প্রতিষ্ঠার এক মহাআশির্বাদ। এ প্রসঙ্গে ইবনু কাছীর রহ. বলেন–

"আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা অনেক অন্যায় কাজ বন্ধ করে দেন, যা শুধু কুরআন দ্বারা (কুরআনের শিক্ষা প্রচার) বন্ধ হয় না।" অর্থাৎ অনেক লোক আছে যারা শুধু কুরআনের ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদানের দ্বারা অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে না। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারী শাস্তির ভয়ে তারা লোক অন্যায়, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।[১]

১০.পরীক্ষামূলকভাবে রাষ্ট্রের বিশেষ অঞ্চলে কুরআনী আইন ও বিধান সমাজে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়নে চালু করা:

বর্তমানকালে কুরআন প্রদত্ত বিধি-বিধান সমাজের মানুষের জন্য কল্যাণকর নাকি অকল্যাণকর তা পরীক্ষা করতে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধায়নে পরীক্ষামূলকভাবে রাষ্ট্রের বিশেষ অঞ্চলে (যে সব এলাকার অধিকাংশ মানুষ এটা চায় সে সবএলাকায়) তা চালু করা। কিংবা প্রচলিত বিচার বিভাগের পাশাপাশি ইসলামী বিচার বিভাগ চালু করা। বর্তমান পৃথিবীর অনেক দেশেই এর নযির আছে। যে এলাকায় এরূপ কুরআন প্রদত্ত বিধি-বিধান চালু আছে সেখানে অপরাধ অনেক কম দেখা যায়।

❑.আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা:

আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের কথা বলা যত ময়দানে তা বাস্তবায়ন তত সহজ নয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিশেষ কিছু কারণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

✡.কুরআন প্রতি গুরুত্বহীনতা ও চর্চায় অনীহা, মক্তব শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস, বস্তুবাদী শিক্ষার কুপ্রভাব :

বর্তমান মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, ভোগ-বিলাস ও সম্পদ অর্জনের মানসিকতা ভীষণভাবে পেয়ে বসেছে। বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থা এটাকে তীব্রভাবে উৎসাহিত করছে। ফলে মুসলিম জাতি আজ অমুসলিমদের মত পার্থিব জীবনের সফলতা ও সম্পদ অর্জনের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করায় কুরআন শিক্ষা করা তাদের নিকট গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। আজ শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই পার্থিব সামগ্রী অর্জনে ব্যস্ত। কুরআন পড়া ও জানা-বুঝার সময় বা আন্তরিক আগ্রহ তাদের নেই। এক সময় মসজিদ ও মক্তব ভিত্তিক কুরআন শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও আজ তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। আজ মুসলিমদের একটি বড় অংশ শুদ্ধ করে কুরআন পড়তেও পারে না।

পার্থিব সফলতার নেশায় মানুষ আজ কুরআনকে উপেক্ষা ও অবহেলা করছে। বস্তুবাদী-ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ পার্থিব সফলতা ও ভোগ-বিলাসে ভয়ানকভাবে ঝুকে পড়েছে। যে কুরআন কোটি কোটি মানবাত্মাকে আলোর পথ দেখিয়েছে আমরা মুসলমানগণ বর্তমান যুগে এর আলো গ্রহণ করছি-না। আজ মুসলিম সমাজের কেউ কেউ কুরআনকে একেবারেই অবহেলা করে তাকে তুলে রেখেছেন। আমরা অনেক বই, পুস্তক বা সংবাদ পত্র পড়ি, কিন্তু আমাদের পাঠ্য তালিকায় আল্লাহর কিতাব নেই! কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্যান্য যিক্রকে ওযীফা করে নেওয়া এবং কুরআন পরিত্যাগ করে শুধু অন্যান্য কিতাবাদি থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ রাসূল সা. ত্রিশ দিন বা এক মাসের মধ্যে সমগ্র কুরআন একবার পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আজ অধিকাংশ এক মাস তো দূরের কথা বছরে একবারেও সমগ্র কুরআন পড়ে না। এমন অসংখ্য লোকও পাওয়া যাবে যারা সারা জীবনে একবারও সমগ্র কুরআন পড়ে শেষ করতে পারেনি।

কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বহীনতার কারণ: ক.বস্তুবাদী শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব ও এর বোঝা। খ. অভিভাবকদের সচেনতহীনতা। গ.শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন বা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্বহীনতা। ঘ.শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শেষ ঘন্টায় গুরুত্বহীন বিষয় রুটিনে স্থান। ঙ.কিন্ডার গার্ডনে সকালে ক্লাসের সময়সূচীগত প্রতিবন্ধকতা।

কুরআন বা মক্তব শিক্ষার উন্নয়নে করণীয়: ক.আখিরাত ও বস্তুবাদী শিক্ষা উপেক্ষার কুফল সম্পর্কে সতর্কীকরণ। খ. অভিভাবকদের মধ্যে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেনতা সৃষ্টি। গ.শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন বা ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব প্রদান। ঘ.মসজিদ বা মক্তবে শিশুদের জন্য বাদ আসর ও বয়স্কদের জন্য বাদ মাগরিব কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

✡.কুরআন সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা ও অধ্যয়ন সমস্যা:

---

[১]. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, প্রাগুক্ত*, খ.৫, পৃ.১১১।

আজকালের মুসলিমরা কুরআন সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতা। আশ্চর্য বিষয় হলো অধিকাংশ মুসলিমও কুরআন পাঠ করতে জানে না কিংবা পড়তে বা বুঝার চেষ্টাও করে না এবং তারা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর প্রয়োগও করে না। আর এজন্য তারা কোনো কষ্টও অনুভব করেন না। অথচ আল-কুরআন ইসলামের মূল উৎস। অনেক ধার্মিক মুসলিম কুরআন পড়লেও শুদ্ধভাবে পড়তে জানে না, অনেকে পড়তে জানলেও অর্থ বুঝে না, কেউ কেউ অর্থ বুঝলেও তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না। অথচ ইসলাম থেকে সুফল পেতে হলে আল-কুরআন শিক্ষা করা, তা অনুধাবন করা এবং এই শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গঠন করা জরুরী।

✡.আংশিক তিলাওয়াত করা:

ফযীলত অর্জনের চেষ্টায় অনেকে কুরআনের নির্দিষ্ট দুই-তিনটি সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে তিলাওয়াত করে থাকে, বাকি কুরআন তিলাওয়াত করেন না। এটা সুন্নত পরিপন্থী, রাসূলুলাহ সা. এবং তাঁর সাহাবীগণ এভাবে ফযীলতের উদ্দেশ্যে সূরা বেছে নিয়ে ওযীফা তৈরী করেননি। এ সব ওযীফার অধিকাংশই জাল ও দাইফ হাদীসের উপর নির্ভর করে তৈরি করা। কিছু আয়াত বা সূরার ফযীলত সহীহভাবে প্রমাণিত হলেও বিশেষভাবে সকালে সন্ধ্যায় এ ধরণের কিছু সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে পাঠ করা এবং পরিপূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতকে অবহেলা করা খুবই অন্যায়।

✡.অর্থ বুঝার চেষ্টা না করে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা:

কুরআনের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ভুলে থাকার কারণে এখন কুরআন জাগতিক জীবনের উপকারার্থে পড়া হয় না। অধিকাংশ মুসলিমই নিছক সাওয়াব লাভ লাভের আশায় মর্মাথ অনুধাবন না করে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকেন। কেউ কেউ এক রাতে অথবা একদিন-একরাতে কুরআন খতম করে করে থাকেন– এটি কুরআনের সাথে অসৌজনতা। এতে কুরআনের মর্মাথ অনুধাবন করা যায় না। তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা সুন্নাতের খেলাফ। আবার এতে গোনাহও হয়ে থাকে। কেননা কুরআন তিলাওয়াত ও শোনা ইবাদত। আবার কেউ মাইক ইত্যাদি ব্যবহার করে রাতারাতি খতম করে থাকে,–এটা ঠিক নয়, কেননা কুরআন তিলাওয়াত, যিক্র, ইত্যাদি নফল ইবাদতের দ্বারা কাউকে বিরক্ত করা, কারো ঘুম, অন্যান্য কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা না-জায়েয। এতে মানুষের অধিকার নষ্ট হয়। তাই মাইকে তিলাওয়াত করানো ঠিক নয়।

সাহাবা (রা.) একসাথে কুরআনের বেশি অংশ অধ্যয়ন করেন নি। কেননা অধিক পরিমাণ বিধি-নিষেধের বোঝা বহন করা যে কঠিন তা তাঁরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতেন। খুব বেশী হলে তাদের এক এক জন একসাথে দশটি আয়াত পড়তেন, মুখস্ত করতেন এবং আয়াতের মর্মানুসারে চলতেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা.) বর্ণিত একটি হাদীস থেকেই আমরা এসব বিষয় জানতে পারি।

কেউ কেউ কুরআনের বিষয়বস্তুর সহজ অর্থ উপেক্ষা করে প্রত্যেক শব্দের মধ্যে রহস্য খোঁজাকেই গভীরতম জ্ঞানের কাজ বলে বিবেচনা করে থাকে। কুরআন অধ্যয়নের এই ভুল রীতিই কুরআনের বাস্তব মূল্যবোধ সমন্ধে অজ্ঞতার বড় কারণ।

✡.কুরআন সম্পর্কে নানা অপপ্রচার ও চক্রান্ত:

কুরআন বা এর শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে কুরআন সম্পর্কে নানা অপপ্রচার আজ সমাজে চালু হয়েছে। মূলত এগুলো ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। নিম্নে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হলো–

•বিশেষ গোষ্ঠীর ভুল অপপ্রচার– *'সাধারণ মানুষ কুরআনের অর্থ ও তাফসীর বুঝাতে গেলে গোমারাহ হবে':*

কুরআনের বাণী সহজে উপলব্ধি করার জন্য তাতে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও বিধি-বিধান বর্ণনার সঙ্গে রারংবার যুক্ত হয়েছে উপমা, রূপক ও উপদেশমূলক ঘটনা। আর দেখানো হয়েছে এদের সঙ্গে ইতিহাস ও প্রকৃতির সম্পর্ক। সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরআনের বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সম্ভব নয়–এ রকম ধারণা একটি মারাত্মক ভুল। কেননা কুরআন ব্যাপকভাবে চর্চার জন্য সকলের বোধগম্য ও সহজসাধ্য করে নাযিল করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে[১]– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ "আর নিশ্চয় আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?"

উল্লেখিত উৎসাহ জ্ঞাপক আয়াতটি সূরা আল-কামারে ০৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কুরআনকে সর্বসাধারণের জন্য সহজ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কাজেই যারা বলে যে, "সাধারণ মানুষের কুরআনের অর্থ ও তাফসীর বুঝার দরকার নেই, কারণ সাধারণ মানুষ কুরআন বুঝতে গেলে গোমারাহ হবে"। –এ কথা ডাহা মিথ্যা ও ভুল অপপ্রচার। কুরআনের সম্পর্কে এই ধারণা এক শ্রেণীর মূর্খ বা ইসলামের দুশমন ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে।

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা কামার ৫৪ : ১৭,২২,৩২, ৪০।

কুরআন সম্পর্কে অপপ্রচারে অমুসলিমরা বেশ তৎপর। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যবিদদের এ ধরনের অপপ্রচার ও অপচেষ্টা সম্পর্কে ড. আব্দুল্লাহ দারাজ বলেন[১] –As for faulty content, that is due either to an incorrect trenslation, or to a bad precis, or both of thesefactors togather.

✡.কুরআনের ধারক-বাহক সত্যপন্থী আলিমের অভাব এবং তথাকথিত আলিম সমাজের সত্য প্রকাশে দায়িত্বহীনতা:
কুরআনের শিক্ষার প্রচার-প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতার একটি অন্যতম কারণ হলো, কুরআনের ধারক-বাহক সত্যপন্থী যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী ও উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন আলিমের বড়ই অভাব। কিছু আলিম জ্ঞানের অধিকারী হলেও নৈতিক দিক থেকে দুর্বল, আর কিছু আলিম নৈতিক দিক থেকে অনেকটা অগ্রসর হলেও জ্ঞান ও যোগ্যতায় দুর্বল। আর এই উভয় শ্রেণীর আলিম সত্যের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ ব্যাপারে তাদের অধিকাংশই উদাসীন ও ভীরু। আবার স্বার্থান্বেষী তথাকথিত কিছু আলিম রয়েছে যাদের নৈতিক মান অতি নিম্ন, তারা সত্যের পথে মানুষকে আহবান করা অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। তারা সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর ও যালিম শাসকদের চাটুকর হিসেবে কাজ করে। ফলে সাধারণ মানুষ কুরআন থেকে প্রকৃত সত্য পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই বঞ্চিত।

✡.কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নে শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা:
কুরআনের শিক্ষার প্রচার-প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান বাধা হলো: শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা। যুগে যুগে আসমানী গ্রন্থ বা কুরআনের শিক্ষা ও বিধি-বিধান বাস্তবায়নে শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা অতীত থেকে চলে আসছে। তারা মহান আল্লাহ বিধি-বিধান মিটিয়ে ফেলার জন্য কুরআনের ধারক-বাহকদের ব্যাপকভাবে নির্যাতিত করেছে। ফলে আল্লাহর সত্য দ্বীন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হুদ আ. ও তার জাতি, সালেহ আ. ও তার জাতি, মূসা(আ.) ও ফিরআউন, ইবরাহীম(আ.) ও নমরুদের ঘটনা এবং মুহাম্মাদ (সা.) ও মক্কার কাফিররা ছাড়াও বিভিন্ন যুগের হক ও বাতিলপন্থিদের দ্বন্দ্বের ঘটনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

✡ প্রবৃত্তিপূজারী ও ইসলামবিরোধী মহলের পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতির অন্ধ-অনুসরণ:
কাফির, মুশরিক ছাড়াও সমাজে একশ্রেণীর প্রবৃত্তিপূজারী ও মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা মানুষকে কুরআন বুঝতে এবং কুরআনের উপদেশ ও হুকুম-আহকামের দ্বারা উপকৃত হতে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়। তারা স্বীয় স্বার্থের পরিপন্থী বিষয়ে কুরআনের বিধি-বিধান মানতে নারাজ। কুরআন-সুন্নাহ পরিবর্তে তারা সমাজ ও পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতির অন্ধ-অনুসরণ করতে কোন দ্বিধা করে না। এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে[২]- وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ- আর যখন তাদের বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর’ তখন তারা বলে, ‘বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি।’ শয়তান তাদেরকে প্রজ্বলিত আযাবের দিকে আহবান করলেও কি (তারা পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণ করবে)?

✡.কুরআনের তাফসীর অধ্যয়ন সংক্রান্ত জটিলতা:
প্রথম যুগের মুসলিমগণ শুধু আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের থেকেই দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেন (তখন জাল বা দায়িফ হাদীস বলতেও কিছু ছিল না)। কিন্তু তাদের পরবর্তী বংশধরগণ গ্রীক দর্শন ও তর্কশাস্ত্র, প্রাচীন পারসী উপকথা ও ভাবধারা, ইয়াহুদীদের পুথি-পুস্তক ও রীতিনীতি খ্রিস্টানদের পুরোহিত তন্ত্র এবং এগুলোর সাথে সাথে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অংশ থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন। কুরআনের তাফসীরগণ এ বিষয়গুলোকে তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ভিতর শামিল করে নেন এবং এরই ফলে কুরআনের দেয়া মুলসূত্রের সাথে এগুলো জড়িয়ে যায়। তাই দেখা যায় কুরআনের বেশীরভাগ তাফসীর রচিত হয়েছে সমকালীন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও রীতি-বৈশিষ্ট্যে। কুরআনের তাফসীরের মধ্যে বিভিন্ন দর্শন, বাতিল ফের্কার চিন্তাধারা, তর্কশাস্ত্র, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বিভিন্ন কাহিনী-রীতিনীতি, জাল ও দুর্বল হাদীস এবং বিভিন্ন মাজহাবী মতাদর্শের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু, উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিধান চালু ছিল। সে সময়কার জনগণের মধ্যে কুরআনের মৌলিক শিক্ষার ব্যাপকভাবে চালু ছিল। ফলে তখনকার একশ্রেণীর পণ্ডিত, সাহিত্যিক, ব্যকরণবিদ ও শৈল্পিক সৌন্দর্য ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী হন। এভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাফসীর প্রনয়ন করেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের হিদায়েতের জন্য কুরআনের যথার্থ ও মৌলিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহজে অনুধাবন করা অনেকাংশে দুরূহ হয়ে পড়ে। এছাড়া বেশীরভাগ তাফসীর গ্রন্থ দীর্ঘ হওয়ায় বেশীরভাগ সাধারণ মানুষ তা পড়ে থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অলস ও উদাসীন। তাই দেখা যায় যে, বিশেষ মতবাদের বাহক কিংবা পূর্ববর্তী নির্বিচার রিওয়ায়েতের সমষ্টি এই তাফসীরগুলো থেকে জ্ঞানার্জন করতে শুরু করলে শিক্ষার্থীরা এসবের গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়, তার চেষ্টা-অনুসন্ধানের বাঁধাগ্রস্ত হয় এবং সৃজনশীলতা ও মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে। তার অনুসন্ধিৎসা ক্রমে অন্যের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ফলে কুরআন ব্যাখ্যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়ে যায়।

---

[1] Dr. M. A.Draz, *The Moral World of the Qur'an, ibid,* p.2.

[২]. আল-কুরআন, সূরা লুকমান ৩১ : ২১।

এছাড়াও আর কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো মানুষকে কুরআনের মূল্যবান শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

❑.আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের কর্মপন্থা:

আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অতীতে ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ ব্যাপারে হতাশ হলে চলবে না। এই প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে উত্তম কৌশল অবলম্বন করে কাজ করে যেতে হবে। এ সম্পর্কে করণীয় হলো–

১.আল-কুরআনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং কুরআনের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান:

আল-কুরআন সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বোত্তম ও সর্বাধুনিক জীবন ব্যবস্থা। এটা ইহলোক ও পরলোকের মুক্তির নির্ভুল ও চূড়ান্ত পথনির্দেশকা। এর শিক্ষা নির্ভুল, পরিপূর্ণ, সর্বজনীন ও চিরকল্যাণকর। বিভিন্ন অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়ে এর মহান শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে রাখা হয়েছে। এর মোকবিলায় দাঁড় করানো হয়েছে বিভিন্ন মতাদর্শ। এসব ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এর প্রতি সর্বশ্রেণীর মানুষের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য যোগ্য লোক দিয়ে বিজ্ঞচিতভাবে কাজ করতে হবে। সব মতবাদের অসারতা প্রমাণ করে বর্তমান অশান্তিময় পৃথিবীর মানুষের কাছে কুরআনের শাশ্বত শিক্ষার আবেদন তুলে ধরে সত্যিকার শান্তি ও মুক্তির পথনির্দেশ করতে হবে। এভাবে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।

মনে রাখা জরুরী যে, আল-কুরআন তাঁর শিক্ষা কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে বিশ্বাসী নয়। কুরআন তাদের পথ দেখায় না যারা এর শিক্ষা আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে না। বরং কুরআন থেকে তারাই উপকৃত হয় যারা এর প্রতি আগ্রহী এবং যারা মুত্তাকী। কুরআন বলেছে[১], هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ -(এটা) মুত্তাকীদের জন্য সঠিক-সুদৃঢ় পথনির্দেশকারী।

২.সঠিক পদ্ধতিতে আল-কুরআন অধ্যয়ন ও মর্মার্থ অনুধাবন:

প্রথমত শুধু আল-কুরআনকে একমাত্র লক্ষ্যবিন্দু স্থির করা। প্রত্যেকটি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জেনে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য স্থির করা। এক্ষেত্রে আগ্র-পশ্চাৎ সম্পর্ক ও বিষয়ের পটভূমি সামঞ্জস্য নির্ণয় করা। –এ কাজ করার পর শিক্ষার্থী মনে প্রশ্ন বা খটকা সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহের বিশুদ্ধ রিওয়ায়েত দেখে নেবে। আর যদি যাবতীয় চেষ্টার পর যদি শিক্ষার্থী এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যা পূর্ববর্তী তাফসীরকার ও বিশুদ্ধ রিওয়ায়েত বিপরীত যায় তবে পুনরায় সতর্ক ও সুক্ষ্মভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। এতেও যদি নিজের বিশ্লেষণটি সঠিক মনে হলে ধীর-স্থির চিত্তে ধৈর্য সহকারে হাদীসের উপর নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করতে হবে। এতে স্বীর ব্যাখ্যার দুর্বলতা এবং হাদীসের যথার্থতা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া উচিত।[২]

৩.যালিম শাসকের বিরোধিতা ও স্বার্থন্বেষী আলিমদের উদাসীনতার মোকাবিলায় পূর্ববর্তী সত্যপন্থীদের কর্মনীতি অবলম্বন:

আল-কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো যালিম শাসকের বিরোধিতা ও স্বার্থন্বেষী আলিমদের উদাসীনতা। এক্ষেত্রে যালিম শাসককে এবং স্বার্থন্বেষী আলিমদের তাদের পরিণতি সতর্ক করতে হবে। এ ব্যাপারে নাবী-রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবউ তাবেয়ী এবং পরবতী বিভিন্ন যুগের সত্যপন্থী জ্ঞানী ব্যক্তিদের কর্মনীতি অবলম্বন করাই উৎকৃষ্ট কর্মপন্থা। এছাড়া নব উদ্ভাবিত সমস্যা মোকাবিলায় সমকালীন বিচক্ষণ জ্ঞানীদের পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধান করা।

৪. আল-কুরআন সম্পর্কে অপপ্রচারকারীদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় তাদের মোকাবিলা:

আল-কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচারকারীদের বক্তব্যের যাচাই করে স্বার্থান্বেষী মহলের মুখোশ উন্মোচন করা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা,যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্র দ্বারা বিরোধীদের মোকাবিলা করা। বিরোধীদের অপপ্রচারের জবাবে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা, প্রচার মাধ্যমে বিভ্রান্তদের মত খণ্ডন ও স্বরূপ উদঘাটন এবং অপ্রচারকারীদের অপতৎপরতা সম্পর্কে সচেতন থাকা ও সতর্ক করা।

বর্তমান মুসলিম জাতির নৈতিক অধঃপতনের কারণ নির্ণয় এবং তার প্রতিকারের পথনির্দেশ করে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব(মৃ.১৯৬৬) মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন-[৩],

রাসূল(সা.)এর রেখে যাওয়া কুরআন আজও আমাদের নিকট অবিকৃত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে। রাসূল(সা.)এর হাদীস, বাস্তব কর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর নির্দেশাবলী এবং তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সব কিছুই আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে, যেভাবে তা ছিল প্রথম যুগের মুসলিম উম্মাতের সামনে ছিল। কিন্তু সেই প্রথম যুগের মুসলিমের(সাহাবীদের) মত সর্বগুণে গুণান্বিত মুসলিম আর দেখা যাচ্ছে না। ....এর প্রধান কারণ খুঁজলে দেখা যাবে প্রথম যুগের মুসলিমগণ যে স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা থেকে

---

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ ০২ : আয়াত ০২।

[২].দেখুন, আমীন আহসান ইসলাহী, *কুরআন গবেষণার মূলনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৭-৪৮।

[৩]. দেখুন, সাইয়েদ কুতুব, *মা'আলিম ফীত তারীক্ব*,, (কায়রো : দারুশ শুরূক, ১৯৭৯), পৃ. ১১-১৯।

তাদের পিপাসা মিটিয়ে ছিলেন, সে পানির সাথে অন্য কিছু মিশে গেছে। এবং সে যুগে তারা যে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, হয়তো বা সেই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতেও ভেজাল মিশ্রিত হয়ে গেছে।

যে প্রসবণ থেকে তারা [সাহাবাগণ] পরিতৃপ্তি সহকারে অমৃত সুধা পান করেছিলেন তা হচ্ছে আল-কুরআন। আবার বলছি, তা শুধুমাত্র কুরআন। কারণ, হাদীস ও রাসূল(সা.)এর দেয়া নির্দেশাবলী ঐ প্রসবণেরই স্রোতধারামাত্র। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা(রা.) কে রাসূল(সা.)এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন,'পবিত্র কুরআনই তাঁর চরিত্র।'[মুসলিম, হা. নং ৭৪৬, আবূ দাউদ, হা. নং ১৩৪৪]

আল-কুরআন থেকেই তারা [সাহাবা] তাঁদের পিপাসা মিটিয়েছিলেন এবং একমাত্র কুরআনের ছাঁচেই তাঁরা তাদের জীবন গড়ে তুলেছিলেন। ...তারা কুরআনের প্রশান্তি নির্ঝর থেকে আকণ্ঠ পান করেন এবং অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে স্থান লাভ করলেন। পরবর্তীকালে অপরাপর উৎস থেকে কিছু ভেজাল পদার্থ এসে কুরআনের পবিত্র স্রোতধারায় মিশ্রিত হয়। ... পরবর্তী বংশধরগণ এ ভেজাল মিশ্রিত উৎস থেকেই জ্ঞান আহরণ করেন। ফলে তারা কখনো প্রথম দিকের মুসলিমদের মত গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারে নি। প্রথম যুগের মুসলিমদের সাথে পরবর্তীকালের মুসলিমদের যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় তার কারণ হচ্ছে এই যে, খাঁটি ইসলামী আদর্শের সাথে অন্যান্য আদর্শের সংমিশ্রণের ফলে যে মতবাদ রচিত হয়,তা ইসলামী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

এরপর দ্বিতীয় কারণ, প্রথম যুগের মুসলিমদের শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিটিও ছিল চমৎকার। তাঁরা সংস্কৃতি, তথ্য বা জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেন নি। সে যুগের কোন লোকই তাঁর বিদ্যার ভাণ্ডার ফাঁপিয়ে তোলা, কোন বৈজ্ঞানিক বা আইন বিষয়ক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা অথবা বুদ্ধিবৃত্তির কোন অভাব পূরণের জন্যে কুরআন অধ্যয়ন করেন নি। বরং তাঁরা নিজেদের ও সমগ্র জাতির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা কি কি বিধি-নিষেধ নাযিল করেছেন তাই অবগত হবার জন্য কুরআনের দিকে মনোযোগী হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামে লিপ্ত সৈনিক যেভাবে প্রতিদিনের সামরিক নির্দেশনাবলী পালনে তৎপর থাকে, ঠিক সেভাবেই সে যুগের মু'মিনগণ কুরআনের নির্দেশ পালন করেছিলেন। ...'বিধি-নিষেধ মেনে চলাই বিধানসমূহ নাযিল করার উদ্দেশ্য।'-এ উপলব্ধিই সে যুগের লোকদের জন্য আত্মিক উন্নয়ন ও জ্ঞান সম্প্রসারণের দ্বার খুলে দিয়েছিল। তাঁরা যদি নিছক আলোচনা, বিদ্যার্জন ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করতেন, তাহলে তাদের জন্যে এ দ্বার কখনো উন্মুক্ত হত না। তাছাড়া এ উপলব্ধির কারণেই তাদের জন্যে কুরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ এবং দায়িত্বের বোঝা হালকা হয়ে যায়। তাদের উঠা-বসা ও চাল-চলনের ভিতরে কুরআনকে এমনভাবে প্রবেশ করেন যে,তাদের প্রত্যেকেই ঈমানের জ্বলন্ত চিত্র হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠেন। এই ঈমান কোন বই বা মগজে লুকায়িত ছিল না,বরং মানব জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসরমান একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তা মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল। বস্তুত যারা কুরআনের বিধি-নিষেধ জেনে সে অনুসারে জীবন-যাপনের ইচ্ছা রাখে না, তাদের জন্যে কুরআন কখনো তার ভাণ্ডার খুলে দেয় না। ...তারা যতটুকুই কুরআন অধ্যয়ন করত নিজ জীবনে তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতো। এভাবে তারা কুরআনের সকল নির্দেশনাবলী জীবনে বাস্তবায়ন করেছিল। পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ কুরআনী জীবন বিধানকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও উপভোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। এভাবে ক্রমে পরবর্তীরা কুরআন থেকে দূরে সরে যায়।

তৃতীয় কারণ, রাসূল(সা.)এর যুগে যে ব্যক্তি ঈমান আনতেন তিনি জাহিলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন। ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের পর তিনি এক নতুন জীবন শুরু করতেন। আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত আগেকার জীবনযাত্রা থেকে মুসলিমগণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে নতুন সমাজে যোগদান করতেন অজ্ঞতার যুগে তিনি যে ভ্রান্ত উপায়ে জীবনযাপন করেছেন সে জন্যে অনুতপ্ত হয়ে সর্বদা ভয়ে ভয়ে জীবনযাপন করতেন। ইসলামে প্রবেশের পর পুরাতন পদ্ধতির সাথে কোন সম্পর্ক রক্ষা করাই যে অনুচিত তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন। যদি কোন সময় মানবীয় দুর্বলতার জন্যে পুরাতন জীবনযাত্রা প্রণালী তার উপর প্রভাবশালী হত বা পুরাতন অভ্যাস তাকে আকর্ষণ করার দরুণ তিনি ইসলামের নির্দেশ পালনে কোন ক্রুটি-বিচ্যুতির করে ফেলতেন; তাহলে তাওবা ও অনুশোচনার মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করে কুরআনের দিকে ধাবিত হতেন। এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিমদের জীবন আগেকার জাহিলিয়াতের জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বয়ে চলত। যেহেতু ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি পূর্বেই ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করেই পদক্ষেপ নিতেন, সে জন্যেই তিনি ইসলামের বিধি-নিষেধগুলো পুরোপুরি মেনে নিয়ে জাহিলিয়াতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেন।

...বর্তমানে আমরা প্রাচীন জাহিলিয়াতের চেয়েও অধিক মারাত্মক জাহিলিয়াতের বেষ্টনীতে আবদ্ধ। আমাদের সমগ্র পরিবেশ, জনগণের বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র ও রীতিনীতি সবই জাহিলিয়াত।...এমতাবস্থায় বর্তমান পরিবেশ থেকে আমাদের সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে নিতে হবে। এবং নির্ভেজাল সেই উৎস তথা কুরআন থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমগ্র জীবনের দিক-নির্দেশনা গ্রহণ হবে, যেখান সাহাবীগণ রা. পাথেয় গ্রহণ করেছিলেন। আর এই উৎসকে সর্বপ্রকার ভেজাল ও সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। নিছক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও উপভোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত না করে কুরআন যে

জীবনপদ্ধতি দিয়েছে ঠিক সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের জাহিলিয়াতের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আচার-ব্যবহার এবং জাহিলী মতাদর্শ ও নেতৃত্বের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে। তাই প্রথমে নিজেদের জীবন পরিবর্তন করে সেই সাথে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর এই পথ অনেক কষ্টের এজন্যে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই পথে রাসূল সা. ও সাহাবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। পূর্বসূরীদের সফলতা ভালোভাবে জেনে ভবিষ্যত চলার পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

কাজেই বর্তমানের অধঃপতিত মুসলিমদেরকে প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের মত উন্নত নৈতিকতা ও গৌরব অর্জন করতে হলে গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করে সেই দাবী অনুযায়ী ঈমান নবায়নসহ সার্বিক জীবন পুনর্গঠন করতে হবে। আর মহানাবী(সা.) এবং আবূ বকর(রা.) ও উমার(রা.) এর শাসনামলে মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে যে দক্ষতা এবং গতিশীলতা বিরাজমান ছিল তা পুনরুদ্ধার করতে হলে মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে স্থান-কালের উপাদান হতে মুক্ত করে সব কর্মধারা ও চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে হবে। এসব মূল্যবোধ মূলত সংশোধন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে উন্নীত করে।

৫.আল-কুরআনের শিক্ষা ও কতিপয় বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন আপত্তি ও সংশয়ের জবাব:

অমুসলিম ছাড়াও তথাকথিত কিছু মুসলিম কুরআন ও তাঁর কিছু বিধি–বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তি ও সংশয় ব্যক্ত করে থাকে। কিন্তু বাস্তবে তাদের আপত্তি ও সংশয় কতটুকু সঠিক ও যুক্তিসংগত নিম্নে তা আলোচনা করা হল:

ক.বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে জীবন সমস্যার সমাধানে চৌদ্দশত বছর পূর্বে নাযিলকৃত আল-কুরআন কি সেকেলে নয়? বর্তমান সময়ে আল-কুরআন কতটুকু উপযোগী ভূমিকা রাখতে সক্ষম? বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআন বিধি-বিধান প্রয়োগ করলে মানুষ কি পশ্চাৎপদ হবে না?

জবাব: সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর বস্তু কখনও তার মূল্য হারায় না কিংবা সেকেলে হয় না। বরং সত্য, সুন্দরের আবেদন সর্বজনীন ও সর্বকালব্যাপী হয়ে থাকে। হাজার বছর পূর্বে সত্য ও সুন্দরের যেমন আবেদন ছিল, হাজার বছর পরে আজও তেমনি তার মূল্য ও আবেদন আছে এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। আল-কুরআন সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক। কুরআন নাযিল হয়েছে অন্যায়, অসত্য, অনাচার উৎখাত করে ন্যায়, সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য। মানবতার উৎকর্ষতার পথে অন্তরায় হতে পারে এবং সততা ও কল্যাণের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে এরূপ সবকিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য। তাই আল-কুরআনের শিক্ষা সর্বকালের, সর্বযুগের ও সকল সমাজের মানুষের উপযোগী থাকবে। শামছুল হক আফগানী (১৯০০-১৯৮৩)বলেন–

> দুনিয়ার যে কোন আইন বা বিধান তা কোন ব্যক্তির রচিতই হউক, কোন জামাত বা পার্লামেন্টে রচিতই হউক; দেশ, কাল ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে তা চলতে পারে না। যুগ, জনগোষ্ঠী বা আঞ্চলিক ব্যবধানের দরূন তার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা এই আইনের মূল উৎস মানুষের জ্ঞান। আর মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। স্থান ও কাল নির্বিশেষে তার দৃষ্টি সমভাবে প্রসারিত নয়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, দুনিয়ার প্রতিটি পার্লামেন্ট প্রতি বছর আইন-কানুনের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের এবং বদ-বদলের ধারা লেগেই রয়েছে। আর কুরআনের আইন-কানুন যিনি প্রচার করলেন সেই পয়গাম্বর ছিলেন একজন উম্মী। তিনি কোন স্কুল-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না। তদানীন্তন গোট আরব দেশেই কোন স্কুল, কলেজ বা লাইব্রেরীর অস্তিত্ব ছিল না। মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ বা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করার মত আইন প্রয়োগকারী কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তখন কেউ কল্পনা করতো না। কিন্তু দেখা গেছে যে, মুসলিম জাতির বিজয় অভিযানের পর মরক্কো থেকে শুরু করে চীন পর্যন্ত বিশাল ভূভাগে শত শত বর্ষব্যাপী এর আইন অনুসৃত হয়ে আসছে। কোন সময়েই এতে কোন প্রকার রদবদলের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।[১]

তাছাড়া আল-কুরআনে মানুষের যে স্বভাব ধর্মের কথা বলা হয়েছে এবং তা নিয়ন্ত্রণের যে মূলনীতি দেওয়া হয়েছে তা সর্বকালের উপযোগী। কাজেই এ ধরনের বক্তব্য ও মূলনীতি সংস্বলিত গ্রন্থের পুরাতন হওয়ার কোন প্রশ্নেই উঠে না। আল-কুরআনের মূলনীতির সর্বজনীন উপযোগিতার পক্ষে জর্জ বার্নাডশ বলেন–It is only religion which appears to me to prossess that assimilating capability to the Changing phase of existence can make itself appeal to every age.[২] অর্থাৎ- আমার মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম, জীবনের বিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য বিধানের সেই ক্ষমতা আছে যা প্রত্যেক যুগের উপযোগী।

খ.আল-কুরআনে এমন কিছু বিধি-বিধান বিদ্যমান যেমন–ব্যভিচারের জন্য একশত বেত্রাঘাত বা প্রস্তরাঘতে হত্যার শাস্তি, চুরির জন্য হাত কর্তনের শাস্তি, যা অমানবিক ও বর্বরীয়, বর্তমান সভ্য সমাজে তা কতটুকু উপযোগী?

জবাব: ইসলাম উন্নত নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। ইসলাম সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস, অনৈতিকতা, অন্যায়, দুর্নীতি ইত্যাদি স্থায়ীভাবে নির্মূল করে একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণ এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষায় ইসলাম দুস্কৃতিকারী ও অপরাধীদের রিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির

---

[১] *কোরআন পরিচিতি*, সম্পাদনা-মুহিউদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৪-০৫।

[২]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

বিধান নিশ্চিত করেছে। কারণ কোন সমাজ থেকে অন্যায়, অনাচার ও অপরাধ মুক্ত করতে হলে সর্বসাধারণের উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার পাশাপাশি দুস্কৃতিকারী ও অপরাধীদের দমনে কঠোর শাস্তি বিধান প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। যদি তা না করা হয় তবে সে সমাজ থেকে অপরাধ বন্ধ হবে না বরং এক পর্যায়ে সমাজ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। তাছাড়া কুরআন যে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে তার অন্যতম উদ্দেশ্য সমাজ থেকে অপরাধ চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে নির্মূল করা। সমাজের সর্বসাধারণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। অপরাধের প্রতি অপরাধীর অনাগ্রহ ও ভীতি সৃষ্টি করা। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অমানবিক মনে হলেও সমাজ থেকে অপরাধ চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে এরচেয়ে উত্তম ও বিকল্প আর কিছু হতে পারে না।

গ. কেউ কেউ অভিযোগ করে যে, আল-কুরআনে অমুসলিমদের ব্যাপারে এমন কিছু কথা আছে যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিবাদকে উস্কে দেয়। এ মর্মে তারা কুরআন থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে থাকে। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]–

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদের বন্দী কর, তাদের অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে উৎ পেতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

জবাবঃ মনে রাখতে হবে যে, এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতিকালীন নির্দেশ, যা কেবল ঐ পরিস্থিতিকালীন সময়ে প্রযোজ্য। উল্লেখিত আয়াতে মুসলমানদেরকে ঐসব লোকদের হত্যা করতে বলা হয়েছে যারা তাদের হত্যা করতে আসে এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এখানে কোন নির্দোষ লোককে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কাজেই কুরআনের কোন আয়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পূর্বে তার ব্যাখ্যা ও নাযিলের পটভূমি ভালোভাবে জানা উচিত।

ঘ. আল-কুরআন নারীদের ব্যাপারে ইনসাফ না করে বৈষম্য নীতি গ্রহণ করেছে। যেমন উত্তারাধিকার সম্পদে পুরুষদের দ্বিগুণ অংশ দিয়েছে আর নারীদের দিয়েছে একগুণ। এ মর্মে কুরআনে এসেছে[২] – يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ। "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান।"

জবাবঃউত্তারাধিকার সম্পদে পুরুষদের দ্বিগুণ আর নারীদের একগুণ অংশ দিয়ে ইসলাম কোনরূপ বৈষম্য করেনি। কারণ ইসলামে বিবাহ পূর্বে একজন নারীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার পিতার উপর এবং বিবাহ পরবর্তী একজন নারীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার স্বামীর উপর বর্তায়। সংগত কারণে ইসলামে একজন নারীর আর্থিক দায়-দায়িত্ব কম। পক্ষান্তরে একজন পুরুষ উপর স্ত্রী-সন্তানের সার্বিক দায়-দায়িত্ব ছাড়াও পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনের জন্যও ব্যয় করতে হয়। তাই পুরুষের দায়-দায়িত্ব বেশী থাকার কারণে পুরুষকে দ্বিগুণ ও নারীকে একগুণ অংশ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, যার যা প্রয়োজন ও প্রাপ্য তাকে তা প্রদানের নামই ইনসাফ। তাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যদি নারীকে পুরুষের সমান অংশ দেয়া হয় তাহলে পুরুষের প্রতি অবিচার করা হবে।

ঙ.অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মত আল-কুরআন একবারে নাযিল হল না কেন? আল-কুরআনে সাধারণত কোন একটি বিষয় একস্থানে পাওয়া যায় না। নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এর বিষয়সমূহ। একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে আবার বিভিন্ন বিষয় একই আয়াতে সন্নিবেশিত।

জবাবঃ কুরআন এসেছে একটি সভ্য জাতি, আদর্শ সমাজ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে। এই গঠন প্রক্রিয়া রাতারাতি সম্ভব নয়, বরং এর জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। তাই কুরআনকে একবারে নাযিল না করে দীর্ঘ ২৩ বছরে ক্রমে ক্রমে নাযিল করা হয়েছে। রাসূল সা. নিরক্ষর ছিলেন কুরআন একবারে নাযিল হলে তা মুখস্ত বা সংরক্ষণ তাঁর পক্ষে কঠিত হতো। অধিকন্তু, ক্রমে ক্রমে নাযিল আরও যে সব কারণ থাকতে পারে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কুরআনের শিক্ষা মানব হৃদয়-মনে স্থায়ীভাবে গ্রেথিত করা, পূর্ণভাবে অনুধাবন, এর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি, এর মূল্যবোধসমূহ আয়ত্ব করা এবং যাতে ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে এর বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। এবং ক্রমে ক্রমে সেই শিক্ষা অনুযায়ী নৈতিক মানের উন্নয়ন ঘটানো এবং কুরআন মুখস্তকরণ ও সংরক্ষণ সহজভাবে সম্পন্ন করা। আল-কুরআন একবারে নাযিল হল না কেন?– এই প্রশ্ন কুরআন নাযিলের সময়েই কাফিররা তুলেছিল। তাদের প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ বলেন[৩]–وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا "কাফিররা বলে, সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।" অন্যত্র বলেন[৪]-وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে তুমি তা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি।"

---

[১]. আল-কুরআন সূরা আত-তাওবা ০৯: আয়াত ০৫।
[২]. আল-কুরআন সূরা আন-নিসা ০৪: আয়াত ১১।
[৩]. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান ২৫: আয়াত ৩২।
[৪]. আল-কুরআন, সূরা আল-ইসরা/বানী ইসরাঈল ১৭: আয়াত ১০৬।

চ. অনেকে অভিযোগ করে থাকেন–আল-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা অবিন্যস্ত, বিশৃংখল এর বিষয়বস্তুগত গ্রন্থনা বিক্ষিপ্ত ও সম্পূর্ণ এলোমেলো।

জবাব: অনেকে প্রচলিত গ্রন্থের মত আল-কুরআনকে বিষয়ভিত্তিক সাজানো না দেখে এ অভিযোগও করে থাকেন যে, এটা অবিন্যস্ত এবং এর বিষয়বস্তুগত গ্রন্থনা বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো। এর জবাবে আহমাদ দীদাত (মৃ.১৯১৮-২০০৫) বলেছেন–

> বিশ্বের পুরাতন ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেগুলো আজও বিদ্যমান তার মধ্যে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত। এর লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ প্রকৃতই অলৌকিক। সাধারণভাবে মানুষ যা কিছু বর্ণনা করে তা থেকে এর বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। স্বল্পদৃষ্টি সম্পন্ন ও বৈরীভাবাপন্ন অনেকেই এই মহাগ্রন্থকে সামঞ্জস্যহীন বা অসম্বন্ধ বলে থাকেন। এই মহাগ্রন্থের সজ্জিতকরণ রীতি অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এর কোন তুলনা নেই। এটিই এর বিশেষত্ব।[১]

আল-কুরআন এবং এর বিধি-বিধান সম্পর্কে এগুলোই মৌলিক আপত্তি। এছাড়া ইসলাম বিরোধী মহল তাদের অজ্ঞতার কারণে আরও যে সব ঠুনকো আপত্তি পেশ করে থাকে তা ভিত্তিহীন।

ছ. আল-কুরআনের অবলম্বনের বদৌলতে প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ (সাহাবা রা. তাবেয়ী ও তাবে' তাবয়ীগণ) উন্নত নৈতিকতা ও উচু মর্যাদা লাভ করলেও বর্তমান মুসলিমদের নিকট ঐ একই কুরআন থাকা সত্ত্বেও তারা (গেছে)তা লাভে সামর্থ্য হচ্ছে না, বরং তারা –এটা কি প্রমাণ করে না যে, কুরআন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে?

জবাব:বর্তমান মুসলিমদের অধিকাংশই কুরআনের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিলেও তাদের বাস্তব কর্ম ও আচরণ কুরআনের শিক্ষার বিপরীত। মানব সমাজে তারা মুসলিম গণ্য হলেও কুরআনের মানদণ্ডে আদৌ তারা কতটুকু মুসলিম তা দেখার বিষয়? কুরআনের শিক্ষার সাথে বর্তমান মুসলিমদের কর্ম ও আচরণ মিলিয়ে দেখলেই যে কেউ তা বুঝতে পারবে।[২] কুরআনের দৃষ্টিতে তাদের কর্ম ও আচরণ বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাস্তবে তাদের অধিকাংশই প্রবৃত্তি পূজারী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের পর্যায়ভুক্ত। তাই তাদের কর্ম ও আচরণ এরূপ মন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ব্যক্তি জীবনে ইসলামের কিছু অনুশাসন মান্য করেন, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআন উপেক্ষা করে এবং ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার না করে নিজ ইচ্ছামত জীবন যাপন করেন। অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্ম ও আচরণে যে নৈতিকতা ও ইসলাম জড়িত তা তাদের অনেকেই অনুধাবন করেন না। তাদের এ সংকীর্ণ ধর্মীয় ধারণা জীবনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার গণ্ডিকে সীমিত করেছে। ফলে তাদের জীবনের বড় অংশ ইসলামী নৈতিকতা থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে যারা ব্যক্তি জীবনে সৎ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নিষ্ঠার সাথে ইসলাম পালন করছে, কিন্তু তারা দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কার্যক্রম থেকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্কহীন হয়ে কতিপয় বিশেষ কাজে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে। এ সব ভালো মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিসর থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে খারাপ লোকেরা বিনা বাঁধায় নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে বর্তমান মুসলিমদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ইসলামের আংশিক অনুসরণ করছে আর অধিকাংশই কুরআনের শিক্ষার গণ্ডি থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এমতাবস্থায় এসব নামসর্বস্ব কুরআনবিমুখ মুসলিমদের কর্ম দ্বারা কুরআনের শিক্ষার উপযোগিতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না।

❑.বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআনের শিক্ষার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গবেষকের মতামত ও সুপারিশ:

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআনের আলোকে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধন এবং অবক্ষয় প্রতিকারে নিম্নোক্ত উপায় ও কর্মনীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১.আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধকরণ:

বিশ্বাস ও চেতনা মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দ্বারাই মানুষ জীবনের সমগ্র আচরণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবন গঠনে ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে এটা বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখে। তাই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশ সাধনে সর্বপ্রথম আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমান-আকীদা ও চিন্তা-বিশ্বাস যাচাই ও সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে আলিম সমাজ ও জ্ঞানীমহলকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আর আলিম ও ধর্মীয় শিক্ষকগণকে সঠিক ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচারের সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্ট সংশয়, ভ্রান্ত মতবাদ ও নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

২.দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানার্জন, নিয়মিত কুরআন-হাদীস চর্চা এবং তদানুযায়ী 'আমল:

জ্ঞানার্জন: দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান তথা ঈমান, তাওহীদ, কালিমার মর্মার্থ ও তাৎপর্য, অযু-গোসল, সালাত, সাওম, যাকাত, হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজিব-সুন্নত, জায়েজ-নাজায়েজ ও শরীয়ত নির্ধারিত হুদুদসহ জীবিকা নির্বাহের স্বীয় পেশা সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান জানা। শিরক, কুফর, রিয়া, নিফাক, প্রবৃত্তির অনুসরণ এগুলোর স্বরূপ ও ক্ষতি সম্পর্কে জানা।
অসুস্থতা বা বড় অসুবিধা ছাড়া পরিমানে অল্প হলেও প্রতিদিন নিয়মিত কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করা।

---

[১]. *আহমাদ দীদাত রচনাবলি*, অনু. ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা (ঢাকা: ই ফা বা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪), পৃ. ২৮।

[২]. মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। বরং মুসলিম হতে হলে নিজ ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে তাঁর ইচ্ছা ও বিধানের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে হয়।

মোটকথা, একজন দায়িত্বশীল সত্যিকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ফরয জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চা করা।

ইবাদতসমূহ পালন: আল-কুরআন ও সুন্নাহ অনুমোদিত সকল ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতসমূহ রাসূল সা. এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গুরুত্বের সাথে সঠিকভাবে পালন করা। ইবাদতসমূহের বিশেষ করে সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের হকীকত ও তাৎপর্য অনুধাবন করা।

মানুষের অধিকারসমূহ আদায়: সঠিক ঈমান-আকীদা অবলম্বন এবং ইবাদতসমূহ পালনের সাথে সাথে বান্দার হক তথা পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অসহায়, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সামাজিক অধিকারসমূহ আদায় ও প্রতিষ্ঠা করা।

৩.মানসিক ব্যাধি দূর, আত্মসংশোধনে সচেষ্ট থাকা, সৎসঙ্গ, যিকর, দু'আ এবং পরকালীন জবাবদিহিতার চেতনা:
দম্ভ, অহঙ্কার, হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া, নিফাক, অন্ধানুসরণ ইত্যাদি মানসিক ব্যাধিসহ অন্তরকে সর্বপ্রকার কলুষতা ও মন্দ থেকে পবিত্র করে সদগুণাবলী দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করতে সদা সচেষ্ট থাকা। অন্তর ও চরিত্র সংশোধনে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার মাপকাঠির অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর ফায়সালাকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেয়া। মুত্তাকী ও মুখলিস বিজ্ঞ আলিমের সংসর্গে থাকা। এটা সম্ভব না হলে অভিজ্ঞ আলিমদের রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার নির্দেশনার ভিত্তিতে আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আল-গাযালী রচিত এহইয়াউ উলূমুদ্দীন, ইবনুল জাওযী কৃত *যাম্মুল হাওয়া*, *তালবীসু ইবলীস*, *সিফাতুস সাফওয়া*, ইবনুল কাইয়েম রচিত *ইগাসাতুল লাহফান*, *আল-ফাওয়ায়েদ*, *মাদারিজুস সালেকীন*, *ই'লামুল মূর্কি'ঈন*, *যাদুল মা'আদ* উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অধিক হারে প্রত্যহ নিয়মিত যিকর, দু'আ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আত্মসংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

মূল্যবোধ বিকাশে মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিশেষভাবে কাজ করা। পার্থিব জীবনের স্বরূপ, পরকালীন জীবনের স্থায়ীত্ব, জবাবদিহিতা, পুরস্কার ও শাস্তির চিত্র ব্যাপকভাবে তুলে ধরে অনাচার ও পাপের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা। অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মের আলোকে নৈতিক উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালানো। এক্ষেত্রে প্রত্যেক এলাকার মসজিদের ইমামগণ ও সমাজপতিগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন।

৪.জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:
অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে, সমাজে তাকে একটি সম্মানজনক অধ্যায়ে পৌঁছতে হলে যে করেই হোক অর্থ-বিত্তে তাকে অন্য সকলের থেকে উপরে উঠতে হবে। এটি নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের বড় কারণ। তাছাড়া তা সকলের উর্দ্ধে উঠা বা উচু মর্যাদার পরিচায়ক নয়। তাই এই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে সকলের থেকে উপরে উঠতে হলে অর্থ-বিত্ত নয় বরং সততা, সংযম(তাকওয়া), ন্যায়পরায়নতা, বিনয়, সৎচরিত্র, নৈতিক সাহস, সহযোগিতা, সহানুভূতি, দয়া-মমত্ববোধ, আত্মত্যাগ, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী চর্চা ব্যাপকভাবে করতে হবে। এ সবের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে বড় ও সম্মানিত হওয়া যায়।

সমাজের অধিকাংশ মানুষ অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের সমীহ করে এবং নেতৃত্বে আসনে অধিষ্ঠিত করে। তাদের যুলম, অন্যায়, অপকর্ম, দুর্নীতি জেনেও না জানার ভান করে। সমাজের বৃহৎ কল্যাণের স্বার্থে অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী এসব দুষ্কৃতিকারীদের সম্মান ও নেতৃত্বের পরিবর্তে ঘৃর্ণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং সমাজের সৎ, ন্যায়বান, জ্ঞানী ও ভালো মানুষদের সম্মান ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য কাজ হবে।

৫.পরিবারকে মূল্যবোধ গঠনের দুর্গে পরিণত করা ও পারিবারিকভাবে নৈতিক শিক্ষা চর্চা:
সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা। পারিবারিকভাবে মূল্যবোধ গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা। শিশু-কিশোরদের নৈতিক উন্নয়ন ও অবক্ষয়ের প্রতিকারে সুশিক্ষা প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মুসলিম পরিবারগুলোকে সন্তানদের শিশু-কিশোর বয়সে পারিবারিক পরিবেশে আল-কুরআনের মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রত্যেক পরিবারের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সচেতনতার সাথে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা। সমাজসেবামূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করা। নিয়মিত পারিবারিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা। অসৎ ও চরিত্রহীন বন্ধুদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে ঘন ঘন না বেড়ানো। শিশু-কিশোর সংগঠনের দায়িত্বশীলদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা। কল্পনাপ্রবণ শিশু-কিশোরদের মনের খোরাকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। সর্বদা নিজের ও পরিবারের সৌন্দর্য চেতনা ও রুচিশীলতা বজায় রাখা। নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে হবে। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের আচার-আচরণ, জীবনবোধ, সমাজের রীতিনীতি ও সমাজের নানা চরিত্রের মানুষের সাথে মিলামেশার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া অভিভাবকের কর্তব্য।

৬.শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং শিক্ষার সর্বস্তরে বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষা চালু:
মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনাকে নৈতিকতার দিকে ধাবিত করতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপক সংস্কার সাধন করা। শিক্ষার সর্বস্তরে বৈষয়িক ও ওহীর জ্ঞানের সমন্বয়ে অত্যাধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে একক ইসলামী মূল্যবোধ সম্বলিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। ঈমান, আক্বীদা, আমল-আখলাক বিনষ্টকারী সর্বপ্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা। স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও

বিশ্ববিদ্যালয় তথা প্রাথমিক থেকে উচু স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠ্যসূচীতে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষা প্রবর্তন করা। নাবী-রাসূল ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। কেননা এটা শিক্ষার্থীদের আদর্শ জীবন গঠন ও মূল্যবোধ বিকাশে অনুপ্রাণিত করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ্য, সৎচরিত্রবান, নিষ্ঠাবান ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করা। শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা ও নৈতিক মান বৃদ্ধি কল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

যুবকদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা। যুবসমাজই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। যুবসমাজ শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার অধিকারী হ'লে দেশ ও জাতির উন্নতি যেমন সুনিশ্চিত, তেমন কোন কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটলে দেশ ও জাতির ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। তাই তাদের অধঃপতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সহ-শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা : ছেলে-মেয়ে ও যুবক-যুবতীদের একই প্রতিষ্ঠানে একসাথে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করার কারণে তারা অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে তারা প্রেমের নামে বিবাহ বহির্ভুত শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে নিজেদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। তাই যুবসমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষায় সহ-শিক্ষার পরিবর্তে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক শিফটে এবং পর্যায়ক্রমে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৭.সুস্থ মানবিক গুণাবলী বিকাশে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা:
সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে অনুকূল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মিথ্যাচার, সত্য অস্বীকার, সত্যের বিরূদ্ধাচারণ, সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিতকরণ, সত্য গোপন, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতারণা, অশ্লীলতা, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস, গীবত, চোগলখুরী, অন্যের দোষ অন্বেষণ করা, কাউকে উপহাস বা বিদ্রূপ করা ইত্যাদি পাপাচার ও অপরাধ রোধকল্পে বিশেষভাবে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ তৈরী ও সামাজিকভাবে নৈতিক শিক্ষা চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৮.রাষ্ট্রে যোগ্যতা ও সততার কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি দান:
জনপ্রতিনিধি, সরকারী, বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য ও সৎ প্রার্থীকে নির্বাচনে অগ্রাধিকার দান। সৎ, কর্তব্যপরায়ন ও নীতিবান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা ও পদন্নোতি দান। গণমাধ্যমে তাদের সততা তুলে ধরা। অসৎ ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের শাস্তি নিশ্চিতকরণ। অপরাধ অনুযায়ী তাদের শাস্তিবিধান এবং তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরী। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নৈতিক শিক্ষা ও কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা।

৯.স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত:
সমাজ ও জাতীয় জীবনে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থা রোধকল্পে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে সকল স্তরের উন্নয়ন ও কার্যনির্বাহ ব্যাহত হবে। দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার জন্যও রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্বাহকদের কয়েকটি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সৎ-নীতিবান ও কর্তব্যপরায়ন লোকদের সমন্বয়ে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন ঢেলে সাজাতে হবে। সর্বোপরি দুর্নীতি দমন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এছাড়াও নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃর্থকীকরণ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তকরণ, ন্যায়পাল নিয়োগের আইন কার্যকরকরণ, রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়-অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি উল্লোখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় আছে যে সব বিষয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সেক্ষেত্রে প্রশাসন ও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ সব ব্যাপারে আলেম ও বুদ্ধিজীবী মহল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০.ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অপরাধীকে অনতি বিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক ও যথাযথ শাস্তি প্রদান করা:
সমাজ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস, ব্যভিচার, ধর্ষণ, পরকীয়া, মিথ্যাসাক্ষ্য, মিথ্যা অপবাদ, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, অত্যাচার, অবিচার, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা, ছিনতাই, ফিৎনা-ফাসাদ, অপব্যয়-অপচয়, কৃপণতা, হারাম উপার্জন, দুর্নীতি, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, ওজনে কম দেয়া, মজুতদারী, কালোবাজারী প্রভৃতি অনাচার বন্ধে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও যথাযথ দণ্ড প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক এগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারী-কর্মকর্তা, বিচারক, বুদ্ধিজীবী মহল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নের্তৃবৃন্দের সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ করা।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ন্যায়পরায়ন বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে বিচার বিভাগ গঠন এবং তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া। বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখতে হবে। সাথে সাথে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন মুতাবিক ন্যায়বিচারের রায় প্রদান ও তা কার্যকর করতে হবে।

১১. মাদক, নেশা জাতীয় দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ এবং এসবের ব্যবহার ও সহজলভ্যতা দূর করা:
বিভিন্ন রকমের মাদক ও নেশা জাতিয় দ্রব্য মানুষকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত করে। তাই মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ করা। এগুলো ব্যবহারকারীদের জন্য শাস্তি বিধান সরকারীভাবে কার্যকর করা। সরকারীভাবে এগুলোর

উৎপাদন, বিপণন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বন্ধ করা। এ সব নেশাকর দ্রব্যের অপকারিতা তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে এর প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে এবং এ থেকে ফিরে আসে।

১২. সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন:
সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন, সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রে সুশাসন ও সুনাগরিক গড়ে তোলার মানসে জনসাধারণের মধ্যে সৎ চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটানো, নিছক কথার চেয়ে কাজের মাধ্যমে নৈতিকতা গঠনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা ও নির্ভিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ অনেকাংশে সম্ভব।

১৩.সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও জনমত গঠন:
যে কোন সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন। আল-কুরআন প্রদত্ত জীবনবিধানের আলোকে সমাজ সংস্কারে ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ তৈরীতেও দরকার শান্তিপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন। তাই নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রয়োজন নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। সমাজের যালিম, সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, দুস্কৃতিকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ এবং সর্বাত্মকভাবে তাদের বর্জন করা। পারস্পরিক ছোট-খাট বিভেদ ভুলে গিয়ে দুর্নীতিবাজ ও দুস্কৃতিকারীদের সব ধরনের চক্রান্ত সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, বুদ্ধিজীবীমহল, গণমাধ্যম ও আলেম সমাজকে একযোগে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। সব অনাচার প্রতিরোধে জনমত গঠন, গণজগরণ ও সচেনতা সৃষ্টি করা। প্রচার মাধ্যমকে এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।

১৪.গণ মাধ্যমকে মূল্যবোধ চর্চার অগ্রণী ভূমিকা পালন করা:
নৈতিক উন্নয়ন এবং অপরাধ প্রতিরোধে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোর কার্যকর ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা। নৈতিক সঙ্কটের কারণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা। ব্যক্তি মন থেকে হীনতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা দূর করে সার্বিক মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা।

১৫.অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত:
সুস্থ জীবন ধারণের জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। বেকারত্ব অবসানে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। নৈতিকতা বর্জিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নীতিমালার পরিবর্তে শোষণ ও বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও কার্যকর করা। সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। নৈতিকতাযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পদ ভোগ ও সুবিধায় সবার অধিকার যথার্থই স্বীকৃত হয়। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যুগপৎ নৈতিক উন্নয়নও অপরিহার্য।

১৬. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর করা :
বেকার যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব দূর করা। কথায় বলে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। যুবসমাজ বেকার থাকলে তারা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পড়বে। তাই তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ, যোগ্য ও কর্মঠ করে গড়ে তোলা এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১৭. অপসংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতারোধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করে সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা:
সুস্থ চিত্তবিনোদনের জন্য রুচিসম্মত উপকরণের ব্যবস্থা ও পরিবেশ নিশ্চিত করণে কর্মসূচী প্রনয়ন। অপসংস্কৃতি আগ্রাসন রোধে উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ ও সুস্থ্য-কল্যাণধর্মী চলচিত্র, সিনেমা ও নাটক বিনির্মাণ এবং সেগুলোর বহুল প্রচার ঘটাতে হবে। অপসংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতারোধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমাজের মানুষের নৈতিক উন্নয়ন করতে হলে সুস্থ ও সুন্দর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, মানুষের প্রতি ভালবাসা, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা। সকল প্রচার মাধ্যমে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা। যাবতীয় অশ্লীল বই, পত্র, সাময়িকী বন্ধ করা। সকল প্রকার বিজাতীয় সংস্কৃতি বন্ধ করে সুস্থ সংস্কৃতি চালু করা।

১৮. ধর্মীয় নেতা ও ইসলামী সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ঐক্য থাকা:
ধর্মীয় নেতা, ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনগুলোর নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ইসলামের মৌলিক ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছা। নিজ দলীয় আদর্শের পরিবর্তে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর মূল আদর্শের প্রতি আহবান জানানো। নিজের বা সংগঠনের কোন কার্যক্রম দ্বারা যাতে ইসলামের ক্ষতি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নিজেকে কোন নির্দিষ্ট সংগঠনের কর্মী অপেক্ষা একজন মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। সব ধরনের উগ্রতা, গোঁড়ামী, চরমপন্থা ও ভুল পথ পরিহার করা এবং সত্য গ্রহণে সদাপ্রস্তুত থাকা। পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা। ছোটখাটো বিষয়ে মতবিরোধ পরিহার করে উদারনীতি অবলম্বনের মাধ্যমে পারস্পরিক সমঝোতা রক্ষা করা। পারস্পরিক মতবিরোধ এবং গঠনমূলক সমালোচনাও থাকতে পারে তবে কুফরী শক্তি, ইসলাম বিরোধী ও স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে সর্বদা সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার থাকা। কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি বাস্তবায়ন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় নিজেদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

১৯.সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণসহ অবস্থানের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ :

বিশ্বয়ন যতই প্রবল হচ্ছে ধর্মীয় চেতনাবোধ ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ততই প্রবল হচ্ছে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ[১] ব্যবস্থা করা। অনুকূল পরিবেশে পারস্পরিক ভাব বিনিময়,সম্মান প্রদর্শন, সহযোগিতা, ভুল বুঝাবুঝির অবসান, বিভেদ দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এই সংলাপ ভূমিকা অনিস্বীকার্য। তাছাড়া সব ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধ অনেকাংশে কাছাকাছি তাই তা সমাজে বাস্তবায়ন করতে হলেও বিভিন্ন ধর্মের আন্তঃসংলাপ জরুরী।

২০.জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআন শিক্ষা কার্যকরঃ
আল-কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তাই কুরআন থেকে পরিপূর্ণ সুফল পেতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক-আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমানভাবে এর শিক্ষা কার্যকর করতে হবে। তাহলে কুরআন থেকে পূর্ণাঙ্গ সুফল ও কল্যাণ লাভ করা যাবে।

উপসংহারঃ

আল-কুরআন মানব জাতির মুক্তির মহান দিশারী এবং সত্য ও ন্যায়ের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তীকা। আল-কুরআন নাযিল হয়েছে বিপথগামী ও অধঃপতিত মানুষের হিদায়েত (সুপথপ্রদর্শন), কল্যাণ ও নৈতিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্য। আল-কুরআন নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হওয়ায় এর মাধ্যমে নবুয়্যত ও রিসালাতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ রহিত হয়। ফলে এই মহাগ্রন্থে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য সর্বকালের উপযোগী করে একটি সর্বজনীন ও চূড়ান্ত জীবন বিধান প্রদান করা হয়। এতে সর্বকালের মানুষের যাবতীয় মৌলক সমস্যা চিহ্নিত করার সাথে সাথে তার নির্ভুল সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে।

আল-কুরআন মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিধানে এবং পারস্পারিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে এবং পৃথিবীতে সঠিকভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কতগুলো বিধি-নিষেধ ও ভালো-মন্দ স্থির করে দিয়েছে– এ সবই মূল্যবোধ। মানব জীবন ও সমাজকে সুন্দর ও শান্তিময় করার জন্য মূল্যবোধের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধই মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিশীলিত করে। কিন্তু মানুষের সীমাহীন লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, মিথ্যাচার, অজ্ঞতা-মূর্খতা, সত্য বিমুখতা, মিথ্যাসাক্ষ্য, সত্যের বিরুদ্ধাচারণ, শিরক, কুফর, নিফাক, কুসংস্কার, অন্ধানুসরণ, কুপ্রবৃত্তির অনুগামীতা, যুলম, হত্যা, সন্ত্রাস, গীবত, মিথ্যা অপবাদ, চোগলখুরী, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, আত্মসাৎ, অকৃজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ওয়াদাভঙ্গ, সুদ, ঘুষ, মাদকাসক্তি, জুয়া, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতা, ফিৎনা-ফাসাদ, প্রতারণা, ভোগ-বিলাস, অপচয়-অপব্যয়, কৃপনতা, অবৈধ উপার্জন, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রপন্থা, শয়তান ও তাগূতের অনুসরণ, বর্ণবৈষম্য, অন্যের অধিকার হরণ, খাদ্যদ্রবে ভেজাল, মজুতদারী, কালোবাজারী, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি অনাচার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় কিংবা মূল্যবোধ বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এর ফলে মানুষের নৈতিক অধঃপতন সংঘটিত হয়।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সমস্যা মানব জাতির একটি মৌলিক সমস্যা। অতীতে মানুষের মধ্যে এই সমস্যা ছিল। কুরআনে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহে যেমনঃ নূহ আ. এর জাতিতে বর্ণবৈষম্য, আদ-সামূদ জাতিতে শক্তির বড়াই, অবাধ্যতা, রাহাজানি, লূত আ. এর জাতিতে সমকাম, ফিরআউনের জাতিতে যুলম, সবলের ওপর দুর্বলের অত্যাচার, জাতিভেদ, শুয়াইব আ. জাতিতে ওজন ও মাপে কম দেয়া, ইত্যাদি নানা অনাচার বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণ মানুষকে এ সব অন্যায়-অনাচার থেকে ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে এবং নৈতিক উন্নয়ন সাধনে কাজ করেছেন। কিন্তু মানুষ নাবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের শিক্ষা উপেক্ষা করার ফলে তাদের মধ্যে অন্যায়-অবক্ষয়ের প্রসার ঘটে। বর্তমানেও এই সমস্যা ব্যাপক ও প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান মানব সমাজ লোভ, হিংসা, দুর্নীতি, ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস, ছিনতাই, অপহরণ, চাঁদাবাজি, ফিৎনা-ফাসাদ, যুলুম, স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার, দায়িত্বহীনতা, মাদকাসক্তি-নেশা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, বিকৃত যৌনচার, নারী নির্যাতন, অপসংস্কৃতিক আগ্রাসন, পরচর্চা, পরশ্রীকতরতা, খাদ্যদ্রবে ভেজাল, মজুতদারী-কালোবাজারী, দ্বৈতনীতি, বৈষম্য-বর্ণবাদ ও অনৈক্য-বিভেদ ইত্যাদিতে ভরে গেছে। অন্যায়, অবিচার, অনাচার, পাপাচার ও অশন্তি আজ সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় মানব জাতিকে চারদিক থেকে ভয়ানকভাবে গ্রাস করেছে। বিশ্ব মানবতা আজ ভয়ানকভাবে বিপন্ন।

---

[১]. আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হল– সাধারণভাবে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ধর্মালম্বী বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা।

তবে মূল্যবোধের সবচেয়ে ভয়ানক ও সর্বগ্রাসী অবক্ষয় ঘটেছিল রাসূল মুহাম্মাদ সা. এর অবির্ভাবকালীন সময়ে আরব ভূখণ্ডে। সে সময় আরব ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির অবস্থাও ছিল চরম শোচনীয়। বিশেষ করে আরব সমাজে অসভ্যতা, বর্বরতা, যুলম, মদ-জুয়া, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন, অজ্ঞতা, মূর্খতা, মূর্তিপূজা, প্রকৃতিপূজা, কুপ্রথা, কুসংস্কার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহ, হত্যা-লুন্ঠন, কন্যা সন্তানের জীবিত কবর, দাসপ্রথা, আভিজাত্যের দম্ভ, বর্ণবৈষম্য, দূর্বলের প্রতি সবলের অবিচার, মদ-জুয়া, অশ্লীলতা-ব্যভিচার, পাপাচার ও অনৈতিকতা ইত্যাদি মানুষের জীবনকে ভয়ানকভাবে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করেছিল। এ সময় আরব ভূখণ্ডের মানুষের এতই নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল যে, ইতিহাস সে যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বা অজ্ঞতা-বর্বরতার যুগ বলে অভিহিত করেন। ইতিহাসের এই চরম ক্রান্তিলগ্নে মানব জাতির মুক্তির মহান আল্লাহ আরব ভূখণ্ডে প্রেরণ করেন শেষ নাবী মুহাম্মাদ সা. কে এবং তাঁর প্রতি নাযিল করেন সর্বশেষ আসমানী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। সেই মহাগ্রন্থে প্রদান করেন অবক্ষয়সৃষ্টিকারী সর্বরোগের অব্যর্থ মহৌষধ এবং মূল্যবোধ বিকাশের সকল উপাদান ও উপায়-উপকরণ। আল-কুরআন প্রদত্ত সেই মহামূল্যবান শিক্ষার পরশে মানুষ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সকল অবক্ষয় সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে মুক্তি লাভ করে এবং পৃথিবীতে উন্নত নৈতিকতার অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, চরম অসভ্য, বর্বর, উচ্ছৃঙ্খল, অধঃপতিত, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব সমাজের এই মানুষগুলোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে ঈমান এনে সর্বান্তকরণে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। রাসূল মুহাম্মাদ সা. এর তত্ত্বাবধানে এবং আল-কুরআনের শিক্ষার বদৌলতে আরবরা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা সকল অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে উন্নত নৈতিক চরিত্র, সৌভ্রাতৃত্ব, সুসভ্য জাতি হিসেবে নযিরবিহীন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তারা সবচেয়ে সুসভ্য-সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়। আল-কুরআনের উন্নত শিক্ষা গ্রহণের বদৌলতে ইসলাম অবির্ভাবের এক শতাব্দীর মধ্যে বিশাল রোম ও পারস্য সম্রাজ্য তাদের অধিকারে এসে যায়। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে নের্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। কুরআনের শিক্ষার আলোকে তারা সব ধরনের অনাচার ও যুলুমের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা, সাম্য, সুবিচার, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীবাসীকে তারা এক অভূতপূর্ব সমাজ ও রাষ্ট্র উপহার দেন। উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, চারিত্রিক মাধুর্যতা, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা, উদারতা, ভ্রাতৃত্ব, আদর্শ-কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তারা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখেন। সততা, নৈতিকতা, উদারতা, উন্নত মানবীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়। দয়া, সদাচারণ, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা, মানুষের অধিকার রক্ষা ও পারস্পারিক সহযোগিতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে তারা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পৃথিবীর ইতিহাসের এরূপ নযিরবিহীন দৃষ্টান্ত আজও কেউ রচনা করতে পারেনি। মুসলিম জাতির ঐতিহাসিক এই মহাবিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল আল-কুরআন। কুরআনের বিপ্লবাত্মক শিক্ষার প্রভাবেই অসভ্য আরব জাতিসহ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ সুসভ্য জাতিতে পরিণত হন। দার্শনিক টমাস কারলাইন যথার্থই বলেছেন,

> কুরআনকে এমন এক সময়ে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা হয় যখন পূর্ব হতে পশ্চিম এবং উত্তর হতে দক্ষিণ–তথা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছিল ধর্মহীনতার অবাধ রাজত্ব। মুছে গিয়েছিল মানবতা, সৌজন্যতা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম নিশান, দিকে দিকে ছিল অশান্তি ও অরাজকতার আধিপত্য এবং ব্যক্তি পূজার ঘনঘটা। কুরআন মানুষকে বদলে দিল মুক্তির পথ, তাদের অন্তর ভরে দিল প্রেম-ভালবাসায়। ফলে কেটে গেল ফিতনা-ফাসাদের কালো মেঘ, প্রতিহত হলো যুল্‌ম-অত্যাচারের দূর্বার গতি। পথভ্রষ্টরা পথে এলো আর বর্বররা সভ্য হল। এ গ্রন্থ পাল্টে দিল দুনিয়ার কায়া। কুরআন মূর্খকে জ্ঞানী, অত্যাচারীকে হৃদয়বান এবং খোদাদ্রোহীকে আল্লাহভীরুতে পরিণত করলো।[১]

মুসলিম জাতির পক্ষে এই অসাধ্য সাধন কি কি কারণে সম্ভব হয়েছিল তার মূল্যায়ন করলেই এটা সুস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসবে। সে যুগের মুসলিমগণ কুরআনের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করেছিল, যা তাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিল। কুরআনের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তারা বিপুল সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছাড়িয়ে মানব সমাজ থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ভ্রষ্টতা, অনাচার ও অবক্ষয় দূর করেছিল। সে সময়ের মুসলিম শক্তি অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল যে সব নীতিমালা অনুসরণ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল বিশুদ্ধ ঈমান, আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসা, তাঁর উপর নির্ভরশীলতা, পরকালীন জীবনে বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস কেন্দ্রিক জীবনাচরণ, কুরআনের নৈতিক জ্ঞানার্জন, জ্ঞানানুযায়ী বাস্তব কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সততা, সাম্য-সুবিচার, ন্যায়পরয়নতা প্রতিষ্ঠা, আমানতদারি, মানব কল্যাণ, সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজের প্রতিরোধ, কুরআনের নীতি বাস্তবায়নে

---

[১]. উদ্ধৃত, আবদুল মতিন জালালাবাদী, *কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০১), পৃ.২৪।

নিঃস্বার্থ সংগ্রাম, সত্যের জন্য ত্যাগ, নিষ্ঠা, ধৈর্য, নৈতিকতা, উদারতা, ‘আমল-আখলাক, আচার-আচরণ ও অনুপম চারিত্রিক। তারা ছিল সুযোগ্য ও সর্ববিষয়ে কর্মপটু।

কিন্তু কুরআনের শিক্ষা পরিত্যাগ করার কারণে আজকের মুসলিমরা নৈতিকতা, সততা, যোগ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, ‘আমল-আখলাক, আচার-আচরণ, সত্যের সংগ্রাম ইত্যাদি সব দিক থেকে অধঃপতিত। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও রাহাজানি প্রতিরোধে মুসলিম শক্তি কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। বর্তমান বিপথগামী মুসলিম জাতি পৃথিবীতে আজ লাঞ্ছিত ও পর্যদুস্ত ও নৈতিকভাবে চরম অধঃপতিত। অধঃপতিত এই মুসলিম জাতি ছাড়া বর্তমান পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করলেও নৈতিকভাবে চরম দেউলিয়া। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে আজ বিশ্বমানবতা ভয়ানকভাবে জর্জরিত। অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, বিভ্রান্তি, অবিচার ও অনাচার নিমজ্জিত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বর্তমান সমাজের মানুষের নৈতিক অবস্থাও প্রায় আইয়্যামে জাহিলিয়্যার মতই অতি শোচনীয়। আইয়্যামে জাহিলিয়্যার এবং বর্তমান সমাজের অনাচার ও নৈতিক অবক্ষয়গুলো প্রায় একই ধরনের। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে জর্জরিত মানুষ আজ মুক্তির অন্বেষায় হতাশাগ্রস্থ, উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা। নৈতিক উন্নতি ছাড়া মানব জাতির সার্বিক মুক্তি, কল্যাণ ও উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কোন মতবাদই তাদের মুক্তি দিতে পারছে না। জীবনের প্রকৃত পথ ভুলে গিয়ে দিশেহারা মানুষ দুর্বার গতিতে ছুটে চলছে বিভিন্ন মরীচিকাপূর্ণ ভ্রান্ত পথে। আত্মবিস্মৃত মানব উচ্ছৃঙ্খলতা ও প্রবঞ্চনার মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে শন্তির অমিয়ধারা। কুরআন প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ না করাই মানব জাতির এসব সংকট, দুর্দশা, দুর্গতি, অশান্তি ও অকল্যাণের মূল কারণ। এমতাবস্থায় মুক্তি পেতে কুরআনই চূড়ান্ত আশার আলো ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। কেননা আল-কুরআনে মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান প্রদান করা হয়েছে তাতে মানব জাতির ইহলৌকিক কল্যাণ, পারলৌকিক মুক্তি এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার অতি চমৎকার দিকনির্দেশনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, নৈতিকভাবে অধঃপতিত এবং চরমভাবে বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে একটি উৎকৃষ্ট সমাজ গঠনের বাস্তব উদাহরণও কেবল আল-কুরআনেরই আছে।

মানব জাতির জন্য আল-কুরআন প্রদত্ত সেই নৈতিক শিক্ষামালা কোন সাময়িক সমাধান ছিল না। বরং কুরআনে বর্ণিত মূল্যবোধ বিকাশের সেই শিক্ষা ছিল সর্বজনীন, কালোত্তীর্ণ, চিরকল্যাণকর। এই নৈতিক নীতিমালা কখনও সেকেলে হবে না, একে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজনও হবে না। এই শিক্ষার আবেদন কখনও ফুরিয়ে যাবে না। এর চেয়ে উত্তম কোন কর্মপন্থা কখনও কারো পক্ষে প্রদান করা না। তাই যে কোন যুগের মানুষ কুরআন প্রদত্ত এই অবক্ষয় রোধকারী ও মূল্যবোধ বিকাশকারী শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবে সে ব্যক্তিই সোনালী যুগের মানুষের মত শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হতে পারবে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীবাসীকে আলোর পথে নিয়ে আসতে সেই কুরআন তার চিরন্তন শিক্ষা নিয়ে আজ স্ব-মহিমায় জাজ্বল্যমান। আজকের বিপথগামী মানব জাতিকে সত্যিকার শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে কুরআন তার শাশ্বত শিক্ষা নিয়ে দীপ্তিমান। আমরা দেখতে পাই বর্তমান মানব সমাজে যেসব বিষয় অবক্ষয় সৃষ্টি করছে কুরআন চৌদ্দশত বছর পূর্বে সেগুলোকে অবক্ষয়কারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং সেগুলো প্রতিকারের নীতিমালাও দিয়ে শতভাগ সফল হয়েছিল। অবক্ষয়রোধে ও মূল্যবোধের উন্নয়নে কুরআন প্রদত্ত সেই নীতিমালা আজকের সমাজের অবক্ষয় প্রতিকারে শুধু সক্ষম নয় বরং এরচেয়ে উত্তম ও বিকল্প নীতিমালা আর নেই, হতে পারে না। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উন্নয়নে কুরআনের নীতিমালাই সর্বজনীন নীতিমালা। এটাই মানবতার মুক্তির একমাত্র কর্মপন্থা। মূল্যবোধ বিকাশ এবং অবক্ষয়রোধে কুরআন অনুযায়ী নতুনভাবে সবার চিন্তার পুনর্গঠন ছাড়া গতান্তর নেই।

আল-কুরআন শিক্ষাই আজকের সমাজের মানুষকে রূপান্তরিত করতে পারে নিষ্কলুষ, পরিশুদ্ধ, আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র মানুষে; জাগ্রত করতে পারে মানুষের মনুষ্যত্ব ও বিবেককে এবং দূরীভূত করতে পারে মানুষের অন্তরাত্মা থেকে সব অসৎ গুণাবলী। আল-কুরআনের শিক্ষা অতীতে মানুষকে যেমন মনুষ্যত্ববোধ বিকশিত করতে ও নৈতিক জীবনাচরণের উদ্বুদ্ধ করতে শিখিয়েছে, আজও তা পারে মানুষকে নৈতিকতায় উজ্জীবিত করতে। এর মাধ্যমে যাবতীয় অনৈতিক ও অবক্ষয়সৃষ্টিকারী বর্জনীয় বিষয়াদি সমূলে উৎপাটন করে একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ মর্মে কুরআনে বলা হয়েছে[১]– قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
“তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে, কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”

[১]. আল-কুরআন, সূরা আল-আন্‌'আম ০৬: আয়াত ১০৪।

আজকের অশান্তি ও বিভিষিকাপূর্ণ সমাজে সত্যিকার শান্তি ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করতে হলে আল-কুরআনে বর্ণিত শিক্ষামালার মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী, মরোণোত্তর জীবনে মানুষের কঠোর জবাবদিহিতা এবং ভালো কাজের জন্য সুখ-শান্তি আর মন্দ কাজের জন্য দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। মানুষ তার কর্মের দ্বারা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করে সুখ-শান্তি অর্জন করতে পারে। এজন্য মানুষকে পার্থিব জীবনে নৈতিক কর্ম সাধন করতে হবে। মানুষ ইহজীবনে নৈতিকতা অবলম্বন করলে এর বিনিময়ে পার্থিব সুখ-শান্তি এবং পরকালে মুক্তি লাভ করবে। কুরআন অনুসারে যারা পার্থিব জীবনে অসৎকর্ম করে মরণোত্তর জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অশেষ দুঃখ-কষ্টের আবাস জাহান্নাম। আর যারা পার্থিব জীবনে সৎকর্ম করে মরণোত্তর জীবনে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখ-শান্তি উপভোগের আবাস জান্নাত। এই ধারণার মাধ্যমে মু'মিনরা জাহান্নামের অগ্নি থেকে বেচেঁ জান্নাতের শান্তি প্রাপ্তির জন্য নিজেকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস পায়। এভাবে পরকালীন জীবনে বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস কেন্দ্রিক জীবনাচরণ মানুষকে ইহজগতে নৈতিক ও আর্দশ মানবে পরিণত করে। এ পবিত্র পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ মানুষ দ্বারা সঙ্গী, প্রতিবেশী, সমাজে ও রাষ্ট্র কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং এরূপ যথার্থ ধার্মিক মানুষের দ্বারা পারিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত উপকৃত হবে। তাই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অধঃপতিত না করে নৈতিক প্রগতিতে উন্নীত করে।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সব ধর্ম ও দর্শনে কম-বেশী মূল্যবোধ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এমন কোন ধর্ম ও দর্শন পাওয়া যাবে না যে, সেখানে নৈতিকতার সুর প্রতিধ্বনিত হয়নি। কিন্তু আল-কুরআন অন্য সব ধর্ম ও দর্শন থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল-কুরআন ছাড়া অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে যে নৈতিক নীতিমালা আছে তাতে অপূর্ণতা রয়েছে। সেগুলোতে মানব জীবনের বিশেষ কিছু দিক সম্পর্কে কিছু নৈতিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, আল-কুরআনে মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ মানব জীবনের সকল দিক-বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ নৈতিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। আল-কুরআন ছাড়া অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে যে নৈতিক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়– তার অধিকাংশই তত্ত্ব সর্বস্ব। এখানে মূল্যবোধ বিকাশের জন্য কিছু করণীয়-বর্জনীয়, ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ সংক্রান্ত শুধু তত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে। এখানে প্রায়োগিক দিক কম। কিন্তু কুরআন শুধু নৈতিক নীতিমালা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং মানব জীবনে তা প্রয়োগের সঠিক কর্মপদ্ধতি ও নির্দেশনা দিয়েছে এবং সফলভাবে তা বাস্তবায়নেও ঘটিয়েছে। এই নৈতিক নীতিমালা একাধারে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতি দর্শন সমাজের বিশেষ শ্রেণী ও কতিপয় লোককেই আদর্শবাদী বানাতে সাহায্য করলেও সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে তা সামর্থ্য রাখে না। এতে যদিও কিছু লোক নীতিবাদী হয়ে উঠে তবুও তাতে সামষ্টিক কল্যাণ সাধিত হয় না। উপরন্তু নীতিদর্শনের নানা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, তা দ্বীনের প্রভাবের মত কখনো গভীর ও ব্যাপকও হয় না। কেননা ধর্ম কেবল উত্তম পবিত্র চরিত্র গ্রহণের আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, ধর্ম নৈতিক চরিত্রের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও মৌলিক আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আচার-আচরণের খুঁটিনাটিও বলে দেয় এবং তার উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। চরিত্র হারালে তার কি নির্মম পরিণতি হতে পারে, তার কথা বলে মানুষকে সাবধান ও সতর্ক করে দেয়। আর চরিত্রবান কি উচ্চ সওয়াব পেতে পারে এবং চরিত্র হারালে কি আযাব ভোগ করতে হতে পারে, তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে চলা ধর্মের কাজ। এছাড়াও অন্যান্য ধর্ম ও দর্শনে যে নৈতিক নীতিমালা আছে তার অনেকগুলো মানব প্রবর্তিত এবং তা ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। কিন্তু আল-কুরআন প্রদত্ত নৈতিক নীতিগুলো বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত, এগুলো সম্পূর্ণ নির্ভুল, বাস্তসম্মত ও মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল। কেননা সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সত্তা হিসেবে আল্লাহ্ মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। মানুষের ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণ কিসে নিহিত তা তিনিই সর্বাধিক ভালো জানেন। তাই নৈতিকতা সংক্রান্ত কুরআন প্রদত্ত আদর্শ ও বিধি-নিষেধই মানব জাতির জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর।

আল-কুরআন জাহেলী যুগের বর্বর-হিংস্র মানুষগুলোকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। কুরআনের বদৌলতে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বে সমাসীন হয়েছিল। অথচ সে কুরআন আজও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। লাখ লাখ মানুষ কুরআন তিলাওয়াতও করছে, এর অর্থ-ব্যাখ্যা শিক্ষা করার জন্য বিপুল পরিমান গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যুগের মানুষগুলো জাহেলিয়াতের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, কুরআন থেকে কোন পথ খুঁজে নিতে পারছে না, হৃদয় আলোকিত হচ্ছে না। লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও বিপর্যয়ই আজকের মুসলিমদের অবধারিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হলো? অথচ কুরআনে বলা হয়েছে, *'কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়েত, রহমত ও মহৌষধ'*।[1] সত্যিই কুরআনের প্রতিটি পাতায় মুমিনদের জন্য রয়েছে হিদায়েত ও দিকনির্দেশনা। এতে রয়েছে চিন্তা-চেতনার বৈকল্য, দ্বিধা-সংশয়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-ক্রোধ, লোভ-লালসা ও

---

[1]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস ১০ : আয়াত ৫৭। আরও দেখুন, আল-কুরআন, ১৭:৮২।

শয়তানী প্ররোচনা ইত্যাদি সমুদয় আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি এবং যে সব সামাজিক ব্যাধি সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে সমাজের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়, যেমন- হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, নৈরাজ্য-ফাসাদ ইত্যাদি সব ব্যাধির মহৌষধ কুরআনে রয়েছে। কিন্তু কেন আজকের মুসলিমরা তা থেকে উপকৃত হচ্ছে না?

এর জবাব হচ্ছে, আজকের সমাজের অধিকাংশ মুসলিম নামধারী মুসলিম, তারা সত্যিকার ঈমান অনেক দূরে। তারা কুরআন থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন। কুরআন তাদের জীবনে মৃত। আর কুরআন কোন তাত্ত্বিক বা ফলিত বিদ্যার গ্রন্থ নয় যে, যে কেউ তা অধ্যয়ন করলেই হিদায়েত লাভ করবে। বরং কুরআন হচ্ছে এমন কিতাব যা কেবল সেই ব্যক্তি মুমিনকে হিদায়েত ও নূর দান করে যে ব্যক্তি তা দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে তা গ্রহণ করে।[আল-কুরআন ০২:০২] এক্ষেত্রে যার হৃদয় যতই ঈমানী রসে সিক্ত হবে সে কুরআন থেকে ততই স্বাদ লাভ করবে, এর গভীর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করবে এবং এ থেকে উপকৃত হবে। যে হৃদয়ে ঈমান ও তাকওয়া নেই, সে হৃদয় এর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে না এবং এ থেকে উপকৃতও হবে না। কেননা কুরআন হিদায়েত ও সত্য জ্ঞানের মহাভাণ্ডার। আর এই মহাভাণ্ডার থেকে আহরণের মাধ্যম হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া যা অন্য কিছু দিয়ে আহরণ করা যায় না। আজকের লাখো মানুষ কুরআন দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না এবং জাহেলী সমাজের পরিবর্তন করতে পারছে না কারণ কুরআনের মহাভাণ্ডার খোলার চাবি তথা সত্যিকার ঈমান নেই। যাদেরও একটু ঈমান আছে তাও নিফাক, কুফর, শিরকসহ নানা ভয়ানক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এছাড়া আজকের মুসলিমদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো, তাদের জীবনে রাসূল সা. আদর্শ অনুপস্থিত। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা রাসূল সা. এর আনুগত্য ও অনুসরণ অনেক দূরে।

তাই আজকের মুসলিমদের যাবতীয় আত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ব্যাধি মুক্তি পেতে হলে তাদের ঈমান নবায়ন করে ব্যাধিমুক্ত সত্যিকার ঈমানের অধিকারী হতে হবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যয় ও উপলব্ধি সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করে সে অনুযায়ী জীবন পুর্নগঠন করতে হবে। কুরআনকে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসে জীবন্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে রাসূল সা. জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। কেননা রাসূল সা. ছিলেন কুরআনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, তাঁর জীবন ও কর্মে কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে জীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে। প্রথম যুগের মুসলিমগণ যেভাবে কুরআনের নিকটবর্তী হয়েছিলেন, আজকের মুসলিমরা সেভাবে কুরআনের নিকটবর্তী হতে পারলে কুরআন তাদের জীবনে গতিশীল ও সাফল্য দানকারী উৎসে হবে যেমনটি হয়েছিল প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের জন্য। আর এ পথেই তারা ইসলামের শান্তিময় ছায়াতলে আসতে পারবে এবং তাদের জীবনে সত্যিকার শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আসবে। বর্তমান কালের মানুষ কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করলে অতীতের মত এখনও সুফল লাভ করবে।

কাজেই বর্তমান মানব জাতির নৈতিক অবক্ষয় দেখে হতাশ হওয়া চলবে না। রাত্রির গভীরতা যত বৃদ্ধি পায় প্রভাত তত নিকটবর্তী হয়। তাই আমাদের আশা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে নৈতিক উন্নয়নে এবং অবক্ষয়রোধে চেষ্টা ও কাজ করে যেতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় যেমন হটাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, ঠিক তেমনি দুই এক মাসে তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ থেকে নৈতিক প্রগতি ও স্বচ্ছতায় উত্তরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইতিহাসে অন্ধকারের পরে আলো, অবক্ষয়ের পর উত্তরণ, অন্ধত্ব-কুসংস্কারের পরে রেনেসা বা জাগরণ ঘটেছে বারংবার। এ হিসেবে অবক্ষয়ক্লিষ্ট দেশ ও জাতি নৈতিক প্রগতি ও উত্তরণের পথে ধাবিত হবে এটা আশা করা যায়। তবে এ উত্তরণ এমনিতেই হবে না। এজন্য চেষ্টা-তদবির ও প্রয়াসের প্রয়োজন। আমাদের নৈতিকতা ও নিয়ম-নীতির চর্চা ও অনুশীলন বাড়াতে হবে। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পুরাতন দ্বার বন্ধ করে দিতে হবে এবং নতুন দ্বার যেন উন্মোচন না ঘটে তাও কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সাথে সাথে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশে আল-কুরআনের শিক্ষা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন, তাফসীর ও উলুমূল কুরআন বিষয়ক গ্রন্থঃ

আল-কুরআনুল কারীম।

আত-তাবারী, আবূ জাফর ইবন জারীর (মৃ.৩১০হি.), *জামি'উল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, তাহকীক, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, বৈরুতঃ মুআসসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০হি.।

ইবন কাছীর, ইসমাঈল ইবনু উমার(মৃ.৭৭৪হি.), *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, সৌদী আরব : দারুত তাইয়েবাহ, ১৪২০হি.।

আল-কুরতুবী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (মৃ.৬৭১হি.), *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, বৈরুতঃ দারু এহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী.।

আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমুদ (মৃ.১২৭০হি.), *রূহুল মা'আনী*, বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি.।

আল-রাযী, ফখরুদ্দীন (মৃ.৬০৬হি.), *আত-তাফসীরুল কবীর/মাফাতীহল গাইব*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ,২০০০ খৃ.।

আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন আলী (মৃ.১২৫০/১৮৩৪) *ফাতহুল কাদীর*, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ৩য় সং, ১৯৯৭, ও *ফাতহুল কাদীর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.।

ইবনুল জাওযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৮।

আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (মৃ.৯১১হি.), *আদ-দুররুল মানছূর ফীত তাফসীরি বিল-মাসূর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৩),

আবূ হাইয়্যান আল-আন্দালুসী, মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ(মৃ.৭৪৫হি.), *তাফসীর আল-বাহরুল মুহীত*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.।

রশীদ রিদা, সাইয়্যেদ (মৃ.১৩৫৪হি./১৯৩৫খৃ.হি.), *তাফসীরুল মানার*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২য় সং, লেবানন।

শফী, মুফতী মুহাম্মদ (মৃ.১৯৮৭খৃ.) *তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন*, অনুবাদ, মুহীউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০।

শহীদ, সাইয়েদ কুতুব(মৃ.১৯৬৬), *ফী যিলালিল কুরআন*, আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ,. http://www.altafsir.com।

আয-যামাখশারী, আবুল কাসিম মাহমুদ (মৃ.৫৩৮হি.), *আল-কাশ্শাফ*,বৈরুতঃদারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.

আল-বায়দাভী নাসিরুদ্দীন (মৃ.৬৮৫/৬৯১হি.) *তাফসীরুল বায়দাভী*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি, লেবানন।

পানিপথী, কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ (মৃ.) *তাফসীর মাযহারী*, অনুঃ ও সম্পাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আল-জাস্সাস, আবূ বকর (৩৭০হি.) *আহকামুল কুরআন*, বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি.।

ইবনুল 'আরাবী, আবূ বকর (মৃ.৫৪৩হি.), *আহকামুল কুরআন*, আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২য় সং. http://www.al-islam.com.

ইসমাঈল হাক্কী(মৃ.১১২৭হি.), *তাফসীর রূহুল বায়ান*, বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি. ।

ফুয়াদ আবদুল বাকী, মুহাম্মাদ — *আল-মু'জাম আল-মুফাহরাস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, আল-কাহিরাহ : দারুল হাদীস,১৪২৮হি. ।

আস-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রাহমান (মৃ.৯১১হি) — *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি. ।

ড. সুবহী সালিহ, — *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন*, বৈরুতঃ দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫ ।

আল-কাত্তান, মান্না' খলীল (মৃ.১৯৯৯ খৃ.) — *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন*, আল-কাহিরাহঃ মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, তাবি. ।

আল-সাবুনী, মুহাম্মদ 'আলী (মৃ.২০১৫ খৃ.) — *আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন*, পাকিস্তান, করাচীঃ মাকতবাতুল বুশরা, ৪র্থ প্রকাশ, ২০১২ ।

যারকাশী,আল্লামা বদরুদ্দীন — *আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন*, বৈরুতঃ দারুয যাইল, ১৪০৮হি. ।

রহমান, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর — *কুর'আন পরিচিতি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৯ ।

" — *কুরআনের পরিভাষা*, ঢাকাঃ কামিয়াব প্রকাশন, প্রকাশকাল ১৯৯৮ ।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, — *কুরআন পরিচিতি*, ঢাকাঃ ই. ফা. বা., প্রকাশকাল ১৯৯৫ ।

মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত — *কোরআন পরিচিতি*,ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স,২য় সং, ১৯৯২ ।

ইউসুফ, মাও. আবুল কালাম মুহাম্মদ — *মহাগ্রন্থ আল-কোরআন কি ও কেন?* খেলাফত পাবলিকেশন্স, একাদশ প্রকাশ-২০০৪ ।

শফিকুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ — *'উলূমু'ল-কুরআন*, রাজশাহীঃআল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া

উবাইদুল্লাহ, মুফতি মুহাম্মদ — *কুরআন সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০ ।

<u>হাদীস ও উলুমূল হাদীস বিষয়ক গ্রন্থঃ</u>

মালিক ইবনু আনাস, ইমাম (মৃ.১৭৯হি.), — *আল-মুয়াত্তা*, তাহক্বীক, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, মিসরঃ দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি. ।

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (মৃ.২৫৬হি.), — *আস-সহীহ*, বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭হি. /১৯৮৭ ।

" — *আদাবুল মুফরাদ*, বৈরুতঃদারুল বাশায়িরিল ইলমিয়্যাহ,৩য় প্রকাশ ১৪০৯হি. ।

মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ.২৬১হি.) — *আস-সহীহ*, তাহক্বীক, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি. ।

আবূ দাউদ সিজিসতানী, সুলাইমান ইবনুল আশআস (মৃ.২৭৫হি.) — *আস-সুনান*, তাহক্বীক, মুহাম্মদ মহীউদ্দিন আব্দুল হামীদ, বৈরুতঃ দারুল ফিকর ।

তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ (মৃ.২৭৯হি.) — *আস-সুনান*, তাহক্বীক, আহমাদ শাকির ও অন্যান্য, বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি. ।

নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুআইব (মৃ.৩০৩হি.), — *আস-সুনান*, সিরিয়া, হালাবঃ মাকতাবাহ আল-মাতবু'আত আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৮৬ ।

ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ(মৃ.২৭৫হি.), — *আস-সুনান*, তাহক্বীক, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী বৈরুত, দারুল ফিকর, তা.বি. ।

আস-সানআনী, আব্দুর রাজ্জাক (২১১হি.), — *আল-মুসান্নাফ*, বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩হি. ।

হাম্বল, ইমাম আহমাদ (রহ.) (২৪১হি.) — *আল-মুসনাদ*,আল-কাহিরাহঃ মুআসসাত কুরতুবাহ, তা.বি. ।

ইবনু আবী শাইবা, আব্দুলাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), — *আল-মুসান্নাফ*, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি ।

আদ-দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫হি.), — *আস-সুনান*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭হি. ।

আলাউদ্দিন আলী ইবন হিসামুদ্দীন, — *কানজুল উম্মাল*, বৈরুত : মুআসসাতুর রিসালা, ১৯৮৯ ।

হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুলাহ(৪০৫হি.), — *আল-মুস্তাদরাক*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১হি. ।

আল-আসকালানী, ইবনু হাজার আহমাদ ইবনু আলী(৮৫২ হি), — *ফাতহুল বারী*, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৯ ।

বাগাভী, আবূ মুহাম্মদ আল-হুসাইন(মৃ.৫১৬হি.), *শরহুস সুন্নাহ*, বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩।

আত-তাবারানী, আবুল কাসেম (৩৬০হি.), *আল-মু'জামুল কাবীর*, ইরাক, আল-মাওসুল : মাতবুআতুল ইলমি ওয়াল হিকমি, ২য় সং. ১৪০৪হি.

” *আল-মু'জামুল আওসাত*, কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫হি.।

ইবনু হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মাদ (৩৫৪হি.), *সহীহ ইবন হিব্বান*, তারতীব ইবনু বালবান, বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩।

বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (মৃ.৪৫৮হি.), *শু'আবুল ঈমান*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ,১৪১০হি.।

আল-মুনযিরী, হাফিয আব্দুল আযীম (৬৫৬হি.), *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, ১৪১৭হি.।

আত-তাবরীযী, আল-খাতীব (৭৩০হি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫হি. ।

ইমাম নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.) *রিয়াদুস সালেহীন*, ঢাকাঃতাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১।

<u>সীরাত, ইস. ইতিহাস, ইস. আইন, আকীদা ও ইসলামী জীবন বিধানের বিভিন্ন দিক-বিভাগের উপর ব্যবহৃত গ্রন্থঃ</u>

আত-তাবারী, আবূ জাফর ইবন জারীর (মৃ.৩১০হি.), *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.।

ইবনু কাছীর, ইসমাঈল ইবনু উমার(মৃ.৭৭৪হি.), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরুত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি.

আয-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ(৭৪৮হি.), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২য় সং. zaza@alwarraq.com. ও বৈরুত, মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৮৯ খৃ.।

” *আল-কাবাইর*, সংযুক্ত আরব আমিরাতঃ মাকতাবাতুল ফুরকান, ২য় প্রকাশ, ২০০৩।

ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ (৩২০হি.), *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরুতঃ দারু সাদির, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮।

আবূ ইউসুফ, ইয়াকুব (১৭৬হি.), *কিতাবুল খারাজ*, কায়রোঃ আল-মাতবু'আত আস-সালাফিয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৩৮২হি.।

খতীব বাগদাদী,আহমাদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি), *তারীখু বাগদাদ*, বৈরুতঃদারল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ,তাবি।

মাওসু'আতু নাদরাতুন নাঈম ফী মাকারিমি আখলাকির রাসূলিল কারীম জেদ্দাঃ দারুল ওসীলাহ লি নশর ওয়াত তাওযী'

আবূ নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (মৃ.৪৩০), *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি.।

ইবনুল জাওযী, আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), *তালবীসু ইবলীস*, বৈরুতঃ দারুল ফিক্‌র, ২০০১।

” *যাম্মুল হাওয়া*, বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪১৮হি.।

” *সিফাতুস সাফওয়া*, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৯হি.।

আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম (২৪১হি.), *কিতাবুয যুহদ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯,

আল-গাযালী, আবূ হামিদ (৫০৫হি.), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, বৈরুতঃদার আল-মা'রিফাহ, তা.বি।

ইবন মাসকুয়াহ, (মৃ.৪২১হি.) *তাহযীব আল-আখলাক ফী আল-তারবিয়্যাহ*, বৈরুত, দার আল-কুতুব লি আরাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১।

ইবন আবী দুনিয়া, আবূ বকর আবদুল্লাহ (মৃ.২৮১হি.) *কিতাবুল আল-ওরা'অ*, কুয়েত : দারুস সালাফিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.।

ইমাম নবুবী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.) *আযকারুন নবুবী*, বৈরুতঃদারুল ফিকর, ১৪১৪হি.।

আস-সারাখসী, আবূ বকর (৪৯০হি.), *আল-মাবসুত*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ২০০০।

ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম(৭২৮হি), *আত-তাওয়াস্‌সুল ওয়াল ওসীলাহ*, রিয়াদঃ দারুল ইফতা, ১৯৮৪।

” *ইবাদতের মর্মকথা*, অনু. এ বি এম খালেক মজুমদার, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০৩।

” *শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, অনুঃ মাও. জুলকিফার আহমদ কিসমতী, ঢাকা:আহসান পাবলিকেশন, প্রকাশকাল-২০০৮।

ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), *ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান*, বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৯৫হি.।

” *যাদুল মা'আদ*, বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪শ প্রকাশ, ১৯৮৯।

” *আল-ফাওয়ায়েদ*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪।

” *আল-ফাওয়ায়েদ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৩৯৩/১৯৭৩।

” *মাদারিজুস সালেকীন*, বৈরূতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবিইয়াহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৬।

” *মাদারিজুস সালেকীন*, বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৬

” *যাদুল মা'আদ*, বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২৭তম প্রকাশ, ১৯৯৪।

” *তারীকুল হিজরাতাঈন*, সৌদী আরব, আদ-দাম্মামঃ দারু ইবনিল কাইয়িম, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪হি.।

” *ই'লামুল মূকি'ঈন*, বৈরুত : দারুল জাইল, ১৯৭৩।

রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-হুসাইন (মৃ.৫০২হি.) *আয-যারী'আহ ইলা মাকারিমিশ শরী'আহ*, কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৭।

আয-যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ(৭৪৮হি.), *কিতাবুল কাবায়ের*, অনু.আবু সাদেক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, ঢাকা: ই.ফা. বা, ২য় সং-২০০৫।

সমরকান্দী, আবূ লাইছ (৩৭৩হি), *তানবীহুল গাফিলীন*, আল-কাহিরাহ : মাকতাবাতুল ঈমান বিল মানসুরিয়াহ, ইমাম জামিআতুল আযহার, ১ম প্রকাশ,১৯৯৪।

মাওয়ার্দী, আবুল হাসান *আহ্‌কামুস সুলতানিয়া*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৫।

ইবনু খালদূন, *মুকাদ্দিমাহ*, বৈরুত:দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.

'আমীমুল ইহসান, মুফতী মুহাম্মাদ *কাওয়ায়েদুল ফিকহ*, ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬১।

ইবনু আবীদ দুনিয়া, আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ *মাকারিমুল আখলাক*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুরআন, ১৪১১হি.।

ইবন আবদুল বার, *আদাবুল মুজালিসাহ*, তানতা: দারুস সাহাবা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯।

আল-জাযাইরী, আবূ বকর জাবির *আক্বীদাতুল মু'মিন*, জেদ্দা:দারুস সুরুক, ৫ম সং, ১৯৮৭।

আল-মুসলেহ, খালেদ ইবন আবদুল্লাহ *আত্মশুদ্ধি, সালাহুল কুলূব*, অনু.আব্দুর নূও, রিয়াদঃ ইসলামী দাওয়াত...ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়,সৌদি আরব, ১৪২৯হি.।

আল-'আসকালানী, ইবনু হাজার *আল-ইসতি'দাদ লি ইয়াওমিল মা'আদ*, দারুত তারবিয়াহ, তা.বি.।

ইবন হাজার মাক্কী, *কিতাবুয যাওয়ায়ির*, অনুঃ মাও. মুশতাক আহমদ, ঢাকা : আল-এছহাক প্রকাশনী, ২০১০।

আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০হি.), *আল-ই'তিসাম*, মিসর : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াহ আল-কুবরা, তা.বি.।

তাফতাযানী, সা'দ উদ্দীন (৭৯১ হি), *শারহুল আকাইদ আন-নাসাফিয়াহ*, করাচীঃ মাকতাবাতুল মদীনা, ২য় প্রকাশ, ২০১২।

শহীদ, সাইয়েদ কুতুব (মৃ.১৯৬৬ খৃ.), *আল-'আদালাতুল ইজতিমা'ইয়া ফীল ইসলাম*, কায়রো : দারুশ শুরক, ১৯৯৩।

” *মা'আলিম ফীত তারীক্ব*, কায়রো : দারুশ শুরূক, ১৯৭৯।

” *আত-তাসভীরুল ফান্নী ফীল কুরআন*, দারুশ শুরক, কায়রো, ২০০২।

কুতুব, মুহাম্মাদ (মৃ.২০১৪), *শুবহাত হাওলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুশ শুরক, ১৯৯২।

আইউব, হাসান তাবসিতুল 'আকায়িদিল ইসলামিয়াহ, আল-কাহিরাহ : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ ।

” আস-সুলূকুল ইজতিমা‘ঈ ফীল ইসলাম, আল-কাহিরাহ : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ২০০২।

দেহলভী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬ হি), *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, অনুবাদ, আখতার ফারূক, ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, ২য় মুদ্রন-২০০১।

” *আল-ফাউযুল কবীর ফী উসুলিত তাফসীর*, দামেস্ক : দারুল গাউছানী, ১ম মুদ্রণ, ২০০৮।

ইকবাল, ড. আল্লামা মুহাম্মদ *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া*, অনু.মোহাম্মদ সুলতান ও গোলাম মোস্তফা, ঢাকা:আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০২।

আল-কারযাভী, ড. ইউসুফ *ফিকহুয যাকাত*, বৈরুত : মু‘আসাসতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৩ হি.।

” *আর-রাসূল ওয়াল ‘ইলম*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি।

” *মুশকিলাতুল ফাক্বরি ওয়া কাইফা ‘ইলজুহা ফীল ইসলাম*, বৈরুত : মু‘আসাসতুর রিসালাহ, ১৯৮৫।

” *ইসলামে হালাল–হারামের বিধান*, অনু. মাও. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭।

” *ইসলাম ও শিল্পকলা, আল-ইসলাম ওয়াল ফুনূন*, অনু. ড. মাহফুজুর রহমান ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭।

” *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনু. ড.মাহফুজুর রহমান ঢাকা:খায়রুন প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০০৯।

ফাওযান, ড. সালেহ বিন *কিতবুত তাওহীদ*, ম্যনিলা : দারুল হিজরাহ ফাউন্ডেশন ফিলিপিন, তা বি।

‘আতি, ড. হামমুদাহ আবদাল *ইসলাম একমাত্র জীবন বিধান*, অনু. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৪।

আল-বাদাবী, ড. জামাল *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, অনু: ডা. আবু খলদুন আলমাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট,২০০৮।

আল-কায়সি, ড. মারওয়ান ইবরাহীম *ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ*, অনু.শেখ এনামুল হক, ঢাকা:বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট,১৯৯৮।

কাসুলী, ড. ওমর হাসান *মেডিকেল এথিক্স: ইসলামী দৃষ্টিকোণ*, অনু. ড. শারমিন ইসলাম ও ডা. আবু খলদুন আলমাহমুদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০।

ড.আব্দুল্লাহআল-মুসলিহ ও অন্যান্য, *মুসলমানকে যা জানতেই হবে*, অনু. আ.মান্নান তালিব ও অন্যান্য, জামেয়া কাসেমিয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯৯।

আল-বারীকান, ড. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ *আল-মাদখালু লি দিরাসাতিল আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যা আলা মাযহাবি .আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা’য়াত*, আল-খুবার:দারুস সুন্নাহ লিন নশর ওয়াত তাওযী, ১৯৯২।

হাকীম, ড.খলিফা আবদুল *ইসলামী ভাবধারা*, অনু. সাইয়েদ আবদুল হাই, ঢাকা: আল হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৪।

শালতূত, আল্লামা মাহমুদ *ইলাল কুরআনিল কারীম*, বৈরুত : দারুশ শুরক, ১৯৮৩।

হাশিম, ড.আল-হুসাইনী ড.সা’দ যাল্লাম ও অন্যান্য,*ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, অনু. ড.এ.বি. রফিক আহমেদ ও অন্যান্য, ই.ফা.বা., ঢাকা ২০১৩।

তাববারা, আফীফ আবদুল ফাত্তাহ *আল-খাত্বায়া ফী নাযরিল ইসলাম*, বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৭৭।

” *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, অনু. রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ঢাকা: ই. ফা. বা., ৩য় সং, ২০০৪।

মোল্লা জিওন, আহমাদ *নূরুল আনোয়ার*, পাকিস্তান, সাদিকাবাদ: জামি‘আ ইসলামিয়া, তা. বি.,

জাহাঙ্গীর, ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৭।

” *এহইয়াউস সুনান*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, প্রকাশ, ৫ম সং, ২০০৭।

বেগোভিচ, ড. আলীয়া ইজ্জত *প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও ইসলাম*, অনু. ঢাকা : আমান পাবলিকেশন, ১৯৯৬।

মা'বুদ, ড. মুহাম্মদ আব্দুল *রাসূলুল্লাহ সা. শিক্ষাদান পদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম প্রকাশ, ২০১১।

ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯।

” *বিদ'আত*, চট্টগ্রাম: খাকী প্রকাশনী, ১ম সং, ২০১১।

লতীফ, ড.সায়্যিদ আব্দুল অনু.মুহম্মদ ইলাহি বখশ, *ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ*, ঢাকা : ই.ফা.বা. ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬।

আলী, সৈয়দ আমীর *দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম*, অনুবাদক: রশীদুল আলম, আয়েশা কিতাব ঘর, ১ম সংস্করণ-২০০২।

দীদাত, আহমাদ *আহমাদ দীদাত রচনাবলি*, অনুঃ ফজলে রাব্বী ও মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ই.ফা.বা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৪,

আবূ সুলাইমান, ড.আবদুল হামিদ *মুসলিম মানসে সংকট*, অনুঃ মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা, ২০০৬।

মাসঊদ, ফরীদ উদ্দীন *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১ম সং, ১৯৮৪।

হযরত আলী (রা.) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক চিঠি, অনু. মনজুর আহসান, ঢাকা: ই. ফা. বা., ১৯৮৩।

সামছুল হক, *বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলাম*, ঢাকা: ই. ফা. বা, ১৯৭৭।

ইসলাহী, মুহাম্মদ ইউসুফ *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*,অনু.এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: ইফাবা, ২য় সং, ২০০৫।

হারুন ইয়াহিয়া, *কোরআন মজিদের কিছু গোপন রহস্য*, অনু.আবুল বাশার, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল,১ম সং. ২০০৩।

আফগানী, শামছুল হক *মানব জীবনে আল-কোরআনের প্রয়োজনীয়তা*, অনু. মো.আব্দুল লতিফ চৌধুরী, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়,১৯৯৬।

ড.আব্দুল্লাহ আল মুসলিহ ও সালাহ আস্‌সাবী, *মুসলমানকে যা জানতেই হবে*, অনু.আ.মান্নান তালিব ও রুহুল আমিন, নরসিংদী : জামেয়া কাসেমিয়া প্রকাশনী, ১৯৯৯।

মুহাম্মদ, ড.কাজী দীন *জীবন সৌন্দর্য*, ঢাকা: ই. ফা.বা., ৬ষ্ঠ সং, ২০০৬।

মুশাহিদ, মওলানা মুহাম্মদ *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তারাধিকার*, অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৮।

রহমান, মওলানা হিফজুর *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনু: মওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা: ইফাবা, ৩য় প্রকাশ, ২০০০।

আল-জাহিয, আমর ইবন ওসমান *তাহযীব আল-আখলাক* সৌদী আরব: দারুস সাহাবাহ, ২য় সং, ১৯৯২ পৃ.১০।

হারুন ইয়াহিয়া, *কুরআনে নৈতিক মূল্যবোধ*, অনু. হোমায়রা বানু, ঢাকা : স্মরণী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০০২।

মর্গান, কেনেথ ডাব্লিউ *ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা*, অনু. মুয়ায্‌যম হুসাইন খান ও অন্যান্য, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ১৯৬৩।

হফম্যান, ড. মুরাদ, *ইসলাম : দি অলটারনেটিভ*, অনু. মুঈন বিন নাসির, ঢাকা: ইফাবা, ২য় সং.২০০৯। পৃ.৩১৩।

মান্নান, ড. এম এ *ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ইসলামিক ইকনমিক রিচার্স ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩।

হামেদ আলী, সাইয়েদ *একাধিক বিবাহ*, অনু মু.হাসান রহমতী, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৬।

রহীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০০।

” *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং, ২০০৭।

” *ইসলামের নীতি দর্শন*, ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০০১।

” *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৪।

” *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, ২০০৫।

ইসলাম, এ এন এম সিরাজুল *ভাল মৃত্যুর উপায়*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ ২০০৬।

জালালাবাদী, আবদুল মতিন *কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০১।

রহমান, মফিজুর *কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল (স.)*, ঢাকাঃ মদিনা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪।

ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নূরুল *ইসলামী অর্থনীতি*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকা ২০১২

” *ইসলামে সম্পদ অর্জন ব্যয় ও বণ্টন*, ঢাকাঃ জমজম প্রকাশনী, ২০০৭।

জিয়াউল হক, *ইসলামী শাসন ব্যবস্থা:মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি*, ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশান্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭

মজিদ, মুহাম্মদ আবদুল *শিরক ও বিদাআত*, ঢাকা : আল-ফুরকান প্রকাশনী, প্রকাশকাল, ২০০৫ ।

আহমদ, ড. এমাজ উদ্দীন *ইসলাম ও উন্নত জীবন*, ঢাকা : ই.ফা.বা, ২০০৭।

রহমান, মোঃ মুখলেছুর *সন্ত্রাস নয় শান্তি ও মহাভবতা ধর্ম ইসলাম*, ঢাকাঃ এন আরবি গ্রুপ, ২০১১।

সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ৮ম সং, ২০০৯।

আল-সালমান,আবদুল আযীয আল-মুহাম্মাদ *আল-আসইলাতু ওয়ার আজইবাতিল উসূলিয়্যাতি আলাল আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাতি লি ইবনে তাইমিয়্যাহ;* প্রকাশ বিহীন, ২১ম সং, ১৯৮৩।

বুকাইলি,ডা. মরিস *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, আখতার-উল-আলম অনূ., ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী,৭ম সং, ১৯৯৬।

বুকাইলি, ডা. মরিস *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান*, অনু.ওসমান গনি, ঢাকাঃ প্রীতি প্রকাশন, ১ম সং, ১৯৯৪।

সালাহউদ্দীন, *মৌলিক মানবাধিকার*, অনু. মাও. মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, ঢাকাঃ ই. ফা. বা., ১ম প্রকাশ-২০০৪।

লেখক মণ্ডলী, প্রবন্ধ সংকলন *স্রষ্টা ও ইসলাম*, ঢাকাঃ ই. ফা. বা., ২য় সং, ২০০৪।

সাইয়েদ হামেদ আলী, *ইসলাম আপনার কাছে কি চায়*, অনু. আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী,-২০০২।

সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.০৬, ঢাকা : ই. ফা. বা., ১৯৮৯।

” *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.০৮, ঢাকা : ই. ফা. বা., ১৯৯০।

” *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১১, ঢাকা : ই. ফা. বা., ১৯৯২।

ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.২১, ঢাকা : ই. ফা. বা., ১৯৯৬।

” *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সং ২০০৮।

” *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকাঃ ই ফা বা, ১৯৯৫।

লেখক মন্ডলী, *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ-২০০১।

মানিক, নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ২০০৫, ৫ম সং ২০০৩।

নীতিবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, আইন, তুলনামূলক ধর্ম ও বিবিধ বিষয়ে গ্রন্থ:

আল-খার্‌রায, খালিদ ইবন জুম‘আহ *মাওসুআতুল আখলাক*, কুয়েতঃ মাকতাবাতু আহলিল আছার, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০হি.।

রহমান, গাজী শামসুর *মানবাধিকারের ভাষ্য*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

” *অপরাধ বিদ্যা*, ঢাকাঃ পল্লব পাবলিসার্স, প্রথম সংস্করণ, বাংলাদেশ বুক হাউজ, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

” *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

অর্জুনবিকাশ চৌধুরী, *নীতি-বিজ্ঞান*, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪।

খালেক, এ এস. এম. আবদুল *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৯।

আলম, ড. রশীদুল *কোরআনের দর্শন*, ঢাকা : আয়েশা কিতাব ঘর, ২০০২।

জহুরী, *অপসাংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা : উত্‌লু প্রকাশনী, ১৯৯৯।

রাসেল,বার্ট্রান্ড *বিবাহ ও নৈতিকতা*, অনুবাদ আরশাদ আজিজ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল-১৯৯৮।

গাঙ্গুলী, বাসুদেব *দণ্ডবিধি*, ঢাকাঃ আলীগড় লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪।

হাবিব, ড. মো.আহসান *তুলনামূলক সমাজ ব্যবস্থা*, ঢাকাঃ গ্রন্থ কুটির, ২০১০।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *ইসলাম : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, অনু. শওকত হোসেন, ঢাকাঃ সন্দেশ প্রকাশনী, ২০০৪।

হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সং, ২০০০।

সেনগুপ্ত, প্রমোদ বন্ধু *নীতিবিজ্ঞান*, কলিকাতাঃ ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ২০০৯।

তোশারফ আলী, সৈয়দ *সমাজ ও সাহিত্য*, ঢাকাঃ শিখা প্রকাশনী, ২০০২।

ড.আজিজুন্নাহার ইসলাম ও ড.কাজী নূরুল ইসলাম, *তুলনামূলক ধর্ম এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ২০০২।

ফুলওয়ারবী, জা'ফর *ইসলাম ও ফিতরাত*, অনু. মোহাম্মদ সাদেক, ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৮০।

ইসলাম, ড. আমিনুল *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*,ঢাকা:নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১।

এনামুল হক, এ এফ মোঃ *মূল্যবোধ কি এবং কেন?* ঢাকা:ই.ফা.বা, ১ম প্রকাশ২০০৪।

হামিদ, ড.এম.আবদুল *সমকালীন নীতি বিদ্যার রূপরেখা*, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড, ২০০১।

সম্পা দাস, *সমাজ কর্ম: প্রত্যয়, ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকাঃ বুক চয়েস, ২০০৫।

পরিমলভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব*, কলিকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর *আত্মহত্যার আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

আলম, ড রশীদুল *দর্শন ও সাহিত্য*, ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২।

হাই ঢালী, ড. মুহাম্মদ আবদুল *নীতিবিদ্যা*, ঢাকাঃ পুথিঘর লিমিটেড, ৩য় সং, ১৩৯৭ বং।

রহমান, মোঃ আতিকুর *সমাজ কল্যাণ* , ঢাকাঃ কোরআন মহল, ১৯৯৯।

ড. শওকত আরা, *উচ্চতর সমাজ মনোবিজ্ঞান*, ২য় সংস্করণ, ঢাকাঃ জ্ঞান বিতরণী, ২০০৬, পৃ.২১৯।

মহাপাত্র, ড অনাদি কুমার *বিষয় সমাজতত্ব*, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা।

ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ*,ঢাকা:অনন্যা প্রকাশনী,১ম সং ২০০১।

হাসনা বেগম, *নৈতিকতা নারী ও সমাজ* , ঢাকা:বাংলা একাডেমী, ১৯৯০।

বারী, মুহাম্মদ আবদুল *নীতিবিদ্যা*, ঢাকাঃ হাসান বুক হাউজ , ৪র্থ সংস্করণ।

মুছলেহ উদ্দীন, আ. ত. ম. *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫।

লস্কর, মো. আজিজুর রহমান *প্রকৃতি বিজ্ঞান ও ধর্ম*, ঢাকাঃ আশরাফিয়া বইঘর, ২য় সংস্করণ, ২০১২।

পবিত্র বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম বাংলা অনু. ঢাকা:বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১।

কিতাবুল মুকাদ্দাস বাংলা অনু. ঢাকা : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০০।

অভিধান ও আরবী সাহিত্য বিষয়ক

ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবন মুকাররম আল-আফরীকী(মৃ.৭১১হি.) *লিসানুর আরব*, ইরান:নাশরু আদাবিল হাওযাহ,১৪০৫ হি.।

রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-হুসাইন (মৃ.৫০২হি.) *আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন*, মক্কা মুকাররমাঃ মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, তা. বি.।

আবূ জাইব, ড. সা'দী *আল-কামূস আল-ফিকহী*, দামিস্ক : দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ-১৪০৮হি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু ফারিস, আহমদ (মৃ.৩৯৫হি.), *মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ*, তাহক্বীক্ব-আবদুস সালাম হারুন, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৩৯৯হি.।

আল-ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), *আল-মিসবাহুল মুনীর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা.বি.।

আল-জুরজানী, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৮১৬হি), *আত-তা'রীফাত*, বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.।

ড. ইবরাহীম মুস্তাফা ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওসীত*, দারুদ দাওয়াত, তাহকীক, মাজমা'উল লুগাতিল আরাবিয়্যা, http://www.almeshkat.net.

রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫।

আযহারী, মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন *আরবী-বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।

মুহাম্মদ নাসীম, *জাদীদ লোগাতুল কুরআন*, অনু. শাহ আব্দুল হালীম, ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ২০১১।

সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ৪র্থ সং ১৯৮৪।

ড মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ, ২০০২।

আবদুল বাকী ও জামাল খান, *ভুবনকোষ* , ঢাকাঃ বঙ্গ প্রকাশনী, ১৯৯৭ ।

আবদুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা:ইফাবা, ২০০৪।

আহমেদ, সরকার শাহাবুদ্দীন *নারী নির্যাতনের রকমফের*, ঢাকা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি,২০০২।

দর্শন ও প্রগতি, ১৯বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ২০০২, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

__বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী বইঃ__

Yusuf Ali, Abdullah *The meaning of the Glorious Quran*, Dar al-kitab al-Masri, Cairo/ Dar al-kitab al-Lubnani, Bairut.

Asad, Muhammad *The Message of The Quran*, Gibratar : Dar Al-Andlus Limited,1980.

” *Road to Mecca,* Kuala Lumpur: Islamic Book Trust,1996.

Draz, Dr. M. Abdullah *The Moral warld of the Qur'an,*Translated by Danielle Robinson & Rebecca Masterton, I.B. Tauris, London,2008,

Fazl-ur-Rahman Ansari, Dr. Muhammad *The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society,* Indus Education Foundation, Karachi, Pakistan.

Michael H.Hart, *The Hundred: A Ranking of the most influential persons in History*, Meera Publication, edition India,

Rodney stark, *Sociology*, california : wadsworth publishing company.

David Popenoe, *Sociology,* Newjersey: Prentice Hall, 1986 , 6th ed. p.57.

Jon.M shepard, *Sociology*, Newyork :West publishing company, 1981, P.65.

David M. Newnan, *Sociology*, exploring the architecture of everyday life, California : SAGE publication Inc.

Jaeqes P. Thiroux, *EthicsTheory and Practice* , California :Glencoe Publishing co. inc. p.2.

S.John Mackenzie, *A Manual of Ethics*, Delhi: Oxford University press, 1993.

Sally Wehmeier, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (New york:Oxford University press, 6th edition, 2003-04

Cathine Soanes, *Oxford Reference Dictionary*, New york: Oxford University press, 2001. p.546.

Dhaka University Institutional Repository

Paul.W.Taylor, *Problems of Moral Philosophy*, California : Dickenson Publishing co. inc.,2nd edition .

Oxford Advanced Learner's Dictionary, sixth edition, Oxford University press

Oxford Reference Dictionary, Oxford University press, 2001.

The World Book Dictionary, Chicagoi: World Book, inc.2000, p.1350.